াবলী-সিরিজ

# সৌরীন্দ্র গ্রন্থাবলী

( তৃতীয় ভাগ )

সৌরিন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

বসুমতী সাহিত্য - মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, - - - - - - - কলিকাতা

গ্রন্থাবলী সিরিজ

# সৌরীন্দ্র গ্রন্থাবলী

—( তৃতীয় ভাগ )—



শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত




শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিন যন্ত্রে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত

[ মূল্য ১৷০ দেড় টাকা

# সূচী


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | দরদী (উপন্যাস) | ... | ... | ... | ১ |
| ২। | প্রেয়সী (উপন্যাস) | ... | ... | ... | ৪৫ |
| ৩। | মুক্ত পাখী (উপন্যাস) | ... | ... | ... | ৯৭ |
| ৪। | বন্দী (উপন্যাস) | ... | ... | ... | ১৬৫ |
| ৫। | কঙ্কণা (গল্প) | ... | ... | ... | ১৯১ |
| | ১। মৃত্যুবাণ | ... | ... ১৯২ | | |
| | ২। বড়দিনের ছুটী | ... | ... ২০৪ | | |
| | ৩। রাস্কেল | ... | ... ২১০ | | |
| | ৪। পুরুষস্য ভাগ্যং | ... | ... ২১৪ | | |
| | ৫। বন-বাদাড় | ... | ... ২২৪ | | |
| | ৬। প্রহসন | ... | ... ২৩০ | | |
| | ৭। সঙ্কেতিকা | ... | ... ২৩৮ | | |
| | ৮। হারানো রতন | ... | ... ২৪৩ | | |
| ৬। | সুপর্ণা (গল্প) | ... | ... | ... | ২৪৯ |
| | ১। হায় নারী | ... | ... ২৫০ | | |
| | ২। উপসর্গ | ... | ... ২৫৩ | | |
| | ৩। বর্ষাতি | ... | ... ২৬২ | | |
| | ৪। দুই পরিচ্ছেদ | ... | ... ২৬৯ | | |
| | ৫। অর্থাৎ | ... | ... ২৭২ | | |
| | ৬। টোপ | ... | ... ২৭৮ | | |
| | ৭। ভক্ত | ... | ... ২৮৬ | | |
| | ৮। অনিন্দিতা | ... | ... ২৮৭ | | |
| ৭। | পঞ্চশর (কৌতুক-নাট্য) | ... | ... | ... | ২৯৫ |
| ৮। | রূপসী (নাটক) | ... | ... | ... | ৩১৩ |
| ৯। | আধুনিক সামাজিক সমস্যা ও সমাধান (নক্সা) | | | ... | ৩৩৭ |
| ১০। | লেখার নমুনা (নক্সা) | ... | ... | ... | ৩৪১ |
| ১১। | গবেষণা (নক্সা) | ... | ... | ... | ৩৪৬ |
| ১২। | বায়োস্কোপের শিনারিও (নক্সা) | | ... | ... | ৩৪৯ |
| ১৩। | মোটরে কাশ্মীর যাত্রা (ভ্রমণ—৩য় পর্ব্ব) | | | ... | ৩৫৪ |
| ১৪। | কবিতা ও গান | ... | ... | ... | ৩৭২ |

# দরদী

[ উপন্যাস ]

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে মুদ্রিত

---

দরদী বন্ধু

ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু

করকমলেষু—

বন্ধু

ছুরি-কাঁচি আর মানুষের হাড়-গোড় নিয়েই আপনার কারবার, জানতুম। কিন্তু এক দুর্দ্দিনে দেখলুম, ও হৃদয়খানি আর্ত্তের উপর অনেকখানি দরদে ভরা। সেই দিনটিকে আমার জীবনে চির-স্মরণীয় করে রাখতে চাই বলেই আমার 'দরদী'কে আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি। আপনি দরদী। কাজেই আমার 'দরদী'র বে-দরদ যে করবেন না, এ বিশ্বাস আমার বিলক্ষণ আছে।

১৭ নং মোহনবাগান রো,
কলিকাতা
২৭ পৌষ, ১৩২৬

স্নেহানুরক্ত
সৌরীন্দ্র

# দরদী

সন্ধ্যা হয়-হয়। রাস্তার গ্যাসগুলা তখনো জ্বালা হয় নাই। কলিকাতার পথে লোকের ভারী ভিড়! ট্রাম ভরিয়া গাড়ী চড়িয়া অফিসের ফেরত বাঙালীবাবুর দল ঘরে ফিরিতেছে,—যাহাদের আয় অল্প, সেরূপ কেরাণীর দল হাঁটিয়া ভিড় করিয়া ভিড় ঠেলিয়া পথে চলিয়াছে। কাহারও হাতে তরী-তরকারী, কাহারো হাত খালি! কাহারো মুখে বিরক্তি, কাহারো মুখে মুক্তির আনন্দ—দাসত্বের খোলশ্ ছাড়িয়া নিজের ঘরের কোণে স্বাধীনভাবে গা গড়াইয়া লইবে। ছোকরার দল পান-সিগারেটের দোকানের সামনে ভিড় করিয়া পান-সিগারেট কিনিতেছে। বাবু ও বিলাসীদের গাড়ী-মোটর পথিকের গায়ে কাদা ছিটাইয়া তীব্র অবজ্ঞা হানিয়া সদর্পে ছুটিয়া চলিয়াছে।

চিৎপুর রোডে লোকের ভিড় বেশী। সরু পথ,—অথচ কলিকাতার বুকের উপর দিয়া সটান্ সোজা চলিয়া গিয়াছে। উপরের বারান্দায় রঙে-রাঙ্তায় গা ঢাকিয়া অভাগিনী নারীর দল শীর্ণ বিবর্ণ মুখে নিতান্ত বেচারীর মত বসিয়া রহিয়াছে। একটা বাড়ীর সুমুখে ভারী ঘটা। উপরে রঙের বাহার! বিলাসী বাবুরা চলন্ত গাড়ীর মধ্য হইতে মুখ বাড়াইয়া বারান্দার উপর দৃষ্টির দুই-একটা ঝিলিক হানিয়া চলিয়াছেন। বারান্দায় এক রূপসী দাঁড়াইয়া—তার চোখের দৃষ্টি কখনো সুদূরে ভাসিয়া চলিয়াছে, কখনো-বা বারান্দায় টবের গাছে ফুটন্ত ফুলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। বারান্দার এককোণে একটা দাঁড়ানো দাঁড়ে একটি কাকাতুয়া। কাকাতুয়ার মাথার ঝুঁটিতে রূপসী সস্নেহে হাত বুলা-ইতে লাগিল। একজন অল্পবয়স্কা দাসী আসিয়া পাণের ডিপা ধরিল। একটা পাণ তুলিয়া লইয়া রূপসী মুখে দিল, তারপর আবার কাকাতুয়ার পানে মনঃসংযোগ করিল।

সহসা দাসী ডাকিল,—দিদিমণি গো, দ্যাখো, দ্যাখো···

রূপসী কহিল,—কি রে?

দাসী কহিল,—ওখানটায় ভিড় দ্যাখো একবার!

অদূরে এক দোকানের সম্মুখে ফুটপাথে লোক একেবারে গিশ্-গিশ্ করিতেছে। একজন লাল-পাগড়ী কন্‌ষ্টেবলও অকু-স্থলে দেখা দিয়াছে এবং বেচারা কেরাণী হইতে আরম্ভ করিয়া পাণওয়ালা কুলি-মজুর পর্য্যন্ত তামাসা দেখিতে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। লাল-পাগড়ী কন্‌ষ্টেবলটি নানা হুঙ্কারে ভিড় সরাইতে পারিতেছে না। দোকানীরা তিন-চারি জনে মিলিয়া দোকান ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে।

রূপসী কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া ভিড় দেখিল, পরে দাসীকে বলিল,—কিসের ভিড় রে?

দাসী কহিল,—দেখে আসবো, দিদিমণি?

—যা।

রূপসীর এ কৌতূহলের কোনো কারণ ছিল না। এমন ভিড় অমন জায়গায় নিত্যই জমে। তাহাতে তাহার কি আসিয়া যায়? কিন্তু এ-বেলায় মনটা আজ তার কোন-কিছু একটা ব্যাপারে ঠিক বসিতেছিল না, তাই এ কৌতূহল!

দাসী সাগ্রহে চলিয়া গেল; রূপসী উপরের বারান্দা হইতে দেখিতে লাগিল।

দাসী গিয়া জনতার সম্মুখে দাঁড়াইতে পাহারওয়ালা পথ করিয়া দিল। কোনমতে ভিড়ের মধ্যে একবার দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া দাসী তখনই গৃহে ফিরিল। দাসী ফিরিলে রূপসী বলিল,—কি রে গঙ্গা?

দাসীর নাম গঙ্গা। গঙ্গা কহিল,—আহা, একটি ছেলে গো, ভিরমি গেছে। ছেলে তো নয় দিদিমণি, যেন রাজপুত্তুর। বয়সও কম—চোদ্দ-পনেরো বছরের ছেলেটি।

—এখনো জ্ঞান হয় নি?

—না গো। দাসী পথের পানে চাহিয়া বকিয়া যাইতে লাগিল,—কার বাছা, না জানি! আহা, মা-বাপ কত ভাবতে নেগেচে।

রূপসী কহিল,—তুই এক কাজ করতে পারিস্, গঙ্গা? যা দেখি, ঐ পাহারওয়ালাটাকে বলে ছেলেটিকে এখানে নিয়ে আয়। অতগুলো মিন্সে জমে খালি তামাসাই দেখচে, কেউ তুলচে না!

গঙ্গা বলিল—না। খালি ভিড় করে রেখেচে।

রূপসী কহিল,—তুই যা। ওদের বলে-কয়ে ছেলেটিকে এইখানে নিয়ে আয়। যদি আন্‌তে পারিস্, তাহলে এক টাকা বখশিস্ পাবি।

দাসী সানন্দে প্রস্থান করিল।

২

বাড়ীর লোক অবাক্ হইয়া গেল। নীচেকার রোয়াকে বসিয়া রেবতী ছোলা ভাজা খাইতেছিল; হঠাৎ বাড়ীর মধ্যে ভিড় ঠেলিয়া আসিল দেখিয়া তাড়াতাড়ি সে উঠিয়া দাঁড়াইল। গঙ্গা ততক্ষণে অচেতন বালকটিকে দুই-চারিজন লোকের সাহায্যে বাড়ীতে আনিয়া ফেলিয়াছে। কন্‌ষ্টেবলও সঙ্গে আসিয়াছিল। সে সদর-দ্বার রুখিয়া ভিড় ঠেলিয়া দাঁড়াইল—গঙ্গা সদরে হুড়কো লাগাইয়া দিল। রেবতী বলিল,—কি লা গঙ্গা? কে ও? কাকে নিয়ে এলি?

রূপসী তখন নীচে নামিয়া আসিয়াছে। গঙ্গাকে সে বলিল,—আমার ঘরে নিয়ে গিয়ে খাটের উপর শুইয়ে দে। পৈরাগ্‌কে বল্‌, কিশোরীবাবু ডাক্তারকে এখনি গিয়ে ডেকে নিয়ে আসুক।

দোকানীও সঙ্গে আসিয়াছিল। রূপসী কহিল,—কি হয়েছিল?

দোকানী বলিল,—ছেলেটি আমার দোকানে উঠে একটু জল চাইলে, আমি একটা ঘটী করে জল দিলুম। জল খেয়ে ছেলেটি যেমন দোকান থেকে বেরিয়েচে, অমনি পড়ে গেল।

রূপসী কহিল,—তা তোমরা একটু জল অবধি মুখে দিতে পারো নি! এতগুলো লোক শুধু ভিড় করেই দাঁড়িয়েছিলে!

দোকানী অপ্রতিভ হইয়া কহিল,—ব্যাপার কি—জানবার জন্ত যাচ্ছি, এমন সময় রৈ-রৈ করে ভিড় জমে গেল। এ একটা কথা বলে, ও একটা কথা বলে, পাঁচ কথায় কেমন থ হয়ে গেলুম মা!

কনষ্টেবল্‌কে রূপসী বলিল,—তোমরা এখন যাও। আমি ডাক্তার ডাক্‌তে পাঠিয়েচি। ওর ভার আমি নিলুম।

কনষ্টেবল আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। এখনি তাহাকে গাড়ী আনাইয়া থানা আর হাসপাতাল করিতে হইত—তার পর করোণার্স কোর্ট অবধিও ছুটাছুটি হয় তো করিতে হইত! আঃ! সে ও দোকানী প্রস্থানোদ্যত হইল। অপর লোকগুলি ছেলেটিকে উপরে শোয়াইয়া রাখিয়া নামিয়া আসিল। তার পর সকলে একসঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

তখন রেবতী কহিল—হ্যাঁলা বিজ্‌লী, এ আবার তোর কি খেয়াল! মাথা খেতে পরের দায় কেন ঘাড়ে নিলি?

রেবতীর পানে তীব্র কটাক্ষ হানিয়া বিজলী কহিল,—ঘাড় শক্ত বলে।

কথাটা বলিয়াই বিজলী ডাকিল,—গঙ্গা—

গঙ্গা বলিল,—কেন গা দিদিমণি?

বিজলী বলিল,—পৈরাগ্‌কে পাঠিয়েচিস্?

গঙ্গা বলিল,—হ্যাঁ। এতক্ষণে সে বেরিয়ে গেছে গো।

বিজলী তখন শশব্যস্তে উপরে উঠিয়া আসিল।

রেবতী অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—আঁচলের ছোলাভাজাগুলা মাটীতে পড়িতেছিল, সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপও ছিল না। বিজলী উপরে উঠিয়া গেলে রেবতী কহিল,—রূপের দেমাকে সারাক্ষণ মট্‌মট্ করচেন! ঢঙ্গিনী!

কল-তলা হইতে সদু, পাঁচি, হেনা, ডালিম একে-একে আসিয়া রেবতীর কাছে দাঁড়াইল, কহিল,—কি গা রেবতী দিদি? কাকে বল্‌চো?

—ঐ বিজ্‌লী ছুঁড়ী! ছাখ্ না—ওলো আমার দরদী—দরদ একেবারে উথলে উঠেচে!

সদু বলিল,—হয়েচে কি?

রেবতী বলিল,—শুন্‌বি যদি তো ঘরে আয়! কার বল্ না, ঘাড়ে দুটো মাথা আছে যে, এখানে একটা কথা কয়ে শেষে থানা-পুলিশ করবে!

কৌতূহলীর দল রেবতীর সহিত তার ঘরে গিয়া ঢুকিল।

রেবতী বলিল,—একটা ছেলে বুঝি রাস্তায় ভিরমি গেছলো—ঐ যে আমাদের ত্রিবেণী এসে বলছিল না! তা মরি বোন্ নিজের জ্বালায়—কে যায় পরের দায় দেখতে। এখন বিজ্‌লী ছুঁড়ি গো সখের বাঁদী গঙ্গাকে পাঠিয়ে তাকে আনিয়ে কি না নিজের বিছানায় নিয়ে শোয়ালেন! ডাক্তার ডাকতে পাঠানো হয়েচে! তাই বলছিলুম, কেন বোন্ পরের দায় ঘাড়ে করচিস্? তা আমায় কি ঝঙ্কার না দিয়ে উঠলো!—ওঃ রূপের জাঁক এতই লো! যাবে, যাবে, ও রূপ থাক্‌বে না! আমরাও এককালে রূপের রাণী ছিলুম।

পাঁচি বলিল,—বাইজী! দুখানা জুড়ি-মটর এসে দাঁড়ায়—সেই দেমাকে একেবারে কাকেও চোখে দেখতে পায় না! সেদিন আমি গেছলুম, একটা টাকা ধার করতে। টাকাটা ফেলে দিয়ে বলা হলো,—ধার আবার কি! ও আর তোমায় দিতে হবে না। আমরা যেন ভিখিরী! টাকা কখনো চক্ষেও দেখি-নি!

রেবতীর ঘরে কমিটি যখন দস্তুরমত জমিয়া উঠিয়াছে, বিজলীর ঘরে বিজলী তখন সেই মূর্চ্ছাহত বালকটির মাথায় অডিকলোঁ ঢালিয়া পটি টিপিয়া বসিয়াছিল। কাছে দাঁড়াইয়া গঙ্গা পাখার বাতাস করিতেছিল। ছেলেটি একবার চোখ চাহিয়া আবার চক্ষু মুদিল। বিজলী কহিল,—গা কি রকম গরম দেখচিস্!

মাথায় হাত দিয়া গঙ্গা বলিল—জ্বরে কাঠ ফাটচে গো! তাই তো, ডাক্তারবাবু কখন্ আস্‌বে! নিশ্বেস

পড়চে বটে, কিন্তু ভাবচি, যদি ভালো-মন্দ হয়? কেন এ দায় ঘাড়ে করলে দিদিমণি? এই বিছানা-পত্তর্ সব নষ্ট হবে!

বিজলী হাঁকিল,—গঙ্গা! স্বর মৃদু হইলেও তাহাতে বাজের হুঙ্কার ছিল। বিজলীর চোখের ভঙ্গী দেখিয়া গঙ্গা শিহরিয়া থামিয়া গেল।

৩

ডাক্তার আসিয়া আস্তি জানাইয়া বলিলেন, জ্বরটা খারাপ। হাসপাতালে পাঠাইলে ভালো হয়—নহিলে এত ঝঞ্ঝাট সহা ইত্যাদি।

বিজলী কহিল,—সে জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না। আপনি ঝঞ্ঝাট সইতে না পারেন, বেশ, অন্য ডাক্তার আনাবো'খন!

অপ্রতিভ হইয়া ডাক্তার কহিলেন,—না, না,—তা নয়। আমার আবার ঝঞ্ঝাট কি! আমার তো কাজই এই। তবে যে রকম তদ্বির দরকার, তাই ভয় হয়, আপনার এখানে করবে কে!

বিজলী বলিল,—আমাকে নেহাৎ মোমের পুতুল ভাববেন না, ডাক্তার বাবু। রোগীর সেবা আমার নেহাৎ অজানা নয়। একদিন...

কথাটা বিজলী শেষ করিল না। একটু থামিয়া সে বলিল,—যাক্ ও-সব বাজে কথা। আপনি ওষুধ-পত্তরের ব্যবস্থা করে দিন্। কি কি কর্‌তে হবে, বলে যান্। আর যখনই আপনি দরকার বোধ করবেন, তখনই আস্‌বেন। আপনার টাকার জন্য ভাববেন না। বলেন তো, আগাম একশো টাকা না হয় রেখে দিন্।

সহরে তখন বিজলীর খুব পশার। বিজলীর রূপ, বিজলীর কণ্ঠ, বিজলীর নৃত্য-ভঙ্গী কলিকাতার সৌখীন সমাজে আলাপের একটা মস্ত সামগ্রী। যে-বাগানে বিজলীর পদার্পণ হয় না, সে বাগান বাগানই নয়! তার মুখের এককণা হাসির দামে বিজলীর কাজ করিতে লোকের ভিড় বাধিয়া যায়। সেই বিজলী এমন কাতরভাবে সাহায্য চাহিতেছে, তাহাও নগদ দাম দিয়া,—ডাক্তার বাবু আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়া কহিলেন,—বেশ, আমার যথাসাধ্য আমি করবো। টাকা পরেই দেবেন—টাকার জন্য এত ব্যস্ত হবার দরকার নেই!

ঔষধ প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া ডাক্তার বিদায় লইলে বিজলী ছেলেটির সেবার ভার লইয়া তাহার শিয়রে আসিয়া বসিল।

গঙ্গা বলিল,—একেবারে খেয়ে নিলে হতো না?

বিজলী কহিল,—আমি এখন খাবো না। তুই যা, বরং খেয়ে নিয়ে এইখানে এসে বসিস্'খন। এই ঘরেই মেঝের বিছানায় পড়ে ঘুমোস্, দরকার হলে তোকে ডাকবো।

গঙ্গা চলিয়া গেল। বিজলী রোগীকে ঔষধ খাওয়াইয়া দিল। পৈরাগ্‌ বরফ ও আইস্-ব্যাগ লইয়া আসিল; বিজলী আইস্-ব্যাগে বরফ পুরিয়া রোগীর মাথায় ধরিল।

হঠাৎ বাহিরে ডাক পড়িল,—বিজু—

বিজলী কাণ পাতিয়া খাড়া হইয়া বসিল মাত্র, উঠিল না।

আবার ডাক পড়িল,—বিজু, ও বিজু।

সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গা আসিয়া ঘরে ঢুকিল, বলিল—দিদি-মণি, জহরবাবু এসেচেন!

জহরবাবু জবরমাটীর জমিদার। এ-পাড়ায় তাঁর বদান্যতার ভারী সুখ্যাতি। তাঁর আঙুলের আটটা আঙ্‌টির অলুশে চারিধার যেমন ঝলমল করিয়া উঠিত, তেমনি নামের রশ্মিতেও এ-পাড়া উজ্জ্বল ছিল। কলিকাতায় কয়টা থিয়েটারে তাঁর একটা করিয়া বক্স বারো মাস রিজার্ভ আছে। মোসাহেব ও বিলাসিনী-পরিবৃত হইয়া জহরবাবু যেদিন থিয়েটারে পদার্পণ করেন, সেদিন থিয়েটারের প্রোপ্রাইটার ম্যানেজার সারাক্ষণ তটস্থ হইয়া বক্সের পাশে-পাশে ঘোরেন। থিয়েটারের প্লাকার্ডওয়ালার বেনিফিট-নাইটেও জহরবাবুর জন্য এক'শো টাকার রয়েল-বক্স বাঁধা বরাদ্দ আছেই! তা ছাড়া কলিকাতার এই পল্লীর সর্ব্বশ্রেণীর ব্যক্তির সর্ব্ব-প্রকার আবেদন জহরবাবুর কাছে সংরক্ষিত হয়। এহেন জহরবাবুও বিজলীর ঘরের দ্বারে আসিয়া প্রবেশের পূর্ব্বে সসম্ভ্রমে অনুমতি ভিক্ষা করেন।

জহরবাবুর প্রকাণ্ড মোটর আসিয়া বাড়ীর সম্মুখে থামিতে গঙ্গা আহার ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে। আসিয়া দেখে, জহরবাবু তখনও প্রবেশের অনুমতি পান্ নাই, তাই দ্রুত সে কর্ত্রীর কাছে আসিয়া জহরবাবুর আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। বিজলী কহিল,—যেতে বলে দে, আজ গান হবে না।

গঙ্গা অবাক্! হঠাৎ যদি সমস্ত পৃথিবীখানা সেই মুহূর্ত্তে উল্টাইয়া গিয়া আকাশটা পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িত, তাহা হইলেও গঙ্গা এতখানি বিস্মিত হইত না। সে ভাবিল, হয় দিদিমণির, নয় তার একজনের নিশ্চয় শুনিবার ভুল হইয়াছে। তাই সে আবার বলিল,—জহরবাবু এসেচেন গো দিদিমণি।

বিজলী কহিল,—এসেচেন, তা কি! নাচ্‌তে হবে! যেতে বলে দে—আজ আমার রঙ্গ করবার সময় নেই! দেখচিস নে?

গঙ্গা যন্ত্রচালিত মূর্ত্তির মতই বাহিরে আসিল। প্রকাণ্ড ভুঁড়ি দুলাইয়া জহরবাবু বলিলেন,—ঘরে কেউ আছে না কি গঙ্গামণি?

গঙ্গার বিরক্তি ধরিয়াছিল কর্ত্রীর এই অর্বাচীনতায়। বড়লোকের অনুগ্রহ পাওয়াও যেমন চকিতে ঘটে, তেমনি তাহা হারাইতেও চোখের পলক পড়ে না! সে খুব সংক্ষেপে ব্যাপারটা খুলিয়া বলিল। তারপর বলিল,—তুমি ভেতরে যাও গো দাদাবাবু। ছাখো না এই এক পাগলামি! এক-বাড়ী লোক সকলে ছি-ছি করচে, তা গ্রাহ্যিও নেই!

জহরবাবু কহিলেন,—যাবো? তাঁর চোখে অত্যন্ত করুণ দৃষ্টি!

গঙ্গা বলিল,—যাবে না তো কি! একেবারে অজ্ঞান! তোমায় দেখলে তবু যদি জ্ঞান হয়!

আশ্বাস পাইয়া জহরবাবু ধীরে ধীরে তখন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। বিজলী টেম্পারেচার দেখিতেছিল। হঠাৎ চোরের মত জহরবাবুকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া সে বলিল,—কে?

—আমি!

জহরবাবুর স্বর একেবারে গোবেচারী ভিখারীর মত, কাতরতায় ভরা! সে স্বরে পাষাণও গলিয়া যায়। বিজলীর ঘাড়ে ভূত চাপিয়াছিল; সে গলিল না, বেশ একটু রূঢ়স্বরেই বলিল,—যেতে বলে দিলুম যে!

—আমি যাচ্ছি, বিজু! কাতর দৃষ্টিতে জহর বিজলীর পানে চাহিলেন। বিজলী সেদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই ডাকিল,—গঙ্গা—

গঙ্গা আসিল। বিজলী কহিল,—খানিকটা বরফ ভেঙ্গে দে দেখি,—তারপর আমার দেরাজ খুলে একখানা ফর্শা তোয়ালে বার করে আমাকে দিয়ে যা।

গঙ্গা ভাবিয়াছিল, না জানি, কত ভর্ৎসনাই তাহাকে গিলিতে হইবে! তাহার পরিবর্ত্তে এই সামান্য ফরমাশে সে একেবারে বর্ত্তাইয়া গেল। গঙ্গা তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

জহরবাবু কহিলেন,—একটা নার্শ আনিয়ে দেবো বিজু?

—কোনো দরকার নেই।

—না হলে তোমার কষ্ট হবে যে। শেষে কি একটা অসুখে পড়বে!

বিজলী সে কথার কোন জবাব দিল না।

জহরবাবু একবার চারিদিকে চাহিয়া খাটের নিকটে সরিয়া আসিলেন; বিজলীর পানে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন,—বিজু, তুমি দেবী!

বিজলী একটু হাসিয়া বলিল,—আপনি আজ বাড়ী যান। এ ক'দিন আমি একটু ব্যস্ত থাকবো—আপনি আর মিছে কষ্ট করে আসবেন না!

—আমি একবার করে এসে দেখে যাবো'খন। বলো তো, একজন ভালো সাহেব-ডাক্তার না হয় নিয়ে আসি কাল।

বিজলী কহিল,—যিনি দেখচেন, তাঁর সঙ্গে কথা না কয়ে কি সাহেব-ডাক্তার আনা ভালো দেখাবে?

গঙ্গা বরফ ও ধোপ্-দোস্ত্ তোয়ালে লইয়া আসিল। বিজলী সেগুলির ব্যবস্থা করিয়া গঙ্গাকে বলিল,—বাহিরে আলো জ্বেলে দে—জহরবাবু নীচে যাবেন।

এ-কথার পর আর দাঁড়ানো চলে না। যদি বিজলী রাগ করে! চিরকালের মত যদি একটা বিচ্ছেদ ঘটিয়া যায়! জহরবাবু এক-পা এক-পা করিয়া ঘরের বাহির হইলেন, দারুণ বেদনার ভারে পীড়িত হৃদয় লইয়া; গঙ্গা পিছনে পিছনে চলিল।

রাগে সে গর্-গর্ করিতেছিল। আজিকার মত তার পাঁচ পাঁচ টাকা বখশিসটাই মাটী হইয়া গেল।

## ৪

পরের দিনের কথা বলিতেছি।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ঘরে আলো জ্বলিতেছে। খাটের পাশে একটা টিপয়ের উপর আঙুরের বাক্স, বেদানা, এই-সব আছে। বিজলী একটা মেজ্যর গ্লাসে বেদানার রস ছাঁকিয়া বাহির করিতেছিল। হঠাৎ অচেতন ছেলেটি পাশ ফিরিয়া ডাকিল,—ও মা, মা গো—

বিজলী চমকিয়া রুমাল ও বেদানা রাখিয়া বিছানায় রোগীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। মাথার পটিতে ছেঁড়া কাপির টোসা করিয়া অডি-কলোঁ ঢালিয়া রোগীর মুখের কাছে মুখ লইয়া ঝুঁকিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।

ছেলেটি বড় রকমের একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আবার চাহিল—পরে তাহার শীর্ণ ক্ষীণ দৃষ্টিতে যতখানি-সম্ভব বিস্ময় ঢালিয়া চারিধারে তাকাইয়া আবার চক্ষু মুদিল।

বিজলীর প্রাণটা আনন্দে নাচিয়া উঠিল। সেবা তাহার সার্থক হইয়াছে তবে! এ-যাত্রা ছেলেটি তবে বাঁচিয়া গেল।

বৈকালে ডাক্তার আসিয়া বলিয়া গিয়াছিল, সন্ধ্যা-নাগাদ জ্ঞান হওয়া সম্ভব। যদি না হয়, তবে রক্ষা করা দায়। এই যে, জ্ঞান হইয়াছে—আঃ!

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বিজলী মেজ্যর গ্লাস আনিয়া ছেলেটির মুখে ধরিয়া বলিল,—খেয়ে ফেলো দিকিন!

ছেলেটির তরফ হইতে কোনরূপ সাড়া পাওয়া গেল না। বিজলী আবার কহিল,—খাও, এটুকু খেয়ে ফেলো। লক্ষ্মীটি!

ছেলেটি আবার চোখ চাহিল,—ক্ষীণ দৃষ্টিতে পরিপূর্ণ বিস্ময় লইয়া। কে এই অপরূপ রূপে রূপময়ী নারী,—তাহার মত হতভাগ্যের জন্য এমন করিয়া···? না, এ স্বপ্ন! আবার সে চক্ষু মুদিল।

কিন্তু না, এই কোমল স্পর্শ, এমন মধুর স্নেহ,—এ কি স্বপ্ন হইতে পারে! কখনো না।

তাহার দীর্ঘ শুষ্ক চুলগুলা রোগশীর্ণ ললাটের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, বিজলী হাত দিয়া সযত্নে চুলগুলি সরাইয়া দিয়া কহিল,—খাও এটুকু, লক্ষ্মী ছেলে!

মমতার এমন কোমল সুর—আঃ! এ জীবনটা সত্যই যদি সত্যের না হইয়া এমনি স্বপ্নের হইত!

বিজলী আবার বলিল—খাও।

না, এ স্বপ্ন নয়, স্বপ্ন নয়! এমন সুর স্বপ্নের বীণাতেও বাজে না তো!

রোগী আবার চোখ চাহিল, চাহিয়া চোখে যাহা দেখিল, সত্যই তাহা বিশ্বাস করিবার মত নয়! এক অপূর্ব্ব ভাবে হৃদয় তার ভরিয়া উঠিল,—মুখ হইতে আপনা-আপনি একটা স্বর ফুটিয়া বাহির হইল,—মা—

বিজলীর সমস্ত শরীর চন্‌চন্ করিয়া উঠিল—যেন এক জলন্ত বিদ্যুৎশিখা মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত চকিতে ছুটিয়া গেল। অপ্রতিভ হইয়া বিজলী কহিল—ছি, আমায় মা বলো না, বল্‌তে নেই।

দুই ফোঁটা জল রোগীর চোখের কোলে গড়াইয়া পড়িল। সে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া বিজলীর পানে চাহিয়া রহিল—কোনো কথা কহিল না। করুণাময়ী নারী—এ কে!

বিজলী কহিল,—এই বেদানার রসটুকু খেয়ে ফেলো।

রোগী ছোট শিশুর মতই বেদানার রস গলাধঃকরণ করিল।

বিজলী কহিল,—এখন কোনো কষ্ট হচ্ছে?

রোগী কহিল,—বড় কাহিল বোধ করচি।

বিজলী কহিল,—ভয় নেই। দুদিনেই সেরে উঠবে'খন!…আর কোনো কষ্ট?

—না। কিছুক্ষণ ঘরের চারিদিকে আপনার বিস্মিত দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া রোগী আবার বলিল,—আমি কোথায় আছি?

বিজলী কিছু বলিল না। কি বলিবে সে? এতদিন ধরিয়া আমোদ-প্রমোদ ও বিলাস-লীলার মধ্যে পড়িয়া যে-ঘরকে সে ঘর বলিয়া মনে করিয়াছিল, আজ সেই ঘরই তাহার কাছে এমনি বিশ্রী, কদর্য্য শ্মশানের মত ঠেকিল যে, সে ঘরের পরিচয় দিতে তার আজ প্রথম এই লজ্জা বোধ হইল।

ছেলেটি আবার বলিল,—আপনি কে?

—আমি? বিজলী থমকিয়া গেল। তাই তো—কি বলিবে? বিজলী কহিল,—আমি এমনি-একজন স্ত্রীলোক।

—এটা আপনার বাড়ী?

—হ্যাঁ।

—আমি এখানে কি করে' এলুম?

—সে অনেক কথা। আগে সেরে ওঠো, তারপর শুনো'খন। এখন তোমার নামটি কি, আমায় বলো দিকি!

—আমার নাম মহিম।

## ৫

তিন-চারদিন পরে মহিম পথ্য পাইয়া উঠিয়া বসিল। সারাদিন ঘরের মধ্যে পড়িয়া বাহির হইতে যে বিচিত্র কণ্ঠের বিচিত্র সুর তার কানে আসিয়া লাগিত, তাহা শুনিয়া সে অবাক্ হইয়া যাইত। বাহিরের এই কলরব, ঐ সব হাসি-গল্পের তরঙ্গ তাহার প্রাণে অত্যন্ত কৌতূহল জাগাইয়া তুলিত। আরো কৌতূহল জমিয়া উঠিত, এই তার প্রাণ-রক্ষয়িত্রী করুণাময়ী নারীটিকে ঘেরিয়া! ঘরের আসবাব-পত্র বেশ দামী,—কৌচ, আয়না, শোফা, কাঁচের ফুলদানী,—এ-সব জিনিষ মহিমের চোখে সম্পূর্ণ নূতন! এ-সবের যিনি অধিকারিণী, তাঁর রূপের সীমা নাই, বয়স অল্প,—লোকের মধ্যে ঐ একটা দাসী আর দুইজন ভৃত্য! ইহাদের ছাড়া আর কোন পুরুষমানুষকে সে এ কয়দিন চক্ষে দেখে নাই! ডাক্তার নিত্য আসিতেছে তাহাকে দেখিতেছে। কথাবার্ত্তা, দেনা-পাওনা যাহা-কিছু হইতেছে, সবই ঐ কিশোরী রমণীর সঙ্গে! রোগশয্যায় পড়িয়া মহিম আকাশ-পাতাল কত কি ভাবিতে থাকে—কিন্তু ভাবিয়া কোথাও থই পায় না!

আজ খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া বিজলী আসিয়া ভিজা চুলগুলা এলাইয়া দিয়া বসিতেই প্রকাণ্ড আয়নায় ছায়া পড়িল। আপনার চেহারাখানি দেখিবার অবসর আজ তার এই প্রথম মিলিল। এ কয়দিন রুম-রুক্ষ ঘষিয়া চেহারাকে সাজাইয়া তুলিবার কথা তার মনেও হয় নাই। বিজলীর মনে হইল, না হোক, কিন্তু এই রুক্ষ শুষ্ক বেশে তাহাকে আরো মানাইয়াছে,—সর্ব্বশরীরে রূপ যেন একেবারে উথলিয়া উঠিয়াছে! হায় রে, এই রূপই কাঁটার চাবুক মারিয়া কোথা হইতে কোথায় তাহাকে আনিয়া ফেলিয়াছে! আগে যেখানে ছিল, আর আজ যেখানে সে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—এই দুই জায়গার মধ্যে কত দীর্ঘ ব্যবধান কোথা হইতে গড়িয়া উঠিয়াছে। এ-পার হইতে আজ সেই ও-পারের দিকে চাহিতে চোখ ঠিক্‌রিয়া পড়ে! ও-পার আজ চোখের সাম্‌নে একেবারে ঝাপ্‌সা অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে! হঠাৎ মহিমের পানে বিজলীর চোখ পড়িল—মহিম একদৃষ্টে তাহারই মুখের পানে তাকাইয়া ছিল। বিজলী চোখ নামাইয়া মাথার খোলা চুলের উপর আঁচলটা তুলিয়া দিল।

মহিম বলিল,—আমি কবে যাবো?

বিজলী কহিল,—কোথায় যাবে? তোমার বাপ-মা কোথায় থাকেন, বলো। তাঁদের একটা খবর পাঠাতে হবে তো। তাঁদের ভাবনার কি সীমা আছে? ক'দিন এদিকে মন দিতেও পারি নি—এমন ভাবনা হয়েছিল! তোমার বাবা কোথায় থাকেন, বলো—আমি এখনি লোক পাঠাই।

মহিম বলিল,—আমার বাপ-মা নেই।

—আর কে আছেন, বলো।

—আমার কেউ নেই। আপনার জন কেউ কোথাও নেই।

তার মুখের পানে নীরবে ক্ষণেক চাহিয়া থাকিয়া বিজলী কহিল,—কোথায় থাকতে?

—কোথায় আর থাকব! আজ তিনদিন হলো সহরে এসেচি—আমার বাড়ী পাড়াগাঁয়ে।

বিজলী বলিল,—এখানে কি করে এলে? আর অত অসুখে কি করেই বা ঐ দোকানে সেদিন এসেছিলে?

মহিম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল—তার মুখে কোনো কথা ফুটিল না। বিজলী মহিমের পানে চাহিয়া চাহিয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল—ঐ সুন্দর সরল মুখখানিতে দুর্ভাগ্য কি গভীর কালো রেখা টানিয়া দিয়াছে, অভাবের কঠিন হাত বালকের গায়ের মাংসটুকুকে খুলিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া হাড়গুলাকে কিরূপ ঝিঁকের মত খাড়া করিয়া ধরিয়াছে! হঠাৎ মহিমের স্বরে সে চমকিয়া উঠিল,—মহিম তখন তাহার দুর্ভাগ্যের ইতিহাস বলিতে বসিয়াছে।

পল্লীগ্রামের এক গৃহস্থ ঘরের ছেলে সে। বাপের কথা মনে পড়ে না—মার কোলে মানুষ হইয়া মাতামহের ঘরে বাড়িয়া উঠিতেছিল। মাতামহের অবস্থা সে কালে মন্দ ছিল না—পাটের ব্যবসায়ে বিস্তর লোকসান দিয়া আপনার দুর্ভাগিনী বিধবা কন্যা আর নাতিটিকে লইয়া কোনমতে দিন কাটাইতেছিলেন। হঠাৎ একদিন মাও ইহলোকের সঙ্গে সব সম্পর্ক কাটিয়া সরিয়া পড়িল। মহিমের বয়স তখন আট বৎসর। বৃদ্ধ মাতামহ নাতিটিকে নাড়িয়া-চাড়িয়া এত-বড় দুঃখেও মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মার একান্ত সাধ ছিল, তাঁর মহিম লেখাপড়া শিখিয়া দশজনের একজন হইয়া ওঠে। মাতামহ তাই মেয়ের সে-সাধ পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে লেখাপড়ায় খেলাধূলায় মহিমের নিত্য-সঙ্গী হইয়া তাহাকে তেমনি ভাবে মানুষ করিতেছিল। আজ মাস তিনেক হইল, বৃদ্ধ মাতামহও তাহাকে ফাঁকি দিয়া সংসার ছাড়িয়াছে। মরিবার সময় মাতামহ বলিয়াছিল, কলিকাতায় জনার্দ্দন চৌধুরী এক-কালে তার আশ্রিত ছিল। আজ সে কলিকাতায় গিয়া কিসের ব্যবসা ফাঁদিয়া বেশ নাকি দু-পয়সার সংস্থান করিয়াছে। পরিচয় দিয়া তার দ্বারে দাঁড়াইলে দুটি অন্নের অভাব তার হইবে না—লেখাপড়াটাও চলিয়া যাইতে পারে। জনার্দ্দন কখনো রাঘব সিংহের নাতিকে ঠেলিতে পারিবে না।

তাই দেশের বিষয়-আশয়ের বিলি-ব্যবস্থা করিয়া অর্থাৎ সর্ব্বস্ব বেচিয়া মহিম কলিকাতায় আসিল। শিয়ালদহ ষ্টেশনে নামিয়া এই জনারণ্যের পানে চাহিয়া প্রথমটা সে কেমন হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিল; তারপর যখন সে ভাব একটু কাটিল, তখন জামার পকেটে হাত দিয়া সে দেখে, টাকার ছোট থলিটি কখন্ অন্তর্হিত হইয়াছে! কাঁদিয়া কলিকাতার রাস্তা সে ভিজাইয়া ফেলিয়াছে—পঞ্চাশজন লোক কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন নিক্ষেপ করিয়াছে—উত্তরে তার দুর্দ্দশার কাহিনী শুনিয়া ঝড়ের মতই আবার কে কোথায় সরিয়া গিয়াছে! না খাইয়া না শুইয়া সহরময় সে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে,—যে রাস্তা চোখে পড়িয়াছে, সেই রাস্তায় ঢুকিয়াছে, যাহাকে সম্মুখে পাইয়াছে, তাহারই কাছে জনার্দ্দন চৌধুরীর ঠিকানা খুঁজিয়াছে। কেহ গালি দিয়াছে—কেহ এক মিনিট আকাশের পানে ঊর্দ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকিয়া নিরুত্তরে চলিয়া গিয়াছে—কেহ-বা জবাব দেওয়া নিষ্প্রয়োজন বুঝিয়া তার সে-কথা কাণেও তোলে নাই। রৌদ্রের তাপ, ক্ষুধার তাড়না, বিনিদ্র রজনী, আর দুশ্চিন্তা পরিভ্রমণ—সব কয়টা মিলিয়া তাড়াইয়া কখন্ যে তাহাকে এ পথে আনে, আর কেমন করিয়াই বা আনিল, সে তার কিছু জানে না! শুধু এইটুকু মনে আছে, একটা দোকানের সামনে আসিয়া সে দাঁড়াইয়াছিল—জ্বরে গা পুড়িয়া যাইতেছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যায়! মাথা ঝন্‌ঝন্ করিতেছিল, পা আর চলিতে চাহিতেছিল না—তারপর এক ফোঁটা জল মুখে পড়িতে—আঃ, এত আরামও ছিল, ঐ একবিন্দু জলে! কিন্তু তখনি মাথা কেমন ঘুরিয়া গেল! চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবী ভয়ঙ্কর দুলিয়া উঠিল! তারপর চারিধার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হইল—কিছু দেখা যায় না! অন্ধকার,—রাশি রাশি অন্ধকার আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তারপর? তারপর আবার যখন চোখ মেলিয়া চাহিল, তখন এই ফুলের মত কোমল শয্যা—ঐ দুটি হাতের সুমধুর স্পর্শ! সে যেন কোন্ ইন্দ্রের স্বর্গপুরীতে আসিয়া পারিজাতের পাপড়ির উপর শুইয়া আছে, দেখিল। আলো—আলো, ওগো, আলোয় চারিধার ভরপুর হইয়া গিয়াছে!

বিজলী কহিল,—এখান থেকে কোথায় যাবে?

মহিম বলিল,—তা জানি না। জনার্দ্দন চৌধুরীর খোঁজ করবো।

বিজলী বলিল,—এই সহর কল্‌কাতা—তার মধ্যে

তোমার জনার্দ্দন চৌধুরীর কোন খোঁজ পাবে না তুমি, এ ঠিক জেনো। কোন্ রাস্তায়, কি কোন্ পাড়ায় থাকে, এটুকু জানা থাকলেও খুঁজে বার করা সম্ভব হতো! —যাক্, ধরো, তাকে পেলে না—তখন উপায়?

মহিমের চোখ ছল-ছল করিতেছিল। উপায় সত্যই নাই! ইহার চেয়ে আরো দুই-চারিদিন যদি সে রোগে ভুগিত, তাহা হইলে ছিল ভালো, বাহিরের কথা ভাবিতে হইত না!

রোগীকে দয়া,—যার প্রাণ আছে সে করিতে পারে, আশ্রয়ও সে দিতে পারে—কিন্তু মহিম এখন সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে, এখন আর তার পরের করুণার উপর দাবী চলিতে পারে না! এই দেবী তাহার জন্ম যাহা করিয়াছেন—এই প্রচণ্ড সেবা, প্রচুর অর্থব্যয়—সেজন্ম জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে কৃতজ্ঞ থাকিবে! কিন্তু এখন যদি ইনি বলেন,—বাপু হে, তুমি সারিয়া উঠিয়াছ, এখন নিজের পথ দেখ—তাহা হইলে তাঁহাকে এতটুকু দোষ দেওয়া যায় না তো। হায় রে, ইহার চেয়ে মরণই তার ছিল ভালো!

বিজলী কহিল,—তোমার জনার্দ্দন চৌধুরীকে পেলে তুমি কি চাকরি-বাকরির চেষ্টা দেখতে?

মহিম বলিল,—না। আমার মার বড় সাধ ছিল, আমি লেখাপড়া শিখি।

বিজলী কহিল,—বেশ, তাই করো।

মহিম মৃদু হাসিল, কথা বলিল না।

বিজলী বলিল,—আমি তোমার লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দেবো। তুমি পড়ো, পড়ে মানুষ হও। তোমার মার সাধ পূর্ণ হোক্।

কৃতজ্ঞতায় মহিমের দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল—গদ্‌গদ কণ্ঠে সে ডাকিল,—মা—

—ছি, মা বলো না। আমায় মা বল্‌তে নেই। আমি বেশ্যা।

জলমগ্ন ব্যক্তি কোনমতে প্রাণপণ শক্তিতে যখন কূলে আসিয়া উঠিয়াছে—পরিশ্রমে আতঙ্কে যখন সে একান্ত কাতর, তখন যদি কেহ সবলে ধাক্কা দিয়া আবার তাহাকে মাঝ-দরিয়ায় ফেলিয়া দেয়, তাহার যেমন অবস্থা হয়, মহিমের ঠিক তেমনি হইল। তাহার দুর্ব্বল বুকে কে যেন সবলে মুগুর মারিল। সে বিজলীর পানে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। বিজলী বেশ শান্ত স্বরে কহিল,—সেই জন্মই আর কি তোমায় অন্যত্র থাকতে হবে। নাহলে আমার কাছেই তোমায় রাখতুম। কিন্তু সে হবার নয়। কল্‌কাতায় ছেলেদের পড়বার মেশ আছে বিস্তর। তুমি আর একটু সেরে নাও—তারপর তোমার জন্ম মেশের ব্যবস্থাই করে দেবো। তবে একটা কথা, তোমার টাকা মাসে মাসে আমি পাঠিয়ে দেবো। তুমি এখানে আসতে পাবে না, কখনো না। এমন কি, আমি নিজেও কখনো যদি তোমায় ডাকতে পাঠাই, তবু না।

৬

আট-দশ দিন পরে মহিমকে স্কুলে ভর্ত্তি করাইয়া, তাহাকে মেশে পাঠাইয়া বিজলী নিজেকে বড় একা, বড় নিঃসঙ্গ বোধ করিল। পাশের বাড়ীতে হার্ম্মোনিয়ম বাজাইয়া তাহারই মত কে-এক নারী গান গাহিতেছিল—

ওগো, আঁধারের মাঝে আলো দেখে আমি
ছুটিনু তাহারি পাছে,—
যত চলি, দেখি সুদূরের আলো
সুদূরেই রহিয়াছে!

একটা কৌচের উপর পড়িয়া বিজলী এক-মনে গান শুনিতে লাগিল। প্রাণের মধ্যে কিসের বেদনা ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। সুমুখে খোলা জানালার মধ্য দিয়া অনেকখানি নীল আকাশ দেখা যাইতেছে। নীল আকাশের পানে সে চাহিল। নির্ম্মল আলোয় চারিধার উজ্জ্বল! কি সুন্দর!

তারপর নিজের ঘরের মধ্যে সমস্ত জিনিষ-পত্র আসবাবের উপরও সে চোখ বুলাইয়া লইল, বিলাসের সমস্ত উপকরণে ঘর একেবারে ঠাশা। পাশের বাড়ীতে তখনো গান চলিয়াছে—

আলোর ভিখারী এ প্রাণ আমার—
সহে না, সহে না এ ঘোর আঁধার!
কোথা আলো? ওগো, অন্ধ নয়ন
আলেয়ায় ছলিয়াছে!

বিজলীর মনে পড়িল, অতীতের কথা! সে কতদিনের কথাই বা! আলো কি তাহার জীবনে সে পাইয়াছে? না! আলেয়ার ছলনা সার হইয়াছে! ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে অভাব তার কতটুকু ছিল, আকাঙ্ক্ষাই বা কতটুকু! তারপর সেই বিবাহের রাত্রি! কম্পিত পুলকে কত বড় আশা লইয়া তার লজ্জা-কুণ্ঠিত প্রাণ কি আলোয় ভরিয়া উঠিয়াছিল! তারপর সেই সুখের রাত্রিগুলা প্রেম আর সোহাগের স্বপ্ন বুনিয়া চলিয়া গিয়াছে! সে স্বপ্ন সত্য হইয়া ফলিল না তো! তারপর অকস্মাৎ সে আশার কুঞ্জটিও কি-বাজের আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। এবং এক ঝঞ্ঝার বেগে জীবনটা এ কোন্ দিকে ছিটকাইয়া আসিয়া পড়িল! সমস্ত প্রাণটাকে তোলপাড় করিয়া ভিতরে প্রবল ঢেউ ছুটিল। ওগো, তার এতটুকু জীবন—কঠিন অদৃষ্ট সেই জীবনকে লইয়াই কত খেলা খেলিয়াছে—কি নিষ্ঠুর খেলা। প্রতিদিনের প্রতি কাহিনী আজ

এই নিঃসঙ্গ মুহূর্ত্তে যেন রক্তের অক্ষরে তার চোখের সামনে জলজল্ করিয়া ফুটিয়া উঠিল।

মা-বাপের আদর, সেই ছোট্ট ঘরখানি, সেই পানা-ভরা পুকুরপাড়—সব মনে পড়িল। সেই পুকুরপাড় দিয়া সে যাইতেছিল, এক সঙ্গিনীর বাড়ী। শীতের প্রাতে দোলাই গায়ে দিয়া পথে দল বাঁধিয়া পাড়ার মেয়েরা মুড়ি খাইতেছিল। একটু দূরে মেটে রাস্তা ভাঙ্গিয়া এক বৃদ্ধ আসিয়া কহিল,—মধুসূদন ভট্টাচার্য্যের বাড়ী কোথায়?

সঙ্গিনীরা ডাকিল,—ও জ্যোতি-দি—

বিজলীর তখন নাম ছিল, জ্যোতির্ম্ময়ী। পাড়ার পুরুষেরা বলিত, ভট্চাযি্য মেয়ের নাম রেখেচে সার্থক বটে! মেয়ের রূপে জ্যোতি ফোটে সত্যই! মেয়েরা বলিত, মেয়ে নয়, যেন চাঁদের কণা!

জ্যোতিকে সকলেই ভালো বাসিত। রঙে-গড়নে এমন মেয়ে চট্ করিয়া কাহারো চোখে পড়ে না। পাড়ার এক বড়লোকের বধূ আদর করিয়া জ্যোতিকে লেখাপড়া শিখাইবার ভার লইয়াছিল, সে ঐ জ্যোতির রূপে মুগ্ধ হইয়া। জ্যোতির রূপ যেমন, বুদ্ধিও ছিল তেমনি। পড়াশুনায় খেলাধূলায় জ্যোতিকে সঙ্গিনী পাইলে মেয়েরা বর্ত্তাইয়া যাইত। জ্যোতি পথে চলিলে ছেলেরা চাহিয়া দেখিত। তরুণের দল নিশীথের সুখ-স্বপ্নে জ্যোতিকে নিজেদের হৃদয়-আসনে রাণীর সাজে দেখিবার কল্পনায় বিভোর হইত!

বৃদ্ধকে দেখিয়া জ্যোতি কাছে আসিল। বৃদ্ধ কহিলেন,—তুমিই ভট্চাযি্য মহাশয়ের মেয়ে, মা লক্ষ্মী?

জ্যোতি কহিল,—হঁ্যা। আপনি তাঁকে খুঁজচেন? আসুন।

জ্যোতিকে সযত্নে নিরীক্ষণ করিয়া বৃদ্ধ কহিলেন,—মা-লক্ষ্মীর মতই রূপ বটে! আমার এতটা পথ আসা সার্থক হলো।

সংবাদটা পাড়ায় রাষ্ট্র হইতে মুহূর্ত্ত বিলম্ব ঘটিল না। সকলে যখন শুনিল, ক্ষীরগাঁয়ের জমিদার চন্দ্রকান্ত চৌধুরী নায়েব পাঠাইয়াছেন,—জ্যোতিকে পুত্রবধূ করিবার সঙ্কল্পে, তখন সকলের প্রাণে একটা হায়-হায় রব উঠিল। আনন্দ যে না হইল, এমন নয়! এমন রূপসী মেয়ে—আহা, সে রাজ-রাণী হোক্!

চন্দ্রকান্ত চৌধুরীকে সে মহলের লোকে টাকার আণ্ডিল বলিত। রাজার ঐশ্বর্য্য। হাতি না থাকিলেও সেকালের হাতিশালা এখনো আছে। সেটা দেখিলেও সমৃদ্ধির কতক আভাস পাওয়া যায়। পাড়ার দুই-একজন ব্যক্তি বিশেষ-রকম ক্ষুব্ধ হইলেন। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন, আপনার পুত্রের সহিত বিবাহ দিয়া জ্যোতিকে গৃহে আনিয়া ঘর আলো করিবেন। কিন্তু চন্দ্রকান্ত চৌধুরী যখন এ-ক্ষেত্রে উ[illegible]ত, তখন সে সাধ মনে রাখা ছাড়া উপায় কি!

মধুসূদন ভট্টাচার্য্য প্রস্তাব শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন না—ইহা আর আশ্চর্য্য কি! তিনি বরাবরই এমনটি আশা করিয়াছিলেন। মেয়েকে ডাগর দেখিয়াও যে নিশ্চিন্ত ছিলেন, দমেন নাই—তাহার কারণ ছিল, ঐ জ্যোতির রূপ! জমিদার-বাড়ীর সেই নহবৎখানা-ওয়ালা প্রকাণ্ড ফটক, দরদালান, মোটা থাম, সেই বিশাল প্রাসাদ, অগাধ ঐশ্বর্য্য—তাঁহার কন্যা জ্যোতিকে সাদরে আহ্বান না করিবে কেন? তাহার রূপ কি সামান্য!

কথা অচিরে পাকা হইয়া গেল এবং বাজনা-বাদ্য, আলোর মশাল ও লোকজনের বিপুল সমারোহ লইয়া সপুত্র চন্দ্রকান্ত শীঘ্র একদিন আসিয়া ক্ষুদ্র গ্রামখানিকে যথেষ্ট তোলপাড় করিয়া দিলেন। ফিরিবার সময় যখন জ্যোতিকে সঙ্গে লইয়া গেলেন, তখন সমস্ত গ্রামবাসীর মনে হইল, পৃথিবীর বুক হইতে সমস্ত আলো যেন একনিমেষে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে!

এই বেদনা সব-চেয়ে বেশী লাগিল, হেমন্তর প্রাণে। হেমন্ত কলিকাতায় বি, এ পড়িতেছিল। মধুসূদনের বাড়ীর ঠিক পাশেই তাহার বাড়ী। হেমন্তর পিতা কলিকাতায় কোন্-একটা অফিসে বড় কাজ করিত—কলিকাতায় বাড়ী ভাড়া করিয়া তাহারা বাস করে, ছুটির সময় কালে ভদ্রে দেশের বাড়ীতে আসিয়া পাঁচ-সাত দিন থাকিয়া যায়।

হেমন্ত প্রথম-প্রথম দেশে আসিতে ভারী আপত্তি করিত। পাড়াগাঁ,—লোকগুলা ভারী গায়ে-পড়া-গোছের, শিক্ষিতকে সম্ভ্রম করিতে জানে না;—কথা কহিয়া সুখ নাই, আলোচনার বিষয় তাহাদের অতি সঙ্কীর্ণ। সে-সব লোকের সংসর্গে মানুষ কখনো বাঁচিতে পারে? চাকরী এবং চাকরীর কর্ত্তা সাহেব-সুবা লইয়া বাপ এতটা ব্যস্ত যে, দেশ ও আত্মীয়-স্বজন, এ-সকলের চিন্তা করিবার মত সময় তাঁর মোটেই ছিল না। কাজেই কাহারো আর দেশে আসা ঘটিত না।

কিন্তু সে-বৎসর কলিকাতায় কি-একটা রোগের হুজুগ বাধিলে শশব্যস্তে সকলে যখন কলিকাতার বাহিরে নিরাপদ নীড় খুঁজিয়া আশ্রয়-লাভের জন্য দৌড় দিল, তখন হেমন্তরাও সপরিবারে দেশের বাড়ীতে আসিয়া তাহার সংস্কারে মনঃসংযোগ করিল। হেমন্ত তখন দেশে আসিয়া এই লক্ষ্মীছাড়া গ্রামেই আকর্ষণের এমন-একটি বস্তু পাইল,—যে হুজুগ থামিবার পরেও তিন চারি দিনের ছুটি হইলে সে দেশের ঘর-বার দেখিবার জন্য অসম্ভব ঝোঁক লইয়া এখানে ছুটিয়া আসিত।

আকর্ষণের সে বস্তু, জ্যোতি। জ্যোতির বয়স তখন বারো পার হইয়াছে। আদরে যত্নে বারো বৎসর বয়সেই

লাবণ্য তাহার সর্ব্বাঙ্গে বান ডাকিয়া দিয়াছিল। সাজাইবার এমন উপকরণ সম্মুখে পাইয়া যৌবনও আপনার হৃদয়ের সমস্ত অনুরাগ ঢালিয়া এমন অপূর্ব্ব লালিত্যে তাহার দেহটিকে বিকশিত করিয়া তুলিতেছিল যে, জ্যোতি আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলে অন্ধেরও চোখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিতে সাধ হয়! জ্যোতির রূপে যেন হিল্লোল বহিতেছে।

হেমন্ত একদিন জ্যোতির সেই রূপের জ্যোৎস্না চক্ষে দেখিল।

দেখিয়া সে পাগল হইল। মিস্ত্রিদের কাজে আশ্চর্য্য খুঁত ধরিয়া মেরামতের কাল সে তো সুদীর্ঘ করিয়া দিলই; তার পর যখন-তখন অবসর মিলিলেই সে দেশে আসিতে লাগিল।

আসিয়া এ রূপ চোখে দেখিয়াই তো আর তৃপ্তি হয় না। জ্যোতির সহিত দুটা কথা কহিবার সাধ হয়; কিন্তু সে সাধ মিটাইবার সম্ভাবনা নাই!

মাথার উপরে কোন্ দুষ্ট দেবতা বক্র হাসি হাসিয়া এক সুযোগ ঘটাইলেন। জ্যোতি সেদিন কোন সঙ্গিনীর বাড়ী হইতে ফিরিতেছিল। হেমন্ত চলিয়াছিল—সান্ধ্য ভ্রমণে। দূর হইতে জ্যোতিকে দেখিয়া হেমন্তর প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। এই তো সুযোগ তার হাতের মুঠির মধ্যে! কিন্তু, কিন্তু—

সহসা জ্যোতি চীৎকার করিয়া উঠিল। স্বপ্ন-বিভোর হেমন্ত চাহিয়া দেখে, একটা গাভী দড়ি ছিঁড়িয়া ছুটিয়া একেবারে জ্যোতির পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। হেমন্ত ছুটিয়া গিয়া গাভীর দড়িটা ধরিয়া ফেলিল। পল্লীগ্রামের গাভী, দড়ি ধরিতেই থামিয়া শান্ত হইল। কাছে একটি গাছে দড়ি বাঁধিয়া হেমন্ত আসিয়া কহিল, —ভয় নেই। বাড়ী যাও!

জ্যোতি কুণ্ঠিত চরণে ত্রস্তে বাড়ী চলিয়া গেল।

হেমন্তর কোনো হুঁশ ছিল না। জ্যোতি চোখের আড়ালে চলিয়া গেলে হুঁশ হইল। তখন তাহার মনে হইল, এই ভীরু দুর্ব্বল মনটাকে সে ঐ ইটে ছেঁচিয়া চুরমার করিয়া ফেলে! হাতের নাগালে পাইয়া অবোধ শিশুর মতই সমস্ত সুখ হায়, হারাইয়া ফেলিল, সে এমন মূঢ়! এই সুযোগে ভীতা জ্যোতির হাতটা ধরিয়া সে তাহাকে তাহার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিতে পারিত তো! এক মুহূর্ত্তের ভুলে, হায় রে, কত-বড় ক্ষতি সে করিয়া বসিল।

হেমন্ত আর দাঁড়াইল না। সে মধুসূদন ভট্টাচার্য্যের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল। ডাকিল,—ভট্‌চায্যি মশাই আছেন?

মধুসূদন ভট্টাচার্য্য গৃহে ছিলেন না; তাঁহার পত্নী ভিতর হইতে কহিলেন,—কে গা?

—আমি হেমন্ত, আপনাদের পাশের বাড়ীতে থাকি।

—ও! সুশীলবাবুর ছেলে!

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ভিতরে এসো না বাবা, ঘরের ছেলে!

হেমন্ত কম্পিত চরণে ভিতরে ঢুকিল। জ্যোতি তখন মার কাছে বসিয়া পড়িয়াছে। মা সন্ধ্যা-দীপ সাজাইতেছিলেন।

হেমন্ত কহিল,—আপনার মেয়ে আজ খুব বেঁচে গেছে। একটা গরুতে তাড়া করেছিল।

মা কহিলেন—তাই বুঝি অমন হম্পদম্প হয়ে ছুটে এলো!

জ্যোতি তখনো হাঁফাইতেছিল।

হেমন্ত কহিল,—ভাগ্যে আমি পথে ছিলুম!

মা বলিলেন,—বেঁচে থাকো বাবা, রাজা হও। হ্যাঁরে জ্যোতি, আমাকে তুই কিছু বল্‌লি না তো এসে!

জ্যোতি কি বলিবে! সে মাটীর দিকে মুখ নত করিয়া বসিয়া রহিল।

হেমন্ত বলিল—একলা ওকে বেরুতে দেন কেন?

মা বলিলেন,—পাড়াগাঁ—সবাই যাচ্ছে, তাই যায়, বাবা।

তার পর হেমন্ত সলজ্জ সঙ্কোচে আলাপটুকু আরো-একটু জমাইয়া তুলিল। জ্যোতি লেখাপড়া জানে, অনেক বই পড়িয়া ফেলিয়াছে; ঘরের কাজ-কর্ম্মে যেমন পটু, লেখাপড়াতেও তেমনি;···বিবাহের সম্বন্ধ দুই-একটা আসিতেছে; কিন্তু মা-বাপ উভয়েরই ইচ্ছা, জ্যোতি ঘণ্টা-নাড়া ভট্টাচার্য্যের হাতে না পড়িয়া একটা মানুষের মত মানুষের হাতে পড়ে!—মা এ কথাটাও বলিয়া ফেলিলেন।

কথায় কথায় রাত্রি হইতেছিল। ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী কহিলেন,—জ্যোতি, যা' তো মা, উনুনটায় আগুন দে।

জ্যোতি উঠিয়া গেল। হেমন্তর মনে হইল, তাই তো! তাহার গল্প করিবার সমস্ত আগ্রহও অমনি মুহূর্ত্তে নিবিয়া গেল,—তা হলে আমি এখন উঠি। আমরা এখানে থাকি না বলে জানাশোনা নেই, এটা বড় দুঃখের বিষয়! আপনাদের কোনো খবরও নিতে পারি না!

ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী বলিলেন,—কবে যাবে?

পরের দিনই হেমন্তর যাইবার কথা। কিন্তু নূতন আলাপের পর তাহার ইচ্ছা হইল, আরো দুই-চারি দিন কাটাইয়া গেলে বেশ হয়! ইহা ভাবিয়া সে বলিল,—দু'চারদিন পরে ফিরতে হবে। আমাদের কলেজ খুলবে কি না।

ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী বলিলেন,—তা হলে আবার এসো। এঁর সঙ্গে দেখা করো। তোমার বাবা যখনই আগে আসতেন, তখনি এঁর সঙ্গে তাঁর যা-কিছু কথাবার্ত্তা

পরামর্শ-টরামর্শ চলতো। কোথায় কাকে বাগান জমা দেবেন, পুকুর জমা দেবেন, ইনিই তা ঠিক করে দিতেন।

হেমন্তর প্রাণটা আশার আনন্দে নাচিয়া উঠিল। সে বলিল,—কাল আসবো। সকালে উনি থাকেন তো?

—হ্যাঁ।

হেমন্ত উঠিল। যাইবার সময় বলিল,—জ্যোতির জন্য ক'খানা বইও সেই সঙ্গে আনবো'খন। ও বই পড়তে ভালোবাসে, বলছিলেন—তা এদেশে ক'খানাই বা পড়বার মত বই পাওয়া যায়!

দুই-চারি দিনের জায়গায় হেমন্তর এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল! তবু এখনো যাইবার নাম নাই! দেশের মাটীতে এমন মন বসিয়া গেল যে কলিকাতা হইতে চিঠি আসিল, ব্যাপার কি?

হেমন্ত তাহার উত্তরে প্রকাণ্ড জবাব লিখিয়া ফেলিল,—লিখিল, সহরে তাহারা ভাড়াটিয়া মাত্র—কেহ মানে না। দেশে গণ্যমান্য বলিয়া খ্যাতি আছে—সে খ্যাতি নষ্ট করা ঠিক নয়। তা ছাড়া বাড়ীটা এখনকার কেতায় সাজাইয়া তোলা নিতান্ত প্রয়োজন; এবং বাড়ীটাকে এমনভাবে রাখা দরকার, যেন ইচ্ছা হইলেই তাহারা আসিয়া ইত্যাদি।

মা চিঠি পাইয়া হাসিয়া বলিলেন,—হিমুর আমার সুমতি হয়েচে গো।

জ্যোতিদের সঙ্গে হেমন্তর আলাপ বেশ জমিয়া উঠিল। লেখাপড়ার কথাই তাহার সঙ্গে বেশী করিয়া হয়—ইংরাজী কাব্য-নাটকের কত গল্পই যে জ্যোতি হেমন্তর কাছে শুনিয়া শিখিয়া ফেলিয়াছে, তার আর সংখ্যা নাই! হেমন্তর এই পরিপূর্ণ অনুরাগ জ্যোতির তরুণ হৃদয়খানির উপর বেশ-একটা ছাপ ফেলিতেছিল। হেমন্তর কাছে এক অপরূপ নূতন জগতের পরিচয় সে লাভ করিত। সঙ্গিনীদের ছোট-খাট কথাবার্ত্তা এখন আর তার মনের খোরাক জোগাইতে পারে না। রাত্রে বিছানায় শুইয়া সে ভাবে, কখন্ আবার সকাল হইবে, হেমন্ত আসিয়া গল্প করিবে,—পড়া বলিয়া দিবে। হেমন্তর হাসি, হেমন্তর কথাবার্ত্তা তাহার প্রাণে কোথাকার কত নব-নব সুরই না জাগাইয়া তুলিত! হেমন্তর কাছে জ্যোতি ফার্ষ্ট বুক পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। মধুসূদন ভট্টাচার্য্যের ইহাতে কোন আপত্তি ছিল না। লেখাপড়া বেশী শিখিলে আজকালকার বিবাহের বাজারে ভালো ছেলেরা পয়সার মায়া কাটাইয়া মেয়েকে ঘরে লইতে রাজী হইবে, এ আশা তাঁহার মনে বিলক্ষণ ছিল।

হেমন্ত কি ভাবিয়া জ্যোতির সঙ্গে এতটা মেলামেশা করিতেছিল, তাহা বলা কঠিন। এটুকু সে বেশ জানিত, তাহার অর্থ-প্রেমিক পিতা জ্যোতির সহিত তাহার বিবাহ কখনো দিবেন না। জ্যোতির রূপের জ্যোতিতে সারা পৃথিবী উজ্জ্বল হইয়া উঠিলেও নয়, জ্যোতি বি, এ পরীক্ষায় পাশ হইলেও নয়। তবু সে মিশিত কেন? তরুণ বয়সে রূপের প্রতি যে গভীর আকর্ষণ, অসীম অনুরাগ পুরুষের প্রাণে জাগিয়া ওঠে, তাহারই বশে হেমন্ত জ্যোতিকে চোখ ভরিয়া দেখিত। প্রাণ ভরিয়া তাই তাহার সহিত গল্প করিত। জ্যোতিকে দেখিয়া, জ্যোতির সহিত গল্প করিয়া যে তৃপ্তি পাইত, তেমন তৃপ্তি জগতের আর-কোন বস্তুতে তাহার কখনো মেলে নাই!

জ্যোতির সঙ্গে বসিয়া গল্প করিবার সময় তাহার তরুণ হৃদয় অপূর্ব্ব রঙে রঙীন হইয়া উঠিত; সঙ্গে সঙ্গে নৈরাশ্যের দুই-একটা কালো রেখাও যে সে রঙকে বিবর্ণ করিয়া না তুলিত, এমন নয়। পাবো না, পাবো না,...এই কথাটা মাঝে মাঝে তাহার সে অপূর্ব্ব রঙে-রঙীন হৃদয়-কুঞ্জকে সন্ত্রস্ত, চকিত করিয়া তুলিত।

আরো এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল...হেমন্ত তবু নড়িবার নাম করে না। শেষে পিতার কাছ হইতে এক জোর তাগিদ আসিয়া উপস্থিত,—কলেজ কামাই করিয়া বাড়ী মেরামত করিবার প্রয়োজন নাই। পত্র-পাঠ চলিয়া আসিবে!

হেমন্তর বুকটা হায়-হায় করিয়া উঠিল। ভগ্ন মনে সে আজ সারা দিন বাড়ীর বাহির হইল না; সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাগানে ফুলের গাছ লাগানো হইয়াছিল, মালীরা তাহার চারিদিকে বেড়া বসাইতেছিল। হেমন্ত আসিয়া অদূরে একটা ঢিপির উপর বসিল। হঠাৎ কোথা হইতে জ্যোতি আসিয়া হাজির। জ্যোতি বলিল,—আজ আমার পড়া নিলে না যে!

হেমন্ত শুধু বলিল—না। বলিয়া একাগ্র দৃষ্টিতে জ্যোতির মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সুন্দর জ্যোতি—না জানি, কোন্ ভাগ্যবানের হাতে পড়িবে! জ্যোতি যাহার হইবে, সে ভিখারী হইলেও রাজা! জগতে তাহার কিসের অভাব আর থাকিতে পারে!

জ্যোতি বলিল,—কেন? তাহার সুরে অনেকখানি আব্দার মাখানো ছিল।

হেমন্ত বলিল,—কাল সকালে আমি চলে যাবো জ্যোতি, তাই সব গোছ্‌গাছ্ করছিলুম।

—চলে যাবে! আবার কবে আসবে?

—তার ঠিক নেই। আর বোধ হয় আসা হবে না।

জ্যোতি কোন কথা বলিল না—চুপ করিয়া রহিল।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া হেমন্ত বলিল,—আমার জন্য তোমার মন কেমন করবে, জ্যোতি?

জ্যোতির চোখ ছল-ছল করিয়া আসিল; মুখে কথা ফুটিল না।

হেমন্ত উঠিয়া দাঁড়াইল,—একেবারে জ্যোতির দুই হাত ধরিয়া কহিল—বলো জ্যোতি।

হেমন্তর শরীর থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। জ্যোতি সে কম্পন বুঝিল। ঘাড় নাড়িয়া জ্যোতি জানাইল, হাঁ।

হেমন্ত আবার ডাকিল,—জ্যোতি—

জ্যোতি হেমন্তর পানে চোখ তুলিয়া চাহিল। অমনি গাছের পাতার ফাঁক দিয়া অস্তগামী সূর্য্যের আবীর-গোলা ঢেউ তাহার মুখের উপর ঝরিয়া পড়িল। সে দৃশ্য দেখিয়া হেমন্ত বিভোর হইল। তাহার নেশা লাগিল। সে একেবারে দুই হাতে জ্যোতিকে বুকে চাপিয়া তাহার লজ্জা-রক্তিম অধরে চুম্বন করিল! আচম্‌কা এই আদরের উচ্ছ্বাস! জ্যোতি কেমন বিমূঢ় বিভ্রান্ত—সে নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া রহিল। তার ভারী লজ্জা হইতেছিল—লজ্জায় সে মুখ তুলিতে পারিল না।

সুগভীর আবেগে আবার তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া হেমন্ত বলিল,—তোমায় আমি ভালোবাসি জ্যোতি, খুব, খুব ভালোবাসি…

জ্যোতি তখনো দাঁড়াইয়া, কাঠের পুতুলটির মতই নিস্পন্দ, নির্ব্বাক্! ধীরে ধীরে হেমন্তর চেতনা ফিরিয়া আসিতেছিল। সে বলিল,—তুমি আমায় ভালোবাসো? বলো…

জ্যোতি কথা কহিল না।

হেমন্ত আবার বলিল;—বলো জ্যোতি, বলো, লক্ষীটি!

জ্যোতি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, বাসি।

—আমায় ভুলে যাবে না?

কি জবাব সে দিবে? এত কথা শুনিবার জন্ত সে প্রস্তুতও ছিল না!

হেমন্ত বলিল,—যদি আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়?

সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডখানা জ্যোতির পায়ের তলায় কাঁপিয়া উঠিল। সর্ব্বাঙ্গ নিমেষে ঘামে ভিজিয়া উঠিয়াছিল। সে কিছু বলিতে পারিল না। সুগভীর লজ্জা নিশীথের অন্ধকারের মত তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘিরিয়া ধরিয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল, কোনমতে যদি সে মাটীর সঙ্গে মিশিয়া যাইতে পারিত! বিয়ে! এ যে বড় লজ্জার কথা!

ভগবান তাহাকে মুক্তি দিলেন। ওধারে বাহির হইতে কে ডাকিল,—জ্যোতি—

জ্যোতি বলিল,—মা ডাকচে।

বলিয়াই সে আর একমুহূর্ত্ত সেখানে দাঁড়াইল না, দ্রুত সরিয়া গেল। হেমন্ত চুপ করিয়া খানিক দাঁড়াইয়া রহিল—তার পর সেই গাছতলায় বসিয়া পড়িল। আকাশ-পাতাল কত-কি ভাবনা তাহার মাথাটাকে বিষম দোল দিয়াছিল।

যখন সে উঠিয়া বাড়ী ফিরিল, তখন রাত্রি হইয়াছে।

## ৮

সে রাত্রে হেমন্তর ভালো ঘুম হইল না। জ্যোতির চিন্তা তাহাকে একেবারে পাইয়া বসিয়াছে। একবার সে ভাবিল, মার কাছে গিয়া কথাটা পাড়িবে—মাকে বলিবে, জ্যোতির সঙ্গে বিবাহ হইলে পড়াশুনায় সে অসম্ভব মন দিবে, পাশ করিয়া টাকা আনিয়া পণের টাকার ক্ষতি সে পূরণ করিয়া দিবে। কিন্তু যখনই আবার পিতার নির্ম্মম অর্থপ্রিয়তার কথা মনে হইল, তখনই মন বেদনার ভারে অবসন্ন হইয়া পড়িল। সে তো জানে, পয়সা-কড়ি সম্বন্ধে পিতাকে টলানো কতখানি শক্ত! সে একেবারে অসম্ভব ব্যাপার!

সকালে বুকের মধ্যে পাহাড়ের ভার পুরিয়া যখন সে বাড়ী হইতে বাহির হইল, তখন দেখিল, ভট্টাচার্য্যের গৃহের দ্বার তখনো বন্ধ। শুধু বাড়ীটা ভাঙা ইটের দেওয়ালে বিদ্রূপের বিশ্রী হাসি মাখিয়া যেন দাঁড়াইয়া

ঐ ঘর! আহা, সোনার প্রাসাদ ঐ ঘর! ঘুমন্ত-পুরীর রাজকন্যা ঐ সোনার প্রাসাদে ঘুমাইয়া আছে! কোথায় তার জীবন-কাঠি পড়িয়া আছে, কে জানে? কবে কোন্ তেপান্তর মাঠের ও-পার হইতে পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া কনক-বরণ রাজপুত্র আসিয়া জীবন-কাঠি ছোঁয়াইয়া রাজকন্যার ঘুম ভাঙ্গাইয়া পক্ষিরাজের পিঠে তাহাকে তুলিয়া লইয়া কোন্ সোনার সিংহাসনে গিয়া বসাইয়া দিবে!

কলিকাতায় ফিরিয়া সে দেখিল, বাপের মুখ ভার। লেখাপড়ায় এতখানি অবহেলা করায় পিতা অত্যন্ত চটিয়া গিয়াছেন। তাহার উপর পাড়াগাঁয়ের মাটীর স্তূপে এমন করিয়া গতর ও অর্থ ব্যয় করিবার কি তাহার প্রয়োজন ছিল? মাটীর স্তূপে যখন বাস করা চলে, তখন সে মাটীর স্তূপকে রাঙতা-সোনায় মুড়িবার এত ঔৎসুক্য কেন?

আবার সেই কলেজ আর লেক্‌চার—কলেজ আর লেক্‌চার। মন কল্পনার ফানুসে চড়িয়া স্বপ্নের রাজ্যে উধাও হইয়া চলে—কোথায় সেই রক্ত-কমলের কোমল দলে শুইয়া আছে জ্যোতি,—রূপের রাজকন্যা! সে কেমন আছে গো? আমাকে সে মনে রাখিয়াছে কি? সেই শেফালির কুঞ্জে ছড়ানো ফুলের মেলা—জ্যোতি আসিয়া তাহার চাঁপার-কলি-আঙুলে করিয়া ধুলামাখা ফুল কুড়াইতেছে! জ্যোতি এখন কি করিতেছে? আঁচল দুলাইয়া সঙ্গিনীদের সহিত নিরুদ্বেগ মন লইয়া পথে পথে ফিরিতেছে? না, পুকুরের ধারে ঘেঁটু-বনে দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছে? অধীর মন সেই সুদূর পল্লীর কাননের কোলে, ঘরের কোণে, পুকুরের পাড়ে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া ক্লান্ত

হইয়া পড়ে—এই সে জ্যোতির নাগাল পায়, পরক্ষণে আবার তাহাকে হারাইয়া ফেলে! বিষম অধীরতা!

এ অধীরতা লইয়া মানুষ বাঁচিতে পারে না। উপায় কি? উপায়? একদিন সে জ্যোতিকে একখানা চিঠি লিখিয়া ফেলিল—প্রাণের শত আবেগ সহস্র সোহাগ জানাইয়া প্রকাণ্ড এক চিঠি! চিঠিটা লিখিয়া পকেটেই রাখিল,—ভাবিল, এ চিঠি পাঠাইলে এখনি একটা তুমুল আন্দোলন পড়িয়া যাইবে। পল্লীগ্রামের যেরূপ ব্যবস্থা—বাপের কানে উঠিতেও হয় তো এতটুকু বিলম্ব হইবে না! তখন?

তাহার ভয় হইল। বাপকে সে বাঘের মত ভয় করে। হৃদয়ের এই সব কোমল বৃত্তিগুলার কোন সংবাদ পিতা রাখেন না—এগুলাকে পিষিয়া একমাত্র পয়সা-কড়িকেই পিতা সার বস্তু বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছেন। পয়সার মাপে পিতা প্রত্যেক বস্তুর ওজন করিয়া থাকেন—যে-ব্যাপারে এক পয়সা লাভ নাই, পিতার কাছে সে ব্যাপারের এতটুকু আলোচনা চলিতে পারে না! কাজেই চিঠিখানা তাহার পকেটেই পড়িয়া রহিল। পাঠানো হইল না।

কিন্তু বিধাতা আবার একদিন মুখ তুলিলেন! দুই-তিন দিনের জন্য পিতাকে অফিসের কি-এক কাজে বিদেশে যাইতে হইল। হেমন্ত সেই ফাঁকে একবার দেশের বাড়ীতে ছুটিল। যাইবার সময় মাকে বলিয়া গেল—এক বন্ধুর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে বন্ধুর দেশে সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে চলিয়াছে—ফিরিতে দুই-একদিন বিলম্ব ঘটিবে।

দেশে আসিয়া সে একেবারে মধুসূদন ভট্টাচার্য্যের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল, ডাকিল,—জ্যোতি—

ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী বাহিরে আসিয়া বলিলেন,—কে? ও, হেমন্ত!

—হ্যাঁ জ্যাঠাইমা। আপনারা ভালো আছেন সব?

পাড়া-সম্পর্কে মধুসূদন ভট্টাচার্য্যকে হেমন্ত জ্যাঠামশায় ও তাঁহার গৃহিণীকে জ্যাঠাইমা বলিয়া ডাকিতে সুরু করিয়াছিল। জ্যাঠাইমা বলিলেন,—হ্যাঁ বাবা, সব খবর ভালো।

হেমন্ত বলিল,—জ্যোতির জন্য ক'খানা বই এনেচি। সে পড়াশুনা করচে কেমন?

জ্যাঠাইমা বলিলেন,—কৈ আর হচ্ছে! বই নিয়ে একটু-আধটু বসে, তা কে বলে দেয়!

—জ্যোতি কোথায়?

জ্যাঠাইমা বলিলেন,—সে ঐ চাটুয্যেদের বাড়ী গেছে। তাদের মেয়ে ননী কাল শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেচে কি না, তাই তার সঙ্গে দেখা করতে গেছে। তুমি এ-বেলায় থাকবে তো?

—হ্যাঁ। বোধ হয় কালও থাকতে হবে।

—তুমি একলা এলে! মাকে একবার নিয়ে এসো না!

—মার নড়বার জো নেই।

ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী তখন নিজের মনের কথা পাড়িলেন—তা বাবা, বোন্‌টি যে বড় হলো। তোমরা কলকাতায় থাকো, একটি ভালো পাত্তর-টাত্তর দেখে দাও না! পয়সা-কড়ির সামর্থ্য তো নেই, জানো। তোমাদের জানা-শোনা এমন একটি ছেলে নেই যে, মেয়েটিকে দেখে দয়া করে গরিবের এ-দায় উদ্ধার করে?

হেমন্তর বুকটা ধ্বক করিয়া উঠিল। তাহাকে বলা হইতেছে, জ্যোতির পাত্র দেখিয়া দাও! নিজের হাতে বিষের পাত্র তুলিয়া কি কেহ এমন স্বচ্ছন্দ চিত্তে মুখে ধরিতে পারে? কৈ, জ্যাঠাইমা এ-কথা বলিলেন না তো,—তুমিই বাবা এ দায় উদ্ধার করো!

হেমন্ত একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। চট্‌ করিয়া তাহার মুখে কথা যোগাইল না! শেষে সে ভাবটা সে সামলাইয়া লইল। চুপ করিয়া থাকা—তাও এদিকে ভাল দেখায় না। জ্যাঠাইমা যদি কোনরূপ সন্দেহ করেন!

হেমন্ত বলিল,—দেখ্‌চি বৈ কি, জ্যাঠাইমা। তেমন পাত্র মিল্‌চে কৈ? জ্যোতিকে তো যার তার হাতে ধরে দেওয়া যায় না।

এ-কথায় জ্যাঠাইমা গলিয়া গেলেন। বলিলেন,—এ-বেলায় এইখানেই দুটি খাবে, বাবা?

হেমন্ত বর্ত্তাইল। আঃ, সে তার পরম সৌভাগ্য! জ্যোতি সম্মুখে বসিয়া থাকিবে, জ্যোতিকে এত কাছে পাওয়া যাইবে!

হেমন্ত বলিল,—আচ্ছা, তা হলে বাড়ী থেকে ঘুরে আসি।

হেমন্ত চলিয়া গেল। বাড়ীতে তাহার কোন কাজ ছিল না। বাড়ীতে আসিয়া সে সেই জ্যোতিকে বহুদিন পূর্ব্বে-লেখা চিঠিখানা খুলিয়া বসিল ভাঁজে ভাঁজে চিঠিখানা মলিন হইয়া পড়িয়াছে, এক জায়গায় ছিঁড়িয়াও গিয়াছে। একবার দুইবার তিনবার হেমন্ত চিঠিখানা পড়িল। ভাবিল, এই চিঠিখানা জ্যোতিকে সে আজ পড়িতে দিবে। তাহাকে বুঝাইবে, জ্যোতি তাহার প্রাণটাকে কেমন করিয়া ভরিয়া রাখিয়াছে। জ্যোতি-হীন হেমন্তর জীবন কত ফাঁকা—কি নিবিড় আঁধারে ভরা!

তার পর সে ভাবিল,—দূর হোক পিতার ক্রোধ! এত কি ভয়? না হয়, পিতা তাহাকে ত্যাগ করিবেন, একটা পয়সাও দিবেন না! না দিন্—একটুও সামর্থ্য কি তাহার নাই, কোথাও সুদূর পল্লীগ্রামে মাষ্টারি করিয়া দুই-পয়সা উপার্জ্জন করে? তাহার প্রাণের গভীর

ভালোবাসায় জ্যোতির আর-সমস্ত অভাব সে পূরণ করিয়া দিতে পারিবে না ? সে ভাবিল,—আজ সে ভট্টাচার্য্যের কাছে জানু পাতিয়া জ্যোতিকে ভিক্ষা মাগিবে ! এ ভিক্ষা কি মিলিবে না ? কিন্তু তাহার পূর্ব্বে জ্যোতির মন জানা চাই ! সেও কি তাহারই মত···?

জ্যোতি, জ্যোতি—প্রাণ বলিতেছে, তুমি আমার, তুমি আমার গো !

৯

হেমন্ত খাইতে আসিয়াই দেখে, সামনেই জ্যোতি। জ্যোতি বলিল,—আমি তোমায় ডাক্তে যাচ্ছিলুম।

হেমন্ত জ্যোতির পানে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিল। এ-কয় মাসে জ্যোতির লাবণ্য আরো শতগুণ উছলিয়া উঠিয়াছে। এ যে রাজরাজেন্দ্রাণীর মূর্ত্তি—রাজার সিংহাসনেই এ-মূর্ত্তি শুধু সাজে ! তাহার মুখে একটা কথা ফুটিল না

হেমন্ত খাইতে বসিলে জ্যোতি পাখা লইয়া বাতাস করিতে বসিল। হেমন্ত ভাবিল, সে যেন জ্যোতির— জ্যোতি যেন তাহার স্ত্রী ! ভবিষ্যতের ছায়া এমনভাবে যখন ফুটিয়া উঠিয়াছে, তখন তাহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন !

জ্যোতি বলিল,—আমাদের ভুলে গেছলে তো বেশ !

হেমন্ত ভাবিল, বাঃ ! জ্যোতির স্বরে আজ এতটুকু জড়তা নাই তো !

হেমন্ত বলিল,—হুঁ।···তোমার পড়াশোনা কেমন হচ্ছে ?

জ্যোতি বলিল,—ছাই !

জ্যোতির মুখে এখন বেশ কথা ফুটিয়াছে ! লজ্জায় জড়ো-সড়ো সেই জ্যোতি এমন রসিকতা করিতে শিখিয়াছে ! বাঃ !

হেমন্ত বলিল,—আচ্ছা, আজ পড়া দিতে হবে। যদি পারো, তা হলে প্রাইজ পাবে। কত বই এনেচি তোমার জন্তে !

—কৈ, দেখি।

—সে-সব আমি বাড়ীতে রেখে এসেচি।

—আমি যাই, নিয়ে আসি গে।

—না, সে হচ্ছে না। আমি পড়া নিয়ে তবে দেবো।

—বটে ! আচ্ছা, আমি নেবো না তো, কখ্খনো সে বই নেবো না।

—কেন জ্যোতি ?

—কেন আমায় তুমি বই দেখাবে না ?

—আমি যখন এসেছিলুম, তখন তুমি বাড়ী ছিলে না কেন ?

—বা রে, আমি বুঝি জানতুম, তুমি আজ আস্বে। ননীদের বাড়ী গেছলুম ত। সে শ্বশুরবাড়ী থেকে নতুন এসেচে কি না, তাই ! তার পর মা গিয়ে যেই বল্লে, তুমি এসেচো, অমনি ছুটে এলুম। ও রান্না কার হাতের গো ? ও সব আমিই রেঁধেচি। মাকে বল্লুম, রাঁধবো মা। মা বল্লে,—রাঁধ্, তোর হিমুদার জন্তে তুইই রাঁধ্ বাপু।

হিমুদা ! হেমন্তর বিষম লাগিল। হাসিয়া জ্যোতি বলিল,—ষাট্, ষাট্ !

আহার শেষ করিয়া হেমন্ত কহিল,—আমি বাড়ী যাচ্ছি।

জ্যোতি বলিল,—চলো, আমিও আমার বইগুলো নিয়ে আসি।

ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী কহিলেন,—আগে খাওয়া-দাওয়া কর্—তার পর যাস্ তোর বই আনতে। তোর হিমুদা তো পালাচ্ছে না।

হেমন্ত ভাবিল, বাঃ, সেই বেশ হইবে ! একটু পরেই সে জ্যোতিকে একান্তে পাইবে। তখন সে তাহার প্রাণের নিভৃত বেদনা-ব্যথার কথা জ্যোতির কাছে খুলিয়া বলিতে পারিবে। জ্যোতির যদি আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে সে তাহার ভিক্ষার আবেদন লইয়া তখনই ভট্টাচার্য্য-দম্পতীর চরণে আসিয়া দাঁড়াইবে। পিতার বিরাগ বা বিমুখতা সে গ্রাহ্যও করিবে না !

হেমন্ত বাড়ী ফিরিয়া ছট্ফট করিতে লাগিল, কখন্ জ্যোতি আসিবে ! এখনো কি তার খাওয়া শেষ হয় নাই ? বড় দেরী করিয়া খায় ! জ্যোতির জন্ত যে বইগুলা আনিয়াছিল, সেগুলা নাড়িয়া চাড়িয়া শেষে কলম বাহির করিয়া প্রত্যেকটাতে গোটা গোটা অক্ষরে সে জ্যোতির নাম লিখিল। তার পর বইগুলাকে বুকে চাপিয়া ধরিল—অবশেষে তাহার চক্ষু মুদিয়া আসিতে-ছিল।

হঠাৎ বাহিরে জ্যোতি ডাকিল,—হিমুদা—

হেমন্ত বিছানা হইতে লাফাইয়া নামিল !

জ্যোতি আসিয়াছে !

তাহার বুকখানা কাঁপিয়া উঠিল—কে যেন সমস্ত মনটাকে ধরিয়া সজোরে নাড়িয়া দিল ! ভগ্ন কম্পিত স্বরে সে বলিল—এসো জ্যোতি।

জ্যোতি আসিল, বলিল,—কৈ আমার বই ? দাও।

বিছানার উপর বইগুলা পড়িয়াছিল—চক্চকে কাগজে ঝক্ঝকে বাঁধা। জ্যোতি বই লইয়া উল্টাইতে বসিল। আর হেমন্ত নির্নিমেষ নেত্রে তাহাকে দেখিতে লাগিল। ঐ অযত্ন-গ্রথিত কবরীর পাশে চাঁপার বরণ সুঠাম গ্রীবা, ঘন-কৃষ্ণ কেশের রাশি চামরের মত সুন্দর ললাটে মৃদু বায়ু-হিল্লোলে উড়িয়া পড়িয়া নাচিয়া ফিরিয়া খেলা করিতেছে—আপেলের মত রক্তিম গাল, নিটোল বাহু ! আহা, যৌবন সমস্ত অবয়বটিকে কেমন সুডৌল ছাঁদে গড়িয়া তুলিয়াছে। যেন রূপের প্রতিমাখানি !

হেমন্তর শিরায় শিরায় তালে তালে রক্ত নাচিয়া উঠিল। গদগদ কণ্ঠে সে ডাকিল,—জ্যোতি—

—কেন হিমুদা ?

জ্যোতি আবার বলে, হিমুদা! হেমন্ত ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া রহিল। পরে জ্যোতির হাতখানা আপনার হাতে তুলিয়া লইল। জ্যোতি হাত ছাড়াইয়া লইল; হেমন্তর মুখের পানে সে তাকাইতেও পারিল না। রাজ্যের লজ্জা কোথা হইতে আসিয়া তাহাকে একান্ত কুণ্ঠিত সঙ্কুচিত করিয়া তুলিল।

হেমন্ত কহিল,—আমাকে তুমি ভুলে গেছলে, জ্যোতি—না ? কিন্তু আমি তোমায় এক মুহূর্তের জন্যও ভুলিনি! সেখানে পলে-পলে তোমারই চিন্তায় আমি দগ্ধ হচ্ছিলুম। এই ছাখো জ্যোতি, তোমাকে একখানা চিঠিও লিখেছিলুম। কিন্তু পাছে তুমি অপ্রতিভ হও, তাই…তাই শুধু এ চিঠি পাঠাতে পারিনি! দিবারাত্র এই চিঠি বুকে নিয়ে আমি বেড়াচ্ছি।

কথাটা বলিয়া হেমন্ত তৃপ্ত হইল। প্রাণের কথাটা বেশ গুছাইয়া সে বলিয়াছে তো! তার পর সে চিঠিখানা খুলিয়া জ্যোতির হাতে দিল। জ্যোতির সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। চোখের সম্মুখে চিঠিখানা একেবারে অস্পষ্ট ঠেকিল! চিঠির অক্ষরগুলাও কালি মাখিয়া হাতের উপর যেন চলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

হেমন্ত বলিল,—চিঠিখানা পড়ো, লক্ষ্মীটি!

জ্যোতি নিস্পন্দ, চেতনা-হীন!

হেমন্ত বলিল,—বেশ, চিঠিটা আমায় দাও। আমি পড়ি।…শুনবে তো ?

জ্যোতি হাঁ-না কোন জবাব দিল না। ঘাড় নাড়িয়া একটা সম্মতি কি অসম্মতি—তাহা জানাইবারও তাহার সামর্থ্য ছিল না। সমস্ত শরীর তাহার যেন কি-এক যন্ত্রস্পর্শে অসাড় হইয়া গিয়াছে!

হেমন্ত গদ্‌গদ কণ্ঠে চিঠি পড়িতে লাগিল, আর জ্যোতি কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার কাণের কাছে দুম্‌ দুম্‌ করিয়া মুগুরের ঘা পড়িতেছিল। প্রণয়ের ঐ তীব্র উদ্দাম উচ্ছ্বাসের এক-আধটা হল্কা থাকিয়া থাকিয়া কাণে আসিয়া লাগিতেছিল, অমনি মাথা-শুদ্ধ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল। কাণ-দুইটা বিষম তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

চিঠি শেষ করিয়া এক সুগভীর তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া হেমন্ত বলিল,—আমার এ আশা কি দুরাশা, জ্যোতি ?

জ্যোতি কোন কথা বলিল না; বলিবার শক্তিও ছিল না। সে যেন কিসের বেড়া-পাকে পড়িয়াছে—নিশ্বাস তাহার বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। সমস্ত শরীর থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

হেমন্ত বলিল,—তুমি শুধু একটিবার বলো জ্যোতি, আমায় তুমি চাও! এখনি তা হলে আমি তোমার বাবার কাছ থেকে মার কাছ থেকে তোমায় ভিক্ষা মেগে চেয়ে নেবো। ভিক্ষা করে তোমায় খাওয়াবো, জ্যোতি—আমি পয়সা চাই না। আর কিছু চাই না আমি। এ জগতে, আমি শুধু তোমায় চাই।

জ্যোতি ভাবিল, এ কি, হিমুদা কি পাগল হইয়া গিয়াছে! সেই আর-এক দিনকার—বাগানের সেই কথা তাহার মনে পড়িল। তেমনি যদি আবার—আজ ? জ্যোতির সমস্ত শরীর কি-এক আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল।

তার পর হেমন্ত কহিল,—তুমি একটি কথাও কবে না, জ্যোতি ? হাঁ কি না, একটা কথা বলো। আমি শুধু ঐ একটি কথা শোনবার জন্যে যে এখানে এসেচি!

জ্যোতি হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—আমি বাড়ী যাই!

হেমন্ত বলিল,—কিছু বলবে না তুমি, জ্যোতি ? বলো। হেমন্তর স্বর অসহ্য কাতরতায় ভারী হইয়া উঠিল।

জ্যোতি বলিল—কি ?

হেমন্ত বলিল,—আমায় তুমি ভালবাসো কি না,—বলো, বল জ্যোতি।

জ্যোতি আজ বেশ বুঝিয়াছিল, হেমন্ত কি জবাব চায়। সে জবাবের অর্থ সেদিন সন্ধ্যায় অত সে খেয়াল করে নাই, আজ হেমন্তর এই ভাব-ভঙ্গী, এই কম্পিত স্খলিত কণ্ঠস্বর—জ্যোতির ভারী লজ্জা করিতেছিল। হেমন্তর এই অদর্শনে তাহার দুঃখ হইত খুবই! কিন্তু কেন—সে কেন ? এমন ব্যথার ব্যথী, সুখে সুখী যে, তাহাকে কাছে পাইতে কাহার না সাধ হয় ? সে দূরে চলিয়া গেলে কাহার বুক না ভাঙ্গিয়া পড়ে! ইহার বেশী আর কিছু সে ভাবে নাই কোনদিন। কিন্তু আজিকার এই কথাগুলা—! অসহ্য!

জ্যোতির সমস্ত মনটাকে ওলোট-পালোট করিয়া প্রবল ঝড় উঠিয়াছিল। হেমন্তর এ কি-সব কথা! সে দিন সন্ধ্যায় হেমন্তর সেই চলিয়া যাইবার পর হইতেই তাহার মন হেমন্তর জন্য যখনই হু-হু করিয়া উঠিত, কিছু ভালো লাগিত না, তখন নানাদিক দিয়া সব কথা ভাবিতে বসিত। সে তো মনটাকে ঠিক করিয়া লইয়াছিল—দু'দিনের অতিথি হেমন্ত তাহার জীবনের পথে আসিয়া পড়িয়াছিল,—এখন দূরে গিয়াছে! ছেলেবেলা হইতে আত্মীয়-স্বজন, সঙ্গিনী, সকলেই কেহ আসিতেছে, কেহ চলিয়া যাইতেছে—সেজন্য ঘরের কোণে বসিয়া কান্নাকাটি করিলে চলে না তো। এ কথাটা জ্যোতি বেশ বুঝিয়াছিল। যে দূরের, সে দু'দিনের জন্য কাছে আসিয়া আবার দূরে গিয়াছে, ইহার জন্য

ভাবিয়া মন খারাপ করায় কষ্টকে ডাকিয়া আনা বৈ আর কি! কিন্তু আজ হেমন্তর ঐ চিঠির ভাষা, এই সব কথায় সে ভড়কাইয়া গেল। বিবাহের কথা? এটুকু সে বেশ জানে, বাঙালীর মেয়ে সে—নিজের বিবাহের কথায় থাকা তাহার চলে না, থাকা সাজে না। তাই সে মনকে এ-সবের এতটুকু ছোঁয়াচ লাগাইতে দেয় নাই। হেমন্তর কথা শুনিয়া সে শুধু ভাবিল, এ-সব কথা আমায় বলা কেন? হেমন্তর কাতরতা দেখিয়া সে যে একটুও গলে নাই, এমন নয়—কিন্তু গলিলে কি হইবে? মনটাকে সে টলিতে দেয় নাই!

কোন কথা না বলিয়া সে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। হেমন্ত বাঘের মত দুই চোখের দৃষ্টিতে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিল। ছুটিয়া আসিয়া সে জ্যোতিকে ধরিল—ধরিয়া বুকের মধ্যে চাপিয়া চুম্বনে-চুম্বনে তাহার মুখখানিকে রক্ত-রাঙা করিয়া তুলিল।

জ্যোতি কাঁদিয়া ধূলায় একেবারে লুটাইয়া পড়িল।

হেমন্তর তখন চমক ভাঙ্গিল। তাই তো, এ সে কি করিতেছে! এতক্ষণ কিসের নেশায় যেন সে একেবারে বুঁদ হইয়া গিয়াছিল! সে বলিল,—আমায় ক্ষমা করো, জ্যোতি। আমি পাষণ্ড, আমায় ক্ষমা করো, কাকেও বলো না এ-সব—বলিয়া সে একেবারে জ্যোতির পা জড়াইয়া ধরিল।

জ্যোতি বলিল,—ছাড়ো হিমুদা।

হেমন্ত পা ছাড়িয়া হতভম্বের মত মেঝের উপর বসিয়া রহিল; তাহার চোখের সম্মুখে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটা সুদীর্ঘ ছায়ার আবরণে ঢাকিয়া গেল!

যখন সে ছায়া সরিল, জ্যোতি তখন চলিয়া গিয়াছে!

* * * *

হেমন্ত উঠিয়া দাঁড়াইল, চাহিয়া দেখিল, বিছানার উপর বইগুলা এলো-মেলো ছড়ানো রহিয়াছে। একখানা বইও জ্যোতি লইয়া যায় নাই। হেমন্ত বিছানায় বইগুলার উপর বুক দিয়া পড়িয়া শিশুর মত ফুপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

সেই দিনই সন্ধ্যার অন্ধকারে সমস্ত পল্লী যখন আপনাকে গোপন করিয়া ফেলিয়াছে, তখন সেই অন্ধকারে গা ঢাকিয়া হেমন্ত চোরের মত নিঃশব্দে গৃহ ত্যাগ করিয়া গেল। যাইবার সময় জ্যোতিদের বাড়ীর পানে চাহিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল—সকলের অলক্ষিতে সে নিশ্বাস বাতাসে মিশাইয়া গেল। কেহ বুঝিল না, সে নিশ্বাসের সঙ্গে হেমন্তর জীর্ণ প্রাণের কতখানি এখানকার বাতাসে সে রাখিয়া গেল।

## ১১

জ্যোতি কিন্তু তখনি বাড়ী ফিরিল না; সে একেবারে নারাণ ঘোষালের বাড়ীর তেতলার ছাদে গিয়া উঠিল। নারাণ ঘোষালের বাড়ীটা জীর্ণ হইলেও প্রকাণ্ড। সেখানে থাকিবার মধ্যে আছে শুধু ঘোষালের দুই বিধবা পত্নী—দুইজনেই বৃদ্ধা। সুতরাং কোন লোকের চোখের সম্মুখে সেখানে দাঁড়াইতে হইবে না, এইটুকু ছিল তাহার পক্ষে পরম আরাম!

জ্যোতির সমস্ত মনখানার মধ্যে তখন আগুন জ্বলিতেছে। মুখে, বিশেষ করিয়া ঠোঁট দুইটাতে—যেখানে হেমন্ত চুম্বনের পর চুম্বন ঢালিয়া দিয়াছে, সেখানটায় যেন জ্বলন্ত সীসা পড়িয়াছে! জ্যোতির মনে হইতেছিল, ঠোঁট দুইটা পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে!

তেতলার ছাদে চিল-কোঠার ধারে কয়টা পায়রা বসিয়াছিল—জ্যোতি আসিতেই ডানা ঝট্‌পট্‌ করিয়া সেগুলা উড়িয়া গেল। জ্যোতি নিরাপদে ছাদের কোণে আসিয়া আলিসায় গা ঠেশ দিয়া বসিয়া পড়িল। নীচে হইতে পল্লীর নানা কার্য্যের একটা মিশ্র কলরব-কোলাহল ভাসিয়া আসিতেছে। জ্যোতি তখন বসিয়া সমস্ত ব্যাপারটাকে একবার তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিল।

তাহার সরল বিশ্বাসে হেমন্ত আজ বড় প্রচণ্ড আঘাত দিয়াছে! জ্যোতির মনে হইল, সে আঘাতে তাহার আজন্মের অনেক ধারণার মূল অবধি নড়িয়া উঠিয়াছে। সেই বাগানে সন্ধ্যার ছায়ায় হেমন্তর প্রথম চুম্বনের কথাও মনে পড়িল। সেদিন সে-জিনিষটাকে সে আদরের একটা উগ্র উচ্ছ্বাস বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার মধ্যে যে কিছুমাত্র কদর্য্যতা আছে, এমন কথা ভুলিয়াও মনে হয় নাই। বড় ভাই ছোট বোন্‌কে আদর করিয়াছে,—সে আদরে কোনরূপ পঙ্কিলতা বা কালি আছে বলিয়া তাহার চোখে পড়ে নাই!

কিন্তু আজ?

ঐ-সব কথা, ঐ চিঠি, ঐ কম্পিত স্খলিত কণ্ঠস্বর—তাহার উপর অল্প ইঙ্গিতে সতর্ক হইয়া যখন সে সরিয়া আসিতেছিল, তখন তাহাকে নিঃসঙ্গ অসহায় পাইয়া হেমন্তর ঐ যে রূঢ় ব্যবহার—সেটা অত্যন্ত গর্হিত, অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার! ছি, ছি—এই জন্যই হেমন্ত তাহাকে লেখাপড়া শিখাইতে আসিয়াছিল, এই জন্যই বইয়ের উপর বই আনিয়া তাহার হাতে গুঁজিয়া দিতেছিল! সেটা ঘুষ? তাহাকে লুণ্ঠন করিয়া লইবে বলিয়াই হেমন্ত অমন অহরহ সচেষ্ট ছিল? আর সে?—জ্যোতি কাঁদিয়া ফেলিল। মার কাছে কোন্ মুখে গিয়া এখন দাঁড়াইবে সে! বাহির হইবার সময় মা বলিয়াছিল,

ওদের বাড়ীতে কে আছে না আছে, অত-বড় ডাগর ছেলের কাছে একলা যাবি তুই? ডাগর হয়েচিস্ এখন! লোকে দেখলে নিন্দে করবে যে। তখন মার সে অহেতুক আতঙ্ককে সে একটা কঠিন দৃষ্টির আঘাতেই খেদাইয়া দিয়াছিল। আর এখন? সেই মার মুখের পানে মুখ তুলিয়া সে দাঁড়াইবে কি বলিয়া? হেমন্তর অভদ্র ব্যবহারে আজ সে আপনাকে নিদারুণ অপমানিত বোধ করিল।

সে একখানা বইয়ে পড়িয়াছিল, নারীকে বিলাসের পুতুল-ভাবে পাইতে একজন পুরুষের কি প্রচণ্ড অভিলাষই না ছিল! এও কি তাই? জ্যোতির দুই চোখ দিয়া ঝরঝর ধারে জল ঝরিয়া পড়িল। সমস্ত মনটা গুমিয়া গুমিয়া পুড়িতে লাগিল। এ জ্বালার বিরাম হয় কিসে? কিসে গো, কিসে?

মাথার উপর রৌদ্র-তপ্ত শুভ্র আকাশ ধূ-ধূ করিতেছে —কচিৎ একটা উড্ডীন পক্ষীর কর্কশ চীৎকার ভাসিয়া ওঠে—মন হইতে একটু আগেকার ঐ বিশ্রী ব্যাপারটা দুঃস্বপ্নের ন্যায় ভুলিয়া যাইবার জন্য যতই সে প্রয়াস পায়, ততই সেটা মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কাটিয়া কাটিয়া চাপিয়া চাপিয়া বসে!

যখন তাহার জ্ঞান হইল, রৌদ্র তখন পড়িয়া গিয়াছে। সন্ধ্যা নামিতেছে। সন্ধ্যার আঁধার তাহার সমস্ত যন্ত্রণার উপর প্রলেপের মত যেন একটা স্নিগ্ধ আবরণ বিছাইয়া দিল। সেই আঁধারকে আশ্রয় করিয়া জ্যোতি, ছাদ হইতে নীচে নামিল।

নারাণ ঘোষালের কনিষ্ঠা পত্নী বলিলেন,—কি লা জ্যোতি ছাদে একা-একা কি করছিলি?

—কিছু না। জ্যোতি থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহার মনে হইল, হেমন্তর সেই চুম্বনটা তাহার সমস্ত মুখে যেন দপ্ করিয়া আগুনের মতই জ্বলিয়া উঠিল, আর সে আগুন ইহাদের চোখে সুস্পষ্ট ধরা পড়িয়া গিয়াছে! সন্তর্পণে একটু পাশ কাটাইয়া যাইবার জন্য সে দুই-পা অগ্রসর হইল। ঘোষালের জ্যেষ্ঠা পত্নী কহিলেন,—বিয়ে হচ্ছে না, তাই মনের দুঃখে ছাদে গিয়ে বরের ভাবনা ভাবছিলি বুঝি লা?

জ্যোতির মনটা দুমড়াইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছিল যে, সে এই অতি-তুচ্ছ তামাসার ভরও সহিল না। জ্যোতি কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিয়া বিনা-বাক্য-ব্যয়ে দুড় দুড় করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া একেবারে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

মা বলিলেন,—কোথায় ছিলি রে তুই? হিমুদের বাড়ী আমি খুঁজতে গেছলুম, তা দেখতে পেলুম না তো!

মার কথায় জ্যোতির গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল।

মা বলিলেন,—গিয়ে দেখি, হিমু ঘুমুচ্ছে, তুই নেই। ও বাড়ীতে যাস্‌নে তুই?

জ্যোতি কহিল,—না।

—তবে কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

—ঘোষালদের বাড়ী।

মা আশ্বস্ত হইলেন, বলিলেন,—তা না গিয়েচো বেশ করেচো। এখন বড় হয়েচো, যেখানে-সেখানে ঢং ঢং করে যাওয়া আর ভালো দেখায় না মা—পাঁচজনে নিন্দে করবে। তা হিমু যে তোকে বই দেবে বলেছিল, আনতে গেলিনে কেন? আহা, বেচারী দুঃখ করবে।

জ্যোতি সে কথার কোন জবাব দিল না।

তখন মা বলিলেন—বইগুলো আন্‌লি না কেন একবার গিয়ে? যত্ন করে দিচ্ছে...

জ্যোতি বলিল,—না মা, পরের কাছ থেকে আর বই নেয় না।

মা বলিলেন,—তা ঠিক কথা। তার পর নিজের মনেই তিনি বলিতে লাগিলেন,—হবার নয় যে! ওর বাপের একেবারে এক পয়সা মা, এক পয়সা বাপ! বিনি-পয়সায় ঐ এক-ছেলের সঙ্গে কি সে বিয়ে দেবে? না হলে হেমন্ত ছেলেটি বেশ ছিল! যেমন গায়ে-পড়া, তেমনি যত্ন-আত্তি! জ্যাঠাইমা বল্‌তে অমনি অজ্ঞান!

জ্যোতির সমস্ত মন ভিতরে ভিতরে সাপের মত ফুঁশিয়া উঠিল। অজ্ঞানই বটে! মা তো জানে না, কত বড় দাম ঐ আত্তির জন্য তাহাকে দিতে হইয়াছে! কিন্তু উপায় নাই—এ কথা, এই এত বড় বেদনার কথা মুখ ফুটিয়া মাকে বলিবার উপায় নাই!

—আজ আর কিছু খাবো না, মা। শরীরটা ভালো নয়...বলিয়া জ্যোতি আপনার ঘরে গিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া হঠাৎ রামায়ণ খুলিয়া বসিল। মা আসিয়া বলিলেন—রামায়ণ পড়চিস্? তা পড়্,—আমিও একটু শুনি। উনি বাইরে গেছেন,—আজ রাত্রে ফিরবেন না।

## ১১

পরদিন সকালে সূর্য্যের ঝিল্‌মিলে আলোয় আসিয়া দাঁড়াইতে জ্যোতির মনে হইল, তাহার যেন পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে। মনের ভিতরকার সমস্ত কালি সূর্য্যের ঐ অমল স্নিগ্ধ কিরণে যেন ধুইয়া মুছিয়া গেল! সে একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া নদীতে স্নান করিতে গেল। হেমন্তর স্পর্শের জ্বালা সর্ব্বাঙ্গে ছুঁচ ফুটাইতেছিল; স্নান করিতে সে জ্বালা যেন নিভিল।

বাড়ী আসিয়া কাপড় ছাড়িয়া সে মাকে বলিয়া ননী-দের বাড়ী চলিয়া গেল।

ননী বলিল,—ওদের হেমন্ত কি বল্‌লে রে কাল?

জ্যোতির সর্ব্বাঙ্গ ছম্‌ছম্‌ করিয়া উঠিল। আবার সে নাম!

ননী বলিল,—হেমন্ত নাকি তোর জন্য বই আনে? তোকে পড়ায়?

জ্যোতি কোন কথা বলিল না। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘিরিয়া আবার একটা কালির ঘূর্ণি তালে তালে নাচিয়া উঠিতে লাগিল।

ননী বলিল,—তা হেমন্তর সঙ্গে তোর বিয়ে হলে বেশ হয়!

জ্যোতি এ আঘাত আর সহিতে পারিল না—তাহার মনের যে জায়গাটা বেদনায় টন্‌টন্‌ করিতেছিল, সেই জায়গায় এই কথা সজোরে নিক্ষিপ্ত পাথর-কুচির মতই প্রচণ্ড আঘাত করিল। তাহার দুই চোখ বহিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

সস্নেহে তাহার মুখখানিকে আপনার বুকে চাপিয়া ধরিয়া ননী বলিল,—কেন ভাই কাঁদ্‌চিস? এই সামান্য একটু ঠাট্টা সইতে পারলি না? এখানে এসে শুনছিলুম কি না, হেমন্ত প্রায় এখন দেশে আসে, তোর জন্যে অনেক বই-টই আনে, তোকে পড়ায়! তাই আমি ভাবছিলুম আর কি…

জ্যোতির শরীরের সমস্ত রক্ত মুহূর্ত্তে হিম হইয়া গেল। এ ব্যাপারে কোনদিন সে এতটুকু বিচলিত হয় নাই—অত্যন্ত সহজভাবেই হেমন্তর সঙ্গে এতদিন সে মেলা-মেশা করিয়াছে। এ ব্যাপারে রাখিবার ঢাকিবার বা লজ্জা কবিবার মত যে কিছু আছে, তাহা তাহার কোনদিনই মনে হয় নাই! কিন্তু কালিকার সেই ঘটনার পর এবং এই ব্যাপারটাই পাড়ায় সকলের কাছে এতখানি আন্দোলনের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে শুনিয়া দারুণ লজ্জায় তাহার সমস্ত মন ভরিয়া গেল। মনে হইল, কি করিয়া এই এক-গাঁ লোকের কাছে এখন মুখ দেখাইবে সে!

ননী বলিল,—বল্‌ না ভাই, তোকে সে বিয়ের কথা নিজে কি কিছু বলেছে?

জ্যোতি কি বলিবে! কালিকার ঘটনাটা আগুনের মত তাহার বুকের মধ্যে আবার তীব্র তেজে জ্বলিয়া উঠিল।

ননী বলিল,—তুই তাকে বিয়ে করতে চাস্‌ কি বল্‌ না আমায়। তাকে ভালোবেসেচিস্‌?

জ্যোতি ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—না, না, কখ্‌খনো না। কেন ভালোবাসবো!

হঠাৎ স্বরে এই তীব্রতা দেখিয়া ননী চুপ করিল। জ্যোতির আর এতটুকু এখানে থাকিতে ইচ্ছা হইল না। কোন মতে এখান হইতে ছুটিয়া পলাইতে পারিলে সে যেন বাঁচিয়া যায়! লুকাইয়া কোথাও পড়িয়া তাহার কাঁদিবার ইচ্ছা হইতেছিল। কিন্তু কি করিয়া হঠাৎ এখন পলায়?

জ্যোতি ঘরের এক কোণে গিয়া বসিল। ননী বলিল,—আমি আসচি, পালাস্‌নে। অনেক কথা আছে তোর সঙ্গে।

ননী ঘর হইতে সরিয়া গেলে জ্যোতি একবার আকাশের পানে চাহিল। আকাশ যেন গুম্‌ হইয়া আছে! কি এক মস্ত অভিসন্ধি যেন আকাশের বুকের মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া তাল পাকাইয়া উঠিতেছে।

জ্যোতির নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। জ্যোতি উঠিয়া সন্তর্পণে ঘরের বাহিরে চকিতে একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইল। কেহ নাই! তখন এক পা এক পা করিয়া বাহিরে আসিয়া চোরের মত নিঃশব্দে সে ননীদের গৃহ ত্যাগ করিল। পথ দিয়া দুইজন লোক স্নান করিতে চলিয়াছে, তাহাদের কাহারো পানে না তাকাইয়া ঝড়ের বেগে একেবারে সে নিজেদের বাড়ীতে আসিল। মা ওধারে রন্ধনের তদ্বির করিতেছিলেন। জ্যোতি আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া একেবারে বিছানার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। তার পর দুই চোখে সে বান ডাকাইয়া দিল।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া যখন সে একান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তখন বেলা অনেকখানি বাড়িয়া উঠিয়াছে। মনের প্রথম বেগ কান্নার স্রোতে ভাসিয়া গেলে মন অনেকখানি হালকা হইল। তখন সে ভাবিল,সে কি সত্যই হেমন্তকে ভালোবাসিয়াছে? সেই কেতাবের নায়ক-নায়িকারা যেমন করিয়া একজন আর-একজনকে ভালোবাসে—তেমনি ভালোবাসা! একের অদর্শনে অপরের বুক যেমন দুঃখে ভরিয়া যায়, আবার দুইজনে এক জায়গায় মিলিতে পাইলে অপূর্ব্ব আনন্দে প্রাণ ভরিয়া ওঠে,—তাহারও কি তেমনি হয়, না কখনো হইয়াছে? অতীতের ধুলি-জঞ্জাল ঘাঁটিয়া সে তখন খুঁজিতে বসিল। সেই সে-বার হেমন্ত যখন কলিকাতায় চলিয়া যায়—সেই সন্ধ্যার অল্প অন্ধকারে, যাইবার সময় হেমন্তর ব্যাকুল-দৃষ্টি যখন জ্যোতিদের গৃহের দিকে ছুটিয়া ছুটিয়া ফিরিতেছিল, জ্যোতি তখন অদূরে সেই ঝোপের আড়ালে লুকাইয়া থাকিয়া তাহা দেখিয়াছিল! দেখিয়া আনন্দ, না কৌতুক—কিসে তাহার ছোট বুকখানা ভরিয়া গিয়াছিল? পরদিন সকালে তাহার আর বিছানা ছাড়িয়া উঠিবার ইচ্ছা হইতেছিল না; সঙ্গিনীদের আলাপ, তাহাদের কলরব—কিছু ভালো লাগিতেছিল না। তাহার মনে হইতেছিল, জীবনের সমস্ত আলো যেন নিবিয়া গিয়াছে—সব আনন্দ যেন হেমন্ত সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছে!

তাই তো! জ্যোতি শিহরিয়া উঠিল। ইহাকেই না নানা ভাষার ছটায় নানা বইয়ে সকলে বলিয়াছে, ভালোবাসা!

ছি ছি! জ্যোতি একেবারে এতটুকু-হইয়া গেল। সে ভাবিল, না, আর সে এমন একান্তে বসিয়া অতীতের কথা ভাবিবে না—হেমন্তর কথা ভুলিয়াও মনে আনিবে না! হেমন্তকে বাহির করিয়া দিয়া বুকের কপাট এমন ভাবে বন্ধ করিয়া দিবে,—কোথাও এমন একটু ফাঁক নয়! না! যে সে ফাঁক পাইয়া হেমন্ত তাহার চিত্তে এতটুকু প্রবেশ করিতে পারে! কে সে? কেহ নয়! পর, সে পর! তাহার কেহ নয়! তাহার কথা মনে হইলে রাগে সে মনকে আঁচড়াইয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিবে। মার কাছে-কাছে থাকিয়া সংসারের ছোট-বড় সকল কাজে মনটাকে ঢালিয়া দিয়া, তাচ্ছিল্য করিয়া হেমন্তকে সে প্রাণ হইতে মুছিয়া ফেলিবেই ফেলিবে।

ধড়মড়িয়া উঠিয়া সে হেমন্তর-দেওয়া বই-গুলা জড়ো করিল। বইয়ের পাতা-গুলা কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ধীরে-ধীরে একটা ঝোপের কাছে গেল। তারপর তাহাতে দিয়াশলাই জ্বালিয়া সেই কাগজের রাশিতে সে আগুন ধরাইল। যতক্ষণ কাগজ ধূ-ধূ করিয়া জ্বলিতেছিল, ততক্ষণ সে একদৃষ্টিতে আগুনের খেলা দেখিল। তারপর কাগজের টুকরাগুলা যখন পুড়িয়া কালো ছাইয়ের স্তূপে পরিণত হইল, তখন সেই পোড়া কাগজের এক টুকরা তাহার চোখে পড়িল। কালো ছাইয়ের উপর কালো অক্ষরে হেমন্তর হাতে লেখা তাহারি নাম—এখনো নিবিড় আঁধারে দৈত্যের মুখের কালো হাসির মতই জ্বলজ্বল্ করে যে! পা দিয়া সেই ছাইয়ের স্তূপটাকে সে পিষিয়া গুঁড়াইয়া দিল—তারপর আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া গৃহে ফিরিল। গৃহে আসিয়া ডাকিল,—মা—

রান্নাঘর হইতে মা সাড়া দিলেন,—কেন রে?

—বড্ড ক্ষিদে পেয়েচে মা। আমায় ভাত দাও।

## ১২

তারপর হেমন্তর সঙ্গে জ্যোতির আর কখনো দেখা নাই। যখনই মনের দ্বারে হেমন্ত আসিয়া উদয় হইত, তখনই সে ঘরের কাজ, সঙ্গিনীদের সাহচর্য্য, এমনি নানা রকমের ভিড় তুলিয়া সেই ভিড়ের হট্টগোলে অবহেলায় তাচ্ছিল্যে হেমন্তকে সজোরে মনের দ্বার হইতে হঠাইয়া দিত। আবার এমনো ঘটিত, কাজ-কর্ম্ম ও সঙ্গিনীদের বাজে গল্প-কৌতুকের ভারে মন যখন তাহার ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তখন সে সেই ক্লান্তি দূর করিবার আশায় নিভৃতে বসিয়া অতীতের স্মৃতি ঝাড়িতে থাকিত। হেমন্ত সে অতীতের এতখানি জায়গা জুড়িয়া বসিয়া আছে যে, সে দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইত। আবার সে এমনও ভাবিত, হেমন্তকে এভাবে দূরে তাড়ানোই বা কেন? তুচ্ছ একটা ব্যাপার লইয়া এত বাড়াবাড়ি করিতেছে সে কিসের জন্ত! তাহার কি হইয়াছে? কিছু না, কিছু না।

এমনিভাবে তাহার জীবন নদী-বক্ষে নৌকার মত দোল খাইতে খাইতেই ভাসিয়া চলিয়াছিল। দুই-চারি জায়গা হইতে বিবাহের সম্বন্ধ আসিতেছিল। কোনটাই কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মনঃপূত হইতেছিল না। পাত্র-গুলি পাড়াগাঁয়ের জীব,—কেহ কোনো কলে চাকরির চেষ্টা দেখিতেছে, কেহ পুরোহিতের পুত্র, কেহ বা এবার পণ্ডিতী পরীক্ষা দিবে। ভট্টাচার্য্য বলিলেন,—না। মেয়ে আমার অমন লেখা-পড়া জানে, দেখতে অপ্সরীর মত, ডাগর হয়েচে, অমন বিদ্যা-বুদ্ধি—সেই মেয়েকে পাশ-করা জামাইয়ের হাতে আমি দিতে চাই।

দিবার কারণও ছিল,—মানুষের মত জামাই সহায় হইলে একমাত্র ছেলে সাধুচরণেরও একটা হিল্লা লাগিয়া যাইবে! সে কি আর এই পাড়াগাঁয়ে পড়িয়া ঘণ্টা নাড়িয়া তাঁহারই মত গামছায় চাল-কলা বাঁধিয়া মরিবে? না। ভট্টাচার্য্যের ইচ্ছা, তাঁহার পুত্র লেখা-পড়া শিখিয়া সমাজের উঁচু ক্লাশে প্রোমোশন লউক!

ভট্টাচার্যের এই গোঁয়ের দরুণ গ্রামের দুই-চারিজন ব্যক্তি বেশ বিরক্ত হইয়াছিল। তরুণ পুত্রেরা প্রাণের গোপন আবেদন মাতাদের কাছে জানাইত এবং মাতারা অনুরোধ-উপরোধ, অশ্রুর বন্যা ও অভিমানের ঝড় তুলিয়া গ্রামের অনেকগুলি পিতাকে ভট্টাচার্য্যের গৃহে উমেদার-স্বরূপ যে না পাঠাইয়াছিল, এমন নয়। চক্ষুলজ্জার খাতিরে ভট্টাচার্য্য তাঁহাদের স্পষ্ট জবাব না দিয়া শামুকের খোলা হইতে নস্য লইয়া নাকে পূরিয়া শুধু বলিয়াছিলেন —আরো কিছুকাল যাক্ ভায়া। এখন তো ওর বিয়ে দেবো না আমি,—ফাঁড়া আছে কি না!

ভট্টাচার্য্যের গৃহিণী বলিতেন,—ওগো, আমাদের সুশীল-ঠাকুরপোর ছেলে ঐ হিমুর সঙ্গে বিয়ে দিলে কেমন হয়?

ভট্টাচার্য্যও সে কথাটা ভাবিতেছিলেন। কিন্তু সুশীলকুমারের পয়সার মায়া দিন-দিন কিরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে, সে কথা পাঁচজনের মুখে মুখে ঘুরিয়া কাণে আসিয়া পৌঁছিত কি না, কাজেই তিনি ওদিকে আশা বড় রাখিতে পারেন নাই। গৃহিণীর কথায় তিনি ভাবিলেন, একবার কালী-গঙ্গা দর্শনের ছলে কলিকাতায় গিয়া সুশীলকুমারের অভিপ্রায়টা জানিয়া আসিলে মন্দ হয় না।

গৃহিণী একদিন সকালে বলয় বাজাইয়া পুঁটলি সাজা-ইয়া দিলেন। জ্যোতি আসিয়া বলিল,—কোথায় যাচ্ছ বাবা?

—একবার কালী-দর্শন করে আস্‌বো মা। দেখি, যদি তিনি মুখ তুলে চান।

ভিতরের কথাটা জ্যোতি মার মুখে শুনিল। অমনি হেমন্তর চিন্তা আর-এক মূর্ত্তিতে আসিয়া প্রাণের দ্বারে

ষা দিল। জ্যোতি ভাবিল, হেমন্ত! আঃ, তাহা হইলে পাড়ার লোকের মুখ বন্ধ করিবার চমৎকার সুযোগ হয় বটে! তার উপর, ঐ-সব বইয়ের গল্পের মত—বেশ হয়।

ভট্টাচার্য্য পরদিন রাত্রে বাড়ী ফিরিলেন। জ্যোতি তাড়াতাড়ি নিদ্রার ভাণ করিয়া বিছানায় গিয়া পড়িল,—কাণ দুইটাকে খাড়া রাখিল, পিতার এ-যাত্রা কতখানি সার্থক হইল, তাহা জানিবার জন্য।

ভট্টাচার্য্য স্থির হইয়া বসিলে গৃহিণী বলিলেন—আসল কাজের কি হলো?

ভট্টাচার্য্য কহিলেন,—রাম বলো! মুখের কথা মুখ থেকেও বার করতে হয়নি! গিয়ে দেখি, সুশীল মহা-ব্যস্ত—ছেলের বিয়ের দুটি সম্বন্ধ এসেচে। কল্‌কাতার বেশ বড় বড় ঘর থেকে। দশ হাজার বারো হাজার টাকা নিয়ে তারা সাধ্‌চে। আমার সামনেই সুশীল তাদের বল্লে, আর ক'মাস বাদে ছেলে পাশ হলে পনেরো হাজারের একটি-পয়সা-কম যখন ঘরে আসবে না, তখন এ ক'মাস বিয়ের কথা তোলা নির্ব্বোধের কাজ! ঐ সব কথা শুনে আমি আসল কথা ভাঙ্‌লুম, কালী-দর্শনে এসেছিলুম, কেমন আছো ভায়া ছেলেপিলে নিয়ে, তাই দেখতে এলুম।

—আদর-যত্ন কর্‌লে কেমন?

—তা একরাত্রের জন্য কি আর দোকানে খেতে পাঠাবে?

—হিমুর সঙ্গে দেখা হলো?

—না। সকালে খোঁজ করেছিলুম। শুনলুম, কোন্‌ বন্ধুর বাড়ী নাকি পড়তে গেছে।

—ছেলেটার সঙ্গে দেখা কর্‌লে না কেন! ছেলের বোধ হয় মন আছে।

—কি করে বুঝলে?

—যখন-তখন জ্যোতির জন্যে বই আনে, ওকে পড়া শেখাবার জন্য অত জেদ! আমিও তাই কিছু বল্‌তুম না! না হলে অত বুড় সোমত্ত ছেলের সঙ্গে কি আমি জ্যোতিকে মিশতে দি! পাড়ার অনেকে অনেক কথা বল্‌তো—তা আমি গ্রাহ্যও করিনি। বলি, দূর হোক্‌ গে মেয়েটার যদি একটা হিল্লে হয়।

জ্যোতির মনে এক প্রচণ্ড ধিক্কার মাথা ঠেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এমন কথা! মা, তাহার মা তাহাকে হেমন্তর সম্মুখে ধরিয়া দিত, বাজারের পণ্য করিয়া? যদি মেয়েটা কোনো গতিকে তাহার গলায় ফাঁশ্‌ পরাইতে পারে! লজ্জায় তাহার মাথা যেন কাটিয়া গেল। ইহার নাম বিবাহ? ছি!

মার উপর তাহার রাগ হইল। মনে হইল, এই যে বিবাহের বাজারে বাহির হইতে পাত্র আনিয়া তাহাদের হাতে মেয়েগুলাকে ধরিয়া সঁপিয়া দেওয়া হয়, ইহাতে লাভ-লোকসান যা-কিছু, সব ঐ পয়সার দিক দিয়াই দেখিতে হইবে…? হৃদয়ের দিক দিয়া কোনো হিসাবই নাই? টাকার হিসাব খতাইয়া মা-বাপ যেটিকে বুঝিবে লাভের, তাহারই হাতে মেয়েকে সমর্পণ করিবে? চমৎকার ব্যবস্থা!

তাহার নিজের কথাই সে ভাবিতে লাগিল। এই যে হেমন্ত—সে জানে, জ্যোতির সহিত তাহার বিবাহ অসম্ভব! বাপের কাছে হাঁকিয়া বলিবে, টাকা আমি চাই না, এ সামর্থ্য হেমন্তর যখন নাই, তখন কেন সে ঐ সব অসংযত ব্যবহারে নির্লজ্জ প্রলাপে তাহাকে উত্যক্ত, অপমানিত, ব্যতিব্যস্ত করিতে আসিয়াছিল? সোনা-রূপার তাল মাথায় লইয়া যে বৌটি ঘরে আসিবে, তাহাকে বুকে ধরিয়া ঐ হেমন্তই একদিন, না জানি, তাকে কত প্রণয়ের কথা বলিবে! হয় তো এ কথাও সোহাগ করিয়া পাড়িয়া বসিবে,—একদিন প্রেমের ইন্দ্রজালে পাড়াগাঁয়ে এক গরীবের ঘরের মেয়ের কতখানি সে তাক্‌ লাগাইয়া দিয়াছিল এবং তাহা বলিয়া হাস্য-কৌতুকে পাকা ফুটির মতই ফাটিয়া পড়িবে। কাপুরুষ!

মনের মধ্যে হেমন্তর যে-মূর্ত্তিখানা মাঝে মাঝে আসিয়া উদয় হইত, জ্যোতির মনে হইল, সেই মূর্ত্তিটাকে টানিয়া বাহিরে আনিয়া দস্তুরমত সে তাহার লাঞ্ছনা করে!

## ১৩

মনের অবস্থা যখন এমন, তখন হঠাৎ একদিন ক্ষীরগাঁয়ের জমিদার-বাটী হইতে সম্বন্ধ আসিল এবং বিবাহের কথা যখন পাকা হইয়া গেল, তখন পাড়ার পাঁচজনের ঈর্ষাকুল দৃষ্টির সম্মুখে আপনাকে সে এক প্রদীপ্ত মহিমায় জ্বালাইয়া তুলিল। তাহার মুখে-চোখে সে এমন ভাব ফুটাইয়া ধরিল, যে সকলে তোমরা দেখ গো—আমি তোমাদের সকলের উপরে।

তারপর একদিন সে শ্বশুর-ঘর করিতে চলিয়া গেল।

বিবাহের প্রথম কয়মাস কাটিয়া গেলে শ্বশুর-গৃহে তাহার বাস যখন বেশ কায়েমী হইয়া দাঁড়াইল, তখন সে দেখিল, যে-রূপের জোরে এই রাজ্যে সে রাজত্ব করিতে আসিয়াছে, সে-রূপের কেহ তোয়াক্কাও রাখে না। পরে সেই রূপই তাহার বিস্তর অশান্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইল।

জমিদার চন্দ্রকান্ত চৌধুরী মহাপ্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। সকল বিষয়ে তিনি একচ্ছত্ররূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে ভালোবাসেন। তাঁহার পুত্রবধূ—দেখিয়া-শুনিয়া এমন আনিতে হইবে, যাহার রূপের তুলনা কাছাকাছি বিশখানা গ্রাম খুঁজিলে মিলিবে না! টাকা না লইয়া বৌ আনা—এ মহত্ব দেখাইবারও প্রয়োজন এই ছিল যে,

তাঁহার মত ব্যক্তির কাছে বৈবাহিকের টাকা-কড়ির মূল্য মোটে নাই।

পুত্রের বিবাহে এই মস্ত চাল্ চালিয়া তিনি গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিলেন, হাঁ, একটা অনন্যসাধারণ কীর্ত্তি করা হইয়াছে বটে! তারপর সে-বধূ তাঁহার গৃহে আসিয়া কি-ভাবে রহিল, সে খোঁজ রাখা তাঁহার মত জমিদারের পক্ষে শক্ত—এবং সে খোঁজ রাখা ভালো দেখায় না। বিবাহ দিয়া বধূ ঘরে আনিয়াই তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হইল।

জ্যোতি আসিয়া দেখিল, এ এক মজার রাজ্য। শাশুড়ী নাই। গৃহের কর্ত্রী শ্বশুরের দূর-সম্পর্কীয়া এক বিধবা রমণী। তিনি কত দিক দেখিবেন? কাজেই বধূকে কেহ ডাকিয়া খাওয়াইতে বসে না। হাতে খাবার তুলিয়া দিতে কেহ নাই। কেহ আদর করিয়া চুল বাঁধিয়া দিতে আসে না! রাত্রে ভালো কাপড়খানি পরাইয়া সাজাইয়া গুছাইয়া স্বামীর ঘরে হাত ধরিয়া তাহাকে পৌঁছাইয়া দিবে, এমন কোনো প্রাণীও নাই! নিজে জোগাড় করিয়া আহার সারিয়া লও; নিজের কাপড়-চোপড় যা-কিছু প্রয়োজন হয়, ঐ বাঁধা-মাহিনার ঝীয়ের সাহায্যে বাহিরে সরকারের কাছে এত্তেলা পাঠাইয়া তাহা সংগ্রহ করিয়া লও; স্বামী ঘরে আসিবার পূর্ব্বেই হোক আর পরে হোক ঘরে ঢুকিয়া শুইয়া পড়ো—ব্যস্! নহিলে অপরে তোমার জন্য কিছু করিতে আসিবে না।

বিবাহের পর প্রথম কয়মাস দুই-চারিজন দাসী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এ কাজটায় সাহায্য করিত। তারপর আর কি গরজ! তাহারা যে-যাহার নিজের কাজে সরিয়া পড়িল। জ্যোতিকে রান্নাঘরে ও দালানে অমন দুই চারি রাত্রি কাটাইয়া দিতে হইয়াছে—কেহ খোঁজও লয় নাই। সকালে এইখানে তাহাকে ঘুমাইতে দেখিয়া দাসীর দল হাসিয়া টিপ্পনী কাটিয়াছে—গরিবের ঘরের মেয়ে, এ-বাড়ীর বনেদি চাল কোথা হইতে জানিবে?

জ্যোতি তখন বুঝিল, এখানে সব ব্যবস্থাই বনিয়াদী বটে! ডাকিয়া দুইদণ্ড কাছে বসাইয়া কথা কহিবে, এমন লোক নাই। সকলেই কলের পুতুলের মত চলা-ফেরা করিতেছে। রুখিয়া ফরমাশ করিতে পারো, কাজ পাইবে; না হইলে কেহ আসিয়া গায়ে পড়িয়া তোমার কাজ করিয়া দিবে না! বাঁধা টাইমে থালা পাতিয়া বসিয়া ঠাকুরকে ফরমাশ করো তো আহার মিলিবে, নয় তো ঠাকুর কখনো ডাকিয়া বলিবে না,—ওগো খাবে এসো!

কিন্তু এগুলা তুচ্ছ ব্যাপার। বিবাহ কিছু বসন-ভূষণের সঙ্গে নয়! আসল বিবাহ যাহার সহিত, সেই স্বামী দেবতাটিও এক নির্ব্বিকার পুরুষ। বয়সে তরুণ হইলে কি হয়, জমিদার-বাড়ীর সাবেকী প্রথা-মত স্ত্রী তাহার কাছে একটা আসবাব-বিশেষ! প্রথম দুই-চারি মাস নূতন আসবাব পাইলে মালিক যেমন নাড়িয়া-চাড়িয়া ঝাড়িয়া-মুছিয়া তাহার তারিফ করে, জ্যোতির স্বামী লক্ষ্মীকান্তও দুই-তিন মাস তাহাকে নাড়িয়া চাড়িয়া তারিফ করিয়াছিল। তারপর জ্যোতি একবার বাপের বাড়ী গেল; এবং যখন ফিরিয়া আসিল, তখন জমিদার-বাড়ী আবার আপনার শিথিল আদব-কায়দাকে আঁট-সাঁট করিয়া বাঁধিয়া গম্ভীর মূর্ত্তি ধরিয়াছে।

জ্যোতি প্রথমটা অবাক্ হইয়া গেল, কিন্তু ইহাতে অভিযোগ করিবার কিছু নাই! কাহার কাছে কি লইয়াই বা সে অভিযোগ করিবে?

স্বামী লক্ষ্মীকান্তর ব্যবহারে প্রাণে আঘাত লাগিল। বাপের বাড়ীতে গিয়া বিরহী তরুণ স্বামীর দুই এক-খানা চিঠি সে প্রত্যাশা করিয়াছিল। পাড়ার মেয়েরা প্রত্যহ আসিয়া খোঁজ লইত, চিঠি এলো? কিন্তু সে চিঠি আসিল না দেখিয়া আড়ালে তাহারা মুখ-টেপাটিপি করিল।

সারদার মনে এই বিবাহে একটা জ্বালা ধরিয়া-ছিল—গরিব ভট্টাচার্য্য-কন্যার একখানি ঐশ্বর্য্য, এ কি মানায়! জ্যোতিকে শুনাইয়া সে এক সঙ্গিনীকে বলিল, —আমার বোনের সঙ্গেই না ওখান থেকে প্রথমে সম্বন্ধ এসেছিল। তা মা বল্লে, বড় ঘরে গয়না-গাঁটিই মেলে, স্বামীর আদর মেলে না,—তাই বরদার ওখানে বিয়ে দিলে না!

সে-কথার হুল্ এখন জ্যোতির মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধিল। ঠিক, এখানে খাও-দাও, বেড়াইয়া বেড়াও, ব্যস্! ইহার বেশী কিছু চাহিলে মেলা দুষ্কর।

তাই বলিয়া লক্ষ্মীকান্তর কোনরকম বদ্‌খেয়ালি সে চোখে দেখে নাই! তবে বাড়ীর যা দস্তুর, পয়সা-কড়ির হিসাব লওয়া আর বন্ধু-পরিজনের সংসর্গে নিজের মহত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখাই হইল এ বংশের প্রধান কাজ। লক্ষ্মীকান্ত সে পথ হইতে এতটুকু টলে নাই।

কথায় কথায় বাড়ীর এক মেয়ে এই বিষয়টা তাহাকে বুঝাইয়া দিল। মেয়েটির নাম রাখালী। রাখালী দূর-সম্পর্কে জ্যোতির ননদ। শ্বশুরবাড়ী হইতে আসিয়া সে বলিল,—এ বাড়ীতে কখনো দেখলুম না, বৌয়ের সঙ্গে সোয়ামী এসে দিনের বেলায় দু'দণ্ড গল্প করলে। আমার শ্বশুর-বাড়ীতে কিন্তু এটি নেই।

জ্যোতি বলিল,—এ বাড়ীর বৌয়েরা বোধ হয় সোয়ামীদের কামড়ায়—তাই! না ভাই?

রাখালী বলিল,—তোমার মত এমন সুন্দরী বৌ—জানি না ভাই, বড় বাবু বাইরে কি নিয়ে মেতে থাকেন! একদিন দেখবে বৌদি, ওরা বাইরে কি করে?

জ্যোতি বলিল,—কি করে দেখ্‌বো লো? ও-মহলের দিকে পা বাড়ালে বনবাসে যেতে হবে যে! বাবা,

সেদিন বাইরের উঠোনে গান হচ্ছিল, তা ওদিক্‌কার জানলাটা একটু ফাঁক করে গান শুনছিলুম—তোর বড় বাবু অমনি তাই না দেখে কোত্থেকে এসে কত কথাই না শুনিয়ে দিয়ে গেল! রোদ্দুর গায়ে লাগলে আঁৎকে উঠি ভাই, ভাবি, এখনি বুঝি আবার বকুনি খেয়ে মরুতে হবে!

রাখালী অত কথা কানে না তুলিয়া বলিল,—ঐ যে নীচে একটা ভাঁড়ার ঘর আছে, অন্ধকার ঘুরঘুট্টি! সেইটের ঠিক গায়েই বড় বাবুর বসবার ঘর। মাঝে একটা দরজা আছে। সে দরজা ভাই বৌদি, এ বাড়ীতে ঢুকে ইস্তক দেখছি, শেকল-আঁটা। সেই দরজায় কাণ রাখলে ওদের সব কথাবার্ত্তা শোনা যায়! চলো না বৌদি।

## ১৪

অনুরোধে পড়িয়া জ্যোতি একদিন ও-ঘরের কথা-বার্ত্তা সব শুনিল। কথা আর কি—জগতে কেহ কিছু নয়! রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বদান্যতায় বড় বাবুর মত অর্থাৎ কি না,—ইত্যাদি ইত্যাদি।

জ্যোতির বিরক্তি ধরিল। সে উঠিয়া গেল, কহিল, —তোর ভালো লাগে, তুই শুন্ গে যা! আমি ও শুনতে চাই না।

জ্যোতির বিপদও হইল, এখন এ দীর্ঘ সময় সে কাটায় কি করিয়া? দুপুরে আহার শেষ হইলে বাড়ীর মেয়েরা সব সনাতন নিয়ম-মাফিক ঘুমাইয়া পড়ে। কাহারো কাছে বসিয়া দুই দণ্ড গল্প করিবে, এমন লোক একটিও নাই। রাখালী কোথায় যে ফাঁকে-ফাঁকে ঘুরিয়া বেড়ায়—চকিতে কখনো আসিয়া দেখা দিয়া যায়। তাহাকে ধরিয়া রাখা দায়। দাসীগুলাও ঠিক মনিবদের মত। পড়িবার বই দুই-একখানা মিলিবে, এমন ব্যবস্থাও এ বাড়ীর নয়।

শ্বশুরের সেবা করিবে ভাবিয়া একদিন সে শ্বশুরের ঘরের দিকে যাইয়া দূর হইতে যাহা দেখিল, তাহাতে ভড়কাইয়া একেবারে সে তল্লাট ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। শ্বশুর খাটে শুইয়া আলবোলার নল টানিতেছেন, আর বাড়ীর অভিভাবিকা-স্বরূপিণী দূর-সম্পর্কীয়া সেই রমণীটি এক-মুখ পান লইয়া একেবারে শ্বশুরের গা ঘেঁষিয়া বসিয়া হাসি-গল্প করিতেছে।

এ দৃশ্যে জ্যোতি একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। এই জন্যই ঐ রমণীটিকে দাসী-চাকর সকলে অমন বাঘের মত ভয় করে, বটে! কিন্তু এ ব্যাপার—বাড়ীতে ছেলে-মেয়ে সকলে রহিয়াছে,—সকলের সম্মুখে এ কি কাণ্ড!

ধিক্কারে তাহার প্রাণ ভরিয়া গেল। সে স্থির করিল, এবার হইতে এ-বাড়ীর যেমন দস্তর, দুপুরবেলাটা শুইয়া গড়াইয়াই কাটাইয়া দিবে!

রাখালী আসিয়া বাহিরের ঘরের কথাবার্ত্তা শুনিতে যাইবার জন্য তাগিদ দিত, জ্যোতির তাহা ভালো লাগিত না। সে ভাবিত, রাখালী পাগল! অনর্থক সে-সব প্রলাপ শুনিয়া রাখালীর কি লাভ হয়?

কিন্তু সে লাভের দিকটাও বিধাতা একদিন ভালো করিয়াই জ্যোতির চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন। সেদিন অত্যন্ত গুমট ছিল,—রাত্রে ভালো ঘুম হইতেছিল না। লক্ষ্মীকান্তও শুইতে আসে নাই। ঘরের ঘড়িতে ঢং-ঢং করিয়া বারোটা বাজিয়া গেল। জ্যোতি উঠিয়া পা টিপিয়া বাহিরে আসিল। বাহিরে দালান। দালান পার হইয়া উত্তর দিকে বাড়ীর ভিতরেই ছোট একটা ছাদ ছিল। জ্যোতি আসিয়া সেই ছাদে আঁচল পাতিয়া শুইয়া পড়িল। সে দিন পঞ্চমী। আকাশে ফালি চাঁদ উঠিয়া খানিকটা আলো ছড়াইতেছিল। শুইয়া আকাশের পানে চাহিয়া জ্যোতি নানা কথা ভাবিতে-ছিল।

এত-বড় জমিদার-বাড়ীর একটি বৌ সে। বাহিরের লোক তাহার অদৃষ্টের হিংসা করে। বাক্স-ভরা গহনা—যে-সব গহনার নামও সে কখনো কাণে শুনে নাই,—যে-সব গহনা চোখে দেখার কল্পনা অনেকে করিতে পারে না, এমন সব ভারী-ভারী গহনা! কিন্তু এ-সবে তাহার কতটুকু সুখ! মা-বাপের কথা মনে পড়িল। না জানি, তাঁহারা এ-রাত্রে বিছনোয় শুইয়া মেয়ের সুখ-সৌভাগ্যের কি বিচিত্র স্বপ্নই না দেখিতেছেন!

আকাশে ক্ষীণ চাঁদ ভাঙা ভাঙা মেঘগুলাকে লইয়া লোকালুফি করিতেছিল,—মেঘ চাঁদ—সকলেই যেন হাসিতেছে! জ্যোতির মনে হইল, সবার মুখে বিদ্রূপের হাসি! হঠাৎ একটা শব্দ তাহার কাণে গেল। মানুষের পায়ের শব্দ। জ্যোতি চমকিয়া উঠিল। একটু ভয়ও হইল। চোর…? না! কে ও? দুজন মানুষ ছাদের ওদিককার দালানে। একটা জানালা খোলা ছিল। সেখানটায় চাঁদের আলো পড়িয়াছিল। চাহিতে জ্যোতি দেখে, রাখালী! আর রাখালীর আঁচল ধরিয়া দাঁড়াইয়া কে ও?

স্বামী লক্ষ্মীকান্ত! জ্যোতির মনে হইল, এ স্বপ্ন! দৃষ্টিটাকে আরো একটু তীক্ষ্ণ করিয়া সে দেখিল,—না, স্বপ্ন নয়—সত্য, অতি সুস্পষ্ট নির্ম্মম সত্য! রাখালীর চিবুকে হাত রাখিয়া লক্ষ্মীকান্ত তাহার মুখ-খানিকে তুলিয়া ধরিয়া তাহাতে চুম্বনের পর চুম্বন বর্ষণ করিতেছে।

জ্যোতির শরীরের সমস্ত রক্ত হিম হইয়া গেল। চোখ যেন পুড়িয়া গেল। সে উঠিবার চেষ্টা করিল, পারিল

না। কে যেন পেরেক মারিয়া তাহাকে মাটীতে আঁটিয়া রাখিয়াছে!

খুব বড় রকমের একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে চোখ মুদিল। এখনো! কি পাপ! জোর করিয়া সে জায়গা হইতে আপনাকে যেন শিকড় ছিঁড়িয়া টানিয়া সে তুলিল। বুকে অসহ্য রকমের ঝড় বহিতেছিল,—বুকটাকে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া জ্যোতি নিজের ঘরের পানে সরিয়া গেল।

ঘরে গিয়া একেবারে বিছানায় লুটাইয়া পড়িল। পড়িয়া বালিশে মুখ গুঁজিল। অত্যন্ত কাঁদিবার ইচ্ছা হইতেছিল, চোখ দিয়া জল কিন্তু বাহির হইল না। অসহ্য জ্বালায় প্রাণ-মন পুড়িয়া যাইতেছিল; তাহার সর্ব্বাঙ্গে যেন কে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে! তেমনি জ্বালা!

বিছানায় পড়িয়া সে ভাবিতে লাগিল—এ কি এ! সারা সংসারে এ কিসের খেলা চলিয়াছে! চারিধারে পাপ, চারিধারে লুকোচুরি, চারিধারে মানুষের প্রাণ লইয়া ছেঁড়াছেঁড়ি, রক্তারক্তি ব্যাপার—কি এ! রাখালীর না বিবাহ হইয়াছে! বেচারা স্বামী হয় তো কোন্ দূর বিদেশে পড়িয়া তাহারই কথা ভাবিতেছে! আর সে এমন অকুণ্ঠিত চিত্তে অপরের সঙ্গে নৈশ অভিসারে মাতিয়াছে! তার উপর ঐ লক্ষ্মীকান্ত—তাহার স্বামী? যাহাকে সে অন্যদিকে যেমনই-হোক-না কেন, নারীর প্রতি একটু সম্ভ্রমশীল বলিয়া ভাবিত, সে এত হীন, এমন নীচ! পরক্ষণে আবার সে ভাবিল, স্বামী এদিকে তাহার পানে ফিরিয়া চাহিবার সময় পায় না—আর ঐ রাখালীর মধ্যে সে এমন কি আকর্ষণের বস্তু পাইল যে…! রূপ? রূপে জ্যোতির কাছে রাখালী একটা বাঁদী! যৌবন? জ্যোতির পাশে রাখালী একটা মাংসের পিণ্ড! জ্যোতির ইচ্ছা হইল, নিজের এই রূপ, এই যৌবনকে তীক্ষ্ণ ছুরিতে বিঁধিয়া বিঁধিয়া এই দণ্ডে ছিঁড়িয়া ফেলে!

আবার মনে হইল, কাল সকালে রাখালী কি করিয়া তাহার সাম্‌নে ঐ মুখ লইয়া আসিয়া দাঁড়াইবে? কলঙ্কের কালি মাখিয়া কি করিয়া বৌদি বলিয়া ডাকিয়া সে সোহাগ জানাইবে? আর লক্ষ্মীকান্ত? জ্যোতি তাহাকে ইদানীং নির্ব্বোধ মূঢ় বলিয়াই জানিয়াছিল! সে-জন্য লক্ষ্মীকান্তর প্রতি প্রাণের মধ্যে কখনো বা একটু মমতাও জাগিত! কিন্তু সে এত-বড় পাষণ্ড!

দারুণ ঘৃণায় জ্যোতির মন ভরিয়া উঠিল। ঐ লক্ষ্মীকান্ত আসিয়া তাহাকে আবার ঐ হাত দিয়া স্পর্শ করিবে? ঐ মুখ লইয়া—ছি!

অমনি মনে পড়িল, সেই অতীতের আর একদিনের কথা! হেমন্তর ব্যবহার! পুরুষগুলা নারীর কত-বড় বিশ্বাসে কি প্রচণ্ডভাবেই না আঘাত দিতে পারে! নারীকে অপমান করিবার জন্য সর্ব্বদা সে কি হীন সুযোগ খুঁজিয়া বেড়ায়! ওঃ ভগবান্, ভগবান্! এই অক্ষম দুর্ব্বল নারী-জাতিটার সৃষ্টি কেন করিয়াছিলে? সৃষ্টিই যদি করিয়াছিলে, কেন তবে ঐ পুরুষগুলার সঙ্গে তাহাদের এমন নিরুপায়ভাবে বাঁধিয়া দিলে?

হঠাৎ নিকটে কাহার পায়ের শব্দ হইল। সে চমকিয়া চাহিয়া দেখে, এক নারী! লজ্জায় জড়ো-সড়ো, কাপড়ে আপনাকে আঁটিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছে। চাঁদের আলোয় জ্যোতি বুঝিল, সে রাখালী। ঘৃণায় বালিশে মুখ গুঁজিয়া জ্যোতি মুখ লুকাইল। রাখালী আসিয়া ডাকিল,—বৌদি!

জ্যোতির ইচ্ছা হইল, রাখালীর ঐ নির্লজ্জ মুখে এখনই একটা প্রচণ্ড চড় মারে,—কিন্তু পারিল না। রাখালী তাহাকে ঠেলা দিয়া ডাকিল,—বৌদি গো—শুনচো! ও বৌদি!

জ্যোতি অবাক্ হইয়া গেল। এত বড় অন্যায় কাজ করিয়া পরক্ষণে মানুষ এমন অচপল কণ্ঠে কথা কহিতে পারে!—আবার সে কাহার সহিত?—বিষ-মাখানো ছুরি দিয়া যাহার অন্তরকে এইমাত্র চিরিয়া চিরিয়া দিয়াছে! দুই পা দিয়া নির্ম্মমভাবে যাহার নিরপরাধ প্রাণটাকে চাপিয়া ধরিয়াছে,—তাহারই সহিত! ইহার চেয়ে আশ্চর্য্য আর কি থাকিতে পারে?

রাখালী আবার ঠেলা দিল, ডাকিল,—বৌদি—

নিদ্রার ভাণ করিয়া জ্যোতি পাশ ফিরিয়া শুইল, চোখ খুলিল না।

রাখালী আবার বলিল—কি ঘুম গা বৌদি! বলি শুনচো, ও বৌদি—

ঘৃণায় অপমানে জ্যোতির আপাদ-মস্তক ভরিয়া উঠিয়াছিল; সে একটা নিশ্বাস ফেলিল, তবু চোখ খুলিল না।

—নাঃ, বড্ড ঘুমুচ্ছে। বলিয়া রাখালী চলিয়া গেল।

## ১৫

রাখালী চলিয়া গেলে হঠাৎ জ্যোতির মনে হইল, অন্যায় করিলাম। হয় তো রাখালীর কোন নালিশ ছিল! হয় তো যে-কাণ্ডটা ঘটিয়া গেছে, তাহা রাখালীর অনভিমতেই ঘটিয়াছে! সে ব্যাপারে হয় তো তাহার কোনো হাত ছিল না! সে দুর্ব্বল, পরাধীনা, পরগৃহবাসিনী নারীমাত্র! সবলের উদ্ধত অত্যাচার দায়ে পড়িয়াই হয় তো তাহাকে সহিতে হইয়াছে! এখন জ্যোতির কাছে ছুটিয়া আসিয়াছিল, হয় তো একটু নিরাপদ আশ্রয়-লাভের জন্য!

আহা বেচারা!

জ্যোতি উঠিল, উঠিয়া দালানে আসিল। কোথায় গেল রাখালী? দালানের পরেই সেই ছাদ। ছাদের

দ্বারের কাছে আসিতে চোখ তাহার পুড়িয়া গেল—ছাদের মাঝখানে ছোট একটা ধোঁয়া-ঘর। তাহার উপর বসিয়া লক্ষ্মীকান্ত, আর লক্ষ্মীকান্তর বুকে মাথা রাখিয়া রাখালী সোহাগে একেবারে ঢলিয়া পড়িয়াছে।

জ্যোতির পায়ের নীচে সমস্ত পৃথিবীখানা ভয়ানক বেগে দুলিয়া উঠিল। সে-টাল্ সামলাইতে না পারিয়া দালানের একটা দেওয়াল ধরিয়া সেইখানেই দ্বারের পিছনে সে বসিয়া পড়িল। চোখের সম্মুখে ঐ চাঁদের আলোটুকুর উপর কে যেন একরাশ কালি ঢালিয়া দিল!

যখন চেতনা হইল, তখন ভোরের ফুরফুরে হাওয়া বহিতে সুরু করিয়াছে। ভালো করিয়া তখনো ভোরের আলো ফুটিয়া ওঠে নাই। জ্যোতির সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে। ভোরের এই স্নিগ্ধ হাওয়ায় মনে হইল, তাহার অঙ্গে কে যেন সান্ত্বনার স্নেহ-স্পর্শ বুলাইয়া দিতেছে! আঁচলের খুঁটে কপালের ঘাম মুছিয়া জ্যোতি উঠিয়া দাঁড়াইল—ছাদের পানে চাহিতে তাহার মনে কেমন আতঙ্ক হইল, সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য আবার যদি চোখে পড়ে! ভূতের ভয়ে শিশুর মন যেমন অন্ধকারের পানে চোখ মেলিতে পারে না—ইচ্ছা থাকিলেও জ্যোতি তেমনি আপনার দৃষ্টিকে ছাদের দিকে প্রসারিত করিতে পারিল না। সে দিক হইতে প্রাণপণ-বলে দৃষ্টিকে সে প্রতিহত রাখিল। সে ধীরে ধীরে নিজের ঘরে আসিয়া বসিয়া পড়িল। বিছানায় বসিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। ঐ বিছানাতেই দুর্ব্বৃত্ত লক্ষ্মীকান্তর সহিত একদিন সে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে শুইয়াছে! লক্ষ্মীকান্তর প্রণয়ের সহস্র ছলনা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিয়া আপনাকে একদিন কৃতার্থ বোধ করিয়াছে! তাহার মনে হইল, এই জঘন্য পুরী ছাড়িয়া বাহিরের কোনো মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়াইয়া প্রাণ ভরিয়া খানিকটা নির্ম্মল বাতাসে যদি সে নিশ্বাস লইতে পারিত! এই পাপ-পুরীর দূষিত বাষ্পে তাহার নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিতেছিল! কি করিবে? সে কি করিবে? কি করিয়া এখানকার এই দারুণ বীভৎসতার মধ্য হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইবে?

ভাবিতে ভাবিতে ঘুমে দুই চোখ ভরিয়া আসিল। সেই মেঝের উপর আঁচল পাতিয়াই সে শুইয়া পড়িল। বাহিরে যাইতে ইচ্ছা হইতেছিল না। লোকজনের সুমুখে এ মুখ দেখাইতে কেমন তাহার বাধিতেছিল। সকলের কাছে দীন, কৃপার পাত্রী হইয়া ঘুরিয়া বেড়ানো? না। এই ঐশ্বর্য্য···? ইহার চেয়ে গরীব বাপের সেই জীর্ণ ঘর—সে স্বর্গ, ওগো, সে স্বর্গ!

হঠাৎ রাখালী আসিয়া ডাকিল,—ঘুমুচ্ছ বৌদি? তার স্বর বেশ কম্পিত!

জ্যোতি আর ঘুমের ভাণ করিল না,—উঠিয়া বসিল।

রাখালী বলিল,—গরমের জন্য মেঝেয় শুয়েছিলে বুঝি?

জ্যোতির হাসি পাইল,—গরমের জন্যই বটে!

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই রাখালী বলিল,—আমিও ভাল ঘুমোতে পারিনি, বৌদি। তারপর একটা ঢোক গিলিয়া আবার বলিল,—বড়বাবু এর মধ্যে উঠে গেলেন যে?

জ্যোতির বিরক্তি ধরিল; সে-ভাব চাপিয়া তীব্র দৃষ্টিতে সে রাখালীর পানে চাহিল। এত বড় শয়তানী রাখালী!

রাখালী বলিল,—তোমার মুখ এমন শুক্‌নো দেখাচ্ছে কেন ভাই? বড়বাবু ঝগড়া করে উঠে গেছেন বুঝি?

অসহ্য! জ্যোতির মনে হইল, ঝড়ের মত ভীষণ গর্জ্জনে চারিধার কাঁপাইয়া তুলিয়া সে বলে, তুই শুধু শয়তানী নোস্, তোর নির্লজ্জতারও দেখছি, সীমা নেই! সবলে মনটাকে বাঁধিয়া সে বলিল,—হ্যাঁ।

রাখালী বলিল,—কেন বৌদি?

জ্যোতি বলিল,—সে সব কথা তোর জেনে কি হবে, বল্ দিকিন?

রাখালী বলিল,—না, এমনি জিজ্ঞেস করছিলুম!

রাখালীর ভাব দেখিয়া নিজের চোখের উপর জ্যোতির একবার সন্দেহ হইল। তবে কি কাল যাহা দেখিয়াছে, সে তার চোখের ভুল? না সে একটা স্বপ্ন?

না, না, সে স্বপ্ন নয়—স্বপ্ন নয়। সত্য, কঠোর, বড়-নির্ম্মম সত্য সে!

রাগে তাহার আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। রাখালীর পানে একটা তীব্র দৃষ্টি হানিয়া জ্যোতি সে ঘর হইতে ঝড়ের মত বেগে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

## ১৩

দুপুর বেলায় জ্যোতি আপনার ঘরেই বসিয়াছিল। মনের ভিতরটা তখনো অসহ্য যাতনায় গুমিয়া গুমিয়া জ্বলিতেছে। সে ভাবিতেছিল, আগুনের তাপে জল যেমন করিয়া উবিয়া যায়, এই যাতনার তাপে সেও যদি ঠিক তেমনি করিয়া উবিয়া যাইতে পারিত! কেন এমন হয় না, ভগবান্!

এমন সময় বাহিরে পায়ের শব্দ হইল। জ্যোতি মুখ তুলিয়া দেখে,—লক্ষ্মীকান্ত। এমন অসময়ে! হঠাৎ!

জ্যোতি উঠিয়া খাটের পাশে গিয়া দাঁড়াইল। লক্ষ্মীকান্ত আসিয়া খাটে বসিল, ডাকিল,—জ্যোতি!

জ্যোতি একদৃষ্টে লক্ষ্মীকান্তর পানে চাহিয়া রহিল, কোনো জবাব দিল না, নড়িলও না!

লক্ষ্মীকান্ত বলিল,—কাছে এসো জ্যোতি!

জ্যোতি বলিল,—কেন?

—আসতে কি নেই ?

—হঠাৎ এত দরদ !

—হঠাৎ আবার কি ! স্ত্রীর কাছে স্বামীর কি আসতে নেই ?

—না। এই দিনে-দুপুরে ! লোকে বলবে কি ?

—লোকের কথায় আমার ভারী বয়ে গেল ! এসো জ্যোতি, কাছে এসো। বলিয়া লক্ষ্মীকান্ত উঠিয়া দাঁড়াইল।

জ্যোতি তবু আসিল না।

লক্ষ্মীকান্ত তখন সরিয়া কাছে গিয়া জ্যোতির দুই হাত ধরিল, বলিল,—তোমায় ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে, জ্যোতি। তুমি খুব সুন্দর। ডাকের সুন্দরী যাকে বলে ! বলিয়া মৃদু হাসিল !

বিরক্তভাবে জ্যোতি বলিল,—থাক্, আর অত ব্যাখ্যায় কাজ নেই।

লক্ষ্মীকান্ত তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিল,—না, না, ব্যাখ্যা নয়। সত্য বল্‌চি।

জ্যোতি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

লক্ষ্মীকান্ত বলিল,—বুঝেচি, তোমার রাগ হয়েচে ! না ?

জ্যোতি বলিল,—রাগ কেন হবে ?

লক্ষ্মীকান্ত বলিল,—কাল ঘরে শুতে আসতে পারিনি, তাই ! কি করবো বলো, বাহিরে নেমন্তন্ন ছিল কি না, রাত্তির হয়ে গেল, কাজেই ফিরতে পারিনি ! এই খানিক আগে বাড়ী ফিরচি।

চোর, মিথ্যাবাদী, কাপুরুষ। দোষ করিতে পারো, আবার মুখ ফুটিয়া তাহা ঢাকিতে আসিয়াছ প্রকাণ্ড মিথ্যা দিয়া ! নির্লজ্জতার কোনো সীমা নাই ! এ কৈফিয়তের কি প্রয়োজন ছিল ? এ কৈফিয়ৎ কে চাহিয়াছিল ?

জ্যোতি কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আপনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়া লক্ষ্মীকান্তর ভিতরটাকে সে যেন তন্ন-তন্ন করিয়া লক্ষ্য করিতেছিল।

লক্ষ্মীকান্ত উঠিয়া জ্যোতির হাত দুইটা আবার চাপিয়া ধরিল। জ্যোতি সবলে আপনাকে ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়া কহিল,—ছাড়ো।

জ্যোতির মুখে উদ্‌ভ্রান্ত বিহ্বল দৃষ্টি স্থাপন করিয়া লক্ষ্মীকান্ত ডাকিল,—জ্যোতি। তার পর জ্যোতিকে সবলে ধরিয়া সে তাহার অধরে চুম্বন করিল।

রাগে দুঃখে অপমানে জ্যোতি জ্বলিয়া উঠিল। এক ঝট্‌কায় আপনাকে ছিনাইয়া লইয়া সে একটু দূরে সরিয়া গেল ; বলিল,—এ-সব আমার ভালো লাগে না। সরে যাও, বলচি।

লক্ষ্মীকান্ত স্থির দৃষ্টিতে জ্যোতির পানে চাহিয়া রহিল ; গদ্‌গদ কণ্ঠে ডাকিল,—জ্যোতি। তাহার দৃষ্টিতে লালসার বহ্নি জ্বলিতেছে।

জ্যোতিকে সত্যই বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। আজ সে স্নান করে নাই। কাল রাত্রির অনিদ্রা ও দুশ্চিন্তা মিশিয়া তাহার মুখখানিকে এক অপরূপ নূতন শ্রীতে সাজাইয়া তুলিয়াছে। অসংবদ্ধ চুলগুলা মুখে-চোখে আলুথালুভাবে লুটাইয়া পড়িয়াছে। লক্ষ্মীকান্ত সে দৃশ্যে কেমন আত্মহারা হইয়া উঠিল। এমন সময় এমন বেশে জ্যোতিকে সে কখনো দেখে নাই। জ্যোতির ঐ শীর্ণ বিশুষ্ক শ্রী তাহার প্রাণে কেমন নেশা জাগাইয়া তুলিল। সে আবার ডাকিল,—জ্যোতি !

জ্যোতি বলিল,—হয় এ-ঘর থেকে তুমি চলে যাও, নয় আমি যাই।

লক্ষ্মীকান্ত বলিল,—কেন শুনি ? আমায় ভালো লাগ্‌চে না ?

—না। জ্যোতি বেশ রূঢ় স্বরেই কথাটা বলিল।

লক্ষ্মীকান্ত বলিল,—আমি না তোমার স্বামী ?

জ্যোতি বলিল,—সে কথা সবাই জানে। আমারও তা মনে আছে। এখন তুমি সরো, আমি চলে যাই।

এ ভণ্ডামি জ্যোতির অসহ্য লাগিতেছিল। দুনিয়ায় এত ছল, এত কাপট্য, এমন অভিনয় করিতে পারে ! নিজের বেদনা কোন মতে সে সহিতে রাজী ছিল ! কিন্তু কেন আবার বারবার সে ক্ষতস্থানে এমন করিয়া এই মিথ্যা আদর আর সোহাগের লবণ ছিটানো ! সে স্থির করিল, দলিতা সর্পিণীর মত এবার সে ফণা তুলিয়া দাঁড়াইবে—ভালো করিয়াই সে আজ এই হতভাগাকে বুঝাইয়া দিবে, গরীবের মেয়ে বটে সে, কিন্তু তাহারো একটা প্রাণ আছে, মন আছে ; এবং সে-মন এই এত-বড় জমীদার-বাড়ীর অতুল বিভবের চেয়েও ঢের-বেশী দামী। এ-বাড়ীর এ-ঐশ্বর্য্য সে তুচ্ছ করিতে পারে অনায়াসে ! তাহাকে এমন করিয়া পা দিয়া পিষিয়া মাড়ানো—সে সহ্য করিবে না ! এই বিরাট পুরীর মধ্যে দিবারাত্র পাপের যে ভীষণ তাণ্ডব-নৃত্য চলিয়াছে—সেই স্পর্দ্ধিত পাপকে রীতিমত আহত করিবার শক্তি জ্যোতির বিলক্ষণ আছে !

জ্যোতির ইচ্ছা হইল, লক্ষ্মীকান্তর ঐ লালসা-দীপ্ত চোখ দুটাতে ছুঁচ ফুটাইয়া এখনি চিরকালের মত তাহাকে অন্ধ করিয়া দেয়।

লক্ষ্মীকান্তর মাথায় লালসার আগুন তখন দাউদাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। লক্ষ্মীকান্তকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া জ্যোতি বলিল,—খবরদার, আমাকে ছুঁয়ো না !

লক্ষ্মীকান্ত হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল। রাগে জ্যোতির সর্ব্বাঙ্গ থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল।

জ্যোতি বলিল,—কাল রাত্রে আসতে পারো নি, তার মিথ্যা কৈফিয়ৎ নিয়ে আমার সামনে আসবার

কোনো দরকার ছিল না। সেজন্ত আমি তোমার পায়ে চোখের জল ফেলতে যাইনি তো!

লক্ষ্মীকান্ত ডাকিল,—জ্যোতি…

সে-কথায় কর্ণপাত না করিয়া সগর্জ্জনে জ্যোতি বলিল,—আমি অন্ধ নই। কাল রাত্রে যা-যা হয়েচে, আমি তা স্বচক্ষে দেখেছি। ভেবো না, আমি তোমার ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনে ভুলে নিজের মনকে থেঁতো করে এখানে পড়ে থাকবো। আমি মানুষ! কুকুর নই।

লক্ষ্মীকান্ত অবাক্ হইয়া গেল, জ্যোতির মূর্ত্তি চকিতে এ কি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে! এমন মূর্ত্তি সে কখনো দেখে নাই।

জ্যোতি বলিল,—বাড়ীর মধ্যে এই সব পাপ কাজ করতে এতটুকু লজ্জা হলো না, আবার ঐ মুখ নিয়ে আমার কাছে এসেচো, সোহাগ জানাতে। ও মুখে এখনো যে পাপের কালি লেগে রয়েচে। তোমার লজ্জা হচ্ছে না? আশ্চর্য্য! কিন্তু তোমার এ নির্লজ্জতা দেখে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে!

লক্ষ্মীকান্ত গর্জ্জিয়া উঠিল,—কি! বাঁদীর এত বড় আস্পর্দ্ধা, আমাকে চোখ রাঙায়! দূর হয়ে যা আমার বাড়ী থেকে!

জ্যোতি নড়িল না।

ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের মত লক্ষ্মীকান্ত জ্যোতির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল; গর্জ্জন করিয়া কহিল,—নিকালো, আবি নিকালো। আমি যা করবো, তাতে কারো বাবাকে আমি ভয় করি না, জানিস্? নিকালো হারামজাদী!

জ্যোতি বলিল,—যাবো, চলেই যাবো আমি। কিন্তু একটা মিনতি শুধু,—অত চেঁচিয়ো না! আমার ভয় নেই, কিন্তু তোমার কেলেঙ্কারি তাতে আরো রাষ্ট্র হবে।

লক্ষ্মীকান্ত বলিল,—তাতে আমি থোড়াই কেয়ার করি। আমার কথায় কথা কবে, এমন লোক দুনিয়ায় নেই,—এ তো আমার নিজের বাড়ী! নিকালো হারামজাদী!

লক্ষ্মীকান্ত সবলে জ্যোতির কেশাকর্ষণ করিল। সে আকর্ষণের বেগ সামলাইতে না পারিয়া জ্যোতি পড়িয়া গেল—লক্ষ্মীকান্ত তখন ভূপতিতা জ্যোতির অঙ্গে পদাঘাত করিল।

দিনে দুপুরে এই গোলমাল শুনিয়া দুই-একজন দাসী আসিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল। রাখালীও আসিয়াছিল। রাখালী তাড়াতাড়ি আসিয়া লক্ষ্মীকান্তকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিল।

লক্ষ্মীকান্ত তখনো গর্জ্জন করিতেছিল,—নিকাল দে, আবি নিকাল দে হারামজাদীকো।

রাখালী বলিল,—তুমি বাইরে যাও দিকি। এমন কাজও করে! ছি!

লক্ষ্মীকান্ত চলিয়া গেল।

রাখালী তখন জ্যোতির কাছে আসিয়া ডাকিল,—বৌদি!

জ্যোতি জবাব দিল না—তাহার তখন চেতন ছিল না।

রাখালী তাড়াতাড়ি একটা দাসীকে জল আনিতে বলিয়া জ্যোতির মাথা আপনার কোলে তুলিয়া লইয়া বসিল; আর একজনকে বলিল,—তুই বাতাস কর্!

জল আসিলে জ্যোতির মুখে-চোখে জলের ঝাপটা দেওয়া হইল। অনেকক্ষণ পরে জ্যোতি বড় একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চোখ মেলিল। রাখালী ডাকিল,—বৌদি!

জ্যোতি উদাস দৃষ্টি তুলিয়া চাহিয়া দেখে, রাখালীর কোলে মাথা রাখিয়া সে শুইয়া আছে।

রাখালী আবার ডাকিল,—বৌদি!

জ্যোতি চোখ খুলিয়া ক্ষীণ স্বরে শুধু বলিল,—উ!

## ১৭

রাখালী কোন কথা গোপন করিল না। প্রথমটা অন্ধের মতই আপনাকে সে বিসর্জ্জন দিয়াছিল। প্রবলের শক্তি তাহাকে একেবারে পরাভূত করিয়াছিল। কি করিবে? সে নিতান্তই উপায়হীন!

স্বামী। বেচারা স্বামী,—তাঁহার প্রাণ-ভরা ভালোবাসার কথা মনে হইলে রাখালীর বুকটা যাতনায় ফাটিয়া যায়! কিন্তু কি করিবে,—সে একেবারে নিরুপায়!

সে কি এবার সাধ করিয়া এখানে আসিয়াছিল? এখানে আসিতে চাহে না সে। এখানকার নামে তার আতঙ্ক হয়! স্বামী যখন বারবার বলিলেন, অনেকদিন এখানে আছো—আমাকেও এখন মাসখানেকের জন্য বিদেশ যেতে হচ্ছে, তোমায় এখানে একলা রেখে কি করে যাবো রাখাল? যদি অসুখ-বিসুখ হয়? না—এখানে তোমাকে দেখবার কেউ নেই। তা-ছাড়া তোমার বয়স অল্প। এমন অবস্থা,—না রাখাল, তার চেয়ে তুমি বরং তোমার মামার বাড়ীতে এ ক'টা দিন কাটিয়ে এসো গে!—রাখালীর কি তখন সে কথায় বুকখানা ফাটিয়া যায় নাই? কিন্তু কি করিয়া সে বলিবে,—ওগো, না, সেখানে আমায় পাঠিয়ো না। তার চেয়ে বাঘের মুখও আমার কাছে ঢের নিরাপদ জায়গা গো! পাপের কাহিনী বলিয়া স্বামীর সোনার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিতে তাহার বড় মায়া হয়! এখানকার এ অত্যাচার কাঁটার মত তাহার গায়ে দুদিন ফুটিবে, ফুটুক! কিন্তু সেখানে স্বামীর আদরে সে যে কি অগাধ সুখ! কত আদর, কি নিশ্চিন্ত বিশ্বাস! সে দিবারাত্র আগুনে পুড়িতেছে—তবু

হাসি-মুখে কোনমতে সে-আগুন চাপা দিয়া শুধু আনন্দ আর হাসির ধারায় তাহার আত্মীয়-পরিজন-হীন স্বামীটিকে সে যে সকল সুখে সুখী করিয়া রাখিয়াছে! স্বামী যখন আদরের ধারায় তাহাকে একেবারে ডুবাইয়া দেন, তখন তাহার মনের ভিতরটা অসহ্য জ্বালায় জ্বলিতে থাকিলেও সে জ্বালার এতটুকু আঁচ সে কোনদিন স্বামীর গায়ে লাগিতে দেয় না!

কি করিয়া এমন হইল? ওগো, সে কাল-রাত্রির কথা মনে হইলে এখনো তাহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া ওঠে।

বিবাহের পর দুই-তিন মাস স্বামীর ঘরে কাটাইয়া সে যখন এখানে আসিল, তখন মন কি শূন্যতায় ভরিয়া থাকিত—কিছু ভালো লাগিত না। একটি স্ত্রীকে হারাইয়া স্বামী সংসারের বাহিরে গিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন—তাহার হাত ধরিয়া আবার সংসারে প্রবেশ করিয়াছেন! তাঁহার আদরের কি সীমা আছে! এখানে আসিয়া সেই আদরের কথা ভাবিয়াই তাহার বিরহের দীর্ঘ দিন-রাত্রিগুলা সে কাটাইয়া দিতেছিল—সেই সুখের স্বপ্নে বিভোর হইয়াই সে বিরহের দুঃখ ভুলিতেছিল।

একদিন রাত্রে সে যখন স্বপ্ন দেখিতেছিল, স্বামীর দুই বাহুর বাঁধনে আপনাকে নিবিড়ভাবে ধরা দিয়াছে, তখন হঠাৎ তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাগিয়া দেখে, এ যে সত্যই দুটা হাতের বাঁধন কঠিনভাবে তাহার গায়ে চাপিয়া বসিয়াছে! শিহরিয়া চাহিয়া সে দেখে, এ কি, এ স্বামী নয়—এ যে লক্ষ্মীকান্ত! লক্ষ্মীকান্তর তখনো বিবাহ হয় নাই।

ভয়ে সে চীৎকার করিতে যাইবে, এমন সময় লক্ষ্মীকান্ত দুই হাতে তাহার মুখ চাপিয়া বলিল,—চুপ!

তার পর ঐ লোকেব কাণে পাছে কিছু গিয়া পৌছায়, এই ভয়েই সে একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়াছে! শুধু তাই? আপনার সর্ব্বস্ব কি করিয়া যে পলে পলে পুড়াইয়া পুড়াইয়া সে ছাই করিয়াছে,—ওগো, ইহাতে সে কি বেদনা পাইয়াছে, তাহা সে-ই জানে! মরিতে কি জানিত না? জানিত বৈ কি! কতবার মরিবে ভাবিয়া পণ করিয়াছে। কিন্তু স্বামী। বেচারা স্বামীর সেই হাসি-ভরা উজ্জ্বল মুখখানি! তাই এত জ্বালা প্রাণে চাপিয়া পলে পলে মৃত্যু-যাতনা সহিয়াও সে মরিতে পারে নাই,—পাঁচজনের সঙ্গে হাসি-কৌতুক করিয়া বাহিরে প্রসন্ন ভাব দেখাইয়া সে বাঁচিয়া আছে! এই যে মরিয়া বাঁচিয়া থাকা, এই যে ভিতরটা পুড়িয়া ছাই হইয়া গেলেও বাহিরের ঠাটটাকে পরিষ্কার খাড়া ধরিয়া রাখা,—ইহাতে কি কষ্ট, তাহা কে বুঝিবে গো কে বুঝিবে?

এবারে সে এখানে আসিয়াছিল, শুধু তার স্বামীর কথাতে! তা ছাড়া সে ভাবিয়াছিল, বৌদির অঞ্চলের নিবিড় ছায়ায় এবার হয় তো নিরাপদ নীড় মিলিবে! কিন্তু অদৃষ্ট যখন তাহার এমন, তখন এইভাবে নিজেকে হত্যা করিয়া রক্তাক্ত মনকে অক্ষত দেহের আবরণে ঢাকিয়া বেড়ানো ছাড়া তাহার আর কি উপায় আছে!

রাখালী কাঁদিয়া ফেলিল।

জ্যোতির বুক এ দুর্ভাগ্যের করুণ কাহিনী শুনিয়া অশ্রুতে ভিজিয়া গলিয়া একশা হইয়া গেল। সে রাখালীকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। তাহার চোখ দিয়া অজস্রধারে জল ঝরিয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ অশ্রু-বর্ষণের পর বুক একটু হাল্কা হইলে জ্যোতি বলিল,—আমি আর এখানে থাকবো না, রাখালী।

—কেন বৌদি?

—এই ব্যবহারের পরেও আমায় তুই এখানে থাক্‌তে বলিস্?

—বৌদি…।

—কেন রাখালী?

—কাল রাত্রে আবার আমায় জ্বালাতন করতে এসেছিল। গরমে ওদিক্‌কার দালানে শুয়ে ঘুমচ্ছিলুম, বড়বাবু গিয়ে আমায় ডাক্‌লেন। ভয়ে আমি একেবারে কাঁটা হয়ে গেলুম। হাত এড়াব মনে করে ছুটে তেতলার ছাদে পালালুম। সেখানেও বড়বাবু আমার পিছনে পিছনে গেলেন। পায়ে ধরে কত মিনতি জানালুম—বললুম, দয়া করে আমাকে মুক্তি দিন। অমন রূপসী বৌ রয়েছে। তা বল্‌লেন, সে তো আছেই, নেয় কে? তার পর ছুটে নীচে পালিয়ে এলুম—তিনিও সঙ্গে সঙ্গে এলেন। যেখানে যাই, সেইখানেই বড়বাবু! নিস্তার নেই! শেষে কি একটা কেলেঙ্কারি হবে। বড়বাবু ভয় অবধি দেখালেন, বলিলেন, পুরোনো কথা সকলকে বলে দেবেন! স্বামীকে চিঠি লিখে সব কথা জানাবেন। নিরুপায় হয়ে তোমার ঘরে ছুটে এলুম। তুমি অঘোরে ঘুমোচ্ছিলে। কি করি? তখন উদ্ধারের পথ নেই দেখে বাঘের মুখেই নিজেকে ছেড়ে দিলুম।—আমার মনে হচ্ছে, আমি আগুনের মধ্যে গিয়ে সেঁধুই। কিন্তু কেবল আমার বেচারা স্বামী! স্বামীর জন্য শুধু। আমার বেচারা স্বামী! তিনি যদি এর একবিন্দু জান্‌তে পারেন, তা হলে তিনি একদণ্ড বাঁচবেন না। না, না, তা আমি পারবো না। তার চেয়ে এ বিষ প্রাণ ভরেই পান করে যাই—তাঁকে সেই মৃত্যুর দিনে সব কথা বলে যাবো। আর পারি না, বৌদি। এ যে কি জ্বালা! তিনিও এখন আমাকে নিয়ে যাবেন না! অথচ—লক্ষ্মী বৌদি,

যে ক'দিন আমায় এখানে পড়ে থাকতে হবে, সে ক'দিন অন্ততঃ তুমি থাকো। তোমার ভয় নেই—আমি সর্ব্বদা তোমার কাছে-কাছে থাকবো। দু'জনে একসঙ্গে যদি থাকি, তা হলে দুজনেই দুজনকে সব অপমান থেকে রক্ষা করতে পারব।

রাখালীর উপর জ্যোতির যতখানি ঘৃণা জন্মিয়াছিল, আজ তাহার ব্যবহারে ও তাহার মুখে এই সব কথা শুনিয়া সে ঘৃণা সম্পূর্ণ সরিয়া গেল। রাখালীর উপর গভীর সমবেদনায় জ্যোতির অন্তর ভরিয়া উঠিল। সে বলিল, যত-বড় বিপদ, যত-বড় লাঞ্ছনাই তাহার মাথার উপর ঘনাইয়া আসুক, রাখালীকে লালসার এই জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে রাখিয়া সে কোথাও নড়িবে না!

## ১৮

ইহার অব্যবহিত পরেই ঘটনা-চক্র অতি দ্রুত জ্যোতির অদৃষ্টকে সম্পূর্ণ এক অভিনব পথে টানিয়া লইয়া চলিল।

সেই অভিভাবিকা-স্বরূপিণী রমণীটির নাম ছিল, বামাকালী। বামাকালীর এক দেবর-পুত্র এই জমিদার-বাড়ীর ভাতায় কলিকাতার কলেজে পড়িতেছিল। হঠাৎ দুই মাসের ছুটীতে সে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার নাম নীরদ।

যখন-তখন নীরদ জ্যোতির কাছে আসিয়া আব্দার তুলিত—বৌদি পাণ দাও,—একখানা চিঠির কাগজ দাও,—দুটো টাকা দাও।

হাত-খরচের টাকা-কড়ি জমিদার-বাড়ীর আদব-কায়দা-মত যথাসময়ে বাটীর বধূর হাতে আসিয়া জমা হইত। জ্যোতির সখ ছিল না, খরচ ছিল না,—কাজেই টাকাটা মোটা রকমে তাহার বাক্সের কোণে জমিয়া উঠিতেছিল।

সেদিনকার সেই ব্যবহারের পর হইতে জ্যোতি লক্ষ্মীকান্তর ঘরেও আর ঢুকিত না। রাত্রে সে ও রাখালী একসঙ্গে রাখালীর ঘরে শয়ন করিত। দাসী ও আত্মীয়-পরিজনেরা জানিল, তবে পরের ব্যাপারে মাথা ঘামানো নাকি এ বাড়ীর রীতি নয়,—কাজেই সে ব্যবস্থায় কাহারো দিক হইতে কোনরূপ অনুযোগ বা কৌতূহল তেমন সাড়া দিল না।

একদিন রাখালী কাছে ছিল না, বাড়ীর বৌ জ্যোতি বসিয়া বৃহৎ পরিবারের জন্য পাণ সাজিতেছিল। এ বাড়ীতে আসা অবধি এই পাণ সাজা কাজটুকুতে বাড়ীর বৌয়ের গৌরবের অধিকার—সে অধিকার হইতে কেহ তাহাকে বঞ্চিত করে নাই। পূর্ব্বাহ্নে সে স্নান করিয়া আসিয়াছিল—ভিজা খোলা চুলের রাশি মাথার পাশ দিয়া পিঠের কাপড়ের উপর এলাইয়া পড়িয়াছিল। জ্যোতি বসিয়া পাণ সাজিতেছিল। নীরদ আসিয়া ডাকিল,—বৌদি...

জ্যোতি নীরদের সঙ্গে কথা কহিত না। ঘাড় গুঁজিয়া সে পাণই সাজিতে লাগিল।

নীরদ বলিল,—মাপ করো, বৌদি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো?

জ্যোতি নিবাত-নিষ্কম্প দীপের মতই স্থির রহিল,—এতটুকু বিচলিত হইল না।

নীরদ বলিল—তোমায় দেখলে মনে হয় বৌদি, তুমি একটা আলোর ধারা! এই লক্ষ্মীছাড়া বাড়ীটার মধ্যে চারিদিকে যে এত রাশি-রাশি জঞ্জাল, ময়লা, আর কদর্য্য দূষিত বাষ্প জমে রয়েচে, তোমার ঐ আলোর ধারায় তা ঘুচিয়ে এই বাড়ীটাকে একেবারে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিতে পারো না?

জ্যোতি একটা নিশ্বাস ফেলিল। সমবেদনার এই কোমল স্পর্শে তাহার প্রাণের সর্ব্বত্র একটা স্পন্দন খেলিয়া গেল।

নীরদ বলিল,—মাপ করো বৌদি। সূর্য্যের নাগাল কেউ পায় না—তবু তার কিরণ পেয়ে এটুকু সকলে বোঝে যে সূর্য্য প্রদীপ্ত মহিমাময়! তোমাকে দেখে এটুকু আমি বেশ বুঝেচি বৌদি যে, এত বড় বাড়ীটার মধ্যে তুমিই আছ একমাত্র মানুষ। কিন্তু কৈ বৌদি, এ বাড়ী চিরদিন যেমন লক্ষ্মীছাড়া ছিল, তোমার পায়ের স্পর্শ পেয়েও যে তাই রয়ে গেল! তার সে ভাব এতটুকু ঘোচে নি তো!

জ্যোতি আর আপনাকে সাম্‌লাইতে পারিল না। তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। পাছে নীরদ দেখিয়া ফেলে, এই ভয়ে সে মাথাটাকে কোলের কাছে আরো নামাইয়া ধরিল।

নীরদ একটা ছোট নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—তোমার দুঃখ কোথায়, এ ক'দিনে আমি তাও বুঝেচি। কিন্তু অত শান্ত হয়ে থাকলে তোমার চল্‌বে না, বৌদি। এ যা বাড়ী,—তুমি বাড়ীর বৌ, তুমিই গৃহিণী—কড়া হয়ে দাঁড়াও,—দেখবে, বাড়ীর যেখানকার যা জঞ্জাল, সমস্ত এক নিমেষে সাফ হয়ে গেছে। মাপ করো, আমি তোমার স্বামীর নিন্দা করচি না—কিন্তু সে কি মানুষ? সে একটা জানোয়ার। বিয়ের কনে হয়ে প্রথম যেদিন তুমি এসে এ বাড়ীর মাটীতে পা রাখলে, সেদিন তোমার ঐ পায়ে যে আমি সোনার স্বপ্ন ফোটো-ফোটো দেখেছিলুম! তোমার ঐ পায়ের স্পর্শে এ বাড়ীর দুর্গন্ধ পাঁকে পদ্ম-ফুল ফোটাবে, ভেবেছিলুম! কিন্তু এবারে এসে সমস্ত ব্যাপার দেখে প্রাণ আমার পুড়ে যাচ্ছে, বৌদি।

টপ্‌ করিয়া এক ফোঁটা জল জ্যোতির চোখের কোল

হইতে ঝরিয়া পানের বাটার উপর পড়িল। নীরদ তাহা দেখিল। নীরদ বলিল,—তোমায় শক্ত হতে হবে বৌদি, খুব শক্ত। এ বাড়ীর কর্ত্তা থেকে অতি-ক্ষুদ্র চাকরটিকে অবধি চিনেচো তো—সবাই এঁরা শক্তর ভক্ত,আর নরমের যম। অরাজক পুরী—যে পারচে, সেই বুক ফুলিয়ে কর্ত্তামি করে যাচ্ছে। অথচ তোমার হক্—তুমি নরম বলে তোমার হাত থেকে তা ফস্কে যাবে? না! তা হলে চল্‌বে না। এ বাড়ীর বৌ তুমি—সে-হিসেবে তোমার একটা কর্ত্তব্যও আছে। তুমি যদি নরম হয়ে এ-সব সয়ে থাকো, তা হলে তোমার পাপ হবে, জানো? কর্ত্তব্য-চ্যুতির পাপ?

জ্যোতি কি বলিবে? অশ্রুর বাষ্পে চোখের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল—ঘোমটার পাশের কাপড়টা টানিয়া সে চোখ মুছিল।

নীরদ কাছে সরিয়া আসিল, চারিধারে একবার চাহিয়া দেখিল, কেহ নাই। পরে অত্যন্ত ধীরে সুগভীর স্নেহে জ্যোতির মাথাটা ধরিয়া তুলিল। জ্যোতির মুখের উপর হইতে ঘোমটা সরিয়া গেল—চোখের জলের কালিতে অমন সুন্দর মুখখানি মলিন হইয়া উঠিয়াছে।

নীরদ বলিল,—কেঁদো না বৌদি। আমি যতদিন এ বাড়ীতে আছি, আমায় তোমার বন্ধু আর সহায় বলেই জেনো। তুমি শুধু শক্ত হও, বৌদি। তোমার এ সোনার রাজ্য—পাঁচ ভূতে যে এখানে নৃত্য করে বেড়াবে, আমার তা বরদাস্ত হবে না। এই ত্মাখো না বৌদি—আমি কেথাকার কে—জোর আছে বলে সেই জোর ফলিয়ে এখান থেকে কি না আদায় করচি? রাজ-ভোগ, মাসিক ভাতা,—কি নয়? আমার কোনো কুলে কেউ নেই। এখানে এসে ঐ লক্ষ্মীর মোসাহেব সেজেই প্রথমটা বসে থাক্‌তুম—তার পর ঘৃণা হলো। ভাবলুম, দূর ছাই, নিজের দিন কিনে নিই না। ফাঁক পেয়ে টাকা-কড়ির ব্যবস্থা করে কল্‌কাতায় সরে পড়লুম। মানুষ না হয়ে থাকি, অন্ততঃ বন-মানুষের দলে গিয়ে যে ঠেকিনি, এটা বোধ হয় তুমিও স্বীকার করবে। তাই বল্‌চি বৌদি, ঘোমটার আড়ালে জুজুবুড়ি সেজে থাক্‌লে চল্‌বে না—খাড়া হয়ে আগুনের তেজে জ্বলে ওঠো, দেখবে, এই অরাজক পুরী সেই রূপকথার হাতীর মত শুঁড়ে করে তুলে তোমায় তার শূন্য সিংহাসনটার উপর বসিয়ে দেবে।

জ্যোতি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। এই দৈত্যপুরীর মধ্যে সত্যই সে আজ একজন হৃদয়-ভরা মানুষের দেখা পাইয়াছে। আঁধার বিজন বনে সে আলো পাইয়াছে। জ্যোতি বলিল,—কিন্তু আমি যে গরীব দুঃখীর মেয়ে, ঠাকুরপো।

নীরদ বলিল,—কিসের গরীব, বৌদি? তুমি তো কাকেও সেধে-কেঁদে এ বাড়ীতে এসে মাথা গলাও নি! সেই গরীবের কুঁড়েতে এরাই গিয়ে সেধে মাথায় করে তোমাকে সেখান থেকে নিয়ে এসেচে।

জ্যোতি বলিল,—কিন্তু আমার এমন কি শক্তি আছে, ঠাকুরপো—?

নীরদ বলিল,—তোমার শক্তি কতখানি আছে, তুমি তার কি জানো বৌদি? কিছু না। শুধু চোখ রাঙিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠো, ব্যস—দেখবে, চারিধার থেকে শক্তিহীনেরা অমনি মাথা নুইয়ে সেলাম ঠুকচে।

পাণ সাজা শেষ হইয়াছিল। নীরদের হাতে পাণ দিয়া জ্যোতি বলিল,—বেশ ঠাকুরপো, তোমার কথায় একবার চেষ্টা করে দেখবো। আমি ত হাল ছেড়েই দিয়েছিলুম,—এখান থেকে চলে যাবো ভেবেছিলুম,—শুধু একজনকে কথা দিয়েচি বলে যেতে পারলুম না। তোমার কথাই শিরোধার্য্য করলুম, ঠাকুরপো। তুমি আমার সহায় থেকো।

## ১৯

লক্ষ্মীকান্ত জ্যোতিকে তাড়াইবার জন্য চোখ রাঙাইয়া গর্জ্জন করিয়াছিল, কিন্তু কাজে তাহা করিতে পারিল না। পারিবে না, ইহাও সে জানিত। ইহাতে জমিদার-বাড়ীর অত্যন্ত অপমান হইবে! একটা গরীবের মেয়েকে বৌ করিয়া আনিয়া শেষে তাহাকে ঠেঙাইয়া ঝী-চাকরের মত বাহির করিয়া দিয়াছে, লোকে এ কথা শুনিলে বাহিরে তখনি একেবারে টী-টী পড়িয়া যাইবে! কর্ত্তা চন্দ্রকান্তর তাহাতে মাথা হেঁট হইবে এবং কর্ত্তার কাণে এ সংবাদ পৌঁছিলে তিনি যদি আগাগোড়া ব্যাপারটার তদন্ত করেন, তাহা হইলে,—জ্যোতি যেরূপ মুখরা হইয়া উঠিয়াছে,—লক্ষ্মীকান্তর ভয় হইল,—কি জানি, সে হয় তো কর্ত্তার মুখের উপর সব কথা বলিয়া দিবে! জ্যোতি তো মুখের উপর স্পষ্টই বলিয়াছে, জমিদার-বাড়ীর এত যে ঐশ্বর্য্য-বিভব, তাহাতে তাহার এতটুকু লোভ নাই! কাজেই লক্ষ্মীকান্ত গরজে পড়িয়া মনের ঝাল মনে মারিল। সে স্থির করিল, অন্দরের ত্রিসীমাও আর মাড়াইবে না! তাহা হইলেই জ্যোতি রীতিমত জব্দ হইয়া যাইবে'খন।

সে নিজের ঘরে শোয়া বন্ধ করিল। সে ভাবিল, জ্যোতি একা ঐ ঘরে পড়িয়া পচিয়া উঠুক, আর দেখুক, লক্ষ্মীকান্ত ও-ঘরে ঢুকিবার কথা মনেও করে না। সে জ্যোতিকে চিনিত না। জ্যোতি যে নিজে হইতেই সে ঘরের ছায়া মাড়ায় না, ভুলিয়াও সে ঘরে ঢোকে না, সে খোঁজ রাখিবার মত বুদ্ধি বা অবসর লক্ষ্মীকান্তর ছিল না। বাহিরে পারিষদবর্গের বাহবা-ধ্বনির অন্তরালে আপনাকে সে পরম নিশ্চিন্তভাবে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল।

কিন্তু সম্প্রতি সে অন্তরালটিতেও মাঝে মাঝে খোঁচা

পড়িতে সুরু করিয়াছে। নীরদ যখন-তখন ঝড়ের মত আসিয়া জমাট্ আসরের হাসি-গল্প ও স্ফুর্ত্তির রস মারিয়া দেয়। তাহার টিপ্পনীর ঝাঁজে লক্ষ্মীকান্তর মনে রীতিমত ফোস্কা পড়ে। কিন্তু উপায় কি! নীরদ বামাকালী দেবীর দেবর-পুত্র—তাহাকে ফশ্ করিয়া কিছু বলিবার জো নাই! কাজেই কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া নীরদের তীব্র বিদ্রূপগুলাকে হজম করা ছাড়া লক্ষ্মীকান্তর উপায় ছিল না।

একদিন মজলিস ভাঙ্গিলে লক্ষ্মীকান্তকে নিভৃতে পাইয়া নীরদ বলিল,—একটা কথা আছে বড়দা।

—কি কথা? লক্ষ্মীকান্তর গা ছম্‌ছম্ করিয়া উঠিল। নীরদের কথাগুলা তো নেহাৎ সাদা রকমের হয় না! তাহাতে ঝাঁজ থাকে বিলক্ষণ!

নীরদ বলিল,—রাত্রে তুমি আজকাল শোও কোথায়?

লক্ষ্মীকান্ত বলিল,—কেন, বাইরের ঘরে!

—হঠাৎ নিজের ঘর ছেড়ে বাইরের ঘরে শোও যে?

—যে গরম পড়েচে!

নীরদ বলিল,—তা নয় বড়দা। আমি এসে অবধি লক্ষ্য করচি, বৌদির ধার তুমি মাড়াও না! ব্যাপার কি, জান্‌তে পারি?

—তোর অত খপরে দরকার কি?

—আছে! বলো না! তোমার আর বৌদির ইজ্জতের জন্যই বল্‌চি। পাঁচজনে বল্‌বে কি? মনে ভাববেই বা কি?

—পাঁচজনের এত মাথা-ব্যথার দরকার নেই তো।

নীরদ গম্ভীর হইয়া বলিল,—হুঁ। তার পর চুপ করিয়া একটা চেয়ারে সে বসিয়া পড়িল।

লক্ষ্মীকান্ত নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। পাছে নীরদ আবার কোন কথা পাড়িয়া বসে, এই ভয়ে সে সরিয়া পড়িবার উদ্যোগ করিল।

নীরদ ডাকিল,—বড়দা!

লক্ষ্মীকান্ত শিহরিয়া উঠিল, এই রে, আবার কি বলে? সে বলিল,—কেন?

নীরদ বলিল,—বিয়ে করে ঐ পরের মেয়েকে ঘরে এনেচো কেন? তার নিজের বাড়ীতে ছুটি অন্ন কি আর মিলতো না?

লক্ষ্মীকান্ত একেবারে বলিয়া ফেলিল,—তুই জানিস্ না নীরো, ও ভারী বদ।

নীরদ বলিল,—বদ! কিসে বদ হলো, জান্‌তে পারি?

লক্ষ্মীকান্ত বলিল,—সে ঢের কথা। যাই হোক্ না, আমার পষ্ট কথা, তার সঙ্গে আমার বনে না।

—কখনো বনাবার চেষ্টা করেচো?

লক্ষ্মীকান্তর সহ্য হইল না। এই লক্ষ্মীছাড়া অন্নদাস ছোঁড়াটাকে এত কৈফিয়ৎ কিসের জন্য! ছোঁড়ার স্পর্দ্ধা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। সে চটিয়া গেল,—তোর কাছে অত জবাবদিহি কর্‌তে পারি না। আমার খুশী, আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক যদি না রাখি! রঙের বাহার দেখে ছোঁড়ার মন ভিজে গেছে, দেখ্‌চি। যত কিছু বলি না, তত আস্পর্দ্ধাও বেড়ে উঠ্‌চে,—বটে! বাড়ীর বৌ, সে আমার পরিবার, তার সঙ্গে তুই কোথাকার কে, দিন-রাত তোর অত কিসের ফিশির-ফিশির রে? আমি কিছু দেখি না? না, বুঝি না? বেইমান কোথাকার?

জোর গলায় নীরদ ডাকিল,—বড়দা—

লক্ষ্মীকান্ত বলিল,—এর আবার বড়দা ছোটদা কি! আমি কিছু বুঝি না? বটে,—আমার পরিবারের সঙ্গে তোর এত প্রাণের কথা কিসের ইষ্টুপিড্?

নীরদ বলিল—মুখ সাম্‌লে কথা কয়ো বড়দা। আমাকে যা খুশী বল, ক্ষতি নেই, তোমাদের অন্নদাস আমি, সব সহ্য করবো। কিন্তু বৌদির অপমান করো না বল্‌চি, খবরদার্। নিজের মত দুনিয়ার সবাইকে ভেবো না।

রাগে লক্ষ্মীকান্তর চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল। সে কি বলিতে যাইতেছিল,—বাধা দিয়া নীরদ বলিল,—আমি সব জানি। আমার কাছে চোখ রাঙিয়ো না। বেশী বাড়াবাড়ি করো তো রাখালীর স্বামীকে আনিয়ে তাকে দিয়ে চাবুক দেওয়াবো, তোমায়।

লক্ষ্মীকান্ত হতভম্ব হইয়া গেল। রাখালীর কথা নীরদ জানিল কি করিয়া? তবে এ জ্যোতিরই কাজ! বটে!

বেচারী জ্যোতি কিন্তু এ কথা কাহাকেও বলে নাই। সে রাত্রে সে সেই যে পাপের লীলা স্বচক্ষে দেখিয়াছে, রাখালীকে সে তাহা জানিতে দেয় নাই, তা নীরদকে বলিবে কি! বেচারী রাখালী! তাহার প্রাণে কতখানি জ্বালা, সে যে কি আগুনে দিবারাত্র জ্বলিয়া খাক্ হইতেছে, জ্যোতি তাহা সব বুঝিয়াছিল!

রাখালীর কথা নীরদ নিজেই জানিত। পূর্ব্বে দুই চারিবার এ-বাড়ীতে আসিয়া রাত্রে যখন সে আপনার খেয়াল-মত বাড়ীময় ঘুরিয়া বেড়াইত,—তখন উপরের ছাদ হইতে কতদিন সে অমন স্বচক্ষে দেখিয়াছে, নীচে রাখালী ছুটিয়া পলাইতেছে,আর তার পিছনে কুকুরের মত লক্ষ্মীকান্ত তাহাকে তাড়া করিয়া চলিয়াছে। এ-ব্যাপার সে চোখে দেখিয়াও দেখে নাই! কিন্তু তবু রাখালীকে বাঁচানো চাই তো। তাই নীরদই চুপি চুপি রাখালীর স্বামীকে চিঠি লেখে, রাখালীর শরীর এখানে ভালো থাকিতেছে না—সে ওখানে যাইতে চায়! স্বামী আসিয়া রাখালীকে তখন লইয়া যায়। রাখালীর স্বামী

আসিতে নীরদ তাহাকে মানা করিয়া দিয়াছিল, চিঠির কথা যেন সে রাখালীর কাছে প্রকাশ না করে। কারণ, রাখালী তাহা হইলে বড় লজ্জা পাইবে। স্বামীও সে কথা তোলে নাই—কাজেই রাখালী জানিল না, হঠাৎ স্বামী তাহাকে লইতে আসিলেন কেন? না জানুক, সে কিন্তু আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া স্বামীর সঙ্গে চলিয়া গেল।

রাখালী এ-সব বুঝিলেও নীরদ গোপনে খুব সতর্ক দৃষ্টিতে তাহার উপর লক্ষ্য রাখিতেছিল—লক্ষ্মীকান্ত যেন কখনো তাহার ছায়াও না মাড়াইতে পারে!

রাখালীর কোনো বে-চাল এবারে কিন্তু সে লক্ষ্য করে নাই—তবে লক্ষ্মীকান্তকে একদিন চোরের মত রাত্রে এ-দালান ও-দালান করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছিল। অমনি সে একেবারে তাহার সম্মুখে গিয়া বলিল, —রাত্রে শোওনি যে বড়দা? ঘুরে বেড়াচ্ছ?

তাহাতে ঢোক গিলিয়া লক্ষ্মীকান্ত জবাব দিয়াছিল, —বড্ড গরম, ঘুম হচ্ছে না। তাই ঘুরে দেখচি বাড়ীটার কোথাও একটু হাওয়া পাই কি না! এবং কথাটা বলিয়াই নীরদের দ্বিতীয় বাক্য-বাণ গায়ে পড়িবার আগেই সে ক্ষিপ্র চরণে একেবারে বাহিরের বৈঠকখানার দিকে সরিয়া পড়িয়াছিল।

আজ নীরদ রাখালীর প্রসঙ্গ তুলিলে লক্ষ্মীকান্ত ভয়ে এতটুকু হইয়া গেল—এবং ধীরে ধীরে চোরের মত নিঃশব্দে সে ঘর ত্যাগ করিল।

নীরদ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল, তার পর ধীরে ধীরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া নদীর ধারে বেড়াইতে চলিয়া গেল।

## ২০

সেদিন যখন অনেক রাত্রে নীরদ বাড়ী ফিরিল—তখন শরীর কেমন ভার বোধ হইতেছিল, মাথাটাও টিপ-টিপ করিতেছিল। তাই ফিরিয়া কিছু না খাইয়াই সে বিছানায় শুইয়া পড়িল।

এ-কয়দিনে নীরদের প্রতি জ্যোতির একটু-একটু করিয়া কেমন একটা টান হইয়াছিল। এত বড় পাথর-পুরীতে এ পর্য্যন্ত যতগুলা মানুষ সে চোখে দেখিয়াছে, সকলের প্রাণই সে দেখিয়াছে একেবারে পাথরে গড়া—সে প্রাণের সংস্পর্শে আসিলে মানুষ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যায়। কেবল এই নীরদই সৃষ্টিছাড়া প্রকৃতি লইয়া এ-বাড়ীতে আসিয়াছে। প্রাণখানি অসীম দরদে ভরা। এখানে কিসের আকর্ষণেই বা সে আসে? ঐ তো জ্যাঠাইমা! তাহার চরিত্রটা কি আর নীরদের জানা নাই? নীরদের প্রতি মায়ায়-মমতায় জ্যোতির প্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছিল। তাই যতটুকু পারে, নেপথ্যের অন্তরাল হইতে নীরদের খাওয়া-দাওয়ার সে তদ্বির করিত। নীরদ সেটুকু লক্ষ্য করিয়াছিল। ইদানীং খাইতে বসিয়া সে দেখিত, থালাখানি বেশ-মাজা-ঘষা, কোথাও শুষ্ক তরকারী-ব্যঞ্জন বা ডালের ছোপ লাগিয়া নাই! অন্নেও কাহার কোমল-হস্তের স্নেহের ছাপ পড়িয়াছে।

সে রাত্রে নীরদ খাইতে আসে নাই। জ্যোতি সেটুকু নজর করিয়াছিল। কেন আসিল না? কোথায় গেল সে? সে সম্বন্ধে আর কাহাকেও কোন প্রশ্ন সে জিজ্ঞাসা করে নাই। তাহার কারণ ছিল। বাড়ীর যে-রকম চাল,—হঠাৎ তাহাকে বিশেষ করিয়া নীরদের খাওয়া-দাওয়ার সম্বন্ধে দরদ করিতে দেখিলে এখনই হয় তো চারিদিকে একটা কদর্য্য ইঙ্গিতের সাড়া পড়িয়া যাইবে! সকলের আহার শেষ হওয়া পর্য্যন্ত তাই সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তার পর অনেক রাত্রে সকলে শুইতে গেলে জ্যোতি একবার নিজের ঘরের কাছটা ঘুরিয়া আসিল; লক্ষ্মীকান্ত তখনো শুইতে আসে নাই। তখন সে রাখালীর সন্ধানে গেল—গিয়া দেখিল, রাখালীও নিজের ঘরে বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছে। জ্যোতি ডাকিল,—রাখালী—

রাখালী কোন জবাব দিল না—সে অঘোরে ঘুমাইতেছে।

জ্যোতি তখন নীরদের ঘরের দিকে গেল। ঘর অন্ধকার! ও-ধারের একটা খোলা জানলা দিয়া চাঁদের আলো আসিয়া বিছানায় পড়িয়াছে। নীরদ বিছানায় শুইয়া আছে। জ্যোতি ঘরে ঢুকিয়া ডাকিল,—ঠাকুরপো।

নীরদের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে বলিল,—কে? বৌদি!

—হ্যাঁ।

—কেন বৌদি, হঠাৎ এত রাত্রে এখানে যে! কি হয়েচে?

—কিছু না। আজ রাত্রে তুমি খেতে গেলে না?

—শরীরটা তেমন যুৎসই নয়, বৌদি। মাথাটা বড্ড ধরেচে। নীরদ দুই হাতে দুই রগ টিপিয়া উঠিয়া বসিল।

জ্যোতি কাছে আসিয়া নীরদের কপালে হাত দিল। ইস্—কপাল যে একেবারে পুড়িয়া যাইতেছে! রগের শিরগুলা দড়ির মত ফাঁপিয়া দপ্‌দপ্ করিতেছে, গায়ে হাত দিয়া জ্যোতি দেখিল, গাও বেশ গরম,—আগুনের মত।

জ্যোতি বলিল,—তোমার যে বেশ জ্বর হয়েচে, ঠাকুরপো।

—হ্যাঁ, জ্বর একটু হয়েচে, বোধ হয়।

জ্যোতি মৃদু হাসিয়া বলিল,—কি যে বলো ঠাকুরপো! বোধ হয়! এ যে বেশ জ্বর। তুমি শোও দেখি। একটু অডিকলোন নিয়ে আসি।

—তুমি ক্ষেপেচো, বৌদি। কিছু করতে হবে না, ঘুমোলেই এটুকু সেরে যাবে। তুমি ঘুমোও গে।

—না, আমি নিয়ে আসি, তুমি শোও।

—পাগল হয়েচো, বৌদি—আমাদের এ হলো লোহার শরীর।

জ্যোতির বড় দুঃখ হইল। কত দুঃখে যে নীরদ ও কথাটা বলিয়াছে, তাহা সে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিল। জ্যোতি আর দাঁড়াইল না—একেবারে নিজের ঘরে গেল। লক্ষ্মী-কান্ত তখনো শুইতে আসে নাই। জ্রূটা একটু কুঞ্চিত করিয়া জ্যোতি নিজের বাক্স খুলিল—বাক্স খুলিয়া শিশি বাহির করিয়া দালানে আসিল। দালানে আসিতেই সিঁড়িতে লক্ষ্মীকান্তর পায়ের জুতার শব্দ কাণে গেল,—লক্ষ্মীকান্ত উপরে আসিতেছিল।

নীরদের ঘরে কুলুঙ্গিতে একটা এনামেলের পেয়ালা ছিল। ধুইয়া কুঁজা হইতে জল লইয়া পেয়ালায় ঢালিয়া জ্যোতি তাহাতে অডি-কলোন মিশাইল এবং ভিজা কানি ডুবাইয়া নীরদের কপালে পটি লাগাইয়া দিল। নীরদ তখন একেবারে বেহুঁশ হইয়া পড়িয়াছে।

জ্যোতি অডি-কলোন দিয়া নীরদের মাথায় পাখার বাতাস করিতে লাগিল। আর নীরদ জ্বরের ঘোরে অচৈতন্ত পড়িয়া রহিল।

ভোরের দিকে জ্যোতির চোখ ঘুমে ঢুলিয়া আসিল। সারা-রাত্রি পাখা নাড়িয়া হাত দুইটাতেও ব্যথা ধরিয়া গিয়াছিল, তবু সে পাখা ছাড়ে নাই।

নীরদের জ্বর কমিয়া আসিয়াছিল—ঘুম ভাঙ্গিয়া চোখ মেলিয়া সে দেখে, জ্যোতি ঘুমে ঢুলিতেছে! চক্ষু মুদ্রিত; হাত কিন্তু পাখা লইয়া সমানে নড়িতেছে। রাত্রি-শেষের ম্লান ফুলের মতই জ্যোতির মুখ শুকাইয়া উঠিয়াছে। প্রাণ ভরিয়া নীরদ সে মুখখানি দেখিল। একটা সুগভীর বেদনায় নীরদের বুক ভরিয়া গেল—কোনমতে দীর্ঘ-নিশ্বাসকে চাপিয়া সে ডাকিল,—বৌদি—

জ্যোতি চমকিয়া চোখ চাহিয়া অপ্রতিভ হইয়া বলিল,—একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, ভাই।

—ঘুমের আর অপরাধ কি বৌদি! সারারাত্রি জেগে বসে আমায় বাতাস করেচো, সেবা করেচো!

—তাতে কোন দোষ হয়েচে?

—দোষ! কিন্তু রোগ যে এতে আস্পর্দ্ধা পেয়ে আমায় ছাড়তে চাইবে না, বৌদি। বলো কি, রাজার মত এমন সেবা পেলে সে যে আমায় একেবারে পেয়ে বসবে!

—ও সব কথা থাক্। এখন কেমন আছো, বলো দেখি? মাথা ধরা ছেড়েচে?

—তোমার হাতের বাতাসে রোগের সব বালাই পালিয়েচে। যাই, এখন পুকুরে ছুটো ডুব দিয়ে আসিগে, ব্যস, দেখ্‌বে, জ্বরের জড় একেবারে মরে যাবে।

—বটেই তো! তা হবে না ঠাকুরপো। তোমার নাওয়া তো হবেই না, ভাতও আজ খেতে পাবে না, জেনো।

—অর্থাৎ—?

—অর্থাৎ আবার কি!

—আমাকে সাবু খাইয়ে রাখতে চাও নাকি? রাম বলো, বৌদি, আমার জন্মে কখনো আমি সাবুর স্বাদ জানিনে। কেন মিছে ও সব ঝঞ্ঝাট করচো?

—কোন ঝঞ্ঝাট নেই এতে। তুমি উঠো না—বল্‌চি। আমি জল নিয়ে আসচি, তুমি মুখ ধুয়ে সাবুটুকু খাও। তুমি বল্‌চো, জ্বর সেরেচে, কিন্তু তোমার মুখ-চোখ এখনো থম্‌থম্ করচে!

## ২১

সন্ধ্যার দিকে নীরদের জ্বর আবার বাড়িল। জ্যোতি রাখালীকে লইয়া নীরদের সাবু তৈয়ার করিল,—দিনের বেলায় রাখালীকে ভার দিল, নীরদকে চৌকি দিবার জন্য—যেন সে বিছানা ছাড়িয়া এতটুকু না উঠিয়া বেড়ায়। সেও যথাসাধ্য তদ্বির করিল।

জ্যোতি অবাক্ হইয়া গেল, বাড়ীর লোক যে-যাহার দৈনন্দিন কাজ বেশ নিয়ম-মত সারিয়া চলিয়াছে,—অথচ এই যে একটা লোক, বাড়ীময় মুক্ত বায়ু-হিল্লোলের মত যে ছুটিয়া ফেরে, সকলের খবর লয়, সে আজ ঘর হইতে বাহির হইল না কেন—বাড়ীতে রহিল? না, কোথায় চলিয়া গেল,—এটা কাহারো হুঁশ হইল না। এমন কি, নীরদের পূজনীয়া জ্যাঠাইমাটির অবধির সেদিকে খেয়াল নাই!

সন্ধ্যার পর নীরদের জ্বর উঠিল,—১০২। চোখ দুটা জবা-ফুলের মত লাল, মুখ-চোখ বেশ ফুলিয়া রহিয়াছে। জ্যোতির ভাবনা হইল, তাই তো! এ সময় একজন ডাক্তার ডাকা দরকার যে! কিন্তু কাহাকে সে বলিবে? শেষে রাখালীকেই ধরিয়া বসিল। রাখালী বলিল,—তার চেয়ে তুমি বড়বাবুকে বলো ভাই বৌদি, ডিস্‌পেন্সারী থেকে ডাক্তার বাবু এসে দেখে যাবে'খন।

—কেন, তুই বাবাকে বল্ গে যা'না—তার চেয়ে না হয়, পিশিমাকে বল্ গিয়ে।

অভিভাবিকা রমণীটিকে এ-বাড়ীর ছেলে ও বৌ-ঝীয়েরা পিশিমা বলিয়া ডাকে।

রাখালী বলিল,—এ-বাড়ীর দস্তুর কি, তা জানো না, বৌদি। ডিস্‌পেন্সারীতে মাইনে-করা ডাক্তার আছে—অসুখ-বিসুখ হলে তাঁকে খপর পাঠালে তিনি এসে দেখে

যান, ওষুধ দেন। জানো তো, চাকর বাকরগুলোকে আমি যদি ডাক্তার বাবুর কাছে যেতে বলি, তা হলে এইখানেই একটু ঘুরে এসে বলবে'খন, ডাক্তারবাবু আসচেন, বললেন। একটুও গ্রাহ্য করবে না,—তাও আবার অসুখ যখন বাবুদের কারো নয়, গরীব নীরদ-দার!

বেচারী নীরদ! জ্যোতি কিছু না বলিয়া রাখালীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রাখালী বলিল,—ডাক্তারটিও তেমনি। পুবিদ্যের কারো অসুখ হলে তাঁর আর আসবার সময়ই হয় না। সেই জন্যই বল্‌চি, তুমি বড়বাবুকে বলে ডাক্তারকে খপর পাঠাতে বলো, তাহলেই ডাক্তার আসবে। না হলে এ-রাত্রে তাঁর ছায়াও কেউ দেখতে পাবে না। তিনি আবার বড়বাবুর একজন পার্ষচর কি না! কে কি বলে তাঁকে?

জ্যোতি ভাবিল, এ এক মন্দ বিপদ নয়! সেদিনকার সেই ঘটনার পর হইতে লক্ষ্মীকান্তর সঙ্গে কথাবার্ত্তা দূরে থাক্, দেখা করাই সে একরকম ছাড়িয়া দিয়াছে—আজ আবার হঠাৎ এই একটা ফর্‌মাস করিয়া বসিবে? কিন্তু উপায় কি! সে তখন একটা দাসীকে চার-আনা বখ্‌শিসের লোভ দেখাইয়া বড়বাবুর কাছে পাঠাইল,—কহিল,—বল্ গিয়া, বৌদি ডাকিতেছেন, বিশেষ দরকার আছে

সদর হইতে জবাব আসিল,—কি দরকার, জানিয়া আয়। বড়বাবু এখন ব্যস্ত আছেন, আসিতে পারিবেন না।

দাসীর সম্মুখে এ-ভাবে অপমানের খোঁচা খাইয়া জ্যোতির দুই চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইল। সে আর এক মুহূর্ত্ত সেখানে দাঁড়াইল না; রুদ্ধশ্বাসে নীরদের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। নীরদ অচেতন অবস্থায় বিছানায় পড়িয়া আছে, আর রাখালী বসিয়া তাহাকে পাখার বাতাস করিতেছে।

জ্যোতি বলিল,—তুই এবার যা ভাই। কাপড় কাচিস তো কাপড় কাচ্‌গে, তার পর কাপড় কাচা হলে ঠাকুরপোর জন্য একটু সাবু তোয়ের করে নিয়ে আসিস।

রাখালী চলিয়া গেল। জ্যোতি নীরদের মুখের পানে চাহিয়া নিতান্তই হতাশভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সত্যই তো, এ-বাড়ীর লোকগুলা কি সব? অত-বড় জমকালো ভারী দেহগুলার মধ্যে ভগবান কি এক ফোঁটা প্রাণও কাহাকে দেন নাই? আশ্চর্য্য!

রাখালী সাবু লইয়া আসিলে জ্যোতি চাম্‌চেয় করিয়া নীরদকে তাহা খাওয়াইতে বসিল। নীরদ ঘুমাইতে-ছিল। জ্যোতি ডাকিল,—ঠাকুরপো!

চোখ মুদিয়াই নীরদ বলিল,—উঁ!

জ্যোতি বলিল,—এটুকু খেয়ে ফেলো ভাই।

নীরদ চোখ মেলিয়া চাহিল, এবং স্থির দৃষ্টি জ্যোতির মুখে নিবদ্ধ করিয়া ছোট শিশুর মতই সাবুটুকু চামচেয় করিয়া পান করিল।

জ্যোতি তখন রাখালীকে বলিল,—তুই এবার যা। খেয়ে নি গে যা—তুই এসে বসলে তার পর আমি যাবো। এমন রোগীকে একলা ফেলে কোথাও নড়া যায় না।

রাখালী নীরদের কপালে হাত রাখিয়া বলিল,—গা বড্ড গরম ভাই! জ্বরটা বেড়েচে, না?

—হ্যাঁ—বলিয়া জ্যোতি নীরবে বসিয়া রহিল।

অনেক রাত্রে জ্যোতি যা-হয় কিছু মুখে দিয়া নীরদের ঘরে আসিয়া রাখালীকে বলিল,—তুই শুগে যা।

রাখালী বলিল,—তুমি?

—আমি এখন এইখানেই একটু থাকি। তার পর যদি ঘুম পায়, ওকে একটু সুস্থ দেখি, তা হলে তোর কাছে গিয়েই শোবো'খন।

রাখালী ইহাতে কোনরূপ ওজর করিল না। সে জানিত, জ্যোতি যে-রকম একরোখা, তাহার কাছে কোন ওজরই টিকিবে না। কাজেই রাখালী বিনাবাক্যে শুইতে গেল, আর জ্যোতি পূর্ব্ব-রাত্রির মতই বিছানায় নীরদের শিয়রে বসিয়া তাহার মাথায় জল-পটী দিতে লাগিল।

## ২২

রাত্রি তখন গভীর। দুই রাত্রির পরিশ্রমে জ্যোতির অত্যন্ত ক্লান্তি ধরিয়াছিল। ঘুমে দুই চোখ আচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছিল। পাখা নাড়িতে নাড়িতে কখন্ যে তাহার শ্রান্ত শির নীরদের বালিশের এক কোণে হেলিয়া পড়িয়াছে, সেদিকে তাহার একটুও হুঁশ ছিল না। হঠাৎ মাথায় একটা প্রবল আঘাত পাইয়া তাহার ঘুম একেবারে ছাড়িয়া গেল। সে উঠিয়া বসিল। ভয়ে ধড়্‌মড়িয়া বসিয়া চোখ চাহিয়া সে দেখে, সম্মুখে দাঁড়াইয়া লক্ষ্মীকান্ত।

লক্ষ্মীকান্ত বলিল,—বেরিয়ে এসো। শীগ্‌গির।

জ্যোতি নীরদের পানে চাহিল,—সে তখন ঘুমাইতেছে। পাছে লক্ষ্মীকান্ত চীৎকার করিয়া ওঠে এবং তাহার সে-চীৎকারে পাছে নীরদের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, এই ভয়ে জ্যোতি নিঃশব্দে লক্ষ্মীকান্তর অনুসরণ করিল।

লক্ষ্মীকান্ত সবলে একেবারে জ্যোতির হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে নিজের ঘরে একরূপ টানিয়া লইয়া আসিল, তার পর ঘরের দ্বারটা ভেজাইয়া বলিল,—সাধ্বী সতী পুণ্যবতী, ও-ঘরে এত রাত্রে শুয়ে ছিলে কেন, শুনতে পাই?

জ্যোতি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। চোরের

মত এই টানাটানি,—তাহার উপর এই ইতর ইঙ্গিত! অসহ্য জ্বালায় তাহার মাথা ঝনঝন্ করিয়া উঠিল।

লক্ষ্মীকান্ত তাহার হাত ধরিয়া প্রবল একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিল,—বলো, বলচি।

এই নীচ ইতর সন্দেহে জ্যোতি একেবারে এতটুকু হইয়া গিয়াছিল,—দারুণ ধিক্কারে তাহার প্রাণ ভরিয়া উঠিল। সে বলিল,—নীরদ ঠাকুরপোর অসুখ করেচে। তাহার স্বর বেশ শান্ত!

লক্ষ্মীকান্ত হাসিয়া বলিল,—নীরদের উপর ভারী দরদ দেখচি যে। এ-ঘরে না শুয়ে একেবারে নীরদের বিছানায় গিয়ে তার পাশে শোয়া হয়েচে!

জ্যোতির মনে হইল, ঐ বর্ব্বর হাসিটায় এখনই যদি সে আগুন ধরাইয়া দিতে পারিত! অভদ্র, ইতর, নীচ! রুদ্র দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ স্বামীর পানে চাহিয়া সে চোখ নামাইল; তার পর ধীরে ধীরে বলিল,—চুপ করো। লজ্জা হচ্ছে না তোমার, ঐ-সব কথা বলতে?

লক্ষ্মীকান্ত হুঙ্কার দিয়া উঠিল,—কিসের চুপ! কিসের লজ্জা! ওঃ, উনি আবার চোখ রাঙাচ্ছেন! পথের কুকুরকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনে মাথায় তোলা হয়েচে কি না,—তাই অহঙ্কারে ধরাকে অমনি সরা দেখেচেন!—ছোটলোক, ছুঁচো, যা মন চাইবে, তাই করবি, বটে!

দুই চোখে আগুন ভরিয়া জ্যোতি বলিল,—খবর্দ্দার! ইতরুমি করো না, বলচি!

লক্ষ্মীকান্তর গর্জ্জন সমানে চলিল,—ওঃ—ইতরুমি! ভারী লম্বা কথা মুখে!···কাল সকালে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে উল্টো গাধায় চড়িয়ে যদি না তোকে বিদেয় করি, তাহলে আমার নামই লক্ষ্মীকান্ত নয়।

জ্যোতি বলিল,—বেশ, তাই করো। কিন্তু দোহাই তোমার, যত মন্দই আমি হই, একদিন আমাকে বিয়ে করে এনেচো—স্ত্রী বলেও মেনেচো। তোমার পায়ে ধরে বল্‌চি, আর এ রকম চীৎকার করো না। আমি এ বাড়ীতে এক মুহূর্ত্ত থাক্‌তে চাইনে—নিজেই বিদেয় হয়ে যাবো। কিন্তু এই রাত্রে আর এ-রকম চীৎকার করো না, ওদিকে বাবা আছেন, সেটাও মনে রেখো। আমি যা-ই হই, তুমি বাড়ীর বড়বাবু, তোমার তো একটা ইজ্জৎ আছে। সকলে তোমাকেও ছি-ছি করবে।

—থাম্। তুই আর আমাকে লেকচার দিস্‌নে।

—বেশ, আমি চুপ কর্‌চি। তুমিও একটু চুপ করো। কাল এ-বাড়ী থেকে চলে যেতে পেলে আমি কৃতার্থ হবো।

···তা হবেই তো! তোমার এখন পাখা উঠেচে! তাই যেয়ো—ব্যবসা করবে! মোদ্দা আজ রাত্রে এই ঘরে বন্দী থাকো। কাল সকালে আমি তোমার গতি করছি।

জ্যোতির মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত টলিতেছিল। সে দাঁড়াইতে পারিল না, থপ করিয়া মেঝের উপর বসিয়া পড়িল।

লক্ষ্মীকান্ত সশব্দে ঘরের দ্বার ভেজাইয়া বাহির হইয়া গেল। একটু পরেই বাহিরের দালানে চীৎকার উঠিল,—রাস্কেল, নেমকহারাম, কুকুর···এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা গুরু-বস্তু পতনের শব্দ শুনা গেল।

যে-ভয়ে জ্যোতি এত-বড় অপমান নীরবে মাথা পাতিয়া সহিয়াছিল, একটি কথা কহে নাই, বুঝি তাহাই ঘটিল গো! ধড়মড়িয়া উঠিয়া সে দালানে ছুটিয়া গেল। যে ভয় সে করিয়াছিল, তাই! নীরদ দালানে ভূমিতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে,—আর তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া লক্ষ্মীকান্ত দৈত্যের মত ফুঁশিতেছে।

জ্যোতি ঝড়ের মত সেখানে গিয়া পড়িল; সবলে লক্ষ্মীকান্তকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিল; এবং নীরদের মাথা আপনার কোলে তুলিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল।

গোলমাল শুনিয়া রাখালী সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া জ্যোতি বেশ শান্ত অকম্পিত স্বরে বলিল,—একটু জল এনে দে না ভাই! ঠাকুরপো অজ্ঞান হয়ে গেছে। এই জ্বরে এতটা চলে এসেচে!

রাখালী জল আনিয়া দিলে জ্যোতি নীরদের মুখে চোখে জলের ঝাপ্‌টা দিতে লাগিল।

লক্ষ্মীকান্ত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—জ্যোতির কাণ্ড দেখিয়া সে অবাক্ হইয়া গিয়াছিল।

রাখালী বলিল,—আপনি শুতে যান, বড়দা। নীরদ-দার জ্ঞান হলে আমরা দুজনে ওঁকে ধরে তুলে নিয়ে যাবো'খন।

রাখালীর এ কথায় লক্ষ্মীকান্ত মন্ত্র-চালিতের মত ধীরে ধীরে আপনার ঘরে চলিয়া গেল।

## ২৩

শেষ রাত্রে নীরদ উঠিয়া আপনার ঘরে চলিয়া গেলে জ্যোতি রাখালীর সঙ্গে রাখালীর ঘরে গিয়া ঢুকিল। রাখালীর কাছে জ্যোতি রাত্রের কাণ্ড খুলিয়া বলিলে রাখালী বলিল,—সব কথা খুলে বল্‌লে না কেন? মিছিমিছি এই অপবাদে···

জ্যোতি বলিল,—কার কাছে খুলে বলবো, রাখালী? নিজের মত দুনিয়ার সকলকে যে দেখে, সেই শয়তানের কাছে? মাপ কর্ ভাই, শাস্ত্রে বলেচে, স্বামী স্ত্রীলোকের দেবতা। শাস্ত্র আমার মাথায় থাকুন, দেবতার দাম এত শস্তা হলে তাঁকে মানা আমার পক্ষে শক্ত হবে।

রাখালী বলিল,—কাল কর্ত্তাবাবুর কাছে যখন সব কথা উঠবে, তখন বল্‌বে তো?

জ্যোতি বলিল,—তাঁর কাছে কি এ কথা উঠবে, ভাবিস্? কে তুল্‌বে? কোন্ কথা?

রাখালী বলিল,—ঐ যে বড় বাবু বল্‌ছিলেন, সকালে তোমায় অপমান করে বাড়ীর বার করে দেবেন!

জ্যোতি বলিল,—ক্ষেপেচিস্‌। বড়বাবুর সাধ্য কি! ফাকা আওয়াজকে ভয় করিস্‌ তুই? তোর বড়বাবুর সে সাহস যদি থাক্‌তো, তাহলে নিজের বাড়ীর মধ্যে বসে অত-বড় পাপ—

এই অবধি বলিয়াই রাখালীর মুখের পানে চোখ পড়িতে জ্যোতি থমকিয়া থামিল। রাখালীর মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছিল।

জ্যোতি বলিল,—এ-বাড়ীর সকলেই সকলকে ভয় করে। কারো দোষের কথা মুখ ফুটে বল্‌তে কেউ সাহস করে না, পাছে পাল্টা জবাব শুন্‌তে হয়! সত্যি বলে বিশ্বাস করলেও বড়বাবু ও-কথা আর-কারো কাছে গলা ছেড়ে বল্‌তে পারবে, ভাবিস্‌? কখনো না। ওঁর ভয় নেই,—আমি যদি ওঁর কথা প্রকাশ করে বলে দি?

রাখালীর সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। ওঁর কথা! সে কথায় তাহারো কত-বড় কলঙ্ক, প্রাণের কতখানি রক্ত মেশানো আছে! প্রায় কাঁদ-কাঁদ স্বরে সে ডাকিল—বৌদি—

জ্যোতি সে স্বরে মিনতির সুস্পষ্ট আবেদন শুনিল। জ্যোতি বলিল,—ভয় নেই রাখালী। আমি কোন কথা কাকেও বল্‌বো না। আমায় যদি সত্যি বিনা-অপরাধে এই এত বড় অপমান, এত বড় শাস্তি মাথায় নিয়ে এ-বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হয়, মুখ টিপে সে অপমান আমি মাথায় নিয়েই যাবো, তবু তোর সুখ-দুঃখ যে-কথায় জড়ানো আছে, এমন কথা আমার মুখ থেকে কখনো বেরুবে না। কাল সকালে ঝাঁটা মার্‌তে মার্‌তে আমাকে যদি বিদেয় করে দেয়, তবুও না।

রাখালী চুপ করিয়া রহিল। তাহার মনে হইল, জ্যোতির প্রাণে যতখানি শক্তি আছে, তাহার একটুকুরাও যদি রাখালীর থাকিত! এই দুর্ব্বলতার জন্যই মিথ্যা কলঙ্কের ভয়ে সে আপনার কি সর্ব্বনাশই না করিয়াছে!

জ্যোতি বলিল,—কিন্তু আমার একটা কথা তোকে রাখতে হবে, রাখালী। আমি যেদিন এ-বাড়ী ছেড়ে চলে যাবো, বল্‌, তুইও সেদিন যেমন-করে পারিস্‌ তোর স্বামীর কাছে চলে যাবি? স্বামী যদি ঘরে না থাকে, তবুও তোকে এ-বাড়ী ত্যাগ করে যেতে হবে। তা যদি না পারিস্‌, তাহলে ও-রকম করে নিজের সর্ব্বনাশ করবি! ও শয়তানের ছায়া মাড়ালেও তোর স্বামীর অকল্যাণ হবে, এ তুই ঠিক জানিস্‌। একটা মিথ্যার ভয়ে এক-জনের কত-বড় বিশ্বাসকে তুই কি ভাবে গলা টিপে-টিপে মার্‌চিস্‌, তা বুঝচিস্‌ না? এতই বা কি ভয়! তুই যদি একদিন মাথা তুলে দাঁড়াতিস্‌, তাহলে দেখতিস্‌, ঐ শয়তান ভয়ে কেঁচোর মত জড়সড় হয়ে পড়তো। পাপ যত বড় দম্ভ করে বেড়াক্‌, তার মত কাপুরুষ পৃথিবীতে আর কেউ নেই—এ নিশ্চয় জানিস্‌!

রাখালী কাঁদিয়া ফেলিল, কাঁদিয়াই বলিল,—আমি কালই এখান থেকে চলে যাবো বৌদি, তুমি তার ব্যবস্থা করে দাও। সেখানে আমার নিজের ঘরে কাকেও আমি ভয় করি না। একলা—কিসের তাতে ভয়?

জ্যোতি বলিল,—কে নিয়ে যাবে? নীরদ ঠাকুরপো যদি ভালো থাক্‌তো, তাহলে ওকে বল্‌তুম, তোকে রেখে আসবার জন্য। কিন্তু ওর ঐ জ্বর—তার উপর তোর বড়বাবু নিশ্চয় ওকে ধরে মেরেচে!

তার পর জ্যোতি নিজের মনেই বলিতে লাগিল—পাছে ঐ-সব সন্দেহের কথার একটা টুকরো ও-বেচারীর কাণে যায়, সেই ভয়ে আমি নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। তবু পারলুম না ও বেচারীকে এই অসুখ শরীরে ঐ-সব জঘন্য আলোচনা থেকে রক্ষা করতে! আমার ভয় হচ্ছে…

রাখালী বলিল,—কি ভয়, বৌদি?

জ্যোতি বলিল,—না, থাক্‌। সে তোর শুনে কাজ নেই।

জ্যোতি চুপ করিল—আর কোন কথা কহিল না। একরাশ নক্ষত্র আকাশের গায়ে ফুটিয়া আছে। চাঁদের আলোয় নক্ষত্রেরা সভা সাজাইয়া বসিয়া নির্নিমেষ-নয়নে পৃথিবীর পানে তাকাইয়া আছে।

অনেকক্ষণ আকাশের পানে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে জ্যোতির দুই চোখ যেন কি এক কৌতূহল-তৃপ্তির আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল! তার মনে হইল, নক্ষত্রগুলা যেন নীচে এই পৃথিবীতে মানুষের বীভৎসতা দেখিয়া শিহরিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে—পৃথিবীর এই দূষিত বাষ্প আকাশে উঠিয়া পাছে ঐ শুভ্র নিখিল আকাশটাকে ঘোলা করিয়া দেয়, এই ভয়ে নক্ষত্রের দল ম্লান-মুখে বসিয়া আছে! একটা বড় রকমের নিশ্বাস ফেলিয়া জ্যোতি রাখালীকে বলিল,—একবার যা তো ভাই, দেখে আয় দিকিন্‌, নীরদ ঠাকুরপো কি করচে!

রাখালী চলিয়া গেল; মুহূর্ত্ত-পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—নীরদ-দা ঘরে নেই, বৌদি!

—সে কি! জ্যোতির আপাদ-মস্তক কাঁপিয়া উঠিল। —সে কোথায় যাবে? চ' দেখি!

দুইজনে আতি-পাতি করিয়া বাড়ীময় খুঁজিল—নীরদ নাই। আবার দুইজনে তাহার ঘরে গেল—দেখিল, বালিশের তলায় একখানা চিঠি রহিয়াছে। জ্যোতি তাড়া-তাড়ি চিঠিখানা খুলিল,—তাহারই নামে চিঠি। চিঠিতে লেখা আছে,—

শ্রীচরণেষু

বৌদি, আমি চলিলাম। এ বাড়ীতে থাকার চেয়ে পথে পড়িয়া মরাও ভালো। আমার জন্য এত-বড় দুর্নাম তোমাকে বহিতে হইল! কি আর বলিব, মাথার উপর ভগবান্ আছেন, তিনি জানেন, ছেলেবেলায় মা হারাইয়াছি, তোমাকে পাইয়া মা পাইয়াছিলাম। তুমি কিন্তু স্বামীর ব্যবহারে ধৈর্য্য হারাইয়ো না। তোমার অধিকার বেশ প্রাণপণ-শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করো। এ-বাড়ীর জঞ্জাল সাফ করিবার ভার তোমার উপর। তুমি ধৈর্য্য হারাইয়া যদি সে ভার না নাও, তবে মাথার উপরে যিনি আছেন, তাঁহার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হইবে। দিন পাইলে দেখা দিব। আমার জন্য ভাবিয়ো না। সরকারী হাসপাতাল থাকিতে নীরদ বিনা-চিকিৎসায় পথে পড়িয়া মরিবে না। তাহার উপর তোমার করুণা, তোমার স্নেহ—পৃথিবীতে তাহার বাঁচিবার সাধ অনেকখানি বাড়াইয়া দিয়াছে।

স্নেহানুগত

নীরদ।

জ্যোতির দুই চোখ বহিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। রাখালী বলিল,—কি ভাই?

—যা ভয় করেছিলুম রাখালী।...সে চলে গেছে।

—এই অসুখ-শরীরে?

—হ্যাঁ। ভগবান্ তাকে রক্ষা করুন।

## ২৪

পরদিন মস্ত সুযোগ মিলিল। লক্ষ্মীকান্ত যখন দেখিল, নীরদ বাড়ী হইতে সরিয়া পড়িয়াছে, তখন তাহার বুকখানা দশ হাত বাড়িয়া উঠিল। সে তখনি বামাকালী দেবীর কাছে গিয়া বধূর নামে যা-তা নালিশ রুজু করিল। শেষে বলিল,—তুমি জানো না পিশিমা, ঐ বৌটো বেচারী নীরদকে বাড়ী-ছাড়া করেচে। কাল স্বচক্ষে আমি দেখেচি,নীরদ ঘুমোচ্ছে, আর তার বিছানায় শুয়ে তোমাদের ঐ বৌ! নীরদ কলেজে পড়চে, ভালো ছেলে, এ-সব কাঁহাতক বরদাস্ত করে, বলো তো!

শুনিয়া বামাকালী দেবী রাগিয়া উঠিলেন। এমন সোনার চাঁদ স্বামী ঘরে থাকতে হা-ঘরের বাড়ীর মেয়ে তাঁহার শ্বশুর-কুলের শিবরাত্রির সলিতাটুকুর উপর এমন জুলুম করিতেছে! লক্ষ্মীকান্তকে তিনি আশ্বাস দিয়া চুপ করিয়া থাকিতে বলিলেন,—আরো আশ্বাস দিলেন, তিনিই এ ক্ষেত্রে দণ্ডমুণ্ডের ব্যবস্থা করিবেন!

বামাকালী দেবী বৌয়ের ঘরে গেলেন, জ্যোতি সাখানে নাই। জ্যোতি রাখালীর সঙ্গে পুকুরে কাপড় কেচিতে গিয়াছিল। ভিজা কাপড়ে সর্ব্বাঙ্গের রূপটাকে কালো-মেঘে-ঢাকা জ্যোৎস্নার মত লুকাইয়া সে যখন বাড়ী ঢুকিল, তখন বামাকালী দেবী উপরের জানালা হইতে হাঁকিলেন,—বৌমা, একবার ওপরে এসো দিকিনি বাছা।

বামাকালী দেবীর রুক্ষ মুখ দেখিয়া জ্যোতি কাঁপিয়া উঠিল।

সেই ভিজা কাপড়েই সে একেবারে তাঁহার সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল। বামাকালী দেবী বলিলেন,—নীরদ কোথায় গেছে, জানো?

—ঠাকুরপো চলে গেছে পিশিমা।

—কেন? হঠাৎ সে-ছেলে কাউকে কিছু না বলে বাড়ী ছেড়ে চলে গেল কেন?

—তা আমি কি করে জানবো?

—কাল রাত্রে তুমি কোথায় শুয়েছিলে?

জ্যোতি কোন জবাব দিল না। এ-সব কথা লইয়া এই এক-বাড়ী দাসী-চাকরের সম্মুখে ইতরের মত আলোচনা করায় তাহার এতটুকু রুচি ছিল না। করিতে মাথা যেন কে একেবারে কাটিয়া দেয়!

বধূর স্তব্ধতা বামাকালী দেবীর ক্রোধাগ্নিতে ঘৃতাহুতির কাজ করিল। তিনি চোখ দুইটাকে পাকাইয়া বলিলেন,—বলো।

—কাল ঘরে শুইনি।

—কেন? রাত্রে কোথায় ছিলে?

জ্যোতি একটু কঠিন স্বরেই বলিল,—শুধু কাল কেন, পরশু রাত্রেও ঠাকুরপোর বড্ড অসুখ করেছিল, তাই আমি তার কাছেই ছিলুম।

—অসুখ! নীরদের অসুখ! সে আবার কবে হলো? আমি জান্‌লুম না, বাড়ীর কেউ জান্‌লে না, তার অসুখ হলো!

—পরশু থেকে তার খুব জ্বর হয়েচে। কাল ভাত খায় নি, একটু সাবু খেয়ে নিজের ঘরেই পড়ে ছিল।

—ও সব কাণ্ড চলবে না বৌমা, এ বাড়ীতে। সে বেচারী মা-বাপ-মরা ছেলে, আমার কাছে দু'দিনের জন্য জুড়ুতে আসে, তার উপর নজর দেওয়া!

জ্যোতির সহ্য হইল না! সে বেশ রূঢ় স্বরেই বলিল,—পিশিমা—

পিশিমা বলিলেন,—চোখ রাঙাও তুমি আমাকে? ভেবেছিলুম, কিছু বল্‌বো না, একটা ভুলচুক করে ফেলেচে, ছেলেমানুষ,—তা তার জন্যে কোথায় নীচু হবে, না চোখ রাঙাও?

—কিসের ভুল-চুক পিশিমা? আমি কোন ভুল বা কোন অন্যায় করিনি। কে আপনাকে বলেচে, শুন্‌তে পাই?

—কে আবার বলবে গো! যার বুকের ওপর

হাঁড়ি চড়েচে, সে-ই বলেচে। তা শোনো বাছা, আমার পষ্ট কথা,—এ-বাড়ীতে ও-সব রীত চলবে না। নিজের বাপের বাড়ীতে গিয়ে যা-ইচ্ছে তাই করো গে।

জ্যোতি বলিল,—আমিও তাই যাবো, ভেবেছিলুম। এ-বাড়ীতে আমার আর পোষাচ্ছে না। দিনে-দুপুরে সতীদের এত তেজ, সে এ-বাড়ীরই থাক! এ-বাড়ীর রীতটা আমি যেমন হাড়ে হাড়ে বুঝেচি—এমন আর কেউ বোঝেনি। ঠিক বলেচ পিশিমা, এ-বাড়ীর রীত আমার সহ্য হবে না!

—কি! আবার মুখের উপর চোপা! বটে, আজই তোমার পথ দেখাচ্ছি।

বামাকালী দেবীর রায় তদ্দণ্ডে বাহির হইয়া গেল।

জ্যোতি আসিয়া হাসিয়া রাখালীকে জড়াইয়া ধরিল, বলিল,—আমি আজ চললুম, ভাই।

—সে কি বৌদি?

—হ্যাঁ। পিশিমা সাফ জবাব দিয়েচে।

—আমার দশা কি হবে, ভাই?

—শোন্ রাখালী, যদি নিজের ভালো চাস্, তাহলে এখনি তোর স্বামীকে চিঠি লেখ্, তোকে নিয়ে যাবার জন্যে। এখানে আর থাকিস নে! যে ক'দিন দায়ে পড়ে থাকতে হবে, সে ক'দিন ঝীয়েদের কারুকে, সঙ্গে সঙ্গে রাখিস। তারা মেয়েমানুষ। মেয়েমানুষ যত খারাপ হোক, আর-একজন মেয়েমানুষের সর্ব্বনাশ কখনো দাঁড়িয়ে চোখ মেলে দেখতে পারে না।

## ২০

জ্যোতি একজন দাসীর সঙ্গে বাপের বাড়ীতে আসিল। জ্যোতির ঐশ্বর্য্যে পাড়ার যে-সব লোক হিংসায় ফুলিত, তাহারা জ্যোতিকে এমন-একজন দাসীর সঙ্গে সহসা এখানে আসিতে দেখিয়া অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া উঠিল। সেবার জ্যোতি আসিয়াছিল—সঙ্গে ছিল দ্বার-বান্, দাসী, চাকর—কি সে রাণীর হাল! আর এবার সে আসিল সঙ্গে শুধু একটা দাসী। তা'ও বাক্স-পেঁটরার বোঝা সঙ্গে নাই—এক বস্ত্রে! ব্যাপার কি?

বড়লোকের বাড়ীর দাসীকে সোহাগ জানাইয়া কথাটা তাহারা বাহির করিয়া ফেলিল। তার পর সমাজের বুকে কালো মেঘ ধীরে ধীরে পাকিয়া বেশ ঘন হইয়া উঠিল এবং জ্যোতি আসিবার চার-পাঁচদিন পরেই সে মেঘ গুরু-গম্ভীর গর্জ্জনে হুঙ্কার তুলিয়া সাড়া দিল। পাড়ার চণ্ডীমণ্ডপে তখন ভট্টাচার্য্যের তলব পড়িল।

ভট্টাচার্য্য আসিলে সকলে বলিল, কুলটা কন্যাকে ঘরে ঠাঁই দিলে তাঁহাকে সমাজ ছাড়িতে হইবে।

ভট্টাচার্য্য কহিলেন,—কিন্তু জ্যোতির কোন দোষ নাই।

সমাজপতির দল বলিল, অসম্ভব কথা। অমন রূপসী যুবতী স্ত্রীকে কোনো স্বামী কোনো কালে হঠাৎ অমনি ছাড়ে হে বাপু?

জ্যোতির মুখে ভট্টাচার্য্য সমস্ত ব্যাপার যেমন শুনিয়াছিলেন, খুলিয়া বলিলেন। সমাজপতিরা নীরদের নামটা পাইয়া আনন্দে নাচিয়া উঠিল, আরে, নীরদকে বাঁচাইতে জ্যোতি দু' কথা বলিবেই তো!

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, কিন্তু নীরদ জ্যোতিকে মা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে, নীরদের লেখা একখানা পত্রও জ্যোতির কাছে আছে। ইচ্ছা করিলে সমাজ সে পত্র দেখিতে পারেন।

সমাজপতি-জুরির দল গোড়া হইতেই এমনি বাঁকিয়া রহিলেন যে, ভট্টাচার্য্যের সহস্র কাতর অনুনয় এবং অশ্রু-সজল যুক্তি নিবেদনে কিছুতেই সিধা হইলেন না! তখন একবাক্যে রায় বাহির হইল, সমাজ ও কন্যা দুই লইয়া ভট্টাচার্য্য থাকিতে পাইবেন না—একটিকে লইলে অপরটিকে ত্যাগ করিতেই হইবে। তবে দয়া করিয়া সমাজপতির দল ভট্টাচার্য্যকে দুই দিন সময় দিলেন,—দুই দিন পরে ভট্টাচার্য্য আসিয়া আপনার অভিপ্রায় জানাইলে সমাজপতিরা সেই অভিপ্রায়ের মর্ম্মে রায় সহি করিবেন।

গৃহে ফিরিতে ভট্টাচার্য্য জ্যোতিকে সম্মুখে দেখিলেন। অমনি সমস্ত লাঞ্ছনা আর অপমানের ঝাল তাহার অঙ্গে নিক্ষেপ করিয়া ভট্টাচার্য্য কহিলেন,—কালামুখী মেয়ে, পারোনি ডুবে মরতে! ঐ মুখ নিয়ে আমার সর্ব্বনাশ করতে এখানে এলে কেন?

শ্বশুর-বাড়ীর অপমানে একেই জ্যোতি মুষড়াইয়া ছিল, তাহার উপর স্নেহময় পিতার মুখে এই ভাষা শুনিয়া সে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। মধুসূদন বাকিয়া গৃহাভ্যন্তরে ঢুকিতেই জ্যোতি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

বাহির হইয়া সে গেল একেবারে নদীর ঘাটে। বৈকালের দিকে নদীর ঘাটে লোক ছিল না। জলের বুকে অস্তগামী সূর্য্যের বর্ণচ্ছটা পড়িয়া সমস্ত জলটাকে রক্তময় করিয়া তুলিয়াছিল। সেই রক্ত-বরণ জল দেখিবামাত্র জ্যোতির মাথার রক্তও নাচিয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে জলে নামিল। একরাশ অভিমান বুকের মধ্যে ভীষণরূপে তাল পাকাইয়া উঠিতেছিল।

এক-গলা জলে নামিয়া জ্যোতি ভাবিল, আর কেন! এই তো পৃথিবী, ইহাতে বাঁচিয়া থাকিয়া কি ফল! মানুষের জন্য মানুষের এখানে এক তিল দরদ নাই! অহঙ্কার আর স্বার্থ এখানে শুধু মত্ত নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে! স্বামীর

কথা ছাড়িয়া দিই—সে পর! সে তো আর হাতে করিয়া জ্যোতিকে মানুষ করে নাই—জ্যোতির মনের পানে একদিনও ভালো করিয়া চাহিয়া দেখে নাই! সে জ্যোতিকে চিনিবে কিরূপে? কিন্তু বাপ—যাহার হাতে সে মানুষ হইয়াছে, যে তাহার মনের অলি-গলির সকল বার্ত্তাই জানে, সেই বাপ, সে-ও আজ এত বড় বিপদে নিরপরাধ অসহায় তাহাকে এ-ভাবে ঠেলিয়া দিল। একবার ভাবিল না, জ্যোতি এখন এ বিপদে দাঁড়াইবে কোথায়? তবে আর কাহার মুখ চাহিয়া বাঁচিয়া থাকা!

কিন্তু এই জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে মরিবার সময় এক জনকে দেখিতে সাধ হয়! যে একটি ব্যক্তির প্রাণে সে গভীর সমবেদনা, অকৃত্রিম সহানুভূতি দেখিয়াছিল,—পর হইয়াও পরের দুঃখে এমন দরদী,—যে দরদে এতটুকু স্বার্থের নাম-গন্ধ নাই। সে যে তাহাকে কত আশ্বাস দিয়াছিল,—অতি-বড় দুঃখেও তাহার কাণে আশার গান গাহিয়াছিল। আজ মরিবার সময় দেখা পাইলে তাহাকে যদি সে বলিতে পারিত, ভাই ঠাকুরপো, ধৈর্য্য রাখিতে পারিলাম না তো! একটার পর আর-একটা বিপদ আসিয়া আমার সকল বাঁধ চুরমার করিয়া ভাঙ্গিয়া দেয়! আজ ভগবানের মত সেই দরদী বন্ধু নীরদকে কাছে পাইলে সমস্ত বুঝাইয়া তাহার অতখানি দায়িত্বের বাঁধন কাটিয়া যাইতে পারিলে যেন তাহার আর কোন দুঃখ থাকিত না!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া জ্যোতি জলে ডুব দিল।

## ২৬

সমাজপতিদের মজলিসের এককোণে একটি লোক চুপ করিয়া বসিয়াছিল,—কোনো কথা কহে নাই। মধুসূদন ভট্টাচার্য্য চণ্ডীমণ্ডপ ছাড়িয়া বাহিরে আসিলে সে লোকটি অলক্ষ্যে ভট্টাচার্য্যের অনুসরণ করে; এবং ভট্টাচার্য্য বাড়ী ঢুকিলে বাড়ীর বাহিরে সে দাঁড়াইয়াছিল—তার পর ক্ষণেকের জন্য একটু অন্যমনস্ক হইয়াছিল। হুঁশ হইলে সে দেখিল, জ্যোতি অতি দ্রুতপদবিক্ষেপে নদীর দিকে চলিয়াছে—সে লোকটিও তখন অলক্ষ্যে থাকিয়া জ্যোতির অনুসরণ করিল।

জ্যোতি যখন জলে ডুব দিল, ততক্ষণে সে সিঁড়ির উপর ধাপে আসিয়া পড়িয়াছে। জ্যোতিকে ডুব দিতে দেখিয়া লোকটি ত্বরিতে আসিয়া জলে ঝাঁপ দিল এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে জ্যোতিকে ধরিয়া টানিয়া তীরে তুলিল। জ্যোতি তখনো তলাইয়া যায় নাই—অচেতন হইয়া পড়িয়াছিল মাত্র। টানাটানির বেগে জ্যোতির সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। চোখ চাহিয়া সে দেখে, সম্মুখে দাঁড়াইয়া হেমন্ত। সূর্য্য তখন নদীর ও-পারে ঘন বনের অন্তরালে নামিয়া পড়িয়াছে।

জ্যোতি বলিল,—কেন হিমুদা আমার সর্ব্বনাশ করচো?

হেমন্ত বলিল,—তুমি মরবে কেন, জ্যোতি?

—বেঁচে আমার লাভ! কিসের আশায় বাঁচবো?

এ কথার জবাব হেমন্ত চট্ করিয়া দিতে পারিল না।

জ্যোতি বলিল,—আমায় ছেড়ে দাও, আমি বাঁচতে চাই না।

হেমন্ত বলিল,—তোমার মরা হবে না জ্যোতি। যদি মরতে চাও, বেশ, আগে আমি যাই, তার পর তোমার যা খুশী হয়, করো। আমার চোখের সামনে আমি তোমায় মরতে দিতে পারবো না।

—হিমুদা, তুমি অন্যায় করচো। তুমি জানো না, পৃথিবীতে আমার কোথাও আশ্রয় নেই। আমার স্বামী মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আমায় তাড়িয়ে দিয়েচে। আর এখানকার সকলে সেই অপবাদকে বড় করে ধরে আমার নির্ব্বাসন চেয়েছে।

—তোমার স্বামী?

—কাটা ঘায়ে আর নুণের ছিটে দিয়ো না হিমুদা।

—চুলোয় যাক্ সমাজ, জ্যোতি। তুমি যদি এভাবে আত্মহত্যা করো, তাহলে সমাজ শুধু যে মস্ত আস্ফালন করবে, তা নয়,—সমাজ এতে ভয়ঙ্কর প্রশ্রয় পাবে, তাব আস্পর্দ্ধাও এতে আরো বেড়ে যাবে।

—যাক্। আমার তাতে কোনো ক্ষতি নেই!

—জ্যোতি, আমার মিনতি, এ সঙ্কল্প ছেড়ে দাও! কোথাও তোমার আশ্রয় না থাকে যদি, আমার ঘর আছে।

—তোমার ঘর! চকিতে কোন্ অতীতের যবনিকা তুলিয়া কবেকার সেই একটা দৃশ্য জ্যোতির মনে জাগিয়া উঠিল। সেই ঘর! তাহার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিল।

হেমন্ত বলিল,—জ্যোতি, একদিন তুমি আর আমি কত কাছাকাছি ছিলুম। তার পর দিনে দিনে কি দীর্ঘ ব্যবধান এসে আমাদের কত তফাতে আজ ফেলে দিয়েছে—প্রকাণ্ড সাগরের ব্যবধান! দু'জনে এই সাগরের দুই-পারে দাঁড়িয়ে কি শুধু দু'জনের মুখের পানে চেয়ে থাকবো, জ্যোতি?

হেমন্তর গলার স্বর এইখানটায় ভারী হইয়া উঠিল। সে গদ্‌গদ-স্বরে বলিতে লাগিল,—তুমি জেনো জ্যোতি, আজ আমার মাথার উপর বাপের কঠোর শাসন নেই। এই সমাজের কাছ থেকে তুমি কি পেয়েচো? শুধু অবহেলা, আর অপমান। এসো জ্যোতি, দু'জনে হাত-ধরাধরি করে এই লক্ষ্মীছাড়া সমাজটাকে দুই পা দিয়ে মাড়িয়ে আমাদের প্রাণের গান গেয়ে যাই।

জ্যোতি নির্ব্বাক্ দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনে হইতেছিল, মরণের তীর হইতে ফিরিয়া আসিয়া এ আবার কি অভিনয় সে দেখিতে বসিল!

জ্যোতির মুখের উপর সূর্য্যের রক্তচ্ছটা আসিয়া পড়িয়াছিল। রঙে রঙ্ মিশিয়া অপরূপ শোভা হইয়াছিল। আর এক সন্ধ্যায় এমনি রঙের খেলা দেখিয়া হেমন্ত সেই প্রথম-যৌবনে মুগ্ধ হইয়াছিল, আজও হইল।

হেমন্ত একেবারে জ্যোতির পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল; দুই পায়ের উপর হাত রাখিয়া বলিল,—জ্যোতি, আমার পানে চাও তুমি!

জ্যোতি তাহার হাত দুইটাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল,—হিমুদা, এ সব কি বলচো তুমি? তুমি জানো, আমার বিয়ে হয়েছে! আমি একজনের স্ত্রী! মনের মধ্যে যাই থাকুক, তবু ধর্ম্মত আমি আর-একজনের। ছি, পা ছাড়ো। ঐ ভাবে পাওয়া ছাড়া কি আমায় পাবার আর কোন উপায় নেই? তার চেয়ে ভাবো না কেন, আমি তোমার ছোট বোন্, আর তুমি আমার বড় ভাই!

—জ্যোতি, জ্যোতি—হেমন্ত উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিল। জ্যোতি নত হইয়া হেমন্তর হাত ধরিল, বলিল—ছি, পা ছাড়ো—ওঠো।

ঠিক এমনি সময় একখানা নৌকা তীরের মত ছুটিয়া আসিয়া ঘাটে লাগিল। নৌকার ছাদে একজন লোক বসিয়াছিল। নৌকা তীরে লাগিতেই সে লাফাইয়া নামিয়া পড়িল। পরে সিঁড়ির উপর আসিয়া জ্যোতিকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল,— কে? বৌদি!

জ্যোতি চমকিয়া ফিরিয়া দেখে, নীরদ! সে বলিল,—ঠাকুরপো!

—একটা কথা ছিল, বৌদি। তা—বলিয়াই হেমন্তকে সম্মুখে দেখিয়া নীরদ ফিরিল; এবং ফিরিয়া একেবারে গিয়া নৌকায় উঠিল। উঠিয়া মাঝিকে বলিল,—নৌকা ছাড়ো।

জ্যোতি অচঞ্চল দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া দেখিল; পরে বলিল,—ঠাকুরপো, যেয়ো না, ফেরো, শোনো,—শুনে যাও। কি কথা ছিল, বলে যাও।

—কোন কথা নয় বৌদি। আমি চললুম।

নৌকা নীরদকে লইয়া যেমন তীরবেগে তীরে আসিয়া লাগিয়াছিল, তেমনি তীরবেগেই তীর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। যতক্ষণ দেখা যায়, জ্যোতি নৌকার দিকে চাহিয়া রহিল। নৌকা চোখের আড়ালে গেলে সে একটা তীব্র নিশ্বাস ফেলিল, মনে মনে বলিল, বটে, এত অবিশ্বাস! বেশ!

তার পর ফিরিয়া সে ডাকিল,—হিমুদা!

হেমন্ত একধারে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে কেমন নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছিল; জ্যোতির আহ্বানে সরিয়া আসিল।

জ্যোতি বলিল,—আমায় তুমি চাও? ঠিক করে বলো। এই সন্ধ্যায়, এই নদীর ঘাটে—বলো, ঠিক করে বলো।

—জ্যোতি—হেমন্ত জ্যোতির একটা হাত চাপিয়া ধরিল।

জ্যোতি বলিল,—বেশ, চলো। আমি তোমারই হবো। মনে রেখো, যতদিন তুমি আমায় রাখ্‌বে, আমি তোমার থাকবো। মনে রেখো।

তার পর গা হইতে সমস্ত লজ্জা ঝাড়িয়া ফেলিয়া সদর্পে সে হেমন্তর হাত ধরিয়া পল্লীর পথ মাড়াইয়া নিজের বাড়ীর দ্বার পার হইয়া হেমন্তর বাড়ীতে গিয়া ঢুকিল।

সূর্য্য তখন অস্ত গিয়াছে। সমস্ত পৃথিবীর উপর অন্ধকার ধীরে ধীরে আপনার কালো পর্দ্দা বিছাইতেছিল

## ২৭

জ্যোতি হেমন্তর সঙ্গে তাহার বাড়ী আসিল। আসিয়াই সে একটা ঘরে ঢুকিয়া হেমন্তকে বলিল,—তুমি আজ আর আমার কাছে এসো না। কালই কিন্তু কলকাতায় যেতে হবে। এখানে আমি থাকবো না। কলকাতায় গিয়ে আমি তোমার হবো।

হেমন্ত সে প্রস্তাবে সম্মত হইল।

আজ এক বৎসর হইল, হেমন্তর পিতার মৃত্যু হইয়াছে। মা আছেন। হেমন্ত মাঝে মাঝে এখনো দেশে আসিয়া থাকে। সে বিবাহ করে নাই। মা অনেক করিয়াও তাহাকে বিবাহে রাজী করাইতে পারেন নাই। না বিবাহ করিয়া মার উপর দিয়া সে আপনার দুর্জ্জয় অভিমানের প্রতিশোধ লইবে, স্থির করিয়াছিল। যেমন টাকা-টাকা করিয়া আমার জীবনের বাসনা তোমরা চরিতার্থ হইতে দাও নাই, তেমনি এখন জব্দ হও। মা নিরুপায় হইয়া শেষে হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন।

হেমন্ত এবারে দেশে আসিয়া শুনিল, ভট্টাচার্য্যদের জ্যোতিকে লইয়া প্রকাণ্ড ঘোঁট বাধিয়াছে। প্রথমটা সে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল—ব্যাপার কোথায় গড়ায়, দেখা যাক! সে কখনো ভাবে নাই, জ্যোতিকে এমন করিয়া জীবনে কোনদিন সে লাভ করিতে পারিবে!

হেমন্ত জ্যোতিকে লইয়া কলিকাতায় আসিল; বাড়ী গেল না, একটা বিশ্রী পল্লীতে আসিয়া এক তেতলা বাড়ীর একেবারে উপরের ঘরে গিয়া আশ্রয় লইল। তার পর জ্যোতিকে লইয়া সে একেবারে উন্মত্ত হইয়া পড়িল! তাহার পরিচর্য্যার জন্য দাসী রাখিল, বামুন

রাখিল, চাকর রাখিল—তাহাকে গান শিখাইবার জন্ম ওস্তাদ নিযুক্ত করিল। জ্যোতি তাহার পূজার সমস্ত আয়োজন নিঃশব্দে গ্রহণ করিল।

জ্যোতি যে হেমন্তর হাতে আপনাকে সঁপিয়া দিয়াছিল—সে-দিকেও যেন জ্যোতির কোন খেয়াল ছিল না। কাচের পুতুল লইয়া ছেলেরা যেমন খেলা করে, যে-ভাবে তাহাকে নাড়িয়া চাড়িয়া শোয়াইয়া বসাইয়া তৃপ্তি পায়—পুতুল যেমন সে-দিকে এতটুকু আপত্তি করিতে পারে না—জ্যোতি ঠিক সেই কাচের পুতুলের মত হেমন্তর হাতে খেলানা হইয়া রহিল। হেমন্ত খুঁতখুঁত করিত—জ্যোতি আমোদ-আহ্লাদ সবই করিতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে যেন জ্যোতির প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না! হেমন্ত ভাবিল, বুঝি এই বাড়ীটার কলঙ্কিত সংসর্গের জন্মই জ্যোতি এমন নির্জীব হইয়া আছে। একদিন সে জ্যোতিকে বলিল—তোমার জন্তে আলাদা একখানা বাড়ী দেখি, জ্যোতি। কি বলো?

জ্যোতি হাসিয়া বলিল—কেন, এ বাড়ীটা কি দোষ করেচে? এ তো বেশ বাড়ী।

হেমন্ত জ্যোতিকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে পারিল না, কেন সে এ বাড়ী ছাড়িতে চায়। সময় সময় জ্যোতিকে তাহার কেমন ভয় হইত। যদি জ্যোতি তাহার উপর রাগ করিয়া বসে—যদি সে একদিন এই সুখের ঘর চুরমার করিয়া কোথায় কোন্ অতল অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া যায়!

হেমন্ত বিপদে পড়িয়াছিল। জ্যোতি নহিলে তাহার চলিবে না, ইহা সে বুঝিয়াছিল—জ্যোতি যে কি নেশায় তাহার প্রাণটাকে মাতাইয়া তুলিয়াছে! অথচ জ্যোতিকে আপনার করিয়া যে সুখটুকু সে পাইত, তাহা যেন কেমন ভরপুর নয়!

জ্যোতি কথা কয়, গল্প করে, গান গায়—তবুও মুখে তাহার কি যেন কিসের একটা রেখা সর্ব্বদা লাগিয়া আছে! তাহার হাসির কোণে কোথায় যেন একটু ঘন গাম্ভীর্য্য স্থির-নেত্রে অপলক দাঁড়াইয়া আছে!

একদিন অনেকক্ষণ গম্ভীর হইয়া পড়িয়া থাকিবার পর জ্যোতি হেমন্তকে বলিল,—তুমি না কলেজে পড়তে?

হেমন্ত অবাক্ হইয়া বলিল,—হ্যাঁ।

—আমার জানা একটি লোক, সেও কল্‌কাতার কলেজে পড়ে, তাকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বল্‌তে পারো?

হেমন্তর বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। এ আবার কি খেয়াল!

জ্যোতি বলিল,—পারবে?

—কে সে, তার কি নাম, কোন্ কলেজে পড়ে, এ-সব না জানলে কি করে হয়?

—তার নাম নীরদকুমার রায়। সে বি, এ,পড়ে।

—কলেজের নাম?

—তা জানি না।

আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া হেমন্ত বলিল,—তবে কি করে পাবো তাকে? কল্‌কাতায় অমন বিশটা কলেজ আছে, আর প্রত্যেক কলেজে প্রায় সাত আটশ' করে ছেলে পড়ে।

—তা হলে পারো না?

হেমন্ত বলিল,—অসম্ভব।

সে-রাত্রে গান বা আমোদ-আহ্লাদ তেমন জমিল না। হেমন্ত সোহাগের কত কথা বলিয়াও জ্যোতির উদাস ভাবটাকে এতটুকু ঘুচাইতে পারিল না।

পরদিন হেমন্ত বাহির হইয়া গেলে জ্যোতি এক ভাড়াটিয়াকে ধরিয়া বসিল। তাহার যে লোকটি, কলিকাতার বাজারে ধূর্ত্ত বলিয়া তাহার বিলক্ষণ খ্যাতি আছে। নাম রসিক। জ্যোতি রসিকের হাতে পাঁচটা টাকা গুঁজিয়া দিয়া বলিল,—যদি খপর আন্‌তে পারো, তা হলে আরো পাঁচ টাকা দেবো।

রসিক বলিল,—হুঁঃ, বলে, বাঘের দুধ এনে দিতে পারি, এ তো একটা কলেজের ছোক্‌রা বৈ নয়।

রসিক মৃদু হাসিয়া চলিয়া গেল। জ্যোতি তাহার হাসির অর্থ বুঝিল,—বেকুব্। তার পর নিজের ঘরে হার্ম্মোনিয়ম খুলিয়া সে গান ধরিল—

আরে মারি কাটারি ছাতিমে
কাঁহা ঢূড়ত বঁধুয়া!

গান ভালো লাগিল না। হার্ম্মোনিয়ম রাখিয়া সে বাহিরে ছাদে আসিয়া দাঁড়াইল। মাথার উপর অনন্ত আকাশ—শূন্য, শূন্য—চারিদিকে দারুণ শূন্যতা খাঁ-খাঁ করিতেছে। এই অসীম অনন্ত শূন্যতায় নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসে।

একঘণ্টা পরে রসিক আসিয়া হাসিয়া চেহারার যে বর্ণনা দাখিল করিল, নীরদের সহিত হুবহু তাহা মিলিয়া গেল।

জ্যোতি বলিল,—একখানা গাড়ী করে আমায় নিয়ে যেতে পারো সেখানে,—এখনি? এই নাও পাঁচ টাকা।

রসিক দেখিল, তাহার বরাত আজ খুলিয়া গিয়াছে। বাঃ! একাদশ বৃহস্পতি! সে বলিল,—তার আর কি। কলেজের ছুটি হতে এখনো একঘণ্টা দেরী।

গাড়ী আনাইয়া জ্যোতিকে তাহাতে তুলিয়া রসিক একেবারে কলেজের কাছে বড় রাস্তায় আসিল। কলেজের একটু দূরে গাড়ী রাখিয়া রসিক কলেজে গেল, নীরদকে ডাকিতে।

নীরদকে গিয়া সে বলিল,—একটি স্ত্রীলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেচেন। পথে গাড়ীর মধ্যে অপেক্ষা করচেন। বলিয়া রসিক চোখ টানিয়া ঈষৎ হাসিল।

নীরদ তাহা লক্ষ্য করে নাই। সে একটু বিস্মিত হইয়া বলিল,—আমাকে খুঁজচেন! একজন স্ত্রীলোক? কে…?

—আজ্ঞে, একবার এলেই দেখবেন'খন। তিনি বল্‌চেন, তাঁর বিশেষ দরকার।

নীরদ বাহিরে আসিয়া দেখিল, ওধারে ফুটপাথের গা ঘেঁষিয়া একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। বিস্ময়-স্পন্দিত বক্ষে সে আসিয়া গাড়ীর কাছে দাঁড়াইল। গাড়ীর মধ্য হইতে জ্যোতি ফিরকির অন্তরাল দিয়া নীরদকে আসিতে দেখিল। নীরদ কাছে আসিলে সে ডাকিল—এসো ঠাকুরপো!

সম্মুখে হঠাৎ জীবন্ত সাপ দেখিলে মানুষ যেমন চমকিয়া ওঠে, নীরদ তেমনি চমকিয়া উঠিল—তাহার মুখ দিয়া আপনা হইতে স্বর বাহির হইল,—বৌদি!

গাড়োয়ান গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিয়াছিল। ইচ্ছা না থাকিলেও নীরদের দৃষ্টি ছুটিয়া একেবারে ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। অমনি গাড়ীর দ্বার সে সশব্দে নিজেই ভেজাইয়া দিল। কহিল,—আমি সব শুনেচি। তোমার সঙ্গে আমার এখন আর কোন সম্পর্ক নেই বৌদি। এ-রকম করে এখান অবধি আমার পিছনে এসে তুমি ধাওয়া করো যদি, তাহলে আমায় কলকাতা ছাড়তে হবে, তা কিন্তু বলে রাখচি। তুমি তাহলে খুশী হবে?

—না, না, ঠাকুরপো, তুমি যাও। আমি চলে যাচ্ছি। বলিয়াই সে গাড়োয়ানকে গাড়ী হাঁকাইয়া দিতে বলিল। কিসের এক অসহ্য জ্বালায় জ্যোতির শরীর-মন বিষম ঝিম্-ঝিম্ করিয়া উঠিল। চোখের জল অবধি সে-তাপে শুকাইয়া গেল। সে গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল; আর কলিকাতা সহরের বুকের উপর দিয়া বিশ্রী শব্দ করিয়া ভাড়াটিয়া গাড়ী যে-পথে আসিয়াছিল, সেই পথেই ছুটিয়া চলিল।

## ২৮

বাড়ীতে নিজের ঘরে আসিয়া জ্যোতি দেখে, হেমন্ত চুপ করিয়া বসিয়া আছে। হেমন্ত অত্যন্ত রাগিয়া গিয়াছিল। সে জ্যোতির জন্য এমন করিয়া মরিতেছে, আর জ্যোতি কি না অম্লান বদনে তাহাকে উপেক্ষা করিয়া কোথায় কোন্ লক্ষ্মীছাড়া বখার সঙ্গে আড্ডা দিতে গিয়াছে! এ নিশ্চয় প্রণয়-চর্চ্চা! আর সহ্য হয় না! আজ একটা হেস্তনেস্ত করিতেই হইবে। এত কি…

জ্যোতি ঘরে ঢুকিতে হেমন্ত বলিল,—আমি আজ চলে যাচ্ছি, জ্যোতি।



জ্যোতি অচপল স্বরেই বলিল,—বেশ।

পাথরের মত জ্যোতির অবিচল মূর্ত্তি দেখিয়া হেমন্তর প্রাণটা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। পাগলের মত সে বলিল,—জ্যোতি, জ্যোতি, তুমি এত পাষাণ! তোমার একটু দয়া হয় না? একটু মমতা হয় না? তোমার জন্য যে আমি সব ত্যাগ করেচি। নিজের সমস্ত ভবিষ্যৎটাকে জুতোর ঠোক্কর মেরে কোথায় হটিয়ে দিয়ে এসেচি যে।

জ্যোতি গম্ভীর স্বরে শুধু বলিল,—হুঁ।

জ্যোতি ভাবিল, একবার আগুনের মত দপ্ করিয়া সে জ্বলিয়া ওঠে! জ্বলিয়া উঠিয়া বলে,—আর আমি? স্ত্রীলোক হইয়া তোর জন্য কি না করিয়াছি রে! নিজের সমস্ত নারীত্বটাকে আগুনে পুড়াইয়াছি! ঠাকুরপোর অত-বড় বিশ্বাসের গোড়া অবধি কাটিয়া দিয়া আসিয়াছি—যে-বিশ্বাসের মূল্য প্রাণ দিলেও শোধ হয় না! মায়া নয়, প্রীতি নয়, ভালবাসা নয়! অভিমান! নিমেষের অভিমানে নিজেকে কিভাবে সে ছেঁচিয়া মারিয়াছে!

জ্যোতিকে নীরব দেখিয়া হেমন্ত বলিল,—কোথায় গিয়েছিলে, জান্‌তে পারি?

—নীরদ ঠাকুরপোর সন্ধানে।

হেমন্তর বুকের ক্ষত স্থানটাতে কে যেন সজোরে লোহার খোঁচা মারিল! হেমন্ত বলিল,—আমার কথা একবার ভাবো না?

জ্যোতি হাসিল; কিছু বলিল না; তার পর ধীরে ধীরে সে-ঘর হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিল।

হেমন্ত দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল,—কোথায় যাও?

—বাইরে।

—কেন?

—তোমার সঙ্গে এক ঘরে আর আমি থাকতে পারবো না। তোমায় আমি ঘৃণা করি, চিরদিন ঘৃণা করি। সত্য কথা শোনো তবে আজ,—তোমার সঙ্গে যে এখানে এসেছিলুম, সে তোমার খাঁচার পাখী হয়ে থাকবার জন্য নয়। তোমার মোহে আসিনি। অভিমান! নীরদ-ঠাকুরপোর উপর প্রাপ্ত অভিমানে শুধু এসেছিলুম! কল্‌কাতায় নীরদ ঠাকুরপো আছে, যদি কোনদিন তার দেখা পাই, তার অবিশ্বাসের ফলটা একবার দেখাবো,—এই ভেবে এসেছিলুম। আমার এ উপকার-টুকু তুমি করেচো, তার দাম আমি আমার নারীত্ব দিয়ে কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করেচি। ব্যস,—চুকে গেছে। তুমি এখন নিজের পথ দ্যাখো, আমিও দেখি।

হেমন্ত জ্যোতির হাত ধরিল, কাতর স্বরে ডাকিল,—জ্যোতি—

—ছেড়ে দাও। বলিয়া আপনাকে ছাড়াইয়া লইয়া

জ্যোতি বলিল,—তোমায় আমি একদিনের জন্য, এক মুহূর্ত্তের জন্য ভালোবাসিনি। তোমার বুক-ভরা ভালোবাসা তুমি যখন আমার হাতে তুলে দেছ, তখন আমার হাত পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, প্রাণ-অবধি জ্বলে গেছে।...আর কেন?...কোন কালেই আমি তোমার নই, কোনদিন তা হতেও পারবো না। আমার মনের উপর তুমি এতটুকু দাগ বসাতে পারোনি। দেহটা আমার যাই হোক্,—মন আমার সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক আছে। তাতে এতটুকু কালির ছোপ লাগেনি। এ তুমি না জান্‌তে পারো, আমি জানি।

তার পর জ্যোতি আপনাকে সে কি এক পঙ্কিল স্রোতে ভাসাইয়া দিল। সামান্য গণিকার মত সে আপনার রূপ আর যৌবনকে কলিকাতার বাজারে পণ্যের মত সাজাইয়া বসিল। কত রাজা আসিল, জমীদার আসিল, বাবু আসিল, জ্যোতি বুকের মধ্যে দারুণ ঘৃণা ভরিয়া সকলের কাছে বেশ চড়া দামে আপনার রূপ আর যৌবন বিকাইতে লাগিল।

এমন সময় জবরমাটীর জমীদার জহরবাবু আসিয়া তাহার পায়ে বিস্তর জড়োয়া গহনা, দামী কাপড়-চোপড় আর নগদ টাকা সেলামি ধরিয়া দিল। জ্যোতির আপত্তি ছিল না! সে নিজের চতুর্দ্দিকে আগুন জ্বালাইয়া তুলিয়াছিল। দুর্বৃত্ত পুরুষ, তোরা দল বাঁধিয়া পতঙ্গের মত এই রূপের বহ্নিতে ঝাঁপ দে, তার পর এই বহ্নিতে পুড়িয়া তোরা ছাই হইয়া যা!

এ-আগুনে নিজেও সে পুড়িতেছিল, কিন্তু সে তখন একেবারে অন্ধ উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছে। নিজে পুড়ুক সে,—তবু ঐ দুরন্ত অত্যাচারী পুরুষগুলাকেও যে সেই সঙ্গে পুড়াইতে পারিতেছে, ইহারই উল্লাসে সে মাতিয়া উঠিয়াছিল। আগুনের অপরূপ খেলা খেলিয়াই তাহার সুখ! নীরদের উপর প্রচণ্ড অভিমানই তাহাকে বিশেষ করিয়া এ খেলায় মাতাইয়া তুলিয়াছিল। তাহাকে নীচ সন্দেহ? অবিশ্বাস? নারী যে আগুন জ্বালিয়া ধরে, এ বিশ্বে কাহার এমন সাধ্য আছে, সে আগুনে না পুড়িয়া বাঁচিয়া যাইবে?

হেমন্তর সঙ্গে সম্পর্ক কাটিয়া দিয়া সে যখন একেবারে কলিকাতার সদর রাস্তার বুকে আসিয়া বসিল, তখন আপনার নামটাকেও জ্যোতি বদ্‌লাইয়া দিল। জ্যোতি নাম বাতিল করিয়া নূতন নাম রাখিল,—বিজলী। বিজলী যেমন রূপের চমক দেয়, তেমনি পুড়াইয়া মারিতে পারে। বিজলী সেই বিজলীর ধারা ধরিয়াছিল। বাবুর দল, জমীদারের দল নূতন বাড়ী ও বাগানের কত প্রলোভন দেখাইত, কিন্তু বড় রাস্তার ধারে এই বাড়ীটি বিজলী কিছুতেই ছাড়িল না। বাবুরা বলিত,—এ কি বেয়াড়া খেয়াল, বিবি!

বিজলী বলিত,—এইটুকুই মজা!

এ-বাড়ী না ছাড়িবার কারণ ছিল। রোজ সন্ধ্যায় সে আয়না পাড়িয়া নিখুঁত করিয়া আপনাকে সাজাইতে বসিত। সাজাইতে সাজাইতে সে দেখিত, এ কি রূপের আগুন দেখিয়া পতঙ্গের দল উল্লাসে ঝাঁপ দিতে আসে? সে রূপের শিখা কোথাও নাই! এ কঙ্কাল, রূপের শীর্ণ কঙ্কালখানা শুধু পড়িয়া আছে! হতভাগার দল চোখে তাহা দেখিতে পায় না!

তার পর যখন রূপের রাণী সাজিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইত, তখন একটি কল্পনার আনন্দে সে বিভোর থাকিত। ঐ লক্ষ-লক্ষ চলন্ত পথিকের উচ্ছ্বসিত বিহ্বল দৃষ্টির সামনে এমনি করিয়া আপনাকে ধরিয়া দিয়া সে ভাবিত, এ পথে কি নীরদ কোনদিন চলিবে না? তখন সে দেখিবে,—তাহার একটা মিথ্যা সন্দেহের কত-বড় প্রতিশোধ বৌদি কি দাম দিয়াই লইয়াছে!

দিনের পর দিন, কত সন্ধ্যা কত বিচিত্র বেশে অমন আসিল গেল, কিন্তু নীরদ কোনদিন এ পথে দেখা দিল না! এ আপশোষ রাখিবার জ্যোতির আর ঠাঁই নাই!

## ২৯

আজ মহিমকে বিদায় দিয়া বিজলী আপনার জীবন-ইতিহাসের জীর্ণ পাতাগুলার উপর দিয়া দৃষ্টি বুলাইয়া চলিয়াছিল। ঘটনার বৈচিত্র্যে সে একেবারে অবাক্ স্তম্ভিত হইয়া গেল। ভাবিতে ভাবিতে বেলা ক্রমে পড়িয়া আসিল। গঙ্গা আসিয়া বলিল,—চুল বাঁধবে না দিদিমণি?

গম্ভীর স্বরে বিজলী বলিল,—না।

—জহরবাবু খপর পাঠিয়েচেন, আজ রাত্রে তিনি আসবেন।

জ্যোতি বলিল,—এলে নীচে থেকেই বলিস্, আমার শরীরটা ভালো নয়। আজ দেখা হবে না।

গঙ্গা অবাক্! বিজলীকে ভূতে পাইল নাকি? বিজলীর খেয়াল সে ভালো করিয়াই জানিত—কিন্তু এ যে একেবারে অত্যন্ত বিশ্রী রকমের খেয়াল!

ঠোঁট উল্‌টাইয়া গঙ্গা চলিয়া গেল। বিজলী গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

ভর্ত্তু চাকর আসিয়া ঘরে আলো জ্বালিয়া দিল। বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বিজলী বলিল,—আলো নিভিয়ে দে। আমার বড্ড মাথা ধরেচে, চোখে আলো সইচে না।

ভর্ত্তু অবাক্ হইয়া ক্ষণেক দাঁড়াইল, পরে আলোটা নিবাইয়া দিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

বিছানায় পড়িয়া বিজলী বারবার আপনার জীবনের অতীত ঘটনাগুলার কথাই ভাবিতে লাগিল। নিতান্ত

সামান্য নারী সে—কিন্তু তাহারই জীবনের উপর দিয়া কতকগুলা লোক কি ভিড় করিয়াই চলিয়া গিয়াছে! এক-একজন আসিয়া এক-একটা সূত্র ধরিয়া টানিয়া কোথা হইতে তাহাকে আজ এ কোথায় আনিয়া ফেলিয়াছে! সমস্ত জীবনের উপর দিয়া কি প্রচণ্ড ঝড় না বহিয়া গিয়াছে! ঝড়ের দাপটে দিক্‌বিদিকে চাহিয়া দেখিবার অবসর সে পায় নাই, শুধু সেই ঝড়ের ধাক্কায় ধাক্কায় আছাড়ি-পিছাড়ি খাইয়া দুই চোখ বুজিয়া অন্ধের মত চলিয়াছে! এখন কোথায় আছে সেই রাখালী? লক্ষ্মীকান্ত? সেই বামাকালী? সেই তাহার বাপ? মা? সেই সমাজের কর্ত্তারা? কোথায়ই বা এখন নিষ্ঠুর নীরদ?…ঐ নীরদ! এক মুহূর্ত্তের জন্য অত বড় ভুল যদি সে না করিত, তাহা হইলে…

তাহা হইলে বিজলীর জীবন কোন্ পথ ধরিয়া কোথায় গিয়া দাঁড়াইত, কে জানে! সে ভাবিতে বসিল—ভাবিয়া কোন কূল পাইল না। সীমা-হীন অকূলে দিশাহারা মন বাতাসের মুখে ক্ষুদ্র নৌকার মত দুলিতে লাগিল, একটুকু অগ্রসর হইতে পারিল না।

কিন্তু নীরদের উপর রাগ করিয়া এই যে প্রচণ্ড প্রতিশোধ সে লইয়াছে—এ কি ঠিক হইয়াছে? নীরদ হয় তো বেশ হাসিমুখেই ঘর-সংসার পাতিয়া বসিয়াছে! কবেকার এক রাত্রির দুঃস্বপ্নের মত জ্যোতির কথা সে আজ অজস্র সুখের মধ্যে ভুলিয়া গিয়াছে। আর লক্ষ্মীকান্ত? সে কি মানুষ? সে তো একটা পশু! তাহার উপরও না কি আবার রাগ হয়? না, তাহার উপর প্রতিহিংসা লইতে ইচ্ছা করে? না। তাহা হইলে তাহার মূঢ়তার সম্মান করা হয়, তাহার দুর্ব্বৃত্ততাকে শ্রদ্ধা দেখানো হয়। জীবনের পাতা হইতে এই লক্ষ্মীকান্তর নামটা বিজলী যদি একেবারে মুছিয়া ফেলিতে পারিত! হেমন্ত? সে ঐ লক্ষ্মীকান্তর জুড়িদার! মূর্খ, নির্ব্বোধ।

নীরদ? হায় রে, বিজলী এই যে আজ তাহার নারীত্বের উপর রাবণের চিতা জ্বালিয়া বসিয়াছে, ইহার এতটুকু আঁচ কি নীরদের গায়ে লাগিয়াছে? তা যদি লাগিত, তাহা হইলে গাড়ীর কাছ হইতে সে দিন অমন করিয়া কখনই সে চলিয়া যাইতে পারিত না। তবে কি এ আগুনে নিজেই সে শুধু নিজেকে তিলে তিলে পুড়াইয়া মারিয়াছে? তাই তো!

বিজলীর দুই চোখ বহিয়া হু-হু করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। বড় আরামের জল এ! কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে আপনার বুকের চিতা নিভাইতে চাহিল। কিন্তু এ কি নিবিতে জানে? এ যে রাবণের চিতা! কত জল তাহার চোখে আছে গো! নারীর বুকের মধ্যে যে-অশ্রুর সাগর ভগবান রচিয়া দিয়াছেন, তাহারই প্রতিহিংসার অনন্ত নিশ্বাসে সে সাগর উবিয়া কোন্ কালে যে উড়িয়া গিয়াছে!

৩০

সকালে উঠিয়া বিজলী পোদ্দার ডাকাইল। পোদ্দার আসিলে আপনার সমস্ত গহনাপত্র মেঝের উপর ঢালিয়া দিয়া বলিল,—এই সব আমি এখনি বিক্রী করতে চাই, এই দণ্ডে। কি দাম হবে, কষে বলো—আর খদ্দের থাকে, এখনি তাকে নিয়ে এসো।

পোদ্দার দাঁও বুঝিয়া দর কষিল; এবং জলের দামেই মণি-মুক্তা কিনিয়া এক-মুখ হাসিয়া পুঁটুলি ঘাড়ে করিয়া দোকানে ফিরিল।

বাড়ীর লোক অবাক্! কলতলায় রেবতীর দল টিপ্পনী কাটিয়া গাহিল,—

——রাধা-কৃষ্ণ বলো মন,
আমি বৃন্দ বেশ্যা তপস্বিনী এইছি বৃন্দাবন!

বিজলী গঙ্গাকে ডাকিয়া কয়খানা গহনা দিল,—এক-শো টাকা নগদ তাহাকে দিল। দিয়া বলিল,—গঙ্গা, এ-সব নিয়ে কোনো ভদ্দর লোকের বাড়ীতে দাসী-পনা করে খে'গে যা। এ তল্লাটে থাকিস্‌নে আর!

গঙ্গা ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। বলিল,—তুমি কোথায় যাবে দিদিমণি?

—পশ্চিমে। তীর্থ করতে।

গঙ্গার সেটা ভালো লাগিল না। এই রোজগারের বাজার ছাড়িয়া কাকের মত তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়ানো—না বাপু, তাহার শরীরে এত কষ্ট সহিবে না। এত-দিন দাসীপনা করিয়া কাটাইল, এখন যদি এতগুলা নগদ টাকা আর গহনা-পত্র বরাতে মিলিয়া গেল, তখন একবার ভাগ্যটাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে না? সে স্থির করিল, এখন দাসীত্ব ছাড়িয়া অনায়াসে সে ঘর ভাড়া লইতে পারিবে। ইহা ভাবিয়া সে আহ্লাদে আটখানা হইয়া পড়িল। সেই দিনই সে মনিবের অলক্ষিতে সে-বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র সরিয়া পড়িল।

বিজলী কাহারও কথা শুনিল না। গাড়ী আনাইয়া সে একেবারে কালীঘাটে গেল। টাকার বাক্স কাছে রাখিল। মনিবের উপর ভর্ত্তুর একটু মায়া পড়িয়াছিল—মনিবকে সে ছাড়ে নাই। ভর্ত্তুর কাছে টাকার বাক্স রাখিয়া বিজলী গঙ্গাস্নানে গেল, তার পর কালী দর্শন করিল! অনেকক্ষণ নাট-মন্দিরে পড়িয়া দেবীকে সে প্রণাম করিল,—পরে মন্দিরের চতুর্দ্দিকে মাটীর উপর শুইয়া গণ্ডী কাটিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিল। তার পর উঠিয়া ভর্ত্তুকে বলিল,—তুই সেই ছেলে বাবুটির বাসা জানিস্ ভর্ত্তু?

ভর্ত্তু প্রশ্ন করিল, যে বাবু পথে পড়িয়াছিল?

—হ্যাঁ।

ভর্ত্তু বলিল,—জানি।

—একটা গাড়ী নিয়ে সেইখানে চ' দেখি।

ভর্ত্তু গাড়ী ডাকিল। বিজলী গাড়ীর মধ্যে গিয়া বসিল, ভর্ত্তু কোচবাক্সে উঠিল।

গাড়ী আসিয়া পটলডাঙ্গায় একটা মেশের সম্মুখে দাঁড়াইল।

ভর্ত্তুকে লইয়া টাকার বাক্স-সঙ্গে বিজলী উপরে উঠিল। একটি লোক উপরের দালানে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার পানে চোখ পড়িতেই বিজলী একেবারে শিহরিয়া উঠিল। এ কি—নীরদ ঠাকুরপো! এখানে?

বিজলীর চোখের সম্মুখে চারিধার মুহূর্ত্তে আঁধারে ভরিয়া গেল। সে ভাব কাটিলে বেশ অবিচলিত কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল,—মহিম বলে একটি ছেলে এখানে থাকে?

নীরদ অবাক্ হইয়া গিয়াছিল। বৌদি…? এত-দিন পরে এ বেশে এখানে! হঠাৎ! এ মূর্ত্তি কি ভুলিবার? নীরদও গম্ভীর স্বরে অজানা ব্যক্তির মতই বলিল,—আমার সঙ্গে আসুন।

নীরদ বিজলীকে লইয়া একটা ঘরে গেল। সে ঘরে মহিম একখানা চেয়ারে বসিয়াছিল, শূন্য দৃষ্টি তাহার আকাশে ঘুরিতেছিল।

বিজলী ডাকিল,—মহিম, বাবা…

মহিম চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এ কে, এঁ্যা! তখনি উচ্ছ্বসিত আবেগে বিজলীর পায়ের কাছে পড়িয়া তাহার দুই পায়ের ধূলা গায়ে মাথায় মাখিয়া মহিম বলিল,—তুমি আমায় দেখ্‌তে এসেচো মা?

—হ্যাঁ বাবা। আমি তীর্থে যাচ্ছি। তোমার এই টাকা নিয়ে কোথাও রাখবার ব্যবস্থা করো—তা হলেই আমি ছুটি পাই। এ টাকায় তোমার সব খরচ চলে যাবে'খন।

মহিম বলিল,—তুমি চলে যাচ্ছ মা?

—হ্যাঁ বাবা। আমায় আর ধরে রেখো না। অনেক কালি গায়ে মেখেচি, তীর্থের জলে নেয়ে-ধুয়ে সাধু-সন্ন্যাসীর পায়ের ধুলো গায়ে মেখে দেখবো, সে কালির কিছু ওঠে কি না!

নীরদ এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল; সে বলিল,—সন্ন্যাসীদের পায়ের ধুলোয় কালি মোছে না। কালি যদি কিছুতে মোছে তো সে এই সংসারের সহস্র কাজেই মোছে।

হঠাৎ নীরদের এ কথায় মহিম কেমন অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। সে তাড়াতাড়ি বলিল,—ইনি আমদের মাষ্টার-মশাই। আমাদের নিয়েই আছেন। বিয়ে-থা করেন নি—নিজের ওঁর কেউ নেই—স্কুলের ছেলেরাই ওঁর সব। তার পর নীরদের দিকে ফিরিয়া বলিল,—ইনি আমার সেই মা। ইনিই আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। এঁর দয়াতেই আমি আপনার পায়ের কাছে এসে দাঁড়াতে পেরেচি মাষ্টার মশাই।

নীরদের প্রতি সমস্ত অভিমান বিজলীর এক মুহূর্ত্তে কোথায় ভাসিয়া গেল। তাহার দুই চোখে জল ছাপিয়া উঠিল। সে নীরদের পায়ের কাছে পড়িয়া অশ্রু-রুদ্ধ স্বরে বলিল,—সংসারের কাজে সত্যই এ কালির কিছুও ঘুচবে? বলো, বলো ঠাকুরপো। তুমি যদি বলো, তা হলেই আমার বুক আশার আশ্বাসে ভরে উঠবে। বলো তুমি, বিশ্বাস করে আমায় কোন কাজের ভার তুমি দিতে পারো? কি কাজের ভার দিতে চাও, বল। তুমিই সে ভার দাও ঠাকুরপো। প্রাণ আমার জ্ব'লে যাচ্ছে, তুমি এ জ্বালার নিবৃত্তি করো।

নীরদ বলিল,—পারবে বৌদি? অগাধ অসীম ধৈর্য্য নিয়ে নারীর যাতে সনাতন অধিকার, সেই অধিকার নিয়ে কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে পারবে তুমি? পৃথিবীর যত বাদ, যত বিসম্বাদ, তাতে এতটুকু বিচলিত না হয়ে নারীর যা কর্ত্তব্য—স্নেহ, মায়া, মমতা—তাই দিয়ে দুনিয়াকে স্নিগ্ধ শীতল করে রাখতে পারবে?

বিজলী বলিল,—তুমি বল্‌লেই পারবো, ঠাকুরপো। তুমি জানো না ভাই, তোমার বিশ্বাসে আমি কতখানি বল পাই। শুধু তুমি সন্দেহ করবে না, বলো?

নীরদ বলিল,—কিন্তু এ কতক্ষণের জন্য, বৌদি? হয় তো এ তোমার মুহূর্ত্তের খেয়াল!

—না, না ঠাকুরপো। এ আমার খেয়াল নয়। বিশ্বাস না হয়—এইটুকু বলিয়াই বিজলী মহিমকে প্রাণপণ বলে বুকে চাপিয়া ধরিল, তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়াই বলিল,—এই মহিম! আমার ছেলে এই মহিম আমার জামীন হইলো। আমি আমার এই ছেলের মাথায় হাত রেখে বলচি, এ-আমার মুহূর্ত্তের খেয়াল নয়, ঠাকুরপো। মহিম, বাবা---

—মা——বলিয়া মহিম সুগভীর আবেগে বিজলীর বুকে মাথা রাখিল।

নীরদ চাহিয়া দেখিল, এ কি ইন্দ্রজাল! মুহূর্ত্তে বিজলীর সমস্ত শরীরে কি যেন এক অপূর্ব্ব জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল! সে জ্যোতির স্পর্শে সমস্ত কলঙ্কের কালি জীর্ণ খোলশের মত তাহার অঙ্গ হইতে খশিয়া পড়িল, মাতৃত্বের অপূর্ব্ব গৌরবে, অপরূপ সুষমায় বিজলীর মুখ প্রদীপ্ত, মহিমাময়!

বিজলীর পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া নীরদ বলিল,—এই ভালো বৌদি, এই বেশেই তোমাকে ঠিক মানায়! তুমি আজ থেকে এই শুধু মা—মহিমের মা—আমার মা—আর এই যে ছেলেরা—এদেরো সকলের মা!

শেষ

# প্রেয়সী

[ উপন্যাস ]

( চতুর্থ সংস্করণ হইতে )

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

প্রিয়-বন্ধু

শ্রীহরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়ের

কর-কমলে

এ বইখানি

উপহার দিলাম

সৌরীন্দ্র

৮২।৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা, ১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩০

"Margrete.......My beloved husband.
Have I a place in your heart···?
Haakon. You have indeed ;···to bring
light and brightness into my life."

---

"Have you forgotten that it was through you that the best years of a young girl were embittered ?"

*Ibsen.*

"Ther'es nothing in the world like the devotion of a married woman."

*Oscar Wilde.*

# প্রেয়সী

১

বৈশাখের প্রভাতে মৃদু রৌদ্র-হিল্লোলে কঙ্কণা নদীর স্বচ্ছ শান্ত বারিরাশি রূপালি পাতের মত ঝক্-ঝক্ করিতেছিল। নদীটি খুব বড় নয়, তবে তাকে ছোটও বলা যায় না। নদীর দুই তীরে যতদূর দেখা যায়, কোথাও গাছপালার ঘন ঝোপ, কোথাও বা খোলা জমি। খোলা জমির উপর খুঁটীর মাচা; সেই মাচায় জেলেরা জাল মেলিয়া রাখিয়াছে। কয়েকখানা নৌকা উপুড় হইয়া ডাঙ্গার উপর পড়িয়া আছে; তলায় রঙ হইতেছে, আঠা মাখানো হইতেছে। এই সকালেই পার-ঘাটায় মৃদু কোলাহল সুরু হইয়াছে—লোক-জন পারে যাইবে। কেহ-বা নৌকা ছাড়িবার উদ্যোগ করিতেছে, নদীতে মাছ ধরিতে যাইবে।

ইহারই একধারে ঘাটের কোলের কাছে প্রকাণ্ড একটা বাবলা ঝোপ। তাহারি নীচে একখানি পান্সী,—সদ্য রঙ করা,—রাজহংসের মত জলে ভাসিতেছে। পান্সীতে লাল নিশান উড়িতেছে। পান্সীর উপর দুই-চারিজন লোক বসিয়া কাহার অপেক্ষা করিতেছে। আটখানা দাঁড়ে পান্সী সুসজ্জিত। দাঁড়ি-মাঝির গায়ে রঙ-করা জামা—দূর হইতে দেখিলে ভুল হয়, বুঝি-বা কলিকাতা হইতে কোনো ফুটবল-টীম ওপারে খেলিতে যাইবে বলিয়া পান্সীতে আসিয়া বসিয়াছে।

পান্সীখানি গ্রামের তরুণ জমিদার রজনীনাথ দত্তর। পান্সীর লাল নিশানে ইংরাজী হরফে নাম লেখা—R. Datta.

রজনীনাথ দত্ত জমিদারের ছেলে। কলেজে পড়িবার অছিলায় সেই যে কলিকাতা যাত্রা করিয়াছিল, তার পর পাঁচ বৎসর আর দেশে ফেরে নাই। বুড়া বাপের বহু মিনতি তার কলিকাতার বাড়ীর দ্বারে আছড়াইয়া গিয়া পড়িয়াছে, তবু তার টনক নড়ে নাই! ইয়ার-দলের রঙীন পরামর্শে সমস্ত পৃথিবীকে তার এই যৌবনের প্রভাতে এমন সোনার বর্ণে সে রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছিল যে, বাকী জগৎটায় কালো কালি পড়িয়া সেটা তার চোখের সামনে হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল!

কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে তার বিবাহ হইয়া গিয়াছিল, কাছাকাছি আর এক গ্রামের জমিদারের মেয়ের সহিত। পাড়াগাঁয়ের জমিদার—তার না আছে মোটর, না জানে সে ভালো করিয়া দুটা ইংরাজী কথা একত্র করিয়া কহিতে! মেয়েও তার তেমনি তৈয়ার হইয়াছে।

বিবাহের পর রজনী যে-কয়দিন বাড়ী ছিল এবং বধূর সঙ্গে মেলামেশা করিয়াছিল, সে কয়দিনে তার সঙ্গে ভাব যে একটুও হয় নাই, এমন নয়। তবে সে ভাব স্থায়ী প্রণয়ে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই দুই-জনে ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল। বধূ যে ইহাতে প্রাণে তেমন বেদনা পাইল, তাহা তার ভাব-ভঙ্গীতে প্রকাশ পাইল না! বরং বন্দিত্ব ঘুচিলে বাপের বাড়ী গিয়া সে মার কোল পাইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল; পিশীমার কাছে রূপকথা শুনিয়া মাথার ঘোমটা খুলিয়া ছুটোপাটি করিয়া আরামে বর্ত্তাইয়া গেল। যে দিন কোন উৎসবের আহ্বানে প্রায় দু'শ ভরির সোনার গহনায় সে গা ঢাকিত, সেদিন বুঝিত, বিবাহ একটা লাভের বস্তু, তার উপর সেই গহনাগুলা যখন এমন আয়ত্তের মধ্যে! স্বামীর বিরহে তখন দুঃখ করিবার কোথাও যে কিছু আছে, এ চিন্তাও তার মনে উদয় হইত না।

কলিকাতায় আসিয়া প্রথমটা রজনী ভ্যাবাচাকা খাইয়া গিয়াছিল। এই বিপুল জনতরঙ্গ, এই যে কেহ কাহারো তোয়াক্কা রাখে না, কেহ কাহারো খাতির করে না, মেশের পাচক-ভৃত্য হইতে পথের কুলি অবধি ধমক খাইলে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া ওঠে—এ ব্যাপার তার কাছে এমন বিসদৃশ ঠেকিল, যে দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপশালী ক্ষুদ্র জমিদারের ইহাতে থ হইয়া যাইবার কথাই বটে।

তার পর ধীরে ধীরে একটি একটি করিয়া বন্ধু আসিয়া যখন আসরে দেখা দিতে সুরু করিল, তখন মনটা এই গল্প-কৌতুককে অবলম্বন করিয়া আবার আপনাকে প্রসারিত করিয়া ধরিবার প্রয়াস পাইল। ইয়ারেরা এই পল্লীর জীবটিকে পাইয়া বর্ত্তাইয়া গিয়াছিল। রজনীর খরচে তাহাদের নিত্যকার চা ও জল-খাবার চলিত; তার উপর থিয়েটারে বায়োস্কোপে রজনীর টাকায় আমোদ-উপভোগ প্রভৃতি সবগুলাই যদি নির্ব্বিবাদে চলিতে থাকে, তবে দুইদণ্ড ফুরসৎ পাইলে সঙ্গ দিয়া খোস্-গল্পে তাহাকে চমৎকৃত করিয়া দিতে আর কি এমন অসুবিধা! এই ইয়ারদলে রজনীনাথ শীঘ্রই রাজ-সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিল, ইয়ারেরাও পাত্র-মিত্র সাজিয়া আসর জমকাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা রাখিল না।

এমনি খোসগল্প আর আমোদ-বিলাসের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িলে যেমন হয়, রজনীরও তাই ঘটিল। কলেজে যে ঠাঁইটুকুতে সে আস্তানা গাড়িয়া বসিয়াছিল, সেই

খানেই সে আস্তানা মৌরুসি-পাকা হইয়া গেল; বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতীর মন্দির-পথে গতি মন্থর হইল। সঙ্গীর দল টপাটপ ওদিকে টপ্‌কাইয়া গেলেও সন্ধ্যায় ও প্রভাতে মিলন সভা তেমনি জমজমাট থাকিত। সেখানে উঁচু-নীচুর মর্য্যাদা-বোধ আসিয়া সরল সঙ্গ-সাহচর্য্যে এতটুকু ঘা দেয় নাই, এতটুকু অস্পৃশ্যতার ব্যবধান টানিতে পারে নাই।

এমনি করিয়া সহরের চালচলন ও আদব-কায়দায় রজনী নিজেকে দ্রুত অগ্রসর করিয়া দিতেছিল। থিয়েটারের ষ্টল হইতে বক্স এবং বক্স হইতে ক্রমে গ্রীণরুমে সে প্রোমোশন পাইয়াছিল এবং এই গ্রীণরুমে পদার্পণ হইবামাত্র দুই-একজন করিয়া অভিনেত্রীর কৃপাদৃষ্টি-লাভে বঞ্চিত রহিল না। টাকা তো চিঠি লিখিবামাত্র আসিয়া পড়ে। সুতরাং ওদিক্‌কার সুখ-স্বর্গে প্রবেশের টিকিট কিনিতে যেটা প্রধান অবলম্বন, সে পয়সার অভাব কোনদিনই ঘটে নাই। প্রবাসে ছেলের পাছে কোন কষ্ট কি অসুবিধা হয়, বৃদ্ধ পিতা সেদিকে যেমন প্রখর দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন, তার কল্যাণের দিকেও তেমনি তিনি অন্ধ ছিলেন। তাই কল্যাণের পথ ছাড়িয়া ভিন্ন পথে রজনীনাথ এমন সবেগে গড়াইয়া চলিল যে, তাহাকে আটকায়, এমন সাধ্য কোনো মহাবীরের পক্ষেও সম্ভব ছিল না! সহরের সৌখীন সম্প্রদায় মুগ্ধনেত্রে ঘোড়-দৌড়ের ছুটন্ত ঘোড়ার ন্যায় রজনীর গতির বেগ নিরীক্ষণ করিত।

বিলাসে আমোদে যখন সে খুব পোক্ত হইয়া কলিকাতার দুই-চারিটা বিশিষ্ট সমাজে দস্তরমত নাম কিনিয়া ফেলিয়াছে, কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে, তখন বুড়া বাপ তার সুখের পথে কাঁটা দিয়া একদিন ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেলেন। রজনী একটু ফাঁপরে পড়িল; কিন্তু সহৃদ্বর্গের পরামর্শের অভাব ঘটিল না। তাহারা বুঝাইল, এই টাকাকড়ি ও জমিদারী প্রভৃতির ভার যোগ্য লোকের হাতে অর্পণ করিয়া কলিকাতায় কায়েমী ভাবে বাড়ী কিনিয়া বস-বাস আরম্ভ করিয়া দাও! মিউ-নিসিপালিটির কমিশনারী হইতে সুরু করিয়া কৌন্সিলে মাতনের অধিকার লাভ পর্য্যন্ত টাকার জোরে বন্ধুরা তার হাতে চাঁদের মত পাড়িয়া আনিয়া দিবে, এ আশ্বাসও দিতে ছাড়িল না। রজনী এ প্রস্তাবে সম্মত হইল। টাকাকড়ির ব্যবস্থা কায়েমি করিয়া কলিকাতায় বাসের বন্দোবস্ত পাকা করিবার উদ্দেশ্যে সে অচিরে গৃহ-যাত্রা করিল। দুই-চারিজন অন্তরঙ্গ বন্ধু তাহাকে সঙ্গ দিয়া কৃতার্থ করিতে ছাড়িল না।

দেখিতে দেখিতে জমিদার-বাড়ী তাস-পাশা খেলার ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। গান-বাজনার বিচিত্র ঝঙ্কারে বাড়ীর ভিৎ পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। কর্ত্তার মৃত্যুর পর হইতে যে বাড়ী শোকের আঁধার বুকে পুরিয়া অহর্নিশি গুমরিয়া আচ্ছন্ন হইয়া ছিল, আজ সে বাড়ী গীতে বাদ্যে, প্রমোদ-হাস্যে ঝঙ্কৃত হইয়া উদ্যানের মত সাজিয়া উঠিল। শান্ত স্নিগ্ধ গৃহকোণে হঠাৎ এক নিমেষে যেন একটা উচ্ছৃঙ্খলতার বান ডাকিয়া গেল! একান্ত কুণ্ঠিতা পল্লী-গৃহ হঠাৎ এই বিলাসিনীর মূর্ত্তি ধরিয়া গ্রামের লোকের বিস্ময় যেমন আকর্ষণ করিল, তেমনি ভবিষ্যতে এক মহা-দুর্দ্দিনের আশঙ্কায় গ্রামের লোক শিহরিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল।

কলিকাতা হইতে মোটর আসিল,—বাগান-বাড়ীর সংস্কার হইয়া সে এক সম্পূর্ণ নূতন শ্রী ধারণ করিল। গ্রামের অদূরে নদী ছিল। পিয়ালী নদী। সেই নদীর জলে জমিদার বাবুদের মামুলি একখানা বজরা বাঁধা থাকিত। জমিদারী-পরিদর্শনে কেহ কখনও বাহির হইলে এই বজরায় করিয়া বাহির হইতেন। রজনীনাথ বজরার উপর একখানা পান্সী যোগ করিয়া দিল। তাহাতে আপাততঃ প্রত্যহ বেড়াইবার ধূমে নদী-বক্ষও চঞ্চল হইয়া উঠিল। অর্থাৎ নূতন কর্ত্তা জলে-স্থলে চারিদিকে আপ-নার অমোঘ আধিপত্যের বিজয়-নিশান এমন সমারোহে উড়াইয়া দিল যে, গ্রামের নিরীহ লোকগুলা তন্দ্রাভঙ্গে জলে-স্থলে চারিদিকে প্রাণোন্মাদনার এক জীবন্ত উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করিল।

কয়েকদিন পরে বাবুদের মাছ ধরার বাতিক চাগিল। চার্, ছিপ, সুতা-বঁড়শী লইয়া বাবুরা একটা পুকুরকেও ছাড়িয়া দিল না। শেষে সখ মিটিলে বাতিক চাগিল, শীকারে যাইব। কোট ও খাকি সার্ট পরিয়া রজনীনাথ বন্দুক লইয়া এ-বন ও-বন চষিয়া ফেলিল; সঙ্গে থাকিত কলিকাতার পারিষদবর্গ। প্রত্যেক ব্যাপারে পল্লী হইতেও সঙ্গী-সহচর মিলিত বিস্তর।

গ্রামের কিছু দূরে একটা বিল ছিল। সঙ্গীরা পরা-মর্শ দিল, সেখানে পাখী মিলিবে। দেশের সঙ্গীর দল আগের রাত্রি হইতে সেখানে গিয়া আস্তানা পাতিল! বাবুরা মোটর হাঁকাইয়া সকালে রওনা হইবেন, কথা রহিল।

ভোর বেলায় পারিষদবর্গ-সমেত বাবু মোটর হাঁকাইয়া বহুদূর পথ অতিক্রম করিল। অঙ্গনা গ্রামের শেষে মোট-রের পথ নাই,—পায়ে হাঁটিয়া পাড়ি জমাইতে হইবে। কুছ্‌ পরোয়া নাই—বাবুরা তখন গাড়ি ছাড়িয়া নামিয়া পড়িল।

দুইধারে আম-কাঁঠালের বাগান। ছায়া-ভরা পথ। মাঝে মাঝে কুঁড়ে-ঘর, পুকুর, ভাঙ্গা কোঠা। নিপুণ পটুয়ার আঁকা ছবির মত দেখিতে—সবুজ, হরিৎ, ধূসর রঙের পোঁছ-লাগানো! প্রায় দেড় ক্রোশ হাঁটিয়া তাহারা একটা বাগানের পথ ধরিয়া যাত্রা সংক্ষেপ করিয়া লইল।

বাগানের এক কোণে ছোট একটি পুকুর। পুকুরের পাড়ে পুরানো জীর্ণ একটা কোঠা-বাড়ী। অগ্রবর্ত্তী এক জন পারিষদ হঠাৎ একটা জামরুল গাছের পিছনে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। পিছন হইতে রজনীনাথ কহিল,—কি হে, থেমে গেলে যে!

অঙ্গুলি তুলিয়া সঙ্গী সঙ্কেত করিল, চুপ!

সকলে অবাক্ হইল। আরও কাছে আসিলে সে অঙ্গুলি-সঙ্কেতে ঘাটের দিকে দেখাইল। ঘাটে এক অপূর্ব্ব সুন্দরী তরুণী স্নান করিতেছে। কতকগুলা তালগাছের গুঁড়ি ফেলিয়া ঘাটের ধাপ তৈয়ার হইয়াছে। শেষ গুঁড়িটার ধারে কতকগুলি মাজা বাসন। ঘাটের উপর একধারে রাশীকৃত পাঁশ গাদা হইয়া রহিয়াছে, অন্য ধারে কচুর জঙ্গল ও ঝোপের মধ্য দিয়া পায়ে-চলা সরু পথ। পাড়ে সেই জীর্ণ বাড়ী, কতকালের প্রাচীন যখের মত দাঁড়াইয়া। বাড়ীর দেওয়াল বহিয়া লতা-পাতা উঠিয়াছে। বাড়ীর মধ্য হইতে কুণ্ডলীকৃত ধূম।

রজনীনাথ তরুণীকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল,—এ দেব-কন্যা, না, অপ্সরী!

একজন সঙ্গী বলিল,—জঙ্গলের মধ্যে বনদেবী!

আর একজন বলিল,—এ ফুল রাজোদ্যানেই শোভা পায়।

রজনীনাথ একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিল। সঙ্গী বলিল,—হায় রে, হতভাগ্য রাজোদ্যান!

বলিয়া সে রজনীনাথের পানে চাহিল। রজনী নির্নিমেষ-নেত্রে তরুণীকে দেখিতেছিল। তরুণী কিছুই জানিল না। কালো জলে সোনার অঙ্গ মেলিয়া নির্জ্জন জলের কোলে সে যেন রূপের ফোয়ারা খুলিয়া দিয়াছে। কালো জল তার রূপের প্রতিবিম্ব বুকে ধরিয়া উল্লাসে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে।

তরুণী স্নান সারিয়া ঘাটে উঠিল, তীরে দাঁড়াইয়া ঘন-কৃষ্ণ কেশের রাশি খুলিয়া দিয়া আর্দ্র কেশ মুছিল; তার পর কাপড়ের জল নিঙ্ড়াইয়া বাসনের গোছা তুলিয়া বাড়ী চলিয়া গেল।

রজনীনাথ তখন বাড়ীটার পানে সতৃষ্ণ নিরাশ দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে বাগানের পথ ধরিয়া নদীর অভিমুখে চলিল।

বাগানের পর বাগান,—রাশি রাশি আমগাছের জঙ্গলের মধ্যে একটা-একটা ফলের গাছ—আম, জাম, কাঁঠাল, গাব, চাল্‌তা, জামরুল। বাগান পার হইয়া সরু পথ। খানা-ডোবা ঝোপের ধার দিয়া সেই পথ ধরিয়া নদীর কিনারায় আসিয়া সকলে পৌঁছিল। স্থির নদী-বক্ষে যে-পান্সী ভাসিতেছিল,—সকলে সেই পান্সীতে উঠিল। আট দাঁড়ে পান্সী ছাড়িল।

## ২

তরুণীর নাম লক্ষ্মী। ওপারে পলাশডাঙ্গা গ্রাম। সেখানে একটা মাইনর স্কুল আছে। লক্ষ্মীর স্বামী রঘুনাথ সেই স্কুলে মাষ্টারী করে। এককালে তার অবস্থা মন্দ ছিল না। বাড়ী ছিল বর্দ্ধমানের ওদিকে। দামোদর সেবারে ফুলিয়া ফাঁপিয়া তার বাড়ী ক্ষেত-খামার সব গ্রাস করিয়াছে। রঘুনাথ কোনমতে প্রাণে বাঁচিয়া যায়। তার পর দুঃখে-কষ্টে কয়মাস কাটাইয়া হঠাৎ খবর পাইয়া এই চাকরির পিছনে সে ছুটিয়া আসে। অজ-পাড়াগাঁয়ের স্কুল,—মাষ্টারী করিতে লোক জোটে না। কাজেই রঘুনাথকে এখানে চাকরি জুটাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। পলাশডাঙ্গায় বাসের যোগ্য তেমন ঘর নাই। যা আছে, সেখানে ইতর লোকের ভিড়। এখানে নির্জ্জন প্রান্তরে এই ভগ্ন কুটীরখানি তাই সে সংগ্রহ করিয়াছে। ভাড়া দিতে হয় না। বাড়ীর মালিক এক বৃদ্ধা। সম্পর্কে তার পিশী। তাহাকে দেখিবার শুনিবার কেহ ছিল না। রঘুনাথ তাহাকে খাইতে দেয় এবং এই পরিচর্য্যার পরিবর্ত্তে সে এখানে পরম সুখে বাস করিতেছিল। রঘুনাথ ও লক্ষ্মীর পরিচর্য্যায় বৃদ্ধা পরম প্রীতিলাভ করিয়াছেন,—এবং তিনি এমনও আশা দেন যে, তাঁহার ধূলা-গুঁড়া যা আছে, সব তিনি রঘুনাথের স্ত্রী লক্ষ্মীকে দিয়া যাইবেন। তাঁর আর এ ত্রিভুবনে কে বা আছে!

ছেলেপিলের মধ্যে রঘুনাথের একটি কন্যা,—মন্টি। বয়স পাঁচ বৎসর। দেখিতে ঠিক ফুলের কুঁড়ির মত। এই দারিদ্র্য আর অবহেলার মধ্যে থাকিলেও মেয়েটি এমন যে, তার পানে একবার চোখ পড়িলে সে-চোখ আর সহজে ফিরিতে চাহে না।

তার মা লক্ষ্মী রূপে যেমন লক্ষ্মী, গুণেও তেমনি। রঘুনাথ প্রায়ই বলে,—এ রূপ রাজার ঘরে মানায়, লক্ষ্মি। আমার মত লক্ষ্মীছাড়ার ভাঙ্গা কুঁড়েয় জীবন কাটালে তুমি,—ভগবানের এই কি বিচার!

লক্ষ্মী তার মুখে হাত চাপা দিয়া বলে,—থাক্, থাক্! এই কুঁড়েই আমার রাজার প্রাসাদ!

নিশ্বাস ফেলিয়া রঘুনাথ বলে,—একগাছা কাচের চুড়ি তোমায় দিতে পারি না, লক্ষ্মি!

স্বামীর পায়ে হাত রাখিয়া লক্ষ্মী বলে,—যাও, কি যে বলো! এই নোয়া আমার হীরে-মাণিকের চেয়েও ঢের বেশী দামী। এর দাম, তুমি পুরুষমানুষ, তুমি কি বুঝবে!

এই বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে জীবন লইয়া লক্ষ্মী খুবই সন্তুষ্ট আছে। একটি দিনের জন্য তার মনে এতটুকু অতৃপ্তি উঁকি দেয় না। তার কারণ, যে-সম্পদ সে লাভ

করিয়াছে, তার কাছে রাজার ঐশ্বর্য্য সে অতি তুচ্ছ মনে করে। সে-সম্পদ, স্বামীর প্রাণ-ঢালা ভালোবাসা।

রঘুনাথ আপনাকে অকপটে লক্ষ্মীর কাছে ধরিয়া দিয়াছে। জীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটি কাজে সে লক্ষ্মীর পরামর্শ লয়। স্কুলে কোন্ ছেলে কবে কি দুষ্টামি করিল, কোন্ ছেলেটি বেশ ভালো পড়াশুনা করিতেছে,—সে খপর পর্য্যন্ত লক্ষ্মীর অজানা থাকে না! এই নির্জ্জন অরণ্য-প্রদেশে একটি কোণে বসিয়া আশ-পাশের প্রত্যেক লোকটির কথা তার বিশেষ জানা। স্কুলের অনেক ছেলেই যেন তার বহুকালের চেনা! ক্যাবলা—সে ঐ নারাণ চক্রবর্ত্তীর ছেলে। ছেলেটি তোৎলা ব'লিয়া ক্লাশের ছেলেরা তাহাকে খ্যাপায়। গণেশ,—ভারী ভালো। পড়াশুনায় সে সকলের উপরে। এমনি করিয়া প্রত্যেক ছেলেটি তাহার কত চেনা, যেন কত কালের জানা! অথচ সে কোনদিন তাহাদের চক্ষে দেখে নাই।

একদিন রঘুনাথ বলিল,—ছেলেদের নিয়ে একটা দল খুলেচি। তারা এমনি তোয়ের হচ্ছে যে কারো ঘরে আগুন লেগেচে শুনলে প্রাণের মায়া ছেড়ে তখনি আগুন নিবুতে ছুটবে,—তা সে রাত বারোটা হোক্, আর বেলা পাঁচটাই হোক্! তারা সাঁতারে এমন দড় যে, কেউ জলে ডুবেচে দেখলে তখনি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে উদ্ধার করতে ছুটবে। দলের নাম রেখেচি, তরুণ-সঙ্ঘ।

লক্ষ্মী বলিল,—বাঃ, বেশ তো! আর কি করবে তারা? জলে ডোবা আর আগুন লাগার বিপত্তি, এ তো নিত্য ঘটচে না—নিত্যকার জন্যে কি কাজ শেখাচ্ছ?

রঘুনাথ বলিল,—তারা প্রতি-রবিবার গাঁয়ের সবার দোরে দোরে গিয়ে ভিক্ষে করে চাল-ডাল-পয়সা নিয়ে আসে। যারা অনাথ আতুর, খেতে পায় না, তাদের সেই চাল-ডাল হপ্তায় হপ্তায় ভাগ ক'রে দেওয়া হয়।

লক্ষ্মী বলিল,—আর যাদের অসুখ-বিসুখ হয়, তাদের দেখাশোনার কি ভার নেবার?

রঘুনাথ একটু চিন্তিতভাবে কহিল,—সেইটেই ভাবনার কথা। সে তো পয়সা না হলে হয় না। ওষুধ-পথ্যি জোগাড় করা, সে তো খালি গতর দিয়ে হয় না লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী বলিল,—সত্যি, তাদের কষ্ট আগে দূর করা উচিত। রোগে ভুগে বিনা-চিকিৎসায় কত লোক যে মারা যাচ্ছে—আহা!

রঘুনাথ বলিল,—ভগবান বুঝি মুখ তুলে চেয়ে সে অভাবও ঘোচাবেন এবার! একটু আশা দেখা যাচ্ছে লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী সাগ্রহে প্রশ্ন করিল,—কেমন করে?

রঘুনাথ বলিল,—কলকাতায় একটি ছেলে, তার নাম যতীশ। সে এবার এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়েছে। তার মামার বাড়ী পলাশ-ডাঙ্গায়। তাদের অবস্থা খুব ভালো। এক বিধবা মা আছেন,—তা ছেলেটি কখনো পাড়াগাঁ দেখে নি। সে এসেচে মার সঙ্গে এবার এই ছুটিতে পাড়াগাঁ দেখতে। মাতামহর বেশ পয়সা-কড়ি আছে, এবং ঐ ছেলেরই সব। মাতামহী ছাড়া তার এখানে কেউ নেই। সেই ছেলেটি আমাদের তরুণ-সঙ্ঘ দেখে তাতে যোগ দিয়েচে। ক'দিনে সে চমৎকার সাঁতার শিখেছে। সে বলেছে, তার মাকে ব'লে একটা হোমিওপ্যাথির বাক্স আর কতকগুলো ওষুধের বই কিনে দেবে। হোমিওপ্যাথি বইগুলো প'ড়ে আমিই একটু-আধটু শিখবো। তার পরে ছেলেদের কিছু কিছু শিখিয়ে দেবো। তাতে ছোটখাট ব্যায়রামের চিকিৎসা এক রকম চলে যাবে'খন।

লক্ষ্মী বলিল,—তোমার ঐ সঙ্ঘের ছেলেদের এক-দিন নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়ালে হয় না?

রঘুনাথ সাগ্রহে বলিল,—খাওয়াবে লক্ষ্মী?

লক্ষ্মী বলিল,—তুমি যদি বলো…

—বেশ তো!…একটা সুবিধে হয়েচে। তারা একদিন কোথাও বন-ভোজন করবে বলছিল। তাদের বরং বলি, এই বাগানে এসে চড়িভাতি করো। জন পনেরো ছেলে,—যারা বড়, তাদের নিয়েই চড়িভাতি হবে। তুমি গোছগাছ করে তাদের সব বন্দোবস্ত করে দিয়ো।

লক্ষ্মী সহর্ষে সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

রঘুনাথ বলিল,—তুমি আমার লক্ষ্মী!

হাসিয়া লক্ষ্মী বলিল,—আমি তো লক্ষ্মী—আর তোমারই লক্ষ্মী, এ আর নতুন কথা কি!

## ৩

শীকারে গিয়া রজনীনাথের মন শীকারে ঠিক বসিতে-ছিল না। সেই যে পুকুরের কালো জলে রক্ত কমলটি ফুটিতে দেখিয়া আসিয়াছে, তাহার বর্ণে-গন্ধে মন তার একেবারে দিশাহারা হইয়া উঠিল। ওপারে পাল্কী রাখিয়া রজনী সদলে একটা মাঠে গিয়া উঠিল। মাঠ ভাঙ্গিয়া বাঁধ পার হইয়া জলা। জলার ধারে ধারে চকাচকি, ছোট-ছোট স্নাইপ, বাল-হাঁস—এমনি কয়েকটা মিলিল। তার পর সূর্য্য যখন আকাশের মাঝামাঝি দীপ্ত তেজে তার সাত ঘোড়ার রথ চালাইয়া আসিয়া দাঁড়াইল, তখন রথের চাকাগুলা দিয়া যেন আগুন ঝরিতে লাগিল, এবং সান-হ্যাট্ ফুঁড়িয়া তার তীব্র হল্কা মাথা জ্বালাইয়া দিতেছিল, তখন রৌদ্রে ভাজিয়া ঘামিয়া শীকারীর দল আসিয়া পাল্কীতে উঠিল। সব কষ্ট ধীরে ধীরে কোথায় যেন মিলাইয়া যাইতেছিল! সেই

স্নিগ্ধ ছায়া-করা বাগানের বুকে সেই পুকুর দেখিবে! এবং তার কোলে সেই কমলের দেখা কি আর একবার মেলে না?

পার হইয়া এপারে আসিলে এক জন সঙ্গী বলিল,—এইবার সেই পরীস্থানে একবার উঁকি দিয়ে যেতে হবে!

কথাটা রজনীর ভালো লাগিল না। সে চায়, একা সে-রূপ দেখিতে—তাহাতে ভাগীদার জুটিবে, এ চিন্তা কাঁটার মত তার বুকে বিঁধিল!

এইবার সেই বাগান। ঐ সেই গাছগুলা—ঐ সেই পুকুর। আশার উচ্ছ্বাসে মন মাতিয়া উঠিল। গাছের ডালে কোথায় একটা ঘুঘু ডাকিতেছিল। তার সে করুণ সুর চারিধারে এক তন্দ্রালস ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছে। নিঝুম পুরী চারিধার স্তব্ধ। সেই পরীর বাসভূমি ঐ সেই ভাঙ্গা ঘরখানি—দারুণ স্তব্ধতার মধ্যে মৌন মূক দাঁড়াইয়া আছে! জলে এতটুকু উচ্ছ্বাস নাই! স্থির শান্ত জল—শ্যাওলায় ভরা—ঠিক যেন কে একখানি সবুজ মখমল বিছাইয়া রাখিয়াছে! ঘাটের কাছে খানিকটা জায়গায় শুধু শ্যাওলা ছিল না, জলটুকু দেখাইতেছিল ভাঙা আরসীর মলিন কাচখণ্ডের মত।

একজন সঙ্গী মৃদু স্বরে গান ধরিল,

ঐ দেখা যায় ঘরখানি!

আর-একজন কহিল, চুপ কর্ ইষ্টুপিড্।

এক জায়গায় আসিয়া গতি কেমন মন্থর হইয়া গেল। পা কাহারো চলিতে আর চায় না! অথচ পুকুরে কেহ নাই! বাড়ীটার মধ্যে সকলে অধীর দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া দিল—কেহ নাই! কোনো বাতায়নে কাহারো চাঁদমুখ,—কৈ, চিহ্নও নাই! বাড়ীটা এমন স্তব্ধ যে ভিতরে কেহ আছে বলিয়া মনে হয় না। পুকুরের এধারে পাঁশ-গাদায় একটা কুকুর শুইয়া ঘুমাইতেছে! খোলা দ্বার-পথে ঐ যে একটুখানি উঠান দেখা যাইতেছে, একটা তুলসীগাছ, মাথায় জলের ঝারি। তা ছাড়া, লোকের বাসের এতটুকু সাড়া নাই, লক্ষণ নাই!

সঙ্গীরা বলিল,—এসো, অতিথি হওয়া যাক্।

রজনী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—বাড়ী চলো হে!

একজন সঙ্গী বলিল,—নিদেন এক গ্লাস জল চেয়ে খেয়ে যাই—ভারী তেষ্টা পেয়েচে।

সকলে অপ্রসন্ন হইল। সঙ্গীরা ব্যাপারটাকে যতখানি তরল করিয়া দেখিতেছিল, রজনী ঠিক তেমন ভাবে দেখে নাই। তার মনে তরুণীর রূপ গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। সে গৃহে চলিল, অত্যন্ত ভারী মন লইয়া—নৈরাশ্যের এক তীব্র জ্বালায় প্রাণটাকে পোড়াইতে পোড়াইতে!

কিন্তু কেন এ দাহ! যাহাকে পাইবার নয়, আয়ত্ত করিবার নয়, যে দুর্ল্লভ, তাহার পানে চিত্ত এমন উধাও ছুটিতে চায় কি বলিয়া!—শুধু যাতনা পাওয়া সার বৈ তো না! আহা, তার চেয়ে সুখে থাক্, সুখী থাক্ ইহারা! সে হতভাগ্য, তার সব থাকিয়াও কিছু নাই! তরুণ মন থিতাইতে পায়, এমন একটু রূপের অবলম্বনও তার গৃহে নাই,—কোথাও কি আছে!

গৃহে ফিরিয়া স্নানাহার সারিয়া সঙ্গীরা বাহিরের ঘরে শয্যায় আড় হইয়া পড়িল। রজনীও ক্লান্ত হইয়াছিল—দুই চোখ গাঢ় ঘুমে ঢুলিয়া আসিতেছিল। সে গিয়া নিজের ঘরে ঢুকিল। আজ মনে হইতেছিল, ঐ যে রূপসী তরুণীকে সেই পুকুর-ঘাটে দেখিয়া আসিয়াছে, তার রূপ, তার অবয়ব, তার মাধুরীর সহিত তুলনা করিয়া দেখিবে, স্ত্রী জয়ন্তীর মধ্যে তার কিছু সে পায় কি না! এই জয়ন্তীকে দিয়া তার পরশ একটু যদি অনুভব করা যায়! সে তরুণা নারী, জয়ন্তীও তাই!

স্ত্রী জয়ন্তী আসিয়া কাছে বসিল। রজনী তাহার মধ্যে যদি এই অতৃপ্তি-পূরণের কিছু পায়, আজ তাই নূতন চোখ লইয়া—প্রাণের দরদ লইয়া গভীর অভিনিবেশ-সহকারে জয়ন্তীকে সে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল!···না, না। কিছু না···। এ একটা মাটীর স্তূপ, মাংসের ঢিপি! এর না আছে সৌন্দর্য্য, না আছে মাধুর্য্য!—তাহার পাশে?···জয়ন্তী একটা কাঠের পুতুল, কাঠের পুতুল! না আছে তার অঙ্গে সৌষ্ঠব, না আছে কোনো পারিপাট্য! এ যে! গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া রজনী ভাবিল,—ক্যাডাভারাস্!

যে পথে সে ছুটিয়াছিল, সে পথটার উপর ঘৃণা ধরিয়া গেল। কি নির্ব্বোধ সে! রূপের বাসনা তখন আরো তীব্র হইয়া বুকে ফুটিয়াছে। নাচ গান হাসি তামাসা, সমস্তই একান্ত নিরর্থক, পাগলামি বলিয়া মনে হইল। রূপ! রূপ! রূপ! সারা ত্রিভুবন জুড়িয়' রূপের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে! সেই তরুণীকে কেন্দ্র করিয়া রূপের তরঙ্গ, তরঙ্গের পর কেবলি তরঙ্গ ছুটিতেছে! পুকুরের তীরে বসিয়া সে ঐ তরঙ্গ দেখিয়া দিন কাটাইবে! সে কিছু চায় না! সব ফেলিয়া সব ছাড়িয়া ঐ রূপের তরঙ্গে শুধু ঝাঁপ দিতে চায়! রূপের কাঙাল মন বুঝিয়াছে, কি ধনেই সে বঞ্চিত!

জয়ন্তী বলিল—পাখীগুলো রান্না হবে তো?

রূপের হাওয়ায় সে ভাসিয়া চলিয়াছিল, জয়ন্তীর কথা সে হাওয়ায় যেন ধূলি ছিটাইয়া দিল। বিরক্ত হইয়া বলিল,—হ্যাঁ।

জয়ন্তী বলিল,—তোমরাই রাঁধবে তো! বামুন-মেয়ে কি পাখী রাঁধতে রাজী হবে?

আবার ঝাঁজ-মিশানো বিরক্তির সুরে রজনী বলিল,—যা হয় করো গে। আমায় বিরক্ত করো না।

জয়ন্তী বলিল,—ঘুমোবে? তা ঘুমোও, আমি বাতাস করি।

জয়ন্তী পাখার বাতাস করিতে লাগিল, রজনী রূপের ধ্যানে তন্ময় থাকিয়া কখন্ একসময় ঘুমাইয়া পড়িল! ঘুমাইয়া সে স্বপ্ন দেখিল :—

ঘর ছাড়িয়া—সব ছাড়িয়া কোথায় কোন্ নির্জ্জন বনে দারুণ শ্রান্ত হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, উঠিয়া জলের সন্ধান করিবে, সে শক্তিও নাই!—হঠাৎ…ও কে! আকাশ ফাটিয়া আলোর ঝর্ণা ঝরিয়া পড়িল!…চারিধার আলোয় আলো হইয়া গেল। বিস্মিত দুই চোখ তুলিয়া রজনী দেখে, তার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সেই তরুণী! এ যে পরীর বেশ—প্রজাপতির বিচিত্র পাখার মত দু'খানি পাতলা হালকা পাখা বাতাসের ভরে মৃদু কাঁপিতেছে! কেশের রাশি শ্রাবণের মেঘের মত নামিয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে! পরীর হাতে ফুলের ছড়ি, কপালে তারা জ্বলিতেছে—দিনের এই প্রখর আলো, সে তারার দীপ্তির পাশে একেবারে ম্লান হইয়া গিয়াছে! সে রূপের হিল্লোল চোখে দেখিয়া তার সব পিপাসা মিটিয়া গেল; সব ক্লান্তি ঘুচিয়া গেল। পরীর অধরে মৃদু হাসি—বিশ্বভুবন-ভুলানো, সব-দুঃখ-জুড়ানো মৃদু মধুর হাসি! রজনী সব ভুলিয়া দুই হাত তুলিল, পরীর ঐ যে আঁচলখানি ভুমে লুটাইয়া পড়িয়াছে—সেই আঁচলের একটু পরশ পাইতে! কিন্তু হাত তুলিতেই সব কোথায় মিলাইয়া গেল!…ছায়া, ছায়া, কিছু নাই!

রজনীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—চোখ মেলিয়া সে ধড়-মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। কোথায় বন, কোথায় বা পরী!…এ তার ঘর। সে বিছানায় শুইয়া, আর তার পাশে বসিয়া—জয়ন্তী!…কি কুৎসিত!

বিরক্ত চিত্তে শুইয়া সে আবার চক্ষু মুদিল।

অসহ্য! অসহ্য এ পিপাসা! এ কি মরীচিকার পিছনে অধীর মন চঞ্চল হইয়া ক্ষ্যাপার মত ঘুরিয়া মরিতেছে! ওগো দুর্লভ, এ কি মায়ার পাশে আষ্টে-পৃষ্ঠে তাহাকে করিয়া বাঁধিতেছ! এ বাঁধন যে গায়ের মাংস কাটিয়া হাড়গুলাকে অবধি চূর্ণ করিয়া দিতেছে!

ঘুম আসে না, চিন্তাও ছাড়ে না! এমন তো তার কখনো হয় নাই! কলিকাতায় অমন কত রূপসীর রূপের মেলায় সে ঘুরিয়াছে—কত বেশে কত ভঙ্গীতে তারা তৃপ্তির কত পেয়ালা ভরিয়া আনিয়াছে—কিন্তু আজ এ অতৃপ্তির মাঝে যে নেশা প্রাণটাকে ভরপুর করিয়া দিয়াছে, এ নেশা, এ বিহ্বলতা তার যে একেবারে অজানা ছিল!

সে পরের—পরের ঘরে ফুটিয়াছে, পরের তৃপ্তির কামনার ধন সে—তবু…তার চিন্তাতেও এ কি সুখ! তাহাকে পাইবার নয়, তবু খেলাচ্ছলে মনের মধ্যে তাহাকে আপনার করিয়া পাইয়া, তাহারি চিন্তায় তাহারই ধ্যানে পড়িয়া থাকা—ইহাতেও কি সুখ, কি এ পরিতৃপ্তি! চোখ বুজিয়া রজনী ভাবিতে লাগিল, সে আমার—সে আমার—সে আমার গো! আলোয় তার কথা ভরা রহিয়াছে, বাতাসে তার কথা মিশিয়া আছে! এ আলো, এ বাতাস আমাকেও ঘিরিয়া আছে, আমাকে জড়াইয়া রহিয়াছে! নিত্যকার এই আলো-বাতাস বিচিত্র মোহে তাহাকে আবিষ্ট করিয়া তুলিল। মাঝে মাঝে মোহের ঘোরে চোখের পাতা যেই খুলিয়া আসে, স্বপ্ন অমনি টুটিয়া যায়—কঠোর বাস্তবের ঘা খাইয়া চোখের সামনে সে-সময় জাগিয়া ওঠে, জয়ন্তী! না! রমণীকে এমন কুৎসিত করিয়া সৃষ্টি করিতে পারো ভগবান্!

জয়ন্তীকে তার যে একেবারে ভালো লাগিত না, এমন নয়। তবে তার মধ্যে মাদকতার অভাব, ঝাঁজের অভাব। এইটুকুই চোখে পড়িত—কলিকাতার বিচিত্র সংসর্গে প্রাণের যে অগাধ লিপ্সার স্বাদ সে পাইয়া আসিয়াছে, তার তুলনায় এ নির্জীব, প্রাণ-হীন, তবু ইহার মধ্যেও কি যেন একটা সুর ছিল! আজ সে সুরও কাটিয়া গিয়াছে! একটিবারের জন্য দেখা দিয়া সে তরুণী প্রাণটাকে কি রঙেই রাঙাইয়া দিয়াছে—তার ফলে এখন সমস্তটা আগাগোড়া ম্লান বলিয়া মনে হইতেছে। মন ঠাঁই পাইতেছে না, কিছুতেই—ঠিকরাইয়া সরিয়া-সরিয়া যাইতেছে।

রজনী উঠিয়া পড়িল, উঠিয়া বাহিরের ঘরে গেল। সঙ্গীরা নিদ্রা যাইতেছে। সে আসিয়া তাহাদের তুলিয়া দিল, বলিল,—পাখীগুলোর ব্যবস্থা করো।

সঙ্গীরা নিদ্রা-জড়িত কণ্ঠে বলিল,—হবে'খন। তাড়া কেন?

রজনী বলিল,—কাল আরো ভোরে বেরুবো, শীকারে। ঐ জায়গাতেই—কেমন?

ঘুমের ঘোরেই সঙ্গীরা বলিল,—আচ্ছা।

## ৪

পরের দিন ভোরে আবার সেই শীকার-যাত্রা। সেই মোটর, সেই পথ, সেই বাগান, সেই পুকুর। পুকুরে তরুণী এখনো দেখা দেয় নাই। শীকারীদের দলে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। রজনী আর অগ্রসর হইতে চায় না—নৈরাশ্যের ঘা খাইয়া পা দুইটা চকিতে অত্যন্ত ভারী ঠেকিল। চলার সব উৎসাহ নিমেষে যেন উবিয়া গেল। অথচ বাগানের মধ্যে জড়-ভরতের মত দাঁড়াইয়া থাকা

চলে না। লোক-জন চলাফেরা করিতেছে—এই সকাল-বেলায়! একটা চক্ষু-লজ্জাও ত আছে!

উপায়? এক জন সঙ্গী বলিল,—বাড়ীতে চলো,—আলাপ করা যাক!

আর-এক জন বলিল,—পাগল!

রজনী বলিল,—সে হয় না!

প্রথম সঙ্গী বলিল,—তা বলে তো চুপ করে এখানে দাঁড়িয়ে থাকাও চলে না!

রজনী বলিল,—মোটর-গাড়ীতে গিয়ে বসা যাক্, আবার ফিরে আসবো।

দ্বিতীয় সঙ্গী বলিল,—না, আমি এমন বাজে ঘোরার মধ্যে নেই। এতটা পথ—কি যে বলো!

প্রথম সঙ্গী বলিল,—তবে চল, সটান্ ঘাটে যাই। আজ না হয় সকাল-সকাল ফিরবো'খন। আজ শীকার মিল্‌বে ভালো। কাল একটু বেলা হয়ে গেছলো। একে গ্রীষ্মকাল, তায় চড়চড়ে রোদ—পাখী মিলবে কেন বেলা হলে?

রজনী বলিল,—মিছে যাওয়া। কাল বন্দুকের আওয়াজে চারিধার ঝালাপালা হয়েচে। আজ আর পাখী ওখানে আসবে কি!

দ্বিতীয় সঙ্গী বলিল,—তবে শীকারে এলে কেন?

রজনী মৃদু হাসিল। প্রথম সঙ্গী বলিল,—রমণীর মন-শীকারে বেরিয়েচো বুঝি আজ?

রজনীর মুখ লাল হইয়া উঠিল। দ্বিতীয় সঙ্গী বলিল, না ভাই, ও পথে আমি নেই। ভদ্দর লোক,—একজনের স্ত্রী—লজ্জা ত্যাগ করা যায় না হয়,—কিন্তু ভয়, সেটাকে ত্যাগ করতে পারছি না।

রজনী করুণভাবে তার পানে চাহিল। সে বলিল,—অভিপ্রায়টা খুলে বলো দিকি!

রজনী বলিল,—শুধু একটু চোখের দেখা—এই আর কি!

দ্বিতীয় সঙ্গী বলিল,—না ভাই, ও দেখাতেও আশঙ্কা বিলক্ষণ!

প্রথম সঙ্গী বলিল,—None but the brave··· জানো তো?

দ্বিতীয় সঙ্গী বলিল,—একে bravery বলো! Coward!

রজনী বলিল,—আমরা তো কারো অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে যাচ্ছি না। ভগবান একজোড়া চক্ষু দিয়েচেন, তার সদ্ব্যবহার করচি।

দ্বিতীয় সঙ্গী বলিল,—দৈবাৎ চোখে কিছু পড়ে, দৃষ্টি চালাও। তা বলে এমন খুঁজে পেতে এসে চোখ দেওয়া! এ মতি ছাড়ো।

প্রথম সঙ্গী বলিল,—কিন্তু এ তো দুর্মতি নয়। লোভও করচি না। শুধু নিষ্কাম দর্শন-সুখ!

দ্বিতীয় সঙ্গী বলিল,—ও সব তর্ক তুলতে চাই না।

অবস্থা যা এখন—হয় এগোও, নয় পেছোও। এভাবে তাঁর প্রতীক্ষায় থাকা ঠিক হবে না—সেটা ভালো দেখাচ্ছে না।

রজনী বলিল,—কেন, এ বাগানে আমরা পাখী খুঁজচি।

দ্বিতীয় সঙ্গী বলিল,—এ বাগানে পাখী!

রজনী বলিল,—হ্যাঁ ঘুঘু! ঘুঘু তো মারতে পারি।

দ্বিতীয় সঙ্গী বলিল,—মারো ভাই, ঘুঘুই মারো। কিন্তু কথায় আছে, ঘুঘু দেখেচো, ফাঁদ ছাখোনি!

রজনী বলিল,—ফাঁদও না হয় দেখলুম! দেখলুম কি, দেখেচি।

প্রথম সঙ্গী বলিল,—শুধু দেখেচো কি, ফাঁদে পড়েচো! বলিয়া মস্ত রসিকতা করিয়াছে ভাবিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তার সে হাসি একটা বিপুল প্রতিধ্বনি তুলিয়া দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িল, যে নির্জ্জন বনভূমি কম্পিত হইয়া উঠিল।

ঠিক সেই সময় সেই দ্বার-পথে তরুণীর ছায়া দেখা গেল। তরুণী ঘাটে আসিতেছিল,—তাহাদের হাস্য-রবে অপরের সান্নিধ্য বুঝিয়া সরিয়া গেল।

রজনী বলিল,—ঐ হে—

দ্বিতীয় সঙ্গী বলিল,—চলে চলো, চলে চলো। এখানে দাঁড়িয়ে থাকে না। বেচারী আসতে পারচে না।

এই কথা বলিয়া দ্বিতীয় সঙ্গী অগ্রসর হইল,—রজনী ও প্রথম সঙ্গী তখন তার অনুসরণ করিল।

ঘাটে সেই পান্সী—তেমনি সাজানো। সকলে পান্সীতে উঠিলে পান্সী ছাড়িবার উদ্যোগ করিল। হঠাৎ রজনী বলিল,—যাঃ, কার্টরিজগুলো মোটরে ফেলে এসেচি। তার পর প্রথম সঙ্গীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—মাখন, এসো না ভাই, নিয়ে আসি। না হলে যাওয়া মিছে! দ্বিতীয় সঙ্গীর পানে চাহিয়া বলিল,—তুমি আসবে, না, নৌকোতেই অপেক্ষা করবে?

রজনীর চোখের দৃষ্টিতে একটা অভিসন্ধি মাখানো ছিল,—দ্বিতীয় সঙ্গী হরেন্দ্র তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল,—তোমরা যাবেই তো, তা যাও। মোদ্দা শীগ্‌গির ফিরো। আমি নৌকাতেই থাকি। আবার এতখানি পথ,—না ভাই, আমার অত সখ নেই, শক্তিও নেই।

মন্মথর মুখে একটা বিবাক্ত হাসির ঢেউ ছুটিয়া গেল। সে বলিল,—এসো রজনী, আমি বন্ধুকৃত্য করি তোমায় সঙ্গ দিয়ে। বেচারী একলা যাবে!

রজনী মন্মথকে লইয়া তীরে নামিল ও নিমেষে দুইজনে বাবলা-ঝোপের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

হরেন তখন জলে পা ডুবাইয়া গান ধরিল,—

খুলে দে তরণী, খুলে দে তোরা স্রোত বহে যায় যে।
মন্দ মন্দ অঙ্গভঙ্গে নাচিছে তরঙ্গ রঙ্গে—
এই বেলা খুলে দে—
খুলে দে তরণী, খুলে দে তোরা স্রোত বহে যায় রে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে দুইজনে ফিরিয়া আসিল, দুই-জনেরই মুখে হাসি। তাহারা নৌকায় ফিরিলে রজনী বলিল,—মন্মথটা গাড়োল! কার্টরিজ ঐ ব্যাগে আছে—তা বলেনি! মোটরে খুঁজে পাই না, শেষে বললে, ব্যাগে করে নিয়েচি। মিছে এতখানি সময় নষ্ট হলো, তাছাড়া এই পরিশ্রম!

হরেন ক্রূর দৃষ্টিতে রজনীর পানে চাহিল, মৃদু স্বরে কহিল,—এত কৈফিয়ৎ কেন!

মন্মথ মৃদু স্বরে বলিল,—মাঝিদের কাছে ইজ্জৎ রাখতে হবে তো! খালি হাতে ফিরলুম! তারা বেকুব ভাববে যে!

হরেন্দ্র বলিল,—মনে পাপ ঢুকেচে—নিষ্কাম দর্শনাকাঙ্ক্ষী আর নও তবে? আগে থাকতে দোষ সামলাচ্ছ তাই!

আট-দাঁড়ে পান্সী চলিয়াছে তরতর করিয়া। রজনী বলিল,—তুমি গেলে না,—ভারী miss করেচো! আহা, আজ যেন রূপের জ্যোৎস্না আরো খুলেছিল!

হরেন্দ্র বলিল,—আমি ওতে নেই। বাইরে আমার রঙ্গ চলে ভালো। ভদ্দর লোকের মেয়ে যেখানে, সেখানে আমি জড়ো-সড়ো হই।

মন্মথ বলিল,—কাল তো চোখ বোজো নি!

হরেন্দ্র বলিল,—দৈবাৎ চোখে ভাল জিনিস পড়ল—চোখ ফিরল না! তা বলে সঙ্কল্প এঁটে কোমর বেঁধে আবার তার পেছু নেওয়া! আজো যদি তখন দেখতে পেতুম, দেখতুম! ভালো বলেই দেখতুম,—অমন ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরতে যেতুম না!

মন্মথ বলিল,—Scoundrel!

রজনী তন্ময় চিত্তে তখনও তরুণীর কথা ভাবিতেছিল। এমন রূপ কখনো সে চোখে দেখে নাই! গরীবের ঘরে ঐ ভাঙ্গা কুঁড়েয় এ যে রাজার ঐশ্বর্য্য—তার চেয়েও বেশী! বিশ্ব-ভুবনের মণি-মঞ্জুষা কে যেন উজাড় করিয়া দিয়াছে!

তার পর আবার সেই কালিকার মতই সব। সেই বিল, তবে পাখী বড় কম। দুই চারিটা তাগ হইল, গুলি ছুটিল, দুই-চারিটা পাখীও মরিল; তার পরই রজনীর শীকারের সাধ মিটিয়া গেল। আর না—আজ একটু আগে ফেরা যাক! সে পুকুরে যদি আর একবার সে ভুবন-মনোমোহিনীর দেখা মেলে!

হায় রে নিরাশা! পুকুরের কালো জল,—সবুজ মখমল-বিছানো সেই অপরূপ শয্যা!...কিন্তু সে নাই, সে নাই! একটা নিশ্বাস ফেলিয়া রজনী থমকিয়া দাঁড়াইল।

হরেন্দ্র বলিল,—এ-রকম শীকার যদি আবার চলে, তা হলে আমাকে ছুটি দিয়ো ভাই।

মন্মথ তামাসা করিয়া বলিল,—An angel! An angel! জানো না তো ভাই,—কোথায় সে মধু আছে বিনা পল্লী-কুসুমে! এ কথা কবি বলে গেছেন।

হরেন্দ্র একটু ঝাঁজালো স্বরে বলিল,—মধুচক্রে মৌমাছিও আছে আর তার হুলও আছে, সে কথা কবি ভুলে যেতে পারেন, তোমরা ভুলো না। এখন এসো। সে অগ্রসর হইল।

—নেহাৎ বেরসিক! বলিয়া মন্মথ রজনীর পানে চাহিল এবং তাহারাও সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

হরেন্দ্রের অসহ্য ঠেকিল। সমস্ত ক্ষণ রজনী আর মন্মথর কিসের এত ফিসির-ফিসির? সে বলিল,—আমি ভাই কাল কলকাতা যাব।

রজনী বলিল,—হঠাৎ?

মন্মথ বলিল,—একসঙ্গে গেলে হতো না?

হরেন্দ্র বলিল,—না, যখন এক রমণী এসে মাঝে দাঁড়িয়েচেন, তখন এ কথা ঠিক যে বেশীদিন বন্ধুত্ব থাকবে ব'লে মনে হয় না! এরই মধ্যে তো আমায় এক-ঘরে করে তোমাদের নানা পরামর্শ চলেছে।

আম্‌তা আম্‌তা করিয়া রজনী বলিল,—না, কাল শীকারে বেরুবো কি না, সেই কথাই হচ্ছিল আমাদের।

হরেন বলিল,—আবার শীকার! ঐ পথে? ঐ জায়গাতেই?

হাসিয়া মন্মথ বলিল,—তাই যদি হয়, দোষ কি!

হরেন্দ্র বলিল,—আমি তাহলে সরে পড়লুম! তাছাড়া মন্মথ তুমি ভাল করচো না। যাক্, তুমি চাকরির চেষ্টায় আছ, তুমি থাকো, আমার তার ব্যবস্থা যে মোটে নেই, তা তো নয়। অতএব—

রাগিয়া মন্মথ বলিল,—আমায় তুমি মোসাহেব বলতে চাও! বন্ধুর সঙ্গে এক-মত হই যদি তো সেটা মোসাহেবি!

হাসিয়া হরেন্দ্র বলিল,—চেপে যাও না!...মোদ্দা রজনী, ভগবান তোমায় পয়সা দিয়েছেন, শরীর দিয়েচেন, বয়সও দিয়েচেন, অন্য নানা স্থানে তার জোরে নানা সুখ আয়ত্ত করতে পারো মনে করলে—আলেয়ার পিছনে কেন ছুটচো? পরের ঘরের রূপসীকে দেখে তাকে দেখার লোভ ছাড়তে পারো না—এর মানে কি? তাকে পাবে না। আর পেতেই যদি চাও, তা হলে শয়তান হয়ে পেতে হবে। অতএব—

রজনী একটু কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। কি আশ্চর্য্য! ঠিক ঐ কথাটাই সারা ক্ষণ ধরিয়া তাহাকে বিষম পাগল করিয়া তুলিয়াছে…! সে কি সম্ভব! ভাবিতেই বুক দুরদুর করিয়া ওঠে।—আবার জোর করিয়া প্রাণে কে সাহস দিয়াছে! পয়সায় কি না হয়! তাছাড়া সে যদি তাহাকে সুখী করিতে পারে, ঐ সোনার অঙ্গ হীরা-জহরতে মুড়িয়া দেয়, রত্ন-পালঙ্কে তাহাকে রাজ্যেশ্বরী করিয়া রাখে…কিন্তু মনের অতি-গোপন এ কথাটার প্রতি হরেন ইঙ্গিত করিল কি করিয়া! তবে কি তার মুখে-চোখে সে গূঢ় অভিসন্ধি, সে সঙ্কল্প এতখানি ছাপ মেলিয়া দিয়াছে? না, না—

রজনী বলিল,—কি বকচো, তার ঠিক নেই! না, না, কাল আর শীকারে যাবো না। তাহলেই হলো তো!

হরেন্দ্র বলিল,—না ভাই, আমার এ-সব ভালো লাগে না। কি জানো, গান-বাজনা হাসি-খুশী গল্প-গুজব করো—কলকাতা থেকে রূপসী আনিয়ে বাগান সাজাও—সে সবে আমাকে তোমার পাশটিতে পাবে চিরদিন! তবে সে গণ্ডী এড়িয়ে যদি যেতে চাও, তাহলে আমি তাতে নেই! আমি ভীতু মানুষ, আমার ভয় হয়। তাছাড়া আমার প্রবৃত্তির একটা সীমা আছে। তোমরা গাছের আড়ালে লুকিয়ে কথা কইছিলে, আমার বুক টিপ-টিপ করছিল।

মন্মথ বলিল,—শুধু দেখছিলুম,—আমরা তার সঙ্গে হাসি-তামাসা করি নি, ইসারাও করি নি। তবে কিসের ভয়!

হরেন্দ্র বলিল,—তবু সে ভদ্র ঘরের মেয়ে! আমি মহিলাদের এ সম্মানটুকু দিয়ে থাকি।

মন্মথ বলিল,—সতী সাবিত্রী গো!

হরেন্দ্রর দুই চোখ জ্বলিয়া উঠিল; সে বলিল—আমি ঘোর পাপিষ্ঠ, স্বীকার করচি, তাবলে একেবারে শয়তান নই!

মন্মথ বলিল,—আমরা শয়তান—এই কথা বল্তে চাও? কে না চেয়ে দেখেচে!

—যে দেখে, সে দেখুক। আমি দেখবো না, দেখতে চাই না। পৃথিবী প্রকাণ্ড ক্ষেত্র, দেখার বস্তুরও অভাব নেই—

রজনী বলিল,—থাক্ তর্ক। চলো, একটু বেড়িয়ে আসি গে।…ও পথে যাবো না,—ভয় নেই হরেন।

পরের দিন হরেনকে কিন্তু ধরিয়া রাখা গেল না। সে কলিকাতায় চলিয়া গেল।

মন্মথ বলিল,—যাক্ গে, coward!

রজনী বলিল,—কিন্তু—

উৎসাহের ভঙ্গীতে মন্মথ বলিল,—এর আবার কিন্তু কি! বন্ধুর জন্ম বন্ধু কি না করতে পারে? হ্যাঁ, যদি প্রকৃত বন্ধু হয়—

রজনী বলিল,—ঘরে তার স্বামী আছে।

গর্ব্ব-স্ফীত কণ্ঠে মন্মথ বলিল,—কুচ পরোয়া নেই।…একটা গরিবের ঘরের মেয়ে—তাকে পাওয়ার জন্ম আবার ভাবনা! রূপেয়া—রূপেয়া কি কম চীজ ভাই!

রজনী বলিল,—ভয় করে ভাই। এক-গাঁ লোক। নিজের গাঁ—

মন্মথ বলিল,—তোমার উপর কারো সন্দেহ হবে না,—তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

রজনী বলিল,—সে যা হবার পরে হবে। যাক্, এখন চলো না একবার ওদিকে। একটু ঘুরে আসি।

মন্মথ বলিল,—চল।

দুইজনে তখনি আবার যাত্রা করিল। অদৃষ্ট ভালো—লক্ষ্মী তখন পুকুরে আসিয়াছিল, কলসীতে জল ভরিতে। সে কলসী ভরিয়া পুকুর-পাড়ে দাঁড়াইয়াছিল।—মন্মথ ও রজনী আসিয়া একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াইল। হঠাৎ ঝরা পাতায় কার পদস্পর্শে খড়্‌খড় শব্দ হইল। লক্ষ্মীর সেদিকে দৃষ্টি পড়িল,—চোরের মত ও কাহারা? দুই-জনের দৃষ্টির ভঙ্গী দেখিয়া লক্ষ্মীর আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। তীব্র ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাহাদের পানে নিমেষ-মাত্র চাহিয়া ঘাটে কলসী রাখিয়াই সে দ্রুত গৃহমধ্যে পলায়ন করিল।

মন্মথর গা টিপিয়া রজনী বলিল,—ফেরো হে।

মন্মথ বলিল,—কেন, ভয় হচ্ছে?

রজনী বলিল,—ছি, ছি, ভারী বেয়াদবি হলো! কি রকম কড়া চোখে চেয়ে গেল,—দেখলে না?

মন্মথ বলিল,—আরে, আজ প্রথম, তাই। ও চোখের চাউনি দুদিনে মিহি করে তুলবো,—আমার নাম মন্মথ!

রজনী বলিল,—না হে, চলে এসো।

মন্মথ কহিল—ভয়?

রজনী বলিল,—তা নয়, হাজার হোক্, আমায় সকলে চেনে—শেষে একটা কেলেঙ্কারী হবে!

মন্মথরও যে ভয় না হইতেছিল, এমন নয়! বাড়ী গিয়া যদি কাহাকেও বলিয়া দেয়? পাড়ার লোক যদি আসিয়া পড়ে?…সে বলিল,—চলো তবে।

দুইজনে তখন চোরের মত সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

## ৫

তরুণ-সঙ্ঘের চড়ি-ভাতির আয়োজন ছিল। সেদিন রবিবার। বেলা ন'টার সময় পলাশডাঙ্গা হইতে দশ-বারোটি ছেলে আসিয়া নৌকা হইতে নামিয়া অঙ্গনায় পৌঁছিল। দলের সঙ্গে যতীশ আসিয়াছিল। এখানে

জীবনের এই মুক্ত হিল্লোল, এই সরল প্রাণের অকপট সঙ্গ—এ-সব দেখিয়া সে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাহার ধারণা ছিল, যা কিছু বুদ্ধি, তা কলিকাতার ছেলেদের মাথাতেই খেলে,—নতুন কাজ, নতুন আইডিয়া,—সে-সব এ পাড়াগাঁয়ের ছেলেদের মাথায় আসিবে কোথা হইতে! তাহারা জীবনের কি জানে? কিন্তু এই তরুণ-সঙ্ঘটিকে পাইয়া তাহার মত বদলাইয়া গেল। এমন আপ্‌শোষও জাগিল যে, অন্ততঃ দুই-তিন বৎসর যদি ইহাদের সঙ্গে সে কাটাইতে পারিত! শুধু ফুটবল খেলিয়া আর ডন কষিয়াই মানুষ হওয়া যায় না। ম্যাচে গোরাদের হারানোতেই আনন্দের চরম নয়। এখানে এই যে পরের জন্ম পরের ভাবিতে শেখা, কাজ করিতে শেখা, নিজের স্বার্থ বলি দিয়া নিজের পানে একটু না চাহিয়া এই যে জীবন-তরঙ্গে ভাসিয়া চলা, ইহারই নাম জীবন! নহিলে বাবুয়ানায় টেক্কা দেওয়া বা সাহেবকে গালি দিতে পারাটাই জীবনের পরম উদ্দেশ্য নয়।

সে সব যেন কৃত্রিম অভিনয়! প্রাণের আন্তরিক যোগ সেখানে কোথায়! তবে এখানে যে তার থাকিবার উপায় নাই! পাশ করিয়া তাহাকে কলেজে ঢুকিতে হইবে। এখানে কলেজ নাই!

তার পর এই দলটি! চমৎকার দল! আশ্চর্য্য সকলের মনের মিল! আর ঐ মাষ্টার মশায়টি,—রঘুনাথ বাবু। কি অনাড়ম্বর তাঁর জীবন-যাত্রার প্রণালী! ছেলেদের সঙ্গে তাঁর মেশার ভঙ্গীটিও কি সুন্দর! সকলকে সমান চক্ষে দেখা, সকলের উপর সমান দরদ,—কলিকাতার স্কুলে এ তো দেখাই যায় না। সেখানে একটা ভুল-চুক্ হইলে শুধু তীব্র ভর্ৎসনা আর শাস্তির ঘটা! আর ইনি? সে তো স্কুলে গিয়া দেখিয়াছে, যার ভুল হইল, তাকে বুকের কাছে টানিয়া কি ভাবেই না তাকে সব বুঝাইয়া দেন! এতটুকু বিরক্তি নাই, এতটুকু অধৈর্য্য নাই!

রঘুনাথের উপর তার মনে অত্যন্ত শ্রদ্ধা জাগিয়াছিল। আজ এ চড়িভাতির প্রস্তাবে তার আমোদ হইয়াছিল সব-চেয়ে বেশী। এ তার কল্পনার অতীত।

ছেলেরা আসিয়া নদীতে ঝাঁপাই জুড়িয়া নদীর জল একেবারে তোলপাড় করিয়া তুলিল। জলের ঢেউয়ে জলের গায়ে তরুণ প্রাণের চপল হিল্লোল লাগায় জলও সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসে যেন নাচিয়া উঠিল। সঙ্গীত-কলরবে তটের কাণে জল সে আনন্দ জানাইতে ছুটিল!

স্নান সারিয়া ঘণ্টাখানেক পরে ছেলেদের দল বাগানে আসিল। চড়িভাতির জন্ম হাঁড়ি-কুড়ি চাল-ডাল সব সাজানো। এক জন গিয়া শুক্‌নো পাতা কুড়াইয়া আনিল। দুই-তিন জন গাছে চড়িয়া শুষ্ক শাখা সংগ্রহে মন দিল,—টুকরা কাঠের স্তূপে তারা অমন ছোট-খাট একটা পাহাড়ের সৃষ্টি করিয়া তুলিল। তার পর মাটী খুঁড়িয়া ইট সাজাইয়া উনান তৈরী হইল। লক্ষ্মী আসিয়া হাঁড়ি চড়াইয়া তাহাতে চাল ডাল ফেলিয়া দিল—খিচুড়ী হইবে।

যতীশ ওধারে ঘুরিয়া পল্লীর এই বিজন কাননভূমিটিকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া লইল। সহরের শুষ্ক কঠোর পথ আর ইট-কাঠে-রচা প্রাচীরের শ্রেণী দেখিয়া চক্ষু কেমন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল—এখানে এই বৃক্ষলতায় অপরূপ বর্ণ বৈচিত্র্য, পুকুর ও খড়ে-ছাওয়া বাঁশে-ঘেরা মাটীর কুটীরগুলির মধ্যে এমন শান্ত শ্রী বিরাজ করিতেছে যে, তাহা দেখিয়া ক্লান্ত দৃষ্টি স্বাস্থ্যে ভর-পূর স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল। এই খোলা জায়গা—গাছের ডালে ডালে পাখীর গান, পাতায় পাতায় বাতাসের কাণাকাণি—তার প্রাণে এমন এক কল্পলোকের সৃষ্টি করিয়া তুলিল যে, সে এক সময়ে একটা পড়া গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়া বসিয়া পড়িল, আর তার চোখের সামনে হইতে সমস্ত বহির্জ্জগতের লোকজন তাদের কল-কোলাহল সমেত কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

হঠাৎ তার নজরে পড়িল, অদূরে একটা জাম গাছের পানে। পুকুরের ধারে জাম গাছ—তার একটা মস্ত ডাল পুকুরের উপর হেলিয়া পড়িয়াছে। ডালে থোলো থোলো কালো জাম—আর ছোট একটি মেয়ে একটা আঁখসি লইয়া জাম গাছের ডালে তাহা লাগাইতেছে, সেই জাম পাড়িবার জন্ম। ছোট মেয়ে, আঁখসিটিও ছোট, জামের গোছায় নাগাল পাওয়া যায় না! কৌতুকের ভাবে যতীশ তাহাই লক্ষ্য করিতে লাগিল। অন্য ছেলের দল তখন চড়িভাতির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। তাদের কলরব শুষ্ক মৌমাছির মৃদু গুঞ্জনের মত কাণে আসিয়া লাগিতেছে, লক্ষ্মী ও রঘুনাথ তাহাদের কাছে দাঁড়াইয়া সব তদ্বির করিতেছে।

হঠাৎ যতীশের চোখের সামনে সমস্ত শ্রী যেন উল্টাইয়া গেল। মেয়েটি ডালে আঁখসি লাগাইয়া এক পা এক পা আগাইয়া চলিয়াছিল, তবু জামের নাগাল পাইতেছিল না। তাহার সে মৃদু চঞ্চল গতিভঙ্গী যতীশের বুকের মাঝখানটায় কি যেন এক অজানা ভয়ের শিহরণ জাগাইয়া তুলিতেছিল! যতীশ তার দিক হইতে চোখ ফিরাইতে পারিল না! তার বুক কেমন দুরুদুরু করিতেছিল। তাই তো, মেয়েটি আনমনা-ভাবে কোথায় আগাইয়া চলে!

হঠাৎ ঝপ করিয়া একটা আওয়াজ ও সঙ্গে সঙ্গে বালিকার ক্রন্দনে চারিদিক ভরিয়া উঠিল। যতীশ ছুটিয়া পুকুর-পাড়ে গেল—মেয়েটি গড়াইয়া জলে পড়িয়া গিয়াছে।—ঐ যে, ঐ সে। যতীশ অমনি টক্ করিয়া

ঝাঁপাইয়া পুকুরের জলে নামিয়া পড়িল। মেয়েটি জল খাইতেছে, চুলগুলা ছড়াইয়া মুখে পড়িয়াছে—এক একবার ভাসিয়া উঠিতেছে, আবার ডুবিতেছে। মুখ তার মৃত্যুর উদ্যত কর-স্পর্শে কেমন এক বিভীষিকায় ভরিয়া গিয়াছে!

যতীশ জলে সাঁতরাইয়া গিয়া বালিকার চুলের মুঠি ধরিয়া টান দিল; টানিতে টানিতে তাহাকে তীরে লইয়া আসিল।

বালিকা জল খাইয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। যতীশ তাহাকে কোলে করিয়া বহিয়া বাগানে উঠিল এবং সকলে যেখানে খিচুড়ী রাঁধিতে ব্যস্ত—সেখানে লইয়া আসিল। লক্ষ্মী চীৎকার করিয়া উঠিল—এ কি!

মেয়েটি মন্টি। কি করিয়া এমন হইল? যতীশ সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। তখন বালকের দল তার গায়ের মাথার জল মুছাইয়া দিতে লাগিল—রঘুনাথ তার হাত ধরিয়া ঘুরাইয়া আরো নানা প্রক্রিয়ার পর পেটের জল বাহির করিয়া দিল। ঘণ্টাখানেক পরে মেয়ে সুস্থ হইলে লক্ষ্মী তাহাকে কোলে করিয়া লইয়া ঘরে গেল এবং হেফাজতে কিছুক্ষণ রাখিবার পর মেয়ে ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল, ডাকিল,—মা—

লক্ষ্মী মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া বলিল,—পাজী মেয়ে! আর কখনো পুকুরধারে যাবে?

বালিকা বলিল,—না।

রঘুনাথ আসিয়া লক্ষ্মীকে ডাকিল, বলিল,—এই যে মন্টি বেশ কথা কইচে!...তুমি এদিকে এসো গো, খিচুড়ী তোয়ের। ভাজাও হয়ে গেছে।

এখন কতকগুলা পাতা কাটিয়া ছেলেদের খাওয়াইতে বসাইলে হয়!

ঘরে দই পাতা ছিল; আচার, সড়া তেঁতুল ঘরে ছিল। লক্ষ্মী সে সব লইয়া বাগানে আসিল। একটি ছেলে এক রাশ কলাপাতা কাটিয়া আনিল।

প্রকাণ্ড একটা আমগাছ ডাল-পালা মেলিয়া এক জায়গায় যেন চন্দ্রাতপ খাটাইয়া রাখিয়াছে। সেই ছায়ায় গাছতলায় ছেলেরা সার-সার বসিয়া গেল। লক্ষ্মী পরিবেষণ করিতে লাগিল। মন্টিকে যতীশ তার পাশে বসাইয়াছিল। যতীশ বলিল,—ভাগ্যে আমি চড়িভাতির দলে না থেকে ঐ গাছতলায় বসেছিলুম!

কথাটা শুনিয়া লক্ষ্মীর সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। সে বলিল,—তোমার জন্যেই ওকে ফিরে পেয়েচি। নৈলে ওর কি আজ বাঁচবার কথা!...বেঁচে থাকো বাবা, ভগবান তোমায় বাঁচিয়ে রাখুন, বড় করুন!

যতীশ বলিল,—তা কেন! আমাদের তরুণ-সঙ্ঘের জন্যেই ও বেঁচেছে। আমি কি আগে সাঁতার জানতুম? মোটেই না। এখানে এসেই তো মাষ্টার মশায়ের কাছে সাঁতার শিখেচি।

রঘুনাথ বলিল,—তার জন্য তোমার গুরু-দক্ষিণাও আজ যা দেওয়া হলো, এর আর তুলনা নেই!

গন্ধে-গুঞ্জনে ছেলেদের কল-গুঞ্জনে এই নির্জ্জন স্তব্ধ বনভূমিতে যেন আজ নন্দনের সুরভি ছিটাইয়া পড়িয়াছিল! লক্ষ্মী ভাবিতেছিল, এত সুখ, তার ভাগ্যে এত সুখ ছিল!

ছেলেদের খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় কোথা হইতে কয় টুক্‌রা মেঘ আসিয়া রৌদ্রের উপর একটা কালো পর্দ্দা বিছাইয়া দিল; দেখিতে দেখিতে সে-মেঘ চারিদিকে এমন দ্রুত ছড়াইয়া পড়িল যে, চরাচর আঁধারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। মাথার উপর পাখীর দল ঝাঁক বাঁধিয়া অত্যন্ত দ্রুত গতিতে আকাশের কোল দিয়া কোন্ অনির্দ্দিষ্ট গৃহ-কোণ লক্ষ্য করিয়া উড়িয়া চলিয়াছে। বাগান হইতে গাছপালার ফাঁক দিয়া নদীর একটু অংশ দেখা যাইতেছিল—ঘোলাটে জল স্থির স্তম্ভিত,—যেন কি এক ভয়ে স্তব্ধ হইয়া গেছে, ভয়ের বস্তুটাকে দেখিতে পাইলেই ভীষণ চঞ্চল হইয়া উঠিবে! তার কোলে ওপারে একটা ইটের পাঁজা হইতে বাষ্প-ধূম উঠিতেছে—যেন দৈত্যদের প্রকাণ্ড সমারোহের জন্য মস্ত উনানে তারা আগুন দিয়াছে!

দেখিতে দেখিতে ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে সুরু করিল। রঘুনাথ বলিল,—ভয়ানক জল-ঝড় আসচে। তোমরা হাত চালিয়ে নাও।

কিন্তু ছেলেরা হাত চালাইবার পূর্ব্বেই হু-হু শব্দে ঝড় আসিয়া পড়িল। রাজ্যের ধূলা-বালি উড়াইয়া, গাছের ডালে পাতায় রুদ্র কলরোল তুলিয়া জীর্ণ ডালের ছররা ছিটাইয়া গুলি ছুড়িতে ছুড়িতে ঝড় আসিয়া তাণ্ডব-নৃত্য সুরু করিয়া দিল। তার হুঙ্কারের বেগে জল নামিল তেমনি মুষল-ধারে, চকিতে।

ছেলেরা পাতা ফেলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া রঘুনাথের বাড়ীর দাওয়ায় আসিয়া আশ্রয় লইল। রঘুনাথ ও লক্ষ্মী যতখানি সম্ভব জিনিসপত্র বাঁচাইয়া ঘরে ছুটিল—ভিজিয়া একশা হইয়া।

যতীশ সিক্তকেশা সিক্তবেশা লক্ষ্মীর পানে চাহিয়া মুগ্ধ দৃষ্টি আর ফিরাইতে পারিল না। লালপাড় শাড়ীখানি তার গৌর-অঙ্গ বেড়িয়া আছে। শাড়ী ভিজিয়া তার গায়ের সঙ্গে ন্যাপ্‌টা হইয়া গিয়াছে—আর কাপড়ের সাদা রঙ্‌, ফুঁড়িয়া তার গায়ের সোনার বর্ণ শাড়ীর লাল পাড়ের ধার দিয়া যেন সোনালি ঢেউ ছুটাইয়া গিয়াছে! তার মনে পড়িয়া গেল, বহু দিনকার একটা হারানো দিনের কথা!

তখন বাবা বাঁচিয়া। কলিকাতায় বাপের সঙ্গে

ফুটবল ম্যাচ দেখিয়া সে বাড়ী ফিরিতেছিল এমনি বৃষ্টিতে। কলিকাতা সহর সেদিন ভাসিয়া গিয়াছিল! একখানা গাড়ী মেলে নাই। ভিজিয়া বাড়ী ঢুকিতে মা সেই বৃষ্টিতে তাহাকে সদরের দ্বার হইতে উঠান পার করিয়া টানিয়া ঘরে লইয়া যাইতে ভিজিয়া সারা হইয়া গিয়াছিলেন—সে দিন মার পরণে ছিল এমনি একখানি লাল-পাড় শাড়ী। আর সে শাড়ী তাঁর গৌর অঙ্গে ভিজিয়া ল্যাপটাইয়া গিয়াছিল! আজ লক্ষ্মীর পানে চাহিতে মার সেই অঙ্গ-সৌষ্ঠব, মার সে লাবণ্য যেন বিদ্যুতের মত তার চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল! লক্ষ্মীর মুখে মার সেই তখনকার সুন্দর মুখের ছাপ যেন কে আঁকিয়া লইয়াছে! তার মনের মধ্যে একটা ডাক উথলিয়া উঠিল, —মা—মা—!

সন্ধ্যার প্রায় কাছাকাছি ঝড়-বৃষ্টি থামিল। ছেলেরা কলরব তুলিয়া বাহিরে আসিল। জলে ভিজিয়া চারিধার কেমন স্নিগ্ধ-শ্যামল রূপে ভরিয়া উঠিয়াছে, মেঘ-জলের অন্তরালে গোধূলির স্বর্ণরাগ সারা বিশ্বে এক অপরূপ লাবণ্য ছড়াইয়া দিয়াছিল। এতখানি মুক্ত প্রান্তরে এমন বিচিত্র বর্ণ-রাগের লীলা যতীশের চোখে একেবারে নূতন! সে এই দৃশ্য প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিয়া লইল। তার পর রঘুনাথ সকলকে লইয়া নৌকায় গিয়া উঠিল। তীরের কাছে-কাছে কাদা-ধোয়া ঘোলা জলে সাদা ফেনার রাশি—নদীর ম্লান হাসির মতই ফুটিয়া উবিয়া যাইতেছে। ঝড়ের সঙ্গে লড়িয়া নদী যেন একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে! তার তরঙ্গ-কল্লোল ভারী শান্ত, ভারী করুণ!

৬

দুই চারিদিন ধরিয়া অলস জল্পনা করিবার পর লক্ষ্মীর সে রূপ রজনীর মন হইতে উবিয়া যাওয়া দূরের কথা—সমস্ত মন জুড়িয়া বসিল। সেদিন লক্ষ্মীর দুই চোখের কঠিন ভর্ৎসনার দৃষ্টি বুকের মধ্যে এমন তীক্ষ্ণ শর বিঁধিয়াছিল যে, ওদিক পানে চাহিতে সাহসে কুলায় না, অথচ কয়দিনের অদর্শন তার পিপাসাকে এমন তীব্র করিয়া তুলিল যে, থাকিয়া থাকিয়া রজনীর মনে হয়, বুঝি, সে পাগল হইয়া যাইবে! কোনো কাজে মন নাই, কিছুই ভালো লাগে না। শীকার, গান-বাজনা—এ-সবে সুখ নাই! ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকা দুঃসাধ্য ঠেকে, অথচ বাহিরটাও নেহাৎ ফাঁকা, নেহাৎ নিরবলম্ব মনে হয়। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে প্রাণ হাঁফাইয়া ওঠে, অথচ বাড়ীর বাহির হইতে গেলে পা দুইটা ভারী বোধ হয়! মনে হয়, কোথায় যাই—কোথায় গেলে একটু জুড়াইতে পাই? এমনি দ্বিধার মধ্যে মন যখন একটা জায়গার দিকে সঙ্কেত করে, চলো সেইখানে—পা তখন কুণ্ঠিত ত্রস্ত হইয়া পড়ে, বুকের মধ্যটা কি এক ভয়ে দুলিয়া ওঠে! রজনী সত্যই ভাবে, এবার সে পাগল হইবে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা রজনী বাহিরের ঘরে পড়িয়া অস্থির মন লইয়া ছটফট করিতেছিল,—মন্মথ কোথায় গিয়াছে, কে জানে! ঘর অন্ধকার। ভৃত্য আলো জ্বালিয়া দিতে আসিলে রজনী মানা করিল।

হঠাৎ একটু পরে চোরের মত মন্মথ আসিয়া হাজির। ডাকিল,—রজনী—

রজনী বলিল,—কি?

মন্মথ বলিল,—সব ঠিক হে। এই দ্যাখো, কে এসেচে।

আঁধার ভেদ করিয়া রজনী লক্ষ্য করিল, দ্বারের কাছে মন্মথর পিছনে এক রমণী-মূর্ত্তি। সে একটু কৌতূহলের ভাবে বলিল,—কে?

রজনীর কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া মন্মথ বলিল, —গুণীন্! এ ঠিক এনে দিতে পারবে—বহুৎ সন্ধানে একে পেয়েচি।

রজনী উঠিয়া বসিল, রমণীকে কাছে ডাকিল। রমণী নিকটে আসিলে সে বলিল,—সব শুনেচো?

রমণী এক-গাল হাসিয়া বলিল,—শুনেচি বৈ কি। কাকে চাই বলো তো দাদাবাবু···কার ওপর সদয় হলে?

রজনী চারিদিকে চাহিয়া খুব চাপা গলায় বলিতে গেল, কাহাকে পাইবার জন্য সে একেবারে অধীর, আকুল। কিন্তু কণ্ঠ কে যেন চাপিয়া ধরিল। চোখের সামনে জল-জল করিয়া ফুটিয়া উঠিল একটি পরিচ্ছন্ন ঘরের কোণ—সেই কোণে বসিয়া তরুণী রূপসী স্বামীর চিন্তায় মশগুল! স্বামীর মুখে তৃপ্তির কি হাসি!···সুখের ঘর!···এ ঘর তার একটি ইঙ্গিতে চূর্ণ হইয়া যাইবে! আর সে? আহা, না, না!

রমণী বলিল,—কাকে চাই দাদাবাবু?

রজনীর বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। কে যেন বুকে মুগুরের ঘা মারিল! রজনী ভাবিল, থাক, কাজ নাই! ···এ চিন্তা মনে হইতে কিন্তু শিহরিয়া উঠিল! অসম্ভব! তাকে না পাইলে দিনগুলা যে অসহ্য ঠেকিতেছে! জীবন ভারী কর্কশ বোধ হইতেছে! কি লইয়া সে থাকিবে? সে ভাবিল, দোষ কি! অত রূপ লইয়া অবহেলায় জঞ্জালের মাঝে বেচারী পড়িয়া আছে—আর সে? এ রূপ মাথার মণি করিয়া রাখিবে!

ধীরে ধীরে সে বলিল,—অর্থাৎ বুঝেচো, রঘু-মাষ্টারের বৌ···ঐ কঙ্কণার কাছে বাড়ী।

রমণী ক্ষণেক স্তব্ধ হইয়া রহিল; পরে অক্ষমতার সুরে নিরাশ কণ্ঠে বলিল,—ও হবে না বাবু—আর কাকেও ফরমাশ করো।

রজনী অধীরভাবে বলিল,—কেন হবে না?

রমণী কহিল,—বড় ভালো লোক দাদাবাবু, রঘু মাষ্টার। বৌটিও বড় লক্ষ্মী। নামে বা, কাজেও তাই। আর গরিব হ'লেও সোয়ামী-অন্ত প্রাণ। সতী-লক্ষ্মী···ও বড় শক্ত কাজ। তা ছাড়া তার পানে চাইলে মন ভরে ওঠে—ওকে পারবো না।

রজনী রাগ করিল; এবং রুষ্ট স্বরে বলিল,—তবে কি করতে এসেচো এখানে?

রমণী বলিল,—এ কথা জানলে আসতুম না। ইনি তো বলতে পারলেন না, কাকে চাই।

ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে রজনী মন্মথর পানে চাহিল। অন্ধকারের মধ্যে সে দৃষ্টি মন্মথ দেখিতে পাইল না।

রজনী বলিল,—কেন তবে একে নিয়ে এলে?

মন্মথ সে কথার কোনো জবাব দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

রজনী বলিল,—তুমি ফ্যাসাদ বাধালে। মিছিমিছি একে জানিয়ে দিলে! তার পর···? ছি ছি, কাঁচা কাজ দ্যাখো দিকিনি তোমার!

মন্মথ নিরুপায়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। রজনী রমণীকে বলিল,—এই নাও দশ টাকা। কিন্তু সাবধান, যদি এ কথা ঘুণাক্ষরে প্রকাশ পায়, তা হলে তোমার হাড় এক জায়গায় মাস এক জায়গায় হবে। মনে থাকে যেন! বলিয়া রজনী তার হাতে একটা দশ টাকার নোট গুঁজিয়া দিল।

রমণী নোটখানা আঁচলের প্রান্তে বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল,—সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থেকো দাদাবাবু—আমায় মেরে ফেল্‌লেও এ কথা প্রকাশ হবে না। বিশেষ তোমার গাঁয়ে থাকি! চাচা আপন বাঁচা! কথাটা বলিয়া সে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

রজনী বলিল,—দাঁড়িয়ে রইলে যে! যাও।

রমণী বলিল,—শুধু শুধু পয়সা খাব, দাদাবাবু! আর কাকেও এনে দি···ঐ আমাদের পাঁচুগোপালের বৌ—চমৎকার সুন্দর, সোয়ামীটে কলকাতায় থাকে—বৌটোকে নেয় না—যেন পরীটি! আর বেশ হাসি হাসি মুখ—চট্ করে পোষ মানবে'খন।

রজনী বিরক্ত স্বরে বলিল,—না, না—কাকেও চাই না। আমার কি ঐ পেশা! তুমি যাও।

রমণী অগত্যা চলিয়া গেল। সে চলিয়া গেলে রজনী ডাকিল,—মন্থ,—বসো, কথা আছে।

মন্মথ বসিল। রজনী কহিল,—অনেক ভেবেচি। এক ব্যাটা আছে। বিন্দে—সে চাঁড়াল। সেটা গুণ্ডা। তার দলে দু'চারজন লোক আরো আছে। তাকে ডাকিয়েছিলুম—তাদের ক' বোতল মদ আর কিছু টাকা দিলে তারা যা হুকুম করবো, তাই করবে। আমি বলি কি, তাদের বলি,—তারা ঠিক এনে দেবে। ভাবচি, একটা রাত্রে তারাই এ কাজ করবে! আমার মোটরখানা আজই সরিয়ে দি। কলকাতায় ফিরবে মেরামতির জন্য—এই কথা বলে। তার পর তিন ক্রোশ দূরে ঐ যে পোড়া-কালীর মন্দির আছে, তার ওধারে বড় রাস্তায় মোটর থাকবে। সন্ধ্যার পর ওধারে লোকের ভিড় থাকে না। এ দিকে মাঝরাত্রে ওরা কাজ হতে করে তাকে এনে মোটরে চড়িয়ে দেবে। দু'খানা গাঁয়ের পর একটা ভাঙ্গা বাড়ী আছে, জঙ্গলের মধ্যে—মোটর একেবারে সেইখানে নিয়ে গিয়ে ওকে রাখবে। আমরাও পরের দিন দুপুর বেলায় কলকাতায় যাচ্ছি বলে বেরুবো। বেরিয়ে সেখানে যাবো। এতে লোকেরো কোন সন্দেহ হবে না আমাদের উপর···তার পর যেমন অবস্থা দেখবো, ব্যবস্থাও তেমনি করা যাবে।

মন্মথ বলিল,—বাঃ, এ যে চমৎকার প্ল্যান! তুমি একখানা উপন্যাস বানিয়ে ফেল্‌লে একেবারে! খাশা।

রজনী বলিল,—একটা চাকরকে ডেকে এবার আলো জাল্‌তে বলো। না, না, থাক্—চলো, একবার বিন্দের ওখানে ঘুরে আসি। সে বেটার আর এখানে এসে কাজ নেই—যদি কেউ দেখে ফেলে! তার চেয়ে ওর ওখান থেকেই বন্দোবস্ত পাকা করে আসা যাক্!

বন্দোবস্ত পাকা করিয়া ফিরিতে রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। বাড়ী ফিরিয়া আহার সারিয়া রজনী বাহিরের বারান্দার একটা ইজি-চেয়ারে বসিয়াছিল। সামনের গাছে লাল-টকটকে একটা বড় গোলাপ ফুটিয়া বর্ণে-গন্ধে দিক মাতাইয়া তুলিয়াছে। মাথার উপর দ্বাদশীর চাঁদ। জ্যোৎস্নায় চারিধার ঝলমল করিতেছে। রজনী ফুলটার পানে চাহিয়া ভবিষ্যতের ছবি আঁকিতেছিল। জলের কোলে সেই যে পদ্ম দেখিয়াছে, তার কাছে এ গোলাপ কত তুচ্ছ! ভাবিতে ভাবিতে জ্যোৎস্না কখন্ যে গোলাপের রঙে রাঙিয়া উঠিয়াছে, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। ফুলটাও সেই সঙ্গে তার পাপড়িগুলাকে বিস্তার করিয়া ধরিয়াছে—আর তার মধ্য হইতে ফুটিয়া উঠিতেছে সেই সুন্দরীর সুন্দর মুখ! কি হাসি তার ঐ রক্তিম অধরে! ঐ কুঞ্চিত কৃষ্ণ ঘন কেশরাশির মধ্যে চাঁপার-বরণ মুখখানি যেন পাতার কোলে ফুলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে! রজনী তার অধীর দুই বাহু বাড়াইল—ও ফুলটি বুকে চাই! অমনি চকিতে তার স্বপ্ন টুটিয়া গেল—কোথায় তার মুখখানি! এ যে একটা গোলাপ ফুল—নেহাৎ তুচ্ছ! রজনী একদৃষ্টে ফুলটার পানে চাহিল। মনে হইল, ফুলটা যেন তার পানে চাহিয়া বিদ্রুপের হাসি হাসিতেছে!

ওদিকে ঠিক সেই সময় রঘুনাথের জীর্ণ গৃহে মাটীর দাওয়ায় লক্ষ্মী একখানি মাদুর পাতিয়া শুইয়াছিল, মণি গল্প শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে,—রঘুনাথ এখনো

বাড়ী ফেরে নাই। চাঁদের আলোয় আলো-করা আকাশের পানে চাহিয়া সে ভাবিতেছিল, তার জীবনের কত কথা! বিবাহের রাত্রে তার কি ভয় হইয়াছিল—বর, স্বামী! সে তো দেখিয়াছে,ঐ পাশের বাড়ীর মামী স্বামীর কাছে কি মার না খায়! পাণ হইতে চুণ খসিলে নিস্তার নাই। ভীম-গর্জ্জনে মামার তিরস্কার, আর লাথি, চড়—কি প্রচণ্ড প্রহার! তাহা দেখিয়া বিবাহের নামে তার হৃৎকম্প হইত। কিন্তু শুভদৃষ্টির সময় ভয়-ভরা কৌতূহলের মাঝে রঘুনাথের স্নিগ্ধ চোখের সরস দৃষ্টি কি পরশ যে বুলাইয়া দিল! কোথায় গেল তার যত দুর্ভাবনা, যত শঙ্কা! রঘুনাথ কি আদরেই তাহাকে রাখিয়াছে!—শুধু হাসি, শুধু আনন্দ! দারিদ্র্য সেখানে হানা দিতে পারে না! এম্‌নি কত কথা ভাবিতে ভাবিতে কখন্ এক সময় সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। চাঁদের আলো তার মুখে জ্যোৎস্নার স্বর্ণ ঝরাইয়া দিয়াছে! ঠোঁটের কোণে হাসির লহর! বুঝি, কি সুখের স্বপ্ন দেখিতেছে!

হঠাৎ রঘুনাথ ধীরে ধীরে আসিয়া সেইখানে দাঁড়াইল; মুগ্ধ বিস্ময়ে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে লক্ষ্মীর ঘুমন্ত মুখের পানে চাহিল। জ্যোৎস্নার ধারায় ধোওয়া মুখখানি—অপূর্ব্ব সুষমায় ভরা! দেখিয়া রঘুনাথ একটা নিশ্বাস ফেলিল—ভাবিল, হায়, এ রত্ন এ যে রাজার ঘরের যোগ্য! এ রত্ন তার হাতে পড়িয়া কি অবহেলাই না ভোগ করিতেছে! বেচারী...বেচারী লক্ষ্মী! কেন সে হতভাগা আসিয়া লক্ষ্মীর জীবন-পথে উদয় হইল! এই জীর্ণ ঘর, এই দারিদ্র্য···এ কি লক্ষ্মীকে মানায়!···কিন্তু উপায় কি? উপায়···?

রঘুনাথ লক্ষ্মীর পাশে বসিল—তার মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া অধীর আবেগে লক্ষ্মীর মুখে চুম্বন করিল। লক্ষ্মী ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল,—মুখে উদ্‌ভ্রান্ত ভাব! উঠিয়া চোখ মুছিয়া লক্ষ্মী বলিল,—যাও, তুমি ভারী দুষ্টু···

হাসিয়া রঘুনাথ বলিল,—বড্ড লোভ হলো, লক্ষ্মী।

হাসিয়া লক্ষ্মী বলিল,—যাও,—বলিয়া স্বামীর গায়ের জামা খুলিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি সে পা ধুইবার জল আনিতে ছুটিল। তার পানে চাহিয়া রঘুনাথ বলিল,—এত ব্যস্ত কেন, লক্ষ্মী? একটু বসো না···

লক্ষ্মী হাসিয়া বলিল,—এতখানি পথ হেঁটে এলে! মুখ-হাত ধোও, কিছু খাও আগে, তার পর সারা রাত তোমার কাছে বসে থাকবো'খন।

লক্ষ্মী চলিয়া গেল। রঘুনাথ একটা নিশ্বাস ফেলিল, হায় রে, এইটুকু লইয়াই লক্ষ্মীর কি তৃপ্তি! ইহা লইয়াই ভাবে, সে পরম সুখে আছে।

৭

পরের দিন রাত্রে ঝড় উঠিল। পলাশডাঙ্গায় যতীশের গৃহে সেদিন কি একটা কাজে ভোজের আয়োজন হইয়াছিল। স্কুলের সব ছেলেগুলি সেখানে সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতে জড়ো হইয়াছে—রঘুনাথেরও ডাক পড়িয়াছে। মন্টিরও নিমন্ত্রণ বাদ যায় নাই।

যতীশের মা মন্টিকে নূতন কাপড়-চোপড় পরাইয়া সাজাইয়া কোলে লইয়া আদর করিয়া এমন মুগ্ধ করিয়া ফেলিলেন যে, সে নিজের মার অদর্শন বুঝিতে পারিল না।

রাত্রি তখন প্রায় দশটা বাজিয়াছে। যতীশ আসিয়া বলিল,—মন্টি ঘুমিয়ে পড়েচে। মা বললেন, এই রাত্রে তাকে নাই নিয়ে গেলেন। কাল সকালে আমি তাকে পৌঁছে দিয়ে আসবো।

রঘুনাথ বলিল,—মাঝ-রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যদি কাঁদে? বিরক্ত করে?

যতীশ বলিল,—মা বললেন, তাকে ভুলিয়ে রাখ্‌তে পারবেন তিনি।

রঘুনাথ বলিল,—বেশ, থাক্ তবে।

তার পর বিদায় লইয়া রঘুনাথ পার-ঘাটার পানে চলিল। জ্যোৎস্না রাত্রি। পল্লীর শ্যাম প্রান্তর আলোয় আলো হইয়া আছে। ছাত্রের দল রঘুনাথকে আগাইয়া দিতে সঙ্গে আসিল। যতীশও আসিতে ছাড়িল না। পার-ঘাটার দিকে যে পথ গিয়াছে, সেই পথে পা দিবামাত্র সকলের চোখ পড়িল, ও-পারের বাঁকের মুখে আকাশের পানে! ও কি, রুদ্রের রক্ত আঁখি ও-দিকটায় অনল বর্ষণ করিতেছে—চাঁদের শুভ্র আলোর কে যেন আবীর মাখাইয়া দিয়াছে! আকাশ একেবারে লালে লাল!

যতীশ চীৎকার করিয়া উঠিল,—ও যে আগুন লেগেচে, মাষ্টার মশায়।

তাই তো, আগুনই তো! ও যে, ও যে···রঘুনাথের ঘরের কাছে···রঘুনাথের বুকটা ধড়াশ্ করিয়া উঠিল! ও ঘরে তার লক্ষ্মী, তার সব···! কালিকার মত লক্ষ্মী যদি ঘুমাইয়া থাকে! যদি বাহির হইতে না পারে···?

রঘুনাথ উন্মাদের মত ছুটিল। ছাত্রের দল ছুটিয়া তার অনুসরণ করিল। ঘাটে দু-তিনখানা নৌকা ছিল; মাঝি নাই। সকলে মিলিয়া উদ্‌ভ্রান্তের মত নৌকায় উঠিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। গাছ-পালায় আগুন, ঘরে আগুন—চারিদিকে আগুনের কি লেলিহান শিখা! সমস্ত গ্রামটাকে গিলিয়া তবে বুঝি আগুনের ও বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা মিটিবে!

তীরে আসিয়া সকলে দেখিল—তাই তো, এ যে রঘুনাথের ঘর জ্বলিতেছে!···লক্ষ্মী···?

রঘুনাথ ছুটিল। হায় রে, ও আগুন নিবাইবার সাধ্য কি! কি দিয়া নিবানো যায়! দুই-চারিজন প্রতিবেশী কলসী লইয়া জল ঢালিতেছে। কিন্তু এ দারুণ অগ্নি-ক্রীড়ায় সে কতটুকু বাধা। আগুন দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, ফট্ ফট্ করিয়া বাঁশ ফাটিতেছে, চালার পর চালা জ্বলিয়া ছাই হইয়া বাতাসের মুখে উড়িয়া চলিয়াছে!

সেই অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে রঘুনাথ পাগলের মত গিয়া ঝাঁপ দিল। লক্ষ্মী, লক্ষ্মী…কোথায় লক্ষ্মী? আগুনে চারিদিক উজ্জ্বল,—কোথায় লক্ষ্মী? লক্ষ্মী নাই! সে বুঝি পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে!

রঘুনাথ পাগলের মত বাহিরে আসিল। ছেলের দল আরো কয়টা কলসী ইতিমধ্যে জোগাড় করিয়া জল তুলিয়া ঘরের আগুন নিবাইবার চেষ্টা করিতেছিল। রঘুনাথের হাত-পা অবশ হইয়া পড়িয়াছে, মাথা ঝিম-ঝিম করিতেছে, একদিকে মূর্চ্ছিতের মত সে বসিয়া পড়িল।

হঠাৎ কখন্ আগুন আপনা হইতে খোরাক না পাইয়া নিবিয়া আসিল। যতীশ আসিয়া রঘুনাথের পানে চাহিয়া কহিল,—মা—?

রঘুনাথ পাগলের মত তার পানে চাহিল; তার পর আকাশের দিকে দেখাইল। গাঢ় স্বরে বলিল,—নেই।

অধীর কণ্ঠে যতীশ বলিল,—নেই কি! উঠুন, আসুন, দেখি।

ছেলেরা বাড়ী-বাড়ী ঘুরিল, বনে-জঙ্গলে পাতি-পাতি খুঁজিল—লক্ষ্মীর কোন চিহ্ন কোথাও নাই!

এক জন বলিল, বনের পথে সে একটা পাল্কী চলিতে দেখিয়াছে, ঠিক ঐ আগুন লাগার পূর্ব্বক্ষণে! শুনিয়া রঘুনাথ বসিয়া পড়িল। ছেলেরা তাকে ঘিরিয়া বসিল—অত্যন্ত নিরুপায়ের ভাবে।

এমনি ভাবেই বনের মধ্যে রাত্রি কাটিয়া গেল। ভোর হইতে যতীশ আবার লক্ষ্মীর সন্ধানে বাহির হইল। চারিধার ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া যখন সে ফিরিল, রঘুনাথ তার পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল,—পেলে?

গাঢ় স্বরে যতীশ বলিল,—না। তার পর তার দুই চোখে বান ডাকিল।

রঘুনাথ তখন উঠিল,—দগ্ধ গৃহে ভস্মস্তূপ ঘাঁটিল—যদি তার দগ্ধ কঙ্কালখানার চিহ্ন পাওয়া যায়!…সন্ধান করিয়া কিছু পাইল না—সে তখন সেই ভস্মস্তূপের উপর মাথা গুঁজিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে মূর্চ্ছা ভাঙ্গিলে রঘুনাথ দেখিল, যতীশ ও অপর ছাত্রেরা তার মুখের পানে কি ভয়াকুল অধীর নেত্রে চাহিয়া আছে। প্রথমটা তার মুখে কোন কথা সরিল না। যতীশ কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ম্লান দৃষ্টিতে ডাকিল,—মাষ্টার মশায়—

রঘুনাথ তার পানে চাহিয়া দুই হাত বাড়াইয়া যতীশকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল। পরে বুকের উপর তার মাথা চাপিয়া ধীরে ধীরে চাপড়াইতে লাগিল। মুখ তুলিয়া যতীশ বলিল,—মন্টি একলা আছে, মাষ্টার মশায়…

মন্টি! ঐ এক মস্ত শিকল! রঘুনাথ একটু আগে ভাবিতেছিল, তার মাথার উপর হইতে সব দায়িত্বের বোঝা সরিয়া গিয়াছে—তার সব কাজ শেষ হইয়াছে—এখন সে মুক্ত, স্বাধীন! উদ্দাম গতিতে যেদিকে খুশী ছুটিয়া যাইতে তার আর কোন বাধা নাই। এমনি ছুটিয়া জীবনের একেবারে প্রান্তে,—সে প্রান্ত ছাড়াইয়া দূরে, আরো দূরে অবলীলায় নিশ্চিন্ত মনে সে ছুটিয়া যাইতে পারে! পিছনে চাহিবার কিছু নাই,—তার প্রয়োজনও নাই! এই সব-হারা শুষ্ক জীবন-প্রান্তরে প্রাণ ভরিয়া ছুটিয়া এই প্রান্তরটা পার হইয়া সে এখন দেখিতে চায়, সেখানে কি আছে! কিন্তু মন্টি…তাই তো, এ যে গোল বাধিল!

পায়ে অমনি শিকল বাজিয়া উঠিল, ঝম্‌ঝম্! হায় রে, এমন দুর্দ্দিনেও তাকে মাথা ঝাড়িয়া উঠিতে হইবে,—আবার কোন্ সুদিনের আশায় বুক বাঁধাইয়া আকুল নেত্রে ভবিষ্যতের পানে চাহিতে হইবে! এ দুর্ভাগ্যের যে আর সীমা নাই!

রঘুনাথ বলিল,—চলো, তোমাদের ওখানে যাই।

যতীশ বলিল,—আপনি চলুন। আমি মাকে গাঁ-ময় খোঁজ করি। হয় তো আগুন দেখে খুব দূরে কোথাও সরে গেছেন…কিম্বা যদি নদী পার হয়ে আমাদের ওখানেই গিয়ে থাকেন?

খুব অন্ধকার পথে হাতড়াইয়া পথিক যখন পথ চলিয়াছে, অন্ধের মত উন্মাদের মত, আশাহীন, উৎসুক দৃষ্টিতে লক্ষ্যহীন—সে সময় সহসা বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিলে সে যেমন পথ দেখিয়া তার সন্ধান পায়—তেমনি এই নিবিড় নৈরাশ্যের আঁধার পথে এ কথায় যেন বিদ্যুৎ ফুটিল। সঙ্গে সঙ্গে আশার আলোয় ভরা পথের প্রান্ত দেখা গেল—তাহারি একধারে দাঁড়াইয়া ঐ যে লক্ষ্মী!

সকলেই আশার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তাও তো সম্ভব! রঘুনাথের পানে সকলে চাহিল। রঘুনাথ বলিল,—চল তবে, দেখি।

ছেলের দল রঘুনাথকে লইয়া পার-ঘাটায় চলিল। নদীর জলে দুই চারিজন লোক স্নান করিতেছে। কেহ স্নান সারিয়া গৃহে ফিরিতেছিল। রঘুনাথের পানে সকলেই মুখ তুলিয়া চাহিল। তাদের সে দৃষ্টি বেদনায় মাখা থাকিলেও রঘুনাথের বুকে তীক্ষ্ণ তীরের মত তাহা বিঁধিল। বেদনা সহ্য হয়; কিন্তু বেদনায় অপরের ঐ কৃপা-ভরা দৃষ্টি—একেবারেই অসহ্য!

নৌকা করিয়া গিয়া তীরে নামিতে রঘুনাথের মনে

চকিতে একবার একটু আশার ঝলক বহিয়া গেল। উদ্দেশে ভগবানকে প্রণাম করিয়া মনে মনে সে বলিল, তাই যেন হয় ঠাকুর, লক্ষ্মীকে যেন এখানে দেখিতে পাই।

বাড়ীর মধ্যে সকলের আগে গিয়া ঢুকিল যতীশ। রঘুনাথ স্তব্ধ দাঁড়াইয়া রহিল। সমস্ত ইন্দ্রিয় রুদ্ধ করিয়া দুই কাণে সে প্রাণের শক্তি উজাড় করিয়া শুনিবার চেষ্টা করিল, ঘরের কোণে লক্ষ্মীর একটু ক্ষীণ স্বর যদি জাগে! কিন্তু একটু পরেই যতীশকে নিরাশ-মলিন মুখে ফিরিতে দেখিয়া রঘুনাথের বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। এত-বড় মূর্খ সে যে, এমন আশা মনে জাগাইতে প্রয়াস পায়!

সমস্ত বাড়ীটায় মুহূর্ত্তে নিরানন্দ এক কঠিন জমাট স্তব্ধতা ফুটাইয়া তুলিল। বাপকে দেখিয়া যতীশের মার কোল হইতে মন্টি নামিয়া বাপের কাছে ছুটিয়া আসিল এবং বাপের এমন অস্বাভাবিক মলিন গম্ভীর মুখ আর ভাবভঙ্গী দেখিয়া সে একেবারে চমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। বাপের মুখ এমন সে কখনো দেখে নাই! রঘুনাথও মন্টিকে সাম্‌নে দেখিয়া এতটুকু হইয়া গেল। কি বলিয়া মন্টিকে সে কি প্রবোধ দিবে! মন্টি যখন বলিবে, বাবা, মার কাছে যাবো—তখন সে তাকে কি বলিয়া কোথায় কাহার কাছে লইয়া যাইবে!

বিপদ ঘটিল। মন্টি কথা কহিল, বলিল,—বাবা, মার কাছে যাবো।

রঘুনাথের সব ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া কোন্ সাগরের অতল-জল ঝর্‌ঝর্ করিয়া তাহার দুই গাল বহিয়া ঝরিয়া পড়িল। মন্টিও কাঁদিয়া ফেলিল। যতীশের মা তখন আগাইয়া আসিয়া মন্টিকে কোলে লইলেন এবং ভুলাইয়া রঘুনাথের পানে চাহিয়া বলিলেন,—ছি বাবা, কেঁদো না। কাঁদবার সময় নয়। ধৈর্য্য ধরো, এটার পানে চেয়ে বুক বাঁধো। তার পর পুলিশে খপর দাও, খোঁজ করো। মন্টি আমার কাছে থাকুক। তার পর ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া তিনি আবার বলিলেন,—ঘরের মধ্যে বেশ দেখেচো তো! সর্ব্বনাশ হয়ে যায় নি তো? তোমার পিশি?

রঘুনাথ একটা প্রচণ্ড নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—না, ঘরে তার কোন চিহ্ন নেই! পিশি ক'দিন এখানে নেই।

—তবে!...প্রশ্নটা করিয়াই যতীশের মা থামিয়া গেলেন। এই 'তবে' কথাটির আর জবাব নাই। তবে! তবে কি?

সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ওলট-পালট করিয়া ঐ 'তবে' কথাটি ইহার মধ্যে এমন ঘূর্ণীর সৃষ্টি করিয়া তুলিল যে, ঘূর্ণী বন্ধ করার কোন উপায় নাই, পথ নাই!

তবু চুপ করিয়া শোক বা দুঃখ করিলেও তো চলিবে না। যদি কেনো বিপদে পড়িয়া থাকে, সেই বিপদেই তাকে ফেলিয়া এখানে নিশ্চল বসিয়া হা-হুতাশ করিলে কি ফল হইবে? সে বিপদ হইতে তাকে উদ্ধার করা চাই তো! তার উপায়? রঘুনাথ ভাবিল, কি বিপদ—কোথায় গেলে এ বিপদ হইতে উদ্ধারের সন্ধান পাই!

তবু যাইতে হইবে! তৃষ্ণায় রঘুনাথের কণ্ঠ শুকাইয়া উঠিয়াছিল! এক-গ্লাস জল খাইয়া সে পথে বাহির হইল; মন্টিকে যতীশের মার কাছে রাখিয়া গেল। যতীশের মা বহুকষ্টে বলিলেন,—একটু কিছু মুখে দিয়ে যাও—কিন্তু তার উত্তরে রঘুনাথ এমন মর্ম্মভেদী কাতর দৃষ্টিতে তাঁর পানে চাহিয়া দেখিল যে, দ্বিতীয় কথা তাঁর মুখ দিয়া বাহির হইল না।

রঘুনাথ চলিয়া যাইতেছিল, তিনি তার কাছে গিয়া বলিলেন,—মন্টিকে ভুলে থেকো না বাবা। খপর দিয়ো—একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ো না। তোমার মন্টিকে মনে করে ফিরে এসো।

রঘুনাথ বলিতে যাইতেছিল, মন্টিকে তো বেশ নিরাপদ রাখিয়া চলিলাম, তার জন্য ভাবনা কি! কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না। যতীশের মার এই আকুল প্রাণের এমন খাঁটি দরদ, এই সহানুভূতি সে-কথায় প্রচণ্ড ঘা খাইবে। সে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইল।

## ৮

বাড়ীর বাহির হইয়া বহুক্ষণ সে নিরুদ্দেশের মত ঘুরিয়া বেড়াইল। হঠাৎ মনে হইল, থানা! থানায় যাইতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে ঐ লোক-জন-ভরা গ্রামের পথ মাড়াইয়া সেই তার চির-সুখের স্মৃতি-ঘেরা জীর্ণ গৃহের সামনে দিয়া যাইতে হয়! কত লোকের প্রশ্ন-ভরা কৃপা-দৃষ্টির ভিড় ঠেলিয়া পথ করিয়া যাইতে হইবে! অমনি সে শিহরিয়া উঠিল। পরক্ষণে মনে হইল, যদি লক্ষ্মী ইহার মধ্যে ঐ কুটীরেই ফিরিয়া আসিয়া থাকে!...ভগবান কি সত্যই এমন করিবেন—তার প্রাণের এ করুণ আবেদন কি তাঁর প্রাণে পৌঁছায় নাই? তা ছাড়া মন্টি...! ভগবান্ কি এমন নিষ্ঠুর হইতে পারেন?

রঘুনাথ আবার আশা করিয়া নৌকায় উঠিল। পার হইয়া অতি সন্তর্পণে নিজের কুটীরের পানে চাহিল—শূন্য ঘর, শত স্মৃতির জীর্ণ কঙ্কাল বুকে লইয়া পড়িয়া আছে! শোকের জমাট স্তব্ধতা দগ্ধ গৃহখানার উপর কি করুণ নেত্র মেলিয়া চাহিয়া আছে। তবু রঘুনাথ একবার কম্পিত চরণে ঘরের ভিতর ঢুকিল। উঠানে পোড়া বাঁশ আর খড়ের ছাইয়ে পাহাড় জমিয়া রহিয়াছে! সে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল; পরে চীৎকার করিয়া ডাকিল,—লক্ষ্মী...

নিজের স্বরে নিজেই সে চমকিয়া উঠিল। তার সে স্বরে একটা শৃগাল ভয় পাইয়া ছুটিয়া পলাইল। রঘুনাথ কিছুক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর চারিদিকে সন্তর্পণে দৃষ্টি বুলাইয়া ধীরে ধীরে গৃহত্যাগ করিল। এই গৃহ! এখানে তার জীবনের যা-কিছু সুখ, যত আনন্দ, একেবারে ভরপুর রহিয়াছে, সে সবের স্মৃতি একেবারে হিমালয়ের মত সম্মুখে প্রকাণ্ড পাহাড়ের সৃষ্টি করিয়া দুই চোখের সম্মুখে আড়াল তুলিয়া ধরিয়াছে!

রঘুনাথ পাগলের মত টলিতে টলিতে আসিয়া গ্রামের ফাঁড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল। একবার ভাবিল, কি হইবে এখানে খবর দিয়া! যদি পাইবার হইত, লক্ষ্মীকে এমনি পাওয়া যাইত! তা ছাড়া সুখ সে এত দিন অবাধে ভোগ করিয়াছে—অজস্র সুখ! এমন কি ভাগ্য করিয়াছে যে, এ-সুখ আরো বহু—বহুকাল ধরিয়া ভোগ করিতে পাইবে! তবু যতীশের মা বলিয়াছেন,—তাই তাঁর কথা রক্ষা করিবার জন্ম সে ফাঁড়ির মধ্যে গিয়া ঢুকিল!

একটি বাবু বসিয়া খাতায় কি-সব লিখিতেছিল—পাশে দুইজন জমাদার দাঁড়াইয়া, এমন সময় রঘুনাথ তাদের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। বাবু মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল,—কি চাই?

রঘুনাথ বলিল,—আমার ঘরে কাল রাত্রে আগুন লাগে, আর আমার স্ত্রীকেও পাওয়া যাচ্ছে না।

বাবুটি বলিল,—পুড়ে যায়নি তো?

রঘুনাথ বলিল—না।

বাবুটি রঘুনাথের পানে কৌতুহল-ভরা দৃষ্টি তুলিয়া চাহিল, চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কোথায় গেল তবে? কার সঙ্গে গেল?

রঘুনাথ বলিল,—জানি না।

বাবু হাসিয়া বলিল,—বয়স কত? নাবালক?

রঘুনাথ বলিল,—না! একটি মেয়ে আছে …

বাবু হাসিয়া বলিল,—কারো সঙ্গে বেরিয়ে যায় নি তো? দেখতে কেমন?

এই অপমান-সূচক কথার ভঙ্গীতে রঘুনাথের প্রাণটা ফাটিয়া তীব্র ভর্ৎসনা জাগিল। সে কঠোর রুক্ষ দৃষ্টিতে বাবুর পানে চাহিল।

বাবু বলিল,—কাকেও সন্দেহ হয়? বাবু হাসিল। জমাদার দুইজন পরস্পরের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

রঘুনাথ তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল,—কাকেও নয়।

বাবুটি রঘুনাথের পানে চাহিল: পরে বলিল,—বেশ, নালিশ লিখিয়ে যান। তার পর আদালতে গিয়ে দরখাস্ত দিন। হাকিম হুকুম দেয় যদি তো তদারক করবো। বলিয়া সে বহিতে রঘুনাথের নাম-ধাম ও লক্ষ্মীর নাম লিখিয়া রঘুনাথকে বলিল,—নাম সই করুন।

রঘুনাথ যন্ত্র-চালিতের মত বাবুটির লেখার তলায় সহি করিল; এবং তার এই অমূল্য উপদেশ লাভ করিয়া ফাঁড়ি হইতে প্রস্থান করিল। যেদিকে দুই চোখ যায়—সেই-দিকে সে চলিবে।

অনেকটা পথ উদ্‌ভ্রান্তের মত সে চলিল। চলিতে চলিতে পথ ঘুরিয়া যেখানে আবার নদীর ধারে মিলিয়াছে, সেইখানে আসিয়া বরাবর সেই ধারে গেল। জন-হীন দুই তীর। এপারে বাব্‌লা গাছের সার—মাঝে মাঝে ঘোড়া-নিম আর খেজুর গাছ। ওপারে গাছপালার পর খানিকটা খোলা জায়গা--তার পর দুইটা তালগাছ। তালগাছের নীচে দু'খানি গোলপাতার ঘর—মাটীর দেওয়ালে ঘেরা। ঘরের মধ্য হইতে সাপের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া ধোঁয়া উঠিতেছে। গৃহস্থেরা রান্নাবান্না করিতেছে। সেই দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে রঘুনাথের দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল। হঠাৎ মনে হইল, আজ যদি এমন অসম্ভাবিতভাবে তার সব ওলট-পালট না হইত তো তাহারো ঘরে লক্ষ্মী এখন রান্নাঘরে বসিয়া তাহারি তৃপ্তির জন্ম প্রাণের সমস্ত আবেগ লইয়া রন্ধনের কাজে নিজের কমল-হাত দুটি ব্যাপৃত রাখিত! কিন্তু হায় রে, তার সে-সব আজ অতীতের স্মৃতির বস্তু!

অতৃপ্ত নেত্রে রঘুনাথ ঐ ঘরের পানে চাহিয়া রহিল—হয় তো ও ঘরে তাহারি লক্ষ্মীর মত ঘরের ঘরণী স্বামীর জন্ম, সন্তানের জন্ম অন্নপূর্ণার বেশে অন্ন তৈয়ার করিতেছে। আহা, ওদের সুখ অটুট থাকুক, ওদের হাসি অফুরান হোক।…

এমনি সুখের কথা ভাবিতে ভাবিতে মন কখন্ নিজের এই নিরুপায়তা ও অক্ষমতার চিন্তার উপর দিয়া ভাসিয়া দেশের নারীর অবস্থার মধ্যে চলিয়া গেল। সে ভাবিল, এই বাঙ্‌লা দেশের নারী কতখানি অসহায়, কি নিরুপায় বেচারীর মত জীবনের পথে চলিয়াছে। স্বামীর জন্ম রান্নাবান্না করিয়া, তার সেবায় সমস্ত মন নিঃশেষে ঢালিয়া এককোণে পড়িয়া আছে! এত বড় জগতের কোথায় কি আছে, কি বিপদ, কি দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে, সে চিন্তা তার মনের কোণে ঠাঁই পায় না। তা যদি পাইত, তাহা হইলে এমন করিয়া প্রাণহীন তৈজসপত্রের মত তার লক্ষ্মীকে কেহ কখনো চুরি করিয়া লইয়া যাইতে পারে! লক্ষ্মী সে বিপদের মুখে এমন তেজে দাঁড়াইয়া উঠিত যে, প্রবলেরও সাহস হইত না, তার কাছে ঘেঁষিতে। দুর্বল হইলেও ভিতরকার সে-শক্তি দেখিয়া প্রবল দস্যুতস্করও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িত! অন্ততঃ বুদ্ধিটাও তার বাহিরের আব-হাওয়ায় এমন পাকিতে পারিত যে, দুটা কৌশলে বা তর্জনে হুঙ্কারে সে দস্যুকে হঠাইতে পারে! এ যে তস্করের দল ঘটি-বাটির মত এক জন নারীকে চুরি করিয়া লইয়া যাইতে পারে, এ বুঝি এই

বাঙলা দেশেই শুধু সম্ভব। কেন এমন হয়? এ সাহস, এ মন দুর্ব্বৃত্ত কেমন করিয়া পায়? সে জানে, পাঁচীলে ঘেরা নারী, ঘোমটায় ঢাকা নারী—স্বামীর পানে মুখ তুলিয়া কথা কহিতে সরমে যে নত হইয়া পড়ে—বাহিরের লোকের একটা তীব্র দৃষ্টির সামনে দাঁড়ানো দূরের কথা—সে দৃষ্টির পরশকে যে তীক্ষ্ণ তীরের ফলার মত ভয় করে,—দুর্ব্বৃত্ত তাহাতে সাহস পাইয়া ভাবে, এই নারী তার সবল হাতের গ্রাস ছিনাইবার কথা মনেও করিবে না। লজ্জাবতী লতার মত নির্জীব কুণ্ঠিত মূর্চ্ছিত হইয়া ধরা দিবে। একটা জীবন্ত জীব—তাও অবোলা পশু নয়—তাকে মাটীর ঢেলার মতই বাঙালী তার সংসারে পাঁচীলের গণ্ডীর মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছে। অবোলা পশুও শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে হাত-পা ছুড়িয়া সে আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টা করে! আর বাঙালীর মেয়ে—কি অসহায়, কি নিরুপায় বেচারী সে!

ভাবিতে ভাবিতে রঘুনাথ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এই যে খবরের কাগজে নারী-নিগ্রহের এত সংবাদ দিকে দিকে ঘোষিত হইতেছে, এর মূলে বাঙালীর চরিত্র-হীনতা, বাঙালীর অপদার্থতার চেয়ে নারীকে অবহেলা-অবজ্ঞা, মানুষ বলিয়া মনে না করা, আর তাকে খেলার পুতুল করিয়া রাখাই বেশী দায়ী। ট্রেণে চড়িয়া ইংরাজ-নারী একা কোথা হইতে কত দূরে চলিয়াছে—দেশ-দেশান্তরে ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে, পথে-ঘাটে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছে—তাকে ধরিতে কোন পরাক্রান্ত দস্যুর হাতও ভয়ে কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। আর বাঙালীর মেয়ের উপর এ আক্রমণ, এ যে নিত্যকার ব্যাপার হইতে চলিয়াছে!...

রঘুনাথ তপ্ত-চিত্তে জলের পানে চাহিল। তার সমস্ত বুক জুড়িয়া কে যেন আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে, বুক এমনি তাতিয়াছিল। সে ধীরে ধীরে জলে নামিল। প্রায় বুক-ভোর জলে গিয়া কতকগুলা ডুব দিল। তার পর ক্ষণেক স্তব্ধ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ভাবিল, এই জীবনটাকে জগতের পথে টানিয়া চলিয়া আর কি হইবে। এই শান্ত শীতল জলের কোলে সব জ্বালা জুড়াইয়া দিলে মন্দ হয় না। এক-পা এক-পা করিয়া সে জলের কোলে আরো অগ্রসর হইল—চোখের সামনে এক অজানা লোকের ছবি জাগিয়া উঠিল—ঐখানে ঐ লোকে হয় তো লক্ষ্মী ইহার মধ্যে আসিয়া তাহার জন্ম প্রতীক্ষা করিতেছে। সে আর-একবার স্থির হইয়া দাঁড়াইল। মনে হইল, একটু চাহিয়া থাকিলে লক্ষ্মীকে বুঝি দেখিতে পাইবে। এমন সময় হঠাৎ একটা স্বর তার কাণে আসিয়া বাজিল,—মা...

রঘুনাথ চমকিয়া উঠিল—এ তার মন্টির স্বর, না? তবে কি লক্ষ্মী আসিয়াছে? আসিয়া রঘুনাথকে ঘরে না দেখিয়া মন্টিকে সঙ্গে লইয়া তাহারি সন্ধানে পথে বাহির হইয়াছে? দুই চোখের উদাস দৃষ্টি মেলিয়া সে তীরের পানে চাহিল। ওপারে ঘোমটায় মুখ ঢাকা এক নারী কলসী কক্ষে নদীর জলে নামিয়াছে, আর তীরে দাঁড়াইয়া তার ছোট মেয়েটি তাকে ডাকিতেছে। মেয়েটি...এ যে তার মন্টির ছায়া! রঘুনাথ অপলক-নেত্রে তাহাদের পানে চাহিয়া রহিল। কি শান্ত মধুর ছবি ঐ জলের কোলে ফুটিয়াছে, মরি!

রমণী জল লইয়া চলিয়া গেল; বালিকা তার অনু-সরণ করিল। তাহারা দৃষ্টির অন্তরালে গেলে রঘুনাথ সহসা শিহরিয়া উঠিল। তাই তো, মন্টি! তাকে ফেলিয়া সে মরিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চলিয়াছে, তার মণ্টি মা-হারা বাপ-হারা কোথায় দাঁড়াইবে? কার মুখ চাহিয়া দাঁড়াইবে সে? না, মরা তো হয় না। রঘুনাথ জল হইতে উঠিয়া পাগলের মত পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল, তার পর যে-পথে আসিয়াছিল, আবার সেই পথে চলিল।

বহুক্ষণ চলিয়া হঠাৎ সে দেখিল, এ যে তার সেই গৃহের দ্বার, সেই পথ, সেই বাগান, সেই সব! দাঁড়াইয়া চোখ মেলিয়া সে ঘরের পানে চাহিয়া রহিল। ঘরের সম্মুখে ভস্ম-স্তূপ বিশৃঙ্খল ছড়ানো। পোড়া বাঁশ, কাঠ, ইট। বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া ঘরের মধ্যে সে প্রবেশ করিল, ডাকিল,—লক্ষ্মী...

কোন উত্তর নাই। তার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। রঘুনাথ বাড়ী হইতে বাহিরে আসিল। তার পর মাতালের মত পা দুইটাকে টানিয়া পারঘাটায় আসিয়া একটা নৌকায় উঠিয়া বসিল, বসিয়া ওপারের দিকে ইঙ্গিত করিল। মাঝি নৌকা খুলিয়া তাহাকে লইয়া ওপারে পৌছাইয়া দিতে রঘুনাথ নামিয়া যতীশদের বাড়ীর অভিমুখে যাত্রা করিল।

যতীশের মা তখন সন্ধ্যা-দীপ জ্বালিতেছেন, যতীশ মণ্টিকে লইয়া গল্প বলিতেছিল। এই শান্তির মধ্যে রঘুনাথ একটা অভিশাপের মত আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া গল্প থামাইয়া যতীশ তার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, মণ্টি ঝাঁপ দিয়া কোলে পড়িল। রঘুনাথ পাগলের মত দৃষ্টি মেলিয়া মণ্টির পানে চাহিয়া দেখিল।

যতীশের মা আসিয়া বলিলেন,—পেলে বাবা?

উদাসভাবে ঘাড় নাড়িয়া রঘুনাথ জানাইল, না।

৯

লক্ষ্মীকে লইয়া মোটর তীরের মত ছুটিল বড় রাস্তা ধরিয়া সোজা—রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করিয়া, ঘুমন্ত প্রকৃতির বুক চিরিয়া। এই আকস্মিক বিপদে দুর্ভাবনায় দুশ্চিন্তায় উত্তেজনায় সংগ্রাম করিয়া লক্ষ্মী কেমন আচ্ছন্ন মূর্চ্ছিতে।

মত হইয়া পড়িয়াছিল। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়া ভোরের পূর্ব্বক্ষণে গাড়ী একটা গলির মধ্যে ঢুকিল। সেই গলিতে খানিকটা পথ চলিয়া এক জীর্ণ বাগান—আলকাৎরা-মাখা কালো কাঠের ভাঙ্গা ফটক। গাড়ী সেই বাগানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ড্রাইভার ফটক খুলিয়া ভিতরে গাড়ী লইয়া গেল। ভিতরে দোতলা বাড়ী; জীর্ণ। তার সামনে গাড়ী থামাইয়া ড্রাইভার লক্ষ্মীর পানে চাহিয়া দেখে, লক্ষ্মীর তখনো মূর্চ্ছা ভাঙ্গে নাই।

মূর্চ্ছিতা লক্ষ্মীর পানে চাহিয়া ড্রাইভার ভাবিল, রূপের জ্যোৎস্নাই বটে! কিন্তু কি মেঘ এ জ্যোৎস্নায় কালির রেখা ঢালিয়া তাহাকে ঢাকিয়া দিয়াছে! একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ড্রাইভার লক্ষ্মীকে কোলে করিয়া বহিয়া দোতলায় উঠিল। দোতলায় চারধারে বারান্দা—বারান্দার ধারে ঘর! সেই ঘরের মধ্যে লক্ষ্মীকে একটা জীর্ণ কৌচের উপর শোয়াইয়া ঘরের সম্মুখে মুহূর্ত্তে অপেক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে সে নীচে নামিয়া আসিল; তার পর গাড়ীতে গিয়া পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল। সে আর কি করিবে? হুকুমের চাকর বৈ তো নয়।

যখন লক্ষ্মীর মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল, তখন একটা জানালার ফাঁক দিয়া এক-ঝলক রৌদ্র আসিয়া ঘরের মেঝের উপর পড়িয়াছে! লক্ষ্মী প্রথমটা কেমন আচ্ছন্নের মত ছিল। হঠাৎ সে ভাব কাটিলে উঠিয়া জানালার ধারে গেল। নীচে জঙ্গল। এককালে বাগান ছিল; এখন অযত্নে আগাছায় ভরিয়া জঙ্গলের সৃষ্টি করিয়াছে! সে কিছুক্ষণ জানালার সামনে দাঁড়াইয়া রহিল, তার পর আসিয়া দ্বারে ধাক্কা দিল—বাহির হইতে দ্বার তালা-বন্ধ। তার গা ছমছম করিয়া উঠিল, মাথা ঝিমঝিম করিতে লাগিল। ক্রমে আগাগোড়া ব্যাপারটা আগুনের হল্‌কার মত সমস্ত মনের মধ্যে ফুটিবামাত্র সে আতঙ্কে শিহরিয়া মেঝের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

মেঝের কোন্ পুরাকালে একটা মোটা কার্পেট বিছানো হইয়াছিল; অযত্নে আজ সেটা ধুলায় ঢাকা, মাঝে মাঝে ছেঁড়া।

মূর্চ্ছার মধ্যে সে স্বপ্ন দেখিল, ঘরে স্বামীর পাশে শুইয়া আছে, বুকের কাছে আছে মণ্টি! স্বামী ঘুমাইতেছেন—মণ্টিও ঘুমে অচেতন। জাগিয়া মাথার মধ্যে কত কি যে কুণ্ডলী পাকাইতেছিল, কত সুখ, কত বেদনা, কত আশা, কত ভয়! সে যেন হরেক রঙের ফুলঝুরি ফুটিতেছিল! হঠাৎ কি একটা শব্দ হইল,—তার মাথার মধ্যকার যত রঙের ফুল ঝড়ের মুখে পাপড়ির মত অমনি ঝরিয়া পড়িল। সে দেখে, সম্মুখে এক প্রকাণ্ড দৈত্য দুই চোখে আগুন জ্বালিয়া তার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে! ভয়ে সে স্বামীকে আঁকড়াইয়া ধরিল, মণ্টিকে বুকের মধ্যে চাপিয়া লুকাইল। তবু দৈত্য ছাড়িল না; স্বামীর বুক হইতে হিঁচড়াইয়া টানিয়া তাহাকে বাতাসের মুখে উড়াইয়া লইয়া চলিল! হাত-পা ছুড়িয়া ভীষণ সংগ্রাম বাধাইয়া এমন বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটাইল যে, হঠাৎ দৈত্যের হাত ছাড়াইয়া সে আসিয়া পড়িল নীচে এক পাহড়ের গায়ে! পাথরে মাথা ঠুকিয়া গেল। একটা চীৎকার করিয়া সে চোখ মেলিল—আঃ···! স্বপ্ন! কিন্তু এ কি, অজানা ঘর, অজানা ঠাঁই! কোথায় ঘর—কোথায় স্বামী? এ যে সে স্বপ্নের চেয়েও ভয়ঙ্কর কঠোর নির্ম্মম সত্য! অমনি সব কথা মনে পড়িয়া গেল। সেই গাছের ছায়ায় ছায়া-করা গ্রামের পথ—দস্যুর কোলে বন্দী সে নিষ্কৃতি-লাভের জন্য প্রাণপণে যুঝিয়া হার মানিয়াছে! তার পর সব ঝাপসা আঁধারে ভরিয়া গেল! মাঝে মাঝে চমক ফুটিতেছিল। মোটর গাড়ী, তাহাতে শুইয়া সে—মুখে কাপড় বাঁধা, মাথার উপর চাঁদের আলোয় ভরা আকাশ সরিয়া সরিয়া পিছনে চলিয়াছে! আকাশের এমন ছুটাছুটি সে আর কখনো দেখে নাই। তার পর মনে পড়িল, সে ঘরের মধ্যে শুইয়া ঘুমাইতেছিল, পাশে স্বামী, মেয়ে। তার পর···ভয়ে তার সমস্ত শরীর চমকিয়া উঠিল। এ আর স্বপ্ন নয়—বিপদ যা ঘটিবার, তা ঘটিয়া গিয়াছে! হায় রে কোথায় তারা? এখন কি করিতেছে? তাকে না দেখিয়া কি ভাবিতেছে? কি করিয়া সন্ধান লইয়া এখানে আসিবে? প্রাণে বাঁচিয়া আছে কি না, তাই বা কে বলিয়া দিবে!···

তার চোখের সামনে দিনের আলো, সূর্য্যের ঐ রশ্মিচ্ছটা চকিতে ঘোলাটে হইয়া নিবিয়া আসিল। হাতের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া সে শুইয়া পড়িল—দুই চোখে অমনি রাজ্যের ঘুম আসিয়া বাসা বাঁধিল।

তার পর বহুক্ষণ এমনি পড়িয়া থাকার পর যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন চোখ মেলিয়া চাহিয়া সে দেখে, সামনে কাঁচের বাসনে রাশীকৃত ফল, আর লুচি-তরকারী সাজানো রহিয়াছে। দেখিয়া ঘৃণায় তার মন ভরিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ সেগুলার পানে তাকাইয়া থামিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল, পরে জানালায় আসিয়া বসিল। জানালার নীচে আগাছার ঘন ঝোপ—মানুষের চিহ্ন দেখা যায় না। চারিধার স্তব্ধ। বহুদূর হইতে একটা কুকুরের চীৎকার সে স্তব্ধতার গায়ে আঘাত করিয়া স্তব্ধতাকে ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছে! সে দুই চোখ মেলিয়া উদাস মনে নীচের দিকে দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া চাহিয়া রহিল। ঐ যে বহুদূরে ঝোপের ফাঁক দিয়া একটু জল দেখা যাইতেছে—বুঝি একটা পুকুর ওখানে আছে। তার পর খুব দূরে একটা স্বর ঐ ভাসিয়া উঠিল—কে নাম ধরিয়া কাহাকে ডাকিতেছে না? স্বরটা শুধু প্রতিধ্বনির তরঙ্গ তুলিল,

তার পর আবার সব স্তব্ধ! লক্ষ্মী ভাবিল, জায়গাটা তবে একেবারে জনমানবশূন্য নয়!···

সঙ্গে সঙ্গে চিন্তার তরঙ্গ ছুটিল চারিদিককার বিরাট শূন্যতার উপর ভর করিয়া তাহারি বুকের উপর দিয়া ভাসিয়া—কোথায় কোন্ অজানা কূল লক্ষ্য করিয়া! কিন্তু ঘুরিয়া কোথাও কূল না পাইয়া শ্রান্ত হইয়া আবার বুকের মাঝে নিরাপদ নিশ্চিন্ত বাসা বাঁধিবার জন্য ফিরিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া লক্ষ্মী ভাবিল, হায় রে, কোথায় কে মানুষ আছে—কে তাহাকে এ কারাগার হইতে মুক্ত করিবে! বেচারা স্বামীর করুণ কাতর মুখ মনের কোণে ফুটিয়া উঠিল,—পাশে মণ্টি, কাঁদিয়া শ্রান্ত আকুল নেত্রে স্তব্ধ দাঁড়াইয়া আছে!

আকাশের গায়ে বহু-ঊর্দ্ধে ক'টা পাখী উড়িতেছিল—লক্ষ্মী ভাবিল, মানুষ না হইয়া সে যদি পাখী হইত! কি সুখী ঐ আকাশের পাখী! খুশী হইলেই মুক্ত আকাশে কত উপরে উঠিতে পারে—ওখান হইতে নীচে পৃথিবীর বুকে যেখানে যা আছে, সব চোখে পড়িতেছে। এমন করিয়া শূন্যতা ভেদ করিয়া চিন্তার তরঙ্গে মন ভাসাইয়া উহাদের দুরাশার স্বপ্ন বুনিতে হয় না। সে যদি মানুষ না হইয়া অমনি পাখী হইত!

কিন্তু না, পাখী হইলে স্বামীর প্রেম, মেয়ের ভালোবাসা—এ সব কি এমনি করিয়াই তার অদৃষ্টে ঘটিত! তার চেয়ে এখন যদি সে পাখী হইতে পারে! পাখী হইলে এই জানলার ফাঁক দিয়া অনায়াসে এক নিমেষে ছুটিয়া বাহির হইয়া ঐ আকাশে ডানা মেলিয়া উড়িয়া যায়!—কত বন, কত পথ, কত মাঠ পার হইয়া সেই ঘরখানিতে গিয়া একেবারে রঘুনাথের বুকের পাশে ধরা দিয়া বলে, আমি এসেছি! হায় রে, এই পাখী হওয়ার বিদ্যাটা যদি তার জানা থাকিত! ঠাকুর, একবার আসিয়া তাকে মানুষ হইতে পাখী করিয়া দাও! না হয়, আর মানুষ করিয়ো না—স্বামীর প্রেম না পায়, তাও সে সহিতে রাজী আছে,—তবু তাঁর কাছে-কাছে সে থাকিতে পারিবে তো!

এমনি যা-তা ভাবিয়া ভাবনার পুঁজি ফুরাইয়া আসিলে সে একেবারে কাতর অবসন্ন হইয়া পড়িল। বুকের মধ্যে একটা বেদনা অমনি কি এমন ঠেলিয়া আসিল যে, তার চাপে নিশ্বাস বুঝি বন্ধ হইয়া যায়! সে ভাবিল, মরণ, সে তো হাতেই আছে! ভাবিয়া কূল যখন পাওয়া গেল না, তখন মিছা আর কেন ভাবা! তার চেয়ে—

আঁচলটা টানিয়া সে বিছাইয়া ধরিল। এই তো মরণের ইঙ্গিত! আর কেন? আঁচলটা সে গলায় জড়াইল—তার পর একটা ফাঁশ টানিল। ফাঁশটা গলায় আঁটিতে চোখের সামনে জাগিয়া উঠিল, রঘুনাথের কাতর দুই চোখ, মণ্টির অশ্রু-ভরা ছোট্ট মুখ! লক্ষ্মীর হাত কাঁপিল—না, মরা হইবে না—তাহা হইলে তাদের সব আশা একেবারে নির্মূল করিয়া দিবে। তারা হয় তো এখনো আশা করিতেছে, লক্ষ্মী ফিরিবে! আর সে···?

সে ফাঁশ খুলিয়া অবসন্নের মত বসিয়া পড়িল, মাথা ঝিম্-ঝিম্ করিতেছিল। আঁচল বিছাইয়া ধীরে ধীরে সে শুইয়া পড়িল—চোখে ঘুম আসিল।

১০

এই ঘুম, আর জাগা, তারি ফাঁকে ফাঁকে চিন্তার জাল—লক্ষ্মী ভাবিল, সে কি পাগল হইবে!

তখন বাহিরে দিনের আলোর উপর সন্ধ্যার আঁচল ঝুলিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে—চারিধার আঁধারে ভরিয়া আসিতেছে। সে ধড়মড়িয়া উঠিয়া জানলার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। ঐ ঝোপ-ঝাপ, ঐ গাছপালা—উহার মধ্য হইতে আলোটুকুকে হটাইয়া আঁধার আসিয়া তার জায়গা জুড়িয়া বসিতেছে। বনের বুক চিরিয়া ঝিল্লীর রাগিণী উঠিতেছে—ওরা কি বলে? ও কি গান গায়? ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্···ও গানে মন ভয়ে ভরিয়া ওঠে যে! এতক্ষণ আলোর মাঝে লক্ষ্মী যে তাকে নির্ভর করিয়াই অজানা পথে-ঘাটে ঘুরিতে ফিরিতে পারিয়াছিল! এ আঁধারে পা চলে না! লক্ষ্মী শিহরিয়া উঠিল। সে চুপ করিয়া জানলায় বসিয়া রহিল।

বাহিরে দ্বারে শব্দ হইল—কে তালা খুলিতেছে! তার দুই চোখ জ্বলিয়া উঠিল—অধীরতায় ভরিয়া মন যেন ফুঁশিতেছিল! কে জানে, এ দৈত্যপুরীর মাঝে হয় তো কে মানুষ আছে, যে আসিয়া বলিবে, লক্ষ্মী, তুমি মুক্ত! না—হয় তো দৈত্যের প্রহরী মমতায় গলিয়া তাহাকে আসিয়া বলিবে, যাও লক্ষ্মী, দ্বার খোলা—পলাও তুমি!···না, এ দৈত্য নিজে কোনো উপদ্রবের সৃষ্টি করিয়া তুলিতে আসিতেছে। উঠিয়া নিজেকে সংবৃত করিয়া সে একেবারে তৈয়ার হইয়া বসিল। যদি উপদ্রব আসে, তবে যে-শক্তিটুকু তার এখনো বাকী আছে, সেটুকু লইয়া একবার প্রাণপণে লড়িবে! প্রাণটাকে ছেঁচিয়া হত্যা করিয়া সে একবার জীবন-পণ লড়িয়া দেখিবে! তার দুই চোখ হইতে যেন আগুনের শিখা ছুটিয়া বাহির হইতেছিল। সে ফুঁশিতেছিল।

দ্বার খুলিয়া গেল। ভিতরে আসিল একটা মালী, তার হাতে আলো। সেই আলোয় মালীর মুখখানা এমন ভীষণ দেখাইল যে, ভয়ে লক্ষ্মী চোখ বুজিল। তার পর চোখ খুলিয়া সে দেখে, মালী আলো রাখিয়া চলিয়া যাইতেছে। লক্ষ্মী ছুটিয়া গিয়া তার পা জড়াইয়া ধরিল—ওগো, আমায় ছেড়ে দাও গো, বাঁচাও তুমি!

মালী তার পানে ফিরিয়া চাহিল। লক্ষ্মীও ঘাড়

তুলিয়া তার পানে চাহিল—কি করুণ কাতর সে দৃষ্টি! মালী তার পানে নীরবে চাহিয়া রহিল—তার চোখে নিরুপায়তার ম্লান দৃষ্টি!

লক্ষ্মী বলিল,—আমায় ছেড়ে দাও—ঘরে আমার মেয়ে, আমার স্বামী ভেবে মরে যাচ্ছে!

মালী কথা না কহিয়া পা ছাড়াইয়া লইল, তার পর লক্ষ্মীর পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে কক্ষ ত্যাগ করিয়া দ্বার বন্ধ করিল।

দ্বারে তালা লাগানোর শব্দে লক্ষ্মীর হুঁশ্ হইল। সে উঠিয়া দ্বার নাড়িল। দ্বার তখন বাহির হইতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। লক্ষ্মী ভাবিল, হায় রে, কেন সে ঐ খোলা দ্বার-পথে পলাইবার একবার চেষ্টা করিল না! দ্বার ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—তার পর ভারী পা দুটাকে টানিয়া আবার মেঝের আসিয়া বসিল। উপায় নাই, আর উপায় নাই! শেষ যে সুযোগটুকু মিলিয়াছিল, তাও সে এক দুর্ব্বল অন্ধ মুহূর্ত্তে বিসর্জ্জন দিয়াছে!

অনেক রাত্রে আবার দ্বার-খোলার শব্দ হইল। লক্ষ্মী ভাবিল, এবার সে শেষ চেষ্টা করিবে···দ্বারের পাশে সে রুখিয়া দাঁড়াইল। বুকের মধ্যটা এমন সজোরে দুলিতেছিল যে, তার ধক্-ধক্ শব্দ তার কাণে বাজের মত বাজিতেছিল।

দ্বার খুলিতে যে-মূর্ত্তি সে চোখে দেখিল, তাহাতে তার হাত-পা অবশ হইয়া গেল, সমস্ত শক্তি চকিতে উবিয়া গেল। সে কেমন বিহ্বলের মত উঠিয়া সরিয়া আসিল। এ যে—মোটরে যে তুলিয়া দিয়াছিল—মুখে বিশ্রী হাসি! এ সে, যাকে পুকুর-ধারে গাছের আড়ালে দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিয়াছিল। কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি!

যে আসিয়াছিল, সে রজনী। রজনী আসিয়া হাসিয়া বলিল,—আমায় মাপ করো।···কেমন আছো?

লক্ষ্মী ভয়ার্ত্ত চোখে রজনীর পানে চাহিল—চাহিতে সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। সে চোখ বুজিল।

রজনী কৌচে বসিয়া ডাকিল—প্রেয়সী···

কি বিশ্রী আহ্বান—কাণের পাশে যেন ঝড়ের রোল;···লক্ষ্মী চোখ মেলিয়া আবার চাহিল। রজনী পকেট হইতে একটা কালো রঙের ছোট বাক্স বাহির করিয়া খুলিল; খুলিয়া বলিল,—এই ভাখো।

লক্ষ্মী কোন কথা বলিল না,—চাহিয়া দেখিল, কালো বাক্সের মধ্য হইতে আগুনের মত কি একটা দপ্‌দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে।

চুনি-হীরা-পান্না-জড়ানো একছড়া হার বাক্স হইতে বাহির করিয়া রজনী হাসিয়া বলিল,—তোমার রূপের পূজায় আমার এই অর্ঘ্য নাও তুমি।

বলিয়া সে উঠিয়া হার-ছড়া লক্ষ্মীর গলায় পরাইয়া দিতে গেল। লক্ষ্মী জড়-সড় হইয়া নিজেকে আঁটিয়া এমন ভাবে বসিল, যেন সে পাথরের মূর্ত্তি! চেতনা কিছুমাত্র নাই।

তার সে আড়ষ্ট মূর্ত্তি দেখিয়া রজনী বলিল,—তোমায় রাণী করে রাখবো। এত রূপ নিয়ে তুমি পুকুর-ঘাটে এক ভিখারীর এঁটো বাসন মেজে দিন কাটাবে,—তাও কি হয়! আমার যে তাতে বুকে বাজে! আমার এই বুকের মাঝে সিংহাসন পেতে তোমায় তাতে বসিয়ে রাখবো—দিন-রাত।···মুখ তোলো, চেয়ে ছাখো, প্রেয়সী!···তোমায় প্রেয়সী বলেই ডাকবো আমি, ঐ একটি নামই তোমায় সাজে শুধু!

লক্ষ্মী সন্দেহের দৃষ্টিতে চাহিল···এ কি, এ যে সত্যই একটা লোক আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া এমনি সব জঘন্য কথা অনায়াসে বলিতেছে! এও কি সম্ভব! না, এ একটা সে দারুণ দুঃস্বপ্ন দেখিতেছে! লক্ষ্মী কিছু বুঝিতে পারিল না। তার দেহ, তার মন যেন একটা হাল্‌কা সুতার ভরে হাওয়ায় দুলিতেছিল—পায়ের নীচে অবলম্বন নাই, ভূমি নাই, কিছু নাই!

হঠাৎ একটা জ্বলন্ত স্পর্শে তার মন সাড়া পাইয়া জাগিয়া উঠিল। ভালো করিয়া চাহিয়া সে দেখে, এ কি, এ কার দুই হাতের বাঁধন তার অঙ্গে এমন আঁটিয়া বসিয়াছে!···অত্যন্ত নোংরা জিনিসের মতই সে হাত দুইটাকে ঠেলিয়া সে ছাড়াইতে গেল! লোহার শিকলের মত শক্ত বাঁধন—তাও খুলিল। রজনী অমনি দুই হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল,—আমার হাত থেকে কোথায় যাবে প্রেয়সী?

লক্ষ্মী ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়িল; উঠিয়া এক কোণে সরিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে রজনীও বিহ্বলভাবে তার পিছনে চলিল। লক্ষ্মী আর-এক কোণে সরিয়া গেল, তার পর আর-এক কোণে—যেখানে যায়, সেইখানেই ঐ হাত দুইটা তার পিছনে! উপায় নাই! মা গো—বলিয়া লক্ষ্মী মাটীর উপর লুটাইয়া পড়িল।

মূর্চ্ছা ভাঙ্গিতে লক্ষ্মী দেখে, সে রজনীর কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া আছে। একবার মনে হইল, এ তার সেই ঘর—আর সেই ঘরে রঘুনাথের কোলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে! রঘুনাথ কখন্ আসিল? তার যে এখনো কাপড়-চোপড় ছাড়া হয় নাই, পা ধুইতে বাকী! ধড়মড়িয়া লক্ষ্মী উঠিয়া পড়িল। উঠিতেই চোখ পড়িল এই কারাগারের বদ্ধ-প্রাচীরে। না, এ সেই অজানা ঘর! অমনি দৃষ্টি পড়িল রজনীর দিকে—এ তো স্বপ্ন নয়, ঐ যে সে দুর্ব্বৃত্ত···উঃ!

লক্ষ্মী অসহায়, একান্ত নিরুপায়! কি করিবে? সে কি করিবে?

হঠাৎ বিদ্যুতের মত একটা চিন্তা তার মনের আঁধার চিরিয়া ফুটিয়া উঠিল। সে একেবারে রজনীর পায়ের

উপর আছাড় খাইয়া পড়িল, পড়িয়া কাতর কণ্ঠে বলিল,—আমায় ছেড়ে দিন; দয়া করে ছেড়ে দিন!

রজনী দুই হাতে পায়ের 'উপর হইতে লক্ষ্মীকে সরাইয়া দিল, দিয়া বলিল,—তোমায় ছাড়ার জন্যই কি এত আয়োজন করেছি প্রেয়সী! তোমায় ছাড়তে গেলে প্রাণটাকেও ছাড়তে হয় যে! তোমায় ছাড়বো না তো! তুমি আমার মাথার মণি!

বলিয়া রজনী আবার লক্ষ্মীকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইবার জন্য দুই হাত বাড়াইল। লক্ষ্মী তার হাত দুটাকে ঠেলিয়া সরিয়া গেল, অশ্রু-জড়িত কণ্ঠে বলিল,—আপনি আমার বাপ…আমি মেয়ে…

এ কথার উত্তরে রজনী এমন একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিল যে, সে হাসির শব্দে চারিধার কাঁপিয়া উঠিল। লক্ষ্মীর মনে হইল, এই ঘরটাও বুঝি ও-শব্দে এখনি ফাটিয়া চৌচির হইয়া যাইবে!

লক্ষ্মীর আর কিছু বলিবার নাই। নারীর এ কাতরতায় যে-পুরুষ এমন পরিহাসের হাসি হাসিতে পারে, তার কাছেও সে মুক্তির আশা করে? নিজের উপর রাগ ধরিল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে এই যে তার মরিবার সাধ হইয়াছিল—কেন সে তখন মরিল না? এই দুর্ব্বৃত্তের হাতে পড়িয়া এমন লাঞ্ছনা তাহা হইলে ভুগিতে হইত না!

রজনী বলিল,—শোনো প্রেয়সী, তোমার সোনার অঙ্গে কঠিন হাত দেবো, এত বড় বাঁদর আমি নই। আমি রূপের পূজারী। এ রূপ আমি বুকে ধরে পূজা করবো, তাই তোমায় এনেচি। আজ, না হয়, কাল; কাল না হয় পরশু—তোমায় একদিন আমি চাইই। তবে জোর করে নয়…তাতে সুখ নেই।

লক্ষ্মী দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া রজনীর পানে চাহিয়া রহিল।

রজনী আবার বলিল,—এই যে হার দেখচো, এ কিছুই নয়—তোমার ঐ সোনার অঙ্গ এমনি হারে ভরিয়ে দেবো। আমার যা-কিছু আছে, সব তোমার পায়ে ঢেলে দেবো—তোমায় সর্ব্বস্ব দেবো। তোমার স্বামী, তোমার মেয়ে—তাদেরও খুব সুখে রাখবো; শুধু তুমি আমার হও!

তার পর ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া রজনী আবার বলিল,—তুমি ভেবে ছাখো প্রেয়সী, তোমার এ রূপ এ যৌবন নিয়ে তুমি সর্ব্বময়ী হয়ে থাকবে আমার কাছে। তোমার কথায় আমি উঠবো বসবো। আজ আমি যাচ্ছি… তোমায় জ্বালাতন করবো না। আজ প্রথম দিন। অসময়ে এসেচি। জানি, ভয়ে তোমার মন এখন ভরে আছে। কিন্তু ভয় নেই…তোমার স্বাধীন ইচ্ছায় আমি হাত দেবো না। তবে সময় দিলুম। তুমিও ভেবে দেখো… যদি একান্তই না পাই তোমায়, তা হলে—

রজনী একটা নিশ্বাস ফেলিল, তার পর আবার বলিল,—যেখান থেকে এনেচি, আবার সেইখানেই তোমায় রেখে আসবো।

লক্ষ্মী কাঠ হইয়া সব কথা শুনিল। কথাগুলা যেন হাওয়ায় ঘুরিয়া কোন্ সুদূর কোণ হইতে ভাসিয়া তার কাণে আসিয়া লাগিতেছে! ঐ শেষের দিকের কথাটা—যেখান থেকে এনেচি, আবার সেইখানেই তোমায় রেখে আসবো…ইহা কি হইবে? ভগবান, ভগবান…এ কি সে সত্যই শুনিয়াছে? না, এ স্বপ্নের আর এক ছলনা।

রজনী বলিল,—তোমায় আর বিরক্ত করবো না, চললুম। তুমি ভেবে দেখো সব। আমার এ ভালোবাসা তুমি পায়ে ঠেলো না। আমি তোমার ভালোবাসার ভিখারী—বলিয়া রজনী লক্ষ্মীর পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া তার মুখের দিকে আকুল চোখে চাহিল। লক্ষ্মী তবু অসাড়, মূক, নিস্পন্দ! রজনী বলিল,—কি পাষাণ তুমি, প্রেয়সী। আচ্ছা, দেখি আমার বুক-ফাটা চোখের জলে ও পাষাণ একদিন গলে কি না! আজ পর্য্যন্ত কখনো আমায় ভালোবাসা ভিক্ষা চেয়ে নিরাশ হতে হয় নি…!

রজনী উঠিয়া কৌচে বসিল। লক্ষ্মী তার পানে চাহিয়া তেমনি নিঝুম দাঁড়াইয়া রহিল। বহুক্ষণ এমনি থাকিয়া রজনী উঠিল, বলিল,—আমি চললুম। তুমি মোদ্দা আমার কথাটা ভেবো প্রেয়সী। এতখানি ভালোবাসা কি মিছে হবে!—আর খাওনি-দাওনি কেন? ছি, ওতে শরীর থাকবে কেন?

কথাটা বলিয়া রজনী ঘুরিয়া দ্বারের কাছে গেল; তার পর আর একবার লক্ষ্মীর পানে তৃষিত নেত্রে চাহিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইল। দ্বারে তালা পড়িল এবং লক্ষ্মী যেমন বন্দী, তেমনি বন্দী রহিল।

রজনী চলিয়া গেলে লক্ষ্মী আবার সেই জানালার প্রান্তে গিয়া দাঁড়াইল। এইমাত্র যে সব কুৎসিত কথা শুনিয়াছে, তার দূষিত বাষ্পে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। বাহির তখন গাঢ় অন্ধকারে ভরিয়া গিয়াছে, আর সেই ঘন আঁধারে জোনাকির ঝিকিমিকি—তার আঁধার ভবিষ্যতের পথে যেন একটু আলোর রশ্মি—উঁকি দিতেছে! সে ভাবিল, না, মরিবে না! এখানে এই পরের ঘরে পরের আশ্রয়ে এমন ভাবে মরার কথা মনে হইলে ঘৃণায় সর্ব্বশরীর শিহরিয়া ওঠে! মরিতে যদি হয় তো সেই তার শত সুখের স্মৃতি-ঘেরা জীর্ণ ঘরের দ্বারে মরিবে! স্বামীর সামনে না যদি মরিতে পায়, তবু সেই দ্বারেই তার মরণ-শয্যা বিছানো চাই! তাঁর পায়ের ধূলায় ভরা ঘর, তাঁর হাসিতে—তাঁর প্রেমে আলো-করা ঘর—মরিবার মত অমন ঠাঁই এ পৃথিবীতে আর কোথায় আছে!

কিন্তু সব দ্বার যে বন্ধ! সে কেমন করিয়া এ বাঁধন কাটিয়া বাহির হইবে! এ কত দূরে কোন্ দেশে আসিয়া পড়িয়াছে—কোন্ পথ ধরিয়াই বা যাইবে! সে ভাবিতে লাগিল। ভাবিয়া কোন দিশা যখন পাওয়া গেল না, তখন এ বিপদের মধ্যেও তার হাসি আসিল। এই ছোট ঘরখানার ভিতর হইতে সে বাহির হইবার পথ পাইতেছে না,—ইহার মধ্যে সে বাহিরের পথের কথা ভাবিয়া আকুল! হায় রে, অদৃষ্টের এমন বিড়ম্বনায় কি কোন মানুষ কোন দিন পড়িয়াছে!

## ১১

সেদিন সারা রাত্রি ভাবিয়া রঘুনাথ স্থির করিল, লক্ষ্মীকে খুঁজিয়া সে বাহির করিবেই। এই তার পণ! এই পণ লইয়া সে বাড়ীর বাহির হইবে! তার প্রাণের লক্ষ্মী, তার উপর সব নির্ভর করিয়া পরম নিশ্চিন্ত মন লইয়া ঘরের কোণে বসিয়াছিল—নিজেকে রক্ষার কোন উপায় কোনদিন তার সেবার মধ্যে মনে করিবার সময় পায় নাই! সেই লক্ষ্মীকে এমন বিপদে ফেলিয়া সে চুপ করিয়া থাকিবে,—মরিয়া দায়িত্বের হাত এড়াইবে? এ বিষম স্বার্থ-চিন্তা ক্ষণেকের জন্য যে তার মনে জাগিয়াছিল, সে জন্য নিজের উপর রাগ হইল। এই তার ভালোবাসা, এই তার স্বামিত্ব! আদায় করিবার বেলা ষোল-আনা, দিবার বেলা কিছু না! তা হইতেই পারে না!

কিন্তু মন্টি! মন্টিকে লইয়া কি করে? ইঁহাদের গৃহে ফেলিয়া গেলে দেখাশুনার বা যত্নের ত্রুটি হইবে না—কিন্তু তার আব্দার আছে, বায়না আছে। বিশেষ মা-বাপ দুইজনকে চোখের আড় করিয়া তার মন যখন মুইয়া পড়িবে! তা ছাড়া অসুখ-বিসুখ হইলে···এতখানি ঝক্কি ইঁহাদের ঘাড়ে ফেলিয়া দেওয়া কি ঠিক হইবে? বলিলে ইঁহারা রাজী হইবেন নিশ্চয়—কিন্তু ভালো লোক বলিয়াই কি ইঁহাদের দরদের উপর এতখানি ভার চাপাইয়া সে অমন হালকা হইয়া বাহির হইবে! যদি লক্ষ্মী বলে, ওগো তাকে কেমন করিয়া ফেলিয়া আসিয়াছ! আমি যে তাহাকে তোমার কাছে রাখিয়াই একটু নিশ্চিন্ত আছি···

রঘুনাথের মন বলিয়া উঠিল, না, না—মন্টিকে ছাড়িয়া যাওয়া হইবে না। এতখানি বেদনা সহিয়া যাইতেছে, আর একটি ছোট মেয়ের ভার,—এ আর সহ্য যাইবে না! তা ছাড়া নৈরাশ্যের মুহূর্তে দুর্বল মন যখন অবলম্বন না পাইয়া দিগ্বিদিকে ছুটিতে চাহিবে, মরণের কোল খুঁজিবে, তখন মন্টি পাশে থাকিলে অনেকখানি শক্তি মিলিবে, সাহসও···! তা ছাড়া আশাও তাহা হইলে একেবারে তার মন হইতে সরিয়া যাইবে না। মন্টিকে সঙ্গে লইয়া নূতন পথে চলিতে হইবে!

কিন্তু কোথায় খোঁজ করা যায়—কোন্ দিকে, কোন্ পথে! মানুষ এমন নিশ্চিহ্ন হইয়া উবিয়া যাইতে পারে—কোন লোক সন্ধান দিতে পারে না?

হঠাৎ মনে হইল, সেই যে ভিড়ের মধ্য হইতে কে বলিয়াছিল, তাকে মোটরে দেখিয়াছি। কার মোটর? মোটরে সে গেল কি করিয়া? তবে—তবে কি...সত্যই কোন দুর্বৃত্ত তার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে!

ভাবিতে ভাবিতে পুরাকালের সেই মর্ম্মভেদী কাহিনী তার মনে পড়িল! বনের মধ্যে বাকল-পরা রাজার ছেলে পাতার কুঁড়ের আশ্রয় লইয়াছিলেন। দুঃখের সীমা ছিল না। সেই বন-মধ্যে একমাত্র অবলম্বন সীতাদেবীকে হারাইয়া তিনি রাজার ছেলে ত্রি-ভুবনের মালিক হইয়াও ধৈর্য্য হারান নাই! সেই সীতাকে উদ্ধার করার সঙ্কল্প লইয়া বনে বনে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া, কত নদী পার হইয়া, কোন্ সাগরে সেতু বাঁধিয়া গিয়া তাঁকে উদ্ধার করেন! দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি দীর্ঘ চিন্তার জাল বুনিয়া তিনি ক্ষান্ত হন নাই, দুই হাতে কাজ করিয়াছিলেন—অমন কত বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া! আর সে এই একটুতে ধৈর্য্য হারাইয়া মরিতে চলিয়াছিল!

না—ভিতর হইতে কে যেন জোর করিয়া বলিল,—তাকে পাওয়া চাই!

তবে?

রঘুনাথ ভাবিল, নামটাতেও তো ভারী আশ্চর্য্য মিল! রঘুনাথ! সেকালের ভগবান রঘুনাথ তাঁর লক্ষ্মীকে হারাইয়া কাতর হইলেও শক্তি হারান নাই···সেও অতবড় নামের মালিক হইয়া তার লক্ষ্মীকে হারাইয়া শক্তি হারাইবে? না।

* * * *

পরদিন ভোরে উঠিয়া রঘুনাথ অধীরভাবে বাড়ীর সামনে পথে পায়চারি করিতেছিল। যতীশ আসিয়া ডাকিল,—মাষ্টার মশায়—

রঘুনাথ যতীশকে বুকের উপর টানিয়া লইলেন, বলিলেন—তোমার মা উঠেচেন?

যতীশ বলিল,—উঠেচেন।

রঘুনাথ বাড়ীর মধ্যে গেল। যতীশের মা রোয়াকে বসিয়া আনাজ কুটিতেছিলেন। রঘুনাথকে দেখিয়া তিনি মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিলেন, বলিলেন,—মন্টি এখনো ওঠেনি।

রঘুনাথ বলিল,—আজ একটু সকাল সকাল তাকে খাইয়ে দেবেন, মা।

যতীশের মা দুই চোখে প্রশ্ন ভরিয়া রঘুনাথের পানে চাহিলেন। রঘুনাথ বলিল,—আজ আমি বেরুবো ওকে নিয়ে। তার পর সে তার সঙ্কল্পের কথা খুলিয়া বলিল।

শুনিয়া যতীশের মা বলিলেন,—ফিরবে কবে?

রঘুনাথ বলিল,—তাকে পেলে।

যতীশের মা বলিলেন,—মন্টি আমার কাছে থাক্ না! ওর ভারী কষ্ট হবে যে, বাবা।

রঘুনাথ বলিল,—না মা, আমি ওকে আগে দেখবো, যাতে কোন কষ্ট না হয়।

যতীশের মা বলিলেন,—আমরা যে দুশ্চিন্তা নিয়ে থাকবো এখানে।

রঘুনাথ বলিল,—আপনাকে মাঝে মাঝে খপর দেবো।

যতীশের মা বলিলেন,—কিন্তু কোথায় যাবে?

রঘুনাথ এ কথার জবাব দিতে পারিল না। কি জবাব দিবে? সে নিজে জানে না যে কোথায় কোন্ দিক দিয়া সে সন্ধান সুরু করিবে! ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া সে বলিল,—দেখি, যেতে যেতে যে পথ সামনে পড়ে, তাই ধরেই যাবো।

যতীশের মা বলিলেন,—যা শুনচি, তাতে আমার মনে হয়, কলকাতার দিকে খোঁজ নেওয়া দরকার। তা, যে মস্ত সহর—সে কি সহজ কথা! আমার ভয় হয়, প্রাণেই কি বেঁচে আছে?

রঘুনাথের দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল। এ ভয় তার প্রাণেও বাজিতেছে, নিশিদিন! কিন্তু তবু মনে হইল, তার লক্ষ্মী—সে যে জগৎ-সংসারের কিছুই জানে না! মরিবার কথা মানুষ ভাবিতে পারে, এমন কথাও যে তার মনে পড়িবে না! তা ছাড়া মরা—সে যে বড় শক্ত কাজ। লক্ষ্মী মরিতে জানে না, মরার কোন উপায়ও জানে না যে!

রঘুনাথ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যতীশের মা বলিলেন,—বেশ, চুপ করে বসে থাকাও তো চলে না। তাই করো! থানার উপর যে কোনো বিশ্বাস নেই! না হলে ওরা মনে করলে কি সন্ধান নিয়ে বার করতে পারে না!

থানা! থানার কথায় রঘুনাথের মনে পড়িল সেই ভাব-হীন মমতাহীন দুই চোখ, আর সেই দুই হাত—কলের মত খাতার পিঠে শুধু কলম চালাইয়া চলিয়াছে—কু-কথায় পঞ্চমুখ, কণ্ঠ-ভরা বিষ প্রাণী! প্রাণ গেলেও তাদের দ্বারে সে দাঁড়াইতে পারিবে না! শুধু তাদের কাছে কেন, কাহারো কাছে মুখ ফুটিয়া তার এ সর্ব্বনাশের কথা কখনো সে খুলিয়া বলিতে পারিবে না। অন্তরের এই গূঢ়তম গাঢ় বেদনা পরের প্রশ্ন আর পরিহাস-ভরা দৃষ্টির সামনে খুলিয়া তার অপমান করিবে, এত বড় দরাজ ছাতি তার নাই!

রঘুনাথ বলিল,—নিজেই খুঁজবো।

এমন সময় যতীশ বলিয়া উঠিল,—ঐ যে মন্টি উঠেচে…

সঙ্গে সঙ্গে মন্টি একখানি ডুরে কাপড় গায়ে জড়াইয়া বাপের কাছে ছুটিয়া আসিল, কহিল—মাকে এনেচো?

এ কথায় স্থানটা এমন বেদনার সুরে ভরিয়া গেল যে, সকলেরই চোখে জল আসিয়া পড়িল। যতীশের মা তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া উঠিয়া মন্টিকে বুকে লইলেন, তার মুখে মুখ দিয়া বলিলেন,—এসো তো মা, মুখ ধুইয়ে দি। তার পর বাবার সঙ্গে মার কাছে যাবে!

—মা আসেনি এখানে? বলিয়া মন্টি বাপের পানে চাহিল।

রঘুনাথ মুখ নত করিয়া ছিল—সে কথার জবাব দিবার কোন চেষ্টা করিল না। মনকে জোর করিয়া চাপিয়া ধরিল—এমন কথা প্রতি নিমেষ এখন শুনিতে হইবে—উহাতে মনকে দমিতে দেওয়া হইবে না!

আহারে বসিয়া মন্টি বিষম বায়না লইল, বাবা খেলে তবে সে খাইবে, না হইলে নয়।

রঘুনাথকে তখন ভাতের কাছে বসিতে হইল এবং মন্টি তার মুখে এক মুঠা অন্ন গুঁজিয়া দিল। রঘুনাথ বলিল,—তুমি খাও মা।

মন্টি বলিল,—তুমি না খেলে আমি খাবো না তো—কখ্খনো খাবো না।

রঘুনাথকে তখন খাইতে হইল। দুইজনের আহার শেষ হইলে রঘুনাথ উঠিল; মুখ-হাত ধুইয়া যতীশের মার পায়ের কাছে প্রণাম করিল। তাঁর পায়ের ধুলা মাথায় দিয়া বলিল,—আশীর্ব্বাদ করুন; যেন হাসি-মুখে আপনার পায়ে তাকে এনে পৌঁছে দিতে পারি।

যতীশ আসিয়া রঘুনাথকে প্রণাম করিলে রঘুনাথ কোন কথা বলিতে পারিল না, শুধু উদাস অশ্রুময় দুই চোখের দৃষ্টি মেলিয়া তার পানে চাহিয়া রহিল।

যতীশের মা বলিলেন,—আমাদের কলকাতার ঠিকানাটা লিখে দাও যতী। চিঠি দিয়ো, বাবা—আর পেলেই তাকে নিয়ে আমার ওখানে গিয়ে উঠো। আমিও আর দু'চারদিন পরে চলে যাবো।

মার কথায় যতী একটা কাগজে তাদের কলিকাতার ঠিকানা লিখিয়া আনিয়া রঘুনাথের হাতে দিল। রঘুনাথ কাগজটুকু জামার পকেটে রাখিয়া মন্টিকে কোলে লইয়া পথে বাহির হইল।

পথে আসিয়া মন্টি বলিল,—আমায় নামিয়ে দাও, আমি হাঁটবো। হাঁটতে আমি পারি।

রঘুনাথ তাহাকে নামাইয়া দিল, দিয়া ভাবিল, এই

তো হাঁটার সুরু··· কতক্ষণ হাঁটিতে হইবে, তার কি কোন ঠিকানা রাখিস্ মা!

গ্রামের বুক···দুইধারে তাল-নারিকেল, আম-কাঁঠালের বাগান, মাঝে ধুলা-ভরা পথ। আশে-পাশে চালা ঘর। কাহারো চালে নানা লতা-পাতা গজাইয়া চালের খড় ঢাকিয়া ফেলিয়াছে! রঘুনাথ চারিদিকে চাহিতে চাহিতে ঘাটের পথে আসিল। তার পর ভাবিল, রাস্তার পথে নয়। এখনি মন্টি সহস্র প্রশ্ন তুলিয়া এমন আকুল করিয়া দিবে, জবাব তার দিতে পারিবে না —মাঝে হইতে বেদনার ঘাগুলা খোঁচা খাইয়া বিষম টনটন্ করিতে থাকিবে।

ঘাটে আসিয়া মাঝিকে সে ওপারে অনেকটা দূরে নামাইয়া দিতে বলিল। নৌকা চলিল। জলের ছোট ছোট ঢেউ ভাঙ্গিয়া নৌকার দুইধারে আছড়াইয়া মরিতে লাগিল! কি বেদনার সুর···কি দরদে-ভরা কল-কল্লোল!

রঘুনাথ আকাশের পানে চাহিল। ঐ আকাশ,—দুই দিন পূর্ব্বে যে আকাশ উপর হইতেই তার ছোট্ট গণ্ডীবেরা বিপুল সুখ চোখ মেলিয়া দেখিয়াছে। আর এ সেই বাতাস, যার পরশ তার অঙ্গে অমৃত বর্ষণ করিয়াছে! আজ···!

সে একটা নিশ্বাস ফেলিল। মন্টি বলিল, আমাদের বাড়ী কৈ, বাবা? এবং তার জবাবের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া চলিল, মা কোথায় গেছে বাবা? কেন গেছে? কার সঙ্গে গেল? আমায় কেন নিয়ে গেল না? যোসো, আমি মার সঙ্গে কথা কবো না তো! আমায় ফেলে একলা চলে যাওয়া—ভারী দুষ্টু মেয়ে মা—আচ্ছা!

রঘুনাথ বলিল,—চেয়ে ছাখো মন্টি, কেমন ছোট ছোট ঢেউ, কেমন নৌকো চলেছে···

মন্টি সে কথায় কাণ না দিয়া প্রশ্নের ঝড় বহাইয়া চলিল।

পারে আসিয়া রঘুনাথ মন্টিকে লইয়া এক পথে চলিল। এ পথে লোকের ভিড় নাই। পথটা গিয়া মাঠের মধ্য দিয়া বড় রাস্তায় মিশিয়াছে। রঘুনাথ আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, আঃ, এ পথে আসিয়া লোকের প্রশ্নগুলাকে খুব ফাঁকি দেওয়া গিয়াছে। বহুক্ষণ হাঁটিয়া মাঠ পার হইয়া একটা জলার ধারে আসিয়া রঘুনাথ বসিল। মন্টি বলিল,—বসলে কেন বাবা? চলো না—বাড়ির হয়ে যাবে যে নৈলে···

রঘুনাথ বলিল,—একটু জিরোও মা। এখন কতদিন হাঁটতে হবে, তা তো জানো না।

মন্টি রঘুনাথের পানে চাহিল। তার অর্থ? এ কথার মানে···?

চাদরের খুঁট খুলিয়া রঘুনাথ কতকগুলা মুড়ি ও কিছু মিষ্টান্ন মন্টির সামনে ধরিয়া বলিল,—খাও। একটু খেয়ে নাও, আবার হাঁটবো।

মন্টি বলিল,—তুমি খাও, তবে খাবো।

তর্ক করা রঘুনাথের সহ্য হইতেছিল না। কি জানি, আবার মন্টি কি প্রশ্ন করিয়া বসিবে! সেও মেয়ের সঙ্গে মিলিয়া মুড়ি মুখে তুলিল।

## ১২

সাত দিন কাটিয়া গেল। সন্ধ্যাবেলা। মালী একটু আগে লক্ষ্মীর ঘরে আলো জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছে।

লক্ষ্মী এ সাত দিন সহস্রবার ভাবিয়াছে, মরিবে—মরণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, তবু মরিতে পারে নাই। মরিব মনে করা যত সহজ, মরা তেমন নয়। বিশেষ বাঙালীর ঘরে। দুঃখী বাঙালীর ঘরে মরণ বড় চট করিয়া মেয়েদের স্পর্শ করিতে চায় না! অতি দুঃখে পড়িয়া আশার শেষ রেখা হারাইয়াও বাঙালীর মেয়ে পড়িয়া দুঃখ সহে—এ তো লক্ষ্মী এখনো আশা ছাড়িতে পারে নাই! স্বামী, মেয়ে—স্বামীর ঘর! কোথা হইতে এ দুর্দ্দিনেও তাকে এমন বাঁধিয়া রাখিয়াছে যে, লক্ষ্মী বার বার মরিতে গিয়া শুধু তাদের মুখ চাহিয়া মাটীতে মুখ গুঁজড়াইয়া পড়িয়াও বাঁচিয়া রহিল।

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। সন্ধ্যার পরেই চাঁদের জ্যোৎস্না ঘরের মেঝের পড়িয়া লুকোচুরি খেলা সুরু করিয়া দিয়াছে। এ কয়দিন রজনী আসিয়া বাহির হইতে চলিয়া গিয়াছে; দ্বারের অন্তরাল হইতে লক্ষ্মীর খোঁজ করিয়াছে; ঘরে আসে নাই। লক্ষ্মীও কতকটা ভয়ের হাত হইতে নিজেকে তাই মুক্ত রাখিতে পারিয়াছে।

আজ রাত্রে চাঁদের এই রূপালি আলোয় তার প্রাণের মধ্যে রূপালি তারে দুলিয়া আশা আসিয়া উঁকি দিল। লক্ষ্মী ভাবিল, তবে বোধ হয় তার দুর্গ্রহ কাটিয়া গেছে! এবার সে ছুটি পাইবে,—ছুটি! বাহিরের মুক্ত অবাধ বাতাসের পরশে এ দুর্দ্দিনের স্মৃতি ভুলিয়া আবার তার সেই চিরকালের চেনা সহজ পুরাতনের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিবে।

দ্বার খুলিয়া মালী ভিতরে আসিল, হাতে জল-খাবারের ঠোঙা। খাবারের ঠোঙা লক্ষ্মীর পায়ের কাছে রাখিয়া অত্যন্ত বিনীত স্বরে সে বলিল,—খাও মা!

লক্ষ্মী কাতর চোখে মালীর পানে চাহিল। সে দৃষ্টির অর্থ, আবার কেন জ্বালাও গো? কিন্তু মূর্খ মালী সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিল না। সে শুধু লক্ষ্মীর পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

লক্ষ্মী তখন কথা কহিল, একটু ঝাঁজালো সুরে বলিল,—কেন বার বার আমায় ত্যক্ত করো তোমরা? এখানকার কোনো জিনিস আমি ছোঁব না! মরে গেলেও নয়!

মালী এ কথায় ব্যথা পাইল। সে বলিল,—এ আমার পয়সায় এনেচি মা—বাবুর পয়সায় নয়।

লক্ষ্মী অবাক্ হইয়া গেল। এই মূর্খ ছোট লোক মালী! ইহার প্রাণে এত মমতা, এমন দরদ!

মালী বলিল,—ক'দিন মুখে কিছু দাও নি যে মা—একটু খাও। আজ তোমায় আমি বার করে দেবোই। আর একটু রাত হোক—তোমায় সঙ্গে নিয়ে গিয়ে একটি বাবুদের বাড়ী রেখে আসবো—সে আমি ঠিক করেচি···

লক্ষ্মী আরো বিস্মিত হইয়া ভাবিল, এ আর-একটা চাতুরীর জাল বুনিতেছে না তো! কিন্তু মালীর মুখের ভাব দেখিয়া সে সন্দেহ নিমেষে অন্তর্হিত হইল।

লক্ষ্মী বলিল,—তার পর তোমার···

কথাটা সে শেষ করিবার পূর্ব্বেই মালী বলিল,—চাকরীর কথা বলচো মা! তোমার আশীর্ব্বাদে গতর থাকলে চাকরী ঢের মিলবে।

মালী একটা নিশ্বাস ফেলিল, তার পর মিনতি-ভরা স্বরে বলিল,—এবার তুমি খাও—না খেলে রাস্তা চল্‌তে পারবে কেন!

এ ব্যাকুল নিবেদন উপেক্ষা করা চলে না—করিবার মত প্রাণ লক্ষ্মীর নয়। লক্ষ্মী মুখ ধুইয়া একটা মিষ্টান্ন মুখে তুলিল।

মালী বলিল,—আরো দুজন মেয়েকে সে এমনি পাহারা দিয়াছে, এমনি তালা-দেওয়া ঘরে কড়া তদারকে রাখিয়াছে—কিন্তু তারা তো মানুষ নয়! দু' দিন পরেই বাবুর সঙ্গে বেশ বনাইয়া হাসি-খুশী করিয়াছে। এবারও সে ভাবিয়াছিল,···কিন্তু সে ভুল! তা ছাড়া লক্ষ্মীর চোখের ঐ কাতর দৃষ্টিতে সে বুনো মালী, তারও প্রাণ টলিয়াছে!

লক্ষ্মী কথা শুনিতে শুনিতে আহার করিতেছিল—হঠাৎ নীচে গাড়ীর শব্দ শুনা গেল। মালী বলিল,—কোন ভয় নেই, মা—বলিয়াই সে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে গিয়া দ্বারে তালা আঁটিয়া দিল।

লক্ষ্মীর হাতের মিষ্টান্ন হাত হইতে পড়িয়া গেল। ভয়ে সে একেবারে থ হইয়া রহিল। কি আশ্চর্য্য—যে-মুহূর্ত্তে সে-ভয় কাটাইয়া মনকে আশ্বাসে ভরপূর করিয়া তুলিয়াছে, ঠিক সেই সময়···

বাহিরে রজনীর মত্ত কণ্ঠের স্বর শুনা গেল। রজনী মালীকে ডাকিতেছিল। ঐ দৈত্যের হুঙ্কার জাগিয়াছে! এত দিন পরে আবার!

লক্ষ্মী নিজেকে সম্বৃত করিয়া উন্নত হইয়া বসিল—এখনি বুঝি পাহাড়ের মত বিপদ আসিয়া ঘাড়ে পড়িবে! সঙ্গে সঙ্গে দ্বারের তালা খুলিয়া রজনী ঘরে ঢুকিল, ডাকিল,—প্রেয়সী ··

লক্ষ্মী ভয়ে একেবারে কাঠ হইয়া রহিল। তার বুকের মধ্যে রক্তটা ভয়ের দোলায় ছলাৎ ছলাৎ করিয়া দুলিতেছিল।

রজনী বলিল,—সাত দিন সময় দিছি! আজ তৈরী! কি বলো, প্রেয়সী! কথা কইচো না যে?

বলিয়াই রজনী আগাইয়া গিয়া লক্ষ্মীর হাত ধরিল। লক্ষ্মী হাত ছাড়াইয়া কোণের দিকে সরিয়া গেল। রজনী তাহাকে জাপটাইয়া ধরিয়া সবলে লক্ষ্মীর অধরে চুম্বন করিল, বলিল,—আঃ, রাধাধর-সুধাপান!

লক্ষ্মী প্রাণপণে নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিল। শরীরে কোথা হইতে এমন শক্তি আসিয়া দেখা দিল! সে প্রাণপণে ডাকিতেছিল, হে মা কালী, হে ঠাকুর···

রজনী বাঘের মত বিক্রমে লক্ষ্মীকে জাপটাইয়া কৌচের উপর বসিয়া পড়িল।

লক্ষ্মীর চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবী একটা রক্ত-রাঙা গোলার মত ঘুরপাক খাইতেছিল। এ গ্রাস হইতে কি করিয়া সে মুক্তি পাইবে? ঠাকুর, ঠাকুর,···

হঠাৎ কে আসিয়া দুইজনের মাঝে পড়িয়া দুইজনকে সবলে দুই পাশে হঠাইয়া দিল। রজনী মদ খাইয়া মাতাল হইয়া আসিয়াছিল—ছিট্‌কাইয়া কৌচের নীচে সে গড়াইয়া পড়িল। লক্ষ্মী ছিটকাইয়া দূরে আসিয়া চোখ মেলিয়া চাহিতে দেখে, মালী। মালী বলিল,—পালাও, মা পালাও—এখনি পালাও তুমি···

লক্ষ্মী কেমন যেন হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল। মালী তার হাত ধরিয়া জোরে টানিল, বলিল,—পালিয়ে এসো, শীগ্‌গির···

লক্ষ্মী তখন বুঝিল, এ কি কাণ্ড চলিয়াছে—আর এ কি মস্ত সুযোগ তার সামনে! সে ছুটিয়া দ্বারের সম্মুখে আসিয়া পড়িল। রজনীও ঠিক সেই মুহূর্ত্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দ্বার আগলাইল। মালী রজনীর হাত ধরিয়া সজোরে আবার ধাক্কা দিল—রজনী একেবারে গিয়া পড়িল কৌচের পায়ার কাছে।

—তবে রে বেটা ঝুঁটি-বাঁধা উড়ে—বলিয়া মালীকে আক্রমণ করিবার জন্য যেমন সে উঠিতে যাইবে, ঠিক সেই ফাঁকে মালী লক্ষ্মীকে ঠেলিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিল। লক্ষ্মীর সমস্ত চেতনা অমনি নিমেষে জাগিয়া উঠিল; এবং সে আর কোন দিকে না চাহিয়া একেবারে সিঁড়ি টপকাইয়া নীচে আসিল!

উঠিয়া রজনী দেখে, লক্ষ্মী ঘরে নাই। মালীর উপর প্রচণ্ড ক্রোধ হইল। কিন্তু লক্ষ্মী যে সরিয়া পলা

মালীকে ছাড়িয়া সে তখন লক্ষ্মীর পিছনে ছুটিতে উদ্যত হইল।—কিন্তু মালী বাধা দিয়া দাঁড়াইল। তখন সমস্ত ক্রোধ এ-বাধায় নাড়া পাইয়া বিপুল বিক্রমে মালীর উপর ঝরিয়া পড়িল। কিল-চড়-লাথিতে মালীকে বিপর্য্যস্ত করিয়া রজনী শেষে তাকে টানিয়া ঘরের বাহির করিয়া সিঁড়ির উপর হইতে সজোরে এমন ধাক্কা দিল যে, মালী গড়াইতে গড়াইতে গিয়া নীচে পড়িল। রজনীও মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া টলিতে টলিতে নীচে নামিয়া আসিল এবং এধারে ওধারে চাহিয়া একেবারে বাগানের ফটক অবধি চলিয়া গেল। ঐ পথ···জন-প্রাণীর সাড়া নাই, শব্দ নাই, এবং চাঁদের আলোয় মাতালের চোখে যতদূর দেখা যায়, কাহারো কোন চিহ্ন নাই! রজনী ফিরিয়া মোটরে গিয়া উঠিল। ড্রাইভারটা তখন চোখ মুদিয়া পড়িয়াছিল। রজনী তাকে টানিয়া তুলিয়া বলিল,—চালাও—আস্তে যাও—

ড্রাইভার হঠাৎ ব্যাপার না বুঝিয়া বিস্মিত হইল। কিন্তু মনিবের আদেশ—পালন কবিল। গাড়ী ধীরে ধীরে পথে বাহির করিয়া ধীরে ধীরে চালাইল—আর রজনী গাড়ীতে বসিয়া দুই চোখে ক্ষুধাতুর লোলুপ দৃষ্টি ভরিয়া পথের সামনে পিছনে ডাহিনে বামে চারিধারে তাহা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কোথায় গেল সে?···কোথায় কোনোদিকে চিহ্ন নাই!

* * * *

বাহির হইয়া লক্ষ্মী পথে আসে নাই। পাছে ধরা পড়ে, এই ভয়ে ফটকের ওদিকে যাইতে তার পা ওঠে নাই। সেই পাতায় ঢাকা আলো-মাখা ঝাপসা জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে যেদিকে দুই চোখ যায়, তেমনি ছুটিয়া চলিয়াছিল। বাগানের বেড়া টপকাইয়া, দুই হাতে জঙ্গল ঠেলিয়া সে চলিয়াছিল। পায়ে কাঁটা ফুটিতেছে, গায়ে গাছের ডালে ধাক্কা লাগিতেছে—সে দিকে তার খেয়াল নাই—চলিয়াছে—সোজা সে চলিয়াছে—অতি সন্তর্পণে, গাছের শুকনো পাতায় পায়ের শব্দ না ধ্বনিয়া ওঠে, সে শব্দ বাঁচাইয়া—মাঝে মাঝে ঝোপের আড়ালে দাঁড়াইয়া। পিছন-পানে সে চাহিয়া দেখিতেছিল, কেহ ধাওয়া করিয়া আসিতেছে কি না!

এমনি করিয়া সারা রাত্রি সে চলিল। জঙ্গল ঠেলিয়া, খানা ডিঙ্গাইয়া, গলি পার হইয়া, বেড়া টপকাইয়া—বাগানের পর বাগান ছাড়াইয়া; কেবল বড় রাস্তায় গেল না। কি জানি, যদি কোন লোকের সঙ্গে দেখা হয়! যদি কেহ প্রশ্ন তোলে, তুমি কে? কোথায় চলিয়াছ? পা ভারী হইয়া মাটীর উপর লুটাইয়া পড়িতে চায়, দেহের ভার সে আর বহিতে পারে না—তবু লক্ষ্মী সমানে চলিয়াছে! চলার তার আর বিরাম নাই! মনের মধ্যে আশা জাগিতেছিল, যদি ভোরের দিকে চোখে পড়ে, সেই তার চির-পরিচিত সোনার ঘরখানি···

চলিতে চলিতে মাথার উপর জ্যোৎস্না তরল হইয়া সরিয়া পড়িবার উদ্যোগ করিল, তার পর কোথায় উবিয়া গিয়া চারিধার আঁধারে ভরাইয়া দিল। সেই আঁধারে লক্ষ্মী চলিয়াছে, লক্ষ্যহীন, দিক-বিদিকের জ্ঞান হারাইয়া, দম-খাওয়া পুতুলের মত!

শেষে গাছের পাতার আড়ে ভোরের পাখীর কাকলী জাগিয়া উঠিল—নানা পতঙ্গের বিচিত্র কল্লোল ফুটিল—তবু লক্ষ্মী চলিয়াছে। পা দুইটা এমন টাটাইয়া উঠিয়াছে যে আর চলে না! মনে হয়, এবার কোথাও পড়িয়া জন্মের মত এ চলায় ছুটী দিতে পারিলে সে বাঁচিয়া যায়!

গাছের ডাল-পাতা ফুঁড়িয়া ক্রমে ভোরের আকাশ হইতে গোলাপী আলো ঝরিয়া পড়িল। মাতালের মত টলিতে টলিতে লক্ষ্মী আসিয়া একটা পোড়ো বাড়ীর সামনে দাঁড়াইল। মাথা ঘুরিতেছিল—সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে, যেন সে সদ্য স্নান করিয়া উঠিয়াছে! ঘুমে চোখ ঢলিয়া আসিতেছিল। জোর করিয়া চাহিয়া সে দেখে, এ কি! রাত্রির অস্পষ্ট আলো-আঁধারের মধ্যেও যে বড় রাস্তাকে দূরে রাখিয়া সে চলিয়াছে, ভোরের আলোয় সেই বড় রাস্তার ধারেই নিজেকে আনিয়া ফেলিল! উপায়···?

উপায় নাই। পা আর চলে না! সেই পোড়ো বাড়ীর সামনে থমকিয়া দাঁড়াইয়া সে একটা নিশ্বাস ফেলিল, ডাকিল,—ভগবান!···

হায় রে, ভগবানকে ডাকিয়া কোনো ফল হইবে না! অত্যাচার-অবিচারের প্রতীকারে যদি তাঁর হাত কখনো উঠিত, তাহা হইলে তাঁর পায়ের কাছে দুঃখীর বেদনার অশ্রু এমন ভাবে নিত্য পুঞ্জিত হইয়া ভোগবতী গঙ্গার সৃষ্টি করিতে পারিত না! দুঃখীর দুঃখ যদি তিনি তার মিনতিতে কি প্রার্থনাতে ঘুচাইতেন, তাহা হইলে এ পৃথিবীতে দুঃখ কি থাকিত! তাহা হইলে কে তাঁর পায়ে মাথা খুঁড়িয়া নিত্য এমন আকুল আবেদনে আকাশ-বাতাস ভারী করিয়া তুলিত! তাঁর নামই তাহা হইলে পৃথিবীর বুক হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইত! দুঃখী ডাকিয়া নিরাশ হয়, তার দুঃখ ঘোচে না, তবু লোকে কোনো দিকে আর কাহাকেও না পাইয়া তাঁহাকেই ডাকিতে থাকে—ভাগ্যের এ কি বিড়ম্বনা!

লক্ষ্মী নিরুপায় হইয়া সেইখানে পড়িয়া রহিল। মাথা ঝিম-ঝিম করিতেছিল। সেইখানে পড়িয়া সে চোখ বুজিল।

## ১৩

একটু বেলা ফুটিতে সে পথে প্রথম আসিয়া দেখা দিল, হরকান্ত। সর্ব্বরকম নেশার সাধনা করিয়া সে একেবারে দিগ্‌গজ বনিয়াছে। এই পোড়ো বাড়ীটা তাদের দলের আড্ডা। সন্ধ্যার সময় হইতে রাত্রি প্রায় বারোটা পর্য্যন্ত এখানে মস্ত ভিড় জমে এবং সে ভিড়ের সভায় দেশের লাটসাহেবের সফরে বাহির হওয়ার খরচ হইতে সুরু করিয়া মায় আজকালের বাজারের চড়া দর অবধি কোন আলোচনাই বাদ থাকে না! এমন কি, সঙ্গে সঙ্গে মানব-দেহকে সকল প্রকার ভোগ্য পদার্থে আপ্যায়িত করিতে কোথায় কি সরঞ্জাম সজ্জিত বা প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা আবিষ্কার করা এবং আবিষ্কারান্তে তাহা সংগ্রহ—এ সমস্তর কিছুই বকেয়া পড়িয়া থাকে না। এই দলের হুঙ্কারে এই পোড়ো বাড়ীটা পাড়ার রমণীবৃন্দের কাছে এক আতঙ্কের জায়গা বলিয়া এমন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে যে, সন্ধ্যার পর একলা এধার মাড়াইতে তাহাদের ভরসা হয় না।

কোন্ পুকুরে মাছ ধরিয়া সে দিনটা সুখে অতিবাহিত করা যায়, তাহারি সন্ধানে হরকান্ত বাহির হইয়াছিল। হঠাৎ আড্ডা-ঘরের সামনে মূর্চ্ছিত নারী-মূর্ত্তি দেখিয়া কৌতূহলী হইয়া সে কাছে আসিল এবং যখন দেখিল, মূর্ত্তিখানি শুধু নারীর নয়, তরুণীর; এবং সে অপূর্ব্ব সুন্দরী, তখন পরম উল্লাসে তার চিত্ত নাচিয়া উঠিল। সে সে-মূর্ত্তির কাছে আসিল এবং কিছুক্ষণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া নিশ্বাস অনুভব করিবার জন্য তার নাকের কাছে হাত লইয়া গেল। এই যে নিশ্বাস পড়িতেছে!

হরকান্ত তখন তরুণীকে একটু নাড়া দিল। সে নাড়ায় লক্ষ্মী চোখ মেলিয়া চাহিল। চাহিয়া এ-মূর্ত্তি সম্মুখে দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল।···আবার। এখনো বিরাম নাই!

হরকান্ত তখন তাহাকে তুলিয়া ধরিতে গেল। বিপদ বুঝিয়া লক্ষ্মী অতি-কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আত্মরক্ষার জন্য ছুটিয়া পলাইতে গিয়া দেখিল, পা তার এমন ভারী আর টাটাইয়া রহিয়াছে যে নড়া শক্ত। তবু সে ছুটিবার চেষ্টা করিল। শীকার ফস্‌কায় দেখিয়া হরকান্ত তাহাকে জাপ্‌টাইয়া ধরিল। লক্ষ্মী সে-আক্রমণ হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে যুঝিতে লাগিল—কিন্তু হায়, হাত-পা নিতান্ত অবশ, শরীরে এতটুকু সামর্থ্য নাই—সমস্ত শরীরকে কে যেন দুমড়াইয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছে! তার দুই চোখে জল আসিল। তার ক্ষুদ্র গৃহকোণ হইতে টানিয়া হিঁচড়াইয়া তাকে এ কোন্ পথে আজ দাঁড় করাইলে, ঠাকুর!

পুরুষের তীব্র লালসা চারিদিকে লোলুপ হাত বিস্তার করিয়া কেবলি নারীকে গ্রাস করিতে চায়! এ কি লজ্জা, এ কি দুর্ভাগ্য! পুরুষকেও কি তুমিই সৃষ্টি করো নাই, ভগবান!

ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া সে যুঝিতে লাগিল। তার হাত ফস্কাইয়া লক্ষ্মী একটু ছুটিবার চেষ্টা করে, ছুটিতে গিয়া অমনি হাঁফাইয়া পড়ে—হরকান্ত গিয়া তাকে ধরিয়া ফেলে। লক্ষ্মী আশা হারাইয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিল। এমন সময় এক কাণ্ড ঘটিল।

ওধারে একটা গলি বাঁকিয়া একখানা ভাড়াটে গাড়ী বড় রাস্তায় আসিয়া দেখা দিল। গাড়ীখানা এই দিকে আসিতেছিল। লক্ষ্মী একবার চকিতের জন্ম গাড়ীটা লক্ষ্য করিল—তার পর চোখের সামনে সব অন্ধকার! হরকান্ত তাহাকে তখন একেবারে আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে।

গাড়ী কাছে আসিল। কাছে আসিতে গাড়ীর খোলা ঝিরঝিরি মধ্য দিয়া একমাত্র আরোহী এক তরুণী মুখ বাড়াইয়া পথে এই কাণ্ড দেখিয়া গাড়ী থামাইয়া নামিয়া পড়িল এবং ছুটিয়া সেখানে আসিয়া বলিল,—এ কি এ!

হরকান্ত তার পানে চাহিল। তরুণী সুন্দরী, পরণে খদ্দরের জামা, গায়ে খদ্দরের শাড়ী, পায়ে নাগ্‌রা জুতা। তাকে দেখিয়া হরকান্ত থ হইয়া দাঁড়াইল, তার পর তার শীকারের দিকে আবার মনঃসংযোগ করিল। লক্ষ্মী তখন আর একবার ছুটিবার চেষ্টা করিল।

ব্যাপার বুঝিয়া তরুণী হরকান্তর হাত ধরিয়া ঝট্‌কা দিল, তীব্র স্বরে কহিল,—ছাড়ো।

হরকান্ত চোখ পাকাইয়া তীব্র একটা হাস্য করিল। তরুণী তখন চকিতে গিয়া গাড়োয়ানের হাত হইতে চাবুক আনিয়া তার পিঠে সজোরে শপাশপ্ বসাইয়া দিল।

আচম্‌কা ছিপটি খাইয়া হরকান্ত ভড়কাইয়া তরুণীর পানে চাহিল। চাহিতেই মুখের উপর শপাৎ করিয়া চাবুক পড়িল—চাবুকের পর চাবুক। তার গাল ফাটিয়া রক্ত বহিল এবং প্রহারে জর্জ্জরিত হরকান্ত বেত্রাহত কুকুরের মত ত্রস্তে পলাইয়া নিজের প্রাণ রক্ষা করিল।

তরুণী তখন লক্ষ্মীকে ধরিয়া প্রশ্ন করিল,—এর মানে কি?

হাঁপাইতে হাঁপাইতে লক্ষ্মী বলিল,—অত্যাচার!

তার মুখে আর কোন কথা ফুটিল না। সে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া যাইতেছিল, তরুণী তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া একরকম টানিয়া তাহাকে আনিয়া গাড়ীর মধ্যে তুলিল। লক্ষ্মীর হাত-পা ঝিম্‌ঝিম্ করিতেছিল—সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে সুরু করিল। টলিয়া সে মূর্চ্ছিত হইয়া গাড়ীর মধ্যে বসিয়া পড়িল।

তরুণী গাড়োয়ানকে সঙ্কেত করিল, চালাও।

গাড়োয়ান ঘোড়ার পিঠে চাবুক কশাইয়া তীব্র বেগে গাড়ী ছুটাইয়া দিল।

অনেকখানি পথ চলিয়া আসিবার পর আতঙ্ক কাটিলে লক্ষ্মী আবার চোখ মেলিয়া চাহিল। তরুণী দুই হাতে ধরিয়া তার মুখখানি বুকের উপর তুলিয়া কহিল,—ভয় নেই। তুমি আমার কাছে আছো।

লক্ষ্মী উদাস দৃষ্টি মেলিয়া চুপ করিয়া রহিল—তার চোখের সামনে তখনো একরাশ দৈত্য কালো-কালো ভীষণ মূর্ত্তি লইয়া তাণ্ডবের তালে নৃত্য করিতেছিল।

তরুণী বলিল,—আর ভয় কি! চাও, চোখ মেলে চাও!

এই কোমল দরদ-ভরা স্বরে লক্ষ্মীর বেদনাহত মনের উপর শান্ত শীতল বাতাসের পরশ ভাসিয়া আসিল। তার আরাম বোধ হইল!

তরুণী বলিল,—বেশ, আমার বুকে মাথা রেখে তুমি ঘুমোও…

লক্ষ্মী বিস্মিত দৃষ্টিতে তার পানে চাহিয়া শুধু প্রশ্ন করিল,—তুমি মা-ভগবতী?

তরুণী মৃদু হাসিয়া কহিল,—না, আমি কিরণ,—তোমার দিদি হই।

এও এই পৃথিবী! এ পৃথিবীতে অত্যাচারের উদ্যত বাহু শত অস্ত্রে মানুষের বুক চিরিয়া তাকে রক্তাক্ত করিয়া তোলে…আবার এই পৃথিবীতেই মমতার স্নিগ্ধ নির্ঝর এমন ঝর-ঝর ধারে ঝরিয়া পড়িতেছে, তার একটি ঝলক-পরশে বুকের সে রক্ত মুছিয়া যায়, সে বেদনা আরাম পায়। লক্ষ্মী ভাবিল, তা যদি না হইত, তাহা হইলে এ দুনিয়ায় মানুষ বাস করিতে পারিত কি, ঠাকুর!

কিরণ দেখিল, লক্ষ্মীর চোখে আশ্বাসের আভাস ফুটিলেও তার মন এখনো আতঙ্কের কাঁটাগুলাকে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে নাই। তাকে ভুলাইবার জন্য সে তখন নিজের কথা পাড়িয়া বসিল। কিরণ বলিল,—আমি এধারে এক ঠাকুর-বাড়ীতে এসেছিলুম কাল রাত্রে, পূজা দিতে। ট্যাক্সি খারাপ হয়ে গেল। ভোর-অবধি তাই থাকতে হলো। ভোরেও ট্যাক্সি খারাপ দেখে এই গাড়ীটা ভাড়া করে ফিরচি। আমি থাকি কলকাতায়,—ট্রেণে ভিড়ের মধ্যে যেতে ভালোবাসি না। এই গাড়ী করে এখনো যাবে তো—এ গাড়ী সব না পারে, পথে আর একখানা গাড়ী নিয়েও বাড়ী যেতে পারবো। আর খানিক গেলে পথে অন্য ট্যাক্সি মিলতে পারে! না হলে ঘোড়ার গাড়ীতে টানা গেলে বাড়ী পৌছুতে সময় লাগবে ঢের বেশী। আজই দুপুরের আগে আমার ফেরা চাই। সেখানে পরের চাকরি করি, তাই।…যাক্, এখন তুমি কোথায় যাবে, বলো দিকি! তোমার বাড়ী কোথায়?

এ কথায় লক্ষ্মীর প্রাণটা ধক্ করিয়া উঠিল। বাড়ী! সে কোন্ দিকে, কত দূরে…তা ছাড়া কার সঙ্গে যাইবে সেখানে? তার চেয়ে…

লক্ষ্মী বলিল,—আজকের মত আমায় একটু আ দেবেন, তার পর সন্ধান নিয়ে আমায় বাড়ীতেই পৌঁছে দেবেন। এই অবধি বলিয়া লক্ষ্মী একটু থামিল, পরে একটা ঢোক গিলিয়া বলিল,—এ ক'দিনে আমার জীবনে কি যে হয়ে গেল…সব কথা আপনাকে বল্‌বো দিদি। বল্‌বো, আগে একটু নিশ্বাস নি।

এই কয়টা কথা বলিতে গিয়া লক্ষ্মী কেমন অবশ হইয়া পড়িল। মনের মধ্যে এই কয়দিনের ঘটনা জ্বলজ্বল করিয়া ফুটিয়া উঠিল,—তার সমস্ত সজীবতা, তার সমস্ত ভীষণতাকে আরো প্রচণ্ড তেজে দীপ্ত করিয়া। লক্ষ্মী কিরণের বুকে মাথা রাখিয়া আবার চোখ বুজিল।

গাড়ী আরো খানিক চলিয়া আসিলে পথেই ট্যাক্সি মিলিয়া গেল। যে ট্যাক্সিতে কিরণ আসিয়াছিল—ড্রাইভার সেটাকে সারাইয়া তুলিয়া পিছনে আসিয়া হাজির হইল। লক্ষ্মীকে ধরিয়া ট্যাক্সিতে উঠাইয়া কিরণও পাশে বসিল—ড্রাইভার গাড়ীর হুড তুলিয়া দিল; তার পর গাড়োয়ানকে ভাড়া চুকানো হইলে ট্যাক্সি উর্দ্ধশ্বাসে ছুট দিল। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে ট্যাক্সি আসিয়া কলিকাতার পথে এক দোতলা বাড়ীর সামনে দাঁড়াইল। দাসী ও ভৃত্য ছুটিয়া দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। লক্ষ্মী স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। ছুটন্ত গাড়ীতে বসিয়া সে দেখিতেছিল, পথে চলন্ত গাছ-পালা আর সহরের মত্ত জনস্রোত—বিদ্যুতের মত তার চোখে পড়িয়া সরিয়া সরিয়া চলিয়াছে! এ দৃশ্য সে আর কখনো দেখে নাই। এই নূতন রকম আবহাওয়ায় তার প্রাণ আতঙ্কের পাশ কাটাইয়া সজাগ হইয়া উঠিতেছিল। কিরণের বাড়ীতে গাড়ী থামিলে কিরণের সঙ্গে সেও নামিল এবং সকলে ভিতরে ঢুকিল।

বাড়ীতে পৌঁছিয়া কিরণ লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া বলিল,—উপরে এসো। ঝীকে আদেশ দিল,—শীগ্‌গির দু'পেয়ালা চা তৈরী করে আন্ দিকি, সদু।

কিরণ লক্ষ্মীকে আনিয়া দোতলায় তার বসিবার ঘরে বসাইল। পরিচ্ছন্ন ঘর—অল্প আসবাবে পরিপাটী সাজানো! চেয়ার, কৌচ—একধারে একখানি তক্তাপোষে কার্পেট-পাতা বিছানা। লক্ষ্মী আসিয়া তক্তাপোষে বসিল। কিরণ বলিল,—আমি আসচি। বলিয়া চলিয়া গেল।

লক্ষ্মী তখন ঘরখানির চারিধারে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। অজানা ঘর—চারিদিকে তবু যেন মুক্তির স্নিগ্ধ হাওয়া বহিতেছে! আলো, আলো, হাওয়া, হাওয়া,…এই দুইটা জিনিষের কথা এ কয়দিন সে ভুলিয়া গিয়াছিল! এই আলো আর মুক্ত হাওয়ার পরশ পাইয় তার প্রাণের গোপন কোণে পুঞ্জিত যা কিছু ভয়, আতঙ্ক, উদ্বেগ, সব ছিট্‌কাইয়া কোথায় সরিয়া গেল! লক্ষ্মীর মনে হইল, কে এ মানুষটি—চোখে-মুখে স্নেহের উজ্জ্বল

দীপ্তি, গতিতে সহজ সারল্য—এ কি তার স্বপ্নের দেবী? ও কয়দিন আঁধার কারাগৃহে পড়িয়া কেবলি সে ব্যাকুল নিবেদন জানাইয়াছে, তাই আজ এই বেশে দেখা দিয়া তিনিই তার সকল দুঃখের অবসান করিলেন! তার এক-একবার এমন মনে হইতেছিল, এটা সত্য? না আবার সেই স্বপ্ন দেখা চলিয়াছে! দুই চোখ রগড়াইয়া সাফ করিয়া সে চাহিল। না, সত্য! এ-সব সত্য! ঐ আকাশ, ঐ আলো, এই শয্যা—স্বপ্ন নয়, স্বপ্ন নয়—এ সত্য, সব সত্য!

এমনি ভাবে যখন তার মনটা দোল খাইতেছে, তখন কিরণ আসিয়া বলিল,—এসো দিদি, তোমার চুলটুলগুলো ঠিক করে দি—ইটা পাকিয়ে যেন দড়ি হয়েচে! আর মুখের এ কি শ্রী…

কিরণ লক্ষ্মীর চুল খুলিয়া চিরুণী লইয়া তার জটা ছাড়াইতে বসিল। লক্ষ্মী বলিল,—থাক্ দিদি!

কিরণ বলিল,—কেন থাকবে!

লক্ষ্মী কিছু বলিতে পারিল না—তার দুই চোখের কোণে জল গড়াইয়া পড়িল। কার জন্যই বা…সে নিশ্বাস ফেলিল।

দাসী চা আনিল। কিরণ বলিল,—খাও, শরীরে একটু জুৎ পাবে'খন।

লক্ষ্মীর মুখে কিরণ চায়ের পেয়ালা ধরিল। এ বস্তু একেবারে নূতন! তবু কিরণের কথা ঠেলিতে তার প্রাণে বাজিল। নিজের হাতে পেয়ালা লইয়া সে বলিল,—আর কেন দিদি, এ সব? আমার এখন মলেই হয়!

কিরণ অত্যন্ত কাতর চোখে লক্ষ্মীর দিকে চাহিল। লক্ষ্মীর এই ফুটন্ত লাবণ্যের মাঝে অতি তীব্র বেদনার কাঁটা এখনো ফুটিয়া আছে, কিরণ তা বুঝিল। বুঝিয়া সমস্ত ব্যাপার আগাগোড়া জানিবার জন্য তার বড় কৌতূহল হইল—কিন্তু কৌতূহল-তৃপ্তির এ সময় নয়। তাই সে নিজেকে দমন করিয়া বলিল,—খাও বোন্—

লক্ষ্মী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া চায়ের পেয়ালা মুখে তুলিল। কিরণ চা খাইল; খাইয়া আবার লক্ষ্মীর কেশের রাশি হাতে লইল।

এই কালো কেশের ঘন তরঙ্গ—গোলাপী মুখখানি বেড়িয়া কি সুষমারই সৃষ্টি করিয়াছে!

কেশের জট ছাড়াইয়া সুগন্ধি তৈল আনিয়া কিরণ লক্ষ্মীর কেশে বেশ করিয়া মাখাইয়া দিল—তার পর নিজেও তেল মাখিল। তেল মাখিয়া লক্ষ্মীকে লইয়া সে স্নান করিতে গেল। স্নানের পর লক্ষ্মীর সীঁথির আগায় ভালো করিয়া সিঁদুর পরাইয়া কিরণ বহুক্ষণ তার মুখখানি ধরিয়া ধরিয়া দেখিল, দেখিয়া বলিল,—এ যে ভগবতীর মুখ, বোন! তা বনের মাঝে অমন বিপদের মধ্যে পড়লে কি করে?

লক্ষ্মী বলিল,—সব কথা তোমায় বলচি দিদি।

তার পর কিরণের বুকে মুখ রাখিয়া কখনো থামিয়া কখনো চোখের জল ফেলিয়া কোন রকমে লক্ষ্মী আপনার কাহিনী আগাগোড়া খুলিয়া বলিল। নদীর ধারে সুখের ঘর, সুখের সংসার—স্বামীর প্রেম, মেয়ের ভালোবাসা—তাহা লইয়া স্বর্গ রচিয়া বসিয়াছিল। তার পর কি করিয়া এক দৈত্য আসিয়া দেখা দিল, কি করিয়া তাকে সে ঘর হইতে ছিনাইয়া আনিল, আনিয়া বন্দী করিল—তার পর অত্যাচারের প্রচণ্ড চেষ্টা এবং তার বিরুদ্ধে লক্ষ্মীর অবিরাম সংগ্রাম—শেষে এক ছোটলোক মালীর সাহায্যে কি করিয়া রক্ষা পাইল, এবং রক্ষা পাইয়া পলায়ন করে! অত রাত্রে, বনে জঙ্গলে শ্রান্ত ক্ষতবিক্ষত দুই পা টানিয়া সেই পোড়ো বাড়ীর সামনে পড়িয়াছিল—সেখানে ঐ উপদ্রব! তার পর দেবী ভগবতীর মতই কিরণ আসিয়া রক্ষা করিল—দৈত্যটাকে হঠাইয়া দিয়া নিজের বুকের নিরাপদ নীড়ে তাহাকে তুলিয়া লইয়াছে—সব কথা সে খুলিয়া বলিল।

কিরণ মন দিয়া তার কথা শুনিল। শুনিয়া বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় পুলকে তার মন ভরিয়া উঠিল। সে বলিল,—তুমি একটু জিরোও, ভাই। আমি ওদিক থেকে এখনি আসচি।

দুঃস্বপ্নের মত এই রাজ্যের বিপদের মধ্য দিয়া আসিয়া কিরণের গৃহে নিরাপদ আশ্রয় পাইয়া লক্ষ্মীর মন তখন নানা চিন্তার গহনে প্রবেশ করিল। যে-মন কোন-রূপ আশা করিতে কুণ্ঠিত হইতেছিল, সহসা বিপদের আঁধার কাটাইয়া এই আলোর রাজ্যে আসিয়া আবার সে মন আশার বীণায় মনের তার জুড়িয়া দিল। তার সব-চেয়ে বিস্ময় লাগিয়াছিল, এই রক্ষাকর্ত্রী আশ্রয়-দাত্রীটিকে! বয়স অল্প, রূপে জ্যোৎস্না ঝরিতেছে, বাঙালীর মেয়ে—অথচ গতিতে ভঙ্গীতে কি স্বচ্ছতা, কি সরল শ্রী ফুটিয়া রহিয়াছে! কোথাও এতটুকু চাপল্য নাই, বা লজ্জার একটা জড় আবরণে নিজেকে ঢাকিয়া সঙের মত কোথাও চুপ করিয়া এ খাড়া থাকে না! সেই যখন পথের মাঝে সে-লোকটা বর্ব্বরের মত তাকে আক্রমণ করিল, তখন অন্য নারী হইলে কি করিত? ভয়ে হয় তো কোথাও পলাইয়া যাইত—আর এ…? কি দীপ্ত তেজে দেবী সিংহ-বাহিনীর মত অসুরটাকে কশাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া হঠাইয়া তাকে কত বড় লজ্জা, কত বড় অপমান হইতে রক্ষা করিল! এও বাঙালীর মেয়ে! সে-ও বাঙালীর মেয়ে। পুরুষের কঠোর ক্ষুধিত দৃষ্টি, জঘন্য কথার সামনে সে কুঁকড়াইয়া সরিয়া নিজেকে যেখানে আরো বিপন্ন করিয়া তোলে, এ সেখানে সে সব দৃষ্টি, আর কথাগুলাকে কি উপেক্ষার ভরেই না দুই পায়ে মাড়াইয়া চলে! ঘরে-বাহিরে নিজের সুন্দর কুণ্ঠাটুকু

বজায় রাখিয়া নিজের দায়িত্বের গণ্ডী অতিক্রম না করিয়া কিরণ এ কত-বড় বিপদে তাহাকে কি সহজে রক্ষা করিয়াছে! কৃতজ্ঞতায় কিরণের পায়ে নিজের চিত্তকে সে একেবারে লুণ্ঠিত করিয়া দিল।

কিন্তু এখন? এর পরে তার পথ কোথায়? গতি কোন্ দিকে ফিরিবে? ঘর! ঘরে কি তিনি আছেন? এতগুলা দিন কাটিয়া গেল! লক্ষ্মীকে ঘরে না পাইয়া মন্টি কাঁদিয়া হয় তো মরিয়া গিয়াছে! আর তিনি?…দুই-দুইটা শোকের ঘায়ে হয় পাগল হইয়াছেন, নয় তো…

শেষের কথাটা ভাবিতেই তার বুক ছাঁৎ করিয়া উঠিল। না, না, তাহা হইতে পারে না! তা যদি হইত, এমন সর্ব্বনাশ যদি ঘটিত, তাহা হইলে শেষ কালে এমন আশ্চর্য্য উপায়ে নিজের নারীত্বকে রক্ষা করিয়া সে আজ এ আলোর মাঝে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিত না!

কিন্তু এতদিন বাহিরে কাটাইয়া আজ যদি সে ঘরে ফেরে, পাড়ার লোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, কোথায় গিয়াছিলে, কার সঙ্গে?…কোথায় ছিলে? তখন তাদের সে প্রশ্নের জবাবে……

লক্ষ্মীর গা ছম্‌ছম্ করিতে লাগিল। এত বড় বিপদে এমন ভাবে রক্ষা পাওয়া · সে কথা কে বিশ্বাস করিবে।…

আবার পরক্ষণে মনে হইল,তারা না করুক,স্বামী বিশ্বাস করিবেন। কিন্তু এটুকু সম্বল লইয়া স্বামীর বাহুপাশে ফিরিয়া স্বামীকে কি সকলের চোখে ঠিক তেমনি ভাবেই তেমনি সম্মানে সে রাখিতে পারিবে! আড়ালে তারা যদি এ লইয়া তাঁকে বিদ্রূপ করে, টিট্‌কারী দেয়? সে কোন্ ছার,—মহালক্ষ্মী সীতাদেবীকেও রাজ্যের প্রজারা নিন্দা করিয়াছিল, এবং তার ফলে সীতার মত সতীকেও ভগবান রামচন্দ্র গহন-বনে নির্ব্বাসনে পাঠাইয়াছিলেন!…

এ-সব কথা ভাবিতে গিয়া লক্ষ্মীর সমস্ত ভবিষ্যৎ আঁধারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। তার জন্ম স্বামী লাঞ্ছনা সহিবেন? না। তার চেয়ে যেমন সে হঠাৎ ঘরের কোণ হইতে সহসা সে রাত্রে উবিয়া গিয়াছে—তেমনই জগতের বুক হইতেও উবিয়া যাক্!

এমনি চিন্তা করিতে করিতে নিজেকে এই উবাইয়া দিবার কল্পনা তাকে এমন পাইয়া বসিল যে, তার সামনে হইতে আর সব একেবারে মুছিয়া গেল! মরণ! মরণ! মরণ! চোখের সামনে মরণের কালো পাখা যেন সে মেলানো দেখিল!

কিরণ আসিয়া লক্ষ্মীকে ঠেলা দিয়া তুলিল, বলিল,—ওঠো তো বোন্—ভাত দিয়েচে।

লক্ষ্মীর তখনো শ্রান্তি ঘোচে নাই। সে কিরণের পানে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

কিরণ বলিল,—এসো, খাবে এসো।

লক্ষ্মী তার মুখের উপর 'না' বলিতে পারিল না—ঐ স্নেহে ঢল-ঢল মুখ,ঐ দরদে ভরা জলভ্রুলে দুই চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি! একটি কথা না বলিয়া সে কিরণের সঙ্গে তার অনুগমন করিল।

উপরে ঘরের সামনে পাথরে-বাঁধানো দালান। দালানে দুখানি আসন পাতা, আসনের সামনে অন্নের পাত্র।

কিরণ বলিল,—হাত ধুয়ে খেতে বসো। খেয়ে দেয়ে জিরিয়ো। এখন সাতদিন ঘুমোলে তবে তোমার শরীরে জুৎ আসবে।

লক্ষ্মী ভাতের থালার সামনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কত দিন পরে…! এ অন্নের মুখ এ কয়দিন সে চোখেও দেখে নাই! সেই শেষের দিন রঘুনাথ খাইয়া স্কুলে চলিয়া গেল—মন্টি খাওয়া সারিয়া তুলসীতলার কাছে তার খেলার ঘরে বসিয়া খেলা করিতেছিল—দাওয়ায় বসিয়া রঘুনাথের পাতের অন্ন লক্ষ্মী খুঁটিয়া তুলিল; পরে ভাত খাইয়া বাসনের গোছা লইয়া পুকুর-ঘাটে গেল—বাসন মাজিয়া ভিজা এলোচুলের রাশ পিঠে ঝুলাইয়া পুকুর-পাড় ধরিয়া আসিতেছিল, পাশে নারিকেল গাছের সারি—পুকুরে জলের কোলে কচুর ঝোপ,—সেই ভুলো কুকুর…ছবির মত সেদিনকার সে দৃশ্য তার চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল। দুই চোখ অমনি জলে ভরিয়া গেল।…

কিরণ লক্ষ্মীকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তার পানে ফিরিয়া চাহিল,—ও কি বোন, কাঁদচো কেন? আর তো ভয় নেই।

লক্ষ্মী চোখের জল চাপিয়া রাখিতে পারিল না। কিরণ আদর করিয়া নিজের আঁচলে তার চোখ মুছাইয়া দিল, বলিল,—ছি, কাঁদে কি! খাও।

লক্ষ্মী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—আমার সামনে এই মল্লিকা-ফুলের মত অন্নের রাশ, আর তারা…

কিরণ একটা নিশ্বাস ফেলিল; তার পর সান্ত্বনার সুরে বলিল,—তিনি পুরুষমানুষ, কখনই তিনি চুপ করে বসে নেই! মেয়ে? তোমার একারই তো মেয়ে নয়, বোন্। তাঁরও তো বটে!…তা ছাড়া, ধরো, তুমি যদি মারা যেতে! মেয়েকে তিনি দেখতেন না?

লক্ষ্মীর হাতের ভাত তবু মুখে উঠিল না। কিরণ আবার বলিল,—এমন করলে তো চলবে না ভাই। বিপদে হা-হুতাশ করলে বিপদ কাটে না—তখন ভারী ধৈর্য্যের দরকার। মাথা ঠিক করে বিপদ থেকে উদ্ধারের চেষ্টা চাই তো! না খেয়ে দুর্ব্বল শরীরে উপায়ই বা ভাববে কি করে! চোখে খালি ঘুম আসবে, মাথাও একেবারে তুলতে পারবে না।

লক্ষ্মী কথা কহিল, বলিল,—আমার আর কি হবে

আশা করে, দিদি ? সব মিছে। কোথায়এসে পড়েচি!··· এখন মলেই আমি নিশ্চিন্ত হই! আর কেন!···এ যে যত ভাবচি, ততই দেখচি, চারিদিকে জট পড়েছে! লক্ষ্মী একটা নিশ্বাস ফেলিল।

কিরণ তার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—এতেই তুমি কাতর হয়ে মরতে চাইছো, বোন্!—তবু তোমার সব আছে।···আমি? নিজের পায়ে সব ঠেলে ফেলে এসে এখনো বেঁচে আছি! শুধু তাই নয়—বেশ আরামেই বাস করচি, দেখচো তো। এমন সাজানো ঘর, কেতাদুরস্ত সাজ-সজ্জা, বিলাস-ভূষণ···কোনটাতে ত্রুটি নেই! আমার দশায় যদি পড়তে···

কিরণ কথা শেষ করিতে পারিল না—কণ্ঠ বাধিয়া গেল। বহু দিনকার হারানো কথার রাশ আসিয়া প্রাণটার মধ্যে নিমেষে জড়ো হইল! একটু থামিয়া সে মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলিল।

লক্ষ্মী একেবারে বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া গেল। এই সহজ সরল মানুষ—যাকে দেখিলে মনে হয়, দুঃখের মুখ কখনো দেখে নাই—তার প্রাণের মধ্যেও এত বেদনা লুকানো আছে! সহানুভূতিতে তার চিত্ত গলিয়া গেল। সে কিরণের পানে চাহিয়া ডাকিল—দিদি···

কিরণ উদাসভাবে আকাশের পানে চাহিয়া ছিল। অতীতের হারানো কথাগুলা প্রাণের মধ্যে ঝড়ের বোল জাগাইয়া তুলিয়াছিল। সেই ঘর, সে ঘরে সেই স্নেহ, সেই প্রীতি—তার পর এক দুরাশার বশে কি আলেয়ার পিছনে ছুটিতে সব চুরমার হইয়া গেল! নূতন জীবনে এ এক নূতন জগৎ···এর কল্পনাও মনের কোণে কোন দিন উঁকি দেয় নাই।

লক্ষ্মী জবাব না পাইয়া আবার ডাকিল,—দিদি—

কিরণের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল,—ডাকচো?

লক্ষ্মী বলিল,—তোমার দুঃখের কথা আমায় বলো, দিদি। আমি ছোট বোন। তা ছাড়া লোকের দুঃখের কথা বড় শুনতে ইচ্ছা করে। আমিও দুঃখী, তাই বুঝি এ সাধ হয়! কথাটা বলিয়া স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে আবেদনের প্রার্থনা ভরিয়া সে কিরণের পানে চাহিল।

কিরণ বলিল,—বলবো বৈ কি, বোন্। স্রোতের মুখে কুটোর মত ভেসে বেড়াচ্ছিলুম—তুমি এসে স্নেহের সঙ্গ দিয়ে কাছে দাঁড়িয়েছো আজ! তোমায় বলবো বৈ কি! কিন্তু আগে ভাত কটি মুখে দাও।···মরবে কেন? মানুষ হয়েচো, তায় মেয়ে—সইতে হবেই যে। কাতর হয়ে মরার চেয়ে বিপদের সঙ্গে যোঝায় বেদনার মধ্যেও একটা মস্ত আরাম আছে! সে আরাম আমি ভোগ করেচি—করচিও। আর তুমি মরতে চাইছ!··· আজ বাদে কাল, চলো, তোমার দেশে খোঁজ করি। ঠিকানা জানো তো? গাঁয়ের নাম জানো তো—তবে? তুমি নিরাশ হও কোন্ দুঃখে, বোন?

এ কথায় লক্ষ্মী যেন অকূলে কূল পাইল। তাই তো, সে এমন নিরাশ হইতেছিল কেন! গ্রামের নাম ধরিয়া সন্ধান লইলে সব তো আবার ফিরিয়া পাইবে। রাত্রি—সে তো কাটিয়া গিয়াছে! তা যদি কাটিল তো এ দিনের আলোয় কি কাল্পনিক ভয় মনে জাগাইয়া সে মুষড়াইয়া পড়িতেছে!

লক্ষ্মী খাইতে বসিল। আহারের পর কিরণ তাহাকে লইয়া ঘরে গেল; বিছানা ঝাড়িয়া দিয়া বলিল,—একটু ঘুমোও।

লক্ষ্মী বলিল,—না, তোমার কথা বলো দিদি!

কিরণ বলিল,—বলবো'খন! আমি তো পালাচ্ছি না কোথাও।

লক্ষ্মী বলিল,—না দিদি, বলো—আমায় আরো তোমার বুকের কাছে টেনে নাও।

ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া কিরণ বলিল,—বেশ, তবে শোনো—

## ১৪

এই সহরের বুকেই এক গলির মধ্যে কিরণের বাপের বাড়ী। এখনো আছে কি না, কে জানে। সেদিকে পা বাড়াইবার কথা মনে হইলে তার সর্ব্ব-শরীর শিহরিয়া ওঠে! তা ছাড়া সেখানকার সম্পর্ক তো সে নিজের হাতে কাটিয়া দিয়া আসিয়াছে।

স্বামীর কথা মনেও পড়ে না! বয়স তখন দশ বৎসর। বাপ গরিব,—এক দোজবরে বর পাইয়া তার হাতেই কিরণকে সঁপিয়া দিয়াছিলেন। স্বামীর বয়স তখন চল্লিশ পার হইয়াছে! সে জন্য বাপের উপর রাগ করিবার কিছু নাই, রাগও সে করে নাই কোন দিন। বেচারা বাপ—কি করেন! ত্রিশের নীচে পাত্রেরা এত বেশী টাকা চাহিয়াছিল যে, ভিটার সঙ্গে হাড় কয়খানা বেচিলেও বাপের পক্ষে তাহা যোগাড় করা অসম্ভব ছিল! কাজেই··· কিন্তু সে কথা যাক্।

বিবাহের পর দুই-তিনবার সে শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিল। স্বামীর পাঁচ-ছয়টি ছেলে-মেয়ে—তিনটি তার চেয়েও ডাগর। কাজেই সেখানে খাপ খাইতে দুই-চারি বৎসর লাগিবে,—এমনি আভাস মনে জাগাইয়া স্বামী তাহাকে বাপের ঘরে ফেলিয়া রাখিলেন! আর সে দুই-চারি বৎসর কাটিবার পূর্ব্বেই ইহলোকে স্বামীর জীবনের মেয়াদ ফুরাইল—এবং বিবাহের দুই বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই কিরণের সীঁথির সিঁদুর মুছিয়া তিনি মহাপ্রস্থান করিলেন।

তার জন্য যে কিরণের মনে বেদনা জাগিয়াছিল, এ

কথা বলিলে মিথ্যা বলা হয়। বুঝি, সেই পাপেই আজ···
···সে কথা পরে বলিব।

স্বামী চলিয়া গেলেও যৌবন তার দাবী ছাড়িয়া সরিয়া রহিল না তো। মা-বাপের আদরের মাঝে বৈধব্যের আচার ঠেলিয়া যৌবনের লাবণ্য আসিয়া কিরণকে অপূর্ব্ব ছাঁদে সাজাইয়া তুলিল। সেদিকে কিরণের চোখ পড়ে নাই! একদিন পড়াইল এক জন—তাকে কেন্দ্র করিয়াই কিরণের এই নূতন জীবনের সূত্রপাত!

বাপের বাড়ীর ঠিক গায়েই ছিল মাঝারি-গোছ একটা বাড়ী। বাড়ীটা মেরামত হইয়া নব-কলেবরে বিদ্যুতের আলোর মালা গলায় দুলাইয়া পাড়ার মধ্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল—এবং সেই বাড়ীতে বাস করিতে আসিল, কোথাকার এক জমিদারের তরুণ পুত্র, তার কয়জন ভৃত্য লইয়া। জমিদার-পুত্র কলিকাতায় আসিয়াছিল, কলেজে লেখাপড়া করিবার জন্য।

কিন্তু লেখাপড়ার কেতাবে তার চোখের দৃষ্টি কতখানি ঝুঁকিত, কে তার খোঁজ রাখে! জমিদারের তরুণ পুত্র দুই চোখের ক্ষুধিত দৃষ্টি লইয়া পাশের এই জীর্ণ গৃহে কিসের সন্ধান করিত, তার খবর কিরণ হাড়ে হাড়ে বুঝিল। তার বয়স তখন ষোল বৎসর। ষোড়শী রূপসীর অঙ্গ বেড়িয়া যে লাবণ্য ঝরিতেছিল, তরুণ নায়ক গোপন অন্তরালে বসিয়া নয়ন দিয়া তাহা পান করিত!

সে দৃষ্টি তীরের মত যেদিন কিরণের গায়ে বিঁধিল, সেদিন সে শিহরিয়া সরিয়া গিয়াছিল। সে দৃষ্টির অর্থ সে ঠিক বোঝে নাই; তবে তার মধ্যে কাঁটার মত কি একটা ছিল, তার আঘাতে কিরণ বেদনায় কেমন শিহরিয়া উঠিয়াছিল। তার পর চলিতে ফিরিতে অন্তরাল হইতে সতর্ক দৃষ্টিতে সে সন্ধান করিত, সে চোখের দৃষ্টি আরও শর নিক্ষেপের জন্য ব্যাধের মত ওৎ পাতিয়া কোথাও আছে কি না!

এমনি সতর্ক সন্ধানের মাঝ দিয়া চোখে-চোখে মিলিয়া যে বিদ্যুৎ খেলিয়া যাইত, সেই বিদ্যুৎ ক্রমে তার পরশে-শিহরণে অন্তরের বিরাগকে মাজিয়া ঘষিয়া এক অপরূপ পুলক-ছটায় এমন রূপান্তরিত করিল যে, কিরণ তার পরশে মরিল। অর্থাৎ যে দৃষ্টি-পরশকে সে ভয় করিত, যে দৃষ্টিকে বিরক্তি আর উপেক্ষায় সে জর্জ্জরিত করিয়া দিতে ছাড়ে নাই, সেই দৃষ্টি একদিন এমন সরস মাধুর্য্য ফুটাইয়া তুলিল যে, ওই দৃষ্টিটুকুর জন্য তার প্রাণ অধীর উন্মুখ হইয়া থাকিত! রাত্রে বিছানায় পড়িয়া সে ভাবিত, কখন্ আবার দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে ও-বাড়ীর বাতায়নে সেই চোখের দৃষ্টিতে নানা রঙের ফুল ফুটিয়া তার শুষ্ক মরুর মত নির্জ্জীব প্রাণে বসন্তের গন্ধ বহিয়া আনিবে! সে দৃষ্টিতে কি অনুরাগ, কি বেদনা, কি মিনতি না ঝরিয়া পড়িত!

শেষে একদিন চোখের ভাষা চিঠির গায়ে ভাসিয়া তার পায়ের কাছে আসিয়া পড়িল। আদর-ভরা, সোহাগ-ভরা ঠিক যেন গানের মালা! এমন সুরও চিঠির ভাষায় বাজিতে জানে! কিরণের প্রাণ গন্ধে-বর্ণে ভরিয়া একেবারে মাতাল হইয়া উঠিল। রোজ চিঠি আসিতে লাগিল—হাতের একটা অক্ষর চাহিয়া, একটু স্মৃতি, একটু লেখার পরশ মাগিয়া সে কি আকুল মিনতি! সমস্ত পৃথিবীখানা কিরণের সামনে হইতে উবিয়া গিয়া ঐ এক মিনতির সুরে পাক্ খাইয়া ফিরিতেছিল। তার মনে হইত, এ পৃথিবীতে মা নাই, বাপ নাই, ঘর নাই, কেহ নাই, কিছু নাই,—আছে শুধু ঐ প্রাণ-মাতানো সোহাগের সুর! কিরণের মনে হইত, বিশ্বের বাসনা কামনা তার পায়ে নূপুরের মত আঁটিয়া শুধু ঐ একটি সুর বাজাইয়া চলিয়াছে!

কিরণ চিঠি না লিখিয়া থাকিতে পারিল না। রাত্রে সকলে শয়ন করিলে গোপনে উঠিয়া কত সতর্ক হইয়া চিঠির জবাব লিখিত! তার পর রাত্রেই গিয়া ও-বাড়ীর জানলা দিয়া ঝুলানো সূতায় চিঠিখানি গোপনে বাঁধিয়া দিত—এবং ভোরে উঠিয়া দেখিত, উঠানের কোণে শিশির-ভেজা দূর্ব্বা-বনে জবাবখানি পড়িয়া আছে! সে তার ভোরের পাখী—আবার কি সুর বহিয়া আনিল, শুনিবার জন্য কিরণ চিঠি বুকে করিয়া অন্তরালে চলিয়া যাইত। একবার, দুইবার, শতবার, সহস্রবার চিঠি পড়িয়া বুকের আঁচলে সেটি লুকাইয়া রাখিত—ওরে আমার ভোরের পাখী, এই বুকে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাক্ —দিনের আলোয় লোকের ভিড়ে কাজের মাঝে অবসর-মত থাকিয়া থাকিয়া তোর সুরে প্রাণ ভরপূর করিয়া তুলিব! তার পর সেই রাত্রির নিশুতি হওয়ার অপেক্ষায় কি অধৈর্য্যে কাল কাটিত—কতক্ষণে সে জবাব লিখিবে! তাহা মনে হইলে আজো প্রাণটা বেদনায় ভাঙ্গিয়া লুটাইয়া পড়ে!

একদিন ভোরে ভোরের পাখী আসিয়া বলিল,—তুমি এসো, কাছে এসো, বুকে এসো, আমার নিখিল জুড়িয়া বসিবে, এসো। নহিলে এ প্রাণ আর রাখিতে পারি না!

এ সুরে সারাদিন মন এমন আচ্ছন্ন রহিল! না গেলে···সর্ব্বনাশ। সব সুখ ভস্মের মত খোয়াইয়া বসিবে। তার কাছে ঘর-সংসার বাপ-মা স্নেহ-মায়া সব মিথ্যা বলিয়া মনে হইল, ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মত সমস্ত সংসার ছিট্‌কাইয়া সরিয়া গেল। কিরণ জবাব দিল—লইয়া চলো গো!

দুনিয়ায় তখন শুধু প্রেমের স্বপ্ন জাগিয়া উঠিয়াছে—আর-সব কোথায় হারাইয়া গিয়াছে! জগতে শুধু এই দুটি প্রাণী, দুই জনের প্রেমে নির্ভর করিয়া কি নিরুদ্দেশের

উদ্দেশে যাত্রা করিতে চায়! লোকালয় ছাড়িয়া, প্রেমের দায়ে দুইজনে বৈরাগ্য মাগিতে চলিয়াছে যেন!

কিন্তু দুর্য্যোগ নামিল সেদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণে! যেমন জল, তেমনি ঝড়। বিদ্যুতের রোষে-রাঙা আঁখির চকমকানি, সঙ্গে সঙ্গে বাজের তেমনি ভীষণ হুঙ্কার আর গর্জ্জন! ধরণী বুঝি প্রলয়ের স্রোতে ভাসিয়া যাইবে! সারাক্ষণ কিরণ কি আতঙ্কে কাটাইয়াছিল। কেবলি ঠাকুরকে ডাকিয়াছিল,—হে ঠাকুর, আজিকার মত তোমার প্রলয় থামাইয়া রাখো গো! একবার দুই জনে দুই জনের পাশে দাঁড়াইয়া হাতে হাত রাখি—তার পর আনো তোমার বিরাট আঁধার, বজ্রের হুঙ্কার, বিদ্যুতের চমক, মৃত্যুর করাল মূর্ত্তি—কোন ক্ষোভ থাকিবে না, প্রভু!

হায় রে, এ তো দুঃখীর দুঃখ-মোচন নয়, অত্যাচারের প্রতিকার নয়—তাই ঠাকুর সে প্রার্থনা তখনি শুনিলেন! মেঘ-জল দেখিতে দেখিতে থামিয়া শান্ত হইল—স্নান-সারা পৃথিবীর বুকে জ্যোৎস্নার শুভ্র হাসি ঝরিয়া পড়িল—আকাশে-বাতাসে স্নিগ্ধ শান্তির এমন দীপ্তি ফুটিল দেখিয়া কিরণের প্রাণ একেবারে বিভোর মুগ্ধ হইয়া গেল!

তার পর আরো রাত্রি হইলে চারিধার যখন ঘুমের কোলে নিঝুম স্তব্ধ, কিরণ তখন ধীরে ধীরে আসিয়া গৃহের দ্বার খুলিয়া পথে দাঁড়াইল। জন-হীন পথ—শুধু মাঝে মাঝে আলোর থামগুলা কি একভাবে স্তম্ভিত দাঁড়াইয়া। কিরণের পা কাঁপিল, গা ছম্‌ছম্‌ করিয়া উঠিল—ভয়ে সে আকাশের পানে চাহিল—চাঁদের মুখে কি সে হাসি, যেন বিদ্রূপে ভরা! সমস্ত নিশীথ আকাশ তার এ নির্লজ্জ অভিসার-যাত্রা দেখিয়া একটা টিট্‌কারীর হাসি হাসিতেছে যেন! কিরণের মনে হইল, এ কি করিতেছে সে? এই যে গৃহের দ্বার মাড়াইয়া বাহিরে আসিল, এ দ্বার যদি চিরদিনের মত বন্ধ হইয়া যায়! সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল,—না, ফিরি···

ফিরিবার জন্য পা উঠাইয়াছে, এমন সময় সে আসিয়া হাত ধরিল, ডাকিল,—এসো।

অমনি তার সব চিন্তা সে সুরের তলায় কোথায় যে মুছিয়া গেল! সে স্পর্শে জড় বাহিরের বিশ্ব ঢাকিয়া গেল,—কিরণ চেতনা হারাইয়া তার হাতে হাত রাখিয়া খানিকটা পথ গিয়া একখানা গাড়ীতে উঠিল। প্রাণের মধ্যে এমন কাঁপন চলিয়াছিল, তার দোলায় একটা কথা ভাসিতেছিল, ও দ্বার যদি বন্ধ হয়? যদি···? কিন্তু এই হাতের পরশ হ'তে তার স্বর্গই নামিয়া আসিতেছে! সে ভাবিল, ও ঘর বন্ধ হয়···হোক। তার পর গাড়ী যখন রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করিয়া পথ সচকিত করিয়া সশব্দে ছুট দিল, তখন কিরণের হঠাৎ মনে হইল, যেন তার সে স্তব্ধ বাড়ী বুক ফাটাইয়া তীব্র স্বর তুলিয়া তাকে ডাকিতেছে,—ফিরে আয়, ওরে, ফিরে আয়!

হায় রে, সে সোহাগ, সে আদর ঠেলিয়া ফেরা কি যায়! কিরণ ফিরিতে পারিল না। গাড়ী গিয়া একটা বাগানে ঢুকিল। বাগানের মধ্যে বাড়ী। তারি পাথরে-বাঁধানো সিঁড়ির নীচে গাড়ী থামিতে সে আদর করিয়া কিরণকে নামাইল; তাকে বুকে করিয়া উপরের ঘরে লইয়া গেল। তার পর অধরে অনুরাগের প্রথম পরশ—কিরণ বিহ্বল বিবশ হইয়া চোখ বুজিল!

কি স্বপ্নের মাঝ দিয়া তার পর কাটিল যে তার দিন, আর রাত্রি! বাড়ীর কথা এক-একবার মনে হইত—কি কান্না, কি শোক সেখানটাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে! অমনি সে নিশ্বাস চাপিয়া সেদিক হইতে মনকে সরাইয়া আনিত! এই আলো, হাসি, গান, আর সুর, জীবনে আর কিছু নাই! মর্ত্ত্যে নন্দনের সৃষ্টি হইয়াছে!

কিন্তু এ স্বপ্ন ভাঙ্গিল। ছয়মাস না কাটিতে তরুণ প্রমোদ-কুঞ্জে দুর্লভ হইয়া উঠিল। অধীর প্রাণে ব্যাকুল প্রতীক্ষায় কিরণের কয় দিন কয় রাত্রি কোথা দিয়া যে কাটিয়া গেল! জ্যোৎস্না রাতে বাতায়নে দাঁড়াইয়া অধীরভাবে সে প্রতীক্ষায় থাকিত, কখন্ আসিবে সে···! জ্যোৎস্না সারারাত্রি আকাশের আসরে বিচিত্র তালে নাচিয়া রাত্রি-শেষে ম্লান চোখে শ্রান্ত দেহ এলাইয়া সরিয়া যাইত—তার তখন চমক ভাঙ্গিত। তাই তো, সারা রাত্রি এই বাতায়নে জাগিয়া কাটিল! সে তো আসিল না!··· শেষে খপর আসিল, তরুণের নেশা কাটিয়াছে। এখন নূতন ফুলে নূতন মধু-পানে সে বিভোর!

নিমেষে কিরণ বুঝিল, কি বেশে এখানে আসিয়া তার সর্ব্বস্ব দিয়া কি ভাবেই না নিজেকে সে রিক্ত নিঃস্ব করিয়া ফেলিয়াছে! নারীর নারীত্ব একটা ইতরের ছলনায় ভুলিয়া এমন হেলায় সে হারাইয়া বসিয়াছে! নেশায় মাতিয়া সে এ কি করিয়াছে! প্রাণের মধ্যে আলো জ্বালিতে গিয়া তারি শিখায় প্রাণটাকে পুড়াইয়া ছাই করিয়া ফেলিয়াছে! ফুল বলিয়া যাহা সে মাথায় তুলিয়াছিল, সে তো ফুল নয়—সাপ! বিষধর সাপ! নিজের সর্ব্বনাশ সে নিজে করিয়াছে, প্রাণ দিয়া, সর্ব্বস্ব দিয়া! আজ সে জগতের বুকে পড়িয়া আছে, দীন, রিক্ত, সর্ব্বহারা! শুধু তাই নয়, মাথায় যে পসরা ধরিয়াছে আজ···

ক্ষোভে অনুশোচনায় কিরণ পাগল হইয়া উঠিল। ভাবিল, এই দুই চোখ উপড়াইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবে। এই রূপ, এই যৌবন, এই দেহ—যারা অমন চক্রান্ত করিয়া তার নারীত্বকে দুই পায়ে মাড়াইয়া থেঁৎলাইয়া চূরমার করিয়া দিল, সেই রূপ, সেই যৌবন, সেই

দেহকে ছুরির ঘায়ে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ফেলিবে! নিজের উপর এমন রাগ ধরিল যে, সে মরিবে বলিয়া ছাদে উঠিল। তখন সন্ধ্যার আকাশ অপূর্ব্ব রক্তরাগে উজ্জ্বল! ঝাঁপ দিবে, এমন সময় হঠাৎ মনে হইল, সে-ই তো গেল—কিন্তু যে তার এ সর্ব্বনাশ করিল, সেই ঠক, প্রতারক, ভণ্ড, তার তো কিছু হইল না! সে পরম আরামে নিশ্চিন্ত সুখে তার সেই চিরদিনকার জগতের বুকে তেমনি অনায়াসে তেমনি নিঃসঙ্কোচে ঘুরিয়া বেড়াইবে! তাকে যদি আজ সামনে পাওয়া যাইত··· ওঃ!

কিন্তু না,—মিছা এ রাগ। সে তো হাত ধরিয়া এ পথে তাকে টানিয়া আনে নাই! কিরণ নিজের ইচ্ছায় ঘর ছাড়িয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে চিঠি লিখিয়া আসিতে বলিয়াছিল! বলুক। কেন কিরণ তখন তার মুখের উপর ঘৃণার চাবুক মারিয়া বলে নাই, কে তুমি ভুলাইতে চাও আমায় এমনি ছলনায়? কথার কুহকে ভুলাইয়া বাহিরে ডাকো। যখন সে হাত ধরিয়া বলিয়াছিল, এসো, কেন সে তখন তার মুখের উপর তীব্র হুঙ্কারে বলিয়া উঠিল না,—যে, না, আমি যাইব না! ইচ্ছা করিয়া বিপথে আসিয়া পরকে আজ চোখ রাঙানো? এ শুধু নিজেকে প্রতারণা করা! তার মনে এ সাধ জাগিয়াছিল। বাহিরের ডাকের জন্য সে উন্মুখ অধীর ছিল, তাই তো আজ ঘর-ছাড়া, সব-ছাড়া, পথের মানুষ সে! যেদিন প্রথম সে-চোখের দৃষ্টি তার গায়ে তীরের মত বিঁধিয়াছিল, সেইদিনই কেন সে তাকে দুই হাতে প্রাণপণে টানিয়া তুলিয়া দূর করিয়া দেয় নাই? আজ সে ফেলিয়া গিয়াছে বলিয়া নিজেকে সব দোষে খালাস রাখিয়া, যত দোষ তার ঘাড়ে চাপাইতে চলিয়াছে—বটে!

কিরণ মরিবে না। সে স্থির করিল, মরা হইবে না। যে-মন অমন পরের ছলনায় ভুলাইয়া তার নারীত্বের অপমান করিয়াছে, সমস্ত জীবনকে বিকৃত করিয়া তুলিয়াছে, সেই মনকে মাজিয়া সাফ করিয়া ব্রহ্মচারিণী করিয়া রাখিবে সে। কাজের মাঝে ভুলাইয়া খাটাইয়া তাকে দিয়া এ আরাম, এ বিলাসের চূড়ান্ত প্রায়শ্চিত্ত করাইবে!

গহনা-পত্র, টাকাকড়ি তরুণ নায়ক তার পায়ে রাশীকৃত জমা করিয়াছিল। স্যাকরা ডাকাইয়া কিরণ সে-সব বিক্রয় করিল। টাকা খরচ করিয়া বহু তীর্থে সে ঘুরিয়া বেড়াইল। কিন্তু প্রাণের মধ্যে স্মৃতির জ্বালা আর থামিতে চায় না! ঠাকুর দেখিয়া থামে না, সাধু-সন্ন্যাসীর পায়ের ধূলা গায়ে মাখিয়া সে জ্বালা জুড়াইতে চায় না! বিরক্ত হইয়া সে আবার সহরে আসিল। মনকে কাজের মধ্যে ডুবাইয়া রাখে, তবু সেই স্মৃতির জ্বালা!

শেষে সে ঠিক করিল, থিয়েটারে ঢুকিবে, অভিনেত্রী হইবে। ঐ পথেই শুধু নিজেকে ভোলা যায়! আজ রাণী সাজিয়া, কাল দাসী সাজিয়া সেই রাণী আর দাসীর মধ্যে নিজের অস্তিত্ব সে ডুবাইয়া দিবে! নানা চরিত্রের ভূমিকার মাঝে আপনাকে যদি ভোলা যায়!

কিরণ থিয়েটারে ঢুকিল। অল্প দিনে তার খ্যাতি চারিদিকে রটিয়া গেল! বাপের দেওয়া নামটা সে চিরকালের জন্য ঠেলিয়া সরাইয়া রাখিয়াছে—সে আদরের নামটার অপমান আর না করে। সে নামের কথা মনে হইলে কিরণ ভাবে, সে মরিয়াছে। কিরণ, সে এক সম্পূর্ণ নূতন লোক!

তার পয়সার এখন অভাব নাই! সে পয়সায় নিজেও সে ভদ্রভাবে বাস করিতে চায়। তার এ পয়সা শুধু নিজের পিছনে ব্যয় করে না। কেহ আসিয়া দুঃখ জানাইলে কিরণ তাহা ঘুচাইতে সাধ্য-মত প্রয়াস পায়। তবে উৎপাত যে না ঘটে, এমন নয়। থিয়েটারে ঢুকিবার পর সেখানে ম্যানেজার হইতে ছোট্ট একটারটা অবধি তার ভালবাসার কাঙাল হইয়া পায়ের কাছে কতবার নতজানু হইয়া পড়িয়াছে! কঠিন দৃষ্টি আর তীব্র ভর্ৎসনায় তাদের সে সাফ বুঝাইয়া দিয়াছে, এ শক্ত কাঠ, এখানে রসের আশায় হাত পাতিলে কোন দিন সে আশা মিটিবার সম্ভাবনা নাই, কেবলি দুঃখ পাওয়া সার হইবে। কত তরুণ আসিয়া ভিখারীর সুরে বলিয়াছে,—একটু ভালোবাসা দাও, কিরণ!

কিরণ বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া তাহাদের মুখের উপর স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছে, পুরুষমানুষ ভালোবাসার ধার ধারে না, আর সে পুরুষমানুষকে চিরদিন ঘৃণা করে। তাদের ভালোবাসিবার কথা মনে হইলে তার সমস্ত গা ঘৃণায় ভরিয়া ওঠে! একটা পথের কুকুরকেও সে ভালো-বাসিতে প্রস্তুত আছে, কিন্তু পুরুষমানুষ?···কুকুরের অধম, ভণ্ড, প্রতারক, ধাপ্পাবাজ···!

কিরণ বলিল,—আজ এই অবধি থাক্—আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপচে। সে সব কথা মনে হলে আজও আমার বুকের মধ্যে যেন রক্ত নেচে ওঠে।

লক্ষ্মী বলিল,—থাক্ দিদি। তোমার কথা শুনে আমি শুধু অবাক হয়ে গেছি, এত ঝড় তোমার মাথার উপর দিয়ে গেছে—আর তুমি এমন হাসি-মুখে আছ!

কিরণ বলিল—কি করবো বোন্—! যা গেছে, তা তো গেছেই, তার জন্য হা-হুতাশ করে ফল কি! বরং তা থেকে যা শিক্ষা হয়েচে, সেটুকু মাথায় রেখে যা বাকী আছে, সেইটুকুর মধ্যে যাতে বিষের ছোঁয়াচ না লাগে, বাঁচিয়ে চলা ভালো নয় কি!

লক্ষ্মী বলিল,—আমার কি মনে হচ্ছে, জানো দিদি?

কিরণ বলিল,—কি ?

লক্ষ্মী বলিল,—তোমার মা-বাবা, ভাই-বোন,—তাঁরা কেমন আছেন,—তাঁদের দেখা দাও···

কিরণ চুপ করিয়া রহিল, পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—তাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়াবার উপায় যে নেই, ভাই। তাঁদের দোরে সমাজ কড়া পাহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে! আমার সেধারের কানাচে দেখতে পেলে সে অমনি তার প্রচণ্ড লাঠি আমার গরিব বাপ-মার মাথায় বসিয়ে দেবে। তারপর একটু হাসিয়া আবার বলিল,—তাছাড়া বাপ আমার এমন তেজী যে অনাহারে পরের দোরে ভিক্ষা যদি করতে হয় তা করবেন, তবু আমার কাছে সে কষ্ট কখনো জানাতে আসবেন না! তাই ভাবি বোন, কি জন্মই আমাদের, এই বাঙলা দেশে মেয়েমানুষের! একটা ভুল, ভুল বৈ কি—দৈবাৎ যদি করে ফেলি তো তার যত বড় প্রায়শ্চিত্তই করতে চাই না—সে ভুলের মার্জ্জনা নেই, আমাদের সমাজে।

কিরণের দুই চোখ উত্তেজনায় জ্বলিতেছিল। লক্ষ্মী তার পানে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। বহুক্ষণ উদাস-ভাবে চাহিয়া থাকিবার পর কিরণ কহিল,—ভাবচি, এই তো একটা মস্ত কাজ হাতে এসেচে। তোমায় যদি তোমার স্বামীর হাতে তুলে দিতে পারি, তাতেও কি প্রায়শ্চিত্ত হবে না! সতী-সাধ্বী তুমি, তোমার সুখের ঘরে যদি তোমায় বসিয়ে দিতে পারি, তোমার স্বামীর পাশে, তোমার মেয়ের পাশে···

বলিতে বলিতে কিরণের চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল এক ফুলে-ভরা কুঞ্জ! সেই কুঞ্জে ছায়া-করা গাছের তলায় বেদীর উপর বসিয়া লক্ষ্মী একরাশ ফুল লইয়া মালা গাঁথিতেছে, তার হৃদয়-দেবতার জন্য···মুখে উৎকণ্ঠার ভাব—আশার রঙীন ছোপ্‌টুকু মুখে লাগিয়া আছে!··· তার পর রঘুনাথ আসিল মেয়ের হাত ধরিয়া! দুইজনের চোখে-চোখে মিলিল। কিরণ দুইজনের হাতে হাতে মিলাইয়া দিল। লক্ষ্মীর হাতে গাঁথা মালা স্বামীকে মেয়েকে কি নিবিড় ডোরে বাঁধিয়া ফেলিল! অমনি ওদিকে আকাশ হইতে ঝর-ঝর পুষ্পবৃষ্টি হইল। এ দৃশ্যের উজ্জ্বলতায় তার মনের মধ্যটা অবধি আলোয় আলো হইয়া গেল···দুই চোখে তার দীপ্তি প্রতিবিম্বিত হইল। লক্ষ্মী তখনো তেমনি মুগ্ধ নির্ব্বাক্ দৃষ্টিতে কিরণের পানে চাহিয়া।

হঠাৎ লক্ষ্মীকে বুকের কাছে টানিয়া কিরণ তার মুখে চুম্বন করিল। আদরে সোহাগে তাহাকে ডুবাইয়া দিয়া বলিল,—সতী-লক্ষ্মী বোনটি আমার, তোমার পায়ের ধূলায় আমার মন পরিষ্কার করে দাও···বলিয়া তীব্র উচ্ছ্বাসের ভরে সে একেবারে লক্ষ্মীর পায়ে হাত দিয়া সে-হাত নিজের মাথায় ছোঁয়াইল।

লক্ষ্মী হাত সরাইয়া দিয়া বলিল,—ও কি করো দিদি! আমি তোমার ছোট বোন যে। ওতে আমার অকল্যাণ হবে!

—না, না, না,—কিরণ অধীর উচ্ছ্বাসে বলিল,—না, বয়সের উপরে যার আসন চিরদিন, নারীর মন, নারীর দেহ—তা যে কি উঁচুতে রেখেচো এত বিপদের মাঝেও, সে তুমি বুঝচো না তো! এ যে বড় পবিত্র জিনিষ ভাই,—এই নারীর মন! কারো ছোঁয়াচ এতে লাগাতে নেই—বাহিরে নয়, চিন্তাতেও নয়!··· একে তুমি নির্ম্মল রেখেচো! তোমার ঐ দীনতা ভেদ করে কি মহিমা জাগিয়ে রেখেচো—

কিরণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে লক্ষ্মীর পানে চাহিয়া রহিল। লক্ষ্মী কুণ্ঠিত হইয়া রহিল! তাকে লইয়া কিরণের এ কি ছেলেমানুষী! সে বলিল,—তোমার দোষ নেই, দিদি। তুমি যে কিছুই পাওনি! যাঁর সঙ্গে বিয়ে হলো, তাঁকে মনের মধ্যে বরণ করে নেবার সময় হলো কৈ!···তার পর যাকে মনের আসনে দেবতা করে বসালে, সে যদি ছলনা করে চলে যায়, তাতে তোমার দোষ কি!···তাকেই তো তুমি তোমার এক, তোমার সর্ব্বস্ব বুঝেছিলে, তাই তাকে নারীর মনের আসনে বসিয়েছিলে আদর করে। তবে···?

হঠাৎ এতগুলা বড় কথা তার মুখ দিয়া বাহির হইতে লক্ষ্মী নিজেই অবাক্ হইয়া গেল। এ-কথা সব এমন ভাবে যে তার মুখে ফুটিতে পারে, এমন কথা তার কোনদিন মনে হয় নাই! অমনি মনে হইল, ঘর-ছাড়া এই বিপদের মাঝে তার মন এতখানি বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, অতি-ছোটগণ্ডী অতিক্রম করিয়া বাহিরের অনেকখানিকেও আমল দিবার সে অধিকার পাইয়াছে। নিজের উপর শ্রদ্ধা একটু না জাগিল, এমন নয়!

কিরণ কি বলিতে যাইতেছিল, বলা হইল না; দাসী আসিয়া খবর দিল, ভুলো পলাশডাঙ্গায় যাইবার জন্য তৈয়ার হইয়াছে—কোন চিঠি যদি দিবার থাকে তো দাও!

কিরণ তখন লক্ষ্মীকে লইয়া চিঠি লিখাইতে বসিল। পাঁচখানা ছিঁড়িয়া ছয়ের খানা একরকম পছন্দ-সই হইল। কিরণের কথায় লক্ষ্মী লিখিল,—

শ্রীচরণেষু

নানা বিপদ কাটাইয়া এখানে দিদির আশ্রয়ে পৌঁছিয়াছি। চিঠি পাইয়া তুমি এই লোকের সঙ্গে মন্টিকে লইয়া আসবে। দেখা হইলে সব কথা বলিব। আমার জন্য ভাবিয়ো না। ইতি—

তোমার চরণাশ্রিতা
লক্ষ্মী।

তার পর চিঠির তলায় কিরণ তার বাড়ীর ঠিকানা লিখিয়া দিল।

লেখা হইলে খামে রঘুনাথের নাম লিখিয়া ভুলো-ভৃত্যকে লক্ষ্মী সাধ্যমত গ্রামের ঠিকানা বুঝাইয়া দিলে কিরণ তাহাকে বলিল,—তুই একখানা ট্যাক্সি নিয়েই যা। পথে লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলে গাঁয়ের খোঁজ পাবি। তোর ছোটদিদিমণি পায়ে হেঁটে এত পথ আসতে পেরেচে যখন, তখন গাঁয়ের খোঁজ পাওয়া শক্ত হবে না।

ভুলো দরদী ভৃত্য, বিশ্বাসী; এবং পশ্চিমী হইলেও বেকুব নয়। সে চিঠি লইয়া চলিয়া গেল। কিরণ বলিল,—এসো বোন্, আমায় একটু লেখাপড়া করতে হবে এখন। থিয়েটার আছে···যেটা সাজতে হবে, সেটা একবার দেখে-শুনে নি।

কিরণ উঠিয়া পাশের ঘরে গেল। এইটা তার লেখা-পড়া করিবার ঘর। এইখানে সে তার ভূমিকার কায়দা-কানুন বুঝিয়া শিক্ষা করে। ঘরে প্রকাণ্ড একখানা আয়না। তাছাড়া টেবিল, চেয়ার, একটা কৌচ এবং তক্তাপোষ আছে। কিরণ আসিয়া ঘরের দ্বার ভেজাইয়া নিজের কাজ করিতে লাগিল, আর লক্ষ্মী তার পানে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে ভুলো ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, সে বাড়ী আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। এবং পাড়ার লোক বলিল, রঘুনাথবাবু ছোট মেয়েটিকে লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন, সে সন্ধান কেহ দিতে পারিল না।

শুনিয়া লক্ষ্মীর মাথা ঘুরিয়া গেল। উপায়···? তার চোখের সামনে যে-পৃথিবী একটু আগে বেশ শান্ত মূর্ত্তি ধরিয়া অপূর্ব্ব রঙে রঙিয়া উঠিতেছিল, সেটা আবার সহসা তার রঙ বদলাইয়া ভীষণ কালো মূর্ত্তি ধরিয়া প্রচণ্ড বেগে ঘুরিতে সুরু করিয়া দিল। দুই চোখে আঁধার ভরিয়া সে ডাকিল,—দিদি···

কিরণ বলিল,—ভয় নেই, বোন্, ভেবো না। তাঁকে পাবেই। খপরের কাগজে আমরা ছাপিয়ে দেবো যে, তুমি এখানে আছ। তোমার সিঁথির সিঁদূরের জোর কি কম! ওরি জোরে তাঁকে আমরা আনবো। যোদ্দা তুমি অমন মুষড়ে থেকো না—বুক বাঁধো। সতী-লক্ষ্মীর এয়োতির জোর সামান্য নয়!

এ কথাগুলা তড়িৎ-প্রবাহের মত লক্ষ্মীর শিরায়-শিরায় বহিয়া গেল। লক্ষ্মী গুম্ হইয়া রহিল। জোর করিয়া মনকে স্থির করিল, মনকে বলিল,—ভয় নাই, তাঁকে পাইব। কিন্তু খপরের কাগজ। তাহাতে ছাপা হইবে এত-বড় লজ্জার কথা! না,—না! সে বলিল,—খপরের কাগজে আর লিখো না কিছু।···কিরণ বলিল,—তাই হবে।

## ১৩

রঘুনাথ মন্টিকে লইয়া পায়ে হাঁটিয়া কত পথ যে অতিক্রম করিল, তার ঠিকানা নাই। শেষে হাতের পয়সা ফুরাইয়া গেল। মন্টি ক্ষুধায় কাতর হইলে রঘুনাথ দুই চোখে আঁধার দেখিল। মন্টি আর চলিতে পারিতেছিল না। পথের ধারে গাছতলায় সে শুইয়া পড়িল। রঘুনাথ বসিয়া তার পানে চাহিল। সে ভাবিতেছিল, মন্টি যদি মরিয়া যায়!···বেশ হয়! তার শৃঙ্খলও কাটে। এ অনিশ্চিতের মাঝে ঘুরিয়া বেড়ানোর অবসান হয়। সেও তাহা হইলে মন্টির পিছনে তার পথ অনুসরণ করে!···

শুষ্ক কণ্ঠে মন্টি ডাকিল,—বাবা···

রঘুনাথ সস্নেহে কহিল,—কেন মা?

মন্টি কহিল,—বড্ড খিদে পেয়েচে বাবা।

রঘুনাথ কোন জবাব দিতে পারিল না। অশ্রুরুদ্ধ চোখে মন্টির কাতর মুখের পানে শুধু চাহিয়া রহিল।

সেদিন কি একটা যোগ ছিল। দলে দলে পল্লী-নারীরা স্নানের বেশে পথে চলিয়াছে। রঘুনাথ হঠাৎ কি মনে করিয়া রমণীদের সাম্‌নে দাঁড়াইল, ডাকিল,—মা···

একজন বর্ষীয়সী রমণী তার পানে চাহিলেন। রঘুনাথ অতি-কষ্টে নিবেদন করিল যে, দারুণ বিপদে তারা ঘর-ছাড়া; মেয়েটা ক্ষুধায় মারা যাইতে বসিয়াছে, হাতে তার পয়সা নাই। যদি দয়া করিয়া···

বর্ষীয়সী গাছতলায় মন্টির পানে চাহিলেন। আঁচলে কটা পয়সা ছিল, রঘুনাথের হাতে দিয়া বলিলেন,—এই নাও বাবা।

একজন তরুণী ঘোমটার আড়ালে বর্ষীয়সীকে কি বলিল। শুনিয়া বর্ষীয়সী বলিলেন,—কিছু কিনে ওকে খাওয়াও। তার পর আমরা এই পথেই তো ফিরবো স্নান করে। আমাদের সঙ্গে এসো বাবা—মেয়ের মুখে ভাত একমুঠো তাহলে দেওয়া হবে। হাতে তো পয়সা আর নেই···এতে কি দু'জনের হবে বাবা?

রঘুনাথের দুই চোখে জল আসিল। হায়রে, সে আজ পথের ভিখারী! এ'ও তার অদৃষ্টে ছিল!···পরক্ষণে ভাবিল দেখা যাক, এর-পর অদৃষ্টে আরও কি আছে! অদৃষ্টের স্রোতেই সে গা ভাসাইয়া দিবে। তার পর লক্ষ্মীর দেখা যদি মেলে কোনদিন, সেদিন তার কোলে শ্রান্ত শির রাখিয়া বলিতে পারিবে,—ওগো প্রেয়সী, ঐশ্বর্য্যে তোমায় মুড়িয়া দিতে পারি নাই—প্রাচুর্য্যের সুখে তোমায় কোন-দিন সুখী করিতে পারি নাই! তবু তোমার প্রেমে ভিখারী সাজিয়াছি। লক্ষ্মী, প্রাণের প্রেয়সী আমার···

কিন্তু লক্ষ্মীকে যে পাওয়া যাইবে, তার কি আশা আছে!

মন্টি ডাকিল,—বাবা—

রঘুনাথের চমক ভাঙ্গিল। সে বলিল,—তুমি একটু শুয়ে থাকো মা। আমি খাবার কিনে আনি। বলিয়া সে উঠিল এবং খানিক আগাইয়া গিয়া একটা খাবারের দোকানও দেখিল। খাবার কিনিয়া মন্টির কাছে রাখিয়া সে বলিল,—খাও মা···

মন্টি বলিল,—তুমি খাও, তবে আমি খাবো।

আবার সেই কথা! ওরে এ কতটুকু···! তবু তাকে খাইতে হইল। না খাইলে মন্টি খাইবে না। খাওয়া শেষ করিয়া রঘুনাথ সেইখানে বসিয়া রহিল। সেই মমতাময়ী যে-কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাঁর সে কথা ঠেলা ঠিক হইবে না। তাঁর মমতার অপমান হইবে তাহাতে!

স্নান সারিয়া তাঁরা আবার এই পথে আসিলেন। রঘুনাথকে বলিলেন,—এসো বাবা।

রঘুনাথ মন্টিকে লইয়া তাঁদের অনুসরণ করিল।

কোঠা বাড়ী। বাড়ীর কর্ত্তা বৃদ্ধ—এককালে ভালো চাকরি করিতেন,—এখন পেন্সন পাইয়া বাড়ীতে বসিয়া বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতেছেন। রঘুনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হইল। রঘুনাথ তাঁর মমতায় গলিয়া নিজের কথা সমস্তই খুলিয়া বলিল।

শুনিয়া তিনি বলিলেন,—কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিন্।

রঘুনাথ বলিল,—বড্ড খারাপ দেখাবে। সমস্ত দেশের বুকে এ কথা একেবারে···

শুনিয়া কর্ত্তা বলিলেন,—একটু অন্য রকমে বিজ্ঞাপন দেওয়া যাক্ তবে···

রঘুনাথ বলিল,—না, থাক্।

তার মনে হইল, যদি লক্ষ্মীকে কেহ সত্যই চুরি করিয়া লইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে এত বড় অপমান, এত বড় লজ্জার উপর এ ব্যাপার তাকে আরো কুণ্ঠিত করিয়া ফেলিবে! তাছাড়া লক্ষ্মী কেমন করিয়া সে কাগজ দেখিবে? দেখিলেও সে অবলা নারী, ঘরের বাহিরে বিপুল জগৎ তার কাছে একেবারে অচেনা! কেমন করিয়া সে তার জবাব দিবে? কেমন করিয়াই বা আসিয়া তার কাছে উপস্থিত হইবে?...তার কোন সম্ভাবনা নাই! মাঝে হইতে একটা ঘৃণিত কুৎসার পাঁকে রঘুনাথ আকণ্ঠ তাহাকে নিমজ্জিত করিয়া ফেলিবে!

কাজেই রঘুনাথ এ প্রস্তাবে রাজী হইল না।

আহারাদির পর সে আবার বাহির হইবার জন্য উঠিল। কর্ত্তা বলিলেন,—একটু জিরিয়ে নিন্—পথে বেরুতে হবে জানি। তবু···

না। রঘুনাথ ভাবিল, বাহিরে থাকাই এখন চাই। যদি পথে দেখা মেলে! এখন এই প্রাচীরে-ঘেরা বদ্ধ বাড়ীর মাঝে ··সে কথা ভাবিতে গেলে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে!

থাকা হইল না। রঘুনাথ মন্টিকে লইয়া আবার পথে বাহির হইল। বিধাতা তার সুখের ঘর ভাঙ্গিয়া আজ তাকে যদি পথের পথিক করিয়াছেন, তবে সে সেই পথকে সম্বল করিয়া ঘুরিয়া ফিরিবে! লক্ষ্মীকে যদি কোনদিন পাওয়া যায়, তবেই আবার ঘরের কথা ভাবিবে, নহিলে এই পথই তার সব।

## ১৬

এমনি পথে পথে ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন সে নির্জ্জন তরু-বীথি ছাড়িয়া একেবারে সুপ্রশস্ত রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল। এ এক নূতন রাজ্য! এখানে লোক শুধু ছুটিয়াছে, অধীর আগ্রহে—কিসের পিছনে, কে জানে! এ পথে কেহ একদণ্ড দাঁড়ায় না,—চলিয়াছে, কেবলি চলিয়াছে! পথের পাশে তৃষিত চোখে কাতর মুখে কে দাঁড়াইয়া আছে—তার পানে ফিরিয়া দেখিতে কাহারো আগ্রহ জাগে না, ফিরিয়া চাহিবার সময়ও নাই। এ কি ব্যস্ত চঞ্চল ভাব—চারিদিকে! এই লোকের মেলায়, এই ইট-কাঠ-পাথরে মোড়া সহরের বুকে সে আসিয়াছে, তার লক্ষ্মীর খোঁজে! এ বিষম হট্টগোলে কোথায় পড়িয়া আছে সে বেচারী তার মনের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, সরম আর কুণ্ঠা লইয়া! কোন্ নিরালা কোণে···

এখানে তার লক্ষ্মীর খোঁজ পাওয়া···এ যে আকাশে ফুল ফুটাইবার দুরাশা!

গাড়ীর পর গাড়ী, লোকের পর লোক—কি ভিড়! এ ভিড় দেখিয়া মন্টি রঘুনাথের হাত চাপিয়া ধরিল। তার বড় ভয় হইতেছিল, যদি তার হাত ছিট্‌কাইয়া সে দূরে সরিয়া পড়ে! রঘুনাথও ভয় পাইল, এ ভিড়ে তার মন্টিকে ঠিক পাশটিতে আঁটিয়া ধরিয়া রাখিতে পারিবে তো!

তারপরে সুরু হইল পাগলের মত নিরুদ্দেশ ঘোরা-ফেরা! কখনো একটা আশার থেই ধরিয়া সে ছোটে গঙ্গার তীরে, আবার কখনো বা ঘুরিয়া বেড়ায় এ পথে ও পথে—নানা পথে! এই লোক-জনের ভিড়ে এত লোক চলিয়াছে, তার আর সংখ্যা হয় না! ইহাদের মধ্যে কেহ বলিতে পারে না, তার লক্ষ্মীকে কোথাও দেখিয়াছে কি না!

এই জন-তরঙ্গে আশার মাত্রা সহসা বাড়িয়া প্রাণটায় এমন আবেগ আর উৎসাহ জাগাইয়া তোলে যে রঘুনাথের হুঁশ থাকে না, তার সঙ্গে আছে মন্টি! আর নিজের না হোক্, মন্টি তো ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলিয়া যায় নাই! কেবল মনে হয়, এই ভিড়ে তাকে পাইব···ঐ না, ঐ

ঘোমটা-মুখে নারীর দল স্নানে নামিয়াছে, উহার মধ্যে ঐ লাল পাড় শাড়ী পরিয়া—লক্ষ্মী···না ?···সে আগাইয়া যায়···কিন্তু হায়রে, কল্পনা শুধু ছলনায় তাহাকে ঘুরাইয়া মারে। সব মিছা হয়।

দুই দিনের পর তৃতীয় দিনে মুস্কিল বাধিল এই যে, এত ভিড় থাকিলে কি হয়, ভিক্ষা এখানে মিলে না! তার উপর রাত্রিটা কোথাও পথে পড়িয়া কাটাইবে, তাতেও বিপত্তি। পুলিশ এখানে চোরের পিছনে যত না ছুটুক, নিরাশ্রয় গৃহ-হীন বেচারাকে পথে পড়িয়া থাকিতে দেখিলে বীরদর্পে লাঠি তুলিয়া তার পিছনে ধাওয়া করিয়া তাকে খেদাইয়া দেয়। ঘর তো নাই এখানে, —পথ! তাও পায়ের নীচে হইতে সরিয়া যায়!

এমনি ভাবে মাসখানেক কাটিতে চলিল। রঘুনাথ গঙ্গার ঘাটে এক ব্রাহ্মণের কাছে আশ্রয় লইল। সে বেচারা কিছুদিন পূর্ব্বে একটিমাত্র মেয়েকে হারাইয়া তার বিগ্রহের মূর্ত্তিটিকে আঁকড়িয়া পড়িয়াছিল। মন্টিকে দেখিবামাত্র তার প্রাণে এমন মায়া হইল যে, সে আর তাদের ছাড়িতে চায় না। রঘুনাথ তার মমতায় গলিয়া দুঃখের কাহিনী তাহাকে খুলিয়া বলিয়াছিল। ব্রাহ্মণ সান্ত্বনা দিয়া বলিল,—ঠাকুরকে ধরে পড়ে থাকো,—তাঁর অদেয় কি আছে!

রঘুনাথের মন এ সান্ত্বনা গ্রহণ করিতে পারে নাই। এই তো এক মাস ধরিয়া ঠাকুরকে সে প্রাণপণে ডাকিয়াছে, ঠাকুর কোন সাড়া দিলেন না! রঘুনাথ সহসা ভাবিল, এর চেয়ে যদি দেশের সেই ভস্মস্তূপে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকিত, তাহা হইলে হয়তো বা এতদিনে কোন হদিশ মিলিত। সে ব্রাহ্মণকে জবাব দিল,—তা কৈ হয়, ভাই। এই তো তুমি ঠাকুরকে ধরে পড়ে আছ, অথচ তোমার শেষ সম্বলটুকুও তিনি ছিনিয়ে নিলেন!

ব্রাহ্মণ বলিল—সময় সময় এ কথা মনে হয়।···কিন্তু আবার ভাবি, মেয়েটার ভাবনায় ভারী বিব্রত থাকতুম। কোনো কুলে কেউ নেই, শুধু ঐটুকু ছিল। যদি ওটার বিয়ে দেবার আগে মরে যাই, তা হলে মেয়েটার কি হবে! কার কাছে যাবে, কে দেখবে,···এমনি ভাবনায় পাগল হবো, এমনও মনে হতো।

ব্রাহ্মণ ক্ষণেক স্তব্ধ রহিল; পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিল,—তাই ভাবনার বোঝা সরিয়ে নিয়ে ঠাকুর আমায় নিশ্চিন্ত করে দিলেন।

রঘুনাথ তার পানে চাহিয়া অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল, এই সরল ব্রাহ্মণ অত-বড় শোকের মধ্যেও কি সান্ত্বনাই না সৃষ্টি করিয়াছে! বুকটার মধ্যে শোকের পাথার বলিলে চলে, কিন্তু বাহিরে তার এতটুকু চিহ্ন নাই! চকিতে অমনি এত বড় সহরখানা তার চোখের সামনে হইতে সমস্ত হট্টগোল বিলাস আর ঐশ্বর্য্য-সমেত কোথায় সরিয়া গেল, শুধু জাগিয়া রহিল, গঙ্গার তীরে এই ছোট্ট ভাঙ্গা ঘরখানিতে ঐ ছোট্ট বিগ্রহটুকুকে লইয়া ধৈর্য্যের এক বিশাল মহিমা!

ব্রাহ্মণ বলিল,—মিছে ভাব ভাই। যদি পাবার হয়, তাঁকে পাবেই। আর কি চেষ্টাই বা করবে, বলো? তার চেয়ে আমার এখানেই থাকো। কাজ-কর্ম্ম করতে চাও, করো—কিন্তু তোমার মেয়ের ভার আমার। আমার রাম্-মা গেছে, তাই এখন পেয়েচি আমার এই নূতন মা, মন্টি-মা।

রঘুনাথ বলিল,—একটা কথা মনে হচ্ছে। মন্টি তোমার কাছে ভালোই থাকবে। দু'দিনের জন্য, ভাবচি, একবার বাড়ীর দিকে ঘুরে আসি···

পাছে নিরাশার ঘা কোন দিক দিয়া আঘাত করে, এই ভয়ে রঘুনাথ কারণটা খুলিয়া বলিল না—বলিবার সাহস হইল না।

ব্রাহ্মণ কৃপানাথ প্রশ্ন-ভরা দৃষ্টিতে তার পানে চাহিল। সে দৃষ্টির সামনে রঘুনাথ কম্পিত স্বরে বলিয়া ফেলিল—যদি—

কৃপানাথ একটু ভাবিয়া বলিল—এ কথা মন্দ নয়। কিন্তু কি জানো, একটু শক্ত বুকে যেয়ো—আর যদি নিরাশ হও তো কাবু হয়ো না ভাই। এই মন্টি-মার কথা মনে করে চট্‌পট্ চলে এসো। বুঝচো তো, কত বড় আশা নিয়ে তুমি যাচ্ছ···

রঘুনাথ বলিল—বুঝি বৈ কি।

সেই দিনই অপরাহ্ণে সহসা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিল। বৈকালের দিকে গঙ্গার বুকে ছেলেদের সাঁতারের বাজি ছিল। বিস্তর লোক আসিয়া নদীর ধারে আসর জমাইয়া দিয়াছে। রঘুনাথ মন্টিকে লইয়া আসিয়াছিল, —একটু বৈচিত্র্যে মন্টির মনের স্তব্ধ জমাট ভাবটাকে যদি কাটাইতে পারে!

সাঁতারের বাজি প্রায় তখন শেষ—সাঁতরাইয়া প্রতিযোগী ছেলেরা বাগবাজারের ঘাট ছাড়াইয়া গিয়াছে। রঘুনাথ মন্টিকে লইয়া জেটির উপর হইতে ফিরিয়া পথে পড়িতে চেনা গলায় কে ডাকিল—মাষ্টার মশায়···

রঘুনাথ চমকিয়া উঠিল। এ কি, এ যতীশ! মন্টি যতীশকে একেবারে আঁকড়াইয়া ধরিল। রঘুনাথের মুখখানা তাকে দেখিয়া মুহূর্ত্তে সাদা হইয়া গেল। মনের মধ্যে আবার সেই কবেকার কথাগুলা জাগিয়া উঠিয়া তাকে একেবারে চাপিয়া ঘিরিয়া ধরিল! যতীশ সে মুখ দেখিয়া বুঝিল, কোন ফল হয় নাই,—মাষ্টার মহাশয়ের শুধু পাগল হইতে বাকী! সে বলিল—কোথায় আছেন?

রঘুনাথ বলিল,—ঐ গঙ্গার ঘাটে পূজারী ব্রাহ্মণের ঘরে। দেখবে এসো।

চলিতে চলিতে যতীশ বলিল—আপনাকে এত খুঁজেচি। মধ্যে একদিন পলাশডাঙ্গায় গেছলুম—ওধারের এমন কিছু খবরও পাইনি!

রঘুনাথ চুপ করিয়া রহিল। যতীশ বলিল,—আমাদের ওখানে চলুন—এখানে বড্ড কষ্ট হচ্ছে।

তখন দুজনে কৃপানাথের ঘরের সামনে আসিয়াছে। রঘুনাথ বলিল,—না বাবা, তোমাদের কথা প্রাণ থাকতে ভুলবো না। তবে লোকালয়ে আর থাকবো না, মনে করেচি।

যতীশ বলিল,—মন্টি···?

রঘুনাথ বলিল,—তার জন্য যেটুকু ভাবনা ছিল, তাও আজ কাটলো তোমায় দেখে। এই ঘর তো দেখে গেলে—মাঝে মাঝে এসো। তোমাদের ওখানে বেড়িয়ে আসবোখন। তার পর যেদিন চলে যাবো, তোমাদের হাতেই ওকে সঁপে যাবো!

যতীশ স্তব্ধ গম্ভীর দৃষ্টিতে রঘুনাথের পানে চাহিয়া রহিল। তার পর বহুক্ষণ স্তব্ধ থাকিবার পর বলিল,—মাকে বলবো, শুনে মা কালই আসবেন'খন।

রঘুনাথ বলিল,—কাল থাক্। কাল আমি থাকবো না। দু-দিন পরে তাঁকে এনো···আর কিছু দুঃখ করো না, বাবা। তোমাদের বাড়ী যাবো বৈ কি মন্টিকে নিয়ে—তবে থাকতে পারবো না সেখানে। মাকে বুঝিয়ে বলো। তিনি দুঃখ না করে যেন আমায় ক্ষমা করেন এজন্য! তুমি এখন মন্টিকে নিয়ে একটু গল্পসল্প করো!

যতীশ তখন মন্টিকে লইয়া গঙ্গার ধারে জেটিতে গিয়া বসিল। সাঁতারের আবার বাজি কি! বাজি তো হাউই, তুবড়ি, এই-সব। সাঁতারের আবার বাজি কি রকম? এমনি নানা কথায় যতীশকে সে ঘণ্টা-খানেক বিব্রত রাখিল। তার পর সন্ধ্যা হইলে যতীশ উঠিল।

মন্টি বলিল,—আমাদের বামুন-জ্যাঠা কেমন ঠাকুরের আরতি করে,—দেখবে না? এসো, দেখবে এসো! বামুন-জ্যাঠার সঙ্গে ঠাকুর কথা কন্,—তা জানো যতীশ-দা? কত লোকের অসুখ হলে বামুন-জ্যাঠার কাছে আসে—বামুন-জ্যাঠা ঠাকুরদের বলে ওষুধ দেন, জানো?

এমনি সব কথায় যতীশ-দার তাক লাগাইয়া সে তাকে ঠাকুরের আরতি দেখাইতে আনিল। আরতির পর ঠাকুরের প্রসাদী দিয়া যতীশদার কাছে সে প্রতিশ্রুতি আদায় করিল যে যতীশদা আবার আসিবে, রোজ আসিবে, তাদের দেখিতে এইখানে; আর মাসিমাকেও সঙ্গে আনিবে আরতি দেখাইতে!

পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া রঘুনাথ দেশের দিকে যাত্রা করিল। কৃপানাথ তাকে পয়সা দিয়া সাহায্য করিল—রঘুনাথ ট্রেণে বাহির হইল।

ষ্টেশন হইতে অনেকখানি পথ হাঁটিয়া যাইতে হয়। সে পথে লোকের ভিড়! সে পথ ছাড়িয়া রঘুনাথ বন-জঙ্গল ঠেলিয়া চলিল। আশায় মাতিয়া কখনো ঝড়ের বেগে চলে, আবার কল্পনা যখন আশার উপর নৈরাশ্যের পর্দ্দা টানিয়া দেয়, তখন রঘুনাথ পথের মাঝে ঝিমাইয়া পড়ে, গতি মন্থর হয়। মনে হয়, কেন সাধ করিয়া আবার এ নৈরাশ্য কিনিতে আসিল!

বরাবর আসিয়া···ঐ যে হাটতলার পিছনে ঘুরিয়া ঐ বাঁকা সরু পথ চলিয়া গিয়াছে···বুকটা মুহূর্ত্তের জন্য ছাঁৎ করিয়া উঠিল। এই পথের দেখা মিলিলে একদিন কি আনন্দে বুক তার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত! কি পুলক-সম্ভাবনায় সমস্ত প্রাণে শিহরণ জাগিত! আর আজ···? এ পথে পা দিতে সে এমন কাঁপিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে কেন?

···ঐ ঘর,—পোড়া বাঁশ, পোড়া কাঠ-খুঁটি একটা দারুণ শোক ও নির্ম্মম বিচ্ছেদের পতাকা তুলিয়া যেন দাঁড়াইয়া আছে! আজো তার বিষাদ তেমনি অটুট রহিয়াছে!

এই উঠান, এই দাওয়া, তুলসী-মঞ্চের একটু স্মৃতি··· হায়, পাখী উড়িয়া গিয়াছে! অবহেলায় ঠেলিয়া-রাখা শূন্য জীর্ণ খাঁচাখানা শুধু পড়িয়া আছে!

···কারো চিহ্ন নাই! আর কিসের আশা! লক্ষ্মী এ পৃথিবীতে নাই, তা আসিবে কি! পাথরের মত ভারী পা দুইটা টানিতে টানিতে রঘুনাথ খিড়কির পথে বাহির হইয়া জঙ্গলে ঢুকিল।···খানিক বিশ্রাম করিতেছে, এমন সময় গ্রামের মুদি বিশ্বম্ভরের সঙ্গে দেখা হইল। বিশ্বম্ভর প্রণাম করিয়া বলিল,—দাদাঠাকুর যে!···তা মা-ঠাকরুণের খোঁজ পেয়েচেন?

রঘুনাথ এ কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেল। সে বিশ্বম্ভরের পানে চাহিল। তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

বিশ্বম্ভর এ কথায় ভারী বিস্ময় বোধ করিল। সে বলিল,—বল কি দাদাঠাকুর! তবে যে কলকাতা থেকে মোটরে চড়ে একটি লোক এসেছিল, তোমার সন্ধানে, মণ্টু-মার সন্ধানে···মা-ঠাকরুণকে পাওয়া গেছে। তিনিই সে লোককে পাঠিয়েছিলেন···তাঁর কে বোন আছেন, সেই তাঁর বাড়ী থেকে···

এঁ্যা! এ-সব কি কথা! লক্ষ্মী আছে! তার বোনের কাছে!··বোন···! রঘুনাথের পায়ের নীচে মাটী দুলিয়া উঠিল, চোখের সামনে দীপ্ত সূর্য্যের খর আলোর উপর কালো পর্দ্দা পড়িয়া গেল। টলিতে টলিতে সে মাটীতে বসিয়া পড়িল। ওরে অবুঝ, ওরে মূর্খ, বড় দর্প করিয়া পথে ঘুরিয়া তুই তার সন্ধান লইতে ছুটিয়াছিলি!···ঘর ছাড়িয়া কেন গেলি রে, তুই কেন গেলি!

বিশ্বম্ভর বলিল,—তা এখানে বসচো কেন! আমার ওখানে চলো—মুখ-হাত ধুয়ে একটু জিরুবে।

রঘুনাথের চোখের সামনে জাগিয়া উঠিল, সেই ভিড়-ভরা সহরের পথ, বাড়ীর ঠাসা-ঠাসি—তার মাঝে কোথায় কোন্ কোণে তার লক্ষ্মী পড়িয়া আছে! তার খোঁজ করা—সে কি সহজ কথা!

বিশ্বম্ভর বলিল,—এসো দাদাঠাকুর!

রঘুনাথ বলিল,—না বিশ্বম্ভর, তুমি যাও। আমি এখনি কলকাতায় চললুম! বলিয়া ধড়মড়িয়া উঠিয়া একেবারে দ্রুত চলিয়া কতকগুলা গাছের অন্তরালে চকিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

## ১৭

কিরণের আশ্রয়ে লক্ষ্মী একটু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছিল। পলাশডাঙ্গা হইতে লোক ফিরিয়া আসিবার পর কিরণ তাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, বাড়ীতে যখন তিনি নাই, তখন নিশ্চয় এখানে আসিযাছেন তোমার খোঁজে! এবং তাঁর এই সন্ধান সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য প্রায় লক্ষ্মীকে লইয়া কলিকাতার বড় বড় ঘাটে স্নান করিতে যাইত। কখনো যাইত দক্ষিণেশ্বরে, কখনো কালীঘাটে, আবার কখনো বা নানা মন্দিরে।

কিন্তু ঠাকুরের কাছে মনের আকুল প্রার্থনা জানাইয়া লক্ষ্মীর চোখ তার প্রার্থিতের দর্শন পাইত না! কিরণ বুঝাইত, আজ আশা মিটিল না, কাল মিটিতে পারে।

থিয়েটারে যেদিন ভালো ভালো অভিনয় হইত, লক্ষ্মীকে সঙ্গে লইয়া গিয়া মেয়েদের আসনে সে বসাইয়া দিত! তার পর অভিনয়-শেষে আবার তাকে সযত্নে বুকের আড়ালে লইয়া বাড়ী ফিরিত। মনটা ভাঙ্গিয়া গেলেও একদিন আবার তাহাকে গড়িয়া তোলা যাইবে, এমনি আশা লইয়া লক্ষ্মী তার দিন কাটাইতেছিল।

সেদিন মহা-সমারোহে থিয়েটারে নূতন নাটক সীতা-নির্ব্বাসনের অভিনয় হইবে। সীতা সাজিবে কিরণ। কিরণের নামের জয়-সঙ্গীতে থিয়েটারের মালিক সহরকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল। কিরণ থিয়েটারে যাইবার পূর্ব্বে নিজের ঘরে সীতার ভূমিকা আর একবার দুরস্ত করিয়া লইতেছিল। লক্ষ্মী চুপ করিয়া বসিয়া তার সে অভিনয় দেখিতেছিল। কিরণের পাঠ শেষ হইলে লক্ষ্মী বলিল,—এমন বল্‌চো ভাই দিদি যে, আমার দুই চোখে জল ঠেলে ঠেলে আসচে।

কিরণ আসিয়া গম্ভীরভাবে লক্ষ্মীর ললাটে চুম্বন করিল, তাকে বুকের মাঝে সস্নেহে চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—এসো, দুজনে তৈরী হয়ে নি! একলাটি থাকবে! আর যা দেখলে, এ তো কিরণকে দেখলে—থিয়েটারে সীনের গাছ-পালার মধ্যে যাকে দেখবে, সে কিরণ থাকবে না গো, সে সীতা!

গা ধুইয়া কিরণ সাজ-সজ্জা করিল। লক্ষ্মী একখানি মোটা লাল পাড় শাড়ী পরিয়া তার উপর মোটা চাদর গায়ে জড়াইয়া লইল। তার পর একটা ট্যাক্সি আনাইয়া কিরণ লক্ষ্মীকে লইয়া থিয়েটারে যাত্রা করিল।

থিয়েটারের সামনে কি ভিড়—লোকে লোকারণ্য! সারা সহর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে! গাড়ী, মোটর, লোক-জন! সেই ভিড় ঠেলিয়া কিরণের ট্যাক্সি আসিয়া ফটকের সামনে দাঁড়াইল। ঘোমটায় ঢাকা কাপড়ের পুঁটলির মত জড়োসড়ো লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া কিরণ নামিয়া থিয়েটারে ঢুকিল। অধীর দর্শকের দল অপূর্ব্ব কৌতূহলে ভরা দৃষ্টি লইয়া কিরণকে দেখিল। এই প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী এখনি ষ্টেজে নামিয়া কি ইন্দ্রজালের না সৃষ্টি করিবে! কোথায় সরিয়া যাইবে সহরের এই কঠিন বুক, সত্যের এই নির্ম্মম পরশ! তার জায়গায় ফুটিয়া উঠিবে সেই কোন্ অতীতের অযোধ্যার রাজপুরী, পথ-ঘাট, সেই বাল্মীকির শান্ত তপোবন—সে এক স্বপ্নের রাজ্য! ঐ কণ্ঠের স্বরে-সুরে কি কুহক তখন ঝরিয়া পড়িবে!...

এই দর্শকের দলে একজন লোক দাঁড়াইয়া ছিল—তার চোখ কিরণের উপর হইতে সরিয়া তার সঙ্গিনীটিকে তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করিতেছিল! লক্ষ্মীর কাপড়ের আবরণ ভেদ করিয়া যে মর্ম্মর বাহু-লতা, যে চম্পক-অঙ্গুলি, যে পদ-তল প্রকাশ পাইতেছিল,—সে যেন বিদ্যুতের শিখা! এমন একটা আভা ঐ বর-অঙ্গ হইতে বিচ্ছুরিত হইতেছিল, যার পরশে তার তৃষিত চোখ একেবারে ক্ষুধিত আকুল হইয়া উঠিল, সে লাবণ্যের পরশ পরিপূর্ণভাবে পাইবার জন্য মন তার অধীর উন্মত্ত হইল! এ লোকটি রজনী।

জীবন তার নিতান্তই একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে—পুরানো মুখ, পুরানো সঙ্গ একেবারে নির্জ্জীব! থিয়েটারে সে আসিয়াছিল, এখানকার কুহক-স্পর্শে প্রাণটায় একটু বৈচিত্র্যের ঝলক লাগাইতে! কিরণকে দেখিবার সাধও তার এক-একবার হইতেছিল—কিন্তু সে জানে, কিরণ এখন দুর্ল্লভ। তাকে পাওয়া যায় না। অথচ একদিন...

একটু হাসিয়া রজনী ভাবিল, যাক সে কথা!...কিন্তু ঐ রূপসী সঙ্গিনী—কে ও?

রজনী ভিতরে গেল; গার্ডকে ডাকিয়া চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিল, কিরণের সঙ্গে আসিল, ও কে?

গার্ড বলিল, সে শুনিয়াছে, কিরণের কি-রকম বোন্ হয়! ভদ্র ঘরের মহিলা। কিরণের ওখানে থাকে, এখানে তার সঙ্গে আসে, পর্দ্দায় বসিয়া থিয়েটার দেখে, আবার তার সঙ্গে স্বতন্ত্র গাড়ীতে চলিয়া যায়!

শুনিয়া রজনী ভাবিল, একবার সে কিরণের বাসে

গিয়া দাঁড়াইবে! তবে আজ আর হয় না,—কাল… সন্ধ্যার পরে—কাল তো কিরণের কোন পার্ট নাই—সে থিয়েটারে আসিবে না।

রবিবার। সন্ধ্যা হইয়াছে। লক্ষ্মী নিত্যকার মত জানলায় বসিয়া পথের পানে চাহিয়াছিল। পথে জন-তরঙ্গ চলিয়াছে—তাই সে একটি-একটি করিয়া গণিতেছিল; আর ঠাকুরকে মিনতি জানাইতেছিল, এই পথে তাঁকে আনো, ঠাকুর—আর যে সহ্য হয় না! কিরণ গিয়াছিল তখন গা ধুইতে। দুইজনে কালীঘাটে আরতি দেখিয়া আসিবে, কথা ছিল।

রাস্তায় গ্যাস জ্বলিতেছে। রাত্রের ফিরিওয়ালারা বিচিত্র সুর তুলিয়া তাদের ফেরির পশরা লইয়া পথে বাহির হইয়াছে। কেহ হাঁকিতেছে, 'বেল ফুল'—কেহ 'কুলপী বরফে'র হাঁড়ি মাথায় চাপাইয়াছে। এ সবগুলার উপর দিয়া ভাসিয়া লক্ষ্মীর মন সেই তার পল্লীর ঘরখানির আশে-পাশে বিচরণ করিতেছিল। সেই জনহীন পথ, পুকুর-ঘাট, সেই আঁধারে-ঢাকা তুলসীমঞ্চ…সে কি স্বর্গ ছিল…!

হঠাৎ ঘরের মধ্যে একটা মত্ত স্বর জাগিল,…কিরণ-বিবি…

চমকিয়া লক্ষ্মী ফিরিয়া দেখে…এ কি…এ যে সে-ই! যে তাকে তার স্বর্গ হইতে টানিয়া আনিয়া আজ এই পথে বসাইয়াছে!…এ সেই রজনী!

দুইজনে চোখাচোখি হইল। অমনি আগন্তুক এক-লাফে একেবারে তার সামনে আসিয়া হাজির হইল। বিভোর দৃষ্টি তার পানে তুলিয়া হাসিয়া সে বলিল,—তুমি! আমার খাঁচার পাখী, তুমি এসে কিরণের খাঁচায় ঢুকেচো! বলিয়াই সে লক্ষ্মীকে ধরিবার জন্য দুই হাত বাড়াইল।

লক্ষ্মী ছুটিয়া পলাইতেছিল,—রজনী তাকে ধরিয়া ফেলিল; আবেগ-জড়িত স্বরে বলিল,—তুমি যে আমায় একেবারে মুষড়ে রেখেচো প্রেয়সী! তোমার কম খোঁজা খুঁজেচি!…ভাগ্যে কাল থিয়েটারে গেছলুম…

লক্ষ্মী আবার এই দৈত্যের কবলে পড়িয়া প্রমাদ গণিল। ভয়ে সে চীৎকার করিয়া উঠিল। তার চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে ঘরে আসিয়া ঢুকিল, কিরণ! কিরণের কেশের রাশি এলায়িত, দুই চোখে বিস্ময়ের সঙ্গে কি এক দীপ্তি! অপরূপ মূর্ত্তি!

কিরণ আসিয়া এ দৃশ্য দেখিয়া বলিল,—এ কি! তুমি…?

রজনী হাসিয়া বলিল,—এ যে আমার ধন কিরণ-বিবি, একে তুমি পেলে কোথায়?

কিরণ বলিল,—তুমিই…?

কথাটা বলিবার সময় রজনীর হাতের বাঁধন একটু শিথিল হইয়াছিল—তারি ফাঁকে লক্ষ্মী ছুটিয়া আসিয়া কিরণের পিছনে দাঁড়াইল, আসিয়া ভীত কণ্ঠে কহিল,—এই সে, দিদি…

কিরণ কহিল,—এ ই…? তার পর রজনীর পানে চাহিয়া বলিল,—তোমার এ রাক্ষুসে ক্ষিদে কি সবাইকে গ্রাস করবে! আমার সর্ব্বনাশ করেও তোমার তৃপ্তি হয়নি! ভদ্র ঘরের সতী-স্ত্রী স্বামীর প্রেমে স্বর্গ তৈরী করে বসেছিল, তাকে স্বর্গ থেকে হিঁচড়ে টেনে বার করে পথে দাঁড় করিয়েচো! আশ্চর্য্য, তোমার মাথায় বাজ পড়ে না! ভগবান কি ঘুমিয়ে আছেন!

হাসিয়া রজনী বলিল, সব সময় তোমার এ্যাকটিং! তা ঘরে কেন, ষ্টেজে করো, ঢের তারিফ পাবে!

দুই চোখে আগুনের হল্‌কা ফুটাইয়া ভর্ৎসনার স্বরে কিরণ বলিল,—আবার আমার ঘরেই চোরের মত ঢুকেচো!… ঢুকে আমার মুখের উপর ঐ মুখ নিয়ে বিদ্রূপ করচো, ব্যঙ্গ করচো! তুমি ভদ্র বলে পরিচয় দাও! আমার বাড়ীতে যে-চাকর বাসন মাজে, তার জুতো ছোঁবারো যোগ্য নও তুমি!…তোমায় আর কি বলবো! চলে যাও, …এখনি বেরিয়ে যাও!

রজনী সহসা এ কথায় চমকিয়া উঠিল। তার মুখের উপর এমন কড়া শাসন চালাইতে সাহস করে, একটা কুলটা নারী, থিয়েটারের এক জন সামান্য অভিনেত্রী! বিশেষ কিরণ—যে একদিন তার হাত ধরিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিল!…সে সরিয়া দাঁড়াইল।

কিরণ বলিল,—এখনো দাঁড়িয়ে রইলে! চলে যাও, নাহলে আমার চাকরকে ডাকবো। সে তোমার হাত ধরে বাড়ীর বাইরে তোমায় রেখে আসবে…

রজনী বলিল,—কি! এত-বড় কথা! বলিয়া সে কিরণের দিকে আগাইয়া আসিল।

কিরণ হাঁকিল,—ভোলা…

ভোলা ভৃত্য নিকটে ছিল। ঘরের মধ্যে ঝাঁজালো কথা শুনিয়া সে আসিয়া দ্বারের পাশে দাঁড়াইয়াছিল। কিরণের আহ্বানে ঘরের মধ্যে আসিলে কিরণ বলিল,—এই ছোট লোকটার হাত ধরে বাড়ীর বার করে দে…

ভোলা আসিয়া রজনীর হাত ধরিল, বলিল,—কেন বাবু ঝামেলা করো…বাহার যাও…

ঝটকানি দিয়া ভোলার হাত ছাড়াইয়া প্রচণ্ড রোষে রজনী হাতের লাঠি তুলিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা কাচের আলমারিতে লাঠি লাগিল এবং ঝন্‌ঝন্ শব্দে তার দুখানা কাচ ভাঙ্গিয়া গেল। অমনি একটা রক্তের তৃষ্ণায় রজনীর প্রাণ নাচিয়া উঠিল। সে দিক্‌-বিদিকের জ্ঞান হারাইয়া লাঠির ঘায়ে আলমারিটা ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিল—তারপর হাতের কাছে পানের ডিপে পাইয়া সেটা ছুড়িল

কিরণের পানে। কিরণের গায়ে ডিপাটা না লাগিয়া লাগিল গিয়া টেবিলে-রক্ষিত একটা পোর্শিলেনের বড় প্রতিমূর্ত্তির গায়ে। মূর্ত্তিটা ঝন্ ঝন্ শব্দে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া চুরমার হইল।

কিরণ তীব্রস্বরে গর্জ্জাইয়া উঠিল—এখানে এসেচো গুণ্ডামি করতে! বদমায়েস, মাতাল, ইতর···বলিয়া লক্ষ্মীকে ঠেলিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিয়া কোণ হইতে একটা চাবুক সে তুলিয়া লইল; কহিল,—বেরোও, বেরোও বল্‌চি,—না হলে এখনি এই চাবুকের ঘায়ে তোমায় ঢিট করে দেবো।

রজনী অট্টহাস্য করিয়া উঠিল; কহিল,—রণ-সাজে সাজবে! এটা থিয়েটার নয়, বিবি···

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে কিরণের হাতের চাবুক শপাৎ করিয়া পড়িল রজনীর মুখে। তখন প্রহার-ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের মত রজনী কিরণের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। ভোলা চাকর তখনই রজনীকে টানিয়া ছাড়াইতে গেল—কিন্তু সে তখন প্রচণ্ড বিক্রমে কিরণের কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়াছে!

রীতিমত একটা ধ্বস্তাধ্বস্তি চলিয়াছে,—মাতাল হইলেও রজনীকে হঠানো সহজ হইল না। এমন সময় দুইজন কনষ্টেবল আসিয়া শশব্যস্তে ঘরে ঢুকিল। আলমারি ভাঙ্গিতে দেখিয়া সদু দাসী ছুটিয়া পথে বাহির হইয়াছিল—মোড়ের কাছে ছিল দুইজন পাহারাওয়ালা। একটা পাণের দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া দোকানীর সঙ্গে তারা খোস্‌গল্প করিতেছিল। সদু গিয়া তাদের খপর দিতে তারা ছুটিয়া আসিয়াছে। এ-বাড়ী হইতে বখশিস প্রায় মেলে, তাই তারা খাতির রাখে!

কনষ্টেবলরা আসিয়া রজনীর দুই হাত ধরিয়া তাকে ছাড়াইল। কিরণের মুখ তখন নীল হইয়া গিয়াছে। রজনী ফুঁশিতেছিল। পুলিশ বজ্রমুষ্টিতে তাকে ধরিয়া তারি গায়ের চাদর টানিয়া রজনীর হাত দুইটা বাঁধিয়া ফেলিল। কিরণ ততক্ষণে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে।

কিরণ বলিল,—এই গুণ্ডা আমার ঘরে ঢুকে আমায় খুন করতে এসেছিল। আমার জিনিস-পত্র ভেঙ্গে চুরমার করে দেছে। একে ধরে থানায় নিয়ে যাও!

পাহারাওয়ালারা কিরণকে সেলাম করিয়া আসামী লইয়া প্রস্থান করিল।

## ১৮

যতীশ গিয়া সে-রাত্রে যখন মার কাছে বলিল, রঘুনাথের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, মা তখন এমন চঞ্চল হইয়া উঠিলেন—সেই রাত্রেই গাড়ী আনাইয়া তিনি বাগবাজারে আসিয়া হাজির হইলেন। মন্টি বসিয়া কৃপানাথের কাছে গল্প শুনিতেছে, আর রঘুনাথ নিশ্চল পাষাণ-বিগ্রহের সামনে দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা রাখিয়া বসিয়া আছে! গাড়ীর শব্দে সে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না—কেন না, গাড়ী এখানে নিত্য আসে—অজানা অচেনা লোক কৃপানাথের দ্বারে আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়ায়, কেহ চায় ঔষধ রোগ সারাইতে, কেহ চায় মাদুলী—তার শক্তিতে যদি পথের চলন্ত সাহেবকে বিমুগ্ধ করিয়া একটা চাকরি মিলাইতে পারে, এই ভিড়ের মাঝে সেও কখনো তার অধীরচোখের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, যদি তার হারামণির কোন সন্ধান পায়! পাষাণ দেবতার পায়ে কতবার সে কত মিনতি জানাইয়াছে, কিন্তু হায়রে,—প্রাণ যার পাথর, তার গায়ে লজ্জা ভয় মিনতি কি কোন দাগ বসাইতে পারে!

যতীশের মা বহু সাধ্য-সাধনা করিলেন, আমার ওখানে চলো বাবা—কিন্তু রঘুনাথের এক কথা, আমায় মাপ করবেন মা! মানুষের পুরীতে আর আমার ফেরবার সাধ নেই! এখানে বেশ আছি। মন যখন বড্ড অধীর হয়, তখন ছুটে গিয়ে ঐ গঙ্গার ধারে বসি।

কোন মতে রঘুনাথ অশ্রু স্তম্ভিত করিল। তার পর ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিল, কোনদিন দরকার হয় তো দ্বিতীয় আশ্রয় সে আর খুঁজিতে যাইবে না—মন্টিকে লইয়া তাঁর গৃহে গিয়াই উঠিবে।

যতীশ বলিল,—কাল এসে আমাদের ওখানে আপনাদের নিয়ে যাবো মাষ্টার মশায়। আমরাও বেশী দূরে থাকি না—এই দর্জ্জিপাড়ায়—পাঁচ মিনিটের পথ!

তারপর যতীশ এখানে প্রায় আসিতে লাগিল। তার সঙ্গে মন্টি বেড়াইয়া আসিত, গঙ্গার ধার দিয়া কতদূর অবধি!

সেদিন যতীশদের বাড়ী নিমন্ত্রণ সারিয়া রঘুনাথ, যতীশ আর মন্টি পরেশনাথের মন্দির দেখিতে গিয়াছিল। মন্দির দেখিয়া সেখানে খানিক বসিয়া গল্প করিয়া তারা যখন বাড়ী যাইবার জন্য উঠিল, তখন সন্ধ্যা হয়-হয়!

বরাবর সার্কুলার রোড ধরিয়া আসিয়া তারা গ্রে ষ্ট্রীটে পড়িল। গ্রে ষ্ট্রীট ধরিয়া ক্রমে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে আসিল। সেইখানটায় পথ পার হইয়া যেমন ওদিককার ফুটপাথে উঠিবে, হঠাৎ অমনি কোথা হইতে একটা ট্যাক্সি আসিয়া পড়িল এবং মন্টি ভ্যাবাচাকা খাইয়া যেমন ছুটিতে যাইবে, অমনি গাড়ীর ধাক্কা লাগিয়া ফুটপাথের কোলে ছিটকাইয়া গিয়া পড়িল। তার কপাল ফাটিয়া ঠোঁট কাটিয়া ঝর-ঝর ধারে রক্ত ঝরিল।

অমনি মজা পাইয়া যত ভিড় আসিয়া জমিল সেই জায়গায়। সকলেই উঁকি মারিয়া দেখিতে চায়, বেশ গল্প করিবার মত ব্যাপার কিছু ঘটিল কি না! ড্রাইভারটা

পলাইতেছিল - পাঁচ-সাত জন লোক ঘুসি পাকাইয়া তাহাকে রুখিয়া দাঁড়াইল—কেহ দিল তার গালে প্রচণ্ড চড়, কেহ দিল ঘুষি। মারের চোটে ড্রাইভারের একটা দাঁত ভাঙ্গিয়া ছিটকাইয়া কোথায় গিয়া পড়িল, তারও মুখে রক্ত ছুটিল।

তখন পুলিশ আসিয়া ধমক দিয়া ভিড় সরাইল—রঘুনাথ আর সতীশ পথের কলের জলে চাদর ভিজাইয়া মন্টির মুখে-চোখে দিল! পুলিশ আসিয়া তাদের লইয়া থানায় যাইতে উদ্যত হইল। যতীশ বলিল,—তার আগে হাসপাতালে চলো। আগে বাঁচানো দরকার।

সেই ট্যাক্সিতে করিয়া মন্টিকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে তার ক্ষত ধুইয়া ডাক্তার পটি বাঁধিলেন; প্রকাণ্ড রিপোর্ট লিখিয়া পুলিশের হাতে দিলেন; পুলিশ তখন সেই রিপোর্ট আর জখমী রোগীকে লইয়া বড়তলা থানায় হাজির করিয়া দিল।

থানার সামনে আবার ভিড় আসিয়া ঠেল দিয়া দাঁড়াইল। সকলের চোখেই কৌতূহল, সকলের মুখে চীৎকার। পথের চলন্ত ট্রাম হইতে যাত্রীর দল থানার পানে চাহিয়া ভাবিল, ব্যাপার কি! এরা সব থানা লুঠ করিতে আসিয়াছে না কি!

মন্টির কেশ লেখা হইতেছে, এমন সময় গ্রেপ্তারী-আসামী রজনীকে লইয়া অপর পুলিশের লোক ভিড় ঠেলিয়া থানায় ঢুকিল।

থানার ঘরে ঢুকিয়া সাম্‌নে মন্টিকে দেখিয়া রজনী শিহরিয়া উঠিল।

এ কি এ···এ যে তার প্রেয়সীর মুখখানি ছোট্ট করিয়া কোন্ নিপুণ শিল্পী ছকিয়া বাখিয়াছে! আর··· তখনি চোখ পড়িল রঘুনাথের দিকে! এ কি মূর্ত্তি! এ যে বেদনা তার দারুণ আর্ত্ত রূপ ধরিয়া রজনীর সামনে দাঁড়াইয়া! মুখে একরাশ দাড়ি গজাইয়াছে, মাথার চুলগুলা এলোমেলো, দীর্ঘ···তার মনের উপর শপাৎ করিয়া কোথা হইতে তীব্র চাবুকের ঘা পড়িল,—কে যেন কাণের কাছে চীৎকার করিয়া বলিল, পাষণ্ড, তোর জন্যই আজ এদের এ দশা! সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়িল, সেই বনের কোলে পুকুরের ধারে জীর্ণ ঘর, সেই ঘরের তকতকে উঠানে এই মেয়েটি নিজের মনে খেলা করিত···

তার পর রজনী চাহিয়া দেখে, এ থানা! চোর, খুনে, ঠক, বাটপাড়, জালিয়াৎদের যেখানে আটক রাখে—নর-সমাজের আবর্জ্জনা ঝাঁটাইয়া পুলিশ যেখানে জড়ো করে। ঐ হাজত-ঘর! পথে চলিতে পথ হইতে সে অমন কত-দিন দেখিয়াছে, ঐ ঘরের মধ্যে চিড়িয়াখানার বন্ধ জানোয়ারের মত কোমরে দড়ি-বাঁধা আসামী···লোহার গরাদের মধ্য দিয়া বাহিরের পানে তাকাইয়া আছে। বাহির হইতে তাকে হিঁচড়াইয়া টানিয়া ঐ খাঁচার মধ্যে পূরিয়া রাখা হইয়াছে, তার দানবী হিংসা হইতে মানুষ-গুলাকে রক্ষা করিবার জন্য। এই ঘরেই ঐ সব খুনে জালিয়াতের সঙ্গে তাহাকে এখন পূরিয়া রাখা হইবে। আর সহরের লোক দূর হইতে দেখিয়া ভাবিবে, এ-ও একটা খুনে জালিয়াৎ, ঠক, চোর······

রজনী ভাবিল, সে কি তাদের চেয়ে কম কোনো-খানে। সে-ও কি কত নারীর মন ছেঁচিয়া খুন করে নাই, প্রেমের কুহকে মজাইয়া কত নারীর সর্ব্বনাশ করে নাই?···নারীর নারীত্ব—তা-ও কি সে চুরি করে নাই?

ভাবিতে ভাবিতে তার মাথা ঝিম-ঝিম করিয়া উঠিল—পায়ের তলা হইতে মাটী বুঝি সরিয়া যাইবে, এমনি বেগে দুলিয়া উঠিল। রজনী পড়িয়া যাইতেছিল, তার কনষ্টেবল ঠেলা দিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল,—এই মাতোয়ালা, খাড়া রহো···

ইনস্পেক্টর বাবু মন্টির কেশ লিখিয়া লইয়া তাদের তদারকে বাহির হইলেন; বলিয়া গেলেন, এ আসামীকে হাজতে পূরিয়া রাখো, আসিয়া সব কথা শুনিব। অন্য বাবুরা তদারকে বাহির হইয়াছেন—তাঁরও মোটর-কেশের জরুরী তদারক পড়িয়াছে।

রজনীকে তখন হাজত-ঘরে পোরা হইল! বাহিরের ভিড় হইতে দুই একটা তীব্র মন্তব্য রজনীর কাণে আসিয়া পৌঁছিল। তারা বলিতেছিল—জানিস্ না? ও ভারী-বাবু লোক, মোটরে চড়ে বেড়ায় যে! থিয়েটারের বক্সে প্রায় নানা মূর্ত্তি সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বসে! নাও বাবা এখন পুলিশের রুলের গুঁতো খাও! একজনের স্বদেশ-প্রেম এমন তীব্র জাগিয়া উঠিল যে, আক্ষেপ ও বিদ্রূপের সুরে সে বলিল,—এই সব লোক হলো আমাদের দেশের বড় লোক! এতে আর জাতের উন্নতি হয় কখনো! মাতাল ব্যাটা···

ঘৃণায়-লজ্জায় রজনী হাজত-ঘরের মেঝেয় বসিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল।

## ১৯

মোটর-কেশের তদারক সারিয়া ইন্‌স্পেক্টর বাবু থানায় ফিরিয়া হাঁকিলেন,—আসামী লে' আও।

তখন হাজৎ-ঘর হইতে রজনীকে বাহিরে আনা হইল। তার কনষ্টেবল আসিয়া বলিল, এই আসামী থ্যাটারের কিরণ-বিবির ঘরে ঢুকিয়া বিবি-লোককে মারিতেছিল, তার ঘরের জিনিষ-পত্র ভাঙ্গিয়া তচ্‌নচ্ করিয়া দিয়াছে। বিবির দাসী আসিয়া খপর দিয়া তাদের পথ হইতে ডাকিয়া লইয়া যায়—তারা গিয়া স্বচক্ষে দেখিয়াছে, এ বাবু জিনিষ-পত্র ভাঙ্গিতেছে।

ইন্‌স্পেক্টর বাবু বলিলেন,—এখন মজা দেখবেন, চলুন! ছি, ছি, আপনারা ভদ্দর লোক! কাল কোর্টে

চোর-ছ্যাঁচড়ের সঙ্গে ডকে গিয়ে দাঁড়ালে ভারী পৌরুষ বেরুবে! না? বীরত্ব দেখাবার আর জায়গা পাননি, বুঝি!

রজনী একেবারে কাঁদিয়া ইন্‌স্‌পেক্টরের পায়ে পড়িল, মিনতির সুরে বলিল,—আমি কান মলচি, এ অপমানের হাত থেকে আমায় বাঁচান। এ অপমানের পর আমি আর বাঁচবো না!

ইন্‌স্‌পেক্টর হাসিয়া বলিলেন,—আমাদের হাতে পড়লে অনেক বদমায়েসই একেবারে সত্যপীর হয়ে ধর্ম্মের বক্তৃতা সুরু করে দেয়!

রজনী বলিল,—না মশায়, আমি তাদের দলে এখনো পৌঁছুই নি। অনেক বদমায়সী করেচি, অনেক পাপ করেচি—তবে পার পেয়ে গেছি…এই সামান্য ব্যাপারে আমার জ্ঞান হয়েচে…যথার্থ বলচি, আজ এই থানার ঘরে ঢুকে আমি বুঝতে পেরেচি, আমি কোথায় নেমে দাঁড়িয়েচি! দয়া করুন, আমায় একটা chance দিন্ মানুষ হবার—a life's chance.

ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু বলিলেন,—তা আপনি কিরণ বিবিকে বলতে পারেন। তিনি যদি মামলা তুলে নেন্ তো আমাদের আপত্তি নেই। এটা compoundable case—শুধু trespass বলে লিখে নিচ্ছি।…আপনি জামিন দিতে পারেন।

জামিন! রজনী অকূল পাথারে পড়িল। এ লজ্জার কথা সে কাহার কাছে গিয়া এখন বলিবে! বন্ধু-সমাজে মুখ দেখাইবে কি করিয়া! হাজতের আসামী!…সে হতাশভাবে বলিল, আমার জামিন হবার জন্য উপস্থিত তো কাকেও দেখচি নে।

ইন্‌স্‌পেক্টর বলিলেন—আচ্ছা, এখন কিরণ বিবির ওখানে তো যাওয়া যাক। তার পরে সে কথা হবে'খন।

বলিয়াই ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু এক জন পাহারাওয়ালাকে ডাকিলেন, তাঁর সঙ্গে যাইবার জন্য। সে আসিয়া রজনীর কোমরে একটা দড়ি জড়াইল। ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু বলিলেন,—এই দড়ি বাঁধা বেশে পথে যেতে পারবেন তো?

রজনী প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল; বলিল,—তার পর কাল সূর্য্যের মুখ দেখবার জন্য আমায় আর থাকতে হবে না। এ অপমানের পর…

ইন্‌স্‌পেক্টর বাবুটি ভদ্র। তিনি পাহারাওয়ালাকে বলিলেন,—একঠো গাড়ী বোলাও।

সে গাড়ী ডাকিলে রজনীকে লইয়া ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন; কনষ্টেবল গিয়া কোচবাক্সে চড়িল। তখন গাড়ী চলিল কিরণের বাড়ীর দিকে।

কিরণ বাড়ী ছিল না। অত-বড় ব্যাপার ঘটিয়া যাইবার পর কিরণের কাছে সমস্ত বাড়ীর হাওয়া এমন বিষাইয়া উঠিয়াছিল যে, সে লক্ষ্মীকে লইয়া দক্ষিণেশ্বরের দিকে বেড়াইতে বাহির হইল। ভাবিতেছিল এই রজনী—হায় রে, ইহাকে বিশ্বাস করিয়া, ইহার উপর নির্ভর করিয়া সে কি আশায় পথে বাহির হইয়াছিল! ঘৃণায় তার মন একেবারে কালো হইয়া উঠিল।

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। রূ লি আলোর ঝর্ণায় স্নান করিয়া সারা সহর যেন হাসিতেছে! এই আলোর ধারায় কিরণের মন তাব সমস্ত ময়লা মুছিয়া ঝরঝরে হইয়া উঠিল। গাড়ী গিয়া যখন দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিল, তখন একটু রাত্রি হইয়াছে। শান্ত মন্দির, চারিধার শান্ত—এমনি এক মায়ার জাল বিছানো রহিয়াছে যে একটু আগে যে বিশ্রী কাণ্ডখানা ঘটিয়া গিয়াছেল, তার শেষ চিহ্ন অবধি তার মন হইতে ছিটকাইয়া কোথায় ঝরিয়া পড়িল।

দুইজনে গিয়া ঘাটের কোলে বসিল। নদীতে তখন ভাঁটা পড়িয়াছে। মৃদু উল্লাসে ছোট ছোট ঢেউগুলা তটের কোলে ছুটিয়া আছাড় খাইয়া পড়িতেছে—ঠিক যেন এক দুঃখে-জমাট পাষাণ বুকের কাছে সুখ-স্বপ্নের স্মৃতির মত! দূরে কে গান গাহিতেছিল,—

দিবস-রজনী আমি যেন কার
আশার আশায় থাকি
তাই চমকিত মন চকিত শ্রবণ
তৃষিত আকুল আঁখি।

গানের কথাগুলা লক্ষ্মীর বুকে এমন করুণ রেশ জাগাইয়া তুলিল যে, তার দুই চোখে জল ছাপাইয়া আসিল। ওগো, এ যে তার অন্তরের বড় গোপন কথা! কে তুমি এ কথা কেমন করিয়া জানিলে গো! আমার মন সত্যই যে অতি তৃষিত ব্যাকুল রহিয়াছে—দুই শ্রবণ তোমার কণ্ঠের সুরটুকু পাইবার জন্য উন্মুখ অধীর সর্ব্বক্ষণ! কে গো তুমি, আমাকে বলিয়া দাও,—কোথায় সে?

গায়ক গাহিতেছিল,—

জাগরণে তারে দেখিতে না পাই
থাকি স্বপনের আশে—
ঘুমের আড়ালে যদি ধরা দেয়
বাঁধিব স্বপন-পাশে…

লক্ষ্মীও তো তাই আকুল থাকে, কখন্ রাত্রি হইবে, চারিদিককার সব কোলাহল মূর্চ্ছিত হইবে! তার মনও তখন তন্দ্রালোকে গিয়া প্রবেশ করিবে,—তখন সে আসিবে—তার প্রিয়তম, দুই বাহুর বাঁধনে লক্ষ্মীকে বাঁধিবার জন্য…

গান তখন দুলিয়া বহিয়া চলিয়াছে,—

এত ভালোবাসি, এত যারে চাই,
মনে হয় না তো সে যে কাছে নাই!
যেন এ বাসনা ব্যাকুল আবেগে
তাহারে আনিবে ডাকি।

কৈ, কৈ, কৈ গো, তার ব্যাকুল প্রাণের বাসনা-কামনা লক্ষ্মীর প্রিয়তমকে ডাকিয়া আনিতে পারিল না তো! তবে…তবে?

বুকের কাছটায় এমনি এক নৈরাশ্য জমাট বাঁধিয়া ভারী পাথরের মত ঠেলিয়া আসিল যে, তার চাপে লক্ষ্মীর নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল! চোখের সামনে চাঁদের আলো সহসা নিভিয়া আসিল! সে কিরণের বুকে মাথা রাখিয়া অত্যন্ত হতাশভাবে ঢলিয়া পড়িল। কিরণ ওপারে আলো-আঁধারের অস্পষ্ট ছবির মত গ্রাম-রেখার পানে চাহিয়াছিল। গাছের ফাঁকে ফাঁকে ঐ যে আলোর কণা দেখা যাইতেছে, লোক-কোলাহলের একটা অস্ফুট গুঞ্জন ঐ যে জলের বুক বহিয়া ভাসিয়া আসিতেছে… কিরণ ভাবিতেছিল, ঐ আলোর কণা, ও কোন্ সুখের ঘরের হাসির হীরার কুচি! ভাই-বোন, মা-বাপের স্নেহ-প্রীতিতে ঘেরা সুখের ঘর! ও ঘরে না আছে নৈরাশ্য, না আছে অনুতাপের বেদনা! সে যদি ঐ ঘরে আজ একটু ঠাঁই লইতে পারিত!

এমনি ভাবনার মধ্যে হঠাৎ লক্ষ্মী তার বুকে শ্রান্ত শির এলাইয়া দিতে কিরণের চমক ভাঙ্গিল। সে ডাকিল,—লক্ষ্মী…

লক্ষ্মী কাতর চোখে তার পানে চাহিয়া ডাকিল—দিদি…তার পর চক্ষু মুদিল।

গানটা কিরণের কানেও গিয়াছিল!—তার প্রাণের বৃন্তকে নাড়া দিয়া গানের সুর তাকে একেবারে শিথিল করিয়া তুলিয়াছিল! সে ভাবিতেছিল, হায় রে, তার যে আর আশা করিবার কিছু নাই! সে এই এত-বড় পৃথিবীর বুকে নিতান্তই একা, অসহায়! একটু আশা করিবার শক্তি—তাও দুই পায়ে মাড়াইয়া চুরমার করিয়া দিয়া আসিয়াছে! তার মত দুর্ভাগিনী আর কেহ আছে কি? কোন কথা না বলিয়া সে চাহিয়া রহিল।

গায়ক তখন অন্য গান ধরিয়াছে,—

অলি বার বার ফিরে যায়—
অলি বার বার ফিরে আসে
তবে তো ফুল বিকাশে!

কিরণের মন গানের সুরে এই ধূলা-মাটীর জগৎ ছাড়িয়া কোথায় যে উধাও যাত্রা সুরু করিল…ফুল, ফুল, ফুলে ছাওয়া, আলোয় আলো-করা সে কুহকের রাজ্য! হাসির রাশি ফুলের পাপড়ির মতই এ রাজ্যের পথে পথে ছড়ানো!—সেই ফুল-হাসির রাশির মাঝে কিরণের মন এমনি বিভোর হইয়া পড়িল যে, এই মন্দির, এই ঘাট, ঐ নদীর জলে ঢেউয়ের কাণাকাণি, পাশে লক্ষ্মী,—সব একেবারে কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গেল!

হঠাৎ একটা সুখের হাওয়ায় চমক ভাঙ্গিল!

গায়ক গাহিতেছিল—

আশা ছেড়ে তবু আশা রেখে দাও
হৃদয়-রতন-আশে!

এ কথায় সে একেবারে লক্ষ্মীকে ঠেলা দিয়া কহিল,—ঐ শোনো লক্ষ্মী! আশা ছেড়ো না, ছেড়ো না বোন্! কোনদিন ছেড়ো না। নদীর ঢেউগুলো শোনো ঐ কথাই বলচে…আশা ছেড়ে তবু আশা রাখো, আশা রাখো!

কিরণের বুক হইতে মাথা তুলিয়া লক্ষ্মী ঢেউগুলার পানে উদাস নেত্রে চাহিল…তারো মনে হইল, ঢেউগুলা যেন আছাড়া-পিছড়া খাইয়া ঐ কথাই বলিতেছে—সুরের ঐ কথাটাই যেন চারিদিকে ভাসিয়া ফিরিতেছে! আশা ছেড়ে তবু আশা রেখে দাও…কিন্তু এ কি আশা! এ যে দুরাশা, মস্ত বড় দুরাশাকে সে আজ সম্বল করিয়া আবার জগতের বুকে উঠিয়া দাঁড়াইতে চায়!

তার পর দুই জনেই স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। মাথার উপর নক্ষত্রের সভায় একরাশ নক্ষত্র শুধু স্তম্ভিত বুকে এই দুই নারীর অন্তরের পানে চাহিয়া বসিয়া আছে। হায় নারী, হায় অভাগিনী, এত দুঃখ সহিয়াও তোরা বাঁচিয়া থাকিস্, কি করিয়া! ছল-ছল চোখে দুইজনের পানে চাহিয়া নক্ষত্রের দল বুঝি এই কথাটাই কানাকানি করিতেছিল!

কিরণ হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—চলো ভাই ঠাকুর প্রণাম করে আসি। এখনি দোর বন্ধ হয়ে যাবে!

লক্ষ্মীকে লইয়া কিরণ আসিয়া মন্দিরে দাঁড়াইল। ঠাকুরকে দুইজনে প্রণাম করিল। লক্ষ্মী প্রাণের আবেগ উজাড় করিয়া ডাকিল,—আর যে পারি না মা, বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে। দাও মা, তাঁদের এনে দাও। যদি কায়-মনে স্বামীর পায়ে আমার ভক্তি থাকে, তাহ'লে তাঁদের আর দূরে রেখো না! এনে দাও মা। আমি বুক চিরে রক্ত দেবো…এই পাহাড়-প্রমাণ দুঃখে-ভরা বুক, তাই চিরে… যত চাও…

কিরণ লক্ষ্মীকে ঠেলা দিয়া ডাকিল—লক্ষ্মী…

লক্ষ্মী সে আহ্বানে চমকিয়া মুখ তুলিল, বলিল,—ডাকচো দিদি?

কিরণ দীপ্ত চোখে বলিল,—হ্যাঁ। আমি আকুল হয়ে মাকে ডাকছিলুম যে মা,এই সতী-লক্ষ্মীর চোখের জল মুছিয়ে দাও মা। তা মার মুখে যেন হাসি ফুটে উঠলো… ঠিক বিদ্যুতের রেখা! তবে তাতে ঝাঁজ নেই, এই জ্যোৎস্নার মত ঠাণ্ডা! এমন তো কখনো আমি দেখিনি, ভাই!

লক্ষ্মী আবেগে কিরণের পায়ের ধূলা মাথায় লইল, বলিল,—তোমার কথাই সত্য হোক্ দিদি…

## ২০

বাড়ী ফিরিতে দাসী সংবাদ দিল, রজনীকে লইয়া থানার ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু তদারকে আসিয়াছিলেন। যাহা ঘটিয়াছিল, তারা তাঁর কাছে সব খুলিয়া বলিয়াছে। তবে কিরণের কথাও পুলিশ শুনিতে চায়। কাল সকালে পুলিশের বাবু আবার আসিবেন। দাসী আরো বলিল, রজনী বাবু আর সে রজনীবাবু নাই। পুলিশের হাতে পড়িয়া তার বিষ-দাঁত ভাঙ্গিয়াছে। তাহাদের কাছে মিনতি জানাইয়াছে, কিরণ যেন তাকে ক্ষমা করে! সে আরো বলিয়াছে, যে ছোটদিদিমণির স্বামীর সে সন্ধান পাইয়াছে। ছোটদিদিমণির মেয়েটি না কি মোটরের ধাক্কা লাগিয়া জখম হইয়াছে…এই কলিকাতাতেই…

এ-সব কি কথা! কিরণ ও লক্ষ্মী দুইজনে চমকিয়া উঠিল। এবং তখনি আর একখানা গাড়ী ডাকাইয়া দুই-জনে ভৃত্যকে লইয়া থানায় ছুটিল।

রজনী তখনও থানায় বসিয়া আছে। ভুলো গিয়া খপর দিল, কিরণ বিবি আসিয়াছেন! ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু বলিলেন,—বেশ, আমি যাচ্ছি।

তিনি উঠিবার পূর্ব্বেই কিরণ আসিয়া থানার ঘরে প্রবেশ করিল।

রজনী তাকে দেখিয়া বলিল,—আমায় মাপ করো কিরণ! আজকের ঘটনা আমায় নতুন মানুষ করেচে।… এখন আমার জামিন হয়ে কেউ না দাঁড়ালে আমায় ঐ চোর-জালিয়াৎদের সঙ্গে হাজত-ঘরে বাস করতে হবে! আগে তার উপায় করো। তুমি মনে করলেই এ মামলা উঠিয়ে নিতে পারো…যদি ক্ষমা করতে পারো আমায় তো সব দিক দিয়েই সুযোগ পাই আমি মানুষ হবার। তার পর রঘুনাথ বাবুর সন্ধানও আমি পেয়েচি…যদি অনুমতি কর যে অন্যায় করেচি, তার প্রতিকার করবারও সুযোগ হয়!

কিরণ ইন্‌স্‌পেক্টর বাবুর পানে চাহিয়া বলিল,—মামলা আমি উঠিয়ে নিতে চাই! একজন বড় ঘরের ছেলের এ বে-ইজ্জতী…

সে একটা নিশ্বাস ফেলিল। এ সেই রজনী…যার সান্নিধ্য তার সব চেয়ে কাম্য ছিল! একদিন যার অদর্শন তার অসহ্য ঠেকিত!… যা গিয়াছে, তা একেবারে গিয়াছে! ফিরিবার নয়, ফিরিবার নয়! ফিরাইতে সে চায় না!

ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু বলিলেন,—স্বচ্ছন্দে মামলা উঠিয়ে নিতে পারেন! কিন্তু তার আগে আপনার জবানবন্দী চাই—অর্থাৎ যা-যা ঘটেছিল…। এর পর আজ রাত্রের মত উনি জামিনে খালাস থাকবেন! কাল ডেপুটি কমিশ-নারের কাছে ওঁকে একবার হাজির হতে হবে। আপনি তাঁর কাছে বললে বা উকিল দিয়ে বলালে মামলা মিটবে, উনিও খালাশ পাবেন।

কিরণ বলিল,—এক জন উকিল তো চাই তা হলে। কিন্তু আমি কাকেও চিনি না।

ইন্‌স্‌পেক্টর বলিলেন,—বেশ, আমি সে ব্যবস্থা করচি। বলিয়া তিনি ডাকিলেন,—দরোয়াজা…

একজন পাহারওয়ালা আসিয়া দাঁড়াইল। ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু তাকে এক জন উকিল আনাইবার কথা বলিয়া দিলেন। সে চলিয়া গেলে ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু কিরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি হয়েছিল, ইনি কি করে ছিলেন, সব বলুন দিকি আমায়।

কিরণ সব কথা খুলিয়া বলিল,—বলিয়া নিবেদন করিল, যে-নারীর উপর উনি অত্যাচার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তিনি এক জন ভদ্র মহিলা—তাঁর নামটা জানিতে না চাহিলেই সে কৃতার্থ হইবে। তা ছাড়া তাঁকে যেন থানায় দাঁড়াইতে না হয়! বা তাঁকে এ সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা না হয়—এই তার প্রার্থনা।

ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু রজনীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—আপনি এ-সব স্বীকার করেন?

রজনী বলিল,—সব সত্য।

ইন্‌স্‌পেক্টর বলিলেন,—আপনার সম্বন্ধে এ-সব কথা শুনে বড় কষ্ট হচ্ছে। আপনারা বড় লোক—অবসরও আপনার প্রচুর! এই পয়সা আর অবসর কত ভালো কাজে খাটাতে পারেন। তা না করে এমনি ইতর লোকের মত নোংরা কাজে ছোটেন! ছি!

রজনী বলিল,—যথার্থই আমার অনুতাপ হচ্ছে ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু! I beg a life's chanco feyon.

উকিল আসিয়া জামিন প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়া দিলে কিরণ একটা চিঠি লিখিয়া দিল, মামলা সে চালাইতে চায় না।

ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু বলিলেন,—এই চিঠি কাল আমি দাখিল করবো। আর রজনীবাবু, আপনি সরকারী গরিব-থানায় কিছু দিয়ে দেবেন—তা হলেই মামলা তুলে নিতে কোন কষ্ট হবে না!

এদিককার ব্যাপার চুকিলে রজনী বলিল,—সেই যে মেয়েটি আজ মোটর চাপা পড়েছিল, তার বাপের নাম রঘুনাথ বাবু। তাঁদের ঠিকানাটা যদি দেন…আমাদের আপনার লোক তিনি…

ইন্‌স্‌পেক্টর সকৌতূহলে রজনীর পানে চাহিলেন, তার পর কাগজ-পত্র দেখিয়া তাদের ঠিকানা বলিয়া দিলেন,—বাগবাজার কালী-মন্দির। কৃপানাথ ঠাকুরের বাড়ী।

ঠিকানা জানিয়া লইয়া রজনী বাহিরে আসিল; আসিয়া কিরণকে বলিল,—তোমরা বাড়ী যাও। আমি তাঁদের নিয়ে এখনি তোমার ওখানে আসচি।

কিরণ লক্ষ্মীকে লইয়া বাড়ী ফিরিল। বাড়ী আসিয়া

সে লক্ষ্মীকে বলিল,—মা-কালীর সে হাসি মিথ্যা নয়—আমাদের দুই বোনের প্রার্থনা তিনি শুনেচেন। রঘুনাথ-বাবুকে এখনি দেখতে পাবে…

এ কি সত্য! এ কি স্বপ্ন! না, এ পরিহাস! তার এত বড় দুরাশা তবে…লক্ষ্মীর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। সে পড়িয়া যাইতেছিল, কিরণ তাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—এসো, এবার রাণীর সাজে তোমায় সাজিয়ে দি…

লক্ষ্মীর সমস্ত চেতনা অন্তর্হিত হইয়াছিল। সে জড় পদার্থের মত নিজেকে কিরণের হাতে ছাড়িয়া দিল। কিরণ তার মুখ-হাত ধোয়াইয়া তাকে সাজাইতে বসিল—মাথার চুল আঁচড়াইয়া দিয়া সিঁথিতে বেশ করিয়া সিঁদুর পরাইয়া, আলতায় পা দুইখানি রাঙাইয়া, ভালো একখানি শাড়ী পরাইয়া লক্ষ্মীকে একটা কৌচে বসাইয়া দিয়া কিরণ মুগ্ধ বিহ্বল দৃষ্টিতে তার পানে চাহিয়া রহিল। লক্ষ্মীর মনে হইতেছিল, সে যেন স্বপ্ন দেখিতেছে! হোক্ স্বপ্ন—তবু এ বড় সুখের…তাই সে অমনি স্পন্দনহীন স্তব্ধ বসিয়া রহিল—ঠিক যেন একটি মাটীর পুতুল।

## ২১

লক্ষ্মীর স্পন্দিত বুকের উপর দিয়া সশব্দে কখন্ একখানা গাড়ী আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল এবং কখন্ যে রজনীর সঙ্গে তার প্রাণের চিরবাঞ্ছিতেরা আসিয়া ঘরে ঢুকিল—এগুলা যেন স্বপ্ন! হঠাৎ তার চেতনা হইল, কপালে পটি-বাঁধা মণ্টু যখন মা বলিয়া তার কাছে ছুটিয়া আসিল।

রঘুনাথ তীক্ষ্ণ স্বরে হাঁকিল,—মন্টি…

মন্টি থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল! রঘুনাথ তার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া দুই পা পিছনে সরিয়া গেল। লক্ষ্মী চাহিয়া দেখে, রঘুনাথের চোখে একটা তীব্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ! সে দৃষ্টির আগুন তার প্রাণটাকে নিমেষে পুড়াইয়া দিল!

লক্ষ্মী উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু পা এমন কাঁপিতে লাগিল যে, আর দাঁড়ানো যায় না! রঘুনাথ তার পানে তেমনি বিরক্তি-ভরা দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল,—তুমি তো বেশ আছ!…এই ঐশ্বর্য্য দেখাতে আমাদের ডাকিয়ে এনেচো! আমরা পথের ভিখারী, আর তুমি রাজরাণী! তা বেশ, তুমি সুখে থাকো! আমরা চললুম! রঘুনাথ মন্টিকে লইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

সমস্ত পৃথিবী এমন ভয়ানক বেগে লক্ষ্মীর পায়ের তলায় দুলিয়া উঠিল যে লক্ষ্মী মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইতেছিল। কিরণ তাকে ধরিয়া কৌচের উপর শোয়াইয়া দিল! তার পর সে রঘুনাথকে বলিল,—আপনি ভুল বুঝবেন না। আমি যেই হই—তবু শপথ করে বলতে পারি ভগবানের নাম নিয়ে যে লক্ষ্মী সত্যই সতী-লক্ষ্মী। ওর দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা শুনলে পাষাণও ফেটে যায়! আপনার জন্যই ও এখনো প্রাণটুকু রেখেছে—আর আপনি এই সব কথা বলচেন! আপনি না ওর সঙ্গে ঘর করেছেন! ওর মনের কথা সবই তো আপনার জানা…সেই লক্ষ্মীকে আপনি বুঝতে ভুল বোঝেন…আশ্চর্য্য!

রঘুনাথ এ কথার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে অবাক হইয়া কিরণের পানে চাহিল। কিরণ রজনীকে দেখাইয়া বলিল,—এই তো ওর মস্ত সাক্ষী। উনিই বলুন…লক্ষ্মী কি ··

রজনীর মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল। সে মনকে প্রাণ-পণ বলে খাড়া করিয়া বলিল,—ইনি সতী-লক্ষ্মী…আমার মা। অমি অন্ধ মোহে ওঁকে ঘর থেকে টেনে এনেছিলুম,—ভেবেছিলুম, নারীকে পাওয়া কোন কালেই শক্ত নয়! কিন্তু আমি শপথ করে বলচি, উনি নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক…

তার পর রজনী ধীরে ধীরে সকল কথা খুলিয়া বলিল। কেমন করিয়া লক্ষ্মীকে প্রথম দেখিয়া তাকে পাইবার জন্য সে পাগল হইয়া ওঠে, তার পর কি ফন্দী করিয়া সে তাকে ধরিয়া আনে, কি করিয়াই বা বন্দী করিয়া রাখে, তার পায়ে রাজার ঐশ্বর্য্য ঢালিয়া তাকে পাইবার দুরাশা লইয়া মিনতি-ভরা ভিক্ষা চায়, জোর করে…কিন্তু লক্ষ্মী দুই পায়ে সে ঐশ্বর্য্য মাড়াইয়া ভাঙ্গিয়া, সে বল তুচ্ছ করিয়া পলাইয়া যায়! তার পর আবার একদিন, আজই, সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাকে আবার পাইবার জন্য কি দুরন্ত আগ্রহে সে ছুটিয়া আসে·· এবং তার ফলে তার মনের উপর হইতে পাপের ভারী পাথরখানা হড়হড় করিয়া সরিয়া গিয়া মনকে মুক্তি দিয়া রজনীকেও আবার মানুষ হইবার মস্ত সুযোগ দিয়াছে! থানায় রঘুনাথকে দেখিয়া সে একেবারে মাটীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল! এ সতী-লক্ষ্মীকে কু-কথা বলিলে পৃথিবী এখনই ফাটিয়া চৌচির হইয়া যাইবে!

কিরণের চোখ দুইটা ধক্-ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল! রজনীর কথা শেষ হইতে সে-ও খুলিয়া বলিল, দৈবাৎ সে লক্ষ্মীকে কেমন করিয়া পথে দেখে এক পিশাচের কবলে! ভাগ্যে সে আসিয়া পড়িয়াছিল, তাই তো লক্ষ্মী রক্ষা পাইল! নহিলে…তার পর এখানে আসিয়া লক্ষ্মী সব আশা হারাইয়া মরিতে চাহিল! তারি কথায় দেশের বাড়ীতে লোক যায় লক্ষ্মীর চিঠি লইয়া এবং সে আসিয়া খপর দেয়, সেখানকায় বাড়ী পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে! তার পর লক্ষ্মী তাঁকে পাইবার জন্য পাগলের মত আজ কালীঘাটে, কাল দক্ষিণেশ্বরে, নিত্য এই গঙ্গার তীরে ঘাটে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে! সে ঘোরার এখনো বিরাম নাই—!

সমস্ত কথাগুলা রঘুনাথের চিত্তকে একেবারে বিকল

করিয়া দিল। তার লক্ষ্মী তার জন্ম এত সহিয়াছে, আর তাকেই সে নিমেষের জন্ম এমন অবিশ্বাসের চোখে দেখিয়াছে! রঘুনাথের মনে হইল, এ চিন্তাই বা তাকে পাইয়া বসিল কি করিয়া!

কিরণ রঘুনাথের উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই মন্টিকে টানিয়া একেবারে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল, তার পর চুমায় চুমায় তার ছোট মুখখানি ভরিয়া দিয়া বলিল,—এসো মা, এসো, মার কাছে এসো।

লক্ষ্মীর সর্ব্বশরীর প্রচণ্ড আবেগে তখনো কাঁপিতেছিল! এ কি সত্যই তার সামনে আজ তার চির-বাঞ্ছিত —এত-বড় আশা তার এমন করিয়া পূর্ণ হইল! এখনো কি স্বপ্ন দেখা চলিয়াছে, না···?

মন্টি গিয়া তার গায়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ডাকিল,—মা—

লক্ষ্মীর দুই চোখে জল ছাপাইয়া আসিল। জলে-ভরা অস্পষ্ট দৃষ্টিতে মন্টির পানে চাহিয়া সে তাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল; মনে মনে ডাকিল, মন্টি, মন্টি, মা, মা—

তার পর সকলে চুপ—কাহারো মুখে একটি কথা নাই! বুকের মধ্যে সকলেরই কিসের তরঙ্গ ছুটিয়াছে!

রজনী সে স্তব্ধতা ভঙ্গ করিল। সে একেবারে আগাইয়া আসিয়া লক্ষ্মীর পায়ের কাছে প্রণাম করিল, করিয়া রুদ্ধ স্বরে কহিল,—মা আমায় ক্ষমা করো। আমার সমস্ত অপমান ভুলে যাও!

লক্ষ্মী কেমন হইয়া গেল। সে যে কি করিবে, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। রজনী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—নারী যে কত বড়, তার মন যে হেলা-ফেলার বস্তু নয়, সে যে সুলভ নয়, তা আমি আগে বুঝিনি! তার পর কিরণের পানে চাহিয়া বলিল,—কিরণ, তুমিও আমায় ক্ষমা করো! যা ফেরাবার নয়, তা ফিরবে না—কিন্তু তোমরা দুজনে আশীর্ব্বাদ করো, জীবনের বাকী দিনগুলো যেন মানুষের মত কাটাতে পারি।

রঘুনাথ তখনো স্তব্ধ দাঁড়াইয়া। রজনী তার পানে চাহিয়া বলিল—আপনার কাছে ক্ষমা চাইবার স্পর্দ্ধা আমার নেই, সে সাহসও নেই! তবে যদি কোনদিন পারেন, আমায় ক্ষমা করবেন। মন যা চায়, তাই তাকে দিয়ে তৃপ্তি পাওয়া—মানুষের পক্ষে এ ভাব ঠিক নয়। সে তৃপ্তি কত ক্ষণিক, আমি তা হাড়ে-হাড়ে বুঝেচি! সে তৃপ্তি এত ক্ষণিক বলেই একটার পর আর একটার দিকে ক্রমেই অসহ্য ঝোঁক নিয়ে অন্ধ হয়ে আমি ছুটেছিলুম!···আপনি কত মহৎ, এখনো আমায় গুলি করে মারচেন না, এতেই আমি বুঝচি!···তবে এবার আমায় শোধরাবার সুযোগ দিন···বলিতে বলিতে সে রঘুনাথের দুই পা জড়াইয়া ধরিল; বলিল,—বলুন, কোনদিন আমায় ক্ষমা করতে পারবেন···? একটু আশা দিন, নাহলে আমার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে না!

রঘুনাথ একটা নিশ্বাস ফেলিল; আর এই একটা নিশ্বাসের সঙ্গে এতদিনকার পুঞ্জিত বেদনা, আর হাহাকার যেন তার বুক ছাড়িয়া বাহির হইয়া বুকটাকে হাল্‌কা করিয়া দিল। রঘুনাথ বলিল,—আপনাকে ক্ষমা করা শক্ত নয় তো! যা কেড়েছিলেন, তা আবার ঐ হাতেই আমায় ফিরিয়ে দিলেন···তেমনি অমলিন, তেমনি শুভ্র!

কিরণ মন্টির মাথায় হাত দিয়া বলিল,—এ যে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেচে মা···

রঘুনাথ বলিল,—ওকে যে ফিরে পেয়েচি···তবে, ভাগ্যে ওর এই বিপদ হয়েছিল, না হলে এ সুখ যে আয়ত্তের বাইরেই থেকে যেতো!

কিরণ বলিল,—রজনীবাবুর মুখে শুনলুম! আজকের বিপদগুলো এমন সম্পদ বুকে নিয়েও এসেছিল,···আশ্চর্য্য!—তা আমি মেয়েটাকে নিয়ে যাই·· একটু কিছু মুখে দিক্। আহা, মুখখানি শুকিয়ে উঠেচে একেবারে···এসো তো মা···বলিয়া কিরণ মন্টিকে লইয়া চলিয়া গেল।

রজনী বলিল,—আজ আপনারা কাথাবার্ত্তা কন্—কাল আপনার সঙ্গে দেখা করবো এসে। আমার মা পেয়েচি···জীবনে মাকে কোনদিন জানিওনি, তাই এত কষ্ট! তাই এমন একটা জ্বালার মত চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছিলুম, মানুষ হইনি!···আজ আশা হয়েচে মার পায়ের তলায় পড়ে এবার বুঝি মানুষ হবো!

রঘুনাথ ও লক্ষ্মীকে আর একবার প্রণাম করিয়া রজনী বিদায় লইল।

সে চলিয়া গেলে রঘুনাথ ও লক্ষ্মী দুইজনে কতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—লক্ষ্মী মাটীর দিকে মুখ নত করিয়া, আর রঘুনাথ দুই চোখের ক্ষুধিত তৃষিত দৃষ্টি লইয়া লক্ষ্মীর পানে চাহিয়া!

বহুক্ষণ এমনি থাকিবার পর রঘুনাথ একটা নিশ্বাস ফেলিল, তার পর ধীরে ধীরে আসিয়া লক্ষ্মীর হাত দুখানি নিজের হাতে তুলিয়া ধরিল, ডাকিল,—লক্ষ্মী···

লক্ষ্মীর সর্ব্বশরীর আবার কাঁপিয়া উঠিল। তার বুকের মধ্যে বিদ্যুতের তরঙ্গ ছুটিল।

রঘুনাথ বলিল,—এত কষ্ট সয়েচো তুমি লক্ষ্মী·· আমি স্বামী, আমি তোমায় রক্ষা করতে পারিনি, তোমার সম্মান রক্ষার জন্ম কোন আয়োজন করি নি···

লক্ষ্মী রঘুনাথের পায়ের উপর পড়িয়া বলিল,—আমায় ক্ষমা করো। তোমাদের দেখেচি, আর আমার কোন সাধ নেই! আমি এবার মরতে চাই—দয়া করে আমায় সে অনুমতি দাও···

রঘুনাথ বলিল,—এ কথার মানে কি, লক্ষ্মী ?

লক্ষ্মী আবেগের সহিত বলিল,—না, না, আমি এ কথা অনেকদিন থেকে ভেবে রেখেচি·· তোমার ঘরে আর আমার ঠাঁই নেই। সব শান্তি নষ্ট করবে তুমি আমার জন্য...? না, তা হবে না! পাড়ার লোক পাঁচ কথা বলবে, তা সহ্য করে ? না, না···

রঘুনাথ বলিল,—সে সব কথা আমি গ্রাহ্যও করি না। তারা কি আমার মত তোমায় জানে ?

লক্ষ্মী বলিল,—তবু সে সমাজ···

রঘুনাথ বলিল,—এটা সত্যযুগ নয়, ত্রেতাও নয় যে সমাজের জন্য আমি মানুষ হয়ে আমার নির্দ্দোষ নিষ্কলঙ্ক স্ত্রীকে ত্যাগ করবো! মানুষের মন যে না ছাখে, সমাজের সে কেউ নয়, কেউ হতে পাবে না কোনদিন। আগে মানুষ, তার পর সমাজ!

লক্ষ্মী বলিল,—কিন্তু আমার উপর এত বিশ্বাস···

রঘুনাথ তাকে একেবারে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল,—তোমায় অবিশ্বাস করলে আমার নিজের উপরও যে সব বিশ্বাস হারাবো, লক্ষ্মী। তোমার মন···? এতদিনেও কি তার কোনো খানটা আমার জানতে বাকী আছে ? তুমি কি শুধু আমার ঘরের ঘরণী ? তুমি যে আমার প্রাণের প্রেয়সী···

তার পর রঘুনাথ বলিল,—সে দিন নদীর ধারে এসে যখন দেখলুম, ওপারের আকাশ রাঙা হয়ে উঠেচে, বুকের মধ্যটা এমন দুলে উঠলো···তবু এ কথা স্বপ্নেও ভাবিনি যে এত বড় বিপদ আমারি কপালে ঘটচে!···বলিতে বলিতে তার স্বর গাঢ় হইয়া উঠিল; চোখের সামনে অমনি ফুটিরা উঠিল, বায়োস্কোপের পটে চলন্ত ছবির মতই সেই আগুনে-রাঙা আকাশ, লোক-জনের চীৎকার! তার পর—শূন্য ঘর! পাড়ার লোক আসিয়া কতজনে কত কথাই বলিয়া গেল! অসহ্য সে সব কথার হাত এড়াইতে মন্টিকে লইয়া রঘুনাথ দেশ ত্যাগ করিল।···পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইয়াছে,···শেষে এক পূজারী ব্রাহ্মণ, মেয়ের শোকে কাতর হইয়া পড়িয়া ছিল; সেই-ই বুক পাতিয়া দুইজনকে ঠাঁই দিয়াছে! আর যতীশ, যতীশের মা ···তাঁদের কথা সোনার অক্ষরে বুকে লেখা থাকিবে চিরদিন!

রঘুনাথ আজই ভাবিয়াছিল, এই মোটরে ধাক্কা খাওয়ার ফলে যদি মন্টির বেশী অসুখ হয়···তাহা হইলে এ কুঁড়ে ঘরে কে দেখিবে ? তাছাড়া যতীশ বলিয়া গিয়াছে, কাল সকালেই সে আসিয়া তাঁদের লইয়া যাইবে, কোন কথা শুনিবে না। মন্টি যে চোট পাইয়াছে,—এখানে কে তাকে দেখিবে ?

রঘুনাথ সব কথা খুলিয়া বলিল। লক্ষ্মী বিভোর মন লইয়া শুনিতেছিল। রচা এ কার দুঃখের কাহিনী যেন শুনিতেছে! এ লোকগুলি যে তারই প্রাণের জন—এ কথাও ভুলিয়া যাইতেছিল—গাঢ় সমবেদনায় লক্ষ্মীর দুই চোখ দিয়া কেবলি অশ্রু ঝরিতেছিল।

রঘুনাথ একটা নিশ্বাস ফেলিল, নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—মন্টির কথা আজই যতীশের মা বলছিলেন,—যে, ওকে আমার হাতে দাও, ওটিকে আমি নেবো। আমার যতীশের জন্য।···

লক্ষ্মীর বুক দারুণ উত্তেজনায় দুলিতে লাগিল। সে বিমূঢ়ের মত দুই চোখে জলের ধারা দুলাইয়া বসিয়া রহিল।

রঘুনাথ লক্ষ্মীকে প্রাণ ভরিয়া দেখিতেছিল,—এই তার প্রাণের প্রেয়সী, কতদূরে গিয়াছিল, কি দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের আড়ালে···! আজ আবার তার চোখের সামনে তার বাহুর বাঁধনে সে ফিরিয়া আসিয়াছে।···

রঘুনাথ লক্ষ্মীর মুখখানি টানিয়া মুখের কাছে আনিল —যেমন চুম্বন করিতে যাইবে, অমনি দ্বারের পাশে কিরণের স্বর শুনা গেল। কিরণ বলিল,—কিন্তু একটি কথা মেয়ের সঙ্গে ঠিক হয়ে গেছে, বুঝলেন রঘুনাথ বাবু, ঘর-দোর আমার এই মেয়েটির অভাবেই এতদিন অপূর্ণ ছিল, আজ সে এসে একে পূর্ণ করেচে! ঘর আমার আলো হয়ে উঠেচে, তার উপর আপনাদের হাসির আলো···ঘর আজ আমার আলোয় আলো! এ আলোর মুখ যে কখনো দেখিনি আমি···

বলিতে বলিতে কিরণের স্বর আর্দ্র হইয়া আসিল; সে স্বরে মিনতি ভরিয়া সে আবার বলিল,—এ আলো নিবিয়ে দিয়ে আমার এ ঘর আর আঁধার করে চলে যাবেন না···

রঘুনাথ ও লক্ষ্মী দুইজনেই বিস্মিত চোখে ফিরিয়া দেখিল, সামনে মন্টি—তার মুখ পুলকের দীপ্তিতে উজ্জ্বল! আর কিরণ···তার দুই চোখের কোলে জল একেবারে টলটল্ করিতেছে!

রঘুনাথ তার পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া বলিল,—আপনার কথা আমাদের কাছে দেবীর আদেশ! তার যদি অপমান করি, তাহলে সমস্ত পৃথিবী আমাদের পায়ের তলা থেকে ঘৃণায় সরে যাবে!

সমাপ্ত

# মুক্ত পাখী

[ উপন্যাস ]

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

---

সাহিত্য-রসিক বন্ধু

শ্রীমান্ অমরেশ শিকদার

প্রীতিভাজনেষু

ভাই অমরেশ

আমার লেখা তোমার ভালো লাগে। আমার বই তোমার কাছে আদরের জিনিষ। মুক্ত পাখীকে তুমি সোনার চোখে দেখেছো। ছাপার অক্ষরে এ বইখানিকে দেখবার আগ্রহ তোমার অসীম! তার উপর তোমার মন অন্ধ সংস্কার-পাশ থেকে কতখানি মুক্ত, কি সহানুভূতিতে ভরা, আমি তা জানি। তাই এ বইখানি তোমায় দিলুম।

সৌরীন্দ্র

# পূর্ব্ব-কথা

মুক্ত পাখী প্রকাশিত হইল।

দীপ্তি-চরিত্রের আভাস পাইয়াছি গ্রাণ্ট-আলেনের লেখা The Woman Who Did উপন্যাসের হার্ম্মিনিয়ার চরিত্র হইতে। গোড়ার দিকে এ চরিত্রের ব্যঞ্জনায় হার্ম্মি-নিয়া চরিত্রের অনুসরণও করিয়াছি কতকটা। অরুণ উক্ত উপন্যাসের মেরিক-চরিত্রের ছায়ায় রচা। তবে উপন্যাসের গতি এবং দীপ্তি-চরিত্রের পরিণতি প্রভৃতি সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নিজস্ব ভঙ্গীতেই রচনা করিয়াছি। ক্ষিতীশ, বিমল, প্রভা, হিরণ প্রভৃতি চরিত্র কাহারো ছায়ায় রচা নয়—সেগুলি সম্পূর্ণ মৌলিক। তাদের ছাঁচ আমারি তৈয়ারী। অর্থাৎ এ বইয়ের outlineএর জন্য মাত্র আমি গ্রাণ্ট আলেনের কাছে ঋণী।—এ গ্রন্থকে গ্রাণ্ট আলেনের বইয়ের মর্ম্মানুবাদ বা ছায়ানুবাদ বলিয়া যেন কেহ মনে না করেন।

তবে অনেকে হয়তো বলিবেন, এ সমস্যার কথা দেশে যখন আজ ওঠে নাই, তখন কেনই বা তোলা! আমি বলি, উপন্যাস-লেখকের কারবার শুধু বর্ত্তমানকে লইয়া নয়! বহু-দূর ভবিষ্যতের পথে বিচরণ করিবার অধিকার তাঁর অবাধ ও অব্যাহত চিরদিন। এ কথা যাঁরা মানেন না, তাঁরা দয়া করিয়া এ উপন্যাস পড়িবেন না। তাঁদের জন্য এ উপন্যাস লিখি নাই। প্রাণ যাঁদের বিশ্ব-প্রসারী সহানুভূতিতে ভরা, কল্পনা যাঁদের মুক্ত গগন-বিহারী, তাঁদের জন্যই মুক্ত পাখী লেখা। তাঁদের প্রাণে মুক্ত পাখী যদি একটু সাড়াও তুলিতে পারে, তাহা হইলেই শ্রম সফল মনে করিব।

৮২।৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা,
২০এ চৈত্র, ১৩৩১

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

…সংসার কঠিন বড়, কারেও সে ডাকে না,—
কারেও সে ধরে রাখে না…
যে থাকে সে থাকে, আর যে যায় সে যায়,
কারো তরে ফিরেও না চায়!…

* * * *

তোমার ব্যথা, তোমার অশ্রু তুমি নিয়ে যাবে,
আর তো কেহ অশ্রু ফেলিবে না!

—রবীন্দ্রনাথ

# মুক্ত পাখী

১

যদুপতি সেন দার্জ্জিলিঙে ওকালতি করিতেন। সেখানেই একটা পাহাড়ের উপর ছবির মত তাঁর বাড়ী, দার্জ্জিলিং-বাসী বা প্রবাসী বাঙালীদের কাছে মস্ত আরামের জায়গা। বাড়ীর সামনে ছোট-বড় পাহাড় সিঁড়ির মত কোথায় কত নীচে নামিয়া এক ক্ষেতে গিয়া মিশিয়াছে—সেখানে পাহাড়ীদের ছোট-ছোট ক্ষেত; আর বাড়ীর ঠিক পিছন-দিকে দেওয়ালের মত আড়াল তুলিয়া পাহাড় উঠিয়াছে। পাহাড়ের মাথায় বরফ জমিয়া থাকে, তার উপর সূর্য্য-কিরণ পড়িলে বাহার যা হয়, তাহা দেখিয়া নিতান্ত নীরস চিত্তও আনন্দ-রসে ভরিয়া ওঠে।

যদুপতি সেন এখন পরলোকে। তাঁর দুইটি ছেলে বিলাত গিয়াছে, আইন পড়িবার জন্য। বাড়ীতে ভৃত্য-পরিজন লইয়া যদুপতি বাবুর স্ত্রী মাতঙ্গিনী দেবী একা বাস করেন। তাঁর আতিথ্যে মুগ্ধ নন্, দার্জ্জিলিঙে এমন বাঙালী আজ পর্য্যন্ত পদার্পণ করেন নাই!

যদুপতি সেন ছিলেন অমায়িক নব্য মতের লোক। আমাদের চিরাচরিত কুসংস্কার ঠেলিয়া যাহা সত্য, সংস্কার-মুক্ত, উদার, তাহারি তিনি সমাদর করিতেন। স্ত্রী-শিক্ষা বা স্ত্রীলোকদের স্বাধীন অব্যাহত বিচরণ—এগুলার সম্বন্ধে কলিকাতার বাহিরে যে সব শিক্ষিত বাঙালী বাস করেন, তাঁদের অভিমত সাধারণতঃ একটু উদার হইয়া থাকে। যদুপতি বাবুর সে উদারতা তো ছিলই,—তাছাড়া তিনি এমন মতও প্রকাশ করিতেন যে, স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশায় সর্ব্বপ্রকার সহায়তা করা সকলের উচিত—কারণ, তাহা হইলে উভয়েরই মনের ভিতরকার যা-কিছু মিথ্যা কুণ্ঠা বা সঙ্কোচ, সে-সব দূর হইয়া পরস্পরের মধ্যে এমন সখ্যের সম্পর্ক স্থাপিত হইবে, যাহা দেশে বহু কল্যাণের সৃষ্টি করিবে। তার উপর নর-নারী এ দৃশ্য দেখিয়া তাহাদের সঙ্কীর্ণ চিত্তকে শুদ্ধ করিয়া নীচ গ্লানি বা কুৎসার কালিতে নিজেদের মনুষ্যত্বকে গাঢ় কালো করিয়া তুলিবার কল্পনা কখনো করিতে পারিবে না! মাতঙ্গিনী দেবীকে তিনি এই ভাবেই গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাহারি ফলে তাঁর বাড়ীটি অতিথিবর্গের একটি রমণীয় সুখ-নীড়ে পরিণত হইয়াছিল! মাতঙ্গিনী দেবী সে নীড়ে অভ্যাগতদের তৃপ্তি-সাধনে আপনাকে যেন উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন।

ধর্ম্ম-সম্বন্ধেও যদুপতি বাবুর মত কোনো সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। দেব-দেবীর প্রসাদ-ভিক্ষা বা মন্দিরে গিয়া বক্তৃতা শোনা কি উপাসনা করা ছাড়িয়া তিনি মনুষ্যত্বের পূজাই মানব-জীবনে সার ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। মানুষকে ঘৃণা না করিয়া তাহার সেবায় মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশ লাভ করে, ইহাই ছিল তাঁর অভিমত; এবং এই অভিমত-মত কাজ করিতে কোনদিন তিনি পরাঙ্মুখ ছিলেন, এমন কথা অতি-বড় নিন্দুকও নিন্দার ছলে তুলিতে পারে না! মাতঙ্গিনী দেবী স্বামীর মতকে শিরোধার্য্য করিয়া আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছেন,—সে বিষয়ে এতটুকু কুণ্ঠা তাঁহাকে কোন-দিন বিচলিত করে নাই!

বাড়ীর বাহিরের বারান্দায় বসিয়া মাতঙ্গিনী দেবী এক তরুণ যুবার সহিত কথা কহিতেছিলেন। কাল প্রভাত—পাহাড়ের গায়ে তুষার-স্তূপের উপর রৌদ্র-কিরণ পড়ায় তাহা সোনার মত ঝক্‌ঝক্ করিতেছিল!

যুবার নাম অরুণ মিত্র। অরুণ কলিকাতায় ব্যারি-ষ্টারী করে; পূজার বন্ধে সে আসিয়াছে দার্জ্জিলিঙে বেড়াইতে। আইভি-লজে একটা সজ্জিত কামরা সে ভাড়া লইয়াছে। অরুণের পিতা অভয় মিত্র কলিকাতার এক জন প্রসিদ্ধ ডাক্তার। অভয় মিত্রের সঙ্গে যদুপতি বাবুর খুব অন্তরঙ্গতা ছিল।

মাতঙ্গিনী দেবী তাই অনুযোগ করিতেছিলেন, তাঁর বাড়ীতে যথেষ্ট জায়গা থাকা সত্ত্বেও অরুণের স্বতন্ত্র বাসায় ঘর ভাড়া লইয়া থাকায় তিনি ভারী ক্ষুব্ধ হইয়াছেন!

অরুণ একটু কুণ্ঠিতভাবে কহিল,—আপনার এখানে হয়তো নানা অতিথি এসে ভিড় জমিয়ে আপনাকে ঘর-ছাড়া করেচে, এই ভেবেই আমি আলাদা বাসা নিয়েচি··· না হ'লে আপনার স্নেহ ঠেলে কে দূরে থাকিতে চায়, বলুন!

মাতঙ্গিনী দেবী বলিলেন,—তোমাদের আজকাল-কার ছেলেদের মুখখানিই সব। মুখ-সর্ব্বস্ব হলে চলে কখনো, বাবা! তোমাদের স্বাধীনতার মাত্রা এমন বে-ওজনে তোমরা চালাও যে, এর দরুণ প্রীতি-আত্মীয়-তায় কতখানি আঘাত লাগে, তা তোমরা ভেবে দ্যাখো না!··· তুমি আসবে আমার এখানে, তাও কি খপর দিতে হবে? না, এখানে জায়গা হবে কিনা, তার খোঁজ নেবে! এ বাড়ী তুমি নিজের বাড়ীর মত ভাবতে পারো না,

সেইটেই আসল কারণ···নয় কি? কথাটা বলিয়া মাতঙ্গিনী দেবী মৃদু হাসিলেন।

অরুণ বলিল,—সত্যি তা নয়।

মাতঙ্গিনী দেবী বলিলেন,—বেশ, তা যদি নয়, তা হলে এখানে না এসে যে-অপরাধ করেচো, তার প্রায়শ্চিত্ত করো।

—কি করতে হবে, বলুন···

—আইভি-লজের ডেরাডেণ্ডা তুলে এখানে চলে এসো।···তোমার বাবাই বা কি ভাববেন, বলো দিকি··· যে, এখানে আমি থাকতে ছেলে গিয়ে উঠলো হোটেলের মত একটা বাসায়! ···ছাখো, ইংরেজের যে স্বাধীনতা শোভা পায়, আমাদের তা সাজে না। আমাদের ধাতুই আলাদা ভাবে গড়া।···ওদের রক্ত বলচে, ছাড়ো, ছাড়ো! শুধু নিজে, নিজের মন, নিজের হাত, নিজের পা···দাঁড়াও কেবল আপন-জোরে, আপনার মাথা উঁচু করে···আশে-পাশে চেয়ো না। নিজেকে খাড়া করতে যদি আশপাশ ছেঁটে ফেলবার দরকার হয়, তাও ছাঁটো! আগে নিজেকে ছাখো, তার পর আর-সবের কথা ভেবো—আর তাও ভাববে, সে-সব যদি তোমার কাজে লাগে, তবেই!··· আমাদের ধাতে তা পারা যাবে কেন? আর পাঁচজনকে নিয়ে আমরা দাঁড়াই। সে-পাঁচজনকে ছাড়লে আমরা বড় একা, বড় নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ি। আমরা চাই চারিদিক নিয়ে উঠতে···আমাদের সঙ্গে সবাই চলুক! নিঃসঙ্গতা তাই আমাদের বিষের মত বাজে! এই ছাখো না, ট্রেণে কলকাতা থেকে সিম্‌লে যেতে গেলে কামরায় যদি ছুটি বাঙালী থাকে তো তাদের কত আলাপই হয় দুজনে,— কি মেলামেশা হয়ে যায়! দুদণ্ডে পরস্পরকে কত কালের আপনার বলে ভাবি, সুখ-দুঃখের কথায় কত দরদ জাগে! আর ওরা? পাঁচজন থাকলেও সেই একখানা খবরের কাগজ নিয়ে আড়াল তুলে সেটা তিরিশ বার পড়বে, তবু পাশের সহযাত্রীটির সঙ্গে ভুলেও আলাপ করবে না! আমাদের মত সামাজিকতা কারো আছে আর? পুরোনো চাকর-বাকরকে অবধি খুড়ো জ্যাঠা দাদা বলে আপনার করে নি! ওদের কাছ থেকে ভালো পাবার ঢের আছে, মানি। সেগুলো নাও! তা বলে নিজেদের ভালোগুলোকে বিসর্জ্জন দিয়ে···? তা নয়। বুঝলে বাবা!

অরুণ অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। সে বলিল, —আমার অন্যায় হয়েচে···

মাতঙ্গিনী কহিলেন,—গুলু, টেঁপু, এরা থাকলে কি তোমায় ওখানে থাকতে দিত! জোর করে এখানে টেনে আনতো! আমি মেয়ে-মানুষ,—প্রাণে মমতাই আছে, গায়ে জোর তো নেই!

অরুণ বলিল,—আচ্ছা, যখন ঘর নিয়েচি, তখন রাত্রে গিয়ে সেখানে শোবো। আমার খাওয়া-দাওয়া এখানেই হবে, আপনার এই স্নেহের নীড়ে। তবে বাসাটা নিয়েচি, টাকাও যখন দিয়েচি, তখন সে হক্ ছাড়বো কেন!

মাতঙ্গিনী দেবী সে কথার কোন জবাব দিলেন না। তাঁর দৃষ্টিপথে তখন এক তরুণীর উদয় হইয়াছিল। পথ দিয়া তরুণী এই দিকে আসিতেছিল।

মাতঙ্গিনী দেবী বলিলেন,—তোমার সঙ্গে একটি মেয়ের আলাপ করিয়ে দেবো। বেশ মেয়েটি···আসচে ঐ···

অরুণ চাহিয়া দেখিল, এক তরুণী রূপের হিল্লোল তুলিয়া পাহাড়ের গায়ের উপর তৃণাস্তীর্ণ পথ ধরিয়া চারিদিকে বিদ্যুৎদীপ্তি বিকশিত করিয়া এই দিকেই আসিতেছে। গতি কি কুণ্ঠাহীন!···

মাতঙ্গিনী দেবী কহিলেন,—এর সঙ্গে বনবেও তোমার! শুধু কি অপূর্ব্ব রূপে রূপসী ও···তোমাদের সমাজ-স্বাধীনতার সম্বন্ধে যা মত, এ মেয়েটি যেন সেই মতই সজীব হয়ে উঠেচে!···ব্রাহ্ম সমাজের একজন মস্ত প্রচারকের মেয়ে, এই দীপ্তি!

—ব্রাহ্ম! অরুণ একটু কুণ্ঠিত হইল। সে কহিল, —একটা গণ্ডীঘেরা জীবনের মধ্যে···বলিয়া সে একটু থামিল। পরে কহিল,—দেখুন, এই যে ধর্ম্মের নামে ভেদ টানা, আমি এর বিরোধী। এতে মনের স্বাধীন অব্যাহত গতি তার স্বচ্ছন্দ লীলায় অগ্রসর হতে বাধা পায়!···আমরা হিন্দু বা ব্রাহ্ম কিছু থাকতে চাই না। আমরা মানুষ, এইটেই শুধু আমাদের একমাত্র পরিচয় হবে! তা ছাড়া আর-কোনো উপাধির উপসর্গ আমাদের আক্রমণ করবে না—আমি এই চাই।

মাতঙ্গিনী বলিলেন,—তা দীপ্তি ঐ নামেই ব্রাহ্মর মেয়ে!···সে যে কোন্ ধর্ম্ম মানে, তা বুঝি না!

শুনিয়া অরুণ খুশী হইল, এই তো চাই! যে-তরুণীটি দেখিতে এমন রূপসী, তার মনটাও তেমনি রূপের আলোয় ভরপুর না হইলে চলে! সেখানে বদ্ধ সংস্কারের অন্ধকার জমা থাকিলে পরিতাপের যে সীমা থাকে না!

তরুণী বাড়ীর ফটক পার হইয়া লনে আসিলে মাতঙ্গিনী দেবী উঠিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন,— এসো মা···

তরুণী কহিলেন,—একটু বেলা হয়ে গেল আজ! আমার ঐ ম্যাথরের বৌটির অসুখ করেচে, ম্যাথর এসে বললে। তাই তাকে দেখতে গেলুম। তা সর্দ্দি-জ্বর, ভয় নেই!...তাকে দেখে বাড়ী ফিরে তার জন্যে একটা হোমিওপ্যাথি ওষুধ পাঠালুম, তাতেই দেরী হয়ে গেল।···

অরুণ দেখিল, সে এক জন অপরিচিত যুবা এখানে

থাকিলেও দীপ্তির কথায় বা ভঙ্গীতে এতটুকু সঙ্কোচ ফুটিল না। কি অম্লান অকুণ্ঠিত তার ভঙ্গী! সে তো নব্য সমাজের বহু তরুণীর সঙ্গে মিশিয়াছে, কিন্তু তাদের যে সেই একটা লোক-দেখানো লজ্জার ভঙ্গী! কি বিশ্রী কুৎসিত! তা দেখিলে মাথা লজ্জায় হেঁট হইয়া যায়! তাদের সে লজ্জা, সে সঙ্কোচ এমন ব্যবসাদারী বেসাতির মত দেখায়! এই তরুণীর ভঙ্গীর কাছে সেটা অত্যন্ত কৃত্রিম মনে হইল!···

মাতঙ্গিনী দেবী বলিলেন,—দীপ্তি, তোমার সঙ্গে এর আলাপ করিয়ে দি, এসো মা! এ আমাদের অরুণ... সম্পর্কে আমার ভাগুর-পো···কলকাতায় থাকে। ব্যারিষ্টার। অল্প দিন বেরুলেও বেশ পশার করেচে!··· কেন করবে না? বুদ্ধিমান ছেলে! তা ছাড়া তোমাদের দলেরই, মা...স্বাধীনতা সম্বন্ধে তোমাদের মত একই কি না। আর এটি হলো দীপ্তি···এঁর বাবা পশুপতি চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্ম-সমাজের একজন গণ্যমান্য আচার্য্য।

মৃদু হাসিয়া দীপ্তি বলিল,—কিন্তু আমি ব্রাহ্ম নই, পিশিমা···

মাতঙ্গিনী দেবীকে দীপ্তি পিশিমা বলিয়া ডাকে।

মাতঙ্গিনী দেবী বলিলেন,—সে কথা অরুণকে বলেচি আমি। তা অরুণও তাই···ভুলেও কখনো কোন দেবতার মন্দিরে প্রণাম করে না! কেউ ব্রাহ্ম বললে ক্ষেপে তাকে মারতে ওঠে!···আর সমাজ-ধর্ম্ম সম্বন্ধে মতামত এমন যে, তোমাদের মধ্যে কে সেরা, তার বিচার করা এক শক্ত ব্যাপার।···তোমরা আলাপ করো —আমি খাবার আনি।

দীপ্তি বলিল,—তোমার হাতের রসগোল্লা যদি থাকে তো দিয়ো, বিস্কুট-মিস্কুটগুলো ভারী একঘেয়ে লাগে, পিশিমা।

অরুণ এই তরুণীর ব্রীড়াহীন স্বচ্ছন্দ কথা-বার্ত্তায় মুগ্ধ হইয়া তাহার পানে চাহিয়া ছিল।

মাতঙ্গিনী দেবী হাসিয়া বলিলেন,—রসগোল্লার উপর তোর একটু দরদ বেশী,—না রে দীপ্তি? বলিয়া তিনি উঠিয়া ঘরের মধ্যে গেলেন।

দীপ্তি বলিল,—পিশিমাকে রোজ আমি জ্বালাতন করি!···তা কি করি বলুন, পিশিমার হুকুম কি? না, আমাকে মুখ ধুয়ে একেবারে এখানে আসতে হবে! চা বলুন, খাবার বলুন, এখানেই খেতে হবে!···পিশিমা আমায় ভারী স্নেহ করেন!···কাকেই যে না করেন! আপনার কথা পিশিমার কাছে প্রায় আমি শুনি। আপনি ওঁকে লিখেছিলেন, ছুটীতে এখানে আসতে পারেন বেড়াতে,...তা আপনি বুঝি কাল এসেচেন? খপর দেন নি তো!

অরুণ বলিল—না, আমি এখানে উঠি নি। আমি এসে উঠেচি আইভি-লজে।

দীপ্তি কহিল—কেন, এখানে রইলেন না যে! পিশিমা তো এমনি কথাই বলছিলেন···

অরুণ বলিল—ভাবলুম, এখানে হয়তো অনেক যাত্রী এসে ভিড় জমিয়ে দেছে। এঁর বাড়ী তো বারোমাসই অতিথশালা। অরুণ হাসিল।

দীপ্তি বলিল—সে কথা সত্যি! পয়সা থাকে ঢের লোকের—কিন্তু তার সদ্ব্যবহার জানে ক'জন! তা ছাড়া পয়সা থেকেও যদি মানুষ সামাজিক হতে না শিখলো, আর-পাঁচজনকে নিজের চরিত্রের প্রভাব না জানিয়ে দিল, তা হলে মানুষ হয়ে জন্মাবারও কোন সার্থকতা থাকে না।

অরুণ কহিল,—আপনি কি এখানেই থাকেন?

দীপ্তি কহিল,—না, আমিও ছুটীতে বেড়াতে এসেচি।

অরুণ কহিল,—আপনি কি বেথুনে পড়চেন? কথাটা বলিয়া একটু যেন কুণ্ঠিতভাবেই সে উত্তরের প্রতীক্ষায় দীপ্তির পানে চাহিল।

দীপ্তি কহিল,—না। পড়তুম বটে! তবে···ছেড়ে দিয়েচি!···ফোর্থ ইয়ারে পড়তে পড়তেই ছেড়ে দিলুম। বলিয়া সে একটু থামিল, পরে কহিল,—ইউনিভার্সিটির একটা ডিগ্রী কুড়িয়ে কি বা এমন লাভ হবে, তাও বুঝি না! জীবনটা চারিধার থেকে কেমন নাগপাশে জড়িয়ে পড়ছিল। বাঁধা রুটীনের চাপে। তা ছাড়া যাদের সঙ্গে পড়ছিলুম, দেখলুম, তাদের লক্ষ্য শুধু এই ডিগ্রী নেওয়ার দিকে—মনটার প্রসার হবে কি করে, তার কথা কারো মনে স্থান পায় না! অর্থাৎ দেখুন, চারিধারে এই যে মস্ত একটা কলরব পড়ে গেছে,—সাম্য-সাম্য, মেয়েদের পুরুষের সঙ্গে সমকক্ষ করে তোলো, সব দিক দিয়ে মুক্ত আলো, মুক্ত বাতাস ছিটিয়ে প্রাণটা ওদের ভরে দাও,— মুক্তির জন্য এই যে আকুলতা, এ কি সত্যই অন্তরের কামনা? না, শুধু লোক-দেখানো ঠাট মাত্র? দীপ্তির কথার সঠিক অর্থ ঠিক বুঝিতে না পারিয়া অরুণ তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

দীপ্তি কহিল,—এই যে শিক্ষা দেওয়া চলেছে, এ শিক্ষা মনকে কতখানি গড়ে তুলচে! একটুও না। সেই বদ্ধ সংস্কারের মধ্যে মন যেমন আচ্ছন্ন ছিল, তেমনি থাকচে! তার পর মুখে যত আন্দোলনই চলুক— মেয়েদের বেঁধে রেখো না, বাঁধন থেকে মুক্তি দাও, তাকে মুক্ত আকাশের পাখী করে তোলো—আসল কাজে তা হচ্ছে কি? বি, এ পাশ করেও তারা সেই দাস্য-লীলায় জীবনকে চুবিয়ে ধরচে! সেই ঘরকন্নার পাঠ, সেই রেঁধে-বেড়ে স্বামীর পথ চেয়ে বসে থাকা—গৃহে স্বামী সেই প্রভুর মত আদেশ করছে, আর স্ত্রী নির্ব্বিচারে তা

পালন করে চলেছে! কোথায় সে বন্ধুত্ব, সখ্য! কলেজে পাশ করে মেয়েরা জীবনে তার কি ফল পাচ্ছে, বলুন তো?

অরুণ কহিল,—আমারো ঠিক ঐ মত।···তবে তার বেশী এটুকু আমি বলি যে, পুরুষদের শিক্ষাই বা কি হচ্ছে, বলুন তো! মানুষ তৈরি হচ্ছে? ইউনিভার্সিটি থেকে ছাপ নিয়ে বেরিয়ে ওকালতি করতে গিয়ে নির্ম্মম চাপে হয় সব মক্কেলের হাড়-পাঁজরা ভেঙ্গে চূর্ণ করে দিচ্ছি, না হয় ডাক্তারী, কি পাটের দালালি করচি! এতে টাকা-কড়ি হলো তো লোকে বললে, হ্যাঁ, একটা মানুষ হয়েচে বটে! মানুষের মাপকাঠি ঐ টাকার বস্তা! তা হলে তো আদর্শ মানুষ—আমাদের টাঁকশাল! কি টাকাটাই সে চাঁদি ভেঙ্গে ছেঁকে নিত্য বার করচে! তা ছাড়া দেখুন, ভালো ছেলের আদর্শ কি? না, যে কোঁৎ-কোঁৎ করে পড়া গেলে, আর এগজামিনের সময় হুড়-হুড় করে তা বমন করে দিতে পারে। এত-বড় বিশ্বজগৎ সমাজ যে আছে, এ-সবের কোন খোঁজ সে রাখে না—দুনিয়ায় মানুষ আছে, তা তার হুঁশও নেই! তার পর ললিত-কলা খেলাধূলা এদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না! তার পর পাশ-টাশ সেরে দেখি, সে দিবারাত্র ওষুধ খাচ্ছে, আর ঘর ছেড়ে খোলা একটু হাওয়ায় আসতে হলে গলায় কম্ফর্টার জড়াচ্ছে! না জানলো কখনো খেলতে, না জানলো প্রাণ খুলে চেঁচিয়ে হাসতে! এই আমি অক্সফোর্ডে ছিলুম তো—তা সেখানে প্লেটো এ্যারিষ্টটল, মিল, এ-সব পড়ার সঙ্গে সঙ্গে খেলাও ছিল কি প্রচুর! এখানে ছেলের দল একত্র হলে শুধু একই কথা, বার্কখানা কতদূর হলো? Dynamicsটা দেখা হচ্ছে না—এই নিয়েই সব মত্ত চব্বিশ ঘণ্টা! আর সেখানে ও সব বার্ক Dynamics কলেজে বা ক্লাশের মধ্যে—কলেজের বাইরে ক্রিকেট, বিলিয়ার্ড রোয়িং। তার পর বুড়োধাড়ি সব ছেলে একজনকে ধরে পাঁজাকোলা করে জলে চুবোচ্ছে! কি চীৎকার! কি মাতামাতি! এখানকার আট-দশ বছরের ছেলেগুলো সে-রকম কিছু করলে বাড়ীতে বাপ-মার চোখ কপালে উঠে যায়! এই তো জীবন!·· জীবনটাকে ফেলে ছড়িয়ে ঠিকভাবে ভোগ করতে যদি না পেলুম তো জীবনের সৃষ্টি হয়েছিল কেন? গাছ-পাথর হয়ে থাকলেও তো চলতো!

দীপ্তি কহিল,—ঠিক তাই। মানুষের মাথাই তো তার একমাত্র অঙ্গ নয় যে, শুধু ঐ মাথাকে গড়ে তুললেই মানুষ গড়া হবে! মানুষ গড়তে হলে তার হাত-পা, তার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তার প্রকৃতিটাকেই যে সঙ্গে সঙ্গে গড়ার দরকার! ভাবুন তা হলে, ছেলেদের সম্বন্ধে যখন এই ব্যবস্থা, তখন মেয়েদের দশা এদেশে কি ভয়ানক সাংঘাতিক!

অরুণ কহিল—আমার কি মত, জানেন?···আমি বলি, শিক্ষা দেবার আগে সকলকে বাঁধনের নিগড় থেকে মুক্তি দাও। আগে মনকে মুক্ত করো, তার পর শিক্ষা! তবেই না তার গড়ে ওঠাবার সম্ভাবনা ঘটবে!

দীপ্তি কহিল—এইটেই খাঁটি কথা।—তার পর দরদী শ্রোতা পাইয়া সে তার মনকে একেবারে আবেগে-উত্তেজনায় খালি করিয়া অরুণের সামনে ধরিয়া দিল। সে বলিল,—এই যে রাজনীতির ক্ষেত্রে আমাদের চেষ্টা বিফল হচ্ছে, এত বিরোধের মাঝে বারবার পথ হারাচ্ছি, এর মানে আর কিছু নয়! শিক্ষার অভাবে আমাদের মন স্বাধীনভাবে গড়ে উঠতে পারে নি, কাজেই আমাদের চেষ্টাকে আমরা আলোয় ভরিয়ে তুলতে পারচি না। মনের মধ্যটা সংস্কারের বদ্ধ অন্ধকারে ভয়ানক জমাট বেঁধে আছে—নিবিড় ছায়া! আলোর ক্ষীণ রশ্মি সে আঁধারকে ঠেলে হঠাতে পারচে না। তার উপর নারীর জাগরণ ব'লে যে চীৎকার উঠেছে—এ কি জাগরণ! জাগবার আগে চাই নিজেদের চেনা। তা কৈ সে নিজেদের চেনবার চেষ্টা? পলিটিক্সের আগে চাই সমাজে তুমুল পরিবর্ত্তন, ভেঙ্গে-চুরে তাকে একেবারে স্বাধীনভাবে নতুন করে গড়ে তোলা! এই যে জাতিভেদ, সামাজিক আচারের পার্থক্য, ধর্ম্মের পার্থক্য, এ সব গণ্ডীও মানুষকে এক হতে দিচ্ছে না। এ সব বাঁধন ভেঙ্গে মানুষ যদি একবার মিলতে পায় যথার্থ প্রাণে-প্রাণে, তা হলে তাদের সেই সম্মিলিত শক্তি যে-কাজে হাত দেবে, তাতে তার জয় হবেই!

অরুণ কহিল—আপনার বাবা এ-সম্বন্ধে কি বলেন?

দীপ্তি কহিল—বাবা! তাঁর মত! আপনি কি বলতে চান, আমার এতখানি বয়স হয়েচে, আমার নিজের কোন মত থাকবে না! বাবার যেমন মত আছে, আমারো তো তেমনি একটা মত আছে! আমার স্বাধীন মতে তিনি কি বলে হস্তক্ষেপ করবেন! আমাদের দেশের পণ্ডিতের কথাই তো—প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ। আমি যে স্বাধীনতার কথা বলচি, তার মানে স্বাতন্ত্র্য! আচারে, কাজে, সব বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা চাই। এ শুধু প্রকাশ্য রাজপথে নারীর অবাধ বিচরণ নয়···সমাজে জীবনের প্রতি কাজে, প্রতি চিন্তায় স্বাধীনতার কথা বলচি আমি!

অরুণ কহিল,—কিন্তু,—তবু মেয়েরা যতই স্বাধীন থাকুন, পুরুষের কাছে একটু মাথা নোয়াতেই হবে!—ভাবুন, আপনি আপনার বাবার অধীন...তাঁরই পয়সায়···

দীপ্তি কহিল,—মোটে নয়। ঠিক ঐখানে বাধছিল বলে আমি লেখাপড়া ছেড়ে দিলুম। বাবার অর্থে আমার দিন চলছিল,·· ভাবলুম, কেন, আমি তো নিজেই পয়সা উপার্জ্জন করতে পারি! যদি কেউ স্বাধীনভাবে নিজেকে

গড়তে চায় তো তাকে সর্ব্বদিক দিয়ে পর-নির্ভরতা ছাড়তে হবে। নারীর এই অসহায়তার জন্তই তো সমাজে এত সব বিধি-নিষেধের সৃষ্টি হয়েচে। আমি চাই, জীবনে কখনো পুরুষের অধীন হবো না, নিজের স্বাধীন সত্তায় দিন কাটাবো,...চিরকাল। তাই আমি বেথুনে পড়া ছেড়ে মেয়ে-স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিয়েচি...কাগজেও কিছু কিছু লিখি...তাতেও কিছু রোজগার হয়। তাতে আমার বেশ স্বচ্ছন্দে দিন চলে যায়!...বিলাসিতা! তার কোনো প্রয়োজন নেই, জীবনে! না-ই হলো বিলাসিতা!

অরুণ কহিল,—তা হলে এখানে আপনি একলাই এসেচেন! আপনার বাবা-মা...

দীপ্তি কহিল,—একলাই এসেচি। ভেলু পাহাড়ের ধারে হেজ-হাউস্ বলে ছোট বাংলা, সেই বাংলায় আমি থাকি। লোকালয়ের একটু বাইরে। তা হলেও সেখানকার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য এমন যে, লোকজনের সঙ্গ পাবার জন্ম মন এতটুকু চঞ্চল হয় না!...কলকাতার মরুভূমি ছেড়ে এই শ্যামল বিজন গিরিগুহায় এসে প্রাণটা যেন মুক্তির নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছে!

অরুণ কহিল,—কিন্তু...একলা ঐ নির্জ্জন জায়গায়...

দীপ্তি মৃদু হাসিল। হাসিয়া কহিল,—আপনি আশ্চর্য্য হচ্ছেন কেন, বলুন তো! নারী একলা থাকতে পারবে না কেন?

অরুণ ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিল,—না, তা পারবেন না কেন! আমি সে কথা বলচি না—তবে পাঁচটা লোকে কি ভাববে, কি বলবে...! তাদের কৌতূহল...

হাসিয়া দীপ্তি কহিল,—লোকের বলার কি ভাবার দিকে আমি ভ্রূক্ষেপও করি না। আমি যেটা সত্য বলে মনে করবো, যেটাতে ভাববো কোন দোষ নেই,—তা করতে আমি কখনো কুণ্ঠিত বা বিচলিত হবো না! লোকে আমার কি জানে! তাদের বলা বা ভাবার পানে চেয়ে থাকলে দুনিয়ায় নড়া-চড়া করাই অসম্ভব হয়ে পড়বে!...বিবেচনা করার শক্তিমাত্র নেই, এমন অবিবেচক বক্তার কখনো অভাব নেই! কোনো দেশে নেই!

অরুণ কহিল,—আপনি এখানে কতদিন থাকবেন?

—আরো তিন হপ্তা। স্কুলের ছুটীটা আর কি এখানেই কাটাবো। কাজের ঢের কথা ভেবে আলোচনা করবারও অনেক সুযোগ পাই এখানে!...

মাতঙ্গিনী দেবী ফিরিয়া আসিলেন,—ভৃত্য একটা ট্রেতে করিয়া দুইজনের মত চা ও জল-খাবার আনিয়া টীপয়ের উপর রাখিল।

মাতঙ্গিনী দেবী হাসিয়া বলিলেন,—দুজনে খুব আলাপ হয়ে গেছে এর মধ্যে!...কেমন, আমি তো বলেছিলুম, যে, তোমাদের দুজনে বনবে খুব।

দীপ্তি কহিল,—এই তো পিশিমা, আমার কথা শুনে তুমি বলো, আমি পাগল! এঁরও ঠিক ঐ মত!

মাতঙ্গিনী দেবী বলিলেন,—কে? অরুণ! ও-ও কম না কি! বলেচি তো, তোমাদের মধ্যে কে সেরা, বলা শক্ত!

চা-পানের সঙ্গে সঙ্গে আরো নানা কথাবার্ত্তা হইল। তার পর দীপ্তি বেড়াইতে যাইবে বলিয়া উঠিল। উঠিয়া অরুণকে কহিল,—তা হলে বিকেলের দিকে আমার বাড়ী দেখতে আসচেন তো! সেখানে গেলে খুশী হয়ে যাবেন। পাহাড়ের ভীম-গম্ভীর মূর্ত্তি—সবুজ ঘাসের শ্যামল শোভা! ...আসচেন বিকেলে?

মুগ্ধ কৃতজ্ঞ চিত্তে অরুণ কহিল,—নিশ্চয়!

—বাড়ী চিনতে পারবেন?

—ঐ তো ভেলু পাহাড়ের কাছে। তা আর চিনতে পারবো না!

—আপনারা তা হলে বসুন—বলিয়া মাতঙ্গিনী দেবীকে প্রণাম করিয়া দীপ্তি চলিয়া গেল। অরুণ বিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিল। এতক্ষণ সে যেন স্বপ্ন দেখিতেছিল!

বেলা দুইটা বাজিতেই অরুণ বৈকালিক নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্ম বেশ-ভূষা আরম্ভ করিয়া দিল। যৌবনের ধর্ম্মই এই—তরুণীর আহ্বানে তরুণ চিরদিন নিজেকে সজ্জিত সুন্দর করিয়া তুলিতে চায়! বেশভূষা সারিয়া অরুণ দেখিল, এখনো অনেক দেরী। সময় যেন কাটিতে চাহিতেছে না! দুই-চারিটা পোষাক নাড়িয়া-চাড়িয়া আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া এতবার সে নিজেকে দেখিল,—তবু ঘড়ির কাঁটা কিছুতে যেন অগ্রসর হইতে চায় না!

অরুণের মনে হইল, হাত দিয়া দার্জ্জিলিঙের ভেলু পাহাড়ের ধারের পরিচ্ছন্ন বাঙলার সব ঘড়িগুলার ছোট কাঁটা যদি সে ঘুরাইয়া চারিটার ঘরে সরাইয়া দিতে পারিত!...সে জানিত না, যে-সময়টায় নিজেকে সে এত করিয়া সাজাইয়াও ঠিক মনের মত করিয়া তুলিতে পারিতেছে না, সেই সময়টায় দীপ্তি মাতঙ্গিনী দেবীর ঘরে বসিয়া তাঁহারি কথা শুনিতেছে।

মাতঙ্গিনী দেবী বলিলেন,—চমৎকার ছেলে এই অরুণ। মনটি শুধু যে শিক্ষায় ভরপুর, তা নয়, মা—ওর মনে যেমন দরদ, তেমনি স্নেহ! তা ছাড়া কুসংস্কারের ছায়া ওর মনে নেই!...মানুষের মধ্যে সব বৈষম্য কেটে দিয়ে সবাই মহা-মানবের অংশ হয়ে গড়ে উঠুক—এই ও চায়। তোমার সঙ্গে ওর মতও মেলে খুব!...তা ছাড়া কত বড় বংশের ছেলে। ওর বাপ কলকাতার এক জন মস্ত ডাক্তার। অগাধ পয়সার মালিক হ'লেও গরীব-

দুঃখীর কাছ থেকে একটি পয়সা নেন্ না। শুধু তাই নয়, গরীবের ডাকটিতে পয়সা না থাকলেও সেটিকে অগ্রাহ্য করেন না। মা মাটীর মানুষ ছিলেন। নেই! আজ দু'বছর স্বর্গে গেছেন!…আর ব্যারিষ্টারীতে এই অল্প দিনেই ও যা পশার করেচে, তাতে মনে হয়, ওর ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল।

ঘড়িতে বেলা তিনটা বাজিয়া গেল, তবু মাতঙ্গিনী দেবীর কথার আর শেষ নাই।—শুধু এই! অরুণ খুব ভালো ছবি আঁকিতে পারে। শুধু গাছপালা বা পাহাড় নদীর ছবি নয়! তুমি বসিয়া আছো, পেন্সিলের দুটা আঁচড়ে মুহূর্ত্তে তোমার এমন ছবি আঁকিয়া দিবে যে, তার কাছে ফটোগ্রাফ কোথায় লাগে! তা ছাড়া কাব্য-উপন্যাসের কত বিষয় লইয়া কত ছবি যে ও আঁকিয়াছে! ও একজন মস্ত গুণীন্ আর্টিষ্ট।

মাতঙ্গিনী দেবী হঠাৎ থামিয়া দীপ্তির পানে চাহিয়া রহিলেন, তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কতক আত্ম-গতভাবে কহিলেন,—দুটিতে মানায় বেশ। তা কি হবে! এ বন্ধুত্ব কি ওদের দুটিকে চির-জীবনের মত এক করে দেবে! শেষের কথাটা দীপ্তির কাণে গেল। দীপ্তি শিহরিয়া উঠিল, ডাকিল,—পিশিমা…

—কেন?

দীপ্তি মাতঙ্গিনীর পানে চাহিয়া কহিল,—কি যে বলো তুমি!

হাসিয়া মাতঙ্গিনী বলিলেন,—কি বলি?

দীপ্তি হাসিয়া অবিচল কণ্ঠে কহিল—আমায় তা হলে তুমি আজো চেনো নি পিশিমা! বিয়ে আমি কখনো করবো না, কখনো না!…এ আমার পণ!

মাতঙ্গিনী দেবী হাসিয়া কহিলেন,—অনেকে ঐ কথা বলে রে! তার পর ঠিক লোকটি এসে যখন চোখের সামনে দাঁড়ায়…! একজনকে না ভালোবেসে এমনি নিঃসঙ্গ একলা থাকবি?

দীপ্তি একটু নীরব থাকিয়া কহিল,—কাকেও আমি ভালো বাসবো না, এমন কথা বলচি না। তা বলা চলে না! আমাদের জীবন এত দীর্ঘ, আর ঘটনাও এত রকম ঘটে!…তবে বিয়ে নয়! সেই চিরকেলে দাম্পত্য…তার চিন্তা আমি করতে পারি না! তাহলে আমার স্বাধীনতা থাকবে কোথায়, পিশিমা? সেই তো তা হলে সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-প্রথাকে মাথায় তুলে দাস্য-ব্রত গ্রহণ করতে হবে…! তোমায় বলে রাখচি, পিশিমা, এ কাজ আমার দ্বারা কখনো হবে না। আর তুমি জানো, আমি মুখে যা বলি, কাজেও তা করি! যখন একটা পণ আমি করি,তখন তা পালন করতে যদি আমার বুক ভেঙ্গে যায়, তবু আমি তা পালন করি! আমার নিজের মনের কাছে কখনো বিশ্বাসঘাতক হবো না আমি, নিশ্চয়!

মাতঙ্গিনী দেবী শিহরিয়া উঠিলেন। দীপ্তি এ বলে কি! দুই-চারিটা মেয়ের মুখে এমনি কথা শুনিয়া তাঁর যেমন ভয়ও হয়, তেমনি এই স্বাধীনতার চেষ্টার প্রতি তাঁর সমস্ত নারী-হৃদয় ক্ষোভে-রোষে বিদ্রোহী হইয়া ওঠে! এ কি ভালো! নারীর এই পুরুষ-সম্পর্কবিহীন স্বার্থ-পরের মত জীবন বহা?… তার চেয়ে ঢের ভালো ছিল সেই পর্দ্দার আড়ালে অল্পে তুষ্ট সরল নির্লোভ জীবন-লীলার শান্ত প্রবাহ!

হঠাৎ ঘড়ির দিকে চোখ পড়িতে তিনি কহিলেন,—আর নয় মা, অরুণকে চারটের সময় আসতে বলেচো। একে সে বাড়ী জানে না, তাতে তোমায় না দেখতে পেলে কোথায় ঘুরে বেড়াবে! বাড়ী যাও এখন। কাল সকালে এসো। কালকের জন্য রসগোল্লা করে রাখতে হবে, না?

দীপ্তি হাসিয়া বলিল,—তোমার রসগোল্লার রসের লোভেই শুধু এখানে আসি বুঝি! আমি কি এমনি পেটুক!

মাতঙ্গিনী হাসিয়া কহিলেন,—রসের লোভ বৈ কি মা! স্নেহ তো করি, তা সে স্নেহকে কবিরা কি বলে? স্নেহ-রস তো…তবে?

দীপ্তি হাসিয়া বলিল,—তা হলে আমি পেটুকই হতে চাই পিশিমা! তোমার স্নেহ-রস যে কি, তার স্বাদ যে পেয়েচে, সেই জেনেচে! এ রসের রসিক যে নয়, সে দুর্ভাগা!

মাতঙ্গিনী দীপ্তিকে টানিয়া বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন; পরে তাহার মাথায় চুম্বন করিয়া কহিলেন,—চিরসুখী হও মা।

গৃহে ফিরিয়া দীপ্তি মাথার বিস্রস্ত চুলগুলাকে আঁচড়াইয়া গুছাইয়া গৃহের সাম্নে বাগানে বেড়াইতে লাগিল। ও গাছটা গোলাপে ভরিয়া উঠিয়াছে, ওধারে ঐ হনি-সাকলের ঝাড়ে কি বাহার! ঐ সুইট্-পীর গুচ্ছ… ঐ হলিহক্…ডালিয়া…লার্কস্পার…কস্মিমা…চারিধারে নিবিড় পুষ্প-কুঞ্জগুলি কে যেন ফুলের রাশে সাজাইয়া রাখিয়াছে!

অরুণ আসিয়া সেই পুষ্প-কুঞ্জের মধ্যে ঢুকিল এবং দীপ্তিকে দেখিয়া কহিল,—বনদেবী বনে ফুল তুলচেন!

দীপ্তি কহিল,—বাঃ, আপনি তো বেশ! একেবারে বাগানে এসেচেন! কোথায় এই একধারে ঝোপের মধ্যে ঘুরচি…! তা চারটে বেজে গেছে?…আমি এগুলোর সন্ধানে এসে ঘড়ির কথা ভুলে গেছি।

অরুণ কহিল,—না, এখনো চারটে বাজতে একটু দেরী আছে। আমি যে বাঙালী, কথায়-কথায় ঘড়ি দেখবার কথা মনে থাকে না!

দীপ্তি হাসিয়া কহিল,—তা হলে তো আপনার বিলেত যাওয়াই মাটী হয়ে গেছে!

অরুণ কহিল,—নিজে না মাটী হলেই ভাগ্য বলে মানবো।

দীপ্তি অরুণের পানে ফিরিয়া চাহিল, এ কথার মানে?

অরুণ বুঝিল, রসিকতার কোন অর্থ নাই! তবু সে কহিল,—অর্থাৎ, ঘড়ির একটু এদিক ওদিক হলে ক্ষতি নেই! মনের গতির না নড়-চড় হয়।

দীপ্তি মুগ্ধ দৃষ্টিতে আশপাশের বুনো লতায় সাজানো ছোট-খাটো বিচ্ছিন্ন ঝোপ-ঝাপগুলার দিকে দেখাইয়া কহিল,—দেখুন তো, যা বলেছিলুম, তা ঠিক কি না। সৌন্দর্য্যের ছড়াছড়ি চারিধারে! নয়?...ওঃ, কলকাতার সেই ধূলো আর ধোঁয়ার তুলনায় এ যেন স্বর্গ পুরী..

অরুণ কহিল,—কবি তো বলেই গেছেন,

Many a green isle needs must be

In the deepwide sea of misery,—এ না থাকলে মানুষ বাঁচতো। কলকাতায় থেকে থেকে দম্ আটকাবার মত হলে,ভাগ্যে এই সব জায়গায় দেখা পাই, নাহলে মানুষের মন পাথর হয়ে যেতো।...

কথাটা বলিয়া সে দীপ্তির পানে চাহিল। দীপ্তির মুখে-চোখে সকালবেলার চেয়েও আরো মধুর দীপ্তি ফুটিয়াছে! একখানি সবুজ রঙের শাড়ী তার নিটোল অম্লান তনুখানিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। হাফ-হাতা সবুজ ব্লাউস গায়ে আঁটিয়া বসিয়াছে—আর গোলাপী রং এমন আভায় বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িয়াছে যে, অরুণের মনে হইল, সবুজ পাতায় ঘেরা এ যেন সদ্য-ফোটা তাজা গোলাপ!...যৌবনের বিদ্যুৎ-স্পর্শে তার সারা অবয়ব অপরূপ মাধুরীতে পরিপূর্ণ।...

অরুণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে দীপ্তির পানে চাহিয়া রহিল। ই তরুণীর দেহখানিকে যৌবন শুধু সবুজ শ্রীতে মণ্ডিত করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, মনটাকেও যৌবনের স্বাস্থ্য-শ্রীতে অপরূপ সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে!

হঠাৎ দীপ্তি তার পানে চাহিতে অরুণের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। সে কহিল,—চমৎকার জায়গা। আপনার রুচির তারিফ করতে হয়! সারা সহরটাকে বাদ দিয়ে কেন এ নির্জ্জন বনের কোলে বাসা নিয়েচেন, তা এখন বুঝলুম।—আইভি-লজের আশ-পাশের শোভা দেখে আমিও বিহ্বল হয়েছিলুম—কিন্তু এখানকার তুলনায় সে জায়গাকে এত খাটো বলে মনে হচ্ছে! দেখচি, বিদেশী আমরা এখানে এসে যে-সব জায়গা বেছে নিয়েচি, নয়ন-মনকে তৃপ্ত দিয়ে বাস করবো বলে! তার চেয়ে গরীব বাসিন্দারা ঢের ভালো জায়গায় এসে আস্তানা পেতেচে! ...ঐ নাচেকার ছোট কুঁড়ে ঘরগুলি...দেখুন তো, ও যেন মানুষের হাতে গড়া নয়। ওগুলি যেন কোন্ পরীর স্বপ্ন দিয়ে গড়া!... ঐ খাদ, পাহাড়ের ঐ এবড়ো খেবড়ো গা, ঐ ডোবা—তাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে কি চমৎকার শোভায় ঝলমল্ করচে!

দীপ্তি কহিল,—ছবি আঁকবেন?

অরুণ একটু অবাক্ হইয়া দীপ্তির পানে চাহিল। দীপ্তি কহিল,—আশ্চর্য্য হচ্ছেন! মানুষের আসল পরিচয় কখনো লুকোনো থাকে না। পিশিমার কাছে আপনার গুণের পরিচয় পেয়েচি। আপনি যে একজন ওস্তাদ চিত্র-কর, তা আমি শুনেচি।...আঁকুন না ছবি! এখানকার মধুর স্মৃতি নীরস কলকাতায় অনেক সান্ত্বনা দেবে।... চলুন, সন্ধ্যা হবার আগে ঐ পাহাড়ের ওপরটা ঘুরে আসি! সূর্য্যাস্তের শোভা যা দেখবেন, তা ভুলবেন না কখনো।

অরুণ সম্মত হইল। তখন দীপ্তি ছুটিয়া বাঙলায় গিয়া একটা গরম জাম্পার গায়ে দিয়া আসিল। তার পর দুই-জনে পাহাড়ের গায়ে পাইন-ঝাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সারা পথ কথার আর অন্ত নাই! দুজনে যেন কত কালের আলাপ—দুটি অন্তরঙ্গ বন্ধু! যৌবনের প্রদীপ্ত আলোয় দুজনের প্রাণ উজ্জ্বল, ভরপুর...এবং মনের গতি দুজনের এক বলিয়া এক-নিমেষে দুজনের মধ্যে এমন সত্য গড়িয়া উঠিল, যাহা বহু-বহু বর্ষের আলাপেও একান্ত দুর্লভ!

অরুণ কহিল,—এই বয়সেই জীবনকে এত দিক দিয়ে আপনি নেড়ে-চেড়ে দেখেচেন যে, আপনার চিন্তা করবার শক্তি দেখে মন শ্রদ্ধায় ভরে উঠচে। অপর মেয়ের কথা ছেড়ে দি, কোনো পুরুষও যে এ ভাবে জীবনকে ভেবে দেখে না!...

দীপ্তি কহিল,—আমার বয়স তখন পনেরো বছর—ম্যাট্রিক দি। দিয়ে নানা বই পড়তুম! সে সময় বাবা একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়। প্রবন্ধটির নাম, সত্য ও মুক্তি। বিদ্যুতের মত সেই প্রবন্ধ আমার মনকে এক নিমেষে এমন চাবুকে দিলে!...বাবা তাতে লিখেছিলেন,—সব ছেড়ে পৃথিবীতে আমরা এক-মাত্র সত্যের সন্ধান করবো—এবং যতদিন না এই সত্যের দর্শন পাবো, ততদিন আর-কিছুর পানে ফিরে চাইবো না। সত্যকে পাচ্ছি না বলে, একটা ছোট মিথ্যাকে ধরে খুশী হয়ে বসে থাকবো না। আকুল প্রাণে সত্যের সন্ধান করা চাই। এর জন্য সমাজের বুকে যুগ-যুগ ধরে লালিত আচার-সংস্কার, রীতি-নীতির মোহ কাটিয়ে এ-সবের ঢের উর্দ্ধে মনকে নিয়ে যেতে হবে। এই সত্যকে পেলেই আমরা মুক্তি পাবো—সত্য ছাড়া মুক্তির কোন আশা নেই!...সে-লেখা পড়ে মনে হলো, ঠিক কথা! সত্যই তো মুক্তি। মিথ্য নিয়ে থাকার মানে,শৃঙ্খলিত থাকা—দেহে-মনে কঠিন শৃঙ্খল! সামাজিক, নৈতিক যা-কিছু

আচার মিথ্যাকে জড়িয়ে পড়ে আছে, সে-সব কেটে ছিঁড়ে মনকে মুক্ত করতে হবে, তবেই তার স্বাভাবিক বিকাশ হবে।···সেই দিন আমি মনকে প্রস্তুত করেছি, যে-দিক দিয়ে পারি, এ বাঁধন কাটবো। সেদিন থেকে আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, সত্যকে সন্ধান করা—সত্যকে জানা, সত্যকে পাওয়া—বলিতে বলিতে দীপ্তি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তার পর সহসা ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিবার পর হাসিয়া সে আবার কহিল,—পারি কি, বলুন তো? কিন্তু কেবলি নিজের কথা কইচি! আপনাকে বেড়াতে নিয়ে এলুম, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-লীলা দেখাবার জন্য! কোথায় তা দেখবেন, না, আমার বকুনি শুনচেন!

অরুণ কহিল,—আপনার কথা আমার খুব ভালো লাগচে। এই মুক্ত আকাশের নীচে মুক্তির এই বাণী—ভারী চমৎকার খাপ খাচ্ছে! তা ছাড়া এ তো আপনার ঘরের কথা নয়, এ যে মুক্তি-প্রয়াসী মানবাত্মার জীবন্ত ইতিহাস। আপনি যে বিশ্বাস করে আমায় এ-সব কথা বলচেন, এর জন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ!···আমি পুরুষ, আপনি নারী, এ কথাগুলো যদি আপনি আর-একজন নারীকে ডেকে শোনাতেন, তা হলেও কথা ছিল! কিন্তু আমি পুরুষ বলেই নারীর মনের এ আকাঙ্ক্ষার কথা শোনবার অধিকারও আমার আছে। কেন না, যুগ-যুগ ধরে পুরুষ নারীকে শুধু বশে রেখে এসেচে—তার প্রাণের কথা শোনেনি, শুনতে চায়নি! আর এ তো আপনার নিজের কথাও নয়। এ যে বিশ্ব-নারীর প্রাণের কথা, তার ব্যাকুল মনের আর্ত্ত আবেদন এ!

দীপ্তি ভাবিতে লাগিল, ঠিক! এ কথাগুলা কোন নারীর কাছে সেও তো বলিতে পারিত না এমন করিয়া!······

৩

সেদিন হইতে অরুণ ও দীপ্তির মধ্যে অন্তরঙ্গতা এমন বাড়িয়া চলিল যে, দীপ্তি যখন-তখন অরুণকে তার গৃহে ডাকাইয়া আনিত, এবং অরুণও সর্ব্বক্ষণ দীপ্তির এই সাদর আহ্বানটুকুর জন্য ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করিত।

দীপ্তির গৃহ-সংলগ্ন কানন-ভূমিতে বসিয়া অরুণ চারিদিককার ঐ মূক গাছপালা, গিরি-নির্ঝরের বহু ছবি আঁকিয়া ফেলিল। এই কঠিন উপত্যকা, ঐ শ্যামল বনানীকে তুলির লিখনে রঙে রঙাইয়া সে যেন কাব্য রচিয়া তুলিল।

দীপ্তি কখনো অরুণের পাশে আসিয়া বসিয়া তার ছবি আঁকা দেখিত, কখনো চঞ্চল মৃগের মত ছুটিয়া আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়াইত। এই তরুণ পুরুষটিকে তার ভালো লাগিত। তার হাসি, কথা, তার মনের স্বচ্ছন্দ ভঙ্গী—দীপ্তির ভালো লাগিত। তার প্রাণ কত দিন ধরিয়া পিয়াসী ছিল—এমনি এক জন বন্ধুর সন্ধানে!

এমনি ভাবে আরো পাঁচ-সাত দিন কাটিয়া গেল। মাতঙ্গিনী দেবীর গৃহে সকালে একবার গিয়া চা ও জল-খাবার খাইয়া দুজনে বাহির হইয়া পড়িত। মাতঙ্গিনী দেবী মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাদের এই অন্তরঙ্গতা লক্ষ্য করিতেন, এবং তাঁর মনে এই অন্তরঙ্গতা এক সুমধুর সম্ভাবনার কথা বারম্বার জাগাইয়া তুলিত। তা কি হইবে···?

অরুণ এখনো বিবাহ করে নাই।···এ-বয়সে তরুণ-তরুণী দুজনেরই প্রাণে কোথা হইতে কামনা জাগ্রত হইতে ওঠে—সঙ্গ-লাভের কামনা। এ সময় মন এমন একজনের সঙ্গ-প্রয়াসী হয় মনে-প্রাণে যে সহচর হইবে,—যাকে নিজের মনের অতি-গোপন কথাটুকু অনায়াসে বলা যায় এবং যার কথা তেমনি নিঃসঙ্কোচে শুনিবার সাধ হয়! আর সেই কথার মধ্যে নিজেকে যদি ভালো একটি আসনে অধিষ্ঠিত দেখি, তাহা হইলে তৃপ্তির আর সীমা থাকে না। এ বয়সটাই যে ভালো-বাসিবার বয়স! এ-বয়সে ভালোবাসিবার সুযোগ যা প্রাণের জন যে না পায়, তার মত দুর্ভাগা আর নাই!··· আহার-নিদ্রা জিনিষগুলা যেমন শরীরকে গড়িয়া তোলে—তেমনি তাকে সুখ দেয়, বাঁচাইয়া রাখে! মন তেমনি যৌবনে যখন সঙ্গ-প্রয়াসী হয়, আর-একজনকে ভালো বাসিবার জন্য আকুল হয়, তখন তার সে গতি রোধ করিতে যাওয়া মূঢ়তা! তাহাতে মন তার স্বাভাবিক ভাবে বাড়িবার পথ না পাইয়া কুণ্ঠিত সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, এবং অসুস্থতায় ভরিয়া ওঠে!

অরুণ যে এখনো বিবাহ করে নাই, তার কারণ, সে ব্যাপারটার দিকে তার খেয়াল হয় নাই। সমাজে এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা বলে, সামর্থ্য হইলে বিবাহ করিব! তাহারা হিসাবী লোক, চারিদিক খতাইয়া শুধু স্বার্থ দেখে। ভালোবাসিবার শক্তি তাদের নাই, ভালো-বাসিবার যোগ্যও তারা নয়। সংসারে জীবন-সঙ্গিনী খুঁজিতে গিয়া লাভ-লোকসানকে যারা আগে খতাইয়া দেখে, তাদের প্রাণে প্রেমের উদার আলো-বাতাস ঢুকিবার উপায় কৈ!

সেদিন অপরাহ্ণে অরুণ আর দীপ্তি দুরারোহ গিরি-শৃঙ্গে চড়িয়া বসিয়া ছিল। পায়ের নীচে পাহাড়ের শ্রেণী সোপানের মত নামিয়া গিয়াছে। পথে বিচিত্র পোষাক-পরা নর-নারীর বিরাট মেলা···তাদের কল-কোলাহল অস্ফুট রাগিণীর মত মাঝে-মাঝে ভাসিয়া আসিতেছে, দূরে পাহাড়ী মেয়েরা রঙীন ফুলে বেণী রচনা করিয়া, পিঠে শিশু দুলাইয়া পথ চলিয়াছে। অদূরে সূর্য্য পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে, তার বিদায়ের অশ্রুময় দৃষ্টি হিমগিরিকে রক্তবর্ণে অভিসিঞ্চিত করিয়া তুলিয়াছে।

আশে-পাশে সবুজ পুষ্প-লতায় প্রকৃতির অঙ্গ ঢাকা··· চারিদিকে অপরূপ মাধুর্য্য !

এ মাধুর্য্যের মাঝে পাশেই রূপের দীপ্তি-ভরা তরুণী দীপ্তি! অরুণের মন মাতাল হইয়া উঠিল। দীপ্তির পানে সে চাহিয়া দেখিল। তার শরীর-মন কাঁপিয়া উঠিল। তার পর রুদ্ধ কণ্ঠে সে ডাকিল—দীপ্তি···

দীপ্তির মুখের উপর ছলাং করিয়া রক্ত-স্রোত বহিয়া গেল। তার দুই গাল আপেলের মত লাল হইয়া উঠিল !···সে ফিরিয়া চাহিল···

অরুণ পাগলের মত আকুল কণ্ঠে কহিল,—কি শুভক্ষণে এবার দার্জ্জিলিঙে এসেছিলুম, দীপ্তি···

দীপ্তি কোন জবাব দিল না, অরুণের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তার বুকের মধ্যে কি যেন দুলিয়া উঠিতেছিল !

অরুণ আবার বলিল,—না এলে তোমায় তো বন্ধু পেতুম না···এ যে আমার জীবনে কত-বড় লাভ !

দীপ্তির বুক আনন্দে-গর্ব্বে দুলিয়া উঠিল ! সে নারী, তরুণী ! তরুণের মুখের এ কথায় তার নারীত্ব এক-নিমেষে জাগিয়া বিপুল সার্থকতায় ভরিয়া উঠিল ! পুরুষের চিত্ত-জয়ের বাসনা···সে বাসনা নারীর প্রকৃতিগত, নারীর তা প্রাণ-অংশ ! গর্ব্বে লজ্জায় দীপ্তি মুখ নামাইল; তার পর ধীরে ধীরে বলিল,—আপনার বন্ধুত্বও আমার কাম্য···

অরুণ কহিল,—আমি নাম ধরে তোমাকে 'তুমি' বললুম—আর তুমি 'আপনি' বলে এখনো সম্ভ্রমের ব্যবধান রাখচো, দীপ্তি ! তুমিও 'তুমি' বলে কথা কও···

দীপ্তির বুক প্রচণ্ডভাবে দুলিয়া উঠিল ! হাসিয়া সে অরুণের পানে চাহিল। কোথা হইতে কে যেন তার মাথাটাকে জোর করিয়া আবার নামাইয়া ধরিল ! তার পর মুখ নীচু করিয়াই সে বলিল,—আপনাকে আমারো ভারী ভালো লাগে, সত্যি। মন আমার স্বীকার করচে, এ মস্ত সত্য, কাজেই তা বল্‌তে আমার কুণ্ঠা হচ্ছে না।

অরুণ কহিল,—তোমার এ করুণা আমি কখনো ভুলবো না, দীপ্তি !···এই ক'দিন ধরে বিরল অবসরে তোমার কথা আমি কেবল ভাবচি।···তুমি সর্ব্বক্ষণ আমার মন ভরে আছো !···এ যদি অপরাধ হয়ে থাকে, ক্ষমা করো—আমিও মনের এ নিবিড় সত্যকে তোমার কাছে প্রকাশ করতে আজ কুণ্ঠা বোধ করচি না !

দীপ্তি একটা নিশ্বাস ফেলিল,—তার পর কহিল,—আপনাকে···

—না, না, আপনি না। তুমি বলো। তুমি, তুমি···

দীপ্তি হাসিল। হাসিয়া কহিল,—তোমাকেও যে যখন-তখন ডেকে পাঠাই,—কি তুমি ভাবো, জানি না, বুঝি নি কখনো···তবে এটুকু শুধু জানি যে, ডাকলে তুমি বিরক্ত হবে না !···তার পর সে মুখ নামাইল, মুখ নামাইয়া কহিল,—সত্যি, যতক্ষণ তুমি কাছে থাকো, এমন ভালো লাগে···তোমার কথা আমিও সারাক্ষণ ভাবি···

দীপ্তি মুখ তুলিল। অরুণ দেখিল, সরমের রক্তিম রাগে দীপ্তির মুখ আরো রাঙা হইয়া উঠিয়াছে !

দীপ্তি কঠিন শিলাবক্ষে তৃণাচ্ছাদিত জায়গায় একটা হাত রাখিয়াছিল, অরুণ উচ্ছ্বসিত আবেগে সেই হাত-খানি নিজের হাতে তুলিয়া দীপ্তির পানে চাহিয়া কহিল,—একটা কথা বলবো, দীপ্তি···যদি অভয় দাও, বলি···

—বলো···

—তোমায় চির-জীবনের মত সাথী পাবার আশা করতে পারি···? বলো দীপ্তি, বলো, তুমি আমার হবে ?

···তোমার হবো !···

দীপ্তি যেন চমকিয়া উঠিল, স্থির দৃষ্টিতে অরুণের পানে চাহিয়া কহিল,—আমিও তাই ভাবছিলুম অরুণ বাবু···যে তোমায় একেবারে নিজস্ব করে এঁটে রাখবার অধিকার আমার আছে কি না !···এ যে স্বার্থপরের সাধ ! তবে এও ভেবে দেখেছি, আমার মন চায়, তোমার বন্ধুত্বের সেরা আসনখানি অধিকার করতে। তোমার বন্ধুদের মধ্যে আমি সেরা হয়ে থাকতে চাই, সবার আগে !···আমার মনের এ দুর্নিবার লোভকে আমি কিছুতে থামাতে পারচি না। তোমায় আমি ভালোবাসি !·· তুমি যখন আজ আমায় ঐ স্বরে ডাকলে, যখন আমার হাত নিজের হাতে তুলে নিলে, তখন একটা শিহরণে আমার অঙ্গ বিবশ হয়ে এলো ! আমি বুঝচি, এ মনের ডাক। মনও এটা চায় এবং পেলে তৃপ্ত হয়। এ সত্যের ডাক। নারীর প্রাণের অতি-সত্য কথা,—তাই তাকে আদর করে গ্রহণ করতেও আমি প্রস্তুত···

অরুণ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। দীপ্তির হাত ধরিয়াই আবেগ-ভরা কণ্ঠে সে কহিল,—আমায় তুমি ভালবাসো ! দীপ্তি, দীপ্তি···

অরুণ উদ্‌ভ্রান্তের মত দীপ্তিকে একেবারে বুকের মধ্যে টানিয়া নিবিড় আলিঙ্গনে তাকে চাপিয়া ধরিল। দীপ্তির বুক উত্তেজনায় সঘন কম্পিত হইতেছিল।

দীপ্তি অরুণের পানে চাহিয়া···! দু'খানি তৃষিত অধর এত কাছে···আবেশে উচ্ছলিত ! নিমেষে চেতনা হারাইয়া অরুণ দীপ্তির ছাড়ানো-বেদানার দানার মত রক্তিম অধরে চুম্বন করিল।

দীপ্তি কোন বাধা দিল না। তার শিথিল তনু বিবশ !···

প্রাণের সুধা অরুণের অধরে ধরিয়া দিতে দীপ্তি নিষেধ তুলিল না, কোন কুণ্ঠা করিল না! দীপ্তি যেন নিশ্চেতন!

তার পর উভয়ে নীরব, স্পন্দনহীন। এ নীরবতার মাঝে দুজনের প্রাণের স্পন্দন এক বিচিত্র রাগিণীতে বাজিয়া চলিয়াছিল···

দীপ্তির শিথিল দেহ আলিঙ্গনে ধরিয়া উচ্ছ্বসিত মৃদু কণ্ঠে অরুণ কহিল,—তা হলে তুমি আমার হবে···? আমার হবে দীপ্তি?

অরুণের বাহু-পাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া দীপ্তি কহিল – তোমার হবো!···হবো কি! আমি তোমারই!···এই আমায় দেহ অলসতায় ভরে লুটিয়ে পড়েচে তোমার বুকে!···আমায় নাও, নিয়ে যদি তৃপ্তি পাও···

এ-কথাগুলা এমন স্নিগ্ধ সরল উচ্ছ্বাসে ঝরিয়া পড়িল যে, অরুণ অবাক হইয়া গেল। সে দীপ্তির পানে চাহিল। দীপ্তির চোখের দৃষ্টি, দীপ্তির মুখ-শ্রী সরমের রাগে ভরিয়া উঠিয়াছে··তবু তার মধ্যে মাদকতার জ্বলন্ত শিখা কোথাও নাই! পূত-হৃদয়ের সরল ছবি, প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোর মতই যেন সে শ্রী ঝলমল করিতেছে! এ দাহ-করা বহ্নি-শিখা নয়, এ যেন চারিধার আলোয়-আলো-করা স্নিগ্ধ প্রদীপের শিখা!

অরুণ কহিল,—তা হলে তোমার অনুমতি পেলে আমাদের বিয়ের ব্যবস্থা করি! যে-মতে তুমি বলো···

—বিয়ে! দীপ্তি একমুহূর্ত্তে বাঁকিয়া উঠিল। কোথায় মিলাইয়া গেল ভালোবাসার সে নিবিড় স্বপ্ন! বিদ্যুতের মত তীব্র দৃষ্টিতে দুই চোখ ভরিয়া সে কহিল,—বিয়ে! বিয়ে আমি কখনো করবো না···কাকেও নয়··· তোমাকেও না! বিয়ে করার কথা তুলচো কেন? সেই সমাজের দাস্য, আচারের দাস্য! কখনো না। মনের কাম্য সত্যকে ঠেলে, একটা মিথ্যা বাঁধনের আড়ালে আশ্রয়! আত্মরক্ষার এ হীন প্রয়াস···? না।

অরুণের মনের উপরে কে যেন কশাঘাত করিল। বিস্মিত দৃষ্টিতে সে দীপ্তির পানে চাহিল।

দীপ্তির মুখে-চোখে দৃঢ়তার সুস্পষ্ট ছায়া! অরুণ বলিল,—এ কি বলচো তুমি দীপ্তি! বিয়ে নয়? তবে এই ভালোবাসার সার্থকতা, এই আকুল তৃষ্ণা···?

দীপ্তি সে কথায় বাধা দিয়া স্থির কণ্ঠে উত্তর দিল—তাকে তৃপ্ত করায় বাধা কি! তোমায় তো বলেচি আমি, নারী তার সেই চির-পুরোনো বদ্ধ প্রথার শিকল টেনে আবার ঘরের মধ্যে গিয়ে আপনার জীর্ণ আসন পেতে বসবে না! তোমার সঙ্গে এতদিন তো এ-সব বিষয়ে অনেক কথা কয়েচি আমি···। অন্য মেয়েদের মত অন্ধভাবে কতকগুলো মন্ত্র আর আচার-অনুষ্ঠানকে সামনে ধরে, তাদের মেনে তবেই আমাদের নতুন পথে যাত্রা করতে হবে···! কেন? সেই আচার-অনুষ্ঠান না হলে আমাদের এ প্রাণের বাঁধন, এই প্রীতি, এ সখ্য, এ ভালোবাসা বাষ্পের মত বাতাসে মিলিয়ে যাবে! আমাদের এ ভালোবাসা এত দৃঢ়, এত গাঢ় নয় যে, শুধু তারি জোরে আমাদের সারা জীবন এক হয়ে গড়ে উঠবে না? তাকে দৃঢ় করবার জন্য চাই সেই বহুকেলে বদ্ধ সংস্কার? সেই পুরোনো পচা আচার-অনুষ্ঠান···?

অরুণ কহিল,—কিন্তু সুদূর ভবিষ্যৎ···! সে কথা ভেবেচো? আমাদের প্রেম আর-কিছুর সাহায্য চায় না দীপ্তি, তার ভিত্তির জন্য, দৃঢ়তার জন্য, এ কথা আমিও মানি! কিন্তু যে-সন্তানের আমরা জন্ম দেবো, তাকে সমাজের সামনে দাঁড়াবার মর্য্যাদা···? তার জন্য···?

দীপ্তি ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—সমাজ ছাপ মেরে না দিলে সে দাঁড়াতে পারবে না, তার নিজের মনুষ্যত্বের জোরে···? শোনো, আমি এ সামাজিক ছাপ নিতে রাজী নই। বিবাহের মানে এ নয় যে, পাঁচজন লোক ডেকে রাঙা কাপড় পরে কতকগুলো মন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে! গোত্রে-গোত্রে মিল করে সে মন্ত্র পড়তে হবে!··· বিবাহের অর্থ, দুটি প্রাণ সুখে-দুঃখে মিলে এক হয়ে ওঠা। তাতে প্রাণের সাড়াই যে সব-চেয়ে বড় জিনিষ। দুটি প্রাণ যদি পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত, আসক্ত হয়ে ওঠে, পরস্পরকে আপন বলে খোঁজে, ডাকে, তবে সে-ডাক অস্বীকার করে কতকগুলো বাঁধা মন্ত্র আউড়ে না গেলে কি বিবাহের সার্থকতা থাকবে না? কখনো না।···মন্ত্র পড়ে এক ঘরে দুজনে ঢুকলো বাস করতে, পুরুষ আর নারী···মনের কোনোখানে তাদের মিল নেই, সারা জীবনে হয়তো মিল হলো না, আজীবন অশান্তি-ভরে দুজনে মনে ঝড় তুলে দিন কাটাতে লাগলো —এই বিয়েই হবে সার্থক শুধু মন্ত্র আওড়ানো হয়েচে বলে? এইটেকেই সমাজ বলবে, বিবাহ! আর মন্ত্র পড়িনি বলে, আমাদের এ মিলন, এ নিবিড় অনুরাগ একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাবে? সমাজ তাকে প্রশ্রয় দেবে না, তাকে উপেক্ষা করবে, ঘৃণা করবে···আর সেই সমাজকে আমরা দেবতা বলে মাথায় তুলে ধরবো! এত-বড় মিথ্যাকে গলিত শবের মত সারা জীবন বয়ে বেড়ানো— আমার দ্বারা হবে না···কখনো না, শত সহস্র সুখের প্রলোভনেও নয়।

অরুণ বিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিল। দীপ্তি কহিল,— আমি জানি, তুমি যা বলবে...! তুমি বলবে, এ সংস্কার ভাঙতে তুমিই বা এত বেদনা কেন সইবে? এত বড় ত্যাগকে মাথায় তুলে নিয়ে সমাজের লাঞ্ছনা, গ্লানি-কুৎসা কেন ভোগ করবে? এই তো? কিন্তু এরো জবাব আছে···একটা চিরকেলে পুরোনো সংস্কারকে যে হঠাতে

যাবে···তাকেই গভীর নির্য্যাতন সইতে হবে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র তা ঘটেচে,···তবু সত্য-সন্ধানী লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হননি। বিপুল গৌরবে অটল ধৈর্য্যে তাঁরা এ সব নির্য্যাতন মাথায় তুলে সহ্য করেচেন বলেই জগতের লোক আজ অনেক সত্যের পরিচয় পেয়েচে! আমিও তেমনি যখন সত্যের সন্ধানে বেরিয়েচি, তখন সব বিপদ স্বীকার করে এ লাঞ্ছনা-ভোগ জেনেই আমি তা বইতে প্রস্তুত হয়েচি! আমার বিবেক বলচে, এতদিন যে-সত্যকে অবলম্বন করে এসেচো, আজ এক তৃপ্তির মোহে তাকে বিসর্জ্জন দিয়ে ফেলবে!···না, এত-বড় কাপুরুষতা আমি ঘটতে দিতে পারবো না! এর জন্য যদি তোমায় হারাতে হয়, তবু নয়! আমার বিবেকের বাণীকে জীবনের সব কর্ম্মে শিরোধার্য্য করতে গিয়ে বুক যদি আমার ভেঙে চূর হয়ে যায়, তবু আমায় তা সহ্য করতে হবে!···নিরুপায়!

উত্তেজনায় দীপ্তির চোখে জল ছাপাইয়া আসিল। অরুণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে দীপ্তির পানে এতক্ষণ চাহিয়াছিল, কি তীব্র তেজে, কি সরল যুক্তিতে ভরা এই তরুণীর মন!

অরুণ বলিল,—কিন্তু তোমার বিবেককে ক্ষুণ্ণ করতে বলচি না তো!···এ শুধু একটা রীতি ক্ষণেকের জন্য পালন করা বৈ আর কিছু নয়! একটা form-মাত্র, বিয়ের অনুষ্ঠান, এ একটা show-মাত্র···

দীপ্তি কহিল,—না।···যাকে মিথ্যা বলে জানি, যাকে প্রাণের মধ্যে স্বীকার করতে পারি না, সে কাজ আমি করতে পারবো না। বলেচি তো, জীবনের সার তৃপ্তির লোভেও নয়···। এমন কি, তুমি যদি আইন-মতে রেজেষ্ট্রী করে বিয়ের কথা বলো, তাতেও আমি রাজী নই! এত-বড় হাস্যকর ব্যাপার আর আছে! দুটি প্রাণ চির-জীবনের মত মিশচে, পরস্পরকে ভালোবাসতে, পরস্পরকে সঙ্গ দিতে, তৃপ্তি দিতে, খুশী করতে—তাতেও লেখাপড়া চাই, সাক্ষী ডাকা চাই! প্রাণের কারবারও তেজারতির মত ব্যবসার সামগ্রী! আশ্চর্য্য এই সব লোকের মনের গতি, যারা এই আইন গড়েচে!

অরুণ কহিল,—কিন্তু সমাজ গড়তে গেলে, তাকে রাখতে হলে আইন-কানুনের দরকার হয় বৈ কি দীপ্তি··· যদি কেউ অপরের হকে হস্তক্ষেপ করতে যায়! সকলেই তো ভালো নয়—তাই প্রবলের অত্যাচার থেকে দুর্ব্বলকে রক্ষা করবার জন্য আইনের শাসন খাড়া রাখতে হয়!

দীপ্তি কহিল—আইন হোক চোরকে সাজা দিতে, ঠককে ঠেকিয়ে রাখতে। স্ত্রী-পুরুষের মনের মিলনকে আইনে বেঁধে না দিলে সমাজ থাকবে না? সে সমাজ না থাকুক!—প্রীতি-ভালোবাসার বাঁধনে যে-মন বাঁধা পড়ে না, এত বড় সত্য যাকে ধরে রাখতে পারে না—রাজার শাসন, জেল আর জরিমানার ভয় দেখিয়ে তাকে ঠেকিয়ে রাখবে! মানুষের মনের উপর এ যে ভারী কঠিন পরিহাস!···নয়?

অরুণ কহিল,—ভেবে দেখলে, তাই বলতে হয়! তবু···

বাধা দিয়া দীপ্তি কহিল,—এর মধ্যে তবু নেই, কিন্তু নেই—এ সত্যের পথ···সরল সিধে পথ···

অরুণ কহিল,—আমি শুধু সমাজের মিথ্যা কুৎসা থেকে, জঘন্য আলোচনা থেকে আমাদের এই পবিত্র-মিলনটুকুকে রক্ষা করবার জন্যই বিয়ের কথা তুলেচি, দীপ্তি।

দীপ্তি কহিল—এর জবাবও আমি দিয়েচি। এ-ভাবে মিথ্যার সাহায্যে আমি আত্মরক্ষা চাই না। আমি শুধু চাই, তোমার ভালোবাসা। আমার এই মুখ-চোখ, আমার এই অবয়ব, আমার এই রূপ, আমার এই যৌবন—যা অপর নারীরও আছে—এদেরই তুমি ভালোবাসবে? সে ভালোবাসার কাঙাল আমি নই! আমি চাই, আমার ভিতরটাকেও তুমি ভালোবাসবে—আমার সাধ আশা, আমার আকাঙ্ক্ষা, এদেরো···পরিপূর্ণভাবে। তা যদি না পারো—দীপ্তি থামিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল, তার পর মুখ নামাইয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল,—ভালবেসো না।··· আমার এই সব-আশা নিয়েই আমার আমিত্ব। সেটুকুকে ভালো না বাসলে, শুধু এই রূপ, এই যৌবন?— আরো মধুর তুমি অনেক পাবে! আর আমার যে-আমিত্বের আমি গৌরব করি, যেখানে আমার বৈশিষ্ট্য, সেটাকে তুমি গ্রহণ করলে তবেই আমার তৃপ্তি হবে। ভাববো, এক জন পুরুষ আছে—আমার সঙ্গী,বন্ধু—যে আমার এ বৈশিষ্ট্যকে দরদ করে, স্বীকার করে, ভালোবাসে।···আমিও তাই বুঝেছিলুম। আর তাই বুঝেই তোমার হাতে নিজেকে তুলে দিতে প্রলুব্ধ হয়েচি। তোমায় ভালবেসেচি—ওগো, তুমি আমায় নিরাশ করো না। আমায় তুলে ধরো, আমায় তুমি শক্তি দাও, উৎসাহ দাও, বিপুল গৌরবে আমায় ভরিয়ে তোলো···

নিতান্ত নিরুপায়তার মধ্য হইতে আশ্রয় মাগিয়া অধীর আগ্রহে দীপ্তি অরুণের দিকে দুই হাত বাড়াইয়া দিল। অরুণ সে হাত দু'খানি লইয়া একেবারে বুকের উপর চাপিয়া ধরিল। কি সে আনন্দ দীপ্তির বুকে! যেন প্রলয়-ঝড়ে সমুদ্র তুমুল তরঙ্গে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে! ···অরুণ রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল,—তোমার তৃপ্তির জন্য আমি সব পারি, দীপ্তি···তোমার এ আকাঙ্ক্ষায় আমার কি সহানুভূতি! সে কি কেবল আমার মুখের কথা!··· বেশ···আমায় দূর করে দিয়ো না··· আমায় ভাববার একটু সময় দাও, জীবন-পথের কথা! তোমার আশা ত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি যেন ঐ পাহাড়ের শিখরে উঠে দাঁড়িয়েচি···স্বর্গ আমার হাতের

নাগালে,—কিন্তু তা পেতে হলে সাবধানে আমায় এগুতে হবে, বেঘোরে পা দিলে নৈরাশ্যের কোন্ পাতালে পড়ে এখনি চূর্ণ হয়ে যাবো।···আমায় একটা রাত্রি সময় দাও, ভাববার···

অরুণ দীপ্তিকে বাহু-পাশ হইতে মুক্ত করিল। দীপ্তি একটা নিশ্বাস ফেলিল। অরুণের আলিঙ্গন তার সারা চিত্তকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছিল।

নিশ্বাস ফেলিয়া দীপ্তি কহিল,—তাই হোক। কিন্তু মনে রেখো, আমার পণ!·· তুমি ভাববে, আমার এ পণ পাগলের খেয়াল, এ ক্ষণেকের! তুমি ভাববে, বিলাতী উপন্যাসের নায়িকাদের ধরণে আমি একটা বিশ্রী স্বপ্ন দিয়ে আমার মনকে গড়ে তুলেছি। পড়ায় আমার মন কতক জোর পেয়েচে, স্বীকার করি। কিন্তু এ ক্ষণেকের মোহ বা খেয়াল নয়। এ নিয়ে আমি অনেক ভেবেচি। বাপের স্নেহ, মার ভালোবাসা এই মতের জন্য কেটে চলে এসেচি —একা, এই নিঃসঙ্গ জীবন বইতে!···আমার মন মুক্তি চায়, কোনো পাশে সে বাঁধা পড়বে না!··· তোমায় আমি ভালোবাসি। জীবনে এমন ভালো কাকেও বাসি নি। আমি তোমার—সম্পূর্ণভাবে তোমারি হতে প্রস্তুত—কিন্তু তার মধ্যে বিয়ের এ মিথ্যে বাঁধন টানা কেন! তার জন্য তুমি আমায় যদি ঘৃণা করো—

দীপ্তি অরুণের পানে চাহিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আবার কহিল,—উপায় নেই! তাও আমায় সইতে হবে। আমার বিবেকের ডাক অগ্রাহ্য করে, এ তৃপ্তি-সুখ মাথায় তুলে নিতে পারবো না আমি!···আমার দেশের নারী-জাতি একদিন যদি আমার এ ত্যাগের ফল ভোগ করতে পায়···! সেই আশার আনন্দে সব দুঃখ আমি শান্ত হয়ে সইতে পারবো!···আমি আজ জগতে নারী-জাতির স্বত্ব-রক্ষার জন্য দাঁড়িয়েচি। ···তুমি বলবে, সভ্য দেশে কেউ তা পারে নি। এ দেশে এ চেষ্টা ভয়ানক বাতুলতা ছাড়া আর কিছু নয়। তবু এই আমার লক্ষ্য, এই আমার পণ·· এ পণ-রক্ষার জন্য আমি আমার স্বর্গ-সুখ বিসর্জ্জন দিতে পারি··· বলেচি তো, এতে তোমার বুক ভেঙ্গে গেলেও আমায় তা সহ্য করতে হবে! বুঝতে পেরেচো!···প্রেমের উচ্ছ্বাস আর নয়। সন্ধ্যা হয়ে এলো। চলো, বাড়ী যাই।

দীপ্তি উঠিয়া দাঁড়াইল, অরুণও মন্ত্র-চালিতের মত উঠিয়া দাঁড়াইল! তার পর পাহাড় বহিয়া নামিয়া দুই জনে পথে আসিল! সবুজ মখমলের মত শ্যাম-বনানীর গায়ে চুমকির মত তখন জোনাকির আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে!··· ঝিল্লী রাগিণী ধরিয়াছে, ঝিম্-ঝিম্!

৪

সারা রাত্রি অরুণ ভালো করিয়া ঘুমাইতে পারিল না। খাইতে বসিল, খাওয়ায় রুচি নাই। লজের কর্ত্রী অনুযোগ করিলে বড় মাথা ধরিয়াছে বলিয়া অরুণ উঠিয়া পড়িল ও একেবারে গিয়া শয্যায় আশ্রয় লইয়া ভাবনার রাশ ছাড়িয়া দিল!···দীপ্তি এ কি বলে? বিবাহ না করিয়া মিলনকে সার্থক করা কতখানি অসম্ভব, একটা মতের প্রবল মোহে পড়িয়া দীপ্তি তা বুঝিতে পারিতেছে না! সে শুধু সুন্দরী তরুণী নয়, শিক্ষিতাও। অথচ এত-বড় অসম্ভব ভুল তার চোখে পড়িতেছে না?··· অরুণের মনে হইল, বইয়ে সে পড়িয়াছে, gipsy love-এর কথা, এ তাই। বিবাহ-বন্ধন নাই, অথচ ঘর-কর্ণা চলিয়াছে! প্রেমের সহস্র আহ্বানে সাড়া দিয়া, কোন দায়িত্বে ধরা না দিয়া তার সর্ব্বনাশী ক্ষুধা মিটাইয়া চলিয়াছে! এ যে আগা-গোড়া এলোমেলো ব্যাপার। যে-কোন মুহূর্ত্তে এ যে ছিঁড়িয়া যাইতে পারে! এ প্রেম—মোহকে আঁটিয়া একটা পঙ্কিল গহ্বরে পড়িয়া থাকিতে চায় যে! কোনরূপ দায়িত্বের উপর যে প্রেমের ভিত্তি স্থাপিত নয়, কতক্ষণ সে টিঁকিয়া থাকিতে পারে! কে বলিবে, যৌবনোদ্ধত মনের এ ক্ষণিক খেয়াল নয়!

অরুণ ভালো করিয়া আগাগোড়া ব্যাপারটা আলোচনা করিতে লাগিল। সে যে দীপ্তিকে খুব ভালোবাসিয়া ফেলিয়াছে, তাহাতে আর ভুল নাই! অথচ যেদিন প্রথম প্রভাতে তাকে সে দেখিল,তার রূপ, তার কথাবার্ত্তা, তার সহজস্বচ্ছন্দ ভঙ্গী তাকে মুগ্ধ করিয়াছিল, সত্য,—কিন্তু সে যে অন্ধভাবে দীপ্তিকে ভালোবাসিয়া ফেলিবে, এ কথা তার মনে তখন উদয় হয় নাই! ···জীবনে কত তরুণীর দেখা মিলিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কাহারও সঙ্গে সে মিশিয়াছে, ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছে, অনেককে দেখিয়া তার পছন্দও হইয়াছে—নিজের মনকে সে কতবার প্রশ্ন করিয়াছে, ইহাকে চির-জীবনের সাথী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি কি? মন উত্তর দিয়াছে, না! ফশ্ করিয়া চির জীবনের জন্য গ্রহণ করিবে?—না, আরো দ্যাখো, আরো প্রতীক্ষা করো!···কিন্তু দীপ্তি···! কোথা হইতে এমন অতর্কিতে সে সারা মনটায় জুড়িয়া বসিল···তাহার মধ্যে সে প্রশ্ন করিবার বা দ্বিধা তুলিবার অবসর সে পায় নাই! হঠাৎ সন্ধ্যাবেলায় পাহাড়ের শ্যামল উপত্যকায় বসিয়া থাকিতে থাকিতে তার মন একেবারে আকুল-আবেদনে ভরিয়া উঠিল,—দীপ্তিকে চাই, চাই, চাই! দীপ্তি তার প্রাণের একমাত্র কামনা,—ইহাকেই যেন সে এতদিন খুঁজিতেছিল! দীপ্তি···! দীপ্তিকে না পাইলে তার মন চির-অন্ধকারে ভরিয়া যাইবে। দীপ্তিকে না পাইলে তার জীবন-মন নিরর্থক হইয়া পড়িবে!··

কিন্তু এই যে চাওয়া···! অরুণ চমকিয়া উঠিল। তার চোখের সামনে দীপ্তির সেই করুণ মিনতি-ভরা মূর্ত্তি কি দীন বেশে ফুটিয়া উঠিল! ওগো আমায় তোলো, আমায় শক্তি দাও, উৎসাহ দাও! আহা, বেচারী! অসহায়া···সে

বড় আশায় অরুণের পানে চাহিয়া আছে, আশ্রয়ের জন্য। একা এই বিবেকের বাণী সফল করিয়া সারা দুনিয়ার সঙ্গে লড়িয়া দীপ্তি কাতর শ্রান্ত অবশ হইয়া পড়িবে, তাই সে অরুণকে পাশে চায় তাকে সুস্থ সবল রাখিতে, তার প্রাণে উৎসাহ জাগাইতে, শক্তি সঞ্চার করিতে।···তাকে সাহায্য না করিয়া, নিবৃত্ত না করিয়া, এই ঝড়ের মুখে তাহাকে সে ছাড়িয়া দিবে? এই সংগ্রামে তার অসহায় মন যে ছিঁড়িয়া চূর্ণ হইয়া যাইবে!···না, না, তাকে সে-বেদনার হাত হইতে রক্ষা করা চাই। না করিলে অরুণের পৌরুষ ধিক্কৃত হইবে, তার মনুষ্যত্ব লাঞ্ছনায় ভরিয়া উঠিবে!—সে যে তাকে কত বড় আশা দিয়া বলিয়াছে, তার জন্য সে সব করিতে পারে···

সে কথা মোহের ছলনা? মিথ্যা?—না। অরুণ তা ঘটিতে দিবে না!···তবে? কিন্তু কত বড় ত্যাগ তাকে স্বীকার করিতে হইবে! বাপ-মার এতখানি স্নেহ···বিশ্বাস!···এক তরুণীর কাতর দীর্ঘশ্বাসে সে সব উড়াইয়া দিবে। এই বিবাহ-হীন মিলনে তাঁদের মাথা হেঁট হইবে, তাঁদের প্রাণে বাজের মত ইহা বাজিবে। ·· আর তার উপর,—এ-মিলনের অর্থ বাপ-মার স্নেহের বন্ধন কাটিয়া মুক্ত জগতে বাহির হইয়া পড়া! একা···! একা নয়, দীপ্তি সঙ্গে থাকিবে!···কিন্তু বাপ-মার অপরাধ? তাছাড়া সমাজের সঙ্গেও আজীবন লড়িতে হইবে!

সে তো বড় হইয়াছে, নিজের বুঝিবার শক্তি হইয়াছে ·· নিজে যা ভালো বুঝিবে, করিবে। তাহাতে বাপ-মার বাধা দেওয়া উচিত নয়···তবু···

এ তবুর মীমাংসা হয় না!···যেখানে পরের স্বার্থের সঙ্গে নিজের স্বার্থ মিশে, সেখানেই এ বিরোধ, সেখানেই এই তবু, এই কিন্তু মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিতে চায়! তা বলিয়া যা ভালো, তা ছাড়িয়া দিতে হইবে? সত্যকে ছাড়িয়া মিথ্যাকে লইয়া বেড়াইতে হইবে! দীপ্তি ঠিক বলিয়াছে—না!

অরুণ ভাবিল, আমাদের এই জীবনকে সত্যের দিক হইতে টানিয়া কি কতকগুলা কৃত্রিম জটিল বাঁধনে আমরা জড়াইয়া রাখিয়াছি! মনকে চারিধার হইতে কষিয়া বাঁধিবার এ যে বিপুল ষড়যন্ত্র! এ ষড়যন্ত্র সহিয়া থাকা মূঢ়তা, কাপুরুষতা! এর চেয়ে নিঃসঙ্গ থাকিয়া একমাত্র সত্যকে গ্রহণ করা ভালো! সে মুক্তি!

দীপ্তির কথা ঠিক। দীপ্তিকে গ্রহণ করিতে হইবে। দীপ্তি একা···সে আশ্রয় চায়। তার এই আশা, এ তো অন্যায় নয়। সে তো জানে, দীপ্তির চিত্ত কি নির্ম্মল! কতখানি বিশুদ্ধ, পবিত্র তার এই অভিপ্রায়—এর কোথাও এতটুকু মালিন্য নাই! ঐ হিমগিরির শিখায় যে তুষারস্তূপ, উহারি মত শুভ্র, অনাবিল।···এ আশ্রয় হইতে তাকে বঞ্চিত করিলে তার দুর্দ্দশার আর সীমা থাকিবে না। বাপ-মার আরো সন্তান আছে, নির্ভর করিবার মত অনেক বস্তু আছে। কিন্তু দীপ্তির? আহা, বেচারী! তার আর কেহ নাই, কিছু নাই। একা এ জীবন বহিয়া তাকে চলিতে হইবে, শুধু তার ঐ বিবেকের ইঙ্গিতে! তাকে আশ্রয় না দেওয়া—নিষ্ঠুরতা!

কিন্তু এ আশ্রয় দিবার পর···? সমাজ একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে। সমাজ বলিবে, এক দুর্ব্বল অসহায় তরুণীকে লালসায় ভুলাইয়া তার গৃহ-কোণ হইতে সে টানিয়া আনিয়াছে! তাকে পত্নীর মর্য্যাদা না দিয়া হেয় গণিকার মত রাখিয়াছে! তার যৌবন-সুধা-পানের ব্যাকুল বাসনায় তাকে আনিয়া পথের ধূলায় লুটাইয়া দিয়াছে!···কি জঘন্য কুৎসা, কি হীন গ্লানি, কি দুর্নামের পঙ্কে না দীপ্তির নামটাকে লাঞ্ছিত ঘৃণিত নিপীড়িত করিয়া তুলিবে! সমাজের কেহ তো জানিবে না, বিবেকের কত বড় আশ্বাসে দীপ্তি আজ নিজেকে বলি দিতে বসিয়াছে···তার সমস্ত জাতির জন্য সে কত বড় ত্যাগ মাথা পাতিয়া লইয়াছে! আমাদের এই মূঢ় সমাজ বাহিরটা দেখিয়াই মানুষের বিচার করিয়া বসে, ভিতর জানিবার জন্য তার চেষ্টা নাই, ইচ্ছাও নাই।··· এ সমাজকে দীপ্তি যে মানিতে চায় না, এ তো ঠিক কাজই করে···তবু···

আবার সেই তবু···! সন্তান যারা আসিবে, তারা যে সমাজের ঐ ভ্রূকুটির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না! ···তা ছাড়া তার ভালোবাসার জন্য, তার তৃপ্তির জন্য দীপ্তিকে সে সমাজের এই ঘৃণিত লাঞ্ছনার মধ্যে আনিয়া ফেলিবে, এও কি ঠিক!···দীপ্তি অন্ধ মোহে যেটাকে সত্য বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে—সেটা সত্য কি না, তা না বুঝাইয়া তাহাতে তাকে আরো প্রশ্রয় দিবে···? সে না দীপ্তিকে ভালোবাসে! দীপ্তি না তাকে বিশ্বাস করে! সে না তার বন্ধু!—দীপ্তি যদি অন্ধ মোহে দেখিতে না পায়, সে তো দেখিতেছে—সে-ভবিষ্যৎকে ভালো করিয়া দেখাইয়া দেওয়া কি তার কাজ নয়?···আজ প্রথম যৌবনের প্রমত্ত খেয়ালে পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে কোন্ অজানা অতলে ঝাঁপ খাওয়া—এখন না হয় কোথাও বাধিবে না! কিন্তু একবার পড়িলে উঠিবার সম্ভাবনাও থাকিবে না!·· দশ বৎসর পরে যৌবনের এ উদ্দাম চাঞ্চল্য যখন মিলাইয়া যাইবে···, তখন এই মুহূর্ত্তটি ভাবিয়া প্রাণ যে অনুতাপে গ্লানিতে ভরিয়া উঠিবে! ভরিয়া গেলেও উঠিবার তখন আর কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। দীপ্তি আজ যৌবনের চাপল্যে গিরিশৃঙ্গ হইতে দুঃসাহসে ঝাঁপ খাইতে চলিয়াছে, সে কোথায় তাকে টানিয়া ফিরাইবে,—না, সেও তার উদ্দাম চাঞ্চল্যে সায় দিবে! শুধু সায় দেওয়া নয়, তাকে ঠেলা দিয়া তার ঝাঁপ খাওয়ায় আরো সহায়তা করিবে! ছি,

এই তার ভালোবাসা! শুধু নিজের স্বার্থই সে খুঁজিয়া ফিরিবে?…না। যে চির-পরিচিত পথে সকলে যুগ-যুগ ধরিয়া চলিয়াছে, সেই পথই চলার পথ,—পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে অজানা অতলে ঝাঁপ খাওয়া—এ তো পথ চলা নয়! মৃত্যুকে বরণ করা! দীপ্তিকেও সেই কথা বুঝাইয়া, গতানুগতিক পথেই তাকে সে ফিরাইয়া আনিবে। তার এই উদ্দাম আকাঙ্ক্ষাকে শান্ত স্নিগ্ধ মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তার যোগ্য স্থানটিতেই তাকে ফিরাইয়া আনিবে! এ যদি না পারে তো তার ভালোবাসায় ধিক্, তার শিক্ষায় ধিক্!

বাহিরে বৃষ্টি পড়িতেছিল—ঝম্ঝম, ঝম্ঝম্! বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা সার্শির কাচে মুহুর্মুহু আঘাত করিতেছিল। তার মনে হইল, ও যেন প্রকৃতির কাতর আর্ত্তনাদ! সমাজের আকুল নিষেধ…ওগো, উদ্দাম স্রোতে বহিয়া যাইয়ো না গো! চাহো, ফিরিয়া চাহো, তোমার পিতৃ-পিতামহের চির-সনাতন সমাজ তোমার পিছনে কাঁদিয়া আছড়াইয়া পড়িতেছে!… সে কান্নাকে উপেক্ষা করিয়া কোন্ অজানা সমুদ্রে পাড়ি দিয়ো না, দুইজনে!…

ঠিক। অরুণ ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল। বাহিরে তখনো বৃষ্টি পড়িতেছে—ঝম্ঝম্ ঝম্ঝম্।

অরুণ ভাবিল—না, দীপ্তিকে সে ফিরাইবেই! তাকে এ সর্ব্বনাশের নেশায় আরো বিভোর করিয়া, এ সর্ব্বনাশের পথে কখনো সে ছাড়িয়া দিবে না। প্রাণে মিনতি ভরিয়া সে বলিবে, দীপ্তি, তুমি ফেরো, ফেরো, স্নেহ-প্রীতি উদারতা দিয়া মানুষ যুগ-যুগ ধরিয়া যে নীড় রচনা করিয়াছে, তার শত দোষ থাক্, তা মিথ্যা হোক্, তবু সে মায়া-প্রীতির স্মৃতির কত উপর গড়িয়া উঠিয়াছে! ছোট নীড়…তাকে কঠিন সত্যের আঘাতে নাই বা চূর্ণ করিলে, বন্ধু!

## ৫

পরদিন সকালে মাতঙ্গিনী দেবীর গৃহে গিয়া অরুণ দেখিল, দীপ্তি সেখানে বেশ গল্প জমাইয়া দিয়াছে! কাল যে জীবনের অত বড় একটা সঙ্গীন মুহূর্ত্ত আসিয়া উদয় হইয়াছিল, দারুণ সমস্যার মেঘ বুকে লইয়া…তা তার কথার ভঙ্গী শুনিয়া বুঝা যায় না! তবে মুখ-চোখ শীর্ণ দেখাইতেছিল!

অরুণ ভাবিল, তবে কি তাহারি মত দুশ্চিন্তায় উদ্বেগে দীপ্তিরও রজনী কাল অনিদ্রায় কাটিয়াছে! তাই। নহিলে এমন বৃষ্টি-ধোয়া স্নিগ্ধ প্রভাতে দীপ্তিকে এমন মলিন দেখাইত না কখনোই!

তার মনে একটু আনন্দ হইল! দীপ্তিও তবে তাহাকে তাহারি মত ভালোবাসিয়াছে—এবং আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় তার মনও এমনি কাতর বিচলিত হইয়াছে!…

মাতঙ্গিনী দেবী কহিলেন,—তোমার আজ একটু দেরী হয়ে গেছে অরুণ!

অরুণ কহিল,—হ্যাঁ! রাত্রে বৃষ্টির সময় ঘুমটা ভেঙ্গে গেছলো—তার পর শেষ-রাত্রের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম বলে উঠতে দেরী হয়েচে!…

মাতঙ্গিনী দেবী কহিলেন,—আজ কোন্ দিকে যাচ্ছ তোমরা বেড়াতে?

দীপ্তি তাড়াতাড়ি উত্তর দিল, কহিল,—বোব্ হিলের দিকে পিশিমা!

মাতঙ্গিনী দেবী হাসিয়া কহিলেন,—দুজনে তোমাদের তর্ক-বিতর্ক চলছে তো খুব? সনাতন বিধি-আচার, এগুলোকে চার হাতে ঠেলে ফেলার ষড়যন্ত্র!…

কথাটা শুনিয়া দীপ্তি হাসিল, কিন্তু অরুণের সারা অন্তর কাঁপিয়া উঠিল! ঠিক, এ যে প্রবল ষড়যন্ত্র—এতদিনকার যত্নে-গড়া এই বিরাট সমাজ-সৌধ,—তার বিরুদ্ধে এ তো বিদ্রোহের অভিযান!…পিতার কথা মনে পড়িল—কথায় কথায় একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, ভাঙ্গা ভারী সহজ অরুণ…গড়ায় কি মেহনৎ, কি প্রাণপাত চেষ্টা, তা কখনো ভেবে দেখেচো কি? যেখানটা জীর্ণ, সেখানটা সারিয়ে তোলো। তা সারাবার যদি ক্ষমতা না থাকে, তবে ফশ্ করে এক মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় মস্ত বাড়ীখানাকে গুঁড়িয়ে ভাঙ্গবার জন্য উদ্যত হয়ো না!…

তার মনে হইল, তাদের এই কাজটির পানে সমস্ত সমাজ যেন কৌতূহলী নেত্রে চাহিয়া আছে! সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, না, যে সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছি, তাহাই করিব। দীপ্তিকে ফিরাইব।

চা খাওয়া শেষ হইলে দীপ্তি অরুণের পানে চাহিয়া কহিল,—এসো…

অরুণ অবাক হইয়া গেল, দীপ্তির এই অসঙ্কোচ আহ্বানের সুরে! কোথাও তার এতটুকু উদ্বেগ নাই, দ্বিধা নাই! এমন অনায়াসে, এমন অবলীলায় সে তাকে আজ ডাকিল কি করিয়া? হায় রে, সে বুঝি ভাবিয়াছে, সারা রাত্রি বিশ্রামের পর তার মতে সায় দিবার জন্যই অরুণ প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে!

দুইজনে পথে বাহির হইল। সেই জনস্রোত, সেই সঙ্গ-প্রয়াসী মানবাত্মার বাণী দিকে দিকে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে!…কেহ একা নয়, নিঃসঙ্গ নয়—সকলের মিলিত হাসির কলরবে চারিদিক মুখরিত!…

পথে দুইজনে কোন কথা হইল না। দীপ্তি আসিয়া বোব্ হিলে একটা শিলাখণ্ডের উপর বসিল। রাত্রে বৃষ্টির জলে চারিধারের গাছপালা স্নান করিয়া এমন দিব্য বেশে সাজিয়া উঠিয়াছে যে, তাদের পানে চাহিয়া প্রাণটা এক

নিমেষে তার আলস্য-অবসাদ মুছিয়া তাজা হইয়া ওঠে!

কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিবার পর দীপ্তি কহিল,—ভেবে দেখলে?

অরুণ চমকিয়া উঠিল। দীপ্তির আহ্বানে সে তার মতের বিরুদ্ধে যা-কিছু যুক্তি খাড়া করিয়াছিল, সেগুলা এক মুহূর্তে কোথায় সরিয়া গেল! একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অরুণ কহিল,—হ্যাঁ, ভেবেছি বৈ কি। আর ভেবে তোমাকে জবাব দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছি।...কিন্তু একটু চুপ করো, দীপ্তি। চারিদিকে এই যে নীরবতা ...প্রাণ দিয়ে একটু একে অনুভব করি, এসো দুজনে! চোখের দৃষ্টিতে শুধু কথা কই এসো ...মুখের ভাষায় এ নীরবতা ভেঙ্গে কাজ নেই। কে জানে, হয়তো এমন তর্ক উঠবে...

—বেশ! বলিয়া দীপ্তি সুদূরের পানে চাহিয়া রহিল। তার চোখের সামনে এক স্বপ্নের জগৎ ভাসিয়া উঠিল,—মধ্যে বিশাল সমাজ, লোক-জন স্বাধীন গতিতে কাজ করিয়া চলিয়াছে। কেহ কাহারো মুখ চাহিয়া ঘরের কোণে অলস বসিয়া নাই! সকলেরই মুখে-চোখে আশার কিরণ, প্রাণে কাজের বেগ, পুলকের ছটা!...তার দুই চোখ বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে তার চোখের সামনে কখন যে এ-সব আবার মিলাইয়া গেল, আর তার জায়গায় ফুটিয়া উঠিল, এক প্রকাণ্ড সৌধ. সে সৌধে নর-নারীর কি বিপুল জনতা!...তাদের কল-কোলাহলে দিগ্‌দিগন্ত একেবারে উচ্ছ্বসিত, মুখরিত!...আর ঐ বিরাট সৌধের নীচে...এ কি জীর্ণ কঙ্কাল! এ কার কঙ্কাল? দীপ্তি ভালো করিয়া চাহিয়া দেখে,...তাহারি অস্থি-পঞ্জরকে ভিত্তি করিয়া এ বিরাট সৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে! এত বিরাট, এত উচ্চ যে তার চূড়া গিয়া সুদূর আকাশকে স্পর্শ করিয়াছে! ...সে শিহরিয়া উঠিল। তার অস্থি-পঞ্জর এমন জীর্ণ! পর-মুহূর্তে হাসিয়া সে ভাবিল, কি সুখ, কি এ অসহ্য সুখ গো!...দধীচি মুনি কবে কোন্ অতীত যুগে নিজের অস্থি দিয়াছিলেন, বজ্র-রচনার জন্য! আর সে বজ্রে অসুরের বংশ সমূলে ধ্বংস করিয়া স্বর্গে দেব-দেবীরা রক্ষা পাইয়া বাঁচেন। এ তো পুরাণের কথা! কে জানে, সত্যই দধীচি মুনি ছিলেন কি না! থাকিলেও এমন করিয়া অস্থি দিয়াছিলেন, কি এমন তার প্রমাণ বা আছে! তবে তাকে যদি সমাজের ভ্রূকুটি-লাঞ্ছনা মাথায় ধরিয়া হাসিমুখে নিজের অস্থি-পঞ্জর চূর্ণ করিয়া ঐ স্বপ্নের সৌধকে সত্য করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়, যে-সৌধে তার জাতি প্রাণ পাইয়া বাঁচিবে, তাহা হইলে তার এ-জন্মটা যে বিপুল সার্থকতায় ভরিয়া চিরগৌরবে মণ্ডিত হইবে।...

অরুণ চারিদিকে চাহিয়া প্রকৃতির মুক্ত সৌন্দর্য্য-লীলা দেখিতেছিল। কি উদার, কি মহান্ ঐশ্বর্য্যের রাশি! ইহার কাছে ধন, যশ, সমাজ কত তুচ্ছ!...প্রকৃতির কোলে এই সৌন্দর্য্যের মধ্যে যদি থাকিতে পারা যায় তো কাজ কি ধন-জনে, সঙ্গ-সমাজে!...হঠাৎ দীপ্তির হাতের স্পর্শে তার চমক ভাঙ্গিল। সে ফিরিয়া চাহিল; দীপ্তি তাহারি পানে চাহিয়াছিল। দুইজনের চোখে-চোখে মিলিল! অরুণ ডাকিল,—দীপ্তি...

দীপ্তি বলিল,—কি বলবে তুমি, বলো...

অরুণ কহিল,—তবে শোনো দীপ্তি!...কাল সারা-রাত ঘুমকে ঠেলে এই চিন্তাতেই আমি কাটিয়েছি।

...তার পর সে বুঝাইতে লাগিল, প্রথম যৌবনের অতি-গর্ব্বে যাত্রা সুরু করিবার সময় জীবনকে যদি হঠাৎ অজানা পথে চালানো যায়, তবে তাহাতে বিপদের ভয় আছে বিলক্ষণ! হয়তো পথ নিরাপদ। তবু একবার যাত্রা সুরু করিলে ফিরিবার যখন আর কোন উপায় থাকিবে না, তখন ভালো করিয়া বুঝিয়াই না সে পথ বাছিয়া লওয়া দরকার! এই পথের জন্যই সমস্ত যাত্রাটুকু বিফল ব্যর্থ হইতে পারে—তখন হায়-হায় করিয়াও যে তাকে আর রক্ষা করা সম্ভব হইবে না।

এই কথাটাই নানা যুক্তি নানা দৃষ্টান্তের সাহায্যে এমনি আবেগে সে বলিয়া চলিল, যে তার কথার প্রতি বর্ণে, তার স্বরের ভঙ্গিমায় দীপ্তির প্রতি তার প্রাণের সুগভীর প্রেম বিদ্যুতের মত বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতে-ছিল! সে প্রেমের বিদ্যুৎ দীপ্তির লক্ষ্য এড়াইল না! দীপ্তি তা বুঝিলেও নিজের সঙ্কল্পে অটল রহিল। এ তো তার ক্ষণেকের উত্তেজনা নয়! এ মত যে সে আজ কত দিন, কত মাস, কত বর্ষ ধরিয়া ভাবিয়া নিজের মনে দৃঢ় করিয়া ফেলিয়াছে! সে অরুণকে ভালোবাসিয়াছে খুবই, নিরুপায়ভাবে...খুব গাঢ় গভীর সে ভালোবাসা! তবু তার পণ, তার ব্রত...সে তো স্পষ্ট বলিয়াছে, তার বুক ভাঙ্গিয়া গেলেও এ-পণ সে রক্ষা করিবে, এ সত্য প্রাণ দিয়া পালন করিবে! মুক্তির দিশায় সে যে আকুল,—তা ছাড়া তার নিজের সুখটাই সে একমাত্র কাম্য করে নাই তো! তার জাতি, সমস্ত নারী-সমাজের কল্যাণের জন্য যে সে এই মুক্তির পণে নিজেকে আবদ্ধ করিয়াছে!

দীপ্তি বলিল—তুমি ভুলে যাচ্ছ, এ শুধু আমার নিজের একটা চপল মত নয়, হাসি-খেলা বা তর্কের মধ্যে এর জন্ম নয়। এ একেবারে আমার প্রাণকে বৃন্ত করে জেগে উঠেচে, আমার প্রাণের অংশ...আমার মর্ম্মের অতি-স্পষ্ট জাজ্জ্বল্যসত্য এ!.. একে আমি কোনো-কিছুর মায়ায় অস্বীকার করতে পারবো না!...আমায় নিতে হলে আমার এই প্রাণ-অংশটুকু-সমেত নিতে হবে! তা না নাও, নিয়ো না, নিতে হবে না!...তবে জেনে রেখো,

তোমার কাছে নৈরাশ্যে আমি ব্যথা পাবো খুব, হয়তো দু'মাস বেদনায় মূর্চ্ছিতের মত পড়ে থাকবো···তবু এ পণ ছেড়ে হঠতে পারবো না। আমি জানি, সাথী একজন আমার চাই, আমায় শক্তি দিতে,—আমায় উৎসাহ দিতে,—আমার কথা যাকে শুনিয়ে তৃপ্তি পাই, এমন একজন বন্ধু, সাথী!···তোমায় ভালোবাসি, প্রাণের চেয়েও। এমন প্রিয়জনকে সাথী পাবো, এর চেয়ে সুখের বস্তু আর কি ছিল! তুমি ত্যাগ করলে হয়তো এমন একজনকে জীবনের সাথী করতে হবে, যার জন্য প্রাণ আকুল হবে না! তেমন দুর্ভাগ্য ঘটলেও বাধ্য হয়ে সে-দুর্ভাগ্যকে আমায় বরণ করে নিতে হবে। তোমার কাছে নিরাশ হবার পর হয়তো আর কাকেও ভালবাসতে পারবো না। কিন্তু ভালো না বাসলেও এ ব্রত পালন করার জন্য এক-জন বন্ধু আমায় বেছে নিতেই হবে···

দীপ্তির দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল। তাহা দেখিয়া অরুণ একটু বিচলিত হইল। সে বলিল—এত যদি আমায় ভালোবাসো দীপ্তি, তা হলে আমায় বিশ্বাস করো···একটু বিশ্বাস···

সবলে উদ্যত অশ্রুকে রুখিয়া দীপ্তি বলিল—কিন্তু এ তো আমার ছোট সুখ-দুঃখের কথা নয়···! শুধু আমার কথা যদি হতো এ···দীপ্তি অরুণের পানে চাহিয়া বলিল, —আমার এ সমস্ত জীবনকে আমি তোমার হাতে তুলে দিতে পারি যে, তোমার যা খুশী করো এ জীবন নিয়ে! কিন্তু এর মধ্যে অনেক কথা আছে···ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা—সমস্ত নারী জাতির কল্যাণ এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে!···এ তো শুধু আমারি কথা নয়, আমারি মত নয়। এ যে আমার অন্তরে বসে আমার সমস্ত জাতির আত্মা আমার মুখ দিয়ে এ কথা বলাচ্ছে!···আমার একটা ক্ষুদ্র সুখ, একটা ছোট তৃপ্তির জন্য যদি আমি তাদের এ বাণীকে উপেক্ষা করি, আজ তা হলে নিজের উপরই যে আমার ধিক্কারের আর সীমা থাকবে না!···নারীর এই মর্য্যাদাটুকুকে যদি আমি ভালো না বাসতুম·· তা হলে তোমাকেও বুঝি আজ আমি এমন ভালোবাসতে পারতুম না···

এ কথার মধ্যে অন্তরের কতখানি দৃঢ়তা, কতখানি নিষ্ঠা রহিয়াছে—অরুণ তাহা বুঝিল।···তবে উপায়? দীপ্তি যে-সর্ত্ত তার সামনে ধরিয়া দিয়াছে, সে সর্ত্তে অরুণ তাকে গ্রহণ করিতে পারিবে না। আর সে তাকে গ্রহণ না করিলে, দীপ্তি···না, ইহাতেও তো তাহাকে রক্ষা করা যায় না! কোন্ অপদার্থকে সহায় করিয়া সে জীবন-পথে যাত্রা সুরু করিয়া দিবে, সে হয়তো পথের মাঝে অসহায় তাকে ফেলিয়া পলাইয়া যাইবে। অরুণ তো জানে, এ পৃথিবীতে কাপুরুষ বিশ্বাসঘাতকের সংখ্যা কত। এমনি অনির্দ্দিষ্ট পথে তাকে ফেলিয়া গিয়া অরুণই কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে?···

অরুণ কহিল—আমার কি ভাবনা হয় জানো দীপ্তি···? সকলে বলবে, এক অসহায় নারীকে আমি ভুলিয়ে পথে এনে দাঁড় করিয়েছি।

দীপ্তি কহিল—লোকের কথাকে এখনো তুমি এত বড় করে ধরচো!···বলেচি তো, আমাদের সংগ্রাম করতে হবে, এই সব আচার-পদ্ধতি কুসংস্কারের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে—হয়তো বা সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গেও! সে-সব লোকের কথা গ্রাহ্য করবে? কে কি বলবে? তারা শত্রু, তাদের সঙ্গেই লড়াই! এই লড়া আমাদের জীবনের ব্রত। আমরা যে মুক্তির প্রয়াসী!

যুক্তিতে হারিয়া অরুণ মিনতি ধরিল, অতি-দীন করুণ মিনতি। কিন্তু দীপ্তি তবু অটল। ঘাড় নাড়িয়া সে বলিল—এই এক পথ আছে—সত্যের পথ, মুক্তির পথ।

অরুণ নিরুপায়ভাবে কহিল—তা হলে আরো কিছু-দিন তুমিও ভেবে ছাখো, দীপ্তি। এত বড় কাজ করবার আগে মনকে বিরুদ্ধ যুক্তির মাঝে ছেড়ে আরো ভালো করে ভাবো। এত ব্যস্ত কেন? সমস্ত জীবনটা যে এরি উপর নির্ভর করছে···

দীপ্তি কহিল—না। আজ, এখনি এ প্রশ্নের মীমাংসা করতে হবে। করা চাই।···আমার মনে কোনো দ্বিধা নেই···তোমাকে আমি সব কথা বলেচি, আমার মনের অতিগোপন এতটুকু কল্পনাও অপ্রকাশ রাখিনি। হয় বলো, তুমি রাজী আছো এ সর্ত্তে! নয়, আমায় ত্যাগ করো।

বিস্ময়ে ক্ষোভে দীপ্তির পানে অরুণ চাহিয়া রহিল। নারীর যে ব্রীড়া তাকে অমন সুন্দর কমনীয় করিয়া তোলে, দীপ্তি তাহা বিসর্জ্জন দিয়াছে!···দিক, তবু তাকে বিশ্রী দেখাইতেছে না। সে বলিল,—দীপ্তি, আমি তোমায় ভালোবাসি! এমন ভালোবাসা বুঝি পৃথিবীতে কেউ আর কাকেও বাসেনি! কেন তুমি এ অবিচার করচো! আমি যদি তোমার ভালোবাসার মধ্যে নিজের স্বার্থ খুঁজতুম, তা হলে এখনি বলতুম, তুমি যা চাও, তাই হোক, তাই—তুমি আমার! কিন্তু আমার প্রেম এমন নীচ নয়, হীন নয়! তাই সবার আগে তোমার মর্য্যাদা, তোমার কল্যাণের কথা ভেবে বার-বার তোমায় সতর্ক করচি—শোনো, আমার কথা তুমি শোনো। এ অন্ধ আবেগ তুমি ত্যাগ করো, সুস্থ মন নিয়ে আর একবার ভাবো।

—ঢের ভেবেচি। দীপ্তি কহিল,—তা হলে এই তোমার শেষ কথা? বেশ, এইখানেই তা হলে যবনিকা পড়ুক।···দীপ্তির স্বর অবিচল গম্ভীর। কাতরতার চিহ্ন কোথাও নাই!

অরুণের সমস্ত মন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।—না, না দীপ্তি, এই আমার শেষ কথা নয়। তুমি এমন সুন্দর, এমন সতেজ সুস্থ সবল তোমার মন—তাতেই আমি মুগ্ধ হয়েচি, পাগল হয়েচি, দীপ্তি! আমি দুর্ব্বল পুরুষ, আমার উপর তুমি অকরুণ হচ্ছো!

দীপ্তি কহিল,—আমার সৌন্দর্য্যের মোহে ভুলিয়ে তোমায় আকৃষ্ট করতে আমি কোনদিন চাইনে, তোমার মধ্যে যে-মনের পরিচয় আমি পেয়েচি, সেই মনের সঙ্গ-লাভের জন্য আমি আকুল। তোমার যা মত, আমার মতের সঙ্গে তার খুব মিল আছে।—তবে কেন তুমি কর্ম্মক্ষেত্রে নামবার সময় এখন এত কুণ্ঠিত হচ্ছো?

অরুণ কহিল,—তোমার মতের সঙ্গে আমার মতের মিল আছে, দীপ্তি। তোমার এ মতকে, তোমার এ আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আমি শ্রদ্ধা করি—কিন্তু তার জন্য আমার এ নিষেধ নয়।...তা হ'লে খুলেই বলি তোমায়। তোমার সঙ্গে পরিচয় হবার আগে পুরুষ আর নারীর মিলন সম্বন্ধে আমার এই মত ছিল যে, মনের মিলই এখানে একমাত্র মন্ত্র, সংস্কৃত কতকগুলো শ্লোক এর মধ্যে ব্যঙ্গের মত শোনায়। আর নারীর মুক্তি বলো, স্বাধীনতা বলো, এই পথেই তো পাওয়া যাবে...বিবাহের বৈধতা, মনের স্বচ্ছন্দ অবাধ মিলনের অবৈধতা—এগুলো শুধু নারীকে দেবে বশে রাখবার জন্য পুরুষের তৈরী কঠিন ফাঁশ, তার ধাপ্পা... সারা জীবন ধরে নারীর উপর একাধিপত্য-বিস্তারের প্রবল চেষ্টা। তা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ ভগবানের বিধান নয়। এ বিয়ের মন্ত্র তিনি ছন্দে গেঁথে দেননি। এ রচেছে পুরুষ, নারীর উপর প্রভুত্ব শুধু খাটাবার জন্য। মানুষ ছাড়া পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গের পানে চেয়ে ছাখো, তাদের মধ্যেও মিলনের সুর বয়ে চলেছে...প্রাণে-প্রাণে মিলনের লীলা! ভগবানের যদি তাই না ঈপ্সিত হবে, কেন তবে তিনি অবোলা পশু-পক্ষীর অন্তরও এই প্রেম, এই সঙ্গ-লিপ্সা এই মমতা, এই স্নেহ দিয়ে অমন করে গড়ে তুলবেন! অর্থাৎ আমার কথা এই যে, আর সমস্ত নারী তো চুপ করে আছে, এই আচার-বিধির বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহ তুলচে না—মাঝে থেকে তুমি কেন এ ভার মাথায় নিয়ে লাঞ্ছনার বিষে জর্জ্জরিত হবে! লোকে তোমায় কত কুকথা বলবে। আমাকে বলবে, যে, শক্তি থাকতেও তোমায় আমি নিবৃত্ত করি নি! নিজের জঘন্য তুচ্ছ তৃপ্তির মোহে এতে তোমায় আরো উৎসাহিত ক্ষিপ্ত করে তুলেচি!

দীপ্তি কহিল,—ও সব কথা আমিও ভেবে দেখেছি বহুদিন। কেন তুমি আমায় এতে উৎসাহিত না করে বার বার নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করচো...

—কারণ, তোমায় আমি ভালোবাসি! তাই।

দীপ্তি কহিল—তা হ'লে এর মানে দাঁড়াচ্ছে এই যে, তোমায়-আমায় এখন বিদায় নেবার পালা এবার!

উদ্বেলিত কণ্ঠে অরুণ কহিল—না, না, বিদায় নয়, বিদায় নয়। তুমি বলেচো, আমায় তুমি ভালোবাস দীপ্তি। নারী যখন এত বড় কথা বলে পুরুষের কাণে, তখন এমন মূঢ় কে আছে যে, তা প্রত্যাখ্যান করতে পারে! নারীই চিরদিন পুরুষের কাম্য...নারীকে সাধনা করে পেতে হয়! বিশেষ তোমার মত নারীর ভালোবাসা ...এর চেয়ে পরম কাম্য পৃথিবীতে আর কি আছে!...এই অযাচিত অনুগ্রহ—এ যে গৌরবের জিনিস, এ আমার মাথার মণি! না, না, তোমায় আমি ছেড়ে দিতে পারবো না।

দীপ্তি কহিল—তা হলে তুমি আমার! আমাকেও তোমার বলে গ্রহণ করচো!

—হ্যাঁ গো, তুমি আমার, তুমি আমার...আবেগে উত্তেজনায় অরুণের স্বর কাঁপিয়া ঝরিয়া পড়িল...

দীপ্তিও কৃতজ্ঞতায় প্রেমে বিবশার মত অরুণের বুকে মাথা রাখিল।-তার অন্তর চিরিয়া মৃদু-কম্পিত মর্ম্মোচ্ছ্বাস ফুটিল—প্রিয়তম, আমি তোমার, একান্ত তোমার!

মাথার উপর নির্ম্মল নীল আকাশ, পাশে হিমালয়ের হিম-শিখর নিস্পন্দ বিস্মিত দৃষ্টিতে এই অপূর্ব্ব মিলন দেখিল,...আর পাহাড়ের গায়ে পাইন-ঝাড়ের ডালে একসঙ্গে কতকগুলা পাখী কূজন-ধ্বনিতে এ মিলনকে অভিনন্দিত করিল।

---

## ৬

এইরূপে কতক ইচ্ছায়, কতক অনিচ্ছায় অরুণকে দীপ্তির মতে সায় দিতে হইল! নহিলে ঐ রূপ, ঐ মন... সে যে হাতের বাহিরে চলিয়া যায়। কি দৃঢ় ভঙ্গিমায় দীপ্তি নিজেকে খাড়া রাখিয়াছে...এমন নির্ম্মম সে...! একটা অসম্ভব মতের পায়ে এমনি করিয়া নিজের জীবনকে বলি দিবে!—নিরুপায় অরুণ কহিল,—তাই হোক দীপ্তি।

তখন আসিল মস্ত এক সন্ধিক্ষণ! জীবনের খুঁটি-নাটি নানা কাজের সূক্ষ্ম আলোচনা! অরুণ অত বড় মতের সামনে এমনি বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া গিয়াছিল যে, ভবিষ্যতের পথ তার মনের নাগালের বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছিল। শুধু এইটুকু সে বুঝিয়াছিল যে,—সে ও দীপ্তি একসঙ্গে এই সমুদ্রে জীবন-তরী ভাসাইয়া চলিবে। সে তরী ভাসানো হইলে কোন্ ঘাট তাদের লক্ষ্য হইবে, সে কথার মীমাংসা করিতে গিয়া বিবাহের কথাই শুধু তার মনে জাগিতেছিল! অথচ এই বিবাহ ব্যাপারের সঙ্গেই দীপ্তির যত বিরোধ! একই গৃহে দুই-জনে তারা বাস করিবে...এক চিন্তা, এক মন! কিন্তু সে গৃহে সেই তো পুরুষের প্রভুত্ব! দীপ্তি কহিল,—না, এক

ঘরে বাসের কি প্রয়োজন? কিছু না! জীবনে স্বতন্ত্র ঘরে বাস করিয়া এমন কি দূরে থাকিয়াও যে আমরা বন্ধুর প্রীতি-পরিপূর্ণ-আনন্দে উপভোগ করি।…তবে?…এ প্রীতি—এও বন্ধুর প্রীতি, প্রিয়জনের সখ্য!—এক গৃহে বাস করিলে সেই তো পুরানো আচারের দাস্য করা হইবে!…তা ঠিক হইবে না। দীপ্তি কহিল, স্বাধীনভাবে দুইজনে এমনই আমরা থাকিব। আমার গৃহে তুমি আসিবে, নিত্য, আমার প্রাণের প্রিয়,…আমার মনের প্রীতি, হৃদয়ের মধু পান করিতে…আমার সন্তানদের পিতা আমাকে ও আমার সন্তানদের দেখিতে আসিবে।…আমার স্বাধীন সত্তা বজায় রাখিয়া স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য আমি পালন করিব। তবে সংসারের কোন কাজে স্বামীর সাহায্য লইব না, স্বামীর বশ্যতা স্বীকার করিব না।

এই সব কথা লইয়া দীপ্তি বহুদিন ধরিয়া নিজের মনে আলোচনা করিয়াছে। আর এই সব আলোচনার দ্বারাই সে স্থির করিয়াছে, বাসের ব্যবস্থায় কোন পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নাই! অরুণের সহিত এই যে মিলন…এ প্রাণের কামনায় পুরুষের সহিত নারীর সখ্য, নিবিড় সখ্য…এর মধ্যে দায়িত্ব চাপাইবার প্রয়োজন নাই!…একা—সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-ঘোষণা নয় এ! নারী ও পুরুষের শরীর-মনের পরিপূর্ণ বিকাশ ছাড়া এ আর কিছু নয়! তাদের চারিদিক দিয়া সার্থক করিয়া তুলিবার জন্যই শুধু এ-মিলন!…তার জন্য বাহিরের ব্যাপারে কোনো পরিবর্ত্তন —না, প্রয়োজন নাই, বরং তাহা করিলে বিশ্রী দেখাইবে। দীপ্তি অবাক হইয়া যাইত! নর-নারীর এই মিলনোৎসব—একান্ত যাহা মনের ব্যাপার, তাহাতে লোক-জনের ভিড় লাগাইয়া সমারোহ বাধাইয়া খাওয়া-দাওয়ায় প্রচণ্ড উৎসাহ জাগাইয়া যে-কাণ্ড করা হয়, তাহা একান্ত হৃদয়-হীন, একান্ত বর্ব্বর, বিসদৃশ!—তবু এ কাহারো চোখে পড়ে না, আশ্চর্য্য! দুটি হৃদয় যখন একান্ত গোপনে পরস্পরকে আত্ম-নিবেদন করিবে, তখন চারিদিকে এই হট্টগোল, এই সমারোহ—লক্ষ লোকের এই উৎসুক কৌতূহলী দৃষ্টি তাদের হৃদয়-বিনিময়ের শান্ত ক্ষণটিকে বর্ব্বর কোলাহলে চিরিয়া ছিঁড়িয়া তার মাধুর্য্য নষ্ট করিয়া দিবে না? এ প্রাণের ব্যাপারেও হট্টগোল! তাহা নিতান্ত নির্ম্মম ঠেকে!

এ সমারোহের অর্থ শুধু এই যে, আর একজন নারী, ঐ ভাখো, পুরুষের দাস্য স্বীকার করিয়া তার নিজের সত্তা হারাইতে চলিয়াছে…বাজাও দামামা, বাজাও দুন্দুভি! গগনভেদী শঙ্খরোলে পুরুষের এই বিজয়-বার্ত্তা দিকে দিকে ঘোষণা করো। আদিম বর্ব্বরতার সেই পৈশাচিক অট্টহাস ছাড়া এ আর কি!…

তাদের মিলনে বাহিরে এতটুকু সাড়া উঠিবে না। একজন বাহিরের লোকের দৃষ্টিও তাদের এ প্রাণের মিলনের উপর পড়িয়া মিলনকে বিষাক্ত করিবে না, তার স্নিগ্ধতার কোনোখানে আঘাত দিবে না। দুটি প্রাণের এ আত্ম-নিবেদন একান্ত নিভৃতে সম্পাদিত হইবে!…পাছে সমাজের কোথাও কোন তর্ক ওঠে, বা এ মিলন লইয়া কোথাও কোন আলোচনা চলে, সেজন্য ভয়ে-ভয়ে দীপ্তির এ সতর্কতা নয়! সে চায়, এ প্রাণের ব্যাপার নীরবে সম্পন্ন হোক!…

দীপ্তি বলিল, বালিগঞ্জ ষ্টেশনের কাছে তার একখানি ক্ষুদ্র কুটীর আছে। সেখানি অল্প ভাড়ায় লইয়া সে তাকে তার রুচি আর সামর্থ্য-মত পরিপাটী করিয়া সাজাইয়াছে। সেইখানে সে বাস করে। আর প্রত্যহ ট্রেণে করিয়া কলিকাতায় তার স্কুলে পড়াইতে আসে!…তার গৃহের আশে-পাশে কয়েক ঘর দরিদ্র লোকের বাস। তা ছাড়া মাঠ, বাগান, জলা ঘাট-বাট পাখীর গানে সকালে-সন্ধ্যায় নিত্য-মুখরিত—খোলা আলো-বাতাসে স্নিগ্ধ-শীতল তার এই ক্ষুদ্র গৃহ যে আরাম সঞ্চিত রাখে, তাহাতে প্রাণ-মন জুড়াইয়া যায়। সেখানে তার কোন অভাব নাই। সে একা থাকে। একটা দাসী আসিয়া বাসন-কোসন মাজিয়া জল তুলিয়া দিয়া যায়, দীপ্তি নিজের হাতে রান্নাবান্না ও ঘরের অন্য যা-কিছু কাজ করে। তাহাতে তার এতটুকু ক্ষোভ নাই—কষ্টও কিছু হয় না। তা ছাড়িয়া অরুণের ঐশ্বর্য্য-সেবিত প্রাসাদে সে বাসের কামনা করে না। আর অরুণের প্রাসাদে বাস করিতে আসিলে তাকে তো অরুণের বশ্যতা স্বীকার করিতে হইবে! তার আরাম-তৃপ্তির জন্য অরুণ পয়সা জোগাইবে। তাহা হইলে সেই অরুণের প্রভুত্বকে বরণ করিয়া তাকে সেই কৃত্রিম বাঁধনে বাঁধা পুরানো প্রণালীতেই জীবন বহিতে হইবে! সে তা চায় না! সে কথা মনে হইলে চিত্ত তার ক্ষুব্ধ বিরূপ হইয়া ওঠে!

তবে এ মিলনে লাভ কি?—সমাজের দিক দিয়া, অর্থের দিক দিয়া কোন লাভ ইহাতে নাই! সে লাভ দীপ্তি চায় না!…এ মিলন শুধু তার নারীত্বকে প্রসারতা দিবে—সেই জন্যই সে ইহাকে বরণ করিতেছে! এ প্রীতি, এ সখ্য—এ শুধু জীবনকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য! কি পুরুষ, কি নারী, দুই জনেরই জীবনকে পরিপূর্ণভাবে গড়িয়া তোলা চাই—নহিলে জীবনের সার্থকতা থাকে না! নারীকে তার জীবন পরিপূর্ণ করিতে হইলে মাতৃত্বকেও গ্রহণ করিতে হইবে…নহিলে জীবের অস্তিত্ব লোপ পাইবে, নারী-জীবনের প্রধান দিকটাই অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে! দীপ্তির স্বাধীনতার বাসনা এমন অন্ধ নয় যে ও-দিককে সে একেবারে উপেক্ষা করিয়া চলিবে! তাহা হইলে নারী যে নারী, সে পুরুষ নয়—যা লইয়া নারীর বৈশিষ্ট্য, সেটাকেই অস্বীকার

করা হয়! আর এ বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করা যা, নারীকে অস্বীকার করাও তাই!

সন্তানদের লালন-পালন? তাদের শিক্ষা? তাতেও কোন বাধা নাই। পুরুষ ও নারী দুই জনে মিলিয়া সন্তানের জন্ম দিয়াছে—সে-সন্তানদের পালন করিবে নারী, তার মমতা দিয়া, স্নেহ দিয়া···আর পুরুষ তার শিক্ষার ভার লইবে। ইহাতে গোলই বা কি, আর বিশৃঙ্খলাই বা আসিবে কোথা হইতে! নর-নারীর এ মিলনের ভিত্তি যে প্রীতি! সেই প্রীতি উভয়কে তাদের কর্ত্তব্য-পালনে সচেতন রাখিবে।···

এমনি করিয়া বিরাট দাস্য ঘুচিয়া পৃথিবীর বুকে মনের যে বাঁধন গড়িয়া উঠিবে, তাহারি জোরে পৃথিবীর যত-কিছু দুঃখ-দৈন্য ক্ষোভ হাহাকার সব ঘুচিয়া যাইবে, বিরাট সাম্যের প্রতিষ্ঠা হইবে! বিবাদ-কলহের অন্ত হইয়া এমন এক সুমহান্ জগৎ জাগিয়া উঠিবে, যাহা প্রীতির রসে স্নিগ্ধ, কর্ত্তব্যের স্পন্দনে চকিত, স্বাস্থ্য ও স্বাধীনতার হাওয়ায় ভরপূর! সে এক আনন্দের জগৎ! দীপ্তির বিহ্বল দৃষ্টির সামনে এই আলোর জগৎ তার উজ্জ্বল আভাসে জাগিয়া উঠিল!

আরো এক সপ্তাহ ধরিয়া ভবিষ্যতের এমনি নানা ছবি গড়া চলিল। অরুণ সে ছবির সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া গেল। কিন্তু তার চেয়েও ঢের বেশী মোহিত হইল, এ স্বপ্নের জগৎ যে গড়িয়া তুলিতেছে, তার রূপের ও মনের দীপ্তিতে!

সেদিন সন্ধ্যায় বেড়াইবার পর দীপ্তির গৃহে অরুণের নিমন্ত্রণ ছিল। অরুণের মনে হইল, সন্ধ্যার আকাশ যেন নির্ম্মল নীল বেশে সাজিয়া নক্ষত্রদের লইয়া উৎসুক নেত্রে পৃথিবীর পানে কৌতূহলে চাহিয়া আছে। তার জীবনে এ যে এক পরম ক্ষণ! চাঁদও হাসি মাখিয়া নক্ষত্রদের পাশে ঐ আসন পাতিয়া বসিয়া গিয়াছে। শীত পড়িলেও জ্যোৎস্না-প্লাবিত উপবনে পাখীর গান মুহুর্মুহু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। পাইনের বন হইতে ধীর পায়ে বাতাস আসিয়া তরু-কুঞ্জে পাতার আড়াল ঠেলিয়া মৃদু-মর্ম্মরে অধীর প্রতীক্ষা জানাইতেছিল। অরুণের মনে হইল, তার জীবনে সন্ধ্যা এমন বিচিত্র মধুর বেশে আর কোন দিন দেখা দেয় নাই! আজিকার এই অম্লান সন্ধ্যা এক অপূর্ব্ব সুরে গান ধরিয়াছে!···তার মনে হইল, তার যৌবন-নিকুঞ্জে পাখী গাহিয়া উঠিয়াছে,—সখি, জাগো, জাগো···

দীপ্তির গৃহে আসিয়া অরুণ দেখিল, ছোট ঘরখানি তৃণ-লতায় পাহাড়ী ফুলে দীপ্তি অপরূপ বিচিত্র সাজে সাজাইয়া তুলিয়াছে। বারান্দায় একটা বাহারে চীনা লণ্ঠন জ্বলিতেছিল। বারান্দার পরে ঘর। ঘরের আগুন-রাখার সামনে কৌচখানির উপর দু'টি ফুলের আসন। গৃহকোণে ছোট অর্গানটার গায়ে ফুল-হার জড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। উৎসবের সুস্পষ্ট আভাস শুধু ঘরে নয়, দীপ্তির মুখে-চোখেও বিচিত্র রাগে উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছে! দীপ্তি অর্গানের পাশে বসিয়া গান গাহিতেছিল,—

ওহে নবীন অতিথি,
তুমি নূতন কি চিরন্তন।
যুগে যুগে কোথা তুমি ছিলে সঙ্গোপন!
যতনে কত কি আনি বেঁধেছিনু গৃহখানি—
হেথা কে তোমারে বলো, করেছিল নিমন্ত্রণ!

অরুণ ঘরে ঢুকিয়া আবেশ-বিহ্বল দৃষ্টিতে দীপ্তির পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাকে দেখিয়া দীপ্তি গান থামাইয়া উঠিয়া আসিয়া তার হাত ধরিল, কহিল—এসো···

দীপ্তির অঙ্গে লজ্জার রক্তিম ছটা সন্ধ্যার মেঘের মতই তাকে ঘিরিয়া ধরিল। অরুণ মন্ত্র-চালিতের মত আসিয়া কৌচে বসিল, দীপ্তি তার পাশে বসিল। দীপ্তি বলিল—এই নূতন জীবনে আজ আমরা আমাদের মনকে অভিষিক্ত করবো। আজ থেকে আমাদের সখ্য, আমাদের প্রীতি পৃথিবীর সমস্ত বেদনা-ঝঞ্ঝা অকাতরে বইবার জন্য প্রস্তুত থাকবে। আজ দুটি হৃদয় এক লক্ষ্য নিয়ে এই মহা-ব্রত-পালনে যাত্রা করবে। প্রিয়তম, আজ থেকে আমি তোমার প্রিয়তমা প্রাণের সঙ্গিনী! আর তুমি আমার একমাত্র প্রিয়তম প্রাণের স্বজন!

দীপ্তির ডাগর দুই চোখে কি ও বিহ্বলতা!···অরুণ আবেশে তাকে বুকের উপর টানিয়া তার অধরে চুম্বন করিল। দীপ্তিও অরুণের অধরে আজ তার প্রথম প্রণয়-অর্ঘ্য নিবেদন করিল। তার পরেই সে অর্গানের ধারে গিয়া বসিল, বসিয়া কহিল—আমাদের এ অপূর্ব্ব সখ্য গানে-গানে সুরে-সুরে আমাদের ছেয়ে ফেলুক। বলিয়াই অর্গান টিপিয়া সে গান ধরিল,—

ওহে সুন্দর মম গৃহে আজি পরমোৎসব-রাতি!
রেখেছি কনক-মন্দিরে কমলাসন পাতি।
তুমি এস হৃদে এস, হৃদি-বল্লভ হৃদয়েশ,
মম অশ্রুনেত্রে কর বরিষণ করুণ হাস্য-ভাতি!
তব কণ্ঠে দিব মালা দিব চরণে ফুলডালা,
আমি সকল কুঞ্জ-কানন ফিরি এনেছি যূথি জাতি।
তব পদতল-লীনা, বাজাব স্বর্ণ-বীণা,
বরণ করিয়া লব তোমারে মম মানস-সাথী।

গান গাহিয়া দীপ্তি কহিল,—এর একটা কথা বদলাতে চাই। পদতল-লীনা কেন? ওটা 'হৃদয়-লীনা'

করে গাইবো···বলিয়া সে অরুণের উত্তরের জন্য না থামিয়া আবার গাহিল,—

এ কি আকুলতা ভুবনে! এ কি চঞ্চলতা পবনে!
এ কি মধুর মদির-রসরাশি, আজি শূন্য-তলে চলে ভাসি!
ঝরে চন্দ্র-করে এ কি হাসি, ফুল-গন্ধ লুটে গগনে!

অনেক রাত্রি অবধি গান চলিল। যখন গান থামিল, তখন গানের সুরে আর দীপ্তির রূপের দীপ্তিতে অরুণ একেবারে মাতাল হইয়া উঠিয়াছে!

দীপ্তি বলিল,—অনেক রাত হয়ে গেছে। খাবার আনি।· বলিয়া সে দুইজনের খাবার লইয়া আসিল। তার পর আহার শেষ হইলে দীপ্তি অরুণের পানে চাহিল। অরুণের মন আবার বিহ্বল হইয়া উঠিল। দীপ্তি অরুণের হাত ধরিয়া ডাকিল,—বন্ধু, প্রিয়তম···

অরুণ কহিল,—অনেক রাত হয়ে গেছে দীপ্তি। বাড়ী যাই।

দীপ্তি কহিল—এত রাত্রে···? এই শীতে···?

অরুণ দীপ্তির পানে চাহিল, দীপ্তির মুখে-চোখে লজ্জা যেন মাখানো রহিয়াছে!

অরুণ ডাকিল,—দীপ্তি···

দীপ্তি কহিল—আজ আমাদের মিলনের বাসর···বলো,
পূর্ণ হলো তোমার নিয়ম প্রভু হে, তোমারি হলো জয়!
তোমার কৃপায় এক হলো আজি এই যুগল হৃদয়!

---

## ৭

কলিকাতায় ফিরিবার পরে ছয়মাস দীপ্তির সুখের আর অন্ত রহিল না। অরুণও এই সুখ অজস্র পান করিতেছিল।···তবে এ সুখে বেদনাও মাঝে মাঝে কাঁটার মত খচ্‌ খচ্‌ না করিত, এমন নয়। দীপ্তি পূর্ব্বেকার মত সারা দিন তার স্কুলে ছাত্রী পড়াইত এবং বৈকালে ট্রেণে করিয়া গৃহে ফিরিত; ফিরিয়া নিজের হাতে অরুণের খাবার তৈরী করিয়া তাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উদ্যত থাকিত।

অরুণ নিত্য তার কোর্টের কাজ সারিয়া মোটরে করিয়া দীপ্তির গৃহে আসিয়া উদয় হইত; তার পর সেখানে চার-পাঁচ ঘণ্টা কাটাইয়া গৃহে ফিরিত।···তার বুকটা মাঝে মাঝে দুলিয়া উঠিত—যখন সে দেখিত, দীপ্তির গৃহের দ্বারে নিত্য যে তার গাড়ী আসিয়া এই দাঁড়াইতেছে এবং রাত্রির অনেকখানি কাল এইখানেই সে-গাড়ী দাঁড়াইয়া থাকে, অথচ বাড়ীতে থাকে তরুণী দীপ্তি, একা···এ ব্যাপারে পাড়ায় বেশ খানিকটা কৌতূহলের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। তার গাড়ীর সামনে কৌতূহলী দর্শকের দল শুধু আসিয়া ভিড় জমাইত, তা নয়—তাদের চোখে তীব্র প্রশ্ন-ভরা বিদ্রোহের দৃষ্টিও সে কত দিন অমন লক্ষ্য করিয়াছে! তার গা ছম-ছম করিয়া উঠিত! ইহারা কি ভাবিতেছে? দীপ্তির সম্বন্ধে মৃদু স্বরে তাহাদের দুই-একটা গ্লানির কথা সে কাণে শুনিয়াছে! অথচ দীপ্তিকে সে কথা বলিতে কোনদিন তার সাহসে কুলায় নাই। দীপ্তির মুখে-চোখে উদ্বেগের চিহ্ন মাত্র নাই। উদ্বেগ কি, তার জীবনে কোথাও লক্ষ্য করিবার মত কোন পরিবর্ত্তন আসিয়াছে, এমন কোন লক্ষণ দেখা যায় না! সে বেশ অনায়াসে সহজভাবে নিত্য তাকে অভ্যর্থনা করে, আর বিদায়ের বেলায় তার দৃষ্টি অশ্রু-সজল হইয়া ওঠে! সে যে বিচ্ছেদের বেদনা অনুভব করিতেছে, সেটা স্পষ্ট দেখা না গেলেও অরুণ এটুকু লক্ষ্য করিয়াছে যে দীপ্তি সে-বেদনাকে প্রাণপণে রুখিয়া তাড়াইবার জন্য কতখানি ব্যাকুল!

কিন্তু আশ-পাশে লোকগুলার ঐ তীব্র প্রশ্ন-ভরা দৃষ্টি মেলিয়া দীপ্তিকে দেখিতে আসায় দীপ্তিকে সে কতখানি লাঞ্ছনায় আর গ্লানিতে ভরিয়া তুলিতেছে, ইহা ভাবিয়া সে আকুল হইয়া উঠিত। তাছাড়া মোটরের সোফারটাও এমন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চায়···! ইতর ইহারা, সঙ্কীর্ণ ইহাদের মন, তাহাদের মিলনের মাধুর্য্য বা গৌরব ইহারা বুঝিবে না, এবং তা না বুঝিয়া ছাই-পাঁশ কি যে তারা ভাবিতেছে, ইহা ভাবিয়া গ্লানির আগুনে অরুণ পলে-পলে দগ্ধ হইতেছিল!

কিন্তু ছয় মাস ধরিয়া নিত্য এত রাত্রে বাড়ী ফেরা··· বাড়ীতে ফিরিবার সময় তার বুক এমন অধীর স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া উঠিত! পিশিমা ছিলেন গৃহে। এই পিশিমাই অরুণকে মানুষ করিয়াছেন। মা যখন বাঁচিয়া ছিলেন, তখনো তার যা কিছু ঝক্কি এই পিশিমাই সহিয়া আসিয়াছেন। পিশিমা প্রায় বলিতেন—কোর্টে এত কি কাজ তো'র বাবা যে এত রাত্রে বাড়ী ফিরিস্!

অরুণের বুক গুর্‌গুর্ করিয়া উঠিত। সে বলিত,—একটি বন্ধু একা থাকেন, তাঁর বিশেষ অনুরোধে তাঁর কাছে রোজ যাই পিশিমা—তার পর কথায় কথায় ফিরতে রাত হয়ে যায়!

পিশিমা বলিতেন,—সেই বালিগঞ্জের ওধারে যাস্··· ড্রাইভার বলছিল।

অরুণের বুক এবার ছাঁৎ করিয়া উঠিল। সে বলিল—হ্যাঁ!···বলিয়াই সে চট্ করিয়া নিজের ঘরে সরিয়া পড়িল।

অরুণ ভাবিল, সর্ব্বনাশ! ড্রাইভার যদি সেই সঙ্গে আরো কিছু বলিয়া থাকে, সে বন্ধু পুরুষ নয়, এক সুন্দরী তরুণী!···অরুণ হাসিল, ইহাতে কুণ্ঠিত হইবারই বা কি আছে! পিশিমা তো তাকে চেনেন—সে যে কোন

রকম হীন আলাপে মত্ত হইতে পারে, পিশিমা এমন কথা কখনো বিশ্বাস করিবেন না!…তবু সে সতর্ক হইল। কোর্টের পর গৃহে ফিরিয়া জলখাবার খাইয়া বেশভূষা পরিবর্ত্তন করিয়া সে বাহির হইতে লাগিল,—মোটরে নয়, ট্রেণে করিয়া। সন্ধ্যায় বালিগঞ্জে গিয়া একেবারে শেষ ট্রেণে কলিকাতায় ফিরিত!…

কিন্তু এদিকে আর এক আশঙ্কার উদয় হইল। অরুণ জানিল, দীপ্তি পুত্র-সম্ভবা।…যদি এখন দীপ্তি স্কুল ছাড়িয়া না দেয়, তাহা হইলে স্কুলে একটা কুৎসার সৃষ্টি হইতে পারে! দীপ্তি বিবাহ করে নাই—এবং তাকে যে-ভাবে স্বামিত্বে বরণ করিয়া জীবনে নূতন সুর দিয়াছে, স্কুলের কেহ তা জানে না! এ ক্ষেত্রে…

ভয়ে ভয়েই এক দিন সে দীপ্তির কাছে কথা পাড়িল! দীপ্তি কহিল,—এতে লজ্জা করবার তো কিছু নেই! লোকে কি ভাববে? কিন্তু লোক-মতকে আমি তো কোনদিন গ্রাহ্য করিনি…আজই বা কেন করবো? আমি তো জানি আমি কোন •অপরাধে অপরাধী নই,—আমি নিষ্পাপ, নির্ম্মল…লোকে যা খুশী ভাবে ভাবুক, যা-খুশী বলুক! তাতে আমার কিছু এসে যাবে না। আমার জীবনে এ যে এক চরম ক্ষণ… মাতৃত্বের গৌরবে আমি এবার ধন্য হবো! এতেই তো নারী-জীবনের সার্থকতা!

অরুণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তার পর কহিল—সে কথা নয় দীপ্তি…এ সময় এভাবে তোমার খাটুনি উচিত নয়। সেই জন্যই আমি বলচি…

দীপ্তি কহিল,—কি?

অরুণ কহিল,—সাম্‌নে আমারও পূজোর ছুটী আস্‌চে—চলো না, কোথাও বেড়িয়ে আসি। জীবনটা একঘেয়ে হয়ে পড়চে না? একটু ঘুরে দৃশ্য-বৈচিত্র্যের মধ্যে থেকে সেটাকে ঝালিয়ে নিতে কি দোষ?

দীপ্তি কহিল,—এ কথা মন্দ নয়। বেশ, আমি ছুটী নেবো—দু'মাসের ছুটী অক্লেশে আমি নিতে পারি!

অরুণ কহিল,—তাই নাও! যে নবীন অতিথি আসচে, তাকে মাধুর্য্য দিয়ে অভিনন্দন করতে চাই!…

—বেশ! বলিয়া দীপ্তি চুপ করিল। একটা বিপুল মহিমায় মন তার ভরিয়া উঠিল। এবার সে মাতৃত্বের গৌরব লাভ করিবে!…সন্তানের মা হইবে—সন্তান! তার এই ব্রতে তারই রক্ত-মাংসে গড়া, তারই ছায়ায় রচা আর-একটি জীবকে সে এই মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া এই সত্য-পথের পথিক করিবে!…এ যে কি সুখ!

দুই জনে পরামর্শ চলিল। পরামর্শে স্থির হইল, কোদারমায় যাওয়া যাক্‌। কোদারমা বেশী দূরে নয়। তার উপর ষ্টেশনের কাছে অরুণের এক মক্কেলের পরিচ্ছন্ন একখানি নূতন বাংলা আছে। ভাড়া কম। তাছাড়া কোদারমায় হাওয়া খাওয়ার যাত্রীরা তেমন ভিড় জমায় না! সেই ভালো হইবে।

কিন্তু দীপ্তির মনে একটা দ্বন্দ্ব চলিল, সত্য কথা স্কুলের কর্ত্রীকে বলিতে হানি কি! অরুণ কহিল,—কাজ নেই! কতকগুলো কুৎসার প্রশ্রয় নাই বা দেওয়া হলো!

দীপ্তি কহিল, লোকের কথা—সে তুচ্ছ করিতে শিখিয়াছে। কোন অপরাধ সে করে নাই, অন্যায়ও কিছু না! তবে…? আর তা না বুঝিয়া যদি কেহ কুৎসা করে, ক্ষতি কি!

অরুণ কহিল, এ তো মিথ্যা কোন কথা বলিতে চাওয়া নয়! ছুটীর কারণ দেখাইবার কারণ নাই! প্রাপ্য ছুটী—চাহিলে পাইবে। চাহিবার অধিকার যখন আছে, তখন অনর্থক কুৎসার সৃষ্টি করাইয়া কতকগুলা বাজে কথা তোলায় সার্থকতা কি! যখন ফিরিয়া কাজে আবার যোগ দিবে, তখন তো সব কথার মীমাংসা হইবেই।

—আচ্ছা—বলিয়া দীপ্তি অরুণের মতে সায় দিল!

তবু পরদিন আবার এই কথাটাই দীপ্তি ভাবিতে বসিল। অরুণের কথায় এই সায় দেওয়া—এ তো সেই পুরুষের বশ্যতা সে স্বীকার করিয়া লইল!…হানি কি? অরুণ তাকে কতখানি ভালোবাসে! বন্ধুর প্রতি স্নেহে বন্ধুর অনেক কথাও তো জীবনে শিরোধার্য্য করিতে হয়, এ ক্ষেত্রেও নয় তাই হইল! এখানে তার কথা ঠেলিলে সেই তো আবার পুরুষ-নারীর বৈষম্যের কথা আসিয়া পড়ে! দীপ্তি তা চায় না! বন্ধুত্বের খাতিরে সে নয় একটু কম নারী, আর অরুণ একটু কম পুরুষ হইল।—তবু সেই পুরুষ-নারীর বৈষম্যকে তো ঘুচানো গেল না! পুরুষের চিন্তা বহুদূর অবধি প্রসারিত হয়, তার দৃষ্টি সুদূর ভবিষ্যতেও বেশ চলে…আর নারী …? এই যে প্রকৃতিগত একটি দৌর্ব্বল্য, ইহা কি দূর করা যায় না?…

তবু একটা মতকে শিরোধার্য্য করিয়া জগতের পথে অগ্রসর হওয়া কত কঠিন! ঘটনার বহু আবর্ত্তে পড়িয়া কত তোলাপাড়া খাইতে হয়! স্নেহ-মমতা প্রীতি-সখ্য—ইহাদের শক্তিও কম নয়! এ যে মানুষের মন!… তবে ঐ কুৎসা! হীন মনের কুৎসিত অভিব্যক্তি সে! কাপুরুষতার উচ্ছ্বাস!… গালির উপরেও যীশু খৃষ্টকে অনেক বেশী সহিতে হইয়াছিল—চৈতন্যদেবকে লোকে পাগল বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিত!… চলা পথ ছাড়িয়া আলাদা পথে চলিয়া বিশ্বে যাঁরা সত্যের সন্ধানে ফিরিয়াছেন, তাঁদেরই যে এমনি গ্লানি আর অত্যাচার নীরবে সহিতে হইয়াছে! আর তারা সামান্য কথার দুটো আঘাত সহিতে পারিবে না? যখন দুজনেই জানে, এই পথ ঠিক, এবং তারা সত্য পথের যাত্রী…!

দীপ্তি স্কুলে ছুটীর দরখাস্ত দিল। কর্ত্রী শুধু বলিলেন, —বেশ কথা,—পূজোর বন্ধ আসচে তো, তার পরে ওদিকে বড়দিন···তোমার শরীরটা ইদানীং ভালো দেখচি না। মুখে গায়ে কেমন কালির রেখা পড়েচে···বেশ, দুদিন ছুটী নিয়ে ঘুরেই এসো!

কর্ত্রীর এ কথা কহিবার বা দীপ্তির দেহে কেন এ পরিবর্ত্তন, সে দিকে লক্ষ্য করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না! দীপ্তি আরামের নিশ্বাস ফেলিল। অরুণ খুবই খুশী হইবে—ছুটী লইবার কারণ আর বলিবার দরকার হয় নাই!···অরুণ যে তাকে অত ভালোবাসে···তার জন্য অরুণ কি না করিতে পারে! সেই অরুণকে সে যে খুশী করিতে পারিবে,তার পক্ষেও কতখানি এ সুখের কথা!···

অরুণের কিন্তু মুস্কিল বাধিল! বাড়ীতে পিতা এক-দিন তাকে ডাকিয়া বলিলেন,—এঁরা বহুদিন বেড়াতে বেরোন্ নি। এই ছুটীতে, সব বলচেন, বেড়াতে বেরুবেন। কাশী, এলাহাবাদ এ-সব ঘুরে সেই দিল্লী, মথুরা, বৃন্দাবন অবধি যাবেন। তোমার পিশিমার সাধ, দ্বারকা অবধি যান্! তোমারো তো লম্বা ছুটী আসছে —তুমিই এঁদের নিয়ে যাবে। আমি বলেচি।

অরুণ শিহরিয়া উঠিল। সর্ব্বনাশ! সে যে দীপ্তিকে লইয়া কোদায়মায় যাওয়ার সব ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে! উপায়? যাইবার দিনও তারা দুইজনে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে, ১০ই। আজ তো মাসের ছ' তারিখ।

অভয় মিত্র কহিলেন,—কি! চুপ করে রইলে যে?

ধীরস্বরে অরুণ কহিল—কিন্তু আমি যে অন্য বন্দো-বস্ত করে ফেলেচি!

অভয় মিত্র কহিলেন—কি বন্দোবস্ত, শুনি?

অরুণ কহিল—এক বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে যাবো বলে···

অভয় মিত্র কহিলেন—বেশ তো! বন্ধু এঁদের সঙ্গেও যেতে পারেন তো! তাতে কারো আপত্তি নেই!

অরুণ কহিল—কিন্তু···

অভয় মিত্র কহিলেন—এর মধ্যে আবার কিন্তু কিসের? আমি তো কোনো দিন বাড়ীর মেয়েদের অতিরিক্ত পর্দ্দায় ঢেকে রাখিনি। তা ছাড়া তোমার বন্ধু, সে ছেলের মত, ঘরের লোক। তবে তোমার এত চিন্তা কিসের?

অরুণ ভাবিল, আর গোপন করা চলে না! এ কথা অরুণ অনেক দিনই ভাবিয়াছে! এই যে অতিথি আসিতেছে—সমাজ তাকে যে-চোখেই দেখুক —সে জানে, সে তারি সন্তান—তার ও দীপ্তির প্রাণ-অংশ দিয়া গড়া পরম স্নেহের ধন সে! তাকে তার নিজের সব পরিচয় হইতে বঞ্চিত রাখার কথা মনে হইলে অরুণ শিহরিয়া ওঠে! সে তার এই নিজের গৃহে আপনার সমস্ত দাবী-দাওয়া লইয়া তার নিজের স্বত্বে এই সংসারের একজন বলিয়া আপনার পরিচয় দিবে না? তা যদি না হইল তো সেই অসহায় নিরীহ জীবকে কি বলিয়া সে জগতে আনিতে চায়?

কিন্তু পিতাকেও সে জানে! তাঁর মন স্নেহ-মমতায় কুসুমকোমল হইলেও নিষ্ঠায় বিশ্বাসে কতখানি অটল, কঠিন, তাও তার অবিদিত নাই!···হঠাৎ এত-বড় বিপ্লবের কথা শুনিয়া তিনি যে বিষম ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই! আবার যখন সে বিপ্লব তাঁর নিজের গৃহে! তাঁরই বড় আশার বড় আদরের জ্যেষ্ঠ পুত্রের দ্বারা সে বিপ্লব ঘটিয়াছে! সে কথা শুনিয়া তিনি কি করিবেন, অরুণ তাহা ভাবিয়া পাইল না!

পিতা কহিলেন—কি ভাবচো?

অরুণ ডাকিল—বাবা···

অভয় মিত্র পুত্রর পানে চাহিলেন। পুত্র ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। তার পায়ের নীচে মাটী দুলিয়া উঠিল।

অভয় মিত্র আজ কালকার দিনে সব দিকেই মানুষটি খাঁটী। তাঁর ধোপ্‌দোস্ত ফিটফাট পোষাক যেমন তাঁকে পরিচ্ছন্নতার দিকে অতিরিক্ত মনোযোগী বলিয়া পরিচয় দেয়, তেমনি তাঁর মনের ভিতরটাও তিনি অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন রাখিয়া আসিতেছেন, চিরকাল। তাঁর চরিত্রে কোন প্রকার দুর্ব্বলতা নাই; এবং কোনরূপ দুর্ব্বলতাকে তিনি ক্ষমা করেন না। তিনি মুখে যা বলেন, কাজে তা করেন। রোগী দেখিতে গিয়া কেশ্‌ শক্ত দেখিলে মিথ্যা আশায় রোগীর আত্মীয়জনকে যেমন স্তোক্ দেন্ না, তেমনি শুধু রোগীর হাত টিপিয়া বা তার বুকে নাম-মাত্র একবার ষ্টেথেস্‌কোপ বসাইয়া চট্‌পট আপনার কর্ত্তব্য সারিয়া সরিয়া পড়েন না! বয়স ষাটের কাছাকাছি হইলেও তাঁর বুদ্ধি এখনো বেশ তীক্ষ্ণ। কথার ছলে তাঁকে ঠকানো বা তাঁর কাছে ধাপ্পা চালানো যে খুব কঠিন, এ কথা একবার ক্ষণেকের জন্য যে তাঁর সঙ্গে মিশিয়াছে, সেই জানে। তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা এমন ছিল যে তাঁর ছেলেরাও হঠাৎ তাঁর কাছ ঘেঁষিতে ভয় পাইত। তাঁর হাসির মাত্রা খুব পরিমিত—তুচ্ছ কথা বা তুচ্ছ হাসিকে তিনি কোনদিন আমোল দেন না! জীবন নানা কর্ত্তব্যে ভরপূর, তার কোথাও ফাঁকি চলে না; এবং সকলে মিলিয়া নিজেদের ছোটখাট স্বার্থ ফেলিয়া একটা শৃঙ্খলা ও পারিপাট্যের মধ্যে বাস করিবে, ইহাই ছিল তাঁর মত। এবং তাঁর এ মত কতখানি দৃঢ়, অবিচল, অরুণ তা খুবই জানে!

অভয় মিত্র পুত্রের মুখে ছোট্ট ডাকটুকু শুনিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার পানে চাহিলেন; তারপর বলিলেন,—কি বলছিলে, বলো···

অরুণ সভয়ে কোনমতে বলিয়া ফেলিল যে তার এই একজন শিক্ষিতা মহিলা; এবং তাঁকে সে পাকা কথা দিয়া ফেলিয়াছে ত তাঁর সঙ্গে সামনের এই পূজার বন্ধে কলিকাতার বাহিরে সে বেড়াইতে যাইবে! যাইবার দিন-ক্ষণ পর্য্যন্ত স্থির হইয়া গিয়াছে!

অভয় মিত্র ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন,—মহিলা! শিক্ষিতা!···তাহলে কিছুদিন আগে যে শুনেছিলুম, তুমি কোর্টের ফেরত রোজ সন্ধ্যার পর বালিগঞ্জে যাও, এ তাঁর ওখানেই···?···সত্যি?

অরুণ ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, কথাটা সত্য!

অভয় মিত্র কহিলেন,—তা এ মহিলাটিও কি একলা তোমার সঙ্গে বাইরে যাচ্ছেন?···

অরুণ কহিল,—হ্যাঁ।

অভয় মিত্র কহিলেন,—তাঁর বাপ-মা এতে মত দিয়েচেন?

অরুণ কহিল,—তিনি তাঁর বাপ-মার সঙ্গে একত্র থাকেন না।

অভয় মিত্র কহিলেন,—মহিলাটির বিবাহ হয়েচে?

অরুণ ঢোক গিলিল, কহিল,—না।

অভয় মিত্রর আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন,—বিয়ে হয়নি! একলা থাকেন! আর তোমার সঙ্গে এত অন্তরঙ্গতা···!···কি রকম মহিলা···? কথাটা বলিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তিনি অরুণের পানে চাহিলেন।

অরুণ কহিল,—এমন শিক্ষিতা, এমন উঁচু মনের মহিলা আমি আর একটিও দেখিনি···

অভয় মিত্র কহিলেন,—ও, তোমাদের লভ্ হয়েচে! তা এঁকে বিয়ে করলেই তো গোল চুকে যায়···

অরুণের বুক একটা আশার উচ্ছ্বাসে ভরিয়া উঠিল। সে কহিল,—বিয়েয় এঁর মত নেই।

অভয় মিত্র যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, কহিলেন,—চমৎকার! বিয়েয় মত নেই—অথচ তোমার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা···! বুঝেচি!···তা এ রকম মহিলার সঙ্গে তুমি বেশ অবাধে মিশচো···তোমার শিক্ষা-দীক্ষাও তাহলে চমৎকার হয়েচে, দেখচি!···এ মহিলাটির সঙ্গ তোমায় ছাড়তে হবে। এ থেকেও বুঝচো না, তাঁর মতি-গতি কি ধরণের?

অরুণ মনে বেদনা পাইল। সে কহিল—না বাবা, এঁর মন নিষ্পাপ, নির্ম্মল। ইনি ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য পশুপতি চক্রবর্ত্তীর মেয়ে।

পশুপতি চক্রবর্ত্তীর মেয়ে!···পশুপতি চক্রবর্ত্তী তো একজন মাননীয় ব্যক্তি, শ্রদ্ধার যোগ্য! এ তাঁর মেয়ে হইয়া বাপের কাছে থাকে না,···আর এই তার মতি-গতি! অভয় মিত্র একটু থামিলেন, পরে কহিলেন,—তা বেছে-বেছে আমার টাকা-কড়ির ওপর তাঁর নজর পড়লো কেন হঠাৎ?

অরুণ রাগিয়া উঠিল।...বৃথা রাগ! রাগ চাপিয়া যথাসাধ্য শান্ত স্বরে সে কহিল,—টাকার তিনি কাঙাল নন্। তাঁর কোন বিলাসিতা নেই। তিনি একটা স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিয়েচেন, নিজের হাতে সংসারের কাজ করেন। কারো পয়সা তিনি চান্ না।

অভয় মিত্র কহিলেন,—এইটেই তার ব্রহ্মাস্ত্র, বাপু। এই অস্ত্রে পয়সাওলা লোকের বোকা ছেলের তাক্ লাগিয়ে তাকে গ্রাস করা—এটা ওস্তাদী চাল!

—তিনি অতি সরলা···অরুণের চোখ জ্বলিয়া উঠিল।

অভয় মিত্র তাহা গ্রাহ্য না করিয়া তার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—তাই তুমি দয়া-পরবশ হয়ে তাঁকে নিয়ে নির্জ্জন-বাসে চলেছো! এ নির্লজ্জ কথা আমার কাছে তুমি বললে কি করে? এই শিক্ষা পেয়েচো তুমি আমার কাছে! ···তুমি যে মস্ত-বড় আহাম্মক, আমি তা জানি। কিন্তু এত-বড় আহাম্মকি করবে, তা স্বপ্নেও ভাবিনি।... এমনি ভাবে তার সঙ্গে মেলামেশায় তোমার অধিকার কি আছে বাপু? বিয়ে করবে না, অথচ পরস্পরে এই অন্তরঙ্গতা চলবে, এর অর্থও তো শুধু একটি-মাত্র দেখি! অর্থাৎ তুমি তাকে ভুলিয়ে তার সর্ব্বনাশ করবে!···আশ্চর্য্য, এটা তোমার ভদ্রতাতেও বাধচে না!

উচ্ছ্বসিত স্বরে অরুণ কহিল,—আমি তাঁকে ভোলাইনি। আমি কেন?—পৃথিবীর কোন রাজা-মহারাজাও তাঁকে কোন লোভে ভোলাতে পারে না, এমন দৃঢ় সবল তাঁর চরিত্র!

অভয় মিত্র একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন, বলিলেন,—কিন্তু একেই ভোলানো বলে। তোমার ব্যবহারে সে এমন আশা নিশ্চয় মনে গড়ে তুলেচে, যে আশা দেওয়া তোমার পক্ষে দারুণ অভদ্রতা, নীচতা! আর এর ফলে, একদিন যদি তার সন্তান-সম্ভাবনা হয়, তখন তুমি হয়তো তাকে এমন পঙ্কে নিমজ্জিত করবে, যা থেকে ওঠবার তার আর কোন উপায় থাকবে না। তখন তুমি সরে পড়বে ভয়ে লজ্জায়! আর তার ব্যর্থ জীবনের অভিশাপ তোমাকে পলে পলে দগ্ধ করবে!···তা যদি হয় তো জেনো, তোমার সে লজ্জায়, সে গ্লানির ব্যাপারে আমি কোন প্রশ্রয় দেবো না! এতে যদি তোমায় পরিত্যাগ করতে হয় তো—বৃদ্ধ অভয় মিত্রর স্বর নিমেষের জন্য রুদ্ধ হইয়া রহিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া, কাশিয়া গলা সাফ করিয়া তিনি বলিলেন,—তোমায় পরিত্যাগ করিতে আমি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হবো না! মনে করো না, তোমার স্বর্গগতা গর্ভধারিণীর স্মৃতির খাতিরেও তোমায় ক্ষমা করবো!

অরুণের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত টলিয়া উঠিল। সে তখন সংক্ষেপে পিতাকে বুঝাইয়া দিল, এই মহিলাটি তরুণী এবং তাঁর মনের গতি খুবই স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী। আর সেই পক্ষপাতিতার জন্যই তিনি সমাজের কোন আচার-প্রথারই সমর্থন করেন না! পুরুষ ও নারী বন্ধুর মত বাস করিবে; এ প্রীতির ফলে সন্তান জন্মিলে নারী তার লালন-পালন করিবে, আর পুরুষ তার শিক্ষার ভার লইবে—সন্তানের সম্বন্ধে এইমাত্র দুজনের দায়িত্ব··· এমনি তাঁর মত!

অভয় মিত্র কহিলেন,—বুঝেচি, তিনি পুরুষের স্ত্রী হয়ে পুরুষের সঙ্গে বাস করতে চান না, গণিকা হয়ে থাকৃতে চান! তাতে দায়িত্বও কিছু নেই! নব নব সুখে নিত্য মত্ত থাকা যায়!

রোষে অরুণের চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। কঠিন স্বরে সে ডাকিল,—বাবা···তারপর·চকিতে স্বর মৃদু করিয়া কহিল, —তাঁর মতের সঙ্গে আমারও মতের মিল আছে। আমিও তাঁর সঙ্গে এই যে মেলামেশা করচি, এর জন্য কোনদিন অনুতাপ বোধ করিনি, অনুতাপ করবো না। আপনাকে আমি সব-চেয়ে শ্রদ্ধা করি···কিন্তু তাঁর উপরও আমার শ্রদ্ধা কম নয়! বিশেষ তিনি শীঘ্রই আমার সন্তানের জননী হবেন! আমাদের সন্তান-সম্ভাবনা হয়েচে!

অভয় মিত্র শিহরিয়া অরুণের পানে চাহিলেন; তাঁর মুখে কোন কথা ফুটিল না। অরুণ কহিল—আর এর জন্য আপনার ভ্রূকুটি, সমাজের কুৎসা যদি আমার মাথা পেতে নিতে হয় তো তাতেও আমি প্রস্তুত আছি। একটা এত বড় সত্যের জন্য যদি নিজের সব সুখ আমায় বলি দিতে হয়, আমাকে সমাজচ্যুত হতে হয় তো তাতে কাতর বা ক্ষুব্ধ হবো না! এই কথাটা অনেক দিন থেকে আপনার পায়ে জানাবো ভাবছিলুম—আজ সুযোগ পেয়ে বলে আমি নিশ্চিন্ত হলুম।

অভয় মিত্র সরোষে অরুণের পানে চাহিলেন। এই তাঁর পুত্র···বেইমান, অকৃতজ্ঞ! একটা তরুণীর রূপের মোহ এত বড় যে বাপকে অনায়াসে অগ্রাহ্য করিতেছে!— যে-বাপের কৃপায় সে আজ মানুষ হইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছে! বাপের স্নেহ, বাপের মায়া একটা তরুণীর ভ্রূ-বিলাসের লীলা দেখিয়া অনায়াসে আজ সে কাটিতে চায়!···কাটুক!—কেনই বা তাঁর মায়া এ পুত্রের প্রতি! তিনি সরোষ কণ্ঠে কহিলেন,—একদণ্ডে সব ঠিক হয়ে গেল! আজন্মের স্নেহের বন্ধন একটা তুচ্ছ খেয়ালে কেটে ফেলচো!···বেশ! আমি চিরদিন জানি, তোমার মন অত্যন্ত দুর্ব্বল। একটা উত্তেজনার ঝোঁকে তুমি পাহাড়ের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়তে পারো! আমি তা গ্রাহ্য করি ! বলিয়া ঘড়ি বাহির করিয়া তিনি সময় দেখিলেন, পরে পকেটে ঘড়ি রাখিয়া বলিলেন,—এ-সব ছোট কাজে মন দেবার মত সময় আমার নেই। তবু শেষ কথা তোমায় বলচি, এখনো ফেরবার সুযোগ দিচ্ছি—পারো, তাকে বিবাহ করো।···এ বিবাহে আপত্তি করবো না। বিবাহ করে তাকে তোমার পত্নীর মর্য্যাদা দিয়ে আমার ঘরে নিয়ে এসো, আমি তাকে পুত্রবধূ বলে সমাদর করে ঘরে নেবো। আমার দিক থেকে আদর-স্নেহের কোনো অভাব হবে না!···আর তা যদি না পারো, আমার গৃহে তোমারো আজ থেকে আর স্থান নেই।

কথাটা বলিয়া তিনি আবার ঘড়ি দেখিলেন, পরে কহিলেন,—আর সাত মিনিট সময় আছে! তুমি তা হলে এঁকে নিয়ে পশ্চিমে যাচ্ছো! যাও, কিন্তু তাঁকে সেখানে তোমায় বিবাহ করতে হবে! বিবাহ করলে এ ঘরে দুজনেই আদরে থাকবে!···তা যদি না হয়, তা হলে এই-খানেই আমাদের ছাড়াছাড়ি···চিরদিনের জন্য···বুঝলে!

অরুণের মুখ দুঃখে অভিমানে রাঙা হইয়া উঠিল। সে কহিল,— তিনি কিছুতেই বিবাহ করবেন না। সে সব কথা তাঁর সঙ্গে বহুকাল পূর্ব্বে হয়ে গেছে এবং আমরা কোনদিন বিবাহ করবো না, এই সর্ত্তে পরস্পরে পরস্পরকে গ্রহণ করেচি।

অভয় মিত্র তীব্র দৃষ্টিতে অরুণের পানে চাহিলেন, তার পর কহিলেন,—তা হলে আজই তোমার মহিলা-বন্ধুর ওখানে তোমার আস্তানা পাতোগে। এ কথার পর তোমাকে একদণ্ড এ গৃহে আমি থাকতে দিতে পারি না। আমরা তুচ্ছ সামাজিক জীব, আমাদের নৈতিক মত অন্য রকমের।—তোমার এ উদার মতের ছোঁয়াচ তোমার বোনেদের পাছে স্পর্শ করে, এ কথা ভাবতে ভয়ে আমায় মন ভরে ওঠে! তার পর একটু স্তব্ধ থাকিয়া কতকটা বিদ্রূপের ভাবেই তিনি কহিলেন,—শিক্ষিতা মহিলা! বিবাহ করবেন না, অথচ পুরুষকে নিয়ে যৌবন-লীলায় মত্ত থাকবেন! চমৎকার!

অরুণ কহিল,—নারীর কল্যাণ-কামনায় নিজেকে তিনি উৎসর্গ করেচেন।

অভয় মিত্র তীব্র স্বরে কহিলেন—আর এ পাগলামিতে প্রশ্রয় দিতে যোগ্য নায়ক তিনি বেছে নিয়েচেন তোমাকে! আহাম্মক গাধা ছোকরা!...সমাজের মধ্যে থেকে তুমি সমাজের ভিত্তি এমনি ভাবে প্রচণ্ড বিদ্রোহে নাড়া দেবে! মানব-মনের গোড়ার জিনিষটাকে অগ্রাহ্য করবে! স্ত্রী-পুরুষের মিলনকে শান্ত সংযত পবিত্র শ্রদ্ধার জিনিস করে গড়ে তোলবার একমাত্র বিধি বিবাহ, তাকে আমোল দেবে না!···তোমাদের বিলেতেও যে এ-সব অনাচার এখনো ঘটতে সুরু হয় নি!···যাক্, আমার সময় কম, তা ছাড়া এ-সব বাজে কথায় মাথা ঘামাতে

আমি কখনও ভালোবাসি না! আমার যা কথা, তোমায় বলেচি। সে কথা মান্‌তে পারো আমার ঘরে স্থান পাবে। না হলে উদার দুনিয়ায় তোমাদের অতি-উদার মত নিয়ে চরে বেড়াও গে!···

কম্পাউণ্ডার নিবারণ আসিয়া সংবাদ দিল গাড়ী তৈরী! অভয় মিত্র কহিলেন,—আমার কথা মনে রেখো! এ কথা যদি পালন করা শক্ত বোঝো, তা হলে ফিরে এসে যেন শুনি, তুমি এ-বাড়ী ছেড়ে গেছ! আর এ-বাড়ীর কেউ নও তুমি। আমার এত কষ্টে রোজগার-করা টাকার একটা টুক্‌রো তোমাদের এই বাঁদরামিকে সাহায্য করবে না—এ কথাও জেনে রেখো।

তিনি একটা নিশ্বাস ফেলিলেন; তার পর বলিলেন,—আমি ভাববো, আমার ছেলে অরুণ ছিল···মারা গেছে!

নিবারণ অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অভয় মিত্র একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিলেন,—এসো হে নিবারণ!··· বলিয়া তিনি নিবারণকে লইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

অরুণ কিছুক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল, পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া টলিতে টলিতে পাশের ঘরে ঢুকিয়া মূৰ্চ্ছিতের মত একটা কৌচে ঢলিয়া পড়িল।

---

## ৮

মন একটু শান্ত হইলে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া অরুণ বরাবর গোলদীঘির দিকে আসিল। গোলদীঘিতে আসিয়া সে একটা বেঞ্চে বসিয়া চিন্তার গহনে নিজের মনকে ছাড়িয়া দিল! পিতা তার প্রতি আজ এ কত বড় অবিচার করিলেন! সে কি অপরাধ করিয়াছে যে, এত বড় রূঢ় শাস্তি তিনি দিয়া গেলেন! স্নেহ-মায়া ভালোবাসার সব বন্ধন এক কথায় কাটিয়া দিলেন!··· স্নেহ-মমতা এমন দুর্ব্বল ভিত্তির উপর বসিয়া ছিল!··· কেবল স্বার্থের একটা সরু সূতায় ভর করিয়া দুলিতেছিল! এমন যে—স্বার্থে-প্রভুত্বে একটু ঘা লাগিতে তা ভাঙ্গিয়া ছিঁড়িয়া যায়! এত ভঙ্গুর এই স্নেহ-মমতা লইয়া সমাজ!···কারো স্বার্থে এখানে ঘা পড়িবার জো নাই!··· অমনি বিরোধ!···কি বিপুল স্বার্থপরতাকে আশ্রয় করিয়া এই সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে! কাহারো মনের প্রতি কেহ চাহিয়া দেখিবে না? সে-মন কত বড় সত্যের আশ্রয় লইয়া কি নির্ম্মল স্নিগ্ধতায় ভরিয়া আছে, তা কেহ দেখিবে না···শুধু নিজের স্বার্থ দিয়া সকল ব্যাপারের বিচার-নিষ্পত্তি করিবে! এ-সব ভাবিয়া মন তার কতক হাল্‌কা হইল। এ সমাজের বন্ধন, এ তো নাগপাশ! এ-বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়া সে আজ বাঁচিয়া গিয়াছে!

···যদি সে দীপ্তির দেখা না পাইত? তাহা হইলে একা, নিঃসঙ্গ দিন কাটাইয়া চলিত! এবং বিবাহ না করিয়া এমনি নিঃসঙ্গ থাকিয়া যদি সে কোন গোপন ব্যভিচারে আপনাকে ডুবাইয়া রাখিত, তাহা হইলেও সমাজের কোনদিক হইতে কোন কথা উঠিত না! পিতার বিশ্বাস আর স্নেহ বুঝি অটল থাকিত···! অথচ তা না করিয়া দুটি মুক্ত হৃদয় সর্ব্বপ্রকার বন্ধন কাটিয়া একত্র মিশিয়াছে—সে মিলনকে তারা গোপন করিতে চায় না, কোন ভাণ বা মিথ্যা অনাচার দিয়া তাহা ঢাকিয়া রাখিতে চায় না—সেই জন্যই শাসনের এই রুদ্র হুঙ্কার! ···কোন দুঃখ নাই। তাদের এ মিলন···ঐ ভণ্ড সমাজের নিয়ম মানিয়া তার পুরানো গণ্ডী স্বীকার করে নাই বলিয়া পঙ্গু, অচল হইবে? কখনো না!··· অসতীত্ব কাকে বলে? যে-মিলনে প্রেমের নাম-গন্ধ নাই! তাদের মিলন?···প্রেমের দৃঢ় ভিত্তি এ-মিলনের একমাত্র আশ্রয়। এর কাছে বিবাহের মন্ত্র? সে তো কতকগুলা ভুয়ো কথা মাত্র!

সে দিন বেলা পড়িতে সে দীপ্তির গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল। দীপ্তি কহিল,—আজ যে এত সকাল সকাল এলে!

দীপ্তির পানে চাহিবামাত্র অরুণের মন সঙ্কোচে ভরিয়া উঠিল!···এই নির্ম্মল নিষ্পাপ দেহ-মন লইয়া সত্যের কি অটল দার্ঢ্যে দীপ্তি দাঁড়াইয়া আছে·· পিতা এর অন্তরের দাম বুঝিলেন না, বুঝিবার প্রয়াস পাইলেন না! না বুঝিয়া নিতান্ত নির্ম্মম নিষ্ঠুর প্রাণে কতকগুলা ইতর সন্দেহের তীক্ষ্ণ বাণ ইহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন!···এমন বে-দরদী পিতার পুত্র হইয়া দীপ্তির সামনে দাঁড়াইতে লজ্জায় হীনতায় যেন তার মাথা কাটিয়া গেল!

অরুণ কহিল—তুমি তৈরী হও, দীপ্তি! আর কটা দিন বা আছে!

দীপ্তি কহিল—কোদারমাই ঠিক্ তা হলে?

অরুণ কহিল,—নিশ্চয়।

অরুণ ভাবিয়াছিল, পিতার সঙ্গে তার সব সম্পর্ক সে ছিন্ন করিয়া আসিয়াছে! দীপ্তি ছাড়া বিশ্বে তার আজ আপন-জন আর কেহ নাই!—তবু এই কথাটা সে বলিতে পারিল না। দীপ্তির এই নিশ্চিন্ত আরাম-সুখ—না জানি, সে কি আঘাতই পাইবে! বাহিরকে যখন সে পরিহার করিয়া আসিয়াছে, তখন সেখানকার ধূলি-জঞ্জাল, সেখানকার কোলাহলের একটু ছিটাও আর জাগাইয়া তুলিয়া কাজ কি! এখানে তর্ক নয়, ঝড় নয় ···শুধু শান্তি, শুধু সুখ!

মাঝের এ কয়টা দিন একটা হোটেলে থাকিয়া অরুণ কোনমতে কাটাইয়া দিল। এক-একবার ইচ্ছা হইতেছিল,

পিশিমার সঙ্গে দেখা করিয়া আসে। কিন্তু না! বাবা বলিয়াছেন, ভাই-বোনদের মনে যেন তার বিদ্রোহী চিত্তের ছোঁয়াচ এতটুকু না লাগে! অভিমানে অরুণের মন ভরিয়া উঠিল। আজ মা বাঁচিয়া থাকিলে গৃহের দ্বার বন্ধ থাকিত না!…কখনো না!…মা তাকে আদর করিয়া ঘরে ফিরাইয়া লইয়া যাইতেন! মার স্নেহ-দৃষ্টিতে এ নির্ম্মলতা এ উদারতা কখনো এড়াইয়া থাকিত না! বাবা ত্যাগ করিয়া যদি সুখী হন, বেশ, তাই হোক! তার চোখের কোলে জল ছাপাইয়া আসিল। সে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

তার পর যথা-নির্দ্দিষ্ট দিনে ট্যাক্সি আনিয়া দীপ্তিকে লইয়া সে বালিগঞ্জ ত্যাগ করিল। যাইবার সময় বাড়ী-ওয়ালাকে তার ভাড়া চুকাইয়া বাড়ী একেবারে ছাড়িয়া দিয়া গেল।

তারা চলিয়া গেলে সারা পল্লী ভরিয়া একটা কুৎসা সাড়া দিয়া উঠিল,—এই মেয়েটির ভিতরেও এত ছিল…গোপনে আলাপ-পরিচয়! ঝীটা আরো তীব্র সংবাদ দিল—মেয়েটি প্রসব হইতে চলিয়াছে! …পাড়ার লোক তাহা শুনিয়া একবাক্যে বলিল—অমন লেখা-পড়া জানার মুখে আগুন! ছি!…এ পাড়া ছাড়িয়া পাপ হইতে পল্লীটাকে খুব যাহোক্ বাঁচাইয়া গিয়াছে!…

কথাগুলা অবশ্য অরুণ বা দীপ্তি কেহই শুনিল না! তারা তখন দীপ্ত আবেগে ষ্টেশনের পথে যাত্রা করিয়াছে।

কোদারমায় আসিয়া সুখের আর অন্ত রহিল না। চারিদিকে প্রকৃতির কি অবাধ মুক্তি। দূরে পাহাড়গুলা যেন এই বিচিত্র রমণীয় দৃশ্যের পিছনে সমাজের ভ্রুকুটির মত দাঁড়াইয়া আছে! ও ভ্রুকুটি আছে বলিয়াই না মুক্তির আনন্দ এমন স্পষ্ট অনুভব করা যায়! আলোর পিছনে কালো আছে বলিয়াই না আলোর এত আদর!

তার পর এই মুক্তির মাঝে দুইজনে পরস্পরকে এমন পাশাপাশি পাইয়াছে, অহরহ, সর্ব্বক্ষণ…এক-মুহূর্ত্ত বিচ্ছেদ নাই। দীপ্তির কাছে এ আনন্দ একেবারে অভিনব—প্রাণের জনকে সর্ব্বক্ষণ এমনি প্রাণের পাশে পাওয়া! …এমন একসঙ্গে বাস, একসঙ্গে বেড়াইতে যাওয়া। মনটাকে যেমন করিয়াই সে গড়িয়া তুলুক, নারীর প্রাণ তো!…

বেড়াইতে গিয়া অরুণ উচ্ছ্বসিত আনন্দে কত দেশের কত গল্প বলে, গানের মত দীপ্তির কানে সে যেন অমৃত বর্ষণ করে!…অরুণের জ্ঞানের গভীরতা অনুভব করিয়া তার মন শ্রদ্ধায় ভরিয়া ওঠে। অরুণের কাছে জগতের কত বিষয়ে কত শিক্ষাই সে লাভ করিল।…দীপ্তির মন তার নিজের অজ্ঞাতে অরুণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া এক অপরূপ সার্থকতায় ভরিয়া উঠিল। এই শিষ্যত্ব তাকে একদিন দেখাইয়া দিল, সে নারী, অরুণ পুরুষ। অনেক বিষয়ে পুরুষের উপর নারীকে নির্ভর করিতেই হইবে—এ নির্ভর করা ছাড়া নারীর উপায়ান্তর নাই। এইখানেই নারীর নারীত্ব। এই নির্ভরশীলতা বহু যুগের বহু জন্মের সংস্কারে নারীর প্রাণের বস্তু হইয়া তার প্রাণ-রসে মিশিয়া আছে! তাকে একেবারে উপেক্ষা করা নারীর চলে না। ঐ যে সামনে একটা বড় গাছ তার বিপুল শক্তিতে বাড়িয়া উঠিয়াছে, তার গলা বেড়িয়া কত পাকেই না একটি লতা ঐ আপনাকে বাড়াইয়া তুলিতেছে! গাছটা ছাঁটিয়া ফেলো, লতাটিও তার সঙ্গে সঙ্গে ধূলি-লীন হইয়া যাইবে। নারীও এমনি পুরুষের গা বেড়িয়া বেড়িয়া উঠিতেছে।

দীপ্তির মন হঠাৎ বাধা পাইল। সে ভাবিল, সত্যই কি তাই? পুরুষ নহিলে নারীর বাড়িবার, কি বাঁচিবার উপায় সত্যই নাই? দীপ্তি হাসিল, বেশ, তবে তাই হোক! এ নির্ভরতার মূলেও তো ঐ প্রীতি! তাকে সামাজিক বিধি বাঁধিয়া বিবাহ নাম নাই দিলে! এ প্রীতি থাকিলে যে সব থাকিল! এ প্রীতিকে একটা বিধির গণ্ডীর মধ্যে না ফেলিলেও এ প্রীতি প্রীতিই থাকিবে!…তবে? বিবাহ বলিয়া তার আর-একটা নাম নাই দিলাম! প্রাণের এই মুক্ত মিলনকে একটা শাসনের পাশে নাই বাঁধিলাম! দীপ্তি ভাবিল, ঠিক!

তার পর নির্জ্জন অবসরে তার চিন্তা আর একটা বিষয়ে আপনাকে তন্ময় করিয়া ফেলিত। যে ক্ষুদ্র জীব তার বুকে এই নূতন স্পন্দন জাগাইয়া তুলিয়াছে, এই যে নবীন অতিথি আসিতেছে,—তার সৌন্দর্য্যে, নির্ম্মল সৌকুমার্য্যে আপনাকে ভরিয়া…এ যে কি অকথিত সুখের মূর্চ্ছনার মত…! তার চিন্তায় দীপ্তির মন অপূর্ব্ব পুলকে ভরিয়া উঠিত! এ অতিথি তারি রক্তে-মাংসে গড়া, অরুণের রক্তে-মাংসে গড়া…দুজনের প্রীতি-সখ্যের জীবন্ত উচ্ছ্বাস! এ যে দুজনের প্রাণের কামনা মূর্ত্ত হইয়া তাদের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইতেছে। তাদের দুজনের দুই হাত ধরিয়া এ যে তাদের প্রীতির ডোরটুকু শৃঙ্খলের মত আটিয়া সুদৃঢ় করিবে! প্রচণ্ড গৌরবের দীপ্তিতে তার মন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে ফিরিয়া চাহিল।

অরুণ ষ্টোভ জ্বালিয়া জল গরম করিতেছিল; সামনে দুটা পেয়ালা আর চায়ের টীন পড়িয়া আছে। দীপ্তি একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, এই দুই বাহুর সম্মিলিত শক্তিতে তাদের ঘরে কি নিবিড় সুখ, অজস্র আরাম না তারা রচিয়া তুলিবে! এর চেয়ে কাম্য আর কি আছে!

চা খাইয়া অরুণ কহিল—এক কাজ করবে দীপ্তি?

দীপ্তি বলিল,—কি?

অরুণ কহিল,—আজ শীগ্‌গির খাওয়া-দাওয়া সেরে নি এসো। তার পরে ট্রেনে উঠে চলো, ওদিকে বেড়িয়ে আসি। এর পরের ষ্টেশন গজহগুী, গজহগুীর পরে গুর্পা। গজহগুী আর গুর্পার মাঝে চমৎকার তিনটে টানেল আছে। রেলের লাইন এত নেমে নেমে গেছে, যেন থাক্‌-থাক্‌ সিঁড়ি সাজানো! দার্জ্জিলিংয়ের সেই কার্ট রোডের মত! যাবে?

দীপ্তি বলিল,—যাবো।

অরুণ খুশী হইল! তার পর আহার করিয়া দুইজনে ষ্টেশনে আসিল; এবং ট্রেণ আসিলে ট্রেণে চড়িল। চারিধারে প্রকৃতি আনন্দের মেলা বসাইয়াছে! ঐ পাহাড়, ঐ ঢালু জমি, ঐ নিবিড় জঙ্গল! আর দূরে মাটীর ঢিপি-গুলা ঐ অভ্রের কুচি গায়ে মাখিয়া ঝক্‌ ঝক্‌ করিতেছে! গজহগুী পার হইবার পর ট্রেণ যেন একটা সুড়ঙ্গ-পথে ঢুকিল। দু'পাশে উঁচু পাহাড় মনুমেণ্টের মত মাথা খাড়া করিয়া আছে...পথ প্রাচীর-ঘেরা! এবং সেই পথ ধরিয়া ট্রেণ, না, দীর্ঘ সরীসৃপ চলিয়াছে! বাঁকের পর বাঁক, পিছনে ঐ সিঁড়ির মত থাক সাজানো! জঙ্গলে চারিধার আচ্ছন্ন···গাছের মাথায় গাছ উঠিয়াছে, তারপরে আবার গাছ···কে যেন থাক্‌ দিয়া গাছ সাজাইয়াছে! থাকে থাকে রেলের লাইনও বাঁকিয়া গিয়াছে। আর সেই বহু-উচ্চ থাকের গায়ে সিগনালটা লাল ও সবুজ রঙের চশমা চোখে আঁটিয়া একটা হাত খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া আছে···এ-পথের পথিককে পথের সন্ধান দিবার জন্য।

ট্রেণ আসিয়া গুর্পায় থামিলে দুইজনে নামিল; এবং একটা পথ ধরিয়া চলিয়া গেল সোজা ঐ বনের দিকে!

অভ্রের কুচি চিক্‌-চিক্‌ করিতেছে! পথে যেন কারা হোলি খেলিয়া গিয়াছে! পাহাড়ের রাঙা মাটী আর তার গায়ে গায়ে অভ্রের রূপালি কুচি! কোথাও জমি খুব উঁচু, আর ঠিক তার পাশেই এমন ঢালু পথ কোথায় কত নীচে গড়াইয়া নামিয়া গিয়াছে! মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড ডোবা। ডোবার জল যেমন স্বচ্ছ, তেমনি পরিষ্কার, ঘোলা নয়—মাটীর বুকে আয়নার মত পড়িয়া আছে!

বেড়াইয়া দীপ্তি শ্রান্ত হইয়া পড়িল। অরুণ কহিল,—বসো দীপ্তি·· বলিয়া একটা শুষ্ক বৃক্ষ-কাণ্ড সে দেখাইয়া দিল। দীপ্তি সেটায় বসিলে অরুণও তার পাশে বসিল। দীপ্তি তখন তৃষিত নেত্রে অরুণের পানে চাহিল; তার একটা হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল—একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো! সত্যি জবাব দেবে?

অরুণ কহিল,—দেবো বৈ কি! আমাদের মধ্যে মিথ্যার কোন আড়াল তো রাখি নি দীপ্তি! কি বলবে, বলো!

দীপ্তি কাতর নয়নে অরুণের পানে চাহিল; তার পর বেদনাবিদ্ধ স্বরে কহিল,—মনে সময় সময় আমার এমন অনুতাপ হয়···দীপ্তি চুপ করিল।

অরুণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল, কহিল,—কিসের অনুতাপ দীপ্তি?

দীপ্তি কহিল,—আমার একটা মতের জন্য তোমায় তোমার নিজের জায়গা থেকে, স্নেহ-মায়া-আরামের শিকড় কেটে এমন উপড়ে ছিঁড়ে এনেচি,···স্নেহ-স্মৃতির সমস্ত নিবিড় বাঁধন মুচ্‌ড়ে ভেঙ্গে···আমার পিছনে তুমি এ-ভাবে ফিরচো, এতে কত কষ্টই হচ্ছে তোমার! কত বেদনা···

উচ্ছ্বসিত আবেগে দীপ্তিকে বুকের মধ্যে টানিয়া অরুণ বলিল—কোন কষ্ট নয় দীপ্তি!···কেন কষ্ট হবে! তোমার প্রাণ-ঢালা ভালোবাসা আমার কোথাও কোন অভাব রাখে নি···

দীপ্তি কহিল—কিন্তু বাড়ীর স্নেহ-আদর, ভাই-বোনের ভালোবাসা···! যখনি আমার মনে হয়, আমি তোমায় সকলের কাছ থেকে ছিঁড়ে টেনে নিয়ে এসেচি, আমার জন্য তুমি সব ত্যাগ করেছো···তখন মন আমার এমন আকুল হয়ে ওঠে! আমার মনে পড়ে, আমি যখন এমনি চলে এসেছিলুম, তখন পিছনে কি আহ্বান আমায় আকুল স্বরে ডাকতো, ফিরে আয়, ফিরে আয়!···তবু ফিরিনি।···নিজের মতকে সবলে আঁকড়ে ধরে সে-আহ্বানকে হটিয়ে দিছি, কঠিন প্রাণে—বুক আমার ছিঁড়ে রক্তাক্ত হয়ে গেছে···তবু পিছনে ফিরে তাকাই নি!

অরুণ সাদরে তার মুখখানি বুকে চাপিয়া ধরিল। দীপ্তি মুখ তুলিয়া অরুণের পানে ফিরিয়া চাহিয়া কহিল,—সে আহ্বান তোমারও প্রাণে বাজচে তো! আমি নিজের সেই মন নিয়ে তোমার মন যে বুঝতে পারচি·· !

তার পর ক্ষণেকের জন্য সে স্তব্ধ হইল, পরে কহিল—আবার ভাবি, এই স্নেহ-মমতা ছিঁড়ে এই বিজন পথে দুজনে যে বেরিয়েচি, যদি এ সত্য-পথ না হয়...

অরুণ কহিল,—সত্য পথ বৈ কি! আমাদের মন যে বলচে, দীপ্তি, এতে সায়ও দিচ্ছে।

দীপ্তি কহিল,—তবে কেন থেকে থেকে মন পিছন-পানে ফিরে চাইবার জন্য আকুল হয়? এ কি মনের ভুল? না, এইটেই···দীপ্তির স্বর গাঢ় হইয়া উঠিল।

অরুণ কহিল,—খাঁচার বাঁধন কেটে পাখী যখন আকাশে উড়ে চলে, গান গেয়ে···তখন খাঁচার পানে ফিরে তাকাতেও সে ছাড়ে না! এটা মনের অন্ধ সংস্কার, মোহ! কিন্তু মুক্ত পাখী আবার ফিরে খাঁচায় ঢুকতে চায় না তো!

এ কথা দীপ্তির কাণেও গেল না। সে অরুণের পানে স্তম্ভিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল ও উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনাবেগে

কহিল—তোমায় যদি আমার সঙ্গে বেঁধে টেনে এনে অপরাধ করে থাকি তো সেজন্য মাপ করো। আর স্নেহ-মমতার যে নিবিড় আশ্রয় ছেড়ে এসেচো, সে স্নেহ-মমতা পূরণ করে দেবার জন্য আমি আমার প্রাণ-মন উজাড় করে আমার মনের সমস্ত ভালোবাসা, প্রাণের সব প্রীতি দিয়ে তোমায় ঘিরে রাখবো…যতখানি আমার আছে, তাই দিয়ে…নিজেকে নিঃস্ব কাঙাল করেও…প্রিয় আমার, বন্ধু আমার, সখা আমার··

এ সময় এ উত্তেজনা বা এই আবেগ দীপ্তির শরীরের পক্ষে ঠিক নয় ভাবিয়া অরুণ একটু চিন্তিত হইল। সে দীপ্তিকে স্নেহে আদরে বুকে ধরিয়া কহিল,—তুমি নিশ্চিন্ত হও দীপ্তি। তোমার প্রেমে আমার কোথাও অভাব নেই, জেনো!…এই মুক্ত-গগন-তলে, এই মুক্ত প্রকৃতির বুকে, মুক্তির কি পরশই যে আমার চিত্ত আলোয় ভরে তুলেচে…

অরুণ মুগ্ধ আনন্দে দীপ্তির পানে চাহিল, পরে ধীরে ধীরে কহিল—তা ছাড়া একটা কথা কি জানো দীপ্তি, আমাদের আত্মীয় বলো, প্রিয়জন বলো, এঁদের সঙ্গে আমাদের যে ক্ষণিক মিলন বা দীর্ঘ বিচ্ছেদ, এগুলো আমাদের চারিধার থেকে পরিপূর্ণ করে তোলবার সহায়তা করে শুধু! এদের আঁকড়ে পড়ে থাকাই মনের ধর্ম্ম নয়। আমরা সকলে এখানে সকলকে গড়ে তুলি। মা-বাপের স্নেহ যেমন শিশুকে বাঁচিয়ে বড় করে তোলে, তাঁদের মমতাও তেমনি আমাদের প্রাণের ক্ষুধা-তৃষ্ণা মিটিয়ে তাকে ভরিয়ে রাখে! তার পর ভাই আছে, বোন আছে, বন্ধু আছে, সখী আছে, তারা হাসির ছটায় অশ্রুর ঝলকে মনকে দোলা দেয়, নানা জিনিষে আমাদের স্মৃতির ভাণ্ডার পূর্ণ করে তোলে। তার পর আসে প্রিয়া… প্রেমের জ্যোৎস্নায় আদরে হিল্লোলে সারা যৌবনকে বিচিত্র মধুর করে দিতে! তার পরে আসে সন্তান, আর এক অভিনব সুখের উচ্ছ্বাসে প্রাণটাকে ভরিয়ে তুলতে! এক-সঙ্গে এদের সকলকে ভরে রাখবো, মনে তার স্থান কৈ! একসঙ্গে ভিড় জমালে মনের মধ্যটা বিপ্লবে-বিরোধে টলমল করে উঠবে। সে ভিড় ঠেলে সবাই প্রাণের মধ্যে বেশী জায়গা দখল করে থাকতে চাইবে।…তাই এক-একজন এক-একটা জিনিষ নিয়ে মনে এসে দাঁড়ায়, তাদের সকলকে যথাযোগ্য সমাদর দিয়ে গ্রহণ করতে পারলে মনও আমাদের নির্ব্বিরোধে তার সমস্ত দিক সার্থক, পরিপূর্ণ করতে পারে…স্বাস্থ্যের পরিপূর্ণ হিল্লোলে, নিবিড় স্বচ্ছতায়!…মা-বাপের স্নেহ-আদর, ভাই-বোনের ভালোবাসা আমাদের মনকে যতদূর অগ্রসর করে দেবার, তা দিয়েচে! এখন আমাদের দুজনের পালা এসেচে… পরস্পরে পরস্পরের মন-দুটিকে ফুটিয়ে সাজিয়ে বাড়িয়ে তুলবো,…তাই!…তার পর এ পালা সাঙ্গ হবে, তখন দুজনে সন্তানকে পেয়ে মনের আর-একটা শূন্য দিক ভরে তুলবো!…মানুষের জীবন-লীলা এই ধারায় বয়ে চলেছে।…কেন তবে তুমি মিছে কাতর হচ্ছ?…বলেচি তো, আমার প্রাণে কোথাও কোন অভাব নেই আজ, এতটুকু শূন্যতা নেই! বিপুল সার্থকতায় সে তার পথে ক্রমেই অগ্রসর হয়ে চলেছে!…

৯

প্রায় সপ্তাহ পরে এক দিন একা বেড়াইতে গিয়া হঠাৎ সন্ধ্যার ট্রেণে অরুণ জ্বর-গায়ে বাড়ী ফিরিল। দীপ্তি সেদিন ছোট-একটু উৎসবের আয়োজন করিয়া মাংস রাঁধিতেছিল। অরুণ আসিয়া একেবারে বিছানায় শুইয়া পড়িল। দীপ্তি তা দেখিয়া ধড়মড়িয়া উঠিয়া আসিয়া কহিল—কি হয়েচে গা?…শুলে যে!

অরুণ কহিল,—বড্ড মাথা ধরেচে দীপ্তি। জ্বরও একটু হয়েচে বুঝি।

দীপ্তি শঙ্কিত প্রাণে অরুণের গায়ে হাত দিয়া দেখিল, গা যেন আগুন!…তার মনের অতি-গোপন স্থানে কে যেন ফ্যাঁশ্ করিয়া ছুরি টানিয়া দিল! অমনি প্রাণের কোন্ বিজন কোণে প্রচ্ছন্ন সুপ্ত একটা চিন্তা সে ছুরির আঘাতে মাথা তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তার সে মূর্ত্তি দেখিয়া দীপ্তির বুক কাঁপিয়া শিহরিয়া উঠিল। অডি-কলোনের শিশি আনিয়া পটি করিয়া অরুণের কপালে চাপিয়া ধীরে ধীরে তাকে সে পাখার বাতাস করিতে লাগিল। অরুণ আরাম পাইয়া চক্ষু মুদিল।

কতক্ষণ পরে ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, মাংস পুড়িয়া যাইতেছে।…

একটা দুর্গন্ধ আসিতেছে বটে, এ তবে তারই!

দীপ্তি কহিল,—যাক্ গে…

অরুণ পাশ ফিরিয়া কহিল,—কি বলচো…?

দীপ্তি কহিল,—মাংস রাঁধছিলুম, তুমি খাবে বলেছিলে…তাই দোয়াবুকা এসে বলচে, সে মাংস না কি পুড়ে গেছে!

—কেন!…অরুণ স্থির দৃষ্টিতে দীপ্তির পানে চাহিল, পরে কহিল,—তুমি যাও··দ্যাখো গে! আমি ভালো আছি। একটু ঘুম আসচে। ঘুমোলেই শরীর সেরে যাবে। তুমি যাও, মাংস নামিয়ে রেখে এসো…একেবারে খেয়েই না হয় এসো। আমি আজ কিছু খাবো না।

দীপ্তি কহিল,—আমিও খাবো না।

—কেন দীপ্তি?

কেন! এ প্রশ্নের উত্তর নাই! দীপ্তি কোন উত্তর দিল না। তার দুই চোখে শুধু জল ছাপাইয়া উঠিল।

অরুণ আবার কহিল,—কেন খাবে না দীপ্তি?

যা বলিয়া যতই বুক বাঁধো, এইখানেই ধরা পড়ে

গো! পুরুষ পুরুষ, আর নারী নারীই!…নারীর অন্তরের বেদনা যদি পুরুষ বুঝিত!…তা বোঝে না বলিয়া তারা এমনি সব উদ্ভট প্রশ্ন তোলে! আর সে-প্রশ্নের জবাব নারী দিতে পারে না…জবাব বুঝি তার নাইও!…দীপ্তি কোন জবাব দিল না। অরুণ কহিল,—বলো…

দীপ্তি কহিল,—আমার খিদে নেই।

অরুণ কহিল,—খিদে নেই!…তা হ'লে মাংস…

দীপ্তি ভৃত্যের দিকে ফিরিয়া কহিল,—তুই খেতে চাস তো রেঁধে নিগে যা—আমরা খাবো না। তুই ওধারে গুছিয়ে নিগে সব…আর তোর রান্নাও তুই নিজে করে নে বাবা, ঠাকুর আজ আসবে না! বাবুর অসুখ দেখচিস্ তো, আমি এখন কোথাও যেতে পারবো না!

রোগের এই দুঃসহ যাতনার মাঝে বিশ্বের কি আরামই না অরুণের প্রাণে বহিয়া আসিল! আঃ! তার জন্ম দরদ করিতে একজন আছে…! অরুণ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া দীপ্তির পানে চাহিল। দীপ্তির চোখে তার প্রাণের যত কাতরতা আসিয়া জমিয়া উঠিয়াছিল। অপলক নেত্রে অরুণের রোগ-কাতর মুখের পানে সে চাহিয়া রহিল!…

পরদিন সকালে কোদার্শ্মার ডাক্তার বাবু আসিয়া অরুণকে দেখিয়া গেলেন, ঔষধ দিলেন।…তার পর কি সে সংগ্রাম সুরু হইল! দিনের বেলা রৌদ্রের মুক্ত হিল্লোলে দীপ্তির প্রাণ আশায় ভরিয়া ওঠে, ভয় কি! অসুখ হইয়াছে, সারিয়া যাইবে!…কিন্তু সন্ধ্যা যখন প্রান্তর পার হইয়া ঐ পাহাড়ের শিয়র বহিয়া নামিয়া চারিদিক তার শ্যাম অঞ্চলে ঢাকিয়া ফেলে, তার পর কালো বাদুড়ের মত পাখায় ভর করিয়া আঁধার রাত্রি নিঝুমভাবে বিশ্বে আসিয়া দাঁড়ায়…খোলা জায়গার মধ্য দিয়া যতদূর দেখা যায়, শুধু আঁধার, ঘনঘোর আঁধার…তখন ঘরের মধ্যে স্তিমিত আলোয় বিছানায় এই রোগ-পীড়িত প্রিয় সাথীর বুক ঠেলিয়া অসহ্য কাতরতা মর্ম্মরিয়া ওঠে, তখন কি ভয়ে, কি ব্যথায় দীপ্তির প্রাণ টন্‌টন্ করিতে থাকে, তা সে-ই জানে! লোকালয়ের বাহিরে, এই বিজন বনের প্রান্তে একা সে, …কি করিয়া অরুণকে ভালো করিয়া তুলিবে! নিজের এই দুর্ব্বল শরীর-মন…তবু সে তো বুঝিতে কাতর নয়! …হায়রে, এ দুঃসময়ে এমন বিপদের মাঝেই মানুষ সহায় চায়! সেবায় না হোক্, মুখের একটা কথাতেও যদি কেহ মনের এ দুর্জ্জয় আতঙ্ক একটু সরাইয়া দেয়!…বুকের উপর নিবিড় এই অন্ধকার পাহাড়ের ভার লইয়া চাপিয়া আছে, একা এ পাহাড়কে ঠেলিয়া ফেলা যায় না! কাতর চোখের আড়লে অশ্রুর পাথার রুখিয়া সে অরুণের পানে চায়,—সেই হাসিমাখা সরস অধর, সেই দীপ্ত চোখে ভাষার-উচ্ছ্বাসে-ভরা স্বচ্ছ তারা, সেই আলো-করা মুখ…কি মলিন, কি বেদনা সহিতেছে গো!…

আট দিন সমানে এই ভাব!…আট দিনে অরুণ কি যে হইয়া গিয়াছে!…জ্বরের বিরাম নাই। আর এ কি জ্বর!…তার উপর এই বকুনি…জ্বরের ঘোরে প্রবলভাবে ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া ওঠা!…আর বকুনি! দীপ্তির পক্ষ লইয়া বাপের সঙ্গে শুধু তর্ক…চোখের পলক পড়িতে তখনি আবার সে তর্ক ভাঙ্গিয়া করুণ আর্ত্ত মিনতির অশ্রুতে গলিয়া পড়িতেছে! পরক্ষণে সারা দুনিয়ার সঙ্গে প্রচণ্ড কলহ—কি ঝাঁজ! কখনো দীপ্তির নাম ধরিয়া ডাকিয়া কেবলি তাকে বুঝাইবার চেষ্টা, অরুণ তাকে কত, কত, কত ভালোবাসে…

দীপ্তির দুই চোখ এ সব কথায় জলে ভরিয়া যায়! সে যেন পাগল হইয়া ওঠে! অরুণের ভালোবাসা কত, সে তা জানে! রোগে পড়িয়াও সর্ব্বক্ষণ তার পক্ষ লইয়া এই যে তর্ক!…তার চোখে যেন শ্রাবণের ধারা জাগিয়া আছে, সারাক্ষণ!…তবু আজ নিরুপায়, নিরুপায় সে… কতখানি অসহায়!…কে আছে এ দুনিয়ায় যে আজ তার প্রাণের বন্ধুকে, তার স্বামীকে…স্বামী, হাঁ, স্বামীকে… বাঁচাইয়া তুলিবে!…বাঁচানো চাই, তাকে বাঁচানো চাই! দীপ্তির প্রাণ ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সেদিন অরুণের অবস্থা দেখিয়া দীপ্তির এমন ভয় হইল যে, কোন দ্বিধা না করিয়া নিজের হাতে টেলিগ্রাম লিখিয়া পাঠাইল, অরুণের পিতার কাছে…

"আপনার পুত্র অরুণ কোদার্শ্মায় টাইফয়েডে শয্যাগত। অবস্থা খুব খারাপ। ডাক্তার হতাশ। যাহা ভালো বুঝিবেন, করিবেন। দীপ্তি।…"

টেলিগ্রাম পাঠাইয়া অরুণের শিয়রে আসিয়া সে বসিল।…আবার ঐ যাতনা! এ যাতনার কি নিমেষ বিরাম নাই!…ওঃ! একা, ওগো, একা সে মৃত্যুর সঙ্গে কত লড়া লড়িবে? তাকে লইয়া মৃত্যু যদি অরুণকে ছাড়িয়া দেয়!…চোখের জলে দীপ্তির দৃষ্টি অস্পষ্ট ঝাপসা হইয়া আসিল, বুকে যেন পাথর চাপিয়া রহিল!…

ঘণ্টা তিনেক পরে দ্বারে কে করাঘাত করিল। দীপ্তি ধড়মড়িয়া উঠিয়া গেল। পিয়ন! টেলিগ্রাম আসিয়াছে। …অভয় মিত্র টেলিগ্রাম করিয়াছেন—টেলিগ্রাম অরুণের নামে।…

"এক্সপ্রেসে রওনা হইতেছি!…সে বালিকাকে বিবাহ করো—এই দণ্ডে। তোমার তাহা কর্ত্তব্য। অভয় মিত্র।"

পুত্রের এই রোগ! পিতার পণ তবু ইহার মধ্যেও সেই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে!…দীপ্তি নিশ্বাস ফেলিল। টেলিগ্রামটা তার হাতেই রহিয়া গেল।

পিয়ন বলিল,—সহি, মা-জী।

—হ্যাঁ। বলিয়া দীপ্ত উঠিয়া সহি করিয়া দিল। পিয়ন চলিয়া গেল।

তার পর রোগীর ঘরে আবার সেই একা জাগিয়া

বসিয়া থাকা! আর অরুণ···? ঐ হাত মুঠি করিল, ঐ কি বকিতেছে! মাগো!···বাহিরে দূরে কোথায় একটা কুকুর ডাকিতেছে।···সে স্বরে নিমেষের জন্ম শিহরিয়া দীপ্তি নিস্পন্দ দৃষ্টিতে কাঠ হইয়া অরুণের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

অরুণ ডাকিল,—দীপ্তি···

দীপ্তি চাহিল। অরুণ কোনমতে তার হাতখানা ছড়াইয়া দিল। দীপ্তি সে হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইল।

অরুণ আবার ডাকিল—দীপ্তি···

হায় চোখের দৃষ্টি। এ যেন সে চোখ নয়—যে-চোখের দৃষ্টিতে দীপ্তি সেই প্রথম দিন চকিত, বিস্মিত, মোহিত হইয়াছিল!···

দীপ্তি কহিল,—কি বলচো গো? বলো···বলো···

অরুণ হতাশ দৃষ্টিতে দীপ্তির পানে চাহিয়া কহিল,—আমি কি বাঁচবো না দীপ্তি? তার দুই চোখের কোলে জলের দুটা বড় ফোঁটা!

অরুণের চোখে জল! দীপ্তির চোখেও জলের ঝর্ণা খুলিয়া গেল। অরুণের পানে অপলক নেত্রে চাহিয়া দীপ্তি ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

অরুণ কহিল,—ডাক্তারকে বল দীপ্তি, আমায় সারিয়ে দিতে।

দীপ্তি কহিল,—বাবা আসচেন···

—বাবা!·· অরুণের অধরে হাসির একটা মৃদু রেখা ফুটিল, নিমেষের জন্য!

দীপ্তি কহিল,—তোমার বাবা। তাঁকে আমি টেলিগ্রাম করেছিলুম, তোমার অসুখ বলে। তিনি তার জবাব দিয়েচেন। তিনি আসচেন। রওনা হয়েচেন।

—তাহলে মার্জ্জনা·· অরুণের চোখের কোণে আরও দুফোঁটা জল আসিল। তার পরে সে কহিল,···আর কিছু লিখেচেন?

দীপ্তি কহিল,—হ্যাঁ···

—কি কথা দীপ্তি?

—আমায় বিয়ে করতে বলেচেন! বলো তাঁর কথা রাখবে কি? কোন সঙ্কোচ করো না···বলো···

এ অভিমান,—না···?

অরুণ দীপ্তির পানে চাহিল। উচ্ছ্বাসে আবেগে দীপ্তি কহিল,—না, না, ওগো, তুমি সেরে উঠবে! এ মেঘ ক্ষণেকের, কেটে যাবে। আবার আমাদের জীবনে সূর্য্যের আলো ফুটবে গো! আমার মন বলচে, তুমি সেরে উঠবে।···কিন্তু যাই হোক, আমার জন্য তুমি ভেবো না।···না, না, কোনো ভাবনা নয়! তুমি শুধু সেরে ওঠো! আমরা যে ব্রত নিয়েচি, তা যে আমাদের পালন করতেই হবে!—এ প্রকৃতির ভ্রূকুটি·· ভয় দেখাচ্ছে শুধু! ওগো আমার প্রিয়, বন্ধু আমার, স্বামী আমার···

অরুণের ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।···

দীপ্তি কহিল,—তোমার এই প্রেম, এ নিষ্ঠা···ওগো, এই যে আমার মনকে ক্ষণে ক্ষণে টলিয়ে তুলচে।···আমার গুরু, আমার সব···যদি এই হয় যে, তোমায় বিয়ে করলে তুমি বেঁচে ওঠো, ওগো, তোমার প্রাণের জন্য আমি তা করতে প্রস্তুত আছি! আজ, এখনি!···ব্রত···? কি হবে তা? তোমায় হারালে আমি যে সব হারাবো!···ওগো, তুমি সেরে ওঠো! ক'দিন আমি কেবলি ভাবচি··· তোমায় ছেড়ে আমার বেঁচে থাকবার কথা আমি কল্পনাও করতে পারি না···

সন্ধ্যার ঠিক পরক্ষণে এক্সপ্রেস ট্রেণ আসিয়া ষ্টেশনে থামিল। খোলা জানলা দিয়া ষ্টেশন দেখা যায়। ঐ বাঁশীর আওয়াজ···ট্রেণ আবার ছাড়িয়া দিল।···তার পর পথে ঐ যে আলোর রশ্মি···রশ্মি সচল···এইদিকে অগ্রসর হইতেছে!···তবে···তবে?

দীপ্তি ডাকিল,—দোয়ারকা···

—মা—বলিয়া দোয়ারকা ঘরে ঢুকিল।

দীপ্তি বলিল—বাবুর বাবা আসচেন বুঝি। তুই যা। দৌড়ে ষ্টেশনে যা। তাঁকে বাড়ী চিনিয়ে নিয়ে আয়।

দোয়ারকা একটা লণ্ঠন লইয়া ষ্টেশনের দিকে ছুটিল।

এখন···এ যে এক প্রচণ্ড মুহূর্ত্ত! হয়তো কত রোষ, কত হুঙ্কারের মাঝে পড়িতে হইবে! হয়তো বা মার্জ্জনার স্নিগ্ধ পরশ!···যাই হোক, অরুণকে বাঁচাইয়া তোলা চাই! বাঁচিবে বৈ কি! নহিলে উনিই বা ঠিক-সময়টিতে আসিবেন কেন! রাগ করিয়া গৃহেই বসিয়া থাকিতে পারিতেন!···সান্ত্বনায় আশ্বাসে দীপ্তির মন ভরিয়া উঠিল!···কিন্তু ও কি! অরুণ চীৎকার করিয়া উঠিল—দীপ্তি! উঃ—যাই যে!

দীপ্তির বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে আসিয়া তাড়াতাড়ি অরুণের পাশে বসিল। অরুণ দুই হাত উঁচু করিয়া তুলিল, পরমুহূর্ত্তে সজোরে সে উঠিয়া বসিতে গেল।—দীপ্তি আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—কি করচো গো! কি করচো! না, উঠো না··

দুই চোখ পাকাইয়া কি-সে দৃষ্টিতে যে অরুণ দীপ্তির পানে চাহিল! তার পর দুই করতল মুষ্টিবদ্ধ করিল, যেন বাতাসের সঙ্গে সংগ্রাম করিবে···

দীপ্তি তাড়াতাড়ি তাকে ধরিয়া ফেলিল। অরুণ চীৎকার করিয়া উঠিল,—ছাড়ো!···বাবা, আমার বাবা··· না বাবা, রাগ করো না, বাবা···বলিয়া একেবারে ঢলিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে সব অমনি নিথর। অরুণের শিথিল দেহ দীপ্তির গায়ে হেলিয়া পড়িল!

দীপ্তি ধীরে ধীরে তাকে শোয়াইয়া দিল। কিন্তু এ কি!

নিশ্বাস ? অরুণের দেহ যে নিথর নিস্পন্দ ! প্রাণ-বায়ুটুকু দীপ্তির বুকে থাকিতে থাকিতে মুক্ত বাতাসে মিশিয়া গিয়াছে। দীপ্তি পাথরের মূর্ত্তির মত স্তম্ভিত, বিমূঢ় বসিয়া রহিল···!

সেই মুহূর্ত্তে অভয় আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন ; ডাকিলেন,—অরুণ···

কে সাড়া দিবে !···

অভয় মিত্র আসিয়া অরুণের পানে চাহিলেন। তাঁর দুই চোখ যেন পুতুলের চিত্র-করা চোখের মত ! তার পর তিনি অরুণের কপালে হাত দিলেন,—পরে শিহরিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—সব শেষ···

অভয় মিত্র নিশ্চল দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁর চোখের কোলে জল ঠেলিয়া আসিল। তাঁর অরুণ, বড় আদরের পুত্র ! তিনি মনের বেদনা প্রাণপণ-বলে রুখিয়া দীপ্তির পানে চাহিলেন। দীপ্তি তখন একেবারে স্পন্দন-রহিত, ঠিক যেন কাঠের পুতুল !

অভয় মিত্র কহিলেন,—আমার টেলিগ্রাম পেয়েছিলে ?

দীপ্তি ফিরিয়া চাহিল, এবং ঘাড় নাড়িয়া জানাইল,হাঁ।

অভয় মিত্র কহিলেন,—আমার টেলিগ্রাম-মত কাজ হয়েছিল ?

দীপ্তি ভীতি-বিহ্বল দৃষ্টিতে তাঁর পানে চাহিল।

অভয় মিত্র কহিলেন,—তোমায় বিবাহ করেছিল, অরুণ ?

সহজ সুস্পষ্ট স্বরে দীপ্তি কহিল,—না।

অভয় মিত্র আশ্চর্য্য হইলেন ! কহিলেন,—না !··· তুমি তাকে টেলিগ্রামের কথা বলেছিলে ?

দীপ্তি মাথা নামাইয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল,—বলেছিলুম !

অভয় মিত্র স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। মৃত্যু-স্থির ঘরে মরণের কি হিম-শীতল নীরবতা !

দীপ্তি কহিল,—তাঁর মতটাকেই তিনি সব-চেয়ে শ্রদ্ধা করতেন !

অভয় মিত্র দীপ্তির পানে চাহিলেন, কহিলেন—হুঁ ! তা হলে আমারো আর কোন কর্ত্তব্য নেই !···এ সময়ে রূঢ় হওয়া উচিত নয়, তবু আমি নিরুপায় হয়েই বলচি··· নারী, তুমিই তাকে কাল-সর্পের মুখে টেনে এনেছ ! এর প্রাণের জন্য তুমি দায়ী···না হলে আমার ছেলে বেঘোরে এক জীর্ণ ঘরে এভাবে আজ বিনা-চিকিৎসায় মারা যেত না ! যাক, যা হয়ে গেছে, তার আর চারা নেই ! মৃত্যুকে কেউ রোধ করতে পারে না ! কিন্তু যাবার সময় অরুণ এই যে দাগা দিয়ে গেল···এর কারণ, শুধু তুমি ! তোমার এই অদ্ভুত খেয়াল ! তবু আমি মার্জ্জনা করতুম···তোমায় আর আমার অরুণের সন্তানকে যোগ্য মর্য্যাদায় আমার ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতুম ! কিন্তু তার পথও তুমি রাখো নি।···আমার গৃহে তোমাদের স্থান নেই। তোমার বা, তোমার পেটে অরুণের যে দুর্ভাগা সন্তান আসচে, তারও না···

অভয় মিত্র স্তব্ধ হইলেন ; পরে কহিলেন,—মা-বাপের স্নেহ ছিঁড়ে তাঁদের আদরের সন্তানকে বিদ্রোহ-মত্ত করে টেনে আনায় তাঁদের প্রাণে কতখানি ব্যথা বাজে—আজ খেয়ালের ঘোরে তা বোঝোনি ! বোধ হয়, বুঝবে না !··· কিন্তু একদিন বুঝবে,···হয়তো !···তবে দুঃখ রইলো এই যে, আমায় পাষাণ নির্ম্মম ব'লে জেনে রাখলে ! এ বুকে কতখানি স্নেহ, তা জানতে পারলে না !···তোমাদের এই মতের পায়ে তোমরা যেমন দুনিয়াকে বলি দিতে পারো, আমারো তেমনি একটা মত আছে, জেনো। সে মতের পায়ে অরুণকে না হয় বলিই দিলুম···

অভয় মিত্র একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, তার পরে ধীরে ধীরে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন।

জল-ভরা চোখে দীপ্তি তাঁর পানে চাহিল, কহিল,—চলে যাচ্ছেন ?

অভয় মিত্র কহিলেন,—হ্যাঁ। আমার কর্ত্তব্য তোমরা তো অনেকদিনই শেষ করে দিয়েচো ! আমার ছেলে অরুণ···আমার কাছে তো তার মৃত্যু আজ ঘটলো না! অনেকদিন ঘটে গেছে। অরুণকে আমি বহুদিন পূর্ব্বেই হারিয়েচি···চির-জীবনের মত !···

অভয় মিত্র একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ধীর পায়ে চলিয়া গেলেন। দীপ্তি কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কি যে হইয়া গিয়াছে, আর তার পর কি যে হইবে,—সেদিকে তার কোন হুঁশ ছিল না ! হুঁশ পরে হইল—যখন বহুক্ষণ নিশ্চল দাঁড়াইয়া থাকিবার পর বিছানার দিকে তার দৃষ্টি পড়িল। ঐ শয্যা ! ঐ ! উঃ ! এত বড় বিপদ মাথায় পড়িয়া তাকে পিষিয়া দিলেও এখনো সে খাড়া দাঁড়াইয়া আছে ! এত কথা কহিয়াছে ! আশ্চর্য্য !

তার সমস্ত মন এই নির্ম্মম ব্যাপার বুঝিয়া এক-নিমেষে তীব্র আঘাতে জ্বলিয়া কাতর হইয়া পড়িল। বন্ধু, বন্ধু, সাথী আমার—বলিয়া সে অরুণের নিস্পন্দ দেহ জড়াইয়া ধরিয়া আর্ত্ত ক্রন্দনে ফাটিয়া একেবারে লুটাইয়া পড়িল।

## ১০

বিধবা নারী···গর্ভে অসহায় শিশু !···এত-বড় নিরুপায় দুর্ভাগ্য মানুষের না কি নিত্য ঘটে না, তাই এ দুর্ভাগ্যে মানুষের অভিভূত হওয়ার আর সীমা-পরিসীমা থাকে না!···যে অতিথির আবাহন-গান দুটি হৃদয়ের তারে এক-সুরে উছলিয়া উঠিত, তারি আলোচনায় দুটি হৃদয় বিভোর হইত··· হায়, আজ সে শিশু যখন পৃথিবীর বুকে প্রথম চরণ পাত করিবে, তখন···

সেই সব কথার স্মৃতি এতটুকু আনন্দ দিবে

না। শুধু বেদনার ঘায়ে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিবে! দীপ্তির দুর্ভাগ্য যে তার চেয়েও বেশী—এই অসহায় শিশুকে লইয়া জগতে সে একা...বিপদ এখানে কত! ...এ বিপদের কথা আগে কোনদিন মনে জাগে নাই...আশার পরম আনন্দে সুখের নীড় বাঁধিয়া সে নিশ্চিন্ত আরামে বাস করিতেছিল—অলক্ষ্যে হঠাৎ কোথা হইতে সে নীড়ে গৃধ্রের মত মরণ আসিয়া তাহা আজ তচ্‌নচ করিয়া দিল।...এ যাতনা কি সহ্য হয়?...কি আশ্বাসে, কি সান্ত্বনায় মানুষ ইহাকে ঠেকাইয়া রাখিবে! ...তবু তার এতখানি কাতর হইলেও তো চলিবে না!... অরুণ আজ পাশে নাই যে, তার পরামর্শ লইবে! ..আদর সোহাগ সে তো গল্পের কথা! কিন্তু নানা ব্যাপারে কত সাহায্য চাই! জীবনের পথে অরুণের সঙ্গে দাঁড়াইয়া ওদিককার কথা মনে পড়ে নাই! আজ অরুণ পাশে নাই, সব মনে পড়িতেছে। আশ-পাশের লোকগুলার সমবেদনা-ভরা কৌতূহলের দৃষ্টিও মাঝে মাঝে কাঁটার মত গায়ে ফোটে!...তবু উপায় যখন নাই, তখন কুণ্ঠা ছাড়িয়া ভয় ছাড়িয়া তাকে এ পথে চলিতেই হইবে!... মৃত্যু?...তাহা হইলে সবই তো শেষ হইয়া গেল!... যে ব্রত সে মাথায় তুলিয়া লইয়াছে, সে ব্রত পালন করিতে সমাজের সকলের ভ্রূকুটি ঝঞ্ঝা অবহেলায় কাটাইয়া দিবে বলিয়া সে পণ করিয়াছে!...মৃত্যুর কোলে ধরা দিলে তার কি হইবে? বেদনা তীব্র বাজিয়াছে, সত্য,—এ বেদনা তো আরো অনেকের প্রাণেও বাজে! তাদের মত আত্মহারা হইয়া জীবনটাকে শেষ করিয়া দিলে, তার যা বৈশিষ্ট্য, সেটাকেও যে গলা টিপিয়া মারিতে হয়। না, সে দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না! তাকে এ বেদনা সহিয়া মাথা উঁচু করিয়াই দাঁড়াইতে হইবে!...যে নবীন অতিথি আসিতেছে, তাকেই শুধু সহায় করিয়া, সাথী করিয়া এ ব্রত পালন করা চাই। জীবনের এত-বড় লক্ষ্য হইতে সরিয়া পড়া ঠিক হইবে না!...

কাজেই প্রতীক্ষা করা ছাড়া উপায় নাই! এই শিশুর পথ চাহিয়া একা বিজনে বসিয়া অধীর প্রতীক্ষা।... অরুণের পুত্র...তারো পুত্র! তাকেই তাদের প্রাণের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া জীবনের পথে চলিতে হইবে।...

দীপ্তি ঘর গুছাইতেছিল। অরুণের কাগজ-পত্র, বই, ব্রীফ...ইতস্তত: ছড়ানো রহিয়াছে। কাগজের পাশে পেন্সিলটি পর্য্যন্ত...অরুণ কি লিখিয়া এমনি ফেলিয়া রাখিয়াছিল! সেটিও ঠিক তেমনি আছে! স্থির হইয়া দীপ্তি পেন্সিলটার পানে চাহিয়া রহিল। একটা কাতর দীর্ঘ-নিশ্বাস বুক ফাটিয়া বাহির হইয়া বাতাসে মিলাইয়া গেল!...

উইল! খেলার ছলে অরুণ একদিন বলিয়াছিল বটে, যে, একটা উইল লিখিয়া রাখিলাম দীপ্তি!... মানুষের প্রাণ...বলা তো যায় না!...হায়, সে পরিহাস এমন কঠিন তীব্র বাজিবে! এত শীঘ্র...এ কেহ স্বপ্নে ভাবে নাই! অরুণ নয়...সে-ও না!...দীপ্তি কাগজখানা তুলিয়া লইল! এ উইলে অরুণের নিজের উপার্জ্জিত টাকা-কড়ি সব 'তার বন্ধু', 'তার সাথী' দীপ্তিকে দিয়া গিয়াছে।

দীপ্তির দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। অরুণের সুগভীর প্রেম, অবিচল ভালোবাসা...নিজের সব ফেলিয়া এই ত্যাগে উজ্জ্বল প্রাণের প্রীতি...

দীপ্তি নিশ্বাস ফেলিল...বিশ্বে এ প্রীতি-ভালোবাসার কি আর তুলনা আছে!—অন্তিম শয্যায় শুইয়াও দীপ্তির মতকে শিরোধার্য্য করিয়া কতখানি ত্যাগ সে মাথায় বহিয়া গিয়াছে! দীপ্তি ভাবিল, তোমার এই স্বার্থহীন বিপুল প্রেমের একটুও যদি পরিশোধ করিতে পারি, বন্ধু! আমায় লইয়া তৃপ্তি কি পাইয়াছ...সত্যই? আমার এই দেহ-মন সুধায় ভরিয়া তোমার মুখে ধরিয়াছি...সে কি তোমায় প্রীতি দিয়াছে? বলো, বলো,...বন্ধু আমার, সেই সুদূর লোক হইতে বাতাসের মৃদু নিশ্বাসে, ফুলের এই উচ্ছ্বসিত গন্ধে, আকাশে-ওড়া পাখীর ঐ সুরের একটু খানি রেশে...

টাকার কথা তার মনে রহিল না।...উইলখানা সে ছিঁড়িয়া ফেলিল। কি এ নির্ম্মম পরিহাস...!

কিন্তু এখন সে কি করিবে? এখানেই থাকিবে? না, কলিকাতায় চলিয়া যাইবে? তার সেই চাকরী...

এ অবস্থায় কলিকাতায় গিয়া চাকরী করা সম্ভব নয়—শরীর এই, মনও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে! তার চেয়ে এখানে, অরুণের সহস্র-স্মৃতি-ঘেরা এই বিজন ঘরে,...এ তার স্বর্গ! আদর-প্রীতি, হাসির রেশ এখনো যে এ ঘরে পুঞ্জিত আছে!...আর যে আসিতেছে, এই নবীন অতিথি, অসহায় শিশু...তাকে এই ঘরেই আবাহন করা চাই! অরুণের গায়ের পরশ এখনো এ ঘর হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই...তারি তপ্ত পরশের মাঝে এই শিশু, আমাদের যুগল মনের প্রীতির ফল, এই প্রেমের কুঞ্জে আসিয়াই তোমার প্রথম চরণ-পাত করো..

এমনি চিন্তায় দীপ্তি যখন কাতর, তখন পশুপতি চক্রবর্ত্তীর এক চিঠি আসিয়া উপস্থিত হইল। তার এই নিঃসঙ্গ বেদনায় তিনি সমবেদনা জানাইয়াছেন; এবং সেই সঙ্গে এ কথাও বলিয়াছেন যে, তার জন্য সমাজে তাঁর মাথা হেঁট হইলেও তার প্রতি পিতার প্রাণে স্নেহ এখনো সঞ্চিত আছে! নিজের অবাধ্যতা ও একগুঁয়েমির জন্য যে ভ্রান্ত পথে সে পা দিয়াছে, পশুপতি চক্রবর্ত্তী তার জন্য দীপ্তিকে অনুতাপ করিবার পরামর্শ দিয়াছেন এবং তাকে পয়সা-কড়ি দিয়া সাহায্য করিতেও তিনি প্রস্তুত

আছেন!···তবে তাঁর ঘরে ফিরিয়া আসা···! দীপ্তিকে তিনি নিজের ঘরে তার পুণ্যহৃদয়া ভগ্নীদের পাশে আর ডাকিয়া আনিতে পারিবেন না, সেজন্য তিনি যে খুবই দুঃখিত, ব্যথিত চিত্তে বার বার তাহাও তিনি জানাইয়াছেন!···একটা নিশ্বাস ফেলিয়া দীপ্তি ভাবিল, কাহারো দয়া, কাহারো সাহায্য সে চায় না! যদি রিক্ত সর্ব্বহারা তাকে হইতে হইয়াছে তো এই দশাকেই কায়ে-মনে মানিয়া জীবন-পথে এ যাত্রা সে সম্পূর্ণ করিবে! পথের মাঝখানে যদি সব চুকিয়া যায়, তাহাতেও ক্ষোভ নাই!··

এই নির্জ্জন গিরি-বনের কোলেই দীপ্তি পড়িয়া রহিল। ডাক্তার বাবুটি খুব ভদ্র। তিনি প্রায় দেখিতে আসিতেন এবং যথাসময়ে তাঁকে যেন খবর দেওয়া হয়, এ কথা তিনি যখনই আসিতেন, জানাইয়া দিতেন!··· বন্ধু-বর্জ্জিত দূর বিদেশে একাকিনী তরুণীর এ অসহায়তা কত নিদারুণ, তাহা তিনি বুঝিতেন। বুঝিয়া তিনি আরো বলিতেন, তাঁর স্ত্রী বা মেয়েরা যদি এখানে কেহ থাকিত, তাহা হইলে দীপ্তিকে তিনি নিজের গৃহে লইয়া যাইতে পারিতেন। তা যখন নাই, তখন বাধ্য হইয়া দীপ্তিকে একা থাকিতে হইবে! তবু···

···এই নিঃসঙ্গতার মাঝে সময়টুকু অত্যন্ত ভারী হইয়া দীপ্তির বুকে যেন চাপিয়া বসিত। আর সে চাপে তার বুকের সমস্ত অস্থি পঞ্জরগুলা যখন ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইবার মত হয়, অসহ্য ব্যাকুলতায় মন তখন ছুটিয়া বাহির হইয়া যাইতে চায়, সেখানে···যেখানে চিতার আগুনে অরুণের নিষ্পাপ দেহ চাপাইয়া পুড়াইয়া ছাই করিয়া বাতাসে সে-ভস্মরাশি উড়াইয়া দিয়াছে!

একটু দূরে পাহাড়ের গায়ে শ্যাম বনানী স্তব্ধ দাঁড়াইয়া ···এইখানটিতে দুজনে তারা কতদিন বেড়াইতে আসিয়াছে! এইখানে বসিয়া ভবিষ্যৎ সুখের কত রঙীন ছবি দুজনে আঁকিত···! জায়গাটা আলোর-উচ্ছ্বাসে হাসির রাশিতে যেন ভরিয়া ছিল!··আর আজ···? শ্মশান! শ্মশান!···

শেষে এমন হইল যে দীপ্তির পক্ষে চলাফেরা করিতেও অত্যন্ত কষ্ট হয়। উঠিয়া অল্প হাঁটিতে পায়ে ভার চাপিয়া ধরে। সে হাঁপাইয়া পড়ে! তখন সে জানালার ধারে বসিয়া চারিদিককার মুক্ত প্রান্তরের পানে চাহিয়া থাকে! মনে হয়, ঐ প্রসারিত প্রান্তর নীরব চোখে তার এই মর্ম্মভেদী বিচ্ছেদে কাতর সহানুভূতি জানাইতেছে·· তার বুক চিরিয়া করুণ সমবেদনাও যেন ঐ উত্থিত হইতেছে!···

ক্রমে সে-দিন আসিল···যেদিন তার মর্ম্মের সমস্ত বন্ধন যাতনায় ছিঁড়িয়া যাইবার মত হইল। দোয়ারকা গিয়া ডাক্তার বাবুকে ডাকিয়া আনিল। ডাক্তার বাবুর সেবায় দীপ্তি ফুলের মত একটি কন্যা প্রসব করিল। মুখে তার অরুণের মুখখানিই ছোট করিয়া যেন কে বসাইয়া রাখিয়াছে···তেমনি হাসি-ভরা টানা চোখ, কালির রেখায় আঁকা বঙ্কিম ভ্রূ,···আর গায়ের রঙ দীপ্তির রঙের মতই গোলাপী আভায় ভরপুর!···ছোট্ট শিশু! আহা, নিতান্ত অসহায়···!

দীপ্তি শিশুকে আবেগে বুকে জড়াইয়া ধরিল! একটা দীর্ঘনিশ্বাস তার বুক ঠেলিয়া বাহির হইল। এ যে তাদের দুজনের নিবিড় প্রীতির মধুর মূর্ত্তি! তাকে দেখিয়া দীপ্তির কি আনন্দ!···কিন্তু এ আনন্দের তুল্য অংশ গ্রহণ করিতে দীপ্তির আনন্দ শতগুণ বাড়াইয়া তুলিতে অরুণ আজ কোথায়! বাহিরে গাছের পাতা দুলাইয়া বাতাস দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। চোখের জলে ভাসিয়া দীপ্তি শিশুর মুখে চুম্বন করিল। দুঃখের মাঝে, কি দুর্দ্দিনেই তুমি আজ আসিলে, ধন!···দীপ্তি মেয়ের নাম রাখিল, সান্ত্বনা!···

## ১১

তার পর আবার সেই কলিকাতা! সেই চির-পরিচিত আশ্রয়-নীড়···কিন্তু তা এমন কঠিন রূঢ় মূর্ত্তি ধরিয়া আছে যে তার সে ভ্রূভঙ্গী তীক্ষ্ণ কাঁটার মত দীপ্তির বুকে বাজিল!···বালিগঞ্জের সেই ক্ষুদ্র আশ্রয়টুকুও আজ মিলিল না! পল্লীর সকলে মিলিয়া কালো কুৎসা-মাখানো প্রচণ্ড নিষেধ তুলিয়া তাকে রুখিয়া দাঁড়াইল। এ পাড়ায় তার বাস করা হইবে না! সকলে সমস্বরে জানাইয়া দিল, দীপ্তির রীত-চরিত্র তারা ভালো করিয়াই জানিয়াছে! ঐ শান্ত মূর্ত্তির মাঝে দীপ্তি কি চরিত্র লুকাইয়া রাখিয়াছে, তা'ও কারো অবিদিত নাই! সুতরাং তাদের এই শান্ত পুণ্যস্নিগ্ধ পল্লীর মাঝে দীপ্তিকে স্থান দিয়া তারা কখনোই এত-বড় দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতে পারিবে না এবং তা দিবে না!···

বিপুল বলে উদ্গত অশ্রু রোধ করিয়া দীপ্তি গাড়োয়ানকে গাড়ী ফিরাইতে বলিল। কিন্তু এখন কোথায় যায়? এই অসহায় ক্ষুদ্র শিশুকে বুকে করিয়া কার দ্বারে গিয়া উঠিবে!···

শেষে নিরুপায় হইয়া দীপ্তি স্কুলের দিকে গাড়ী চালাইতে বলিল।···

মেয়েরা তখন স্কুলে আসিয়াছে। তাদের কল-কল্লোলে স্কুলের বুকে কি হর্ষ ফুটিয়াছে! স্কুলের ফটকে গাড়ী থামিলে দীপ্তি শিহরিয়া উঠিল। তার বুকে এই মেয়ে!··· এখনি সকলে প্রশ্ন তুলিবে, এ কে?···দীপ্তি ইহাদের কাছে কোন কথা বলিয়া যায় নাই! আজ হঠাৎ এই শিশুকে বুকে ধরিয়া ইহাদের মাঝে আসিয়া উদয় হইলে, এখানেও না জানি, কি কুৎসার সৃষ্টি হইবে!···তবু মন বলিল, এ কুৎসার কথা অরুণ তো পূর্ব্বেই বলিয়াছিল।

এবং সে তখন বড় গলায় জবাব দিয়াছিল, এ সব কুৎসাকে কোন দিনই সে গ্রাহ্য করে না !···আজ একটু আগে পল্লীর মুখে ঐ সব কুৎসার কথা শুনিয়া তার বুক কিন্তু কাঁপিয়া মূর্চ্ছিতের মত হইয়া পড়িয়াছিল !··· এখানেও তেমনি বেদনার মাঝে যদি পড়িতে হয় !···

এখানেও আশ্রয় মিলিল না !·· স্কুলের কর্ত্রী বলিলেন, দীপ্তি চলিয়া গেলে তিনি সব কথা শুনিয়াছেন। দীপ্তির জীবনে যে মস্ত একটা রোমান্স না অ্যাডভেঞ্চার কি ঘটিয়া গিয়াছে, এ কথা স্কুলে কাহারো অবিদিত নাই !···তবে এ দুর্ঘটনায় তাঁর সহানুভূতি থাকিলেও দীপ্তিকে স্কুলের পুরানো চাকরীতে বহাল করিয়া সে সহানুভূতি দেখাইবার দুঃসাহস তাঁর নাই ! কারণ, পাঁচ জন গৃহস্থ ভদ্রলোক মেয়েদের স্কুলে পাঠান—শুধু লেখাপড়া শিখাইবার জন্যই, তা নয়। এখানকার নৈতিক আব-হাওয়াটাও তাঁরা পরিচ্ছন্ন দেখিতে চান···একেবারে বিশুদ্ধ রকমের ! তাকে লইয়া পাঁচটা আলোচনা হইয়া যাওয়ার পর তাকে আবার শিক্ষয়িত্রীর আসন দেওয়া··· তার মানে, স্কুলটিও একেবারে ভাঙ্গিয়া চূরমার হইয়া যাইবে ! কারণ, কেহই এখানে অতঃপর মেয়ে পাঠাইবে না !···

দীপ্তির চোখে জল আসিল। হায়, তাকে ইহারা এমন অতলে নামাইয়া দিয়াছে যে, সেখান হইতে উঠিবার সম্ভাবনাও আজ নাই !···এ সব কথা, এ কথার মানে ? সে কি করিয়াছে ? কিছু না !···তার অভিমান হইল। সে তো শ্রেষ্ঠ সতী-সাধ্বী কোনো নারীর চেয়ে একতিল নীচে নয় ! বিবাহই সে করে নাই ! কিন্তু বিবাহের অর্থ যদি এই হয় প্রাণে প্রাণে সুগভীর অনুরাগ তো সে অনুরাগের চূড়ান্ত যে তার প্রাণে ফুটিয়াছিল ! অরুণকে ভালোবাসা, তার রোগে সেবা-শুশ্রূষা, তার স্মৃতি বুকে ধরিয়া অহর্নিশি এই প্রবল সংগ্রাম···কোন্ সতী ইহার বাড়া কি করিয়াছে !···

দীপ্তি সবলে অশ্রু রুখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। স্কুলের কর্ত্রী কহিলেন,—ওটি মেয়ে বুঝি ?

দীপ্তি কহিল,—হ্যাঁ।

কর্ত্রী কহিলেন,—আহা !

সেই আহা ! দীপ্তির বুক যেন ফাটিয়া গেল ! কৃপার পাত্রী কাঙালিনী হইয়া সে তো এখানে থাকিতে আসে নাই ! তবে···কেন এ আহা ! কেন ঐ করুণ নয়নে তার পানে চাওয়া গো !···জীবন-পথে কাহারো কৃপা সে চাহে নাই কোনদিন ! কৃপা সে চায় না !···মেয়ের পানে প্রাণ-ভরা দৃষ্টিতে চাহিয়া সে তার মুখে চুম্বন করিল— বাছা আমার, বড় দুঃখের সান্ত্বনা আমার !···

তার পর সহসা দীপ্তি কোন কথা না বলিয়া বিদ্যুতের মত ত্বরিতে স্কুল হইতে বাহির হইয়া গেল।···এখানে কাজ করিয়া জীবিকার সংস্থান করিবে, ভাবিয়াছিল ! হায় রে !

স্কুল হইতে ফিরিয়া সে সমস্যায় পড়িল। মেয়েটিকে এখন মানুষ করিবে কি করিয়া ! এখানে যত বড় কাজ করিতে ছোটো, সবার আগে নিজেকে খাড়া রাখা চাই ! ···আর সে খাড়া রাখিতে গেলে আগে চাই টাকা !··· টাকা নহিলে এক পা এখানে চলিবার জো নাই !···

কিন্তু সেও পরের কথা !···এখন গাড়ীতে এমনি বসিয়াও দিন কাটানো চলে না !···একটা আশ্রয় চাই ! তা হোক সে বন, হোক্ সে প্রান্তর···! আবার শুধু তাই ? একটা ছাদ ও চারিটা দেওয়ালের আড়ালে রচা চাই একখানি আশ্রয়-নীড়··· এই মুহূর্ত্তে চাই··· নহিলে নয় !···

গাড়োয়ান কহিল,—কোথায় যাবো, মা-জী ?

দীপ্তি হতাশভাবে চারিধারে চাহিল। তার পরে গাড়োয়ানকে ডাকিয়া কহিল,—এমন কোন জায়গায় নিয়ে যেতে পারো, যেখানে ভাড়ার জন্য একখানা ছোট ঘর মেলে ?···

গাড়োয়ান কহিল,—তা তো জানি না মা ! তবে আমি থাকি মাণিকতলায়। সেখানে অমন ঘর মিলতে পারে !···কিন্তু ঘোড়া আমার ঘুরে ঘুরে হাঁপিয়ে উঠলো, মা···

দীপ্তি কহিল,—কোনমতে আমায় একটু আশ্রয়ে পৌঁছে দাও তুমি···বকশিস দেবো।

গাড়োয়ান তার গাড়ীতে এমন আরোহী কখনো তোলে নাই ! সে একটু ভাবিয়া পরক্ষণে মাণিকতলার দিকে গাড়ী চালাইয়া দিল।···

একটা ঘর মিলিল। মাণিকতলায় একটা বাগানের ফটকে লাল-কাঁকর ফেলা পথের পাশে ফ্লোরের উপর ছোট একখানি ঘর, দুধারে ছোট বারান্দা,—রান্না করিবার ছোট একটু জায়গাও আছে। বাগানের ভিতর-দিকে মস্ত বাড়ী, কোন বিলাসী বাবুর আরাম-নিবাস। বাবু ক্বচিৎ আসেন ! বাগানের মালী এই ঘর দুখানি সুবিধা-মত ভাড়া দেয়। দীপ্তি কায়েমীভাবে থাকিবার বাসনা জানাইলে মালী প্রথমে ইতস্তত করিতেছিল, পাছে ধরা পড়িয়া যায়। কিন্তু দীপ্তি যখন বলিল, ঝামেলা কিছুমাত্র নাই ! তার চাকর থাকিবে না, দাসীও না। সে শুধু এই ছোট শিশুটিকে লইয়া নিতান্ত নিভৃতে একা এখানে বাস করিবে, তখন মালী আর আপত্তি না তুলিয়া এক মাসের ভাড়া আগাম দশটি টাকা আদায় করিয়া ঘর খুলিয়া দিল। দীপ্তি নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। সকাল হইতে ঘোরার বিরাম ছিল না !

এখন ঘরে ঢকিয়া প্রকাণ্ড সমস্যা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। পেট চলিবে কি করিয়া ? পুঁজি তো এমন

বেশী নয়! যা আছে, তা ভাঙিলে ফুরাইতে কতক্ষণ। তখন? স্কুলের চাকরী ফিরিয়া পাইবার কোন আশা নাই! তার মনের মতের সঙ্গে এইবার তো সংগ্রাম বাধিল! একদিকে সারা সমাজ দুর্গ-দ্বার রুদ্ধ করিয়া উপেক্ষার বাণ হানিতেছে, সরিয়া যাও, দূরে, আরো দূরে ···আমার সীমার কাছেও ঘেঁষিয়ো না।

আজ যদি অরুণ পাশে থাকিত! একা এ সংগ্রামে সে যে জর্জ্জর শ্রান্ত হইয়া পড়িবে, কেই বা তাকে উৎসাহের বাণী জোগাইবে, পাশে থাকিয়া শ্রান্তি ঘুচাইয়া দিবে? সান্ত্বনা! নেহাৎ কচি, এতটুকু মেয়ে!···

তবু ভাবিলে চলিবে না!···পাশে যখন কেহ নাই, কাহাকেও পাইবার আশা যখন নাই, তখন এই বিরুদ্ধ বিপক্ষ শক্তি যত প্রচণ্ড হোক, তার সঙ্গে প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়া নিজেকে খাড়া রাখিতে হইবে। অদৃশ্য অন্তরাল হইতে ভবিষ্যতের নারী-সমাজ তার এই সংগ্রামের ফলের উপর নিজের অদৃষ্ট লক্ষ্য করিতেছে!··· তার এত-বড় বিশ্বাস···দীপ্তিকে তা পালন করিতে হইবে।···

অনেক ভাবিয়া সে স্থির করিল, সে তো সেলাইয়ের কাজ জানে, গান-বাজনাতেও কিছু দখল আছে! ভাবনা কি!···কিস্তির সর্ত্তে সেলাইয়ের কল কিনিয়া সে ফ্রক পেনি সেলাই করিলে অর্থ আসিবে, আর খপরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে বহু পরিবারে গান-বাজনা শিখাইবার কাজও মিলিতে পারে!···তার পর বই লেখা!···নিজের মনে এ বিশ্বাস তার খুবই আছে, নূতন চিন্তার ফুলে গাঁথা বিচিত্র মালা সে উপহার দিতে পারিবে! আশায় আনন্দে প্রাণ তার ভরিয়া উঠিল! এত বড় পৃথিবী···আশ্রয়ের জন্য ভাবনা!···

এমনি করিয়া দীপ্তি এই শিশুর মুখ চাহিয়া জীবন-সংগ্রামে নামিল। ফ্রক পেনি সেলাই করিয়া কয়েকটা দোকানে নগদ দামে সে তাহা বিক্রয় করিত! তার হাতের কাজে বৈচিত্র্য ছিল, পারিপাট্য ছিল, অথচ দামেও সস্তা, কাজেই কয়েকটা দোকানের মালিক খুব আগ্রহে দীপ্তির তৈরি জামা সেমিজ ফ্রক প্রভৃতি কিনিয়া লইত! খপরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া দুই-চারিটা বড় ঘরে মেয়েদের গান-বাজনা শিখাইবার কাজও তার মিলিয়া গেল। তবে মুস্কিল বাধিল এই যে, সান্ত্বনাকে একলা ফেলিয়া যাইতে হয়! বাধ্য হইয়া একজন দাসী রাখিতে হইল। সে বাহিরে গেলে দাসীই সান্ত্বনাকে দেখাশুনা করে।···তার পর রাত্রির নির্জ্জন অবসরে এক-একদিন দীপ্তি উপন্যাস লিখিতে বসিয়া যায়! সে এক বিচিত্র জগতের বিচিত্র কাহিনী···তারি স্বপ্নের রঙে আগাগোড়া রঙানো!···তার মনের উপর দিয়া চিন্তার যে ঝড় বহিয়া চলিয়াছে, সে ঝড়ে কত ছবির টুক্‌রা ঝরিয়া পড়ে! দীপ্তি সেইগুলিকে কাগজের উপর সাজাইয়া গুছাইয়া ধরে। তার অঙ্কিত চরিত্রগুলি তারি প্রাণের রসে জীবন্ত হইয়াওঠে!···

ছয় মাসের পরিশ্রমে সে উপন্যাস রচনা শেষ করিল! এখন প্রশ্ন, তার এ বই কিনিবে কে? তাছাড়া বই ছাপিবার পয়সা নাই!···প্রকাশকের দ্বারে ফেরা··· দীপ্তি কুণ্ঠিত হইল। তার বুকের রক্তে আঁকা ছবি··· কে ইহা গ্রহণ করিবে!—অনাদরে অবহেলায় যদি এর শির ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়ে! নৈরাশ্যের আশঙ্কায় দীপ্তির প্রাণ টন্‌টন্ করিয়া উঠিল!

তবু ঘরের কোণে জল্পনা লইয়া বসিয়া থাকিলেও চলে না!···মনের কুণ্ঠা-সঙ্কোচ কাটাইয়া দীপ্তি একদিন লেখা খাতাখানি লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।···বহু প্রকাশকের দ্বারে ঘুরিয়া নিরাশ হইয়া ভগ্ন প্রাণে বাড়ী ফিরিবে বলিয়া সে হেদুয়ার কোণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে রিক্‌শার সন্ধানে, এমন সময় একখানা মোটর তাকে দেখিয়া পথে থামিয়া পড়িল। মোটর হইতে এক সুবেশ যুবা নামিয়া তার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। দীপ্তি বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে তার পানে চাহিতে সে কহিল—আপনি এখানে দাঁড়িয়ে!···

দীপ্তি হাসিয়া কহিল,—বাড়ী যাবো ভাবছিলুম······

যুবা কহিল,—যদি আপত্তি না থাকে, আমার গাড়ীতে আসুন।···আপনার সঙ্গে আমার একটু দরকারও আছে।

দীপ্তি অবাক্ হইয়া গেল! তার কাছে দরকার! চিনিতে ভুল হয় নাই তো? সে যুবার পানে কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে চাহিল।

যুবা বুঝিল, দীপ্তি দ্বিধা করিতেছে। সে বলিল,—আমি প্রভার দাদা···যে-প্রভাকে আপনি গান শেখান!

—ও! বলিয়া দীপ্তি আর আপত্তিমাত্র না করিয়া মোটরে উঠিল; যুবাও মোটরে উঠিয়া সোফারকে মাণিক-তলার দিকে গাড়ী চালাইতে বলিল।

গাড়ী চলিলে দীপ্তি কহিল,—কি কথা আপনার, বলুন······

যুবা কহিল,—আমার নাম ক্ষিতীশ!···প্রভার কাছে শুনছিলুম, আপনি নাকি একখানি উপন্যাস লিখেচেন,···

দীপ্তি কহিল,—হ্যাঁ।

ক্ষিতীশ কহিল,—সম্প্রতি আমি একটু পাব্লিশিং কাজ সুরু করেচি। ক'জন নামজাদা লেখকের উপন্যাসও হাতে পেয়েচি,—সেই সঙ্গে আপনার বইখানিও ছাপতে চাই —অবশ্য যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে!

আঁধারে আলো দেখিলে প্রাণ যেমন উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে, দীপ্তি ঠিক তেমনি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে বলিল,—আপত্তি!···আমি এই নতুন লেখা সুরু করেচি

—এই আমার প্রথম বই। এ বই ছাপতে ঝুঁকি আছে খুব···আপনি নিজে স্বেচ্ছায় ছাপাতে চাইছেন, এ যে মস্ত লোভের কথা!···কিন্তু আপনার টাকাগুলো হয়তো বাজে খরচ হয়ে যাবে!···

ক্ষিতীশ মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল,—ব্যবসা করতে গেলে ঝুঁকি তো নিতেই হবে! জানেন তো, কথা আছে, No risk, no gain. কোন্ বই বাজারে কি-রকম বিকুবে, তা কেউ বলতে পারে না, আগে থেকে। বড় লেখকের লেখা বইও দেখা যায় তেমন বিকুচ্ছে না,··· অথচ রামা-শামার বই ভীষণ রেটে বিক্রী হচ্ছে।···

দীপ্তি কহিল—সেই বই নিয়ে আজও বেরিয়েছিলুম। বড় বড় দোকানে ঘুরে এলুম। নতুন লোকের লেখা ছাপতে কেউ ভরসা পায় না! নিরাশ হয়ে ফিরছিলুম, ···এমন সময় আপনি এলেন!···বই আমার কাছেই আছে!···

ক্ষিতীশ কহিল,—আমায় যদি পড়তে দেন একবার···

দীপ্তি কহিল,—নিশ্চয় পড়বেন। না পড়ে বুঝবেন কি করে ছাপবার যোগ্যতা এর একটুও আছে কি না!

ক্ষিতীশ কহিল,—বেশ, আজ আমায় দেবেন,— রাত্রেই আমি পড়ে ফেলবো। কাল আপনাকে জানাতে পারবো,···আর বাকী কথাবার্ত্তা তখনি হবেখন!

দীপ্তি কহিল,—রাত্রেই পড়ে উঠতে পারবেন!··· হাতের লেখাও অনেক জায়গায় জড়িয়ে আছে!···আমার তো তেমন তাড়া নেই—অবসর-মত পড়লে চলবে।

ক্ষিতীশ কহিল,—অবসর খুঁজলে তো ব্যবসা চলে না! আমার যে এই ব্যবসা!···কত রাবিশ যে ঘাঁটতে হয়! আপনার লেখা ভালো হবে বলেই আশা করা যায়। আমাদের দেশের শিক্ষিতা লেখিকারা নেহাৎ রাবিশ দেন না; রাবিশের বোঝা দেয়, পুরুষ-লেখক! মনের কারবার নিয়েই তো উপন্যাস···আর এ মনের বিস্তার যদি কারো থাকে সে নারীর আছে!···

ক্ষিতীশের কথা-বার্ত্তায় তার প্রতি দীপ্তির একটু শ্রদ্ধাও জন্মিল। নারীর প্রতি তার এতখানি বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা! এতগুলা বহির দোকানে ঘুরিয়া সে তো কারো কাছে দরদের একটা কথাও শুনিতে পায় নাই। বিপুল দম্ভে বুক ফুলাইয়া সব বসিয়া আছে···একজন লেখা আনিয়া ধরিতেছে, লেখাটা না হয় পড়িয়াই ঢাখো—না, একেবারে গোড়া হইতে সব সাব্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছে, নূতন লেখকের লেখা আর কি হইবে!···পুরানো লেখকের মামুলি কাসুন্দি ঘাঁটাও তাদের কাছে ঢের আদরের, লোভের সামগ্রী!···হা রে দুনিয়া!

গাড়ী আসিয়া তার বাগানের সামনে পৌঁছিল। দীপ্তি বলিল,—আমি এইখানে থাকি। ক্ষিতীশ গাড়ী থামাইল। দীপ্তি নামিল, কহিল,—আসবেন না?

প্রসন্ন চিত্তে ক্ষিতীশ কহিল,—আসবো বৈ কি!···

উভয়ে নামিয়া ভিতরে আসিল! ছোট্ট গৃহ···তবু কি পরিচ্ছন্ন। চারিদিকে কি পারিপাট্য আর শৃঙ্খলা! ছোট দোলায় সান্ত্বনা ঘুমাইতেছে! ক্ষিতীশ কহিল,— এটি···?

দীপ্তি কহিল—আমার মেয়ে।

তারপর নানা বিষয়ে কিছুক্ষণ নানা কথা বার্ত্তা কহিয়া ক্ষিতীশ কহিল—আজ তা হলে উঠি। আপনার লেখাটা দিন—কাল সকালেই আমি আবার আসচি, কথা-বার্ত্তা কয়ে সব ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলবার জন্য!··· একসঙ্গে পাঁচ-সাতখানা বই আমি প্রেসে দিতে চাই।

খাতা লইয়া ক্ষিতীশ চলিয়া গেল। দীপ্তি দাঁড়াইয়া দেখিল। ক্ষিতীশের গাড়ী চলিয়া গেলে সে ফিরিয়া দাসীকে কহিল,—একে কখন্ খাইয়েচিস্ রে···? কালমেঘটা আর একবার দিয়েছিলি তো?

দাসী জবাব দিল, দীপ্তির আদেশ সে যথারীতি পালন করিয়াছে। দীপ্তি কহিল,—তুই এখন যা। উনুনটা ধরিয়ে ফ্যাল্। যতক্ষণ না উনুন ধরে, ততক্ষণ আমি এই ফ্রকটা শেষ করে ফেলি···

দাসী উনুন ধরাইতে গেল। দীপ্তি আলোর সামনে সেলাই লইয়া বসিল।

## ১২

পরের দিন বেলা তখন আটটা। দীপ্তির দ্বারে ক্ষিতীশের মোটর আসিয়া দাঁড়াইল। দীপ্তি তখন সান্ত্বনার বালিশ-কাঁথাগুলা রৌদ্রে দিয়া, সাবান মাখাইয়া জামা কাচিতেছ! ফ্লোরের কাছে সিঁড়ির নীচে আসিয়া ক্ষিতীশ কি বলিয়া কাকে ডাকিবে, তার কোন হদিশ না পাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কতক্ষণ পরে দীপ্তি জামা কাচিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দিবে বলিয়া আসিয়া দেখে, ক্ষিতীশ দাঁড়াইয়া আছে। সে কহিল,—আপনি!·· কতক্ষণ এসেচেন?···

ক্ষিতীশ দীপ্তির পানে চাহিল, কহিল,—এই আসচি···

—তা ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন যে! আসুন···

দীপ্তির কাপড়-সেমিজ জলে ভিজিয়া গিয়াছিল, আঁচলটা কোমরে জড়ানো। আঁটা শরীরখানি প্রভাতের তরুণ অরুণ-আলোয় যৌবনের পরিপূর্ণ প্রভায় বিকশিত! ক্ষিতীশ তাহা লক্ষ্য করিল, লক্ষ্য করিয়া সলজ্জভাবে মাথা নামাইল। দীপ্তি কহিল,—আসুন···

ক্ষিতীশ দীপ্তির আহ্বানে উপরে আসিল। দীপ্তি তাকে বসিতে বলিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিতে গেল। ক্ষিতীশ ঘরখানার চারিধারে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। আসবাবপত্র অল্প, তবে সেগুলি পরিপাটী করিয়া সাজানো। দেওয়ালের পাশে ছোট একটি টী-পয়।

তার উপরে দোয়াত, কলম-দান, একখানি প্যাড, এক-খানি ফটো। ফটোখানি অরুণের। ফটোর ফ্রেমের মাথায় সদ্য-তোলা একটি রক্ত গোলাপ! খড়খড়ির গায়ে ঝালর-দেওয়া সাদা পর্দ্দা! চারিদিকে গৃহ-স্বামিনীর সুরুচি ও পারিপাট্যের ছাপ। দীপ্তির প্রতি শ্রদ্ধায় ক্ষিতীশের মন আর-একবার ভরিয়া উঠিল।

একটু পরে দীপ্তি আসিল, আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঘরে একখানি মাত্র চেয়ার ছিল।

ক্ষিতীশ তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল,—আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন যে!

দীপ্তি কহিল,—তা হোক, আপনি বসুন।

ক্ষিতীশ কহিল,—সে কি হয়! আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন, আর আমি বসবো!

দীপ্তি হাসিয়া কহিল,—তাতে কি! চেয়ার আমার ঐ একখানি মোটে আছে। আপনি অতিথি···

ক্ষিতীশ কহিল,—তা হোক! আপনি এই চেয়ারে বসুন, আমি দাঁড়িয়ে থাকচি······

দীপ্তি কহিল,—কেন আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন!··· আচ্ছা, আমি মেঝেয় মাদুর পেতে নয় বসচি···

বলিয়া একটা মাদুর টানিয়া মেঝেয় পাতিয়া তারি এক প্রান্তে দীপ্তি বসিয়া পড়িল, বসিয়া কহিল,—এই আমি বসচি···আপনি এখন বসুন-তো······

ক্ষিতীশ কহিল,—আপনি মেঝেয়, আর আমি চেয়ারে···তা হয় না।

দীপ্তি হাসিয়া কহিল,—তাতে কিছু এসে যায় না! ·· এ তো অতি তুচ্ছ একটা ব্যাপার···এটায় অত মনোযোগ নাই বা দিলেন!

ক্ষিতীশ এই মহিলার কথার ভঙ্গিমায় এমন একটা তেজ লক্ষ্য করিল যে, তার সঙ্গে তর্ক করিতে যাওয়া স্পর্দ্ধা, ইহা ভাবিয়া সে ক্ষান্ত হইল এবং চেয়ারে বসিয়া দীপ্তির লেখা খাতাখানি বাহির করিয়া কহিল,—তা হলে কাজের কথা পাড়া যাক!

দীপ্তির বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। এইবার তার পরীক্ষা! সে মুখ তুলিয়া চকিতের জন্ত ক্ষিতীশের পানে চাহিল, কহিল,—বলুন···

ক্ষিতীশ কহিল,—আপনার উপন্তাস কালই আমি পড়ে শেষ করেচি, রাত একটা অবধি জেগে!···চমৎকার বই হয়েচে। উপেক্ষিতা নারীর মনের অসহ্য দুঃখ, তার নীরব মর্ম্মবেদনা, মুক্ত আলো-হাওয়ার জন্ত তার প্রাণের অধীর আকাঙ্ক্ষা···এ সব যেন ছবির মত ফুটিয়ে তুলে-চেন!···বাংলায় এমন বই এর আগে পড়ি নি···

দীপ্তির সারা অঙ্গ লজ্জায় ছমছম করিয়া উঠিল। কাণের কাছে এই প্রশংসার বাণী, মনকে যে পাগল করিয়া তোলে!

ক্ষিতীশ কহিল,—বইখানির নাম-করণ করেননি এখনো, দেখলুম। নামটা কি দেওয়া যায়, বলুন তো?

দীপ্তি কহিল,—ভেবে ঠাওয়াতে পারি নি!···তবে কাল রাত্রে মনে হচ্ছিল, ও আর বেশী ভেবে কাজ নেই··· খুব সাধারণ নাম দেওয়া যাক। ভাবচি, 'উপেক্ষিতা' নাম দিলে কেমন হয়?

ক্ষিতীশ বলিল,—বেশ হয়!···আমারও ঐ নামটা মাথায় আসছিল।···তা হলে ঐ নামই থাক্।

দীপ্তি কোন কথা কহিল না, শুধু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

ক্ষিতীশ একটা ঢোক গিলিয়া কহিল,—তা হলে··· এর জন্য প্রণামী আপনাকে কি দিতে হবে, আদেশ করুন!

—প্রণামী!···দীপ্তি গম্ভীরভাবে কহিল,—যা খুশী, দেবেন। আমি ও-সব জানি না! বই একটা লিখেচি এইমাত্র! তবে আপনার কাছে গোপন করবো না—আমার টাকার খুব দরকার আছে। ঐ মেয়েটিকে মানুষ করা···এই সব করেই আমায় চালাতে হবে কি না!

কথাটার মধ্যে এমন গূঢ় বেদনা ছিল যে, তাহা ক্ষিতীশের মনটাকে প্রচণ্ড দোলা দিল! সে কহিল,—বেশ, আপাততঃ দু'শো পেলে আপনার কোনো অসুবিধা যদি না হয়, তো তাই নিন···তার পর বই যেমন বিক্রী হবে, তেমনি শতকরা পঁচিশ টাকা হিসাবে কমিশন আপনি পাবেন। ছাপা, বাঁধাই, বিজ্ঞাপন—এ-সব খরচ আমার! আপনার কোন ঝুঁকি নেই!

দীপ্তি কহিল,—তা বলে আমার প্রতি দয়া দেখিয়ে লোকশান করবেন না যেন নিজের···

ক্ষিতীশ কহিল,—না, না, লোকশান হবে কেন! এটা দু-তরফ থেকেই fair। আর বড় বড় লেখকদের সঙ্গেও এই আমি সর্ত্ত করচি!

দীপ্তি হাসিয়া কহিল,—কিন্তু আমার নগণ্য লেখার দর তাঁদের সঙ্গে এক হতে পারে না।

ক্ষিতীশ কহিল,—আপনার প্রথম উপন্যাস হলেও এতে যে শক্তি আপনি দেখিয়েচেন, তা অপূর্ব্ব, একেবারে খুব উঁচু দরের!

দীপ্তি এ প্রশংসায় লজ্জা পাইল। সলজ্জভাবে সে কহিল,—কি যে আপনি বলেন!

ক্ষিতীশ কিন্তু কাল রাত্রে দীপ্তির লেখা উপন্তাস পড়িয়া সত্যই বিস্মিত হইয়া গিয়াছে! নারী-চিত্তের এ-সব গোপন তথ্য, এ যে তার একেবারে অজানা! 'উপেক্ষিতা'র নায়িকা বিভার মন মুক্ত হাওয়ায় একেবারে জল-জল করিতেছে। এমন আলোয় ভরপুর যে সে এক-নিমেষে প্রাণটাকে স্পর্শ করে। এ চরিত্রটির কোথাও

মামুলি ছাপ নাই—যেমন তার দীপ্ত ভঙ্গী, মনের প্রবাহ তেমনি সতেজ লীলায় বহিয়া চলিয়াছে! কেবল বিবেকের কাছেই সে জড়ো-সড়ো। তা ছাড়া জগতে কারো কাছে আপন-কাজের কোন কৈফিয়তের তোয়াক্কা রাখে না! তার কাজ-কর্ম্মের মধ্যেও নারী-জীবনের সেই সনাতন ধারা কোথাও নাই! তা বলিয়া কোনো রকম অন্যায়ের ধারেও সে ঘেঁষে না, বা তার নারীত্ব কোথাও খর্ব্ব হয় নাই। বাংলার উপন্যাস-সাহিত্যে এ এক সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি!

ক্ষিতীশ অবাক হইয়া তাই ভাবিতেছিল, এই নির্জ্জন নিরালা বন-প্রান্তবাসিনী নারী এ-চরিত্রের আভাস পাইলেন কি করিয়া! একটা দুর্জ্জেয় হেঁয়ালির মতই দীপ্তিকে ঘিরিয়া বিপুল রহস্য ক্ষিতীশের প্রাণে কাল হইতে ক্রমাগত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে!

ক্ষিতীশ কহিল,—আপনার বিভা এই মামুলি উপন্যাসের রাজ্যে এমন বিশিষ্ট কিরণ-পাত করেচে যে, তার রশ্মিচ্ছটায় সাহিত্য-জগৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে!… তাই ভাবছিলুম, আপনি নারী, লোকালয়ের বাইরে থাকেন…এ চরিত্র সৃষ্টি করলেন কি করে?…মনের খুব অবাধ মুক্ত প্রসারতা না থাকলে এ চরিত্রের কল্পনা করাও সম্ভব নয়! ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে যে-সব লেখকের মন আবদ্ধ হয়ে আছে, তারা চর্ব্বিত-চর্ব্বণের জ্বালায় বাংলার উপন্যাস-রাজ্যটাকে গাঢ় অন্ধকারে ভরে তুলেচে…তাদের কল্পনার দৌড় আর কত হবে, বলুন!

উচ্ছ্বসিত আবেগে ক্ষিতীশ প্রশংসার নানা কথা বকিয়া চলিল। দীপ্তির বুকের মধ্যটা সে প্রশংসায় তোলপাড় করিতেছিল!

ক্ষিতীশ তো জানে না, বুকের কতখানি রক্ত দিয়া দীপ্তি তার কল্পনার ছবিকে এই উপন্যাসে আঁকিয়া তুলিয়াছে!…এ যে তারই মনের ছায়ায় বিভার চরিত্র আঁকিয়াছে সে!…

বহুক্ষণ বকিয়া ক্ষিতীশ নীরব হইল। দীপ্তি শুধু কহিল,—লিখলুম তো যা হোক,—বাজারে কি এ বই বিক্রী হবে?

ক্ষিতীশ কহিল,—বলেন কি! বিক্রী হবে না? বাঙালী পাঠকের বিবেচনা-শক্তি এখন খুবই প্রখর হয়ে উঠেচে …তারা সঙ্কীর্ণ বাজে যা-তা লেখা পড়তে চায় না, আর! অক্ষম লেখকদের হাত-মক্সোর জ্বালায় সব অস্থির। তারা চায়, প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দিত মানব-মনের জীবন্ত ছবি! বাছা-গোপালের পচা আদর্শ তারা বিষের মত দেখে! অবশ্য সমঝদার পাঠকের কথা বলচি আমি।

দীপ্তি কহিল,—দেখুন, এখন আপনার হাত-যশ! আমার লেখা তো তুচ্ছ…

ক্ষিতীশ সাগ্রহে কহিল,—কিছু ভাববেন না আপনি! …মোদ্দা এইখানেই লেখা থামাবেন না। এ বই ছাপা হোক্, আপনি আরো উপন্যাস লিখুন! বাঙালীকে কিছু দেবার শক্তি যখন আপনার আছে, তখন দানে কার্পণ্য করবেন না!

এই অপরিচিত তরুণের কথায় দীপ্তির মন তার প্রতি আকৃষ্ট হইল। এমন দরাজ উদার মন…এর পূর্ব্বে সে আর একটি মাত্র দেখিয়াছিল—অরুণের! আজ অরুণ নাই!…দীপ্তি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। তার মনে হইল, এই যে নিবিড় আঁধারের মধ্য দিয়া বাকী জীবন কাটাইয়া দিবে ভাবিয়া সে আকুল হইয়া উঠিতেছিল, কাহারো সঙ্গে আর কখনো মনের সুর মিলাইতেও পারিবে না বলিয়া…একা নিঃসঙ্গ গৃহকোণের কীট হইয়া নিজের বেদনা লইয়া তাকে তৃপ্ত থাকিতে হইবে…তা নয়! একজন বন্ধু এই শূন্য জীবনে আবার আসিয়া দেখা দিয়াছে! শুধু কাজের কথা কহিতে-কহিতে প্রাণ আর হাঁপাইয়া মরিবে না!…স্বস্তির নিশ্বাসে দীপ্তির চিত্ত ভরিয়া উঠিল।

ক্ষিতীশ কহিল,—কেমন, তা হলে কথা দিন্ আমাকে—আরো লিখবেন…!

দীপ্তি কহিল,—দেখা যাবে। আমার তো উপন্যাস লেখবার শক্তি নেই! এমনি চুপচাপ বসে থাকি, ভাবলুম, কিছু লেখবার চেষ্টা করে দেখি!…তাই ছাই-পাঁশ যা মনে এলো, লিখতে সুরু করলুম!

হাসিয়া ক্ষিতীশ কহিল,—ছাই-পাঁশই বটে!…কথায় বলে না, যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখো তাই, মিলিলে মিলিতে পারে বিবিধ রতন!—এমনি ছাই-পাঁশ আরো পাঁচজন যদি দিতে পারতো, তা হলে বাংলা সাহিত্যের দুর্দ্দশা কতক ঘুচতো!…

এই ব্যাপার হইতে ক্ষিতীশের সঙ্গে দীপ্তির অন্তরঙ্গতা বাড়িয়া উঠিল। দীপ্তি যেদিন প্রভাকে গান শিখাইতে যায়, সেদিনটা ক্ষিতীশও এমন অধীর আগ্রহে তার পথ চাহিয়া বসিয়া থাকে! দীপ্তি গান গায়, প্রভাও তার সুরে সুর মিশাইয়া যে স্বপ্ন-জালের সৃষ্টি করে, সে জালে ক্ষিতীশও কেমন মুগ্ধ আবেশে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া ফেলে! প্রভা অবাক হইয়া গেল, গানের দিকে দাদার হঠাৎ এমন ঝোঁক জাগিয়াছে দেখিয়া। আগে এই গান করাটাকে ক্ষিতীশ অলসতার প্রশ্রয় দেওয়া বলিয়া উড়াইয়া দিত! আর এখন…!

একদিন হাসিয়া প্রভা কহিল,—গানটা তা হ'লে কুড়েমির চর্চ্চা নয়…না দাদা?

ক্ষিতীশ এ কথায় অপ্রতিভ হইয়া কহিল,—তার মানে?

প্রভা কহিল,…আগে মার কাছে কত না লাগাতে, গান গাওয়া কি! প্যাঁ-প্যাঁ করে বাজনা আর তার সঙ্গে

তা-না-না ক'রে গাওয়া···এতে সময় নষ্ট না করে লেখাপড়া করুক না!—আর এখন যে নিজে তন্ময় হয়ে গান শুনতে বসে যাও···

দৃষ্টিতে হাসি ভরিয়া দীপ্তি ক্ষিতীশের পানে চাহিল। ক্ষিতীশ তা লক্ষ্য করিল, লক্ষ্য করিয়া কহিল,—তা ব'লে কি সে তোর ঐ প্যাঁ-প্যাঁ!···এঁর গান শুনে মনে হচ্ছে বটে যে, হ্যাঁ, গান জিনিষটা বসে শোনবার মত!···

প্রভা অভিমানের সুরে বলিল,—তা, আমি বুঝি দু'দিনেই অমন শিখে ফেলবো!···গাইতে গাইতেই তো গলা হবে—নয় দিদি?

প্রভা দীপ্তির দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল। দীপ্তিকে সে দিদি বলিয়া ডাকে।

দীপ্তি কহিল,—তা বৈ কি!···প্রভার গলা ভালো, দানা আছে···গাইতে গাইতে ওর গলা চমৎকার খুলবে!···

প্রভা সহর্ষে কহিল,—শুনলে তো!···

ক্ষিতীশ কহিল,—শুনলুম। তাইতো···তোর গলার evolution লক্ষ্য করি বসে-বসে! যাক্, এখন তর্ক ছেড়ে ঐ গানটা শিখে ফেল্!···বেশ গান। রবি বাবু না হ'লে গান লিখবে কি ঐ ওপাড়ার মথুর কুণ্ডু, না শিবু সা···? কেমন ভাব ছাখ্, দিকি···আর কি সুরের ঝর্ণা বয়ে চলেছে!—বিদায় যখন চাইবে তুমি দখিণ সমীরে! ···আহা! বিদায়ের বেদনা কি অপরূপ করুণ হয়ে ফুটে উঠেচে···অশ্রুর মালা গলায় ধরে বিদায়-বেলাটুকু যেন বেদনায় টল্‌মল্ করছে!···

দীপ্তি কহিল,—রবি বাবুর গান গাইতে সুখ, শুনে সুখ···বাংলা দেশে এ সব গান দেখে, অন্য লোক গান লেখে কি সাহসে, তাই আমি মাঝে-মাঝে ভাবি···

ক্ষিতীশ প্রবল উচ্ছ্বাসে মাথা নাড়িয়া কহিল,—ঠিক কথা! Fools rush in, where angels fear to tread

## ১৩

দীপ্তির উপন্যাস 'উপেক্ষিতা' যথাসময়ে ছাপিয়া বাহির হইল—এবং তরুণ প্রকাশক ক্ষিতীশ প্রবল উৎসাহে তাকে বিজ্ঞাপনের তাঞ্জামে চড়াইয়া মহা সোর-গোল বাধাইয়া লোকের দৃষ্টি-আকর্ষণে কার্পণ্য করিল না। বহু নিষ্কর্ম্মা অলস ব্যক্তি—যারা দুনিয়ার কোন কাজে সাফল্য লাভ করিতে না পারিয়া হিংসার আগুনে পুড়িয়া দুনিয়াকে পুড়াইবার জন্য মাথা কুটিয়া মরিতে-ছিল,—এবং বসিয়া-বসিয়া নভেল নাটক ও কবিতায় হাত মক্সো করিতে গিয়া কলম আঁচড়াইয়া কিছুতেই লেখা বাহির করিতে না, তারা শেষে সমালোচকের গদি পাতিয়া সমালোচনার কাজে লাগিয়া গেল! তাদের লেখায় আর কিছু না থাক্, সনাতন সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য প্রচণ্ড চেষ্টা এবং যাদের রচনায় একটু প্রাণের স্পন্দন দেখা যায়, গুণ্ডার মত তাদের সেই প্রাণ-টুকুকে চাপিয়া মারিবার জন্য অমানুষিক বিক্রম আর গালি-কুৎসার বিষ এমন আত্ম-প্রকাশ করিত যে, তারা অচিরে বাণীর কমল-বনের ধারে লোলুপ ব্যাঘ্র ও বন্য বরাহের মত দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিল। তারা সর্ব্বদা ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকিত, কখন্ কার লেখা বাহির হয়! বাহির হইলেই চিড়িয়া-খানার খাঁচায়-পোরা বাঘ মাংস-খণ্ড পাইলে যেমন লাফ দিয়া তার উপর পড়িয়া সেটাকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া নিজের রুদ্ধ আক্রোশ মেটায়, তেমনি ভাবেই এরা সে লেখাকে দাঁতে কাটিয়া নখে ছিঁড়িয়া তচ্‌নচ্ করিয়া দেয়।

দীপ্তির উপন্যাস বাহির হইলে, তেমনি নির্ম্মম বিক্রমে তার প্রতি পৃষ্ঠা কলমের খোঁচায় জর্জ্জরিত করিয়া সকলকে মহা-কলরবে জানাইয়া দিল যে, এ বই বাংলা সাহিত্যের কলঙ্ক, বাঙালীর সমাজকে ধূমকেতুর মতই ধ্বংস করিবার জন্য উদয় হইয়াছে! শুধু এইটুকু বলিয়াই তাহারা ক্ষান্ত রহিল না—লেখার ফাঁক দিয়া লেখিকার সম্বন্ধে এমন গ্লানিকর কুৎসার সৃষ্টি করিয়া তুলিল যে, তাহা পড়িয়া নিতান্ত নিরীহ শান্ত পাঠকের মনও রাগে ঘৃণায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। নিজেদের মনের যা-কিছু কালি ঘাঁটিয়া তারি গাঢ় প্রলেপে সারা উপন্যাস-খানিকে সে কালি লেপিয়া কালো করিয়া ছাড়িল না, তারা দীপ্তির নাম, দীপ্তির চরিত্র এ-সবের উপরও সেই কালি ছিটাইয়া তাকেও নিবিড় কালো করিয়া তুলিল।

তাদের অধ্যবসায় এই কুৎসা লিখিয়াই ক্ষান্ত রহিল না। অসাধারণ উদ্যমে দীপ্তির ঠিকানার সন্ধান করিয়া সেই কুৎসাভরা আলোচনা দীপ্তির ঠিকানায় পাঠাইয়া তবে তাদের সাহিত্য-প্রীতি ও সমাজ-অনুরাগ শান্ত হইল। দীপ্তি সে আলোচনা পড়িল! পড়িয়া অসহ্য বেদনায় তার নিশ্বাস বন্ধ হইবার মত হইল। দুই চোখে কোথা হইতে জলও ঠেলিয়া আসিল। দীপ্তি একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল।

ক্ষিতীশ আসিয়া কহিল,—এ রকম বসে আছেন যে?

দীপ্তি সেই লেখাগুলা তার দিকে আগাইয়া দিয়া কহিল,—পড়েচেন?

ক্ষিতীশ হাসিয়া কহিল,—কি, ঐ সব রোতো গালাগাল?

দীপ্তি কহিল,—সমালোচনা!

ক্ষিতীশ ঝাঁঝালো স্বরে কহিল,—একে সমালোচনা বলে সমালোচনার অপমান করবেন না। ভাড়াটে গুণ্ডার দল, এদের বলেন, সমালোচক! Failure has made monsters of these vile creatures! যত নর্দ্দামার

পোকা—দুর্গন্ধ পাঁকের মধ্যে নাক-মুখ গুঁজে পড়ে আছে সারাক্ষণ—ফুলের গন্ধ, আলোর লহর এরা সহ্য করতে পারে কখনো?···এদের ছুঁচো বললেও ছুঁচোর অপমান হয়—এরা রামছুঁচো···

দীপ্তি ক্ষিতীশকে এর পূর্ব্বে এমন উত্তেজিত কখনো দেখে নাই! সে অবাক্ হইয়া গেল, তার রাগ দেখিয়া! ধীর স্বরে সে কহিল,—একজন নয় তো, তিনজনে তিনটে লেখা পাঠিয়েচে—আমার ঠিকানাও কোথা থেকে জেনেচে!···আশ্চর্য্য!

ক্ষিতীশ কহিল,—এই তো কাজ ওদের!···দিন্ দিকি এই কাগজগুলো! পা দিয়ে চেপে পিষে তার পর আগুন জ্বালি—জ্বেলে পুড়িয়ে ছাই করে দি!···

বলিয়া সে মুহূর্ত্ত থামিল, তারপর বলিল,—না, না, নিজে এ কাজ করবো না। একটা ম্যাথর নেই? তাকে পা দিয়ে মাড়াতে বলি, তার পর সে-ই এগুলো আগুনে পোড়াক! তা হলেই এর যোগ্য মর্য্যাদা একে দেওয়া হবে!···বলিয়া সে কাগজগুলা মেঝেয় ফেলিয়া জুতায় মাড়াইয়া জুতার ঠোক্করে ঘরের বাহির করিয়া দিল।

তারপর ক্ষিতীশ কহিল,—এর জন্য মাথা ঘামাবেন না মোটে!···যাঁরা প্রাণবন্ত সাহিত্য ভালোবাসেন,—অবশ্য এমন লোকের সংখ্যা খুব কম,—তাঁরা এ বইয়ের খুব আদর করচেন। এই দেখুন তাঁদের সমালোচনা! সমালোচনা যাকে বলে! আর ওগুলো? চার আনা পয়সা দিন, কি দু'খানা বাসি কাট্‌লেট ঐ পথের ধারের হোটেলের— সুর ফিরিয়ে কি পুষ্পাঞ্জলিই যে এরা তখন বর্ষণ করবে, দেখবেন আবার। এরা লিখিয়ে? ভাড়াটে গুণ্ডা সব। এখন আসল সমালোচনা দেখুন···

ক্ষিতীশ একখানা মাসিক-পত্র খুলিয়া দীপ্তির সামনে ধরিল। দীপ্তি দেখিল, তার 'উপেক্ষিতা'র ক্ষুদ্র একটা সমালোচনা বাহির হইয়াছে। দীপ্তি সাগ্রহে পড়িতে লাগিল। নানা কথার পর সমালোচক লিখিয়াছেন, বইখানিতে প্রতিভার ছাপ আছে। তাঁর সৃষ্ট চরিত্র-গুলির মতের সঙ্গে আমাদের মত না মিলিতে পারে, তবু বলিব, গল্পটিতে এমন কৌতূহল উদ্রিক্ত হইয়াছে যে, এ বহি রুদ্ধ নিশ্বাসে পড়িয়া শেষ করিতে হইবে! মানব-জীবনের এত বড় ট্র্যাজেডি বাংলায় আর নাই। মনস্তত্ত্বের এমন সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ—যে, দেখিয়া অবাক হইতে হয়! অবসাদের তীব্র বেদনায় নৈরাশ্যের হাহাকারে বহিখানির প্রতি পৃষ্ঠা ভরা—তবু এর আগাগোড়া প্রাণের যে স্পন্দন জাগিয়াছে, তা অভিনব। সমাজের নানা কলুষিত প্রথার বিরুদ্ধে এমন সতেজ সঙ্কেত—লেখিকার এই বিপুল নির্ভীকতা, তাঁর যুক্তির অমোঘ আবেগ অস্বীকার করা যায় না। তবে এ বহি আরো পঞ্চাশ বৎসর পরে লিখিত হইলে বোধ হয় এর যোগ্য আদর হইত। সর্ব্বপ্রকার সংস্কার হইতে পাঠকের মন মুক্ত না হইলে এ উপন্যাসের মর্ম্ম-কথা তারা উপলব্ধি করিতে পারিবে না, ইত্যাদি-ইত্যাদি···

পড়া শেষ করিয়া দীপ্তি ক্ষিতীশের পানে চাহিল। ক্ষিতীশ কহিল,—পড়লেন! ·· তার পর থামিয়া আবার সে কহিল,—সমালোচনা জিনিষটা আমাদের দেশে নেই।···কাল্‌চার তেমন না থাকলে, প্রাণটা খুব দরাজ বড় না হলে সমালোচনা করা যার তার কর্ম্ম নয়। ঐখানে বানান ভুল হয়েচে, ওখানে ঐ ভাষার দোষ—এ তো সমালোচনা নয়—এর নাম পাঠশালার গুরুমশায়-গিরি! আমাদের এ দেশটা হলো অতি-বিজ্ঞের দেশ—সবাই এখানে সব দিকে অসাধারণ ওস্তাদ, আর জ্ঞানী! যে দালালী করছে, কি স্কুলে অঙ্ক কষায় বা তর্জ্জমার কাগজ দেখচে, সেও যখন সাহিত্যের আসরে এসে আচম্‌কা দেখা দেয়, তখন কাব্য, পুরাণ, নাটক থেকে সমস্ত ব্যাপারের আলোচনায় এমন বিপুল স্পর্দ্ধা প্রকাশ করে, যে তা দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাই। এদের দৃষ্টির সীমা খুব সঙ্কীর্ণ--নিজেদের প্রত্যক্ষ করা সেই ছোট্ট গণ্ডীর বাহিরে সব অন্ধকার! কল্পনার দৌড় এদের সেই গণ্ডীর কানাচ অবধি! সমালোচকের কল্পনা-শক্তি কত বেশী থাকা দরকার, তা এরা কি জানে!···আমাদের এই অতি-উর্ব্বর দেশে সবাই যেমন সমাজপতি, তেমনি সবাই সমালোচক, সবাই এডিটর--পাঠক নেই! নাহলে রবিবাবু--যাঁর নামে গৌরবে-গর্ব্বে দেশ ফুলে উঠবে, তাঁর লেখা নিয়েও রামছুঁচোর দল টিটকিরী দেয়, ব্যঙ্গ করে!...আপনি কি ছার···!

মৃদু হাসিয়া দীপ্তি কহিল,—আপনি তর্ক থামান্ দিকি। ও গালাগাল পড়ে আমি একটুও বিচলিত হই নি! লেখকের নিজের মন বলে একটা তো জিনিষ আছে! সে মনের কাছে ফাঁকি চলে না! সেই মন লেখককে বলে দেয়, সে যা দিচ্ছে, তার মধ্যে কতখানি প্রাণ, কত-খানি সার বস্তু আছে!··· সমালোচকের কথায় সে মন টলবার নয়!

ক্ষিতীশ কহিল,—ঠিক বলেচেন!···আপনি আবার উপন্যাস লিখুন—আমি ছাপ্‌বো। আমি তো বরাবর বলেচি, দুনিয়াকে কিছু দেবার শক্তি আপনার আছে। দেবার জিনিষও যখন দিতে পারেন, তখন তা না দেবেন কেন?···

দীপ্তি কহিল,—দেখা যাক্!···

দীপ্তির লেখা চলিল—কিন্তু অতি-ধীরে! বছরে একখানি উপন্যাস লেখা হয়! ক্ষিতীশ উৎসাহে তা ছাপে—এবং এই লেখার উৎসাহে-আলোচনায় কোথা দিয়া যে পাঁচটা বছর কাটিয়া গেল···সে যেন স্বপ্নের

কথা! সান্ত্বনা বড় হইতেছে—তার মুখে-চোখে লাবণ্যের হিল্লোল! পরী-শিশুর মত নাচিয়া সে খেলা করে, গানের সুরে কত কথা বলে, কত গল্প করে··· দীপ্তির প্রাণ তাহাতে আরামের উচ্ছ্বাসে ভরিয়া ওঠে!

এই দীর্ঘ পাঁচ বৎসর সমস্ত জগৎ হইতে দূরে থাকিয়া দীপ্তির দিন কাটিয়া চলিয়াছিল। শুধু ক্ষিতীশ এখানে প্রায় আসে—তার খোলা প্রাণের সরল কথা-হাসি দীপ্তির নিঃসঙ্গ পুরীটিকে কি কলোচ্ছ্বাসেই ভরিয়া তোলে!

একদিন দৈবাৎ কি-একটা সভায় দীপ্তির দেখা হইয়া গেল তার পিতার সঙ্গে। পশুপতি চক্রবর্ত্তী ছিলেন সে সভার সভাপতি। সমাজ ও মানুষের মনের উপর তিনি বক্তৃতা করেন। সভাভঙ্গ হইলে সকলে বাহির হইয়া গেল···দীপ্তি শুধু দাঁড়াইয়া রহিল। পশুপতি চক্রবর্ত্তী সভাস্থল হইতে বাহির হইবার সময় হঠাৎ দীপ্তিকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। দীপ্তি ডাকিল,—বাবা···

পশুপতি চক্রবর্ত্তী কহিল,—কে···দীপ্তি!

দীপ্তি কহিল,—হ্যাঁ। বলিয়া পিতাকে সে প্রণাম করিল।

পশুপতি চক্রবর্ত্তী কহিলেন,—যা করেচো, তার জন্য তোমার মনে অনুতাপ জেগেচে?

দীপ্তি বেশ শান্ত স্বরেই কহিল,—অনুতাপ! না বাবা! আমি তো কোন অন্যায় কাজ করি নি—যার জন্য অনুতপ্ত হবো!···আপনার সঙ্গে যখন দেখা হলো, তখন আপনার আশীর্ব্বাদ নেবো বলে দাঁড়িয়ে আছি। আমায় আশীর্ব্বাদ করুন, জীবনের সঙ্গে আমার যে যুদ্ধ চলেছে, তাতে যেন কাতর না হই!···সে-যুদ্ধে যেন আমি জয়ী হই···

পশুপতি চক্রবর্ত্তী দীপ্তির পানে চাহিলেন···তাঁর দুই চোখে জল ঠেলিয়া আসিল। তিনি ডাকিলেন,—দীপ্তি···

দীপ্তি ডাকিল—বাবা···তার পর দুজনেই নির্ব্বাক!

পশুপতি চক্রবর্ত্তী কহিলেন,—তোমার কথা এক দিনও আমি ভুলিনি, দীপ্তি! কাঁটার মত তুমি আমার বুকে ফুটে আছো সারাক্ষণ!···আমার বুক তোমায় ফিরে নেবার জন্য যে কি উদ্‌গ্রীব···কিন্তু যতদিন না অনুতপ্ত প্রাণে তুমি আমার কাছে এসে দাঁড়াচ্ছ, ততদিন তোমায় আমি ফিরিয়ে নিতে পারচি না মা। ঘরে আমার অন্য ছেলে-মেয়েরা আছে, তাদের ভবিষ্যৎ আছে, সমাজ আছে,—তাদের সঙ্গে এ-মন নিয়ে তুমি তো এক-ঘরে বাস করতে পারো না।···পশুপতি চক্রবর্ত্তী ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ হইলেন, পরে কহিলেন,—শুনেচি, তোমার একটি মেয়ে হয়েচে···

দীপ্তি কহিল,—হ্যাঁ, সান্ত্বনা!···সেও এসেচে আমার সঙ্গে···দাসীর কাছে গাড়ীতে আছে···

নিমেষের আগ্রহে পশুপতি চক্রবর্ত্তী কহিলেন,—এসেছে!···বলিয়াই তিনি পথের দিকে অগ্রসর হইলেন। দু'খানি গাড়ী সামনে দাঁড়াইয়াছিল, একখানি পশুপতি চক্রবর্ত্তীর জন্য—আর-একখানি···তাহাতে ঐ যে ছোট একটি শিশু···শিশু অধীর চোখে তার মার পানেই চাহিয়া ছিল। সে ডাকিল,—মা···

পশুপতি চক্রবর্ত্তী ছুটিয়া গাড়ীর সামনে গেলেন; তার পর সহসা থামিয়া পড়িলেন। থামিয়া দীপ্তির পানে চাহিয়া কহিলেন,—তুমি আজ আমার এ হাত দুটোকে কি বাঁধনে যে বেঁধে দিয়েচো! ঐ নিষ্পাপ সরল শিশু, তাকে বুকে নিতে গিয়েও নিতে পারলুম না।··· এখনো ফেরো দীপ্তি···এখনো উপায় আছে! বাপের বুকের চেয়ে একটা তুচ্ছ খেয়ালই এত বড় হলো তোমার!···

দীপ্তি জল ভরা চোখে পিতার পানে চাহিয়া কহিল—খেয়াল নয়, বাবা···

—বেশ, তবে তোমার ঐ মত নিয়েই তুমি সুখে থাকো...বলিয়া তিনি গাড়ীতে বসিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া দিতে বলিলেন। গাড়ী চলিয়া গেলে দীপ্তি তার গাড়ীতে উঠিল। সান্ত্বনা কহিল,—কে মা, ঐ বুড়ো মানুষটি?···তুমি কথা কইছিলে···?

—তোমার দাদু। দীপ্তি আর কোন কথা বলিতে পারিল না। একরাশ স্মৃতি আসিয়া তার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল, বুকের মধ্যে নিমেষে তারা প্রচণ্ড কলরব জাগাইয়া তুলিল।

সান্ত্বনা মা'র গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল,—দাদু! দাদুর কাছে যাবো মা···

—না সান্ত্বনা, দাদু নেবে না···বলিয়া সান্ত্বনাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া দীপ্তি চক্ষু মুদিল। গাড়োয়ান গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

## ১৪

এক সপ্তাহ পরে আর-একটা ঘটনা ঘটিল। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ক্ষিতীশের গাড়ীতে তার এক ধনী বন্ধু আসিয়া হাজির হইল। বন্ধুটি গাড়ীতেই বসিয়া রহিল। ক্ষিতীশ আসিয়া দীপ্তির ঘরে প্রবেশ করিল। দীপ্তি তখন একখানা নূতন উপন্যাস লিখিতেছে। ক্ষিতীশকে দেখিয়া কাগজ-পত্র রাখিয়া বলিল,—আসুন···

ক্ষিতীশ বসিল, বসিয়া কহিল,—নতুন বই এগুচ্ছে বেশ?

দীপ্তি কহিল,—বেশ আর কৈ! আজ একটু সেলাইয়ের কাজ নিয়ে পড়েছিলুম—এই তো বই নিয়ে বসচি!···

ক্ষিতীশ কহিল—দীপদির সেরে নিন্!···আপনার

ভক্তদল আমায় ভারী অস্থির করে তুলেচে, আপনার নতুন বইয়ের জন্য!

দীপ্তি কহিল,—আমার ভক্ত?

ক্ষিতীশ কহিল,—হ্যাঁ, ভক্ত!···একজন আমার সঙ্গে এসেচেন আজ আমার গাড়ীতে!···

দীপ্তি সলজ্জ কুণ্ঠিত ভাবে চারিধারে চাহিল। ক্ষিতীশ কহিল,—গাড়ীতেই তিনি বসে আছেন। আপনার অনুমতি না পেলে তো তাঁকে এখানে আনতে পারি না!···

দীপ্তি কথাটা ভালো বুঝিতে না পারিয়া ক্ষিতীশের পানে চাহিয়া রহিল।

ক্ষিতীশ কহিল,—আপনাকে তিনি একবার দেখতে চান। আপনার এমন ভক্ত পাঠক আর দুটি নেই! তাঁর ভক্তি-নমস্কার তিনি জানাতে এসেচেন!···

দীপ্তি কোন কথা কহিল না। ক্ষিতীশ একটু অপ্রতিভ হইল। দীপ্তি কি পছন্দ করিল না···? ক্ষিতীশ কি তার অধিকারের বাহিরে গিয়াছে, এ কথা তুলিয়া···? সে দীপ্তির পানে চাহিল।

দীপ্তি কহিল,—তিনি দেখা করতে চান্! বেশ—তা কবে ···?

ক্ষিতীশ প্রসন্ন হইল। সে কহিল,—যবে বলেন!··· তবে আজ তিনি এসেচেন এখানে···

—এসেচেন! দীপ্তি শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল··· দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিল।

ক্ষিতীশ কহিল,—তিনি বাড়ীতে আসেন নি, বাইরে গাড়ীতে বসে আছেন।

—গাড়ীতে! দীপ্তি কহিল,—তাঁকে নিয়ে আসুন।

গর্ব্বিত বক্ষে ক্ষিতীশ গাড়ীর দিকে ছুটিল এবং অনতিবিলম্বে বন্ধুকে লইয়া ফিরিয়া আসিল; আসিয়া কহিল—ইনিই উপেক্ষিতা-রচয়িত্রী। তার পর বন্ধুর পানে চাহিয়া কহিল,—আর ইনি আমার সাহিত্য-রসিক বন্ধু বিমলচন্দ্র দত্ত। কলকাতায় এঁর অসংখ্য বাড়ী, কারবার···কিন্তু তাতেই আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন না। সাহিত্যের ইনি রীতিমত পাঠক আর সমঝদার।··· আপনার লেখার ভারী ভক্ত। আপনার উপেক্ষিতা বই পড়ে উচ্ছ্বসিত আনন্দে বলেছিলেন, আজ এই বাংলা ভাষায় প্রথম উপন্যাস বার হলো! স্বাধীন ভাব, স্বাধীন চিন্তা, ভঙ্গী, মৌলিকতা আর স্বাস্থ্যে ভরপুর নবযুগের এই প্রথম উপন্যাস!

প্রশংসার উচ্ছ্বাসে দীপ্তি সলজ্জ কুণ্ঠায় মাথা নত করিল।

বিমল কহিল,—একটি কথাও আমি অত্যুক্তি করি নি··

ক্ষিতীশ কহিল,—সমস্ত বিদেশী কাব্য-উপন্যাস বিমল পড়ে ফেলেচে! শুধু পড়া নয়, সেগুলির সৌন্দর্য্যও বারে আয়ত্ত করে রেখেচে! আপনার উপেক্ষিতার একটা সমালোচনাও লিখে ফেলেচে···তবে কোনো মাসিক-পত্রে তা ছাপায়-নি! ওর ইচ্ছা, নতুন একখানা কাগজ ও বার করে—আর আপনাকে সেই কাগজের প্রধান লেখিকা করে কায়েমিভাবে আপনাকে আটকে ফেলে···

দীপ্তি মুখ তুলিয়া বিমলের পানে চাহিল। বিমল কি শ্রদ্ধার আবেগ-ভরা দৃষ্টিতে দীপ্তির পানে চাহিয়া ছিল! দীপ্তি মুখ তুলিতেই দুজনে চোখাচোখি হইল। বিমল চোখ নামাইল।

বিমল কহিল,—ক্ষিতীশ আমার বন্ধু। বন্ধুত্বের খাতিরে আমার সম্বন্ধে অনেক অতিরঞ্জিত কথা ও বলেচে! সেজন্য ওকে ক্ষমা করবেন। আমি শুধু সাহিত্যের ভক্ত। কাজেই আপনার লেখারো খুব ভক্ত পাঠক—আমার এইটুকু পরিচয়মাত্র আপনি জেনে রাখুন।

দীপ্তি কহিল,—আপনি যে দাঁড়িয়ে রইলেন! বসুন ···বলিয়া চেয়ারটা টানিয়া দিতে গেল।

বিমল ক্ষিপ্র হাতে চেয়ারখানা দীপ্তির হাত হইতে ছিনাইয়া টানিয়া লইল; লইয়া কহিল,—আমি বসবো, আর আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন! তা হয় না!···আপনি বসুন, আমি এই মেঝের সতরঞ্চিতে বসচি!···বলিয়া সে মেঝেয় পাতা সতরঞ্চের একধারে বসিয়া পড়িল।

দীপ্তি কহিল,—সে কি!···না না, ওখানে বসবেন না। আপনি চেয়ারে বসুন, আমি নীচেয় বসচি···

বিমল কহিল,—সে হতেই পারে না!···আপনার দুর্ভাগ্য যে, এই বাংলা দেশে এ প্রতিভা নিয়ে জন্মেচেন। বিলেত হলে আজ আপনাকে সকলে রত্ন-সিংহাসনে বসিয়ে দিতো!

লজ্জার রক্তিম উচ্ছ্বাসে দীপ্তির মুখ রাঙা হইয়া উঠিল।

ক্ষিতীশ কহিল,—বিমল অনেকদিন থেকেই আপনার এখানে আসতে চাইছিল, কিন্তু আমার সাহস হয়নি, আপনার এ নির্জ্জন ধ্যান ভঙ্গ করতে। আমি যে অধিকারটুকু পেয়েচি—কি জানি, তার গণ্ডী বাড়াতে গেলে যদি আপনি বিরক্ত হন!

—বিরক্ত! হাসিয়া দীপ্তি কহিল,—এ তো আনন্দের কথা! যে-পাঠক লেখার পক্ষপাতী, সে পাঠক যে লেখকের বরেণ্য অতিথি, অন্তরঙ্গ বন্ধু! তাঁর আসায় কোনো লেখক বিরক্ত হতে পারে কখনো!···

বিমল কহিল,—দেখুন তো ক্ষিতীশের অতি-সতর্কতা ···তার ভয় হচ্ছিল, যদি আপনাকে আমার কাগজে টেনে নিতে পারি, তা হলে ওর বইয়ের ব্যবসা হয়তো মাটী হয়ে যেতে পারে!

দীপ্তি এ কথার অর্থ ভালো বুঝিতে না পারিয়া বিমলের পানে চাহিল।

বিমল কহিল,—নতুন আন্‌কোরা বইয়ের কাট্‌তি বেশী কি না, মাসিকে কোনো উপন্যাস পড়ে আবার সে বই ছেপে বেরুলে তা কিনে পড়বে, বাংলা দেশে এমন পাঠকের সংখ্যা খুব কম···

এই নূতন অতিথির সরল-স্বচ্ছন্দ কথা-বার্ত্তার ভঙ্গী নিমেষে দীপ্তির হৃদয় স্পর্শ করিল। বাজে লৌকিকতার বা অর্থহীন শিষ্টাচারের কোন ধার এ ধারে না! মনে যখন যে কথা আসিয়া দাঁড়ায়, অকুতোভয়ে এবং কেমন অবলীলায় তখনি সে তা প্রকাশ করিয়া ফেলে! চমৎকার! দীপ্তি নিমেষে বিমলকে আপনার হৃদয়-কক্ষে আসন ছাড়িয়া দিল।

এর পর হইতে ক্ষিতীশের সহিত বিমলও দীপ্তির গৃহে অতিথি হইয়া উঠিল। কয়জনে মিলিয়া সাহিত্যের কমল-বনে অবলীলায় বিচরণ করিয়া বেড়ায়, বিচিত্র মানস-কুসুম তুলিয়া কত রকমেরই যে সব মালা গাঁথে, আর নিজেরা সে মালার বৈচিত্র্য উপভোগ করিয়া মুগ্ধ হয়! ···এমনি করিয়া এই তিনটি প্রাণীর মধ্যে মিলনের ডোর ক্রমেই বেশ ঘন ও নিবিড় হইয়া উঠিতে লাগিল!

সান্ত্বনার সঙ্গেও তাদের আলাপ জমিল খুব। ক্ষিতীশের কাছ হইতে বিস্কুট, লজেঞ্জেস আর চকোলেট—এ তো নিত্য উপহার মিলিত! দম-দেওয়া মোটর গাড়ী, বেবি-পুতুল, সেলুলয়েডের খোকা পুতুল, এ-সব বিমল তাকে আনিয়া দিল। দীপ্তি আপত্তি তুলিল,—কেন এ সব খরচ করচেন!

দুই বন্ধুতে জবাব দিল,—সে ওর সঙ্গে বোঝাপড়া হবে। আপনি ওদিকে চেয়ে দেখবেন না!

এই সঙ্গে বিমলের মাসিক-পত্রের আলোচনা চলিত সবেগে। দীপ্তির উপর বিমলের অগাধ নির্ভর!

দীপ্তি বলিল—কিন্তু আমি তো কুঁড়ের হদ্দ! এক বছরে কোনমতে একখানি উপন্যাস লিখে শেষ করি।

বিমল বলিল,—প্রবন্ধও দু-একটা ফী মাসে আপনাকে জোগান দিতে হবে। আমাদের দেশের এখনকার নারী-সমাজের আলোচনা—তার সর্ব্বাঙ্গীন আলোচনা!

দীপ্তি কহিল,—ভারী তো আমার বিদ্যে! আমি লিখবো প্রবন্ধ!

বিমল বলিল,—এতে তো এম-এ পাশ্ করার দরকার নেই! এ সম্বন্ধে আপনার যা মত, যা আপনি দেখেছেন, দেখে যেটা দোষ বলে বুঝেচেন, তা কি করে সাফ হয়··· সে সম্বন্ধে আপনার যা প্ল্যান—এই সব আর কি লিখবেন। এ লিখতে সোপেনহাউয়ারের লেখা ঘাঁটতে হবে না, মিল-স্পেন্সারের নাম করবারও দরকার নেই! সাফ মনের কথা! পাণ্ডিত্য জাহির করার দুশ্চেষ্টা তো চাইছি না! আজকাল বহু লেখিকার এই বিদ্যাবত্তার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেচি! খালি কোটেশন আর জ্যাঠামি!

দীপ্তি কহিল,—ও সব লেখার চেষ্টা তো কখনো করি নি! তবে হাঁ, এ সম্বন্ধে অনেক কথা ভাবি বটে!

বিমল কহিল,—আমি তাই চাইছি, সেই ভাবনা-টুকুই লেখার অক্ষরে গেঁথে দেবেন!

দীপ্তি কহিল,—তা যেন লিখলুম! কিন্তু আমার একখানি উপন্যাস আর ঐ রকম একটি প্রবন্ধ, এতেই তো কাগজ চলবে না। বাকী লেখার কি হবে? এত বড় কাগজ ভরাবেন কি দিয়ে?

বিমল বলিল,—অত বড় মানে, ঢাউস কাগজ তো আমি বার করচি না! ···গন্ধমাদন বওয়া আমার কাজ নয়। আমি চাই, কাগজ খুব বড় হবে না, অল্প লেখা তাতে যা থাকবে, তা প্রাণবন্ত হবে, প্রাণের কথায় প্রতি পৃষ্ঠা ভরপুর থাকবে।

দীপ্তি কহিল—আর ছবি? ছবি না দিলে তো কাগজ চলবে না!

বিমল কহিল,—ছবি মৌলিক না হলে দেবো না। বিলিতী কাগজের ছবি কেটে তার ব্লক এঁটে চুরি-বিদ্যার প্রশ্রয় দিতে চাই না আমি! আজকাল মাসিক কাগজে ছবি যা বেরুচ্ছে—দেখচি, এ শুধু পরস্পরের মধ্যে একটা ভীষণ কামড়া-কামড়ি চলেছে, চুরির কারবারে কে বেশী দড়, এইটেই প্রমাণ করতে!···যে যত বেশী ছবি চুরি করতে পারে, সেই তত বাহাদুর! কোনো বিদেশী লোক যদি আজ আমাদের দেশের একটা ঢাউস মাসিক-পত্র খুলে দেখে তো ঘৃণায় তার প্রাণ ভরে উঠবে—এতে বাংলার প্রাণ কৈ? উপন্যাসে কবিতায় সেই লেসের ঝালর, নেট, পর্দ্দা, আর চা-কাটলেট্, ছুরি-কাঁটার ঝন্‌ঝনি! ছবিতেও সাহেব-মেমের মুখ-চোখ, হাত-পা তাতে বাংলার প্রাণের সাড়া কোথাও নেই।

দীপ্তি কহিল,—কথাটা যা বলচেন, তাই দেখচি একরকম হচ্ছে বটে!

বিমল কহিল,—আমি চাই, বাংলার কাগজ বার করতে! যাতে বাংলার প্রাণের পরিচয় আগাগোড়া পাওয়া যাবে, বাংলার প্রাণের সুর বইবে যার পাতায় পাতায়! খাঁটি সাহিত্য-রস আমি বিলুতে চাই! আর এ বিশ্বাস আমার খুব আছে, তাতে আপনার সাহায্য পেলে এ কাজ আমি সুসম্পন্ন করতে পারবো!···আপনি যদি ভরসা দেন, তবেই কাজে নামি,—না হলে এ আকাশ-কুসুম চয়নের কল্পনা ছেড়ে দি···

দীপ্তি কহিল,—বেশ, আমি ভেবে দেখি! এ তো কার্ত্তিক মাস চলছে···আপনি কাগজ বার করবেন কবে থেকে?

বিমল কহিল,—পৌষ মাস থেকে আরম্ভ করবো। কাগজের নাম দিচ্ছি নব্যবঙ্গ। কি বলেন?

দীপ্তি কহিল,—মন্দ কি! এতে খালি নব্যবঙ্গের চিন্তার ছাপ থাকবে!

বিমল কহিল,—হ্যাঁ। প্রাচীন প্রত্নতত্ত্ব মোটেই স্থান পাবে না।

দীপ্তি কহিল,—তারও কিন্তু দাম আছে সাহিত্যের দিক থেকে···

বিমল কহিল,—মাটী খোঁড়া বা ঢিপি বওয়ার জন্য দেশে এত কাগজ তো রয়েচে···আর একটা কুলির সংখ্যা নাই বাড়ালুম!

হাসিয়া দীপ্তি কহিল,—বেশ!···তা আমার দ্বারা কতটা সাহায্য হতে পারবে, ভেবে দেখে আমি বলবো!

## ১৫

আষাঢ়ের মাঝামাঝি দীপ্তির নূতন উপন্যাস "মন্দাক্রান্তা" বাহির হইল। এ উপন্যাস বাহির হইতে দুটা দলে দুই রকম বিভিন্ন সমালোচনা বাহির হইল। একদল রচনায় চরিত্র-সৃষ্টিতে লেখিকার অদ্ভুত তেজ আর অসীম নির্ভীকতা দেখিয়া তাঁর শিরে অজস্র পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ করিল; অপর দল এমন কুৎসিত কলরব তুলিয়া সমাজকে সতর্ক হইতে বলিল যে, তাদের সেই ইতর লেখা পড়িলে সর্ব্বাঙ্গ রী-রী করিয়া ওঠে! একখানা লক্ষীছাড়া সাপ্তাহিক কাগজ সর্ব্ব-শাস্ত্রে আশ্চর্য্য নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়া সকল বিষয়ে এমন মুরুব্বিয়ানা প্রকাশ করিত যে, সে কাগজখানা ভদ্র শিক্ষিত দলের ঘৃণা যে পরিমাণে বহন করিতেছিল, অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের কৌতুককেও ঠিক সেই পরিমাণে জাগাইয়া তুলিত। সাহিত্য এবং সমাজ সম্বন্ধে এই কাগজখানার আশ্চর্য্য অভিমত শুনিলে গায়ে কাঁটা দেয়—এবং এই অভিমত প্রচণ্ড বিজ্ঞের মত মুরুব্বির ভঙ্গীতে কাগজের পৃষ্ঠায় নির্লজ্জ নিঃসঙ্কোচে ছাপিয়া এ কাগজখানা অতি অল্পকালের মধ্যে ইতরতা ও বর্ব্বরতায় আপনার আসন কায়েমি করিয়া ফেলিয়াছে। দুই-একখানা ভদ্র কাগজ ইহার এই নির্বুদ্ধিতার প্রতি সামান্য একটু ইঙ্গিত করিবামাত্র এ এমন গালি দিয়া বসিল যে, সে গালি কোন ভদ্রলোক মুখে উচ্চারণ করা দূরে থাক, মনের কোণেও আনিতে পারেন না! এই সাপ্তাহিকখানার নাম ছিল 'ধুরন্ধর'। ধুরন্ধরে 'মন্দাক্রান্তার' এক অপূর্ব্ব সমালোচনা বাহির হইল। বহির সমালোচনা ঠিক নয়,—বহির লেখিকার পরিচয় সংগ্রহ করিয়া তাঁকে অসহ্য বর্ব্বরভাবে কুশ্রী গালি দিয়া লেখিকার বহিকে ও লেখিকাকে বাংলা দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিবার প্রস্তাব তুলিয়া সে মনের ঝাল মিটাইল! এই লেখিকার বহি আইনের সাহায্যে বন্ধ করিয়া দেওয়া দরকার, এ কথাও মূর্খ সম্পাদক আইন না জানিয়া বেশ অকুতোভয়ে লিখিয়া দিল! অরুণের সহিত দীপ্তির সম্পর্কটুকু খুঁজিয়া বাহির করিয়া তার প্রতি এমন অভদ্র কটাক্ষ করিল যে, শনিবারের অফিস-ফেরত কেরাণীর দল দুর্নিবার লোভে এক-একখানা কাগজ কিনিয়া রবিবারটা এই দীপ্তির আলোচনাতেই কাটাইয়া পরমানন্দ উপভোগ করিল! মানুষের আদিম বর্ব্বতার নির্লজ্জ পরিচয়, কুৎসার প্রতি এই যে অনুরাগ, মনুষ্যত্বকে কতখানি লাঞ্ছিত পতিত করিয়া তোলে, এ-সব কাগজের পাঠকের সে জ্ঞান মোটেই নাই—তাই তারা নির্লজ্জ কৌতুকে এ ভাবে মত্ত হইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বা সঙ্কোচ বোধ করিল না!

ধুরন্ধর-সম্পাদকের সংবাদ-সংগ্রহের শক্তিও অসাধারণ! দীপ্তির পূর্ব্ব পরিচয় সে যেমন আশ্চর্য্য তৎপরতায় সংগ্রহ করিয়াছিল, তার এখনকার ঠিকানাও সে তেমনি চট্‌পট্ খুঁজিয়া বাহির করিল এবং বাহির করিয়া মন্দাক্রান্তার সমালোচনা যে-কাগজে ছাপা হইল, তার একখানা দীপ্তির কাছে পাঠাইয়া দিতে সে ভুল করিল না! আরো ক'খানা কাগজের মত 'ধুরন্ধরও' যথাসময়ে দীপ্তির হাতে আসিয়া পৌছিল, এবং দীপ্তি সে সমালোচনা পড়িল। পড়িয়া তার মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করিতে লাগিল! এমন ময়লা সমাজের বুকে এ ভাবে জড়ো করা আছে,—এই বর্ব্বরতা, এই ইতরতা!··লেখার কথা, রচনার সমালোচনা তাহাতে এতটুকু নাই, আছে তাকে-না-বুঝিয়া ব্যক্তিগত গালাগালি! দীপ্তির পায়ের তলায় পৃথিবীখানা যেন ভূমিকম্পের বেগে দুলিয়া উঠিল! কিন্তু উপায় কি? ইতরের মুখ বন্ধ করিবার শক্তি কাহারো নাই।

সে যখন সমালোচনা পড়িয়া বিমূঢ়ের মত বসিয়া আছে, সহসা তখন ঝড়ের মত ক্ষিতীশ আসিয়া হাজির হইল।

আসিয়াই ক্ষিতীশ বলিল,—এ কি! এ কাগজখানাও আপনার হাতে এসে পৌঁচেছে!···কি করে এলো?

দীপ্তি বেদনাবিদ্ধ স্বরে কহিল,—ডাকে এসেচে।··· এরাই বোধ হয় পাঠিয়েচে।

ক্ষিতীশ রাগে জ্বলিয়া উঠিল, তীব্র স্বরে কহিল,—তাই দেখচি! এত বড় শয়তান···শয়তানীর কিছু সাজাও আমি দিয়ে আসচি, এইমাত্র···

দীপ্তি ম্লান দৃষ্টিতে ক্ষিতীশের পানে চাহিল, কহিল,—তার মানে?

ক্ষিতীশ কহিল,—কাল রাত্রে এই ইতর লেখাটা আমার হাতে পড়ে! তখন অনেক রাত হয়ে গেছলো··· সারারাত বিছানায় পড়ে রাগে শুধু জ্বলেছি! তার পর সকালে উঠে মাথায় মস্ত আইডিয়া এলো—কি করে তার এ দুর্বৃত্ততার সাজা দেওয়া যায়! ভাবলুম, পুলিশ কোর্টে একটা কেশ করে দি,···তার পর ভাবলুম, তাতে ওকে আরো বড় করে দেওয়া হবে—ওর স্পর্দ্ধা আর গর্ব্ব তাতে

বাড়তে পারে! তার চেয়ে অন্য সাজা—ছুঁচোর ছুঁচোমির সাজা দেওয়া চাই। এই ভেবে চাবুক নিয়ে ওদের অফিসে গিয়ে হাজির হলুম। সম্পাদকের খোঁজ করলুম! একটা লোক—রোগা বেঁটে কালো হতভাগা মর্কটের মত চেহারা—রোয়াকে বসে বিড়ি টানছিল! ছুঁচোর মত ছোট দুই চোখ তুলে আমায় জিজ্ঞাসা করলে, কাকে চান? আমি বললুম, ধুরন্ধর-সম্পাদক-মশায়কে! বললে,—আমিই সম্পাদক। আমি ধুরন্ধরখানা খুলে বললুম, এ গালাগাল কে লিখেচে? তাতে মুচকে হেসে সে বললে, আমি লিখেচি!...যেই শোনা, অমনি আর কোন কথা না তুলে শপাশপ তাকে চাবুক কষিয়ে দিয়েচি! তার পর আমার শোফারকে দিয়ে কাণ ধরিয়ে তাকে দৌড় করিয়েচি! আরো পাঁচজন লোক এসে পুলিশ ডাকাডাকি করতে লাগলো...তাতে আমি ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে তাকে ধরে পথের মাঝে নাকে-খৎ খাইয়ে নিয়ে তবে ছেড়েচি। সে নাকে খৎ দিয়ে বলেচে, আসচে হপ্তায় মাপ চেয়ে সে এর প্রায়শ্চিত্ত করবে। না হলে আমি বলে এসেচি, তাকে কলকাতা-ছাড়া করতে আমি কাতর হবো না—এর জন্য যত টাকা খরচ হয়, খরচ করবো বলেচি!

উত্তেজনায় ক্ষিতীশ থর-থর কবিয়া কাঁপিতেছিল! দীপ্তি অবাক হইয়া তার কথা শুনিতেছিল। কথা শেষ হইলে সে কহিল,—এ কি করেচেন আপনি?

ক্ষিতীশ কহিল,—ঠিক কাজ করেচি। কি আনন্দই যে আমার হচ্ছে · দুর্জ্জনকে সাজা দিয়ে এত আনন্দও হয়।

দীপ্তি কহিল,—এখন সে যদি নালিশ-মকর্দ্দমা করে?

ক্ষিতীশ কহিল,—করুক! আদালতে গিয়ে হাকিমের সামনে বলে আসবো, দুর্ব্বৃত্ততার সাজা দিয়েচি, তাতে জরিমানা হয়, সেই দণ্ডে জরিমানা দেবো...মহিলার অপমান করে পার পাবে আমার হাতে, এত বড় শয়তান আজো জন্মায়-নি!

দীপ্তি অবাক হইয়া গেল, এই তরুণের শ্রদ্ধার ভঙ্গী আর সাহস দেখিয়া! সে বলিল—ছি, ভালো কাজ করেন-নি! এতে কি বয়ে গেছে!...গালাগাল,—দু'দণ্ড চীৎকার করে কারো কৌতুক জোগাবে, মানি। কিন্তু তার পর হাউইয়ের আগুনের মতই ছাই হয়ে কোথায় কালো মাটীর বুকে মিশিয়ে যাবে! আমি তো ও-সব গ্রাহ্যও করি না!...

ক্ষিতীশ কহিল,—সমালোচনার নামে মাঝে মাঝে এই যে সব ইতর গালাগাল কাগজে বেরোয়, তার জবাব কলমে না দিয়ে এই চাবুকে দিতে হয়। অভদ্রতা তাতে শায়েস্তা হয়, সাহিত্য-কুঞ্জের জঞ্জালও কতক সাফ হবার সুযোগ পায়।...মাথায় যাদের তিলমাত্র বোধ-শক্তি নেই, ভদ্রতার বিন্দু যারা জানে না, কলমের লেখায় তাদের বুদ্ধি দেওয়া যায় না—চাবুকেই তাদের মেধা পরিষ্কার হয়।

এমনি নানা আলোচনার পর ক্ষিতীশ বলিল,—আমায় একবার এর মধ্যে এলাহাবাদ যেতে হচ্ছে। ওখানে এক বন্ধুর বিয়ে—না গেলে নয়! বোধ হয় হপ্তা-খানেক থাকবো। কাল যাবো বলে ভাবচি।... 'মন্দাক্রান্তা' বেশ বিক্রী হচ্ছে—এর রয়ালটীর দরুণ কিছু টাকা আজ এনেচি। রাখুন। আমি গেলে যদি এর মধ্যে আপনার টাকার দরকার হয়...

দীপ্তি কহিল,—টাকা তো অনেক নিচ্ছি! বই বিক্রীর চেয়েও ঢের বেশী...

ক্ষিতীশ কহিল,—যাঁদের নিয়ে আমার ব্যবসা, তাঁদের কোনরকম অসুবিধা না হয়, সেদিকে নজর রাখা চাই তো! লেখক-লেখিকা যদি অসুবিধা ভোগ করেন, তা হলে আমার ব্যবসার ক্ষতি হবে যে তাতে। এই জন্য আমি লেখক-লেখিকাদের খুশী রাখতে চাই সর্ব্বক্ষণ। পাটের কারবারে দাদন দেয় না? এও আমাদের তাই আর কি! বলিয়া ক্ষিতীশ হাসিয়া উঠিল!

দীপ্তি কহিল,—আপনার মত প্রকাশক যদি আরো দু'চারজন থাকতেন, তা হলে লেখক-লেখিকার দুঃখও ঘুচতো—আর তাঁদের হাত থেকে সত্যই সতেজ সবল সাহিত্য বার হতো!.. দারিদ্র্যে জর্জ্জর কাতর বিষণ্ণ মনের রচনায় সাহিত্য নিপীড়িত হয়!...লেখক-লেখিকার মন স্বচ্ছন্দ না থাকলে অব্যাহত ভঙ্গীতে তাঁরা সৃষ্টি করবেন কি করে!...

ক্ষিতীশ কহিল,—লেখক-লেখিকার ঘরের খপর প্রকাশক রাখতেও পারে না তো! তবে হ্যাঁ, নিজের তবিলের দিকে নজর রাখার সঙ্গে সঙ্গে লেখক-লেখিকার তবিলের দিকেও নজর দেওয়া চাই তো!—তা ছাড়া আরো একটা কথা আছে, আগে টাকা নিয়ে অনেক লেখক লেখা-সম্বন্ধে যেমন উদাসীন থাকেন, তেমনি অনেকে আবার বিশ্বাসঘাতকতা করে লেখাটুকু অন্য প্রকাশকের হাতে চুপি চুপি তুলে দিয়ে সেখান থেকে নগদ আরো-কিছু লাভ করেন! পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাসের সম্পর্ক দাঁড়ালে কারো দিক থেকে কোন অনুযোগ যেমন উঠতে পারে না, তেমনি পরস্পরের বিশ্বাসে-সহযোগিতায় পরস্পরের লোকসানও হয় না কোনোদিকে।...সবার আগে এই বিশ্বাস আর সহযোগিতা চাই! লেখকের উপর প্রকাশকের যদি বিশ্বাস থাকে, তা হলে বই কবে পাবো, সে তারিখ না খতিয়েও লেখককে প্রকাশক আগাম টাকা দিতে পারেন এবং এ-রকম অনেক প্রকাশক অনেক লেখককে টাকা দিয়েও থাকেন।

দীপ্তি কহিল,—দেখুন, সময়-সময় আমি ভাবি, আমাদের দেশের লেখকদের দারিদ্র্যই তাঁদের মনকে

কুণ্ঠিত সঙ্কুচিত রাখে। সাহিত্য-সেবায় যদি তেমন টাকা মিলতো, তা হলে বাংলা সাহিত্য আরো সরস, আরো প্রাণবন্ত হতে পারতো। বিলেতে লেখকরা যে এত বেশী পয়সা পান্,তার একটা কারণ—স্বীকার করি,তাঁদের পাঠক সমস্ত বিশ্ব জুড়ে রয়েচে—আর এখানে লেখক খুব সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই তাঁর পাঠক সংগ্রহ করেন। বিলেতের পাঠকের তুলনায় এ যেন সিন্ধুর কাছে বিন্দু! তবে লেখকের সাংসারিক অবস্থা ফিরলে তাঁরা নির্ব্বিবাদে সাহিত্য সাধনা করতে পারেন। এদেশে সাহিত্য-সেবায় লেখকের পেট চলে না বলে বেশীর ভাগ সময় তাঁকে অফিসে কলম পিষে, ওকালতি করে, নয় হাকিমি করে কাটাতে হয়—তারি ফাঁকে যেটুকু অবসর মেলে, তাতেই সাহিত্য-সাধনা করে যা তৃপ্তি তিনি সংগ্রহ করেন! এতে সাহিত্য ক্ষুণ্ণ হয় কতখানি, ভাবুন তো। কল্পনা ঐ কাজ-কর্ম্মের ভিড়ে চাপা থাকে সর্ব্বক্ষণ—সে ভিড় একটু সরলে খুব কুণ্ঠিত পায়ে সে বেরিয়ে আসে! তবে সে কতটুকু বিচরণ করে—কাজেই সৃষ্টি যা হয়, তা কুণ্ঠিত, সঙ্কুচিত, —অর্থাৎ অত্যন্ত দীন মূর্ত্তিতে সকলের সামনে এসে সে দাঁড়ায়।·· সংসারের ভাবনা ভাবা, আর সাহিত্য-সৃষ্টি করা, দুটো একেবারে বিভিন্ন ব্যাপার—এ-দুয়ে বিরোধ চিরকাল!

ক্ষিতীশ কহিল,—দেখুন, আপনাকে একটা সত্য কথা তা হলে বলি। আমি যে প্রকাশক হলুম—এর একটা কারণ, লেখকদের সাংসারিক অবস্থা একটুও যদি ভালো করতে পারি—তাঁদের মনকে যদি সংসারের দায়-দুর্ভাবনার হাত থেকে একটুও মুক্ত রাখতে তারি, এই জন্য। সেই-জন্যই কোনো লেখক টাকা চাইলে আমি কখনো তা দিতে ওজর-আপত্তি তুলি না। প্রকাশক ছাড়া লেখকের বন্ধুই বা আর কে আছে!

দীপ্তি কহিল,—আপনার বন্ধুর মাসিকপত্রের খপর কি?

ক্ষিতীশ কহিল,—সে শুধু কল্পনা নিয়ে আছে। মনের মত আয়োজন না হলে বার করবে না। তার পর দেখুন, শুধু গ্রাহকের চাঁদায় মাসিক-পত্র চলে না, চলতে পারে না। যদি প্রচুর বিজ্ঞাপন জোগাড় করতে পারে, তা হলেই কাগজ চলে। বিজ্ঞাপন জোগাড় করতে হলে ভালো ক্যান্‌ভাসার চাই। তেমন বিশ্বাসী ক্যান্‌ভাসার পাওয়া খুবই শক্ত ব্যাপার।—বিমল এ-সম্বন্ধে কিছু বলেনি?

দীপ্তি কহিল,—না, চার-পাঁচদিন তিনি আসেন-নি এধারে!

ক্ষিতীশ কহিল,—আসেনি!···আমার সঙ্গেও তার দেখা হয়-নি। শুনলুম, সে নাকি 'মন্দাক্রান্তার' প্রকাণ্ড একটা সমালোচনা লিখে ফেলেচে।

দীপ্তি কহিল,—বিমলবাবুর মতামত একটু অদ্ভুত রকমের। সব-তাতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন!

ক্ষিতীশ হাসিয়া কহিল—ওর সবই অদ্ভুত! মাসিকপত্র নিয়ে এই তো ক্ষেপে উঠেচে—হঠাৎ একদিন যদি শুনি যে মাসিক-পত্রের ওপর খাপ্পা হয়ে সে বোতামের কারখানা খুলেচে তো তাতে আমরা আশ্চর্য্য হবো না। তার বন্ধুরা তার খামখেয়ালী জানে।

হাসিয়া দীপ্তি কহিল,—ভারী মজা তো! অথচ মাসিক-পত্র নিয়ে কি আলোচনাই যে করেন!

ক্ষিতীশ কহিল,—আলোচনা না হলে ও থাকতে পারে না! সারা জীবন ধরে একটা না একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা কর্‌চেই। যাক্—কারো আড়ালে তার সম্বন্ধে এ সব আলোচনা করা ঠিক নয়।···

## ১৬

বিমল যে কত-বড় অদ্ভুত জীব, দীপ্তি আর এক রকমে অচিরে সে পরিচয় পাইল।

সেদিন সন্ধ্যার দিকে মেঘ খুব কালো হইয়া ঘনাইয়া আসিল। পৃথিবীর বুক বেড়িয়া একটা শীতল পরশ জাগিয়া উঠিয়াছিল। আঁধারে-ঘেরা পথের উপর দিয়া পথিকের দল অধীর আগ্রহে গৃহে ফিরিতেছিল! দীপ্তি তার ঘরের জানলা খুলিয়া সামনে ঐ পথের পানে উদাস দৃষ্টি মেলিয়া বসিয়া ছিল—এমন সময় বিমলের গাড়ী আসিয়া হাজির। বিমল গাড়ী হইতে নামিয়া ভিতরে আসিল···হাতে তার মস্ত একটা কাগজের মোড়ক। বিমল আসিয়া ডাকিল—সান্থু···

সান্ত্বনা বিছানার উপর পুতুল পাড়িয়া বসিয়া খেলা করিতেছিল; বিমলের আহ্বানে ফিরিয়া চাহিল।

বিমল কহিল,—এই ছাখো, তোমার বাজনা এনেচি।

কাগজের মোড়ক খুলিয়া বিমল একটা পিয়ানোফোর বাহির করিয়া বাজাইতে লগিল। সান্ত্বনা মহাখুশী হইয়া বলিয়া উঠিল,—দিন্, দিন্ আমায়···

বিমল বাজনাটা তার হাতে দিয়া কহিল,—বাজাও খুব ···তার পর যখন গান শিখবে, তখন একটা বড় বাজনাও দেবো, প্রাইজ—কেমন?

কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে সান্ত্বনা কহিল,—আচ্ছা!

দীপ্তি কহিল.—আপনি কেন এ কৃতজ্ঞতা এত বাড়িয়ে তুলচেন, বিমল বাবু?

বিমল কহিল,—তার মানে?

দীপ্তি কহিল,—নয় তো কি! নিত্য এই উপহার—কেন মিছে এত পয়সা খরচ করেন!

বিমল কহিল,—মোটেই এত নয়!···বাজে পয়সা অনেক দিকে ঢের বেশী খরচ হচ্ছে, এবং সেগুলো একে-বারেই বাজে!···এ তো খুবই সামান্য-কিছু, এতে যদি

শিশুর মুখে হাসি ফোটানো যায় তো কতখানি মূল্য পেলুম ভাবুন তো!…সামুর বাল্য-জীবনটাও এ-সবের অভাবে নেহাৎ ফাঁকা না থেকে যায় …

দীপ্তি কহিল,—কিন্তু আমি ওকে প্রাচুর্য্যের মধ্যে মানুষ করতে চাই না মোটে!…প্রাচুর্য্য থেকেই অভাবের সৃষ্টি হয়। আর এই অভাব থেকেই মনে যা-কিছু বেদনা, অনুযোগ আর হাহাকার!

বিমল কহিল,—সে অভাবের সম্ভাবনা যার থাকবে না, তার…?

কথাটা সম্পূর্ণ না করিয়া উত্তরের প্রতীক্ষায় বিমল দীপ্তির পানে চাহিল।

দীপ্তি কহিল,—তা কেউ বলতে পারে কখনো! রাজ-রাজেন্দ্রাণীর ছেলে-মেয়ের ভবিষ্যৎও সমান অনিশ্চিত, এ তো গরীবের মেয়ে!

বিমল একটু স্তব্ধ থাকিয়া দীপ্তির পানে চাহিয়া কহিল,—আপনার এ দারিদ্র্য তো স্বেচ্ছাকৃত…

দীপ্তি একটু বিস্ময়ের স্বরে কহিল,—কেন?

বিমল একবার আকাশের পানে তাকাইল, পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—তা নয় তো কি!

দীপ্তি এ কথার অর্থ না বুঝিয়া অবাক হইয়া বিমলের পানে চাহিল …পাশের ঘরে সান্ত্বনা তখন পিয়ানোফোরে প্রচণ্ড এলোমেলো বব তুলিয়াছে!

বিমল কোন কথা কহিল না, দীপ্তিও নীরব…ঠিক এমনি সময়ে আকাশ ফাটিয়া ঝম্‌ঝম্ করিয়া শ্রাবণের ধারা নামিল। চারিদিক অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল। দীপ্তি উঠিয়া আলো জ্বালিল! তার পর বিমলের পানে চাহিল, —ক্ষিতীশের সেদিনকার কথাটা মনে পড়িল, বিমলের সবই অদ্ভুত! সত্যই তাই,…খামকা কি তুচ্ছ কথা তুলিল, তুলিয়া একেবারে চুপ!

দীপ্তি কহিল,—এত কি ভাবছেন বিমল বাবু?

বিমল যেন কোন্ মহাধ্যানে তন্ময় ছিল! দীপ্তির কথায় ধ্যান ভাঙ্গিয়া দুই নেত্র বিস্ফারিত করিয়া দীপ্তির পানে চাহিল, পরে শান্ত স্বরেই কহিল,—আপনার কথাই ভাবছিলুম…

—আমার কথা! দীপ্তি হাসিয়া উঠিল।

সে হাসিতে চমকিয়া বিমল কহিল,—হ্যাঁ, আপনারই কথা!…আপনার কথা সেদিন সব শুনলুম, এক জায়গায় আশ্চর্য্য রোমান্স কিন্তু!…শুনে বড় দুঃখ হলো, আহা, অরুণ বাবু যদি মারা না যেতেন!

দীপ্তির প্রাণের কোণে সুপ্ত বেদনা এ কথায় এক নিমেষে তার জর্জ্জর স্মৃতি মাখিয়া মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিল! বুকের মধ্যটা বাহিরের ঐ মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মতই জমাট শোকে আচ্ছন্ন হইল।

বিমল কহিল,—আপনার মতের সঙ্গে আমারো মত খুব মেলে! সত্যই তো, বিবাহ কি!…যার সঙ্গে যার মনের মিল হবে, তার সঙ্গেই মনে-প্রাণে মিশে যাবে।… তার পর যদি অতৃপ্তি ধরলো তো ব্যস, মুক্ত, স্বাধীন, দোসরা পথে চলে যাও!…এই জন্যই আমি আজ পর্য্যন্ত বিয়ের ফাঁশে ধরা দিই নি! তাতে কি অনুতাপ হয়েচে কোনদিন?…মোটে না! অথচ I have known sweet company,

বিমলের কথায় দীপ্তি শিহরিয়া উঠিল। তার সে সদ্য-জাগরিত শোকস্মৃতি এ-কথায় আহত হইয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। সে নির্ব্বাক বিস্ময়ে বিমলের পানে চাহিল।

বিমল বেশ সতেজেই কহিল,—তাই তো বলছিলুম, আপনার এ দারিদ্র্য-দুঃখ স্বেচ্ছাকৃত!…আপনি ইঙ্গিত করলে রাজার ঐশ্বর্য্য আপনার পায়ে লুণ্ঠিত হয়ে পড়ে …শুধু একটা ইঙ্গিতের ওয়াস্তা!

দীপ্তির মন জ্বলিয়া উঠিল। সরোষ কণ্ঠে সে ডাকিল, —বিমল বাবু…

বিমল কহিল,—আপনার উপন্যাসে এই ফ্রী-লভের এমন নিপুণ ইঙ্গিত আপনি দিয়েচেন যে, আমি ভাবছিলুম,…এর মধ্যে introspectionটুকু সবই জীবন্ত!…

দীপ্তি কহিল,—আমায় মাপ করবেন বিমল বাবু, আমার উপন্যাস তা হলে মোটেই আপনি বোঝেন নি…

বিমল কহিল,—না বুঝলেও আপনার পরিচয় পেয়ে আপনাকে বুঝেচি…

দীপ্তি কহিল,—তাও বোঝেন নি!

বিমল কহিল,—আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না!…তবে অনুমতি যদি করেন তো আপনার জীবনকে এই দারিদ্র্য আর দুঃখ-কষ্টের আবহাওয়া থেকে একেবারে প্রাচুর্য্য আর স্বাচ্ছন্দ্যে ঘিরে দি—প্রকাণ্ড প্রাসাদ, দাসী, চাকর, জুয়েলারি, কোনোখানে কোন অভাব থাকবে না! আর সামুও রাজকন্যার আদরে মানুষ হবে!…

এ কথার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দীপ্তির মনে কাঁটার মত বিঁধিল। তবু সে কাঁটার আঘাত গোপন করিয়া সে কহিল,—এ তো ইন্দ্রজালের সৃষ্টি হবে, দেখচি তা হলে! কিন্তু আপনি যে আমার জন্য এতখানি করবেন, এর কারণ…?

বিমল কহিল—কারণ বলচি। আর এই জন্যই গোপনে আপনার সঙ্গে আমার কতকগুলো কথা ছিল। অনেক দিন থেকেই বলবো, ভাবছিলুম, কিন্তু ক্ষিতীশের সামনে কথা পাড়া কতখানি ঠিক হবে, বুঝতে পারছিলুম না বলেই বলি নি। এখন ক্ষিতীশ বাইরে গেছে,— তাই বলতে এসেচি!

দীপ্তি কহিল,—বলুন !···আমি কিন্তু আশ্চর্য্য হচ্ছি, আমার সঙ্গে আপনার এমন কি-বা গোপন কথা থাকতে পারে !···তার পর ক্ষণেকের জন্ম স্থির দৃষ্টিতে বিমলকে লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া কহিল, আপনিও কি পাব্লিশিং হাউস খুলচেন তবে ? দুই বন্ধুতে পাছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাধে, তাই এ গোপনতা !

বিমল কহিল,—তা নয়, তবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বটে !

দীপ্তি কহিল,—তা হলে পাব্লিশিং হাউসই খুলচেন, মাসিক পত্র ছেড়ে !···আমার গর্ব্ব বোধ হচ্ছে, আমার লেখা এমন যে, তার জন্ম দু'জনের এই রেষারেষি···

গম্ভীর স্বরে বিমল কহিল,—রেষারেষিই বটে !··· তবে লেখার জন্ম নয়···কারণ, সম্প্রতি পাব্লিশিং হাউস খোলবার বাসনা আমার মোটেই নেই !

দীপ্তি কহিল,—তবে···?

বিমল কহিল,—সেই কথাই বলচি ! পয়সার জন্ম খেটে লিখে, কাজ করে, যে ভাবে আপনি শরীরটাকে ক্ষয় করচেন, এ আমার ভালো লাগচে না ! তুচ্ছ পয়সার জন্ম আপনার এই কষ্ট—এতে আমার প্রাণে ভারী বাজে·· অথচ এই পয়সাই কি-ভাবে না আমি বাজে খরচ করে উড়িয়ে দিচ্ছি···

দীপ্তি কহিল,—আপনি আমার পরিচয় পেয়েচেন, বললেন না ? তা যদি পেয়ে থাকেন, তা হলে এ কথাও জেনেচেন যে, স্ত্রীলোকের এই আর্থিক দাস্য ঘোচাবার দিকে আমার আগ্রহ কতখানি !—অথচ আপনার সঙ্গে যে বন্ধুত্ব, তার মধ্যে পয়সার কথাই বা আনচেন কেন ? পয়সা ভিক্ষা করাকে আমি হেয় মনে করি !

বিমল কহিল,—পয়সাটা ভারী নোংরা জিনিস, সন্দেহ নেই। বন্ধুত্বের মধ্যে পয়সার কথা আনতে নেই।···তবু এই পয়সা না হলেও একদণ্ড চলে না !

দীপ্তি কহিল,—কিন্তু আপনার কাছে হাত না পেতে আমার বেশ চলে যাচ্চে। আর আপনার কাছে পয়সার দুঃখের কথা কখনো বোধ হয় আমি তুলিও নি···তবে এ কথা আপনি বলচেন কেন ! নোংরা পয়সার কথা আমাদের এ বন্ধুত্বের মধ্যে নাই আনলেন !···

বিমল কোন জবাব না দিয়া মুগ্ধ নয়নে দীপ্তির পানে চাহিয়া রহিল ; এই তেজস্বিতার পায়ে আপনাকে যে সে বিকাইয়া দিয়াছে !···

দীপ্তি কহিল,—আপনি রাগ করবেন না ! আপনার কথাটা আমার কাণে এমন অকস্মাৎ এসে বাজলো যে, আমি ঠিক বুঝতে পারচি না, এ কথা কেন আপনি তুলচেন !···

একটা ঢোক গিলিয়া বিমল কহিল,—তার কারণ··· আমি আপনাকে ভালোবাসি !—আমার গৃহে এসে সে গৃহের সমস্ত ভার নিয়ে আপনি তার অধীশ্বরী হয়ে বসুন

···এইটুকু বলা হইবামাত্র বিমল লক্ষ্য করিল, দীপ্তি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়াছে ! তাই সে থমকিয়া তখনি আবার বলিল,—কেন থাকবেন না ? যতদিন আপনার ভালো লাগে···বিবাহ নয়···শেষের দিকে বিমলের স্বর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

দীপ্তি কহিল,—আপনি আমায় ভালোবাসেন··· অতএব আপনার সঙ্গে আমার যেতে হবে ! কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন বিমলবাবু, আপনার যেমন একটা মন আছে,—যে-মন আমার জন্ম অধীর, যে-মন আমায় গ্রাস করবার দুর্ব্বার লোভ আমার কাছে প্রকাশ করতে এতটুকু আপনাকে কুণ্ঠিত করচে না···তেমনি আমারো একটা মন আছে···তার দিক থেকে তো বিরূপতা উঠতে পারে···

বাধা দিয়া বিমল কহিল,—কেন তা উঠবে !··· আপনি তো সমাজের সে-সব সঙ্কীর্ণ আচার মানেন না ! মিলন-সম্বন্ধে আপনার তো কোনো কুণ্ঠা নেই···

দীপ্তি কহিল,—আমার সম্বন্ধে এত বড় ভুল ধারণা আপনি করলেন কি করে ! শুনে আমি আশ্চর্য্য হয়েচি··· এত ছোট, এমন লঘু আমার মন···ছি !

বিমল কহিল,—কিন্তু অরুণ বাবুকে তো বিবাহ করেন নি, জানি···এবং আজ তিনি বেঁচেও নেই···

দীপ্তি কহিল,—তা নেই, কিন্তু তাঁর স্মৃতিতে আজো আমার মন ভরে আছে···

বিমল কহিল,—একটা তুচ্ছ স্মৃতি ! যার কোন অস্তিত্ব নেই, যে-স্মৃতি কোনো সান্ত্বনা দেবে না—তৃপ্তি দেবে না —শুধু দুঃখই বাড়াবে ! আপনার এই তরুণ বয়স, জগতের তৃপ্তির পাত্র যখন কানায় কানায় ভরে আছে···

দীপ্তি কহিল,—আপনি যাকে তৃপ্তি বলচেন, সেটা হীন লিপ্সা—তা ছাড়া আর কিছুই নয়। তুচ্ছ পশুর লিপ্সা ! আর স্মৃতি ?···মানি, তার কোনো কায়িক অস্তিত্ব নেই। তবু যে বন্ধু আমার জন্ম প্রচণ্ড ত্যাগ মাথায় করে নেছেন, তাঁর প্রতি আমার একটা কৃতজ্ঞতাও তো আছে !

বিমল কহিল,—আমার এই প্রাণ-ভরা ভালো-বাসা—এই দান, এই ত্যাগ—আপনার সাম্নেও আমার কাছে খুব আদরে-যত্নে থাকবে !···এ-সব বৃথা হবে ?

দীপ্তি কহিল,—আপনি গোড়ায় ভুল করেছেন।··· নারীর মনটা নিছক কবি-কল্পনা নয় যে, তা নিয়ে যা-খুশী করবেন।···আর পয়সার প্রলোভনে যে-নারী মনকে বিলিয়ে দিতে পারে, জানি না, কি-নামে তাকে অভিহিত করবো।···আপনি নারীর বন্ধু বলেই পরিচয় দিতেন ! নয় ? তা হলে নারীকে নিজের খেয়ালের সামগ্রী, বাসনার পুতুল বলে ধরে নিলেন কি করে, তাই ভাবচি। নারীর সঙ্গে বন্ধুত্বের মানে এ নয়, যে, তার

শরীর-মন আয়ত্ত করবেন, তাকে ভোগের জন্য গ্রাস করবেন···

বিমল অপ্রতিভ হইল, লজ্জিত হইল !···চুপ করিয়া সে বসিয়া রহিল।···তার পর সহসা একটা কথা আগুনের শিখার মত মনের মধ্যে দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল !

তখনি দীপ্তির পানে চাহিয়া ব্যঙ্গের স্বরে সে কহিল —আপনি ক্ষিতীশকে ভালোবাসেন, আমি তা বুঝি।

দীপ্তি কহিল,—হ্যাঁ, বাসি।

বিমল কহিল,—ক্ষিতীশ তা জানে···?

দীপ্তি কহিল,—তিনি আমার বন্ধু ! বন্ধুকে মানুষ ভালোই বাসে—আর সে কথা বিজ্ঞাপন দিয়ে বন্ধুকে জানাতে হয় না কোনোদিন !

বিমল কহিল,—তা নয়। ক্ষিতীশ বলে, আপনাকে বিবাহ করবার সৌভাগ্য যদি কখনো তার হয়, তবেই সে বিবাহ করবে—না হলে জীবনে সে বিবাহ করবে না, কখনো না !

এ কথা শুনিয়া দীপ্তি নিমেষের জন্য বিমূঢ় স্তব্ধ হইয়া রহিল; তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—তিনি বলেচেন এ কথা ?

বিমল কহিল, —বলেচেন বৈ কি ! তাই না আমি আমার কথা আপনাকে বলবার অবসর খুঁজছিলুম। প্রতিদ্বন্দ্বিতা—বুঝলেন !

দীপ্তি কোন কথা কহিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বিমল কহিল,—তাহলে আমার কোন আশা নেই···?

—না !

—বেশ ! ক্ষিতীশ ভাগ্যবান···

বাধা দিয়া দীপ্তি বলিয়া উঠিল,—তিনিও যদি এমন আশা করে থাকেন, তাহলে তাঁর জন্যও আমি দুঃখিত !··· বলিয়া সে আবার নীরবে বসিয়া রহিল—বিমলও চুপ !

বাহিরে ঝম্‌ ঝম্‌ বৃষ্টি পড়িতেছে···ঘরের মধ্যে দু'জনে নীরব স্তব্ধ !···

সহসা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বিমল কহিল,—তাহলে উঠি···

—এই বৃষ্টিতে ?

—তাছাড়া উপায় ! বিমল উঠিল।

দীপ্তি কহিল,—দেখুন, নারীর সম্বন্ধে একটু ভালো ধারণা করতে শিখুন···তার বন্ধুত্বের সুযোগে তাকে হীন অপমানে লাঞ্ছিত করবেন না···নারীকে ভোগের বস্তু বলেই ভাববেন না। সহায়হীনা হলেই নারী সুলভ হয় না—এ কথা মনে রাখবেন !

বিমল ফিরিয়া দীপ্তির পানে চাহিল।

দীপ্তি কহিল,—এই বৃষ্টিতে আপনার ওঠবারো এমন প্রয়োজন দেখচি না !···লজ্জা হয়েচে ? অনুতাপ হয়েচে ?···তার কারণ নেই ! আমি তো আমাকে চিনি, আপনার কথায় এতটুকু বিচলিত হই নি ! আপনি চান যদি তো আমি আপনার বন্ধুত্বকে এখনো বরণ করে নিতে প্রস্তুত আছি। আজকের এ কথা একটা স্বপ্ন বলেই মনে করবো···

বিমল কহিল,—কিন্তু আমি যে জীবনে আমার এ দুর্ব্বলতার কথা ভুলতে পারবো না···

দীপ্তি কহিল,—তাহলে আমাদের বন্ধুত্ব এইখানেই শেষ···?

বিমল স্থির হইয়া দাঁড়াইল; পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—আমি যদি আমার দুর্ব্বলতাকে কোনো দিন ক্ষমা করতে পারি, তা হলে আপনাকে এসে তা জানাবো এবং সেদিন আবার বন্ধুত্ব ভিক্ষা করবো।··· আজ আর দাঁড়াতে পারচি না। চললুম !

## ১৭

এর পর পাঁচ-সাত দিন অবধি ক্ষিতীশেরও দেখা নাই। কবে তার এলাহাবাদ হইতে ফিরিবার কথা !

দীপ্তি ভাবিল, কেন সে আসে না ! এই মেঘলা দিনে সন্ধ্যার ক্ষণটুকু তার অভাবে দীপ্তির খুবই নির্জ্জন, নিঃসঙ্গ মনে হয় ! আকাশ যখন মেঘে ভরিয়া ওঠে, অন্ধকার যখন ঘন হইয়া চারিধার ঢাকিয়া ফেলে, দীপ্তির মন তখন সে অন্ধকারের তলায় কোথায় চাপা পড়ে— পড়িয়া হাঁপাইতে থাকে !···কেন সে আসিতেছে না ? এখনো ফেরে নাই ?···

সেদিন দুপুরবেলা দীপ্তি ক্ষিতীশের অফিসের দিকে চলিল, তার সংবাদ লইবার জন্য। প্রভা শ্বশুর-বাড়ী গিয়াছে,—কাজেই প্রভার সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নাই ! হঠাৎ ক্ষিতীশের সন্ধানে তার বাড়ীতে যাওয়াও ঠিক মনে হইল না !

অফিসে ক্ষিতীশ তখন কাজে ব্যস্ত, দীপ্তি আসিয়া কহিল,—এই যে আপনি !···বাঃ ! আর আমি ভাবচি। ···বেশ লোক তো !···কবে ফিরলেন ?

রুদ্ধ নিশ্বাসে ক্ষিতীশ কহিল,—দিন পাঁচেক হলো, ফিরেচি···

দীপ্তি কহিল—আমার ওখানে যান্‌নি যে ?

ক্ষিতীশ কহিল,—ক'দিন এখানে ছিলুম না, কাজেরও অগোছ হয়ে রয়েচে,—তাই যেতে পারছিলুম না...

দীপ্তি কহিল,—আজ একবার সময় করে যাবেন ? কতকগুলো কথা আছে···

ক্ষিতীশ কহিল,—যাবো।···আপনার বই কতদূর ?

দীপ্তি কহিল,—শেষ হয়েচে।···একবার পড়ে দেখবেন···

ক্ষিতীশ কহিল,—দেখবো বৈ কি।···এবার আপনার

বইখানির বাইণ্ডিং যা করবো, একেবারে নতুন রকমের। বিলিতী বইয়ের মত। তেমন বাঁধানো কোনো বাংলা বই এ-পর্য্যন্ত বেরোয় নি।

দীপ্তি কহিল,—সে আপনার যা-পছন্দ হয়, করবেন! কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করছিলুম···

ক্ষিতীশ মুখ তুলিয়া কহিল,—কি?

দীপ্তি কহিল,—বই বিক্রী হচ্ছে কেমন?

ক্ষিতীশ কহিল,—মন্দ নয়!···আপনার উপেক্ষিতার বিক্রী সব-চেয়ে বেশী···

দীপ্তি চলিয়া গেল। তার পর সন্ধ্যার সময় ক্ষিতীশ দীপ্তির গৃহে আসিল। দীপ্তি তখন সান্ত্বনাকে কোলের কাছে লইয়া রূপকথার গল্প বলিতেছে। সদ্য-বৃষ্টি-ধোওয়া গাছপালার উপর মেঘ-ভাঙ্গা আকাশের মধ্য হইতে চাঁদের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না আসিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে।

ক্ষিতীশ আসিয়া কহিল,—কি সানু, গল্প শুনচো?

সান্ত্বনা কহিল,—হ্যাঁ। শুনুন না, রাজপুত্তুর কি-রকম চালাকি করে বেঁটে দৈত্যকে ঠকিয়ে রাক্ষসের পুরীতে ঢুকলো!···মাগো, ভয় করে না? চারদিকে রাক্ষসগুলো মুলোর মত দাঁত বের করে দাঁড়িয়ে, হাতে সব ঢাল-তলোয়ার—রাজপুত্তুরের কি সাহস!

ক্ষিতীশ কহিল,—রাজপুত্তুরদের ভয় থাকে না কিছুতেই!

সান্ত্বনা কহিল,—তা বলে রাক্ষসদের সামনে অমন করে যাওয়া—এ কেউ পারে?···আপনি পারেন?

হাসিয়া ক্ষিতীশ কহিল,—না সানু, রাক্ষসকে আমি ভারী ভয় করি!

হাসিয়া সান্ত্বনা কহিল,—শুনুন না কাণ্ড! তার পর কি,···মা?

দীপ্তি কহিল,—আজ এই অবধি থাক সানু, আজ লেখা করোগে,···আমরা একটু কাজ করি···

মুখখানি ম্লান করিয়া সান্ত্বনা বলিল,—কিন্তু বড্ড শোনবার ইচ্ছা হচ্ছে মা···

ক্ষিতীশ কহিল,—গল্পটা শেষ করুন···আমি একটু বসচি!···আমিও শুনি আপনার গল্প···

দীপ্তি কহিল,—শেষ করবো?···

ক্ষিতীশ কহিল,—শেষই করুন! মাসিকে ক্রমশঃ উপন্যাসগুলো কি রকম জ্বালায়, জানেন তো!···পরের সংখ্যার জন্য মনে এতটুকু সোয়াস্তি থাকে না!···সে দুঃখ আর সানুকে কেন দেন?

দীপ্তি কহিল,—বেশ, তবে শেষ করে দি···

দীপ্তি রাজপুত্রের কথা বলিতে লাগিল,—আর সানু বিস্ফারিত চোখে ছোট্ট প্রাণের সমস্ত আগ্রহটুকু লইয়া রাক্ষসের গল্প শুনিতে লাগিল।

গল্প শেষ হইলে মার কথায় সান্ত্বনা চলিয়া গেল,—পাশের ঘরে গিয়া সে খেলনা পাড়িয়া বসিল। সে চলিয়া গেলে দীপ্তি ক্ষিতীশের পানে চাহিল—ক্ষিতীশ তখন কি-একটা ইংরাজী বইয়ের মধ্যে সুগভীর মনঃসংযোগ করিয়াছে! দীপ্তি বহুক্ষণ তার পানে চাহিয়া রহিল—এই তরুণ যুবার স্বাস্থ্যের স্বচ্ছতা, সুস্থ মনের সহজ আনন্দ-জ্যোতির রেখা মুখে-চোখে প্রদীপ্ত উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়া রহিয়াছে! দীপ্তি একটা নিশ্বাস ফেলিল, তার পর কহিল,—আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।

ক্ষিতীশ চোখ তুলিয়া চাহিল—চাহিতে দুইজনের দৃষ্টি মিলিল। ক্ষিতীশ দেখিল, দীপ্তির দৃষ্টি যেন গাঢ় বেদনায় ভরা! তার সারা অঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। বিমলের কাছে সে কতকগুলা কথা শুনিয়াছে, তার কতকটা আসল, আর তার সঙ্গে কতখানি কল্পনা যে জুড়িয়া দিয়াছে···! সে কথা শুনিয়া ক্ষিতীশ বিরক্ত হইয়াছে! রাস্কেল! তার সম্বন্ধে কোনো কথা দীপ্তির কাছে তুলিবার অধিকার তাকে কে দিয়াছিল! তার মনের অতি-গোপন সাধ-আশার কথা·· সে নিজে এ কথা কোন দিনই একটা অস্ফুট নিশ্বাসের উচ্ছ্বাসেও প্রকাশ করিত না!

দীপ্তির কথায় ক্ষিতীশ দীপ্তির পানে চাহিল,—তার মুখে সহসা কোন কথা ফুটিল না!

দীপ্তি কহিল,—বিমল বাবু একদিন এসেছিলেন এর মধ্যে। এসে একটু বিপ্লব বাধিয়ে গেছেন···

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ক্ষিতীশ কহিল,—আমি সে কথা শুনেচি···

দীপ্তি কহিল,—শুনেচেন!···আশ্চর্য্য! স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এঁরা ভাবেন কি, বলুন তো? পুরুষের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্ত্রীলোকের থাকতেই হবে!···

ক্ষিতীশ কহিল,—ও কথা ভুলে যান! আমি তাকে সতর্ক করে দিয়েচি—আর কখনো সে আপনার দোরে আসবার স্পর্দ্ধা রাখবে না!···

দীপ্তি কহিল,—তার জন্য আমি কিছু মনে করি নি ···তবে দুঃখ লাগে এই যে, স্ত্রীলোকের মাথার উপর যদি কোনো পুরুষ না থাকে, অর্থাৎ স্ত্রীলোক যদি কারো সম্পত্তি হয়ে না থাকে, তাহলে পুরুষ তাকে এমন সুলভ ভাবে কি করে?···এর মধ্যে এই কথাটাই আমার বুকে সব-চেয়ে বেজেচে···

ক্ষিতীশ কহিল,—এটা পুরুষের আদিম বর্ব্বরতার চিহ্ন। বলে সে নারীকে প্রথম গ্রহণ করেছিল, এবং নিজের ভোগের সামগ্রী বলেই জেনে এসেচে, বরাবর ···তাই।

দীপ্তি কহিল,—নারীর যে একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকতে পারে, ঠিক পুরুষের মত—এ কথা পুরুষ একেবারে ভাবেও না! আশ্চর্য্য!

ক্ষিতীশ কোন কথা কহিল না। দীপ্তি চুপ করিয়া

বসিয়া রহিল। ক্ষিতীশের মনের মধ্যে একটা কথা প্রবলভাবে ঝাঁকিয়া উঠিতেছিল, প্রকাশের পথ খুঁজিয়া সে যেন অধীর আকুল হইল!

কোনমতে সে বলিয়া ফেলিল,—আমার সম্বন্ধেও সে নাকি অনেক অপমানের কথা বলে গেছে? তার জন্ম ক্ষমা করবেন…

দীপ্তি ক্ষিতীশের পানে চাহিল, তার পর শান্তস্বরে কহিল,—হ্যাঁ!…সে কথা…?

ক্ষিতীশ কহিল,—তার স্পর্দ্ধা আর অবিনয়ের সীমা নেই!…এ কথা তাকে কোনোদিন আমি বলি নি,—এ তার নিজের মন-গড়া। এ কথা নিয়ে আমার সঙ্গে অনেকদিন সে তর্ক করেচে…আপনার সম্বন্ধে কোন আলোচনা আমি সহ্য করি নি, তাই সে নিজে থেকে ঐ সব কথা গড়ে নিয়েচে…

দীপ্তি কহিল,—তাহলে ওটা মিথ্যাই…?

ক্ষিতীশ চট্ করিয়া কোন জবাব দিতে পারিল না। সে মাথা নামাইয়া নীরবে বসিয়া রহিল!

দীপ্তি কহিল,—আশা করি, আমাদের বন্ধুত্ব চিরদিন অম্লান থাকবে, অটুট থাকবে…

ক্ষিতীশ কহিল,—আমারো প্রাণের একান্ত কামনা তাই…! এর মাঝে কোন ঝড় যেন না বয়, কোন স্বার্থ যেন না আসে…

এ কয়দিন দীপ্তি প্রভার কাছে যায় নাই। প্রভা শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিল রংপুরে। সেখানে প্রায় মাসখানেক থাকিয়া ফিরিয়া প্রভা দীপ্তিকে চিঠি লিখিয়া পাঠাইল,—

দিদি আমি ফিরিয়াছি! আপনি কাল আসিবেন। কাল আবার গান শিখিব। ইতি

স্নেহের প্রভা

চিঠি পাইয়া দীপ্তি যথাসময়ে প্রভাকে গান শিখাইতে গেল। প্রভা কহিল,—আমার বড় মামীর কাছ থেকে রবিবাবুর দুটো নতুন গান শিখে এসেচি, দিদি…শুনুন তো!

প্রভা গাহিল,—

তার বিদায়-বেলার মালাখানি
আমার গলে রে
দোলে দোলে বুকের কাছে
পলে পলে রে।…

দীপ্তি নিথর নিস্পন্দ হইয়া গান শুনিতে লাগিল। গানের সুরে কথায় তার বুকটা একেবারে তোলপাড় করিয়া উঠিল। এ গান সেই কোদার্ম্মার ঘরে সে শেষ গাহিয়াছিল—অরুণের সামনে! গান শুনিয়া অরুণের দুই চোখ ছলছলিয়া উঠিয়াছিল! অরুণ বলিয়াছিল,—এ গান কেন গাইচো দীপ্তি? বিদায় বেলার তো অনেক দেরী আছে। মিলনের কথা যদি কিছু জানা থাকে তো তাই গাও!…তার পর…

তার বুকের মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস প্রলয়ের ঝড়ের মত ফুঁশিয়া ফুলিয়া উঠিল। প্রভা গাহিতেছিল,—

দিনের শেষে যেতে যেতে
পথের পরে
ছায়াখানি মিলিয়ে দিল
বনান্তরে!
সেই ছায়া এই আমার মনে,
সেই ছায়া ঐ কাঁপে বনে,
কাঁপে সুনীল দিগঞ্চলে রে!

কি বেদনাই যে এ গানের সুরে ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল! এই ইট-কাঠের বাড়ী, এই সজ্জিত ঘর—এ-সব দীপ্তির চোখের সামনে হইতে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল!…মনের মধ্যে নিমেষে জাগিয়া উঠিল, সেই সবুজ শ্যামল বনের অন্তরাল! সেই ধূমল মেঘের নীচে দূরে-দূরে ছায়ার মত পাহাড়ের গা! আকাশে সেই সজল মেঘের আবরণ! কে যেন বনের গণ্ডী টানিয়া সমস্ত পৃথিবীকে এতটুকু করিয়া ফেলিয়াছে!…তবু সেই ছোট গণ্ডীটুকুর মধ্যেই কোথায় ফাঁক পাইয়া তার জীবনের যা-কিছু সুখ সেখান দিয়া সরিয়া পলাইয়া গিয়াছে!…তার সে সুখ-স্বপ্নের ছায়াটুকু ঐ বনান্তরেই মিলাইয়া গেছে! যাইতে যাইতে অমনি ঐ পথের পরে! …দীপ্তির দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

গান শেষ করিয়া প্রভা কহিল,—এ গানটা আপনি জানেন?

দীপ্তি ঘাড় নাড়িয়া কহিল,—জানি।

প্রভা কহিল,—গান্ না…এ সুর শিখেচি বটে,—কিন্তু এতে ভাব যেন আরো ফোটানো যায়! এ সুর প্রাণে তেমন লাগচে না…

দীপ্তি কহিল,—খোঁচগুলো ঠিক হচ্ছে না।

প্রভা কহিল,—রবিবাবুর গানের মজাই ঐ। স্বরলিপি আছে। তবু তাঁর নিজের সুরটুকু তা থেকে ঠিক আয়ত্ত করা যায় না! সকলের মুখে রবিবাবুর গান এক-রকমও শুনি না। খুব উঁচুদরের আর্টিষ্ট আর ভাবুক না হলে রবিবাবুর গানে ঠিক প্রাণটুকু কেউ ফুটিয়ে তুলতে পারে না!…এই দেখুন না, আপনি যেমন গান,—তেমন তো আর কারো গলায় খোলে না।

দীপ্তি কহিল,—পাগল!…আচ্ছা, আমি ওগানটি গাইচি, শোনো।…স্বরলিপি থেকে intonation ঠিক করা যায় না।

দীপ্তি ঐ গানই গাহিতে বসিল!…তার সুরে কি যে ছিল,…সমস্ত আকাশ-বাতাস এক নিমেষে করুণ

সুরের প্লাবনে ভরিয়া উঠিল! সে সুরে বুক-ভাঙা এমন বেদনা, এমন হাহাকার ফুটিয়া বাহির হইল যে, বিদায়-ক্ষণের করুণ বিষাদ যেন সে সুরে দুলিতে লাগিল!…

সেদিন দীপ্তির বিদায় লইবার সময় প্রভা কহিল,—একটা কথা আছে, দিদি…

দীপ্তি উদ্‌গ্রীবভাবে চোখ তুলিয়া চাহিল, কহিল,—কি কথা প্রভা?

প্রভা কহিল,—দাদার সম্বন্ধে…

দীপ্তি চমকিয়া উঠিল। দাদার সম্বন্ধে! ক্ষিতীশ-বাবু…! কি কথা? তাঁর কোন অসুখ হইয়াছে নাকি?

প্রভা কহিল,—না।

প্রভা কহিল,—দাদার জন্য বাবা-মা কারো মনে সোয়াস্তি নেই!…

দীপ্তি নির্ব্বাক বিস্ময়ে প্রভার পানে চাহিয়া রহিল। প্রভা কহিল,—দাদার বিয়ের সব ঠিক ওঁরা করেচেন… দাদা কিন্তু এমন বেঁকে বসেচে বিয়ে করবে না বলে… সে একেবারে দুর্জ্জয় গোঁ!…

তবে কি…? একটা অতি-ক্রূর সংশয় কাঁটার মত দীপ্তির বুকে খচ্ করিয়া বিঁধিল!—দুই হাতে সবলে সে কাঁটাটাকে চাপিয়া দীপ্তি কহিল,—বিয়ের আপত্তি কেন?

প্রভা ক্ষণেক স্তব্ধ হইল, পরে কহিল,—বলবো…?

—বলো প্রভা…

দীপ্তি বেশ সতেজে তাকে এ প্রশ্ন করিল।

প্রভা কহিল,—দাদা কিছুতেই বলতে চায় না! শেষে অনেক করে আমি জেনেচি…

—কি?

দীপ্তি ব্যাকুল আগ্রহে প্রভার পানে চাহিল।

প্রভা একটু কুণ্ঠিতভাবে কহিল,—দাদা…বলিয়াই সে দীপ্তির পানে চাহিল, পরে কহিল,—আপনাকে দাদা কোনো কথা বলে নি?

—কি কথা?

—এই বিয়ে-থার কথা!

—না।

আসল কথাটা প্রভা কিছুতেই বলিতে পারিল না। বলা যায় না! শেষে বুদ্ধি করিয়া সে কহিল,—আপনি দাদাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, বিয়ের তার আপত্তি কিসের!

তাকে কেন এ কথা জিজ্ঞাসা করার ভার, দীপ্তি আভাসে তাহা বুঝিল, বুঝিয়া কহিল,—কিন্তু আমার পক্ষে এ কথা জিজ্ঞাসা করা কি ভালো দেখাবে, প্রভা? …কোন্ অধিকারে আমি এ কথা জিজ্ঞাসা করবো?

প্রভা কহিল,—আপনাকে দাদা শ্রদ্ধা করে…

দীপ্তি কহিল,—আচ্ছা, যদি তিনি আমার ওখানে যান, তা হলে জিজ্ঞাসা করবো।

দীপ্তি চুপ করিল। প্রভাও ইহার পর কি বলিবে, ভাবিয়া না পাইয়া চুপ করিয়া রহিল। বহুক্ষণ এমনি নীরব থাকিবার পর দীপ্তি উঠিল, উঠিয়া ডাকিল—প্রভা…

—কেন দিদি…?

গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া দীপ্তি বলিল,—আমি যা ভাবচি, যদি তাই হয়, তা হলে তোমরা ভুল বুঝেচো। আমার দিক থেকে কোনো-কিছু নেই, শুধু বন্ধুত্ব!…তবে উনি যদি এমন কোনো কথা ভেবে তোমাদের কষ্ট দিয়ে থাকেন, তা হলে সে খুবই দুঃখের কথা, সন্দেহ নেই!…যাই হোক, তিনি আমার বন্ধু। তোমাদেরো আমি প্রাণের স্বজন বলে ভাবি, এ রকম ভুল-চুক আমাদের মধ্যে মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।…তুমি নিশ্চিন্ত থাকো প্রভা, আমার দিক থেকে কোনো দুঃখ তোমাদের পেতে হবে না।

কথাটা বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষামাত্র না করিয়া দীপ্তি চলিয়া গেল।

## ১৮

দীপ্তির মনে ধিক্কার জাগিতেছিল। পুরুষের বন্ধুত্ব কি এখানে এমন দুর্লভ! অন্তরঙ্গতা করিতে গেলে কি ঐ একই ধারায় তাদের মন ছুটিয়া চলিবে? ছি! দীপ্তি ভাবিল, ক্ষিতীশকে সে একটা চিঠি লিখিবে।…

কাগজ লইয়া দীপ্তি তখনি চিঠি লিখিতে বসিল।… দুই-চারি ছত্র লিখিয়া ভাবিল, তাই তো, সহসা এমন হীন সন্দেহ কি বলিয়া সে করিতেছে! হয়তো ক্ষিতীশের বিবাহ না করার অন্য কারণ আছে!…

চিঠিখানা সে ছিঁড়িয়া ফেলিল,—ছিঁড়িয়া আকাশের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

বাগানে মিস্ত্রীদের কোলাহল উঠিয়াছিল। মিস্ত্রীর দল বড় বাড়ীটা সারাইতে আসিয়াছে! গাড়ী-গাড়ী চূণ-বালি আসিতেছে! দীপ্তি ভাবিল, ক্ষিতীশকে একবার আসিতে বলা যাক্—তার মুখে কারণটা শুনিয়াই ব্যবস্থা করা যাইবে! সে তখন ক্ষিতীশকে শুধু লিখিয়া দিল,—আপনি একবার আসিবেন, বড় দরকার। তার পর চিঠিখানা ডাকে পাঠাইল।

পরের দিন দুপুরবেলায় ক্ষিতীশ আসিয়া হাজির হইল। দীপ্তি তখন সান্ত্বনাকে পড়াইতেছে। ক্ষিতীশ কহিল,—সানুকে ইস্কুলে দিন না।

দীপ্তি কহিল,—তাই ভাবছিলুম!…ঐ যে ক্যাথরিন ইনষ্টিউট হয়েচে না…সার্কুলার রোডে? সেইখানে দেবো। ওখানে বাইবেল পড়ায় না, আর কোনো দিকে গোঁড়ামির কিছু নেই! সেলাই, গান, রান্না—এ সব-গুলোও শেখায়…আমি যদি ওর পিছনে সমস্ত সময়টুকু দিতে পারতুম, তা হলে স্কুলে দেবার কথা ভাবতুম

না! তা যখন পারি না, তখন স্কুলে দেওয়াই ঠিক।

ক্ষিতীশ কহিল,—বলেন তো, আমি নিয়ে গিয়ে ভর্ত্তি করে দিয়ে আসি!

দীপ্তি কহিল,—আপনাকে আর এই সামান্য ব্যাপারে কেন কষ্ট দি! আমি নিয়ে যাবো'খন!

ক্ষিতীশ বসিল, বসিয়া সান্ত্বনাকে কহিল,—স্কুলে যাবে তো সান্ত্ব! মন কেমন করবে না, মার জন্য?

সান্ত্বনা হাসিয়া মাথা নাড়িয়া কহিল,—না।

দীপ্তি কহিল,—তুমি যাও, তোমার ছুটী!

সান্ত্বনা বই তুলিয়া রাখিয়া বাগানে ছুটিল।

ক্ষিতীশ কহিল,—আমায় কেন ডেকে পাঠিয়েচেন? কি দরকার, বলুন তো!

দীপ্তি একটা ঢোক গিলিয়া কহিল,—হ্যাঁ, দরকার আছে। দীপ্তি হঠাৎ গম্ভীর হইয়া উঠিল।

দীপ্তির এ গম্ভীর ভাব দেখিয়া ক্ষিতীশ অবাক হইল। সে বিস্ময়ে দীপ্তির পানে চাহিল!

দীপ্তি কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়া একেবারেই কহিল,—আপনার না কি বিবাহের কথা হচ্ছে? কাল শুনে এলুম...

ক্ষিতীশ লজ্জিতভাবে মাথা নত করিল, কোন জবাব দিল না।

দীপ্তি কহিল,—আপনি নাকি বিবাহে ভীষণ আপত্তি তুলে সকলকে খুব কষ্ট দিচ্ছেন?

ক্ষিতীশ চকিতের জন্য চোখ তুলিয়া দীপ্তির পানে চাহিল, কহিল—বিয়ের আমার মত নেই!

দীপ্তি কহিল—মত নেই!...কেন?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ক্ষিতীশ কহিল,—এ বেশ আছি, নয়?...বিয়ে করলেই স্বাধীনতা যাবে। অনর্থক একটা মহা-দায়িত্বের ভারে অস্থির হয়ে উঠতে হবে।

দীপ্তি কহিল,—কিছুমাত্র না।...আর্থিক অবস্থা যার স্বচ্ছল নয়, তার পক্ষে এ কথা খাটে। আপনার নয়...

ক্ষিতীশ কোনো জবাব দিল না, মুখ নামাইয়া নীরবে বসিয়া রহিল। দীপ্তি তাকে বেশ করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া কহিল,—শুধু তাই...? না, আর কোন কারণ আছে? ...একটু থামিয়া সে আবার কহিল,—আপনার মত অবস্থাপন্ন লোক যখন বিবাহ করতে চায় না, মা-বাপের অত্যন্ত আগ্রহ-সত্ত্বেও...তখন তার মধ্যে জটিল কোন কারণ থাকে—অন্ততঃ আমার তো তাই বিশ্বাস!... আপনি কি বলেন?

ক্ষিতীশ অত্যন্ত অপ্রতিভের মত মুখ তুলিল। তার পর ধীরে ধীরে কহিল,—না, এর আবার কারণ কি!

দীপ্তি কহিল,—এ কথা সত্য...আর, আমায় এ কথা বিশ্বাস করতে বলচেন?

ক্ষিতীশ কুণ্ঠিত হইল, মিথ্যা কথা দীপ্তির কাছে!...না! এ তো ঠিক নয়! সে কহিল,—আমায় ক্ষমা করবেন। যদি অন্য কোন কারণই থাকে, তা একান্ত গোপনীয়— সে কথা নাই বা শুনলেন!

সে সংশয় দীপ্তির বুকে আবার খচ্ করিয়া উঠিল। সে কহিল,—কিন্তু লোকে বোধ হয় আমাকেই এর জন্য দায়ী করবে!

ক্ষিতীশ একেবারে যেন আকাশ হইতে পড়িল। সে গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—আপনাকে দায়ী...! পরক্ষণেই নিজের সেই স্বরের তীব্রতা অনুভব করিয়া সে যেন মরমে মরিয়া গেল। স্বর মৃদু করিয়া সে কহিল,— আপনাকে কারা দায়ী করচে, জানতে পারি?

দীপ্তি কহিল,—ঠিক মুখের কথায় কেউ দায়ী করে নি! তবে, আমার মনে হয়...বলিয়া দীপ্তি একেবারে প্রশ্ন করিল,—আমায় আপনি বন্ধু বলে স্বীকার করেচেন, বন্ধুর কাছে গোপন কথা প্রকাশ করতে, আশা করি, আপনার কোনো আপত্তি হবে না!...আমায় বলবেন কি সে গোপনীয় কারণ...?

ক্ষিতীশকে কে যেন বাঁধিয়া কশাঘাত করিল!...সে যে অতি-গোপন কথা, সে যে বুকে ইষ্টমন্ত্রের মত!...সে জানে, এ কথা কাহারো কাছে প্রকাশ করিবার নয়, প্রকাশ করা চলে না,—বিশেষ দীপ্তির কাছে।

দীপ্তি কহিল,—বলবেন না?...তাহলে আমাকেই বলতে হবে! এতে কুণ্ঠা করলে চলে না!...আশা করি, আমি আপনার মনে এমন কোনো আশা জাগিয়ে তুলি নি, যাতে আপনি...

ক্ষিতীশ এ-কথায় বেত্রাহতের মত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। তার মাথার মধ্যে রক্ত চন্ চন্ করিয়া উঠিল। সে একেবারে আর্ত্তের মত দীপ্তির পায়ের কাছে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া কহিল,—আমায় ক্ষমা করবেন। আমি আপনার বন্ধুত্বের অপমান করেচি...এ গৃহে আমার প্রবেশের অধিকার আর নেই!...

দীপ্তি কহিল,—এ কি করচেন, ক্ষিতীশ বাবু!...ছি, উঠুন...

ক্ষিতীশ উঠিয়া কহিল,—আপনি কেন এ-সব কথা তুললেন?...

দীপ্তি কহিল,—বলুন, আপনি বিবাহ করবেন?...

ক্ষিতীশ গদ্গদ কণ্ঠে কহিল—বিবাহ করতে বলচেন,... কিন্তু যাকে বিবাহ করবো, তার প্রতি কর্ত্তব্য...?

দীপ্তি কহিল,—মনে করলেই সে কর্ত্তব্য পালন করতে পারবেন! মনকে সবল সচেতন করে তুলুন! মানুষকে ভালোবাসা একটুও কঠিন নয়, ক্ষিতীশবাবু! ঘৃণা করা সহজ, জানি—কিন্তু তাতে মনে সুখ পাবেন না! ভালোবাসুন, কি আমোদে যে প্রাণ বিভোর হয়ে

উঠবে!...আমি চিরদিন আপনার বন্ধুত্বের গৌরব করবো, জানবেন!...আপনার মনের আলোয় আপনার স্ত্রীও প্রচুর আলো পাবেন। একজন নারীর আত্মাকে আলোয় ভর-পুর করে তুলে তার জীবনকে সার্থক করা...এ যে মস্ত কাজ!...

ক্ষিতীশের দুই চোখে জল আসিল। সে কহিল,—আপনি আমায় ক্ষমা করবেন। দুরাশার গহনে আমার যে-মন অধীর হয়ে ছুটেছিল, তা থেকে তাকে ফিরে আন্‌বার শক্তি দিন...

দীপ্তি কহিল,—আমি তো বলেছি, আমি আপনার বন্ধু!...এখন বলুন, বিবাহ করবেন আপনি?

ক্ষিতীশ কহিল,—করবো! কিন্তু তাকে তৈরী করবার ভার আপনার।...

—তাই হবে।...দীপ্তি শান্তির নিশ্বাস ফেলিল।

ক্ষিতীশ কহিল,—এ ঘটনা আমাদের বন্ধুত্বকে কোনদিন আঘাত করবে না? একটুও না...?

—না। দীপ্তির স্বর অশ্রুর বাষ্পে গাঢ়।

তিন দিন পরে দীপ্তি যখন প্রভাকে গান শিখাইতে গিয়া শুনিল, ক্ষিতীশ বিবাহ করিতে রাজী হইয়াছে, তখন মুহূর্ত্তে তার চেতনা যেন লুপ্ত হইল! সে নারী—ক্ষিতীশের ভালোবাসা নিজের মনে সে অনুভব করিয়াছিল। তাই কথাটা প্রথম উঠিবামাত্র সে কেমন চমকিয়া উঠিয়াছিল! অরুণ...? একটা স্মৃতি! তবু তার ভালোবাসার চেয়ে ত্যাগটাই মনে বেশী ফুটিয়া আছে! প্রথম যৌবনের মোহ সে! তবু সেই ত্যাগের স্মৃতির পায়েই দীপ্তি আপনাকে বিকাইয়া বসিয়া আছে। তার প্রেম, সে যেন সেই ব্রত, সেই কর্ত্তব্যকে নির্ভর করিয়াই উদয় হইয়াছিল। আর এ...? প্রাণের প্রতি প্রাণের এক অসহ্য আকর্ষণ! তবু...না, এ আকর্ষণকে চাপিয়া দিতে হইবে। দেওয়া চাই। তাই দীপ্তি জোর করিয়া ক্ষিতীশকে বিবাহে রাজী করাইয়াছে!

সে ভাবিল, ক্ষিতীশের বন্ধুত্বটুকু পাইলেই তার ঢের পাওয়া হইল। ক্ষিতীশের জীবনকে নিজের সঙ্গে কষিয়া বাঁধিতে গেলে সে যে দারুণ স্বার্থপরের কাজ হইবে! তার পর সান্ত্বনা...! না, চারিদিকে একটা বিশ্রী জট্ পাকাইয়া উঠিবে!...এই বেশ, কোনোদিকে কোনো বিরোধ নাই! ...এ বয়সে বিরোধ আর ভালোও লাগে না।...মনকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া লাভ নাই। তাছাড়া সান্ত্বনা...। তার কথাই এখন আগে ভাবা চাই—নিজেকে তুচ্ছ করিয়া, বলি দিয়াও!...

দীপ্তি কহিল,—বেশ হয়েচে। একটি বৌ না এলে বাড়ীও সত্যি মানায় না। তা, মেয়েটি লেখাপড়া জানে তো?

—জানে। ম্যাট্রিক্ পাশ করে ইণ্টারমিডিয়েট পড়চে!...

—পড়া এবার বন্ধ করে দেবে

—মা তাই বলছিলেন। বাবা বললেন, তা কেন? বাড়ীতে পড়ে এগজামিন দেবে। দাদারও তাই মত!

—সেই ভালো। যতদিন পড়া চলে, চালাতে দেওয়া ঠিক। বন্ধ করা উচিত নয়।...

গৃহে ফিরিয়া দীপ্তি দেখে, সেখানে ভারী ধুম বাধিয়া গিয়াছে, বাগানের বড় বাড়ী ভাড়া হইয়াছে। কোথাকার কে জমিদার কামাখ্যা বাবু—তাঁর স্ত্রীর কঠিন পীড়া। তাঁকে এখানে আনা হইয়াছে চিকিৎসার জন্য। লোকজনের ভিড়ে সারা বাগানবাড়ী একেবারে গম্-গম্ করিতেছে!

দীপ্তি গৃহে ফিরিয়া ডাকিল,—সানু...

দাসী কহিল,—ঐ যে বাবুরা বড় বাড়ীতে ভাড়া এসেচে, তাঁদের দুটি মেয়ে এসে সানুকে নিয়ে গেছে, ওদের ওখানে!...

দীপ্তি চমকিয়া উঠিল। তার নির্জ্জনতার মাঝখানে আজ আবার এ কি কোলাহল জাগিল? সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বিছানার উপর গা ঢালিয়া দিল...

## ১৯

পরের দিন দীপ্তির গৃহে অতিথি। ঐ বড় বাড়ীর জমিদার ভাড়াটিয়া কামাখ্যা বাবুর দুই কন্যা আসিল। দুজনেই বয়সে তরুণী—দুজনেরই বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বড়র নাম হিরণ, ছোটর নাম কিরণ। হিরণের বিবাহ হইয়াছে কলিকাতায়; তার স্বামী এক এটর্ণির বাড়ী আটক্ল্ আছে; ছোটর স্বামী মফঃস্বলের জমিদার-পুত্র। হিরণ আসিয়া দীপ্তিকে কহিল—আপনি বই লেখেন, না? লেখিকা দেখতে কেমন, তাই দেখতে এলুম...

হাসিয়া দীপ্তি কহিল,—তার দুটো হাত, দুটো পা আছে; এবং লেখিকা ঠিক সাধারণ মানুষের মতই! দেখলেন তো?

হাসিয়া হিরণ কহিল,—দেখতে তাই বটে!

দীপ্তিও হাসিয়া জবাব দিল,—আপনারা ভেবেছিলেন, চিড়িয়াখানার কোনো জীবের মত দেখবেন,—না? দেখে নিরাশ হলেন...?

হিরণ কহিল,—সত্যি, কি করে বই লেখেন, তাই ভাবি।

দীপ্তি কহিল,—কালি-কলম আর কাগজ নিয়ে।

হিরণ কহিল,—শুধু কালি-কলম আর কাগজ নিয়েই যদি বই লেখা যেত, তা হলে বাঙালীর ঘরে লেখকের আর অভাব থাক্‌তো না!

দীপ্তি কহিল,—আমার বই তা হলে পড়েচেন! পড়ে বোধ হয় খুব গাল দেছেন?

কিরণ কহিল,—মোটে না। আমরা শুধু অবাক্ হয়ে গেছি, বাঙালীর ঘরের মেয়ে বই লেখে কি করে, এই ভেবে। সংসার দেখাশোনা করার পর…এ যে আশ্চর্য্য ব্যাপার! বাইরের কতটুকু বা আমরা জানি! ক'জন মানুষকেই বা দেখেচি!

দীপ্তি কহিল,—কিন্তু আমি তো ঘরের মধ্যেই বন্ধ থাকি না।…আমায় পুরুষ মানুষের মতই বাইরে আনাগোনা করতে হয়, বোন্।

কিরণ কহিল,—তাই।…আমি তো অনেক সময় ভাবি, আচ্ছা, একটু ভেবে কিছু লেখবার চেষ্টা করে দেখি না! কিন্তু মন ঐ বাড়ীর পাঁচিল অবধি গিয়েই থেমে যায়। বাইরে কেবল ভিড়, আর অন্ধকার! সে ভিড় ঠেলে মন বেরুতে পারে না।

দীপ্তি কহিল,—লেখার দিকে যদি আগ্রহ থাকে, তা হলে ঐ পাঁচিল-ঘেরা গণ্ডীটুকুর মধ্য থেকেই লেখার জিনিষ খুঁজে নিতে হবে!

কিরণ কহিল,—তাও বুঝি হয়?…

হিরণ কহিল,—কাল কিন্তু এসেই আপনার মেয়ের সঙ্গে ভাব করে ফেলেচি। দিব্যি ফুলের মত মেয়েটি! দাঁড়িয়ে অবাক্ হয়ে আমাদের দেখছিল। থাকতে পারলুম না। আপনার সন্ধান করলুম, কোথায় গেছলেন! তা আপনার অনুমতি না নিয়েই সানুর সঙ্গে ভাব করে ওকে আমাদের ওখানে নিয়ে গেলুম! আমার মা রুগ্ন। তিনি কত আহ্লাদ করলেন। মা আপনার সঙ্গে ভাব করতে চান্। যাবেন কি? মা বলে পাঠিয়েচেন!…

দীপ্তি কহিল,—কেন যাবো না? আপনার মার কি অসুখ?

হিরণ কহিল,—কার্ব্বাঙ্কল্। অনেক দিন ধরে ভুগচেন, একেবারে শয্যাগত! আমরা থাকি বহরমপুরে। সেখানে চিকিৎসার হদ্দ হয়ে গেছে, কোনো ফল হলো না। তাই এখানে আনা হয়েচে। এখানে চিকিৎসার ভালো ব্যবস্থা যাতে হয় সেই জন্য!…মন আমাদের ভারী উদ্বিগ্ন সর্ব্বক্ষণ। কি যে হবে!

দীপ্তি কহিল,—বেশ, আমি যাবো!…তা এখানে কে দেখচেন?

হিরণ কহিল,—আজ দু'তিনজন ডাক্তার এসে পরামর্শ করবেন—কাকে দেখানো মত হয়!…সানু কোথায়?

দীপ্তি কহিল,—স্কুলে গেছে।

কিরণ কহিল,—আপনার বাজনা রয়েচে, দেখছি। আপনি গান-বাজনা করেন?

দীপ্তি কহিল,—একটু-আধটু করি।

হিরণ কহিল,—মা গান শুনতে এমন ভালো বাসেন। তা কি করেই বা শোনেন! একটা গ্রামোফোন কেনা হয়েচে, শুয়ে শুয়ে তাই শোনেন!…আপনি গান গাইতে পারেন শুনলে মা কত যে খুশী হবেন!…আপনি কখন্ যাবেন?…

দীপ্তি কহিল,—এখন যাবো…?

হিরণ কহিল,—আপনার কোনো অসুবিধা হবে না তো?

দীপ্তি কহিল,—না, অসুবিধা আর কি! চলুন…

হিরণ-কিরণ দুই বোন মহা-উৎসাহে দীপ্তিকে তাদের মায়ের কাছে লইয়া চলিল। মা খুব খুশী হইলেন, বার-বার বলিলেন, এখানে নির্জ্জন রোগ শয্যায় তিনি যে কি কাতর হইয়া পড়িয়া আছেন!…দীপ্তি যদি মাঝে মাঝে আসিয়া দেখা-শুনা করে, তাহা হইলে এ কাতরতার মাঝে তাঁর কতক শান্তি মেলে! রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া নিজের উপর তাঁর ধিক্কার জন্মিয়া গিয়াছে। স্বামী ও আত্মীয়-বন্ধু সকলকে সর্ব্বক্ষণ এমন বদ্ধ বন্দী করিয়া রাখা, যত কাজ-কর্ম্ম স্বাচ্ছন্দ্য সব বিসর্জ্জন দিয়া দিবারাত্র তাঁর এই রোগের পরিচর্য্যা করিতেছেন—এত বড় দুর্ভাগ্য নারীর আর নাই!

দীপ্তি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়া কহিল,—আপনি তো সখ করে রোগ ভোগ করচেন না।…আপনার রোগ-যাতনা লাঘব করতে পারলে ওঁদের এ পরিশ্রম কতক সার্থক হয়!…

হিরণ কহিল,—ইনি মা, গান-বাজনা জানেন!…শুনবে গান?

মা কহিলেন,—গাইবে মা?

দীপ্তি কহিল,—আপনার এখানে বাজনা আছে?

কিরণ কহিল—একটা বক্স-হার্ম্মোনিয়ম আছে। দাদা ঐ গ্রামোফোনের গানের সঙ্গে মাঝে মাঝে বাজায়। দাদা তো গাইতে পারে না…শুধু বাজাতে জানে, তাও একটু-আধটু।

দীপ্তি কহিল,—বাজনা আনিয়ে দিন। না হয় গাই দু-একটা গান…

কিরণ-হিরণ দুজনে গিয়া বক্স-হার্ম্মোনিয়াম আনিয়া দিলে দীপ্তি গাহিতে সুরু করিল। একটি, দুইটি, তিনটি গান হইল। হিরণ ও কিরণ গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। মা বলিলেন,—গলা মা, তোমার চমৎকার! আমি এদের বলি, তোরা যদি একটু-আধটু গান শিখতিস! …তা এঁর তো ও সব দিকে মন নেই!—তবে গোবিন্দর সখ আছে। গোবিন্দ আমার বড় জামাই। তার বড় সাধ, হিরণ গান শেখে। তা ওর শ্বশুর-বাড়ীতে তা হবার উপায় নেই। শাশুড়ী-টাশুড়ী সব সেকেলে ধরণের মানুষ, বলেন, বৌ-মানুষ বাজনা নিয়ে গান গাইবে কি! তা ওঁকে বলি, হিরণকে একট শেখাও

গো, জামাইয়ের সখ! উনি বলেন, কার কাছে শিখবে? তা তুমি মা যদি একটু কষ্ট করো!

দীপ্তি কহিল,—তার আর কি! শেখাবো!···

এই গান-গল্পের মধ্য দিয়া পরিবারটির সঙ্গে দীপ্তির বেশ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া গেল।···কিরণের মা কহিলেন,—মাঝে মাঝে এসো মা। তোমার সঙ্গে দুদণ্ড কথা কয়ে রোগটা একটু তবু ভুলে থাকবো!

দীপ্তি কহিল—আসবো বৈ কি।

কিরণ কহিল—আপনি কখন্ বই লেখেন?

দীপ্তি কহিল,—ওর আর সময়-অসময় নেই। যখন সময় পাই, একটু একটু লিখি।

হিরণ কহিল,—এখন কোনো বই লিখচেন?

দীপ্তি কহিল,—হ্যাঁ! একটা তো ধরেচি!···না লিখলে চলে না, ভাই! এই সব করেই আমাকে চালাতে হয় কি না!

মা কহিলেন,—কত দিন এ দশা হয়েচে?

দীপ্তি এ কথার ইঙ্গিত বুঝিল; বুঝিয়া কহিল,—অনেকদিন হয়ে গেল।

মা কহিলেন—মা-বাপ শ্বশুর-শাশুড়ী নেই?

একটা ঢোক গিলিয়া দীপ্তি কহিল—আছেন।

মা কহিলেন—তবে এখানে একলাটি থাকো যে?

দীপ্তি কোনো উত্তর দিল না; চুপ করিয়া রহিল।

মা কহিলেন,—তাঁদের সঙ্গে বনিবনা নেই?···তার পর কিছুক্ষণ স্থিরভাবে দীপ্তিকে লক্ষ্য করিয়া তিনি আবার কহিলেন,—ছি মা, মা-বাপের উপর অভিমান করতে নেই! তাঁদের প্রাণ যে কতখানি কাতর হয়ে আছে!···তুমিও তো বোঝো মা, তুমিও মা। ছেলে-মেয়ে অভিমান করে আলাদা আছে, এ কথা ভাবতে যে মার প্রাণ শিউরে ওঠে!·· অভিমানকে এত বড় করে তুলতে নেই, বিশেষ মা-বাপের উপর! জগতে কেউ যদি আপনার থাকে তো মা-বাপ! স্বামীর ভালোবাসাতেও যদি স্বার্থ থাকে, সন্তানের উপর মা-বাপের যে স্নেহ-ভালোবাসা, তাতে একেবারে কোনো স্বার্থ নেই!···

দীপ্তি অবিচল প্রাণে এ কথা শুনিল!···এ একটা পরীক্ষা! হায়, এঁরা তো জানেন না, কত বড় মতের পায়ে সে মা-বাপ, সমাজ, সকলকে কিভাবে বলি দিয়াছে! অথচ এ কথা এখানে তুলিলে কেই বা তার সে ত্যাগের মূল্য বুঝিবে! কেহ না। মাঝে হইতে অবজ্ঞার স্রোতে তাকেই ভাসিয়া যাইতে হইবে! এ ভাসা আর ভালো লাগে না! সে তো ভাসিয়াছে অনেকদিন। আজ যদি বা তীরের কাছে স্নেহ-প্রীতি দিয়া রচা তীর-ভূমির হাওয়া একটু গায়ে আসিয়া লাগে, সে হাওয়াটুকু প্রাণে আরাম জাগাইয়া তোলে, তখন এ হাওয়া ছাড়িয়া দূরে সরিয়া যাইতেও প্রাণে বেদনা বাজে! ·· তবু···সে যা করিয়াছে, তার কোথাও অন্যায় কিছু নাই।·· হায়রে, মানুষ এটুক্ কেন যে বোঝে না!...

দীপ্তিকে নীরব দেখিয়া মা আবার কহিলেন,—বাপ-মার সঙ্গে দেখা কর মা···একরত্তি ঐ মেয়েটিকে নিয়ে এমন নির্জ্জনে থাকা—বিপদ-আপদ আছে; তো। তখন···?

সেই তখনকার কথা আগে মনে হইত না, এখন মাঝে মাঝে সে কথা কাঁটার মত মনে বেঁধে!···চারিপাশে যদি আত্মীয়-বন্ধু থাকিত, তাহা হইলে অরুণ কি অমন অসময়ে চলিয়া যাইত! কে জানে! এ সব কথা ভাবা যায় না—এ ভাবনার কূল-কিনারা নাই! এ সব কথা মনে আসিলে দীপ্তি সন্তর্পণে সেগুলাকে সরাইয়া দেয়। শেষে এ চিন্তায় নিশ্বাস বন্ধ হইবার মত হইলে সে বাড়ী ছাড়িয়া পথের বিরাট ভিড়ের মাঝে আপনাকে টানিয়া লইয়া গিয়া নিক্ষেপ করে!

মা বলিলেন,—আমার এ কথাটি রেখো মা!···সংসারে ক'দিনের জন্যই বা থাকা! কে কখন্ চলে যায়, তারো ঠিক নেই! এর মাঝে বিরোধ-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করা পাগলামি! সাধ করে দুঃখ আনা বৈ আর কিছু নয়! আমার বয়স হয়েচে অনেকখানি—বিরোধ-দ্বন্দ্বও জীবনে ঢের এসেচে। তার মাঝে এতটুকু উত্তেজিত না হয়ে মনকে তাতিয়ে না তুলে শান্ত হয়ে সামঞ্জস্য এনে সে বিরোধ-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে এসেচি আমি চিরকাল!···চারিদিককার ঝড়ও তাতে থেমেচে, সূর্য্যের অমন আলো বিরোধের মেঘে ঢাকা পড়তো, সে আলো আবার হেসে চোখ মেলে চেয়েছে!···বুড়ো মানুষের কথা একটু ভেবে দেখো মা!···তোমায় দেখে আমার কেমন মায়া পড়েচে, তাই এত কথা বললুম।···জীবনে অনেক দুঃখ আছে, অনেক বিপদ···তার মধ্যে সামান্য ছোট-খাট স্বার্থ নিয়ে কেনই বা বিরোধ তোলা! তাতে কোনো লাভ নেই!···আর কারো স্বার্থ যদি প্রবল হয়, হোক্, ·একটু সয়ে থাকো! সওয়ার বাড়া গুণ আর নেই, বিশেষ মেয়েদের!···

এ কথাগুলা তীক্ষ্ণ শরের মত দীপ্তির বুকে গিয়া বিঁধিল। আত্মীয়-বন্ধুর এই প্রীতি···তাহা ছাড়িয়া যে নির্জ্জন পথ সে বাছিয়া লইয়াছে—যে-পথে প্রীতির শ্যামল ছায়ার চিহ্নও কোথা নাই—সে তবে ভুল পথ···?···মন সগর্জ্জনে বলিয়া উঠিল, না, না, এই ক্ষুদ্র সংসার-গহ্বর, তুচ্ছ হাসি-খেলা—এ লইয়া তো সকলেই থাকে!···এখানে প্রকাণ্ড কোনো কাজ করিতে গেলে, প্রচণ্ড কল্যাণ সাধনা করিতে গেলে তারো মূল্য দিতে হয়!···সেই মূল্যই সে দিয়াছে। এ মূল্যে যদি অতখানি কল্যাণ সে কিনিয়া লইতে পারে তো তা ছাড়িয়া দিবে। দীপ্তি নিজের মনকে নিমেষে স্থির করিয়া লইল। মা কহিলেন,—কি ভাবচো?

দীপ্তি কহিল,—সে অনেক কথা। আর একদিন আপনাকে বলবো'খন···আজ তাহলে আসি। সান্ত্বর স্কুল থেকে ফেরবার সময় হয়ে এলো। তার জল-খাবার তৈরী করতে হবে।

মা কহিলেন,—বেশ মেয়েটি! তাকে এখানে পাঠিয়ো মা। একলা থাকি···ভারী মিষ্টি কথা কয়, আর ভারী শান্ত! যে ক'দিন এখানে মেয়াদ আছে, তোমাদের দেখি-শুনি!

দীপ্তি বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।···

পরের দিন আর এক মস্ত ঘটনা ঘটিল। আগের দিন সন্ধ্যার পর দুই ঘণ্টা ধরিয়া নানা পরামর্শের পর ডাক্তারের দল কামাখ্যাবাবুর স্ত্রীকে বিচক্ষণ প্রবীণ ডাক্তার অভয় মিত্রর হাতে চিকিৎসার জন্য সমর্পণ করা মত করিলেন এবং পরদিন ডাক্তার অভয় মিত্রর প্রকাণ্ড মোটর আসিয়া বাগান-বাড়ীতে ঢুকিল।

অভয় মিত্র রোগী দেখিয়া ফিরিতেছিলেন—সান্ত্বনা সে সময় স্কুলে যাইবার জন্য ফটকের সামনে দাঁড়াইয়াছিল, স্কুলের গাড়ীর প্রত্যাশায়। মেয়েকে স্কুলের পোষাক পরাইয়া দীপ্তি স্নান করিতে গিয়াছিল। সান্ত্বনা অন্যমনস্ক-ভাবে চাহিয়া ছিল। গাড়ীর দিকে তার হুঁস ছিল না। অভয় মিত্রর মোটরের সামনে পড়িলে সোফার হর্ণ বাজাইয়া চীৎকার করিয়া গাড়ী থামাইয়া ফেলিল। সে চীৎকারে অভয় মিত্রর নজর পড়িল সান্ত্বনার উপর। ফুলের মত সুন্দর মেয়েটি। কার মেয়ে?···সান্ত্বনা কেমন হক্চকিয়া গিয়াছিল। অভয় মিত্র গাড়ী হইতে নামিয়া তাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। এ কি! এ মুখ...এ মুখ যে তাঁর বুকে আঁকা রহিয়াছে!···অরুণের মুখের ছায়াটুকুর মত!···সেই চোখ, সেই নাক···সব সেই! এ যেন তাঁর অরুণই শিশু-মূর্ত্তি ধরিয়া তাঁর সামনে আবার আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! সান্ত্বনাকে আদর করিয়া তাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার নাম কি মা?

—সান্ত্বনা।

—তোমার বাবার নাম?

—অরুণচন্দ্র মিত্র!···অভয় মিত্রর বুকে কে যেন ছুরি বিঁধিয়া দিল! তিনি শিহরিয়া উঠিলেন; কহিলেন,—তোমার বাড়ী?

ছোট গৃহটির পানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সান্ত্বনা কহিল,—ঐ বাড়ী।

—তোমার বাবা আছেন?

—না!

না। অভয় মিত্রর পায়ের তলায় মাটীটা প্রচণ্ড দোলে দুলিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন,—তোমার কে আছেন?

—মা।

মা! না, কোনো ভুল নাই! অভয় মিত্র কহিলেন,—তোমার মার নাম জানো?

—শ্রীমতী দীপ্তি দেবী।

সব ঠিক! এ নামও যে তাঁর বুকে ফুটিয়া আছে, সর্ব্বক্ষণ, তীক্ষ্ণ কাঁটার মত!···

অভয় মিত্র কাঁপিয়া উঠিলেন। সান্ত্বনাকে বুকে করিয়া তিনি তার পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তার পর তার মুখে চুমা দিয়া কহিলেন,—আমি কে, জানো?

সান্ত্বনা দুই চোখের বিস্ফারিত দৃষ্টি তাঁর মুখে স্থাপিত করিয়া কহিল,—ডাক্তার বাবু।

হাঁ, ডাক্তার বাবু! এইমাত্র তাঁর পরিচয়! একটা অজানা বেদনায় তাঁর মন টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। সান্ত্বনাকে বুক হইতে নামাইয়া তিনি কহিলেন,—স্কুলে যাচ্ছ?

—হ্যাঁ।

—কোন্ স্কুলে পড়ো?

—ক্যাথারিন ইন্‌ষ্টিটিউটে।

—চলো, আমার গাড়ীতে করে! আমি তোমায় তোমার স্কুলে নামিয়ে দিয়ে যাবো।

এত বড় মোটরে চড়িয়া! সান্ত্বনা মহা-খুশী হইয়া কহিল,—যাবো।

অভয় মিত্র সান্ত্বনাকে গাড়ীতে তুলিয়া লইলেন—পরে সোফারকে কহিলেন,—তুমি ওর বাড়ীতে বলে এসো, ডাক্তার বাবুর গাড়ীতে করে ও স্কুলে যাচ্ছে। স্কুলের গাড়ী এলে যেন ফিরিয়ে দেয়!

সোফার দাসীর কাছে খবর দিয়া গাড়ী চালাইয়া পথে বাহির হইল।

## ২০

সান্ত্বনার সেদিন গর্ব্ব আর আমোদের সীমা রহিল না। এত বড় মোটরে চড়িয়া স্কুলে আসা···অভয় মিত্রর উপর এক নিমেষে তার প্রচুর ভালোবাসা জন্মিল!···স্কুল হইতে কখন্ বাহির হইয়া বাড়ী ফিরিয়া মার কাছে এত বড় সৌভাগ্যের খবর দিবে, এই চিন্তায় সারাদিন সে আকুল হইয়া রহিল। স্কুলের ছুটীর পর বাড়ী ফিরিতে মা জিজ্ঞাসা করিল,—কার সঙ্গে স্কুলে গেছলে আজ সান্ত্ব···?

—ডাক্তারবাবুর সঙ্গে। পুলকে সান্ত্বনা একেবারে উচ্ছ্সিত! তার পর সে একটা গিনি মার হাতে দিয়া কহিল,—ডাক্তার বাবু আমায় দেছেন, বলেচেন, এই দিয়ে পুতুল কিনো। সোনার টাকা। একে গিনি বলে, ডাক্তার বাবু বললেন···

দীপ্তি অবাক হইয়া গেল। কে অজানা ডাক্তার তার মেয়েকে হঠাৎ এতখানি আদর করিয়া উপহার দিয়া গেল! এ উপহার দেওয়ার মানেই বা কি!...

সান্ত্বনা কহিল,—এ কিন্তু আমার। এতে আমি খেলনা কিনবো—খুব অনেকগুলো পুতুল, আর কলার-বক্স, ছবি আঁকবো বলে...

সে কথা দীপ্তির কানেও গেল না। সে শুধু ভাবিতেছিল, কে এই ডাক্তার বাবু!...ছেলেমেয়ের উপর যাঁর এতখানি দরদ আর ভালোবাসা...এ সমস্যার সেদিন কোনো মীমাংসা হইল না!...

পরদিন বেলা তখন ন'টা। সান্ত্বনাকে স্নান করাইয়া দীপ্তি তাকে আহারে বসাইয়াছে, এমন সময় দ্বারের সামনে কে ডাকিল,—সান্ত্বনা...

কে ডাকে?...এ স্বর যেন পরিচিত! দীপ্তি বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া দ্বার-প্রান্তে চাহিল।...তাই তো! এ যে... কি আশ্চর্য্য, অভয় মিত্র!...দীপ্তি চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অভয় মিত্র ঘরে ঢুকিয়া কহিলেন,—আমি ও-বাড়ীতে রোগী দেখতে এসেছিলুম। কাল সান্ত্বনার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়েচে।...তুমি তাহলে এইখানে আছো...? কত দিন?

দীপ্তি মাটীর পানে চাহিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল,—সেই অবধি...সান্নু হবার পর থেকে!

অভয় মিত্র একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—তোমাদের চলছে কি করে?

দীপ্তি কহিল,—এক রকমে চলে যাচ্ছে।

অভয় মিত্র কহিলেন,—কোনো অভাব...? যদি থাকে বলো। এ তো অরুণের মেয়ে...এর প্রতি আমারো একটা কর্ত্তব্য আছে! তাই বলছিলুম...

দীপ্তি কহিল,—কোনো দরকার নেই!...তার পর এক নিমেষে দীপ্তির মনে পড়িয়া গেল, জনহীন বিদেশে চরম বিদায়ের ক্ষণে সেই নির্ম্মম অবহেলা, সেই নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যান! তার সমস্ত অন্তরাত্মা শিহরিয়া একমুহূর্ত্তে হাহাকার করিয়া উঠিল।

সে কহিল,—আপনি তো সব ত্যাগ করেচেন—তবে আবার কেন প্রচণ্ড লোভ নিয়ে এই শিশুর সামনে এসে দাঁড়িয়েচেন! আপনার কাছে কোনো দয়ার প্রত্যাশী হয়ে আমি তো হাত পেতে দাঁড়াই নি! ঐ গিনি দিয়ে কেন আমার মেয়েকে প্রলোভনে বশ করতে এসেচেন...! ফিরিয়ে নিন আপনার গিনি...এ-দয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

অভয় মিত্র অবাক হইয়া গেলেন। এত তেজ!... তিনি কহিলেন,—ছোট ছেলে, তাকে কিছু দিয়ে ফিরিয়ে নেওয়া যায় না!...না হয় পথের লোক ভালোবেসেই ওকে দিয়েচে, ভেবো।

—না, পথের লোকের কাছে হাত পাতবার মত দুর্ভাগ্য এখনো হয় নি—ওর নয়, আমারো নয়!... ফিরিয়ে নিন্ আপনার গিনি। আর আপনাকে মিনতি করচি, এর প্রতি মায়া দেখাবার আগে দয়া করে ভেবে দেখবেন, এর বাপ-মার প্রতি আপনার অসীম দয়া-মায়ার কথা! আপনি যান্। গরীবের কুঁড়ে আপনার পায়ের ধূলা পাবার যোগ্য নয়!

অভয় মিত্র কহিলেন,—সান্ত্বনাকে একটিবার দেখে যাবো!...

দীপ্তি বাধা দিয়া তাঁর সামনে দাঁড়াইল, কহিল,—না। তার সঙ্গে আপনার কোনো সম্পর্ক যখন নেই, তখন দেখা করবারো কোন দরকার আমি বুঝি না। আপনি দয়া করে ওকেও ত্যাগ করুন, যেমন একদিন তার বাপকে ত্যাগ করেছিলেন! তাকে আর স্নেহের অত্যাচারে বিঁধে কাতর জর্জ্জরিত করবেন না!...আপনার কাছে এইটুকু আমার ভিক্ষা!

অভয় মিত্র কহিলেন,—কাল একটা কথা ভাবছিলুম, শোনো, বলি...পুরোনো কথাগুলো কাঁটার মত আবার আমার মনে বিঁধেচে, কাল সারাক্ষণ! অরুণের পরশ কাল আবার নতুন করে পেয়েচি।...তাই একটা কথা বলছিলুম...অর্থাৎ মেয়েটিকে আমায় দাও। ওকে বড় করবার, মানুষ করবার ভার আমি নি। আমার নাতনী। পরম আদরে আমি ওকে বুকে করে রাখবো। আমার কাছেই সান্ত্বনা থাকবে। তুমি তাকে যখন খুশী দেখতে পাবে।.. ওর জীবনটাকে দারিদ্র্য আর অভাবের মধ্যে নিক্ষেপ করো না। আমার অরুণের মেয়ে...তোমায় আমি অনেক টাকা দেবো...অনেক...

রাগে দীপ্তির মন একেবারে তাতিয়া জ্বলিয়া উঠিল সে কহিল,—আমায় আপনি টাকার লোভ দেখাতে এসেচেন! মেয়ে-বেচা আমার ব্যবসা নয়। আমি গরিব। আপনাদের এ উচ্চ আদর্শ গ্রহণ করতে আমি একান্ত অক্ষম!...আপনি যান। মরা ছেলেকে ফেলে যেমন একদিন চলে গেছলেন...

অভয় মিত্র কহিলেন,—ভালো করে বুঝে দেখো কথাটা। আমি এখনি ওকে নিয়ে যাচ্ছি না। ভেবে ছাখো, হঠাৎ যদি তোমার খুব বিপদ হয়—সান্ত্বনা তখন কোথায় থাকবে? তার কি হবে...

দীপ্তি কহিল,—সে আমি ভেবে রেখেচি।...সহরে অনাথ-আশ্রম আছে। এমন যদি ঘটেই, ও অনাথ-আশ্রমে থাকবে। তবু...আপনার কাছে নয়!

অভয় মিত্র গম্ভীরভাবে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় দীপ্তির পানে এমন বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গেলেন যে, সে দৃষ্টি মেঘ-ভাঙ্গা বিদ্যুৎ-শিখার মত দীপ্তির বুকে বিঁধিল। দীপ্তি ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া আত্মগতভাবে

কহিল, মায়া দেখাতে এসেচেন, করুণা প্রকাশ করতে এসেচেন…! পুরানো স্মৃতির সেই গাঢ় অন্ধকারে অরুণের দুই দীপ্ত চোখের দৃষ্টি জলজ্বল করিয়া তার মনে অমনি ফুটিয়া উঠিল!

দীপ্তি কহিল, এ দয়ার একটা কণারও প্রত্যাশা করি না! এ দয়ার একটা কণা যেন কোনোদিন না গ্রহণ করি!…

সান্ত্বনাকে সে নিষেধ করিয়া দিল, ডাক্তারবাবুর সঙ্গে যেন সে দেখা না করে! তাঁর সঙ্গে কথা না কয়!…

সান্ত্বনা অবাক হইয়া মার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। দীপ্তি কহিল,—ডাক্তারবাবু কি করেচেন, তা এখন বুঝবে না, সান্ত্বনা! বড় হলে তোমায় সব কথাই বলবো'খন…

এ নিষেধ তুলিয়া দিলেও ঘটনার স্রোত কিন্তু আর এক-রকম দাঁড়াইল।

পাঁচ-সাত দিন পরে স্কুল হইতে জ্বর লইয়া সান্ত্বনা গৃহে ফিরিল। সন্ধ্যার পরক্ষণে জ্বর এমন প্রবল হইয়া উঠিল যে,জ্বরের ঘোরে তার আর কোনো হুঁশ রহিল না! দীপ্তি মহা-ভাবনায় পড়িল। ক্ষিতীশ তার একমাত্র বন্ধু! তাকে খপর দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই! কিন্তু কে বা খপর দেয়! সে-ই শুধু বাড়ী জানে—কিন্তু মেয়েকে দাসীর কাছে এ অবস্থায় ফেলিয়াও যাওয়া যায় না!…চিঠি লিখিলে ক্ষিতীশ কাল সেই দুপুর বেলায় চিঠি পাইবে…তখন যদি সে বাড়ীতে না থাকে! নূতন বিবাহ করিয়াছে, যদি শ্বশুর-বাড়ীই গিয়া থাকে! হিরণদের খপর দিবে? তাও কি ঠিক হইবে? একে ওরা নিজেদের জ্বালায় অস্থির হইয়া আছে, তার উপর আজ তিনদিন তার মার অসুখ বাড়িয়াছে!…নিরুপায়! ঘোর নিরুপায়! অথচ একদণ্ড বিনা-চিকিৎসায় সান্ত্বনাকে ফেলিয়া রাখা চলে না!…সেই বহুকাল পূর্ব্বে এমনি জ্বর সে দেখিয়াছিল—প্রথমটা কিছু নয় বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছিল! সেই জ্বর লইয়া গৃহে ফেরা!… না, না! বয়স তখন তরুণ ছিল, ঘা খাইয়া এমন মুষড়িয়া পড়ে নাই! আজ একটুতে ভয় হয়! এ জ্বর কিছু নয়…মানি! তবু চুপ করিয়া থাকা যায় না। একটা দীর্ঘ রাত! কি জানি, যদি এ জ্বর বাঁকা পথে চট্ করিয়া ঢুকিয়া পড়ে!…

অভয় মিত্র!…তাঁকেই খবর দিবে?…তাই বা কি করিয়া হয়! হিরণদের ভৃত্য তাঁর বাড়ী জানে। কিন্তু তাঁকে অমন করিয়া বিদায় দিবার পর আবার তাঁর দ্বারে দাঁড়ানো!…সে যে বড় গলায় বলিয়াছিল, পরের কাছে হাত পাতিবে সেও ভালো, তবু তাঁর কাছে এক-কণা করুণা ভিক্ষা করিবে না! এ কি ভীষণ পরীক্ষায় সে আজ পড়িল! শেষে কথাটা কি ক্ষণেই যে মুখ দিয়া বাহির হইয়াছিল!…এ পৃথিবীতে পরের উপর মানুষকে এতখানি নির্ভর করিয়া চলিতে হয়! এমন বাঁধন চারিদিকে বিছানো রহিয়াছে! হা রে মানুষ, এ বাঁধনের মাঝে মন কি সাহসে তার স্বাধীনতার গর্ব্ব করে! বাঁধন! আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধন! চারিধারে বাঁধন!…

রাত তখন নয়টা। সান্ত্বনার জ্বর আরো বাড়িল। মুখ সিঁদুরের মত রাঙা! দীপ্তির অত্যন্ত ভাবনা হইল। তাইতো, উপায়? আরো রাত্রে এ জ্বর যদি আরো বাড়ে? কোথায় ডাক্তার! কোথায় ঔষধ! কে তখন আনে! হিরণদের বাড়ীই খবর দিবে? তার মার অসুখ বাড়িয়াছে! তাদের সে দুর্ভাবনার উপর আবার তার বিপদ তাদের ঘাড়ে চাপাইবে!…কিন্তু উপায়ও আর নাই!

হঠাৎ সান্ত্বনা ডাকিল,—মা…

দীপ্তি কহিল,—কেন মা?

—জল…বড় তেষ্টা! দীপ্তি তার মুখে জল ঢালিয়া দিল। সান্ত্বনা জল গিলিতে পারিল না, গালের কষ বহিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

দীপ্তি ডাকিল,—সানু…মা…

সান্ত্বনা কোন সাড়া দিল না—বিস্ফারিত নেত্রে মার পানে চাহিয়া রহিল।

দীপ্তি আবার ডাকিল,—সানু। জল খাবে বললে যে মা…জল দিচ্ছি, খাও…

সান্ত্বনা জবাব না দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।…

দীপ্তির ভাবনা বাড়িল। এইটুকু সময়ের মধ্যে জ্বর এমন বাড়িল!…আর এই সব লক্ষণ! এ সব যে তার খুব চেনা!…দাসীকে ডাকিয়া সান্ত্বনাকে আগলাইতে বলিয়া দীপ্তি পাগলের মত ছুটিল হিরণদের বাড়ী।

দালানে ষ্টোভ জ্বালিয়া হিরণ জল গরম করিতেছিল—ঘরের মধ্যে রোগীর কাছে আর সকলে ভিড় করিয়া বসিয়া!

দীপ্তি আসিয়া ডাকিল,—হিরণ…

হিরণ চমকিয়া চাহিয়া দেখে, দীপ্তি! সে কহিল,—আপনি? কি খপর?

দীপ্তি কহিল,—সানুর বড্ড জ্বর…কেমন ভুল বকচে। কোথায় ডাক্তার, কি যে করি…বড় ভাবনা হয়েচে!

হিরণ কহিল,—সানুর জ্বর!…কৈ, আমরা তো কিছু জানি না।

দীপ্তি কহিল,—আজই স্কুল থেকে জ্বর নিয়ে ফিরেচে…দেখতে-দেখতে সেই জ্বর এমন বেড়ে উঠলো যে, আমার ভারী ভয় হচ্ছে! এখনো তো সমস্ত রাত পড়ে রয়েচে!…

হিরণ কহিল,—তাই তো! তা…আমরা কাকেও

পাঠাই ডাক্তার আনতে!...আপনার তো লোক-জন নেই!

দীপ্তি কহিল,—সেইজন্যই আমি এসেছিলুম, কাকেও যদি একটিবার পাঠাতে পারো...

হিরণ কহিল,—আচ্ছা, আমি এখনি নেপালকে পাঠাচ্ছি।...ডাক্তার নিয়ে আসবে। আপনি বাড়ী যান—সে একলাটি রয়েচে!

দীপ্তি জিজ্ঞাসা করিল,—মা কেমন আছেন?

হিরণ কহিল,—বিকেলের পর থেকে একটু ভালো আছেন!.. একটা ধাক্কা কাটলো...তা আপনি আর দাঁড়াবেন না, যান শীগ্‌গির।

দীপ্তি লৌকিকতার খাতিরে দাঁড়াইল না, তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিল।

বাড়ী ফিরিয়া দেখে, সান্ত্বনা তেমনি আছে!... হঠাৎ তার মনে হইল, মাথায় একটু বরফ দিলে হয়! কিন্তু বরফ, আইসব্যাগ...হায় রে, একা নারীর পক্ষে সংসার নির্ব্বাহ করা এত কঠিন!...

দীপ্তি উঠিয়া একটা চায়ের পেয়ালায় জল ঢালিয়া তাহাতে কালি ভিজাইল। সেল্‌ফে অডিকোলোনের একটা শিশি ছিল; সেটা লইয়া দেখে, দু ফোঁটা মাত্র পড়িয়া আছে! তাড়াতাড়ি একটা ছোট কাগজে অডিকোলোন নামটা লিখিয়া দাসীকে বলিল,—একবার খপ্ করে যাও না ভাই, হিরণ-দিদিমণির কাছে, তাকে এই কাগজটা দিয়ো—দিলে সে যে-শিশি দেবে, সেইটে শীগ্‌গির নিয়ে এসো দিকি...

লেখা লইয়া দাসী বড় বাড়ীর দিকে ছুটিল! দীপ্তি অসহ্য চিন্তাভার বুকে লইয়া নিঃশব্দে সান্ত্বনার শিয়রে বসিয়া রহিল!...

ঘণ্টাখানেক পরে মোটরে চড়িয়া ডাক্তার অভয় মিত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁকে দেখিয়া দীপ্তি চমকিয়া উঠিল।...

অভয় মিত্র কহিলেন,—ওদের বাড়ীর চাকর গিয়ে বললে, বাগানের ছোট বাড়ীতে যাঁরা থাকেন, তাঁদের সেই ছোট মেয়েটির বড্ড অসুখ! তুমি নিশ্চয়ই আমায় খপর দিতে বলনি!...কারণ, আমার কাছ থেকে কোন-কিছুর তুমি প্রত্যাশা করো না! আমিও তাই ভাবছিলুম, আসবো কি না!...কিন্তু আজীবন অভ্যাস এমন দাঁড়িয়েচে যে, কারো অসুখ, আর সে ডাক্তার চায়, এ খপর পেয়ে কখনো নিশ্চিন্ত বসে থাকি নি, তাই এসেচি। তা ছাড়া আরো একটা কারণ আছে...স্বীকার করি। মেয়েটিকে আমি ভালোবেসে ফেলেচি! অরুণ না বুঝে অপরাধ করেছিল, কিন্তু তার মেয়ে...নেহাৎ কচি! সে তো কোনো অপরাধে অপরাধী নয়! সে তো নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক—তা, তোমার দেখতে দিতে কোনো আপত্তি আছে?

এত চিন্তার মাঝেও দীপ্তি মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হইল। তার পর বলিল,—দয়া করে আমার মেয়েকে আপনি দেখে সারিয়ে দিন...

অভয় মিত্র সান্ত্বনাকে দেখিলেন; দেখিয়া কহিলেন—হঠাৎ জ্বর এত বেড়ে উঠলো!

দীপ্তি কহিল,—হ্যাঁ।

দীপ্তি কহিল,—মাঝে মাঝে কেমন ভুল বকচে...

অভয় মিত্র কহিলেন,—আমার সঙ্গে আইস্‌ব্যাগ আছে, বরফও কিছু এনেচি...মাথায় বরফ দাও। একা না পারো, বলো, বাড়ী গিয়ে আমার কম্পাউণ্ডারকে আমি পাঠিয়ে দি...

দীপ্তি কহিল,—তার কি দরকার হবে?

অভয় মিত্র কহিল,—সে জানে-শোনে, অনেকটা তদ্বির করতে পারবে।

দীপ্তি কহিল,—তা'হলে তাই পাঠিয়ে দেবেন।

গাড়ী হইতে আইস্‌ব্যাগ ও বরফ আনাইয়া নিজেই ব্যাগে বরফ পুরিয়া অভয় মিত্র সান্ত্বনার মাথায় দিলেন! পাঁচ-সাত মিনিট পরে সান্ত্বনা চোখ মেলিয়া চাহিল, ডাকিল,—দাদু...

অভয় মিত্র সস্নেহে কহিলেন,—হ্যাঁ দিদি, দাদু!... এখন কেমন আছ বলো তো?...বড্ড কষ্ট হচ্ছে মাথায়, না?...

সান্ত্বনা কহিল,—হ্যাঁ।

অভয় মিত্র কহিলেন,—এই যে ওষুধ দি। এবার ঘুমোও—ঘুমোলেই অসুখ সেরে যাবে।

তার পর অভয় মিত্র দীপ্তিকে কহিলেন,—খানিকটা জল গরম করে দাও—ওকে স্পঞ্জিং করিয়ে দি...

আদেশ-মত দীপ্তি জল গরম করিয়া আনিলে অভয় মিত্র সান্ত্বনার গা মুছাইয়া বেশ করিয়া গরম কাপড়ে তাকে ঢাকা দিয়া শোয়াইয়া চেয়ারে বসিলেন। চেয়ারের সামনে টীপয়। টীপয়ের উপর অরুণের ফটো। ফটোর ফ্রেমে ফুল সাজানো। ফটোখানা এক-দৃষ্টে লক্ষ্য করিয়া তিনি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, পরে দীপ্তির পানে চাহিলেন। দীপ্তি তখন সান্ত্বনার মুখের পানে চিন্তায়-ভরা দুই চোখের দৃষ্টি লইয়া চাহিয়া আছে! তার সেই ম্লান মূর্ত্তি, আর সামনে এই ফুলে সাজানো অরুণের ছবি! কঠিন তপশ্চর্য্যা ও স্মৃতিপূজার মহিমায় পরিপূর্ণ তার মুখখানিতে অভয় মিত্র অপূর্ব্ব আলোর দেখা পাইলেন!...

অভয় মিত্র কহিলেন,—মেয়েটাকে আর কষ্ট দাও কেন?...নিজেরা তো যথেষ্ট ভুগেচো...এটিকেও এই অভাব আর দারিদ্র্যের মধ্যে ফেলে রেখে, পরিচয়-হীনা অনাথার মত এমন কষ্ট দেওয়া কি উচিত হবে?

দীপ্তি অভয় মিত্রের পানে চাহিল, পরে শান্ত সহজ

স্বরে কহিল, আমি মা। মা কখনো তার সন্তানকে ত্যা করতে পারে?…

অভয় মিত্র কহিলেন,—তা যদি না পারে, তবে বাপের বুক থেকে তার আদরের ছেলেকে কেড়ে নিতে গেছলে কেন?…কি আশা নিয়ে কি সুখেরই না কল্পনা করেছিলুম! সব চুরমার হয়ে গেল।…পরে একটু থামিয়া কহিলেন,—তোমারই বা কি হলো!…তার চেয়ে আমার কথা যদি শুনতে…জগতে তবু নাম থাকতো। এ রকম নির্জ্জন বনবাসেও বাস করতে হতো না—মানুষের সঙ্গ ছেড়ে, মানুষের স্নেহ-মায়ার সব বাঁধন কেটে, এমন নিঃসঙ্গ, একলা! এই তো মেয়ের অসুখে অস্থির হয়ে পড়েচো, কে এখন তাকে দেখে…!

সে কথা ঠিক! তবু দীপ্তি কহিল—ও-সব পুরোনো কথা কেন তুলচেন! ফেরবার পথ নেই আজ…

অভয় মিত্র কহিলেন,—ফেরবার পথ নেই!…ফেরবার পথ সব সময়ে পড়ে আছে—তবে ফেরবার মন চাই।

দীপ্তি কহিল,—সমাজ আমায় ফিরে নেবে?

অভয় মিত্র কহিলেন,—নেবে। তবে সমাজের বিপক্ষে তুমি বিদ্রোহ করেছিলে,—সে বিদ্রোহের প্রায়শ্চিত্ত করা চাই আগে।

দীপ্তি কহিল,—কি প্রায়শ্চিত্ত?

অভয় মিত্র কহিলেন,—অনুতাপ করে সমাজের পায়ে মিনতি জানাতে হবে…

দীপ্তি কহিল,—কিন্তু কোথায় এ সমাজ…?

অভয় মিত্র কহিলেন,—তোমার সমাজ আমি, তোমার বাপ-মা, তোমার আত্মীয়-স্বজন! তাঁদের কাছে অনুতপ্ত মনে ফেরবার আকাঙ্ক্ষা জানালে তাঁরা বিমুখ হয়ে থাকবেন না!…আমার দিক থেকে বলতে পারি, আমি সব ভুলে যাবো। তোমায় অনুরোধ করচি, শুধু যদি এই মেয়েটিকে আমার ঘরে ফিরিয়ে দাও—তুমি তাকে অনায়াসে দেখাশোনা করতে পারবে…শুধু তোমার ঐ উন্মাদ মতগুলোকে ত্যাগ করতে হবে!

দীপ্তি কোন কথা কহিল না! অভয় মিত্র কহিলেন,—যে-মত নিয়ে এত ব্যথা পেয়েচো, তার ফলে কি লাভ হলো তোমার!…ক'জনকে তোমার মতে ফেরাতে পেরেচো! ক'জন তোমার পানে গাঢ় সহানুভূতি নিয়ে চেয়ে দেখেচে? কেউ না!…ভেবেচো, উপন্যাস লিখে দেশের লোককে তোমার দলে টানবে! এর চেয়ে বাতুল আশা আর নেই। মানুষ উপন্যাস পড়ে ক্ষণেক তৃপ্তি পায়, তার চরিত্র-সৃষ্টিতে যদি বৈচিত্র্য থাকে! তার উপর তোমরা যাকে মনস্তত্ব বলো, সেই মনস্তত্বের লীলা যদি ফুটোতে পারো, তা হলে তার তারিফও লোকে করে। তা বলে তুমি যদি সনাতন সত্যকে উড়িয়ে দিতে চাও তো লোকে তাতে মুগ্ধ হবে না, হাসবে মাত্র।…স্নেহ, মায়া, মমতা, এগুলো সবার আগে, তার পর তোমার সমাজ-সমস্যা, ধর্ম্ম-সমস্যা! স্নেহ-মমতাই যদি ছিঁড়ে চুরমার করে দিলে তো রইল কি?…একটা কথা শুধু ভেবে দেখো,—তোমার হঠাৎ একটা খেয়ালের ঝোঁকে তুমি মা-বাপকে ত্যাগ করে চলে এসেচো! এখন এই মেয়েটিকে আঁকড়ে ধরে পড়ে আছো, একে তোমার নিজের মনের ছায়াতে বড় ক'রে তুলবে, ভাবচো! কিন্তু এই মেয়ে বড় হয়ে যদি তোমার স্নেহের শিকল ছিড়ে চলে যায় তো তোমার চোখে অশ্রু দেখে লোকে তখন বলবে, তুমিও তো বাপু তোমার মা-বাপকে এমনি কাঁদনে কাঁদিয়ে এসেচো! বিদ্রোহীর কন্যা বিদ্রোহী হয়েচে!…তখন…? শুধু নিজের মনটিকে নিয়ে থাকলে,—নিজের পানে চেয়ে আর কারো মনের পানে না চেয়ে,—সংসার থাকে না! তা ছাড়া সমাজ-ধর্ম্ম, এ-সবেরও কোনো অস্তিত্ব থাকে না! …মানুষের কাজই হলো, নিজের মনের সঙ্গে অপরের মনের সামঞ্জস্য রেখে চলা—greatest good of the greatest number—এইটিই লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি!…যাক্, এখন আর বকবো না! তবে তোমাদের কথা এক মুহূর্ত্ত আমি ভুলতে পারি না। যদি বা ভুলতুম, এই মেয়েটি আবার সে-সব কথা নতুন করে মনে জাগিয়ে তুলেচে! কতকগুলো কথা তো বলে ফেললুম, একবার ভেবে দেখো।…আজ তা হলে আসি। বারোটা বাজে! আমি গিয়ে কম্পাউণ্ডারকে পাঠিয়ে দি··তার পর কাল সকালে আবার আসবো। ভয় নেই। ভাববার মত এখনো কিছু হয়নি?

অভয় মিত্র চলিয়া গেলেন। দীপ্তি মেয়ের মাথায় আইসব্যাগ চাপাইয়া কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল।

## ২১

আট দশদিন ভুগিয়া সান্ত্বনার জ্বর ছাড়িল! অভয় মিত্র এ কয় দিন দুইবার করিয়া তাকে দেখিতে আসিতেন, আসিয়া বহুক্ষণ থাকিতেন; এবং নানা কথায় তিনি অবগত হইলেন, দীপ্তি কি করিয়া সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ করে! কম্পাউণ্ডার নিবারণ এ কয়দিন দিবা-রাত্র রোগীর সেবায় রত রহিল, শুধু দিনে দুইবার বাড়ী গিয়া আহার করিয়া আসিত। হিরণ এবং কিরণ দুই বোন সর্ব্বদা দেখিতে আসিত, তাদের মার শরীর এ কয়দিন একটু ভালো আছে।

নিবারণ অনেক কথা বলিত—অরুণের জন্য অভয় মিত্রর প্রাণটা সর্ব্বক্ষণ কি যে হা-হা করে! বড় আশার ছেলে সে ছিল! তার উপর বাবুর প্রাণ একেবারে ঢালা ছিল! তাঁর মৃত্যুর পর হইতে বাবু অসম্ভব গম্ভীর হইয়াছেন। অমন যে ঝাঁজালো মেজাজ, তাও যেন জল হইয়া গিয়াছে! তার পর কয় বৎসর ধরিয়া দীপ্তির

কত সন্ধানই তিনি করিয়াছেন। ছেলে হইল, না, মেয়ে হইল, জানিবার জন্ত কি আকুলতা!...যেদিন সান্নুর দেখা পাইলেন, সেদিন গৃহে ফিরিয়া চাকর-দাসীদের হঠাৎ এত টাকা বখশিস্ দিয়া ফেলিলেন যে,সকলে অবাক হইয়া গেল। শুধু নিবারণকে তিনি বলিয়াছিলেন, তার চিহ্নটুকু মিলিয়াছে! বাবুর চোখে নিবারণ সেদিন জলবিন্দু দেখিয়াছিল!...অরুণের মৃত্যুতেও সে-চোখে সে জল দেখে নাই।...

শুনিয়া দীপ্তি সবেগে একটা নিশ্বাস ফেলিল। নিবারণ কহিল,—চলো না মা, বাড়ী চলো!...তুমি একটিবার বললে বাবু বুকে করে নিয়ে যান্!...

দীপ্তি সান্ত্বনার উপর উদাস চোখের দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। যাওয়া চলে না—যাইবার উপায় নাই! যে পণ শিরোধার্য্য করিয়া এতদিন এত বিপদ মাথায় করিয়াও সকলের সঙ্গে যুঝিয়া আসিল, আজ মন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে বলিয়া সে পণটাকে চুরমার করিয়া এই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য মাথায় তুলিয়া লইবে?...না! তা হয় না!

তা ছাড়া অভয় মিত্র প্রায়শ্চিত্তের কথা বলিয়াছেন!...কিসের প্রায়শ্চিত্ত? সে তো অন্যায় কিছু করে নাই! পরাজয়ের লাঞ্ছনা গায়ে মাখিয়া আজ কৃপা-প্রার্থিনীর মত সে সবার সামনে দাঁড়াইবে? বিশেষ অভয় মিত্রর কাছে? সান্ত্বনাকে তিনি সারাইয়া তুলিয়াছেন, তার জন্য কৃতজ্ঞতা...দীপ্তি সে কৃতজ্ঞতা অস্বীকার করে না!

কিন্তু সেই দণ্ডে তার মনে পড়িল, কোদাপাড়ার সেই জন-হীন ঘর, শয্যায় লুণ্ঠিত অরুণের মৃত দেহ...অভয় মিত্র নির্ম্মম প্রাণে তা দেখিয়া চলিয়া আসিলেন! সেই ভীষণ মুহূর্ত্তে তাঁর রাগটাই এত বড় হইল...

দীপ্তির চোখ জলে ভরিয়া আসিল, আষাঢ়ের মেঘের মত!...না, না, সে কথা সে জীবনে ভুলিবে না!...এ সংগ্রামে প্রাণ যদি তার ছেঁচিয়া পিষিয়া যায়, তবু সে অভয় মিত্রর কৃপার ভিখারিণী হইবে না! কি তুচ্ছ পরিশ্রমের কথা সকলে তোলে!...নিজের হাতে খাটিয়া অর্থ উপার্জ্জন করায় কি সুখ, তা যে করিয়াছে, সে-ই জানে! সেখানে সেই অধীনতার শৃঙ্খল পায়ে আঁটিয়া পালিত পশুর মতই পড়িয়া থাকিবে—তার কোনো কথা সেখানে খাটিবে না—সান্নুর সম্বন্ধেও না!...

কিন্তু আবার যদি তার এমনি অসুখ হয়?...দীপ্তি ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। তখন তো পরের মুখ চাহিতে হইবে!

অভয় মিত্র কহিলেন, তার এই মত লইয়া সে করিল কি? কটা লোককে সে তার এ-মতে দীক্ষিত করিতে পারিয়াছে!

...সত্য, কাহাকেও পারে নাই। গৃহ-কোণে বসিয়া শুধু সেই কথার ধ্যানে সে জীবন কাটাইয়া দিল! একটা জীবনই সে এমন নীরবে কাটাইয়া দিল...কে বুঝিবে, কেন? তবে...? সে যে মস্ত-বড় আশা লইয়া এ পণকে বরণ করেছিল, তার কি হইল? কি করিল সে? দু'খানা বই লেখা? অভয় মিত্র ঠিক বলিয়াছেন, দু'দণ্ড লোককে তা তৃপ্তি জোগাইয়াছে মাত্র!...এই যে পৃথিবীর বুকে আলো আর মুক্তির বাণী যুগে যুগে কত মহাত্মা ঘোষিত করিয়াছেন, কয় জন তা শুনিয়াছে? প্রকাণ্ড যন্ত্রশালার মানুষ মৌন যন্ত্রের মত চলিয়া ফিরিয়া জীবনগুলাকে শেষ করিয়া গিয়াছে!...তবে কি সে একটা দারুণ ভুলকে লইয়া নিজেকেই হত্যা করিতেছে?...স্নেহ-মায়া-মমতা-প্রীতির বাঁধন কাটিয়া মোহ-গহ্বরে অন্ধকারের মাঝে এই দীর্ঘকাল কাটাইয়া দিয়াছে!...দীপ্তি একটা নিশ্বাস ফেলিল,—যাহাই হউক, ফিরিতে গেলে আজ পরাজয়ের কালি মুখে মাখিয়া ফিরিতে হইবে!

দীপ্তির প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিল! এ যে চারিদিক হইতে সমস্যা জটিল হইয়া উঠিতেছে! পরকে স্বার্থপর বলিয়া ত্যাগ করিয়া নিজের স্বার্থকেই সে প্রকাণ্ড করিয়া তুলিতেছে!

বাহিরে অভয় মিত্রর স্বর শুনা গেল। তিনি ডাকিলেন,—সান্নু দিদি...

দীপ্তি ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়িল। অভয় মিত্র ঘরে ঢুকিয়া কহিলেন,—এই যে সান্নু জেগে আছে!...কোনো কষ্ট হচ্ছে দিদি?

হাসিয়া সান্নু কহিল—না।

নিবারণ কাছে ছিল; তার পানে চাহিয়া অভয় মিত্র কহিলেন,—নিবারণ, তুমি আমার গাড়ীতে করে যাওতো একবার—কিছু পথ্য আনা দরকার। ফর্দ্দ আছে। এই নাও—আর এই নাও টাকা। চট্ করে নিয়ে এসো। তুমি এলে আমি কামাখ্যা বাবুর স্ত্রীকে দেখতে যাবো—দেখে তবে ফিরবো।

তার পরে সান্নু পথ্য পাইলে ব্যবস্থা হইল, প্রত্যহ গঙ্গার ধারে সকালে-বিকালে অভয় মিত্রর গাড়ীতে চড়িয়া সে হাওয়া খাইবে। অভয় মিত্র আপনার প্রতি সান্নুর মনটিকে এমন অনুরক্ত করিয়া তুলিলেন যে, তাঁকে না পাইলে সান্নু অস্থির হইয়া ওঠে।

সেদিন অভয় মিত্র আসিয়া বলিলেন,—সান্নু আজ আমার ওখানে থাকবে, বাড়ীতে একটা কাজ আছে—সবাই ওকে দেখতে চায়!

দীপ্তি এ-কথায় না বলিতে পারিল না! মেয়েকে যিনি এত বড় রোগ হইতে সারাইয়া তুলিয়াছেন, মেয়েকে যিনি এমন করিয়া যত্ন করিতেছেন, তাঁর সে স্নেহে আঘাত দিতে দীপ্তির মন কেমন কুণ্ঠিত হইল।

কিন্তু এই বিলাস-ঐশ্বর্য্য এমন মায়ায় সান্ত্বনাকে ঘিরিয়া ধরিতেছিল যে, মার এই ক্ষুদ্র কুটীরখানি নেহাৎ সাহুর যেন একটা ক্ষুদ্র বদ্ধ খাঁচার মত মনে হইতে লাগিল। এখানে না আছে খেলার সঙ্গী, না আছে মস্ত বারান্দা, না ছাদ! সেখানে দাদুর বাড়ীতে কত সঙ্গী, কত খেলার সাথী···আর কি সে আদর! সে সেইখানে থাকিবে।

মা শিহরিয়া উঠিল। ও-দিকটা এভাবে চোখে পড়ে নাই! মেয়েকে তার কাছ হইতে ইহারা কাড়িয়া লইতেছে! মা মেয়েকে বুঝাইল। মেয়ে কিন্তু দুর্জ্জয় গোঁ ধরিল, সে খাইবে না, কিছু করিবে না!

হিরণ আসিয়া এ ব্যাপার দেখিয়া দীপ্তির পানে চাহিল, কহিল,—মা আপনাকে ডেকেচেন। অনেক কথা আছে।

দীপ্তি কহিল,—যাবো। ভাখো দিকিন্ এখন মেয়ের বায়না!

হিরণ কহিল,—তা দু'দিন পাঠিয়ে দিন না। পরের কাছে যাচ্ছে না তো!

দীপ্তির ভাবনা হইল। একটু সে অসতর্ক হইয়াছে, অমনি সেই ফাঁকে চারিদিকের বাঁধন এমন শিথিল হইয়া গেছে!

হিরণের মা বলিলেন,—ডাক্তার বাবুর কাছে সব কথা শুনেচি, মা!···ওঁর যখন আগ্রহ হয়েচে, তোমাদের নিয়ে যাবেন, তখন অমত করো না! তাঁর কাছে যাও—এখানে আলাদা থেকো না। তোমার বয়স এমন হয়নি যে আত্মজন সবাইকে ছেড়ে এমনি বনবাসে একলা পড়ে থাকবে!

দীপ্তি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল! সকলের মুখে এই এক কথা!

মা বলিলেন,—এই যে মেয়ের এত-বড় অসুখ হলো—ভাগ্যে উনি ছিলেন!···তুমি মেয়ে মানুষ, যতই লেখাপড়া জানো, যতই সব ভাখো-শোনো, তবু পুরুষ পুরুষ, মেয়ে মেয়েই! ঝড়-ঝাপটায় পুরুষের সাহায্য না পেলে নিস্তার পাওয়া যায় না! মেয়ে-মানুষ স্নেহ-মায়াই দিতে পারে! পৃথিবীতে আরো যে বড় বড় বিপদ, তাতে মাথা দিয়ে যোঝা মেয়ে-মানুষের কাজ নয়!···যার পুরুষ অভিভাবক নেই, সে কি করবে বলো?···কিন্তু তোমার যখন সব আছে, এত বড় সহায়, তখন তা ত্যাগ করে অভিমান নিয়ে শুধু থেকো না।···সংসারে যুদ্ধ করবে পুরুষ—আর তারা যুদ্ধ করে শ্রান্ত হয়ে ফিরলে মেয়েরা স্নেহ-মায়ায় তাদের সে শ্রান্তি ঘুচিয়ে দেবে।

হিরণ কহিল,—রবিবাবুর একটি চমৎকার কবিতা আছে,—

এসো এসো তুমি নারী
আনো তব হেম-ঝারি!······

দীপ্তি কহিল,—কিন্তু মেয়েরাও তো মানুষ। তাদের মনও পুরুষের মনের মত, ব্যথায় কাতর হয়, আনন্দে দীপ্ত হয়ে ওঠে······এতটুকু তফাৎ নেই!

মা বলিলেন,—এই দুয়ে মিলে এক হতে হবে তো! পুরুষ আর নারীর সৃষ্টি যে হয়েচে, দুজনেই কুড়ুল-কোদাল ধরে মাটী কাটিতে যাবার জন্ম নয়!···দুজনের যদি এক কাজ হতো, তাহলে শরীরের গড়নও দুজনের এক হতো। মেয়েদের মত পুরুষও তাহলে শিশুর জন্ম দিত, শিশুকে পালন করতো!···মেয়েরা এখন এই যে একটা গোঁ ধরেচে, যে, সর্ব্বত্র পুরুষের সঙ্গে সমান চালে চলবে, সব বিষয়ে সাম্য চাই, এ তো ঠিক নয় মা। আমি তো বুঝি, শিক্ষা দুজনের সমান চাই বটে! আর স্ত্রী যেমন স্বামীকে মানবে, শ্রদ্ধা করবে, স্ত্রীকেও স্বামীর তেমনি মানা চাই। আর সাম্য মানে আমি এই বুঝি, দুজনে মিলে-মিশে সবদিকে সামঞ্জস্য রেখে চলবে! হয়তো এ আমার ভুল। তবু ঠিকটা যে আজকালের মেয়েরাই বলচে, তাও তো মনে-প্রাণে মানতে পারচি না! পর্দার কড়াকড়ি বদ, এ আমি মানি। তবে পুরুষের মত মেয়েরাও যে ভিড়ের মাঝে অকুতোভয়ে অসঙ্কোচে বুক দিয়ে গিয়ে দাঁড়াবে, তাও আমি সহ্য করতে পারি না।···তোমার এই মেয়েটি আছে—তাকে দেখবার আপন-জনও আছে, তার বিপদ-আপদ আছে···তার মুখ চেয়ে তোমার আত্মজনকে মেনে চলতেই হবে।···

পরের দিন অভয় মিত্রর সঙ্গে বেড়াইতে গিয়া সান্ত্বনা বাড়ী ফিরিল না! অনেক বেলায় নিবারণ আসিয়া কহিল,—সানু দিদি বললে, আজ এখানে আসবে না।···তাই কর্ত্তাবাবু আমাকে পাঠিয়ে দিলেন, খপর দিতে। আপনি হয়তো ভাবচেন।···বেলা হলে সে আসবে। কর্ত্তাবাবু কত বললেন, মা ভাববে, মার মন কেমন করবে! তা তাঁর বুকে উঠে গলা জড়িয়ে ধরে বললে, আমি সেখানে যাবো না, এখানে খেলা করবো।···খেলার সাথী পেয়েচে সেখানে। শিশুর মন!···আর সবাই ওকে এত ভালো বাসে!

ঠিক! দীপ্তি ভাবিল, তাদের সে ভালোবাসা এত-বড় যে, মায়ের ভালোবাসা তার পাশে দাঁড়াইতে পারে-না! হায়রে, সেকালে লোকে যে বলিত, ছেলেমেয়ে যাদের, তাদেরই থাকে! মা শুধু পেটে ধরিয়া পালন করিয়া মরে! বড় হইলে মার পানে সন্তান ফিরিয়া চায় না!···অমনি নিজের কথা মনে জাগিল!···মা-বাপকে সেও ছাড়িয়া আসিয়াছে!···এ কি তারি শাস্তি তবে!···

সারাদিন দীপ্তি নানা কথা ভাবিতে লাগিল। ক্ষিতীশ আসিয়া তাড়া দিয়া গেল, নূতন উপন্যাসের কি হইল?

দীপ্তি কহিল,—সানুর অসুখ হয়ে অবধি আর লিখতে পারি-নি।

ক্ষিতীশ কহিল,—এবারে শেষ করে ফেলুন।··· বলিয়াই সে ঘরের চারিধারে চাহিয়া কহিল,—সান্থু কোথায়? কামাখ্যা বাবুর বাড়ী গেছে বুঝি?

দীপ্তি কহিল,—না।

ক্ষিতীশ কহিল,—স্কুলে···? না। আজ তো রবিবার।

দীপ্তি কহিল,—ডাক্তার মিত্রর ওখানে গেছে।

ক্ষিতীশ কহিল,—ও, আপনার শ্বশুর-মশায়ের কাছে!

দীপ্তি কহিল,—হ্যাঁ!

ক্ষিতীশ কহিল,—তাহলে উঠি···

ক্ষিতীশ যাইবার উদ্যোগ করিল।

দীপ্তি কহিল,—যাচ্ছেন?

লজ্জায় কুণ্ঠিত হইয়া ক্ষিতীশ কহিল,—একটু দরকার আছে। মাধুরী ধরেচে, তাকে বায়োস্কোপ দেখাতে নিয়ে যেতে হবে।···তাই তাড়া! একবার দোকান হয়ে যাবো।

ক্ষিতীশ চলিয়া গেল। সে গেলে দীপ্তি ভাবিল, সেই ক্ষিতীশ! তার প্রতি কি অসহ্য প্রেমের নৈরাশ্যে প্রাণটাকে বৈরাগ্যে ভরাইয়া তুলিতেছিল! তারপর তার হাত ধরিয়া যেমনি বাঁধা গণ্ডীর মধ্যে দীপ্তি তাকে পুরিয়া দিল, অমনি শান্ত বালকের মত সেই গণ্ডীতে কেমন অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে! সকলেই নিজেকে লইয়া বেশ সহজ ভঙ্গীতে জীবনের পথে চলিয়াছে! সেই শুধু সারা জীবন এমনি করিয়া প্রচণ্ড কোলাহলে জর্জ্জরিত হইয়া দিন কাটাইতেছে ···সান্ত্বনার কথা মনে হইল,—ঠিক তো! আজ যদি দীপ্তি মারা যায়, কাল তাকে কে দেখিবে? কোথায় সে দাঁড়াইবে?

চিন্তার অজস্র সূত্র কোথা হইতে উঠিয়া প্রচণ্ড একটা জটিলতার সৃষ্টি করিয়া তুলিল! তার জন্য সান্ত্বনাও ভাসিয়া যাইবে? তার এই পুষ্পিত জীবন···?

দীপ্তি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল, ফেলিয়া ভাবিল, চারিদিকে যখন এক সুর উঠিয়াছে, তখন তাই হোক! সে কিন্তু পুরানো গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে লইয়া আর ফিরিতে পারিবে না। তার ভাগ্যে যা ঘটে, ঘটুক! তবে সে যেমন কারো বাধা-নিষেধ মানে নাই, তেমনি সান্ত্বনাকেও কোন বাধা-নিষেধে ঘিরিয়া রাখিবে না!

অসহ্য উচ্ছ্বাসের ভরে দীপ্তি কাগজ-কলম লইয়া চিঠি লিখিতে বসিল। অভয় মিত্রকে সে চিঠি লিখিল,—

সান্ত্বনার নামে একটা চিঠি দিলাম—বড় হইলে তাকে দিবেন। আর আপনার কথাই আমি রক্ষা করিলাম··· সান্থুকে··আপনার হাতেই দিয়া গেলাম। তার সব ভার আপনার। আমি চলিলাম। কোথায়, জানি না! তবে এটা বুঝিতেছি, আমিই সান্থুর জীবনে মস্ত বাধা! সে বাধা আজ দূর করিলাম।

দীপ্তি।

সান্ত্বনাকে দীপ্তি লিখিল,—

সান্ত্বনা, মা,

যাঁকে তোমার আর দরকার নাই! যার ঘরে দারিদ্র্য, অভাব! আর তোমার আপন-জন তোমার পিতামহ···তাঁর ওখানে অজস্র সুখ, ঐশ্বর্য্য! মাকে তাই ভুলিয়াছ! ভুলিয়াই থাকো! মার অভাব তুমি বুঝিবে না!

যখন বুঝিবে না, তখন আমি আর মিছা গণ্ডী টানিয়া তোমায় বাঁধিয়া রাখি কেন? আমি একদিন মনের গতি রোধ করিতে না পারিয়া সব ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলাম,—তুমিও আজ মনের গতি রোধ করিতে না পারিয়া নিজের পথে যাইতে চাহিয়াছ! তাই যাও। আশীর্ব্বাদ করি, সুখী হও!

আমি বুঝিয়াছি, ত্যাগে বাঁচা যায় না, মানুষ বাঁচিতে পারে না। আর পারে না বলিয়াই যার আপন-জন নাই, সে পরকে আপন করিয়া সুখে থাকিতে চায়! আমি এ সুখ চাহি নাই! আমার লক্ষ্য ছিল খুব-বড়র দিকে। কিন্তু তা ঐ লক্ষ্য মাত্র! তা পাইবার জন্য কি করিলাম, কি-বা পাইলাম!

তবু একটা কথা কিছুতে মানিতে পারি না—সে এই সমাজের স্বেচ্ছাচার! সমাজকে আমি মানি না। মনে করিয়ো না, সমাজের ভয়ে চলিয়া গেলাম কোন্ নিরুদ্দেশের পথে! তা নয়। সমাজের যে মিথ্যা আচার চারিদিক হইতে মানুষের মনকে পিষিয়া মারিতেছে, সে মিথ্যা আচারের দাস্য কোনদিন করিয়ো না, মার এই শেষ কথাটুকু রক্ষা করিয়ো! তাহা হইলেই মার এ ত্যাগ সার্থক হইবে!

এ চিঠি আজিকার জন্য লিখিতেছি না। বড় হইয়া সব যখন বুঝিবে, তখন এ চিঠি পড়িয়ো!···

আমি যখন সব ত্যাগ করিতে পারিয়াছি, তখন তোমাকে ত্যাগ করা আমার পক্ষে বিচিত্র নয়!··· যুঝিয়া শ্রান্ত হইয়াছি! তোমার জন্যই যুঝিয়াছি। কিন্তু আমার কাছে যখন তোমার সুখ নাই, তখন মিথ্যা আর যুঝিয়া মরি কেন?

যে-মতের পায়ে আপনার সমস্ত আমি বলি দিয়াছি, তার কিছুই করিতে পারিলাম না! তোমার পিতামহ ঠিক বলিয়াছেন, ঘরের কোণে বসিয়া মতটাকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিলে কোন ফল হয় না!···আজ বুঝিতেছি, জন-বল, অর্থ-বল না থাকিলে কোনো মতকে খাড়া করা যায় না, সমাজের অতি-ছোট একটা ত্রুটিও শোধরানো যায় না!

এ নিষ্ফলতায় ক্ষোভ নাই!—এর পর যদি পর-জন্ম থাকে, তাহা হইলে আবার আসিব। আসিয়া এই মত লইয়া প্রাণপণে আবার সংগ্রাম করিব! জন্ম-জন্ম এই

পণ লইয়া আসিব,—মিথ্যা লোকাচার ভাঙ্গিয়া মানুষে-মানুষে সত্যকার সম্পর্ক, সমবেদনা-সহানুভূতিতে-ভরা সার্থক সম্পর্ক গড়িবার সঙ্কল্প লইয়া যুঝিব।···

আজ এই অবধি।···কোথায় যাইব, জানি না। তবে এখানে আর নয়। তুমি সুখী হও, এই আশীর্ব্বাদ করি। আমি যে যুদ্ধ করিয়া ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছি, তেমন যুদ্ধ তোমায় না করিতে হয়!

মা কি সহিয়াছে আর কেন সহিয়াছে, সেটুকু বুঝিবার চেষ্টা করিয়ো। তোমার মা সতী—ইহাও জানিয়ো। ইহা জানিয়া মার কথা বিরলে কখনো ভাবিয়া দু ফোঁটা চোখের জল ফেলিয়ো—মার এই শেষ মিনতি।

চিঠিখানা অভয় মিত্রর হাতে পৌঁছিল সন্ধ্যার পূর্ব্ব-ক্ষণে। চিঠি পাইয়া সান্ত্বনাকে লইয়া তিনি মানিকতলায় বাগান-বাড়ীতে আসিয়া দেখেন, জিনিষ-পত্র যেমন তেমনি পড়িয়া আছে। শুধু দীপ্তি নাই! আর সেই ফটোখানা···সেখানাও নাই!

দাসীকে প্রশ্ন করিলে দাসী কহিল,—মা পশ্চিমে গিয়েছেন। এ সব জিনিষ-পত্র সে আগুলিয়া রহিয়াছে। মা বলিয়া গিয়াছেন, ডাক্তারবাবু যদি এ-সব তাঁর ওখানে লইয়া যান তো তাহাই হইবে! আর যদি না লইয়া যান, তাহা হইলে তাকেই সব লইতে বলিয়াছেন।

সান্ত্বনা মাকে দেখিতে না পাইয়া কাতরভাবে অভয় মিত্রর পানে চাহিয়া কহিল,—মা···?

অভয় মিত্র তাকে আদর করিয়া বলিলেন,—মা পশ্চিমে গেছে। ভয় কি সানু? যতদিন না মা ফেরে, তুমি আমার কাছে থাকবে। দাসীকে কহিলেন,—এ সব জিনিষ আগলে রাখ্,—আমার লোক এসে নিয়ে যাবে কাল।···আর তোকে সে এর জন্য বখশিস দিয়ে যাবে!···তোর মাইনে সব পেয়েচিস্?

দাসী কহিল,—হ্যাঁ। মা সকলকে সব চুকিয়ে দিয়ে গেছেন,—কারো সিকি-পয়সা পাওনা রেখে যান্ নি।

অভয় মিত্র একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন—সান্ত্বনা কাতর নয়নে তাঁর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

শেষ

# বন্দী

( উপন্যাস )

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

## পূর্ব্বকথা

ফ্রান্সের অমর লেখক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ভিক্তর হুগো প্রণীত ফরাসী উপন্যাসের ইংরাজী অনুবাদ, Under Sentence of Death অবলম্বনে বন্দী রচিত হইয়াছে।

আগাগোড়া অনুবাদ করিবার মত ধৈর্য্য বা সময় আমার ছিল না। যতটুকু ভালো বুঝিয়াছি, নিজের কল্পনা-মত কোথাও তাহা জুড়িয়া দিয়াছি, মূলের কতক-বা পরিবর্জ্জনও করিতে হইয়াছে। তবে যতদূর পারিয়াছি, কবির কথা বজায় রাখিয়াছি।

রচনাটির বিশেষত্ব এই যে, একটি অন্তর-বাসী প্রাণীর করুণতম মর্ম্মকথা তাহারই মুখ দিয়া কবি মনোজ্ঞভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। মানব-চিত্তের গূঢ়তম, গভীরতম প্রদেশে কবি অবাধে যাতায়াত করিয়াছেন! আবার শুধু তাঁহার নায়কের হৃদয়টিতেই নহে, চারিদিককার অবিরাম জনস্রোতের প্রতি ক্ষুদ্রতম তরঙ্গাঘাতটি অবধি তাঁহার বিশাল চিত্ত-তটে আসিয়া প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে!

বঙ্গ সাহিত্যে এরূপ রচনা নূতন বলিয়াই আমি এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম। ১৩১৭ সালের "ভারতী" পত্রিকায় বন্দী ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। মাসিক পত্রিকার জন্য প্রতি মাসে প্রয়োজন-মত, খণ্ড খণ্ড রচনা করিয়াছি, বোধ হয়, সে কারণে কতকটা রস-হানি ঘটিয়া থাকিতে পারে। যাহা হোক, বর্ত্তমান সংস্করণে রচনাটি আমূল পরিমার্জ্জিত হইয়াছে।

ভবানীপুর
মহাবিষুব সংক্রান্তি
১৩১৯

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বহুভাষাবিদ্
সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক
বাণী-মন্দিরের আদর্শ পুরোহিত
কলাকুশল কবি ও সুলেখক
**জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর**
মহাশয়ের করকমলে
রচয়িতার
আন্তরিক শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ
এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ
**উৎসর্গিত হইল**

# বন্দী

## ১

ফাঁশি!

পাঁচ সপ্তাহ ধরিয়া আমার এই এক চিন্তা! সারা দিনরাত্রি আমি নিঃসঙ্গ একাকী মৃত্যুর হিম-স্পর্শ অনুভব করিতেছি! রজ্জুতে কে যেন আমার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়াছে!

কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে কিন্তু আমি সাধারণ মানুষের মতই ছিলাম! প্রতি দিন, প্রতি ঘণ্টা, প্রতি মুহূর্ত্ত, নিজের স্বাধীন মত, স্বাধীন কাজ! আমার তরুণ নির্ম্মল মস্তিষ্ক যেন একটা নেশায় বিভোর থাকিত! কোনো নিয়ম নাই, শৃঙ্খলা নাই, বাধা নাই, বন্ধন নাই, এমনই একটা জীবনের কল্পনায় অধীর হইয়া উঠিতাম!

সুন্দরী কিশোরী, জয়-পরাজয়, আনন্দ ও আলোক-মণ্ডিত রঙ্গালয়, সন্ধ্যার ছায়ায় তরুতলায় কিশোরীর বাহু-বন্ধনে ধরা দিয়া স্বপ্নময় পরিক্রমণ—এমনই সুখের মধ্যে দিন কাটিত! চিন্তার গতি ছিল স্বাধীন, নিজেও ছিলাম স্বাধীন!

কিন্তু আজ? আমি বন্দী। শৃঙ্খলাবদ্ধ, কারাগৃহ-বাসী বন্দী! মনের মধ্যেও কারাগহ্বরের সেই ঘনীভূত অন্ধকার!—একটা ভীষণ, নিষ্ঠুর হত্যার কলঙ্ক-কালিমায় গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন! আজ আর কোনো চিন্তা নাই, শুধু একটি কথা অহর্নিশি মনে জাগিতেছে—ফাঁশির রজ্জুতে আমার প্রাণদণ্ড!

অশরীরী ছায়ার মত এই চিন্তা আমাকে ঘিরিয়া আছে! আর কোনো কথা ভাবিবার অবসর নাই! সে কথা ভুলিতে চেষ্টা করি, কিন্তু হায়, সবই বৃথা! তাহার কঠিন স্পর্শ হইতে একদণ্ডের জন্য নিস্তার নাই!

আমার পানে রক্ত-আঁখিতে সর্ব্বদাই যেন সে চাহিয়া আছে! চারিধারে কে যেন বিষাদের গান গায়, আর মাঝে মাঝে কাহার তীব্র হাসি বিদ্যুতের মত ফুটিয়া ছুটিয়া ফিরে! কারাগৃহের জানালার ধারে,—ও কার চোখ? মৃত্যুর! ভূতের মত সে আমার চারি পাশে ঘুরিতেছে! হাতে রজ্জু! না, আমি পাগল হইব!

সহসা ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কে যেন আমার মুখের উপর হইতে দৃষ্টি সরাইয়া লইল! এ কি স্বপ্ন! কারা-গৃহের কঠিন প্রস্তরে, আলোকের ক্ষীণ রেখায়, প্রহরীর নীরব মূর্ত্তিতে, জানালার ধারে—সর্ব্বত্র যেন কে ঘুরিতেছে! তাহার মুখে শুধু ঐ এক কথা—ফাঁশি!

## ২

অগষ্ট মাস! নির্ম্মল, স্নিগ্ধ, সুন্দর প্রভাত! আজ তিন দিন আমার বিচার আরম্ভ হইয়াছে! এ তিন দিনে আমার অসাধারণত্বের সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অলস লোকগুলা—কাজের জন্য যাহারা একদণ্ড বাড়ী ছাড়িতে চাহিত না—আজ আমাকে দেখিবার জন্য আদালতের প্রাঙ্গণে আসিয়া দিব্য দল বাঁধিয়া বসিয়াছে! মৃত দেহের চারি পাশে শকুনির দল যেমন লোলুপ দৃষ্টিতে বসিয়া থাকে, তেমনই আজ আমার জন্য ইহারা এত অধীর, এমন চঞ্চল!

প্রহরীদলের এই বীরদাপ, লোকগুলার নিরীহ মূর্ত্তি—আমার অসহ্য বোধ হয়!

প্রথম দুই রাত্রি চোখে নিদ্রা ছিল না। প্রাণের উপর কি এক সুদূর, ব্যাকুল আর্ত্তনাদ! কিসের এক গভীর আশঙ্কা! তৃতীয় রাত্রে ক্লান্ত চোখে নিদ্রার মোহ-স্পর্শ প্রথম অনুভব করিলাম! আবেশময়ী নিদ্রা,—সকল বেদনা সে ভুলাইয়া দেয়! প্রহরীর আহ্বানে নিদ্রা ভাঙ্গিল। তাহার পায়ের ভারী জুতা, হাতে চাবির গোছা, অর্গলমোচন—নানা কঠোর শব্দেও নিদ্রা ভাঙ্গে নাই। সে আসিয়া ঠেলা দিয়া ডাকিল,—ওঠো!

আমি চোখ মেলিয়া চাহিলাম! চারিধারে কারা-গৃহের কঠিন প্রস্তর! ছাদের নীচে বায়ু-পথের মধ্য দিয়া একটুখানি আকাশ দেখা গেল। সূর্য্যের আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে! এই সূর্য্যের আলোটুকু আমি প্রাণের চেয়ে ভালোবাসি!

আমি কহিলাম,—বাঃ! চমৎকার প্রভাত!

প্রহরী চুপ করিয়া রহিল—আমার কথার জবাব দেওয়া,—প্রথমটা সে প্রয়োজন বলিয়া মনে করিল না। কিন্তু সহসা কি ভাবিয়া সে কহিল,—এমনই তো মনে হচ্ছে!

পাষাণের মত আমি নিশ্চল, নিস্পন্দ! চেতনা ছিল না! আমি সেই বায়ু-পথের দিকেই চাহিয়াছিলাম! আবার কহিলাম, —বাঃ! বেশ দিন!"

লোকটা কহিল,—হাঁ! কিন্তু বাহিরে তোমার জন্য সকলে প্রতীক্ষা করিতেছে!

ছোট্ট কথাটুকু! মাকড়সার জালের মত এই কথা-টুকু আমাকে আবার পুরানো চিন্তার জালে জড়াইয়া ফেলিল! নিমেষে আমার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল,—সেই নির্ম্মম হৃদয়-হীন, রক্তপিয়াসী বিচার-গৃহ—

জজের সেই গম্ভীর অপ্রসন্ন মুখ, নিরীহ সাক্ষীর দল, পুতুলের মত চিত্র-করা যেন তাহাদের চোখ, সতর্ক, সপ্রতিভ প্রহরী ও চাপরাশির দল, কালো গাউন-মণ্ডিত উকিলের গর্ব্বিত, উদ্ধত মূর্ত্তি—আর এই সব অলস কাপুরুষ দর্শকের সারি।

আমার সারা দেহে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল! গা কাঁপিতেছিল! পা টলিতেছিল! প্রহরী আমাকে ধরিয়া কাঠগড়ার মধ্যে পুরিয়া দিল! বাহিরের বাতাসে যেন অনেকখানি শ্রান্তি, অনেকখানি দুশ্চিন্তা কাটিয়া গিয়াছিল! মাথার উপর বিস্তৃত নীল আকাশ—রৌদ্রের উষ্ণ-মধুর স্পর্শ, চারিধারে পাখীর কোলাহল, গাছের ছায়া—এ পৃথিবী এমন সুন্দর, তাহা পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই!

তার পর আমার বিচার-গৃহের এই বদ্ধ বায়ু! জীবনের পর মৃত্যু,—সে-ও বুঝি এমনই ভীষণ! আমাকে দেখিয়া চারিধারে একটা কোলাহল পড়িয়া গেল। চুপি-চুপি কথা, কাগজ-পত্র উল্টানোর খস্‌খস্ শব্দ, চলা-ফেরা,—সমস্ত মিলিয়া একটা বিকট মিশ্র রাগিণীর সৃষ্টি করিল! এতক্ষণ অধীরভাবে প্রতীক্ষা করিয়া সকলে কষ্ট পাইতেছিল, আমি আসিতে লোকগুলা যেন আরাম পাইয়া বাঁচিল! কি নির্লজ্জ হৃদয়-হীনতা! একজন ফাঁশি-কাঠে প্রাণ দিতে চলিয়াছে, আর এই বর্ব্বর পশুর দল তাহা দেখিয়া আমোদ করিতে আসিয়াছে!

চারিধার শান্ত নিস্তব্ধ! ঝড়ের পূর্ব্বে প্রকৃতি যেমন শান্ত থাকে, তেমনই! এখনই ঝড় উঠিবে! ভীষণ ঝড়—আমার অস্থিগুলাকে গুঁড়াইয়া দিয়া, শিরাগুলাকে ছিঁড়িয়া টুক্‌রা-টুক্‌রা করিয়া, প্রাণটাকে সহস্র খণ্ডে বিদীর্ণ করিয়া তবে এ ঝড় থামিবে! আজ আমার অপরাধের দণ্ড-বিধান হইবে!

দণ্ড! কে কাহাকে দণ্ড দিবে? কে কাহার অপরাধের বিচার করিবে? আমি নিস্তব্ধভাবে প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। হৃৎপিণ্ড তালে তালে নাচিয়া উঠিতেছিল! কি গভীর বিরাট স্পন্দন! তাহারই ধ্বক্-ধ্বক্ ধ্বনি বন্দুকের শব্দের মত ভীষণ মনে হইতেছিল!

তখন আমার মনে কোনো ভয় ছিল না! ঘরের জানালা খোলা ছিল। তাহারই মধ্য দিয়া আমি আকাশের পানে চাহিয়া ছিলাম। আকাশের গায়ে অসংখ্য ছোট পাখী উড়িয়া বেড়াইতেছে। বাহির হইতে একটা মিশ্র কোলাহল ভাসিয়া আসিতেছিল, আর শান্ত মৃদু বায়ু, মাতার কল্যাণ-হস্তের মত আমার শান্ত ললাটে শান্তি বহিয়া আনিতেছিল! জজের নিদ্রা-কাতর নয়নের প্রতি দৃষ্টি পড়িতেছিল! আমি ভাবিতেছিলাম, আর কেন এ অভিনয়!

বাহিরে দোকানীর দল হাসিতেছিল, গল্প করিতেছিল! আমাকে ভুলিয়া তাহারা আজ হাসি-গল্প লইয়া রহিয়াছে! আলোচনার বিষয়ও পাইয়াছে! কি নির্ব্বোধ, মূর্খ এই দোকানীর দল!

চারিধারে এত আনন্দ, এমন শোভা! তাহার মধ্যে মৃত্যুর কথা ভাবা নিষ্ঠুরতা—পাপ! এই স্নিগ্ধ বায়ু, এমন দীপ্ত প্রসন্ন সূর্য্য-কিরণ, ইহার মধ্যে মৃত্যুর চিন্তা,—নিতান্তই সে অশোভন! সূর্য্য-রশ্মির মত আশার আলোক-ছটা মাঝে মাঝে নিরাশ-তিমির হৃদয়টাতে আলো দিতেছিল। আহা, যদি আজ মুক্তি পাই!

আমার উকিল বলিলেন,—আশা আছে!

মৃদু হাসিয়া আমি কহিলাম,—ভাল কথা!

উকিল বলিলেন,—একটা জিনিষ—হঠাৎ যে কাজটা হইয়া গিয়াছে, তাহা আমি প্রমাণ করিয়াছি। ফাঁশি তো হইবেই না। তবে আজন্ম বন্দী—দেখা যাক্!

আমি কহিলাম,—কারাগৃহে আজন্ম বন্দী! তার চেয়ে যে মৃত্যু ভালো!

হাঁ, মৃত্যু ভালো! আমি বাহিরের দিকে চাহিলাম। গাছের ডালে বসিয়া একটা পাখী ফলে ঠোকর মারিতেছিল! কি স্বচ্ছ, লঘু উহার আনন্দটুকু! আমি যদি আজ পাখী হইতাম! অমনই মুক্ত, স্বাধীন!

তখন জজের রায় পড়া হইতেছিল—সেদিকে আমি লক্ষ্য করি নাই! জীবন বা মৃত্যু, দুটার কথাই তখন আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সহসা শুনিলাম, আমার ফাঁশি! মাথায় ঝিন্ ঝিন্ করিয়া ঘাম ফুটিয়া উঠিল। চোখের সম্মুখে কিসের একটা পর্দ্দা পড়িয়া গেল। আমি কাঠগড়ায় ঠেশ দিয়া দাঁড়াইলাম! জজের মনে বুঝি দয়া হইল। তিনি কহিলেন,—তোমার কিছু বলিবার আছে?

বলিবার অনেক কথাই ছিল! কিন্তু কথা বাড়াইয়াই বা কি লাভ? তাহা ছাড়া জিভটা জড়াইয়া গিয়াছিল! দুই হাতের মধ্যে আমি মুখ ঢাকিলাম। লোকগুলা কোলাহল করিতে করিতে বিচার-গৃহ ত্যাগ করিতেছিল—তাহাদিগের পায়ের শব্দ শুনিতেছিলাম। এতক্ষণে তাহারা বাঁচিয়াছে! আঃ! কাজ, কর্ম্ম, বিলাস, বিশ্রাম—সব ত্যাগ করিয়া হতভাগারা সারাক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত, আজ তাহাদের সকলকে ছুটি দিয়াছি! ধন্য আমি!

অনেকক্ষণ পরে আমার স্বর ফুটিল। আমি কহিলাম, হুজুর একটু দয়া করুন…মৃত্যুটা যেন শীঘ্র হয়! আর আমার বলিবার কিছু নাই!

সমস্ত জগতের উপর আমার অভিমান হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে জগতের কি ক্ষতি! সে চিরদিনকার মত হাসিবে, খেলিবে! আমি যে আজ তাহার ক্রোড়চ্যুত হইয়া চলিলাম, এ অভাব সে কখনও অনুভব করিবে?

হায়, এমন সুন্দর পৃথিবী, সে এত নির্ম্মম! কাহারও

জন্য এতটুকু মায়া নাই! স্নেহ নাই, যেন নিস্পন্দ, কঠিন একটা জড়পিণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে! এই জগতে কোনমতে টিঁকিয়া থাকার নামই জীবন! ইহার চেয়ে মৃত্যু,—সে কি এত কঠোর!

প্রহরীরা আমাকে বাহিরে লইয়া আসিল। বাহিরে তখনও উৎসুক দর্শকের দল আমাকে দেখিবার জন্য পাগল! এই সব হৃদয়-হীন পশুগুলার শিরে বাজ পড়ে না, ভগবান! প্রেত, পশুর দল।

বাহিরে আসিয়া বুঝিলাম, এ কি পরিবর্ত্তন! যখন বিচার-গৃহে আসিয়াছিলাম, তখন সকলের মতই আমি জীবন্ত ছিলাম—এই জগতেরই একজন! আর এখন এ যেন আমার মৃতদেহটা ভৌতিক বলে চলিয়াছে! আমি যেন এখন আর এ জগতের নহি! এই পাখীর গান, সূর্য্যের কিরণ—ইহারা আজ আর আমার কেহ নহে! এই নদীর জল, নীল আকাশ—আর সকলের জন্য ঠিক তেমনই আছে, কেবল আমি ইহাদের মধ্য হইতে ভ্রষ্ট, চ্যুত তারার মত খসিয়া পড়িয়াছি! ঐ ছোট ছোট ফুলগুলি, ঐ গাছের ছায়াটুকু—আজ আমার জন্য তাও নাই,—কিছু নাই! এ সবে কোনো অধিকার আজ আমার নাই!

প্রকাণ্ড কালো রঙের বন্ধ গাড়ী আমার জন্য বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল। আমি গাড়ীতে উঠিতেছি, এমন সময় শুনিলাম, অদূরে কে বলিতেছে,—লোকটার ফাঁশির হুকুম হয়ে গেল! আমি তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলাম! একটা ব্যর্থ আক্রোশে অন্তর জ্বলিয়া উঠিল।

গাড়ী চলিল। গাড়ীর মধ্যে ছোট একটু ফাঁকের ভিতর দিয়া পথের পানে চাহিয়া চলিলাম,—যাত্রীর দল পথে ভিড় জমাইয়া হাসি-গল্প করিতেছে। আজও জগতের হাসি-খেলায় এতটুকু বিরাম পড়িবে না! এতটুকু সহানুভূতি নাই!...হায় রে, এত হাসি, এত আনন্দ কিসের জন্য!

৩

মৃত্যু!

কিন্তু ক্ষতি কি! মানুষ চিরদিন বাঁচে না। একদিন তাহাকে মরিতে হইবেই। সেই দিন ও ক্ষণটুকু শুধু তাহার নির্দ্দিষ্ট নাই,—এই প্রভেদ! তবে কেন আমি মিছা ভাবিয়া মরি!

আজ হইতে ফাঁশির দিন—এই সময়টুকুর মধ্যে কত লোকই প্রাণ দিবে! আমার ফাঁশি দেখিবার জন্য যে-সব লোক আকুল হইয়া আছে, তাহাদিগের মধ্যেও কেহ বা আজই ইহলোক ত্যাগ করিবে! কেহ-বা দুই-দিন পরে! তবে আমারই বা এ জীবনের প্রতি এত মমতা কেন?

আলোক ও বায়ুহীন রুদ্ধ কারাগৃহ, কদর্য্য অন্ন, নিঃসঙ্গ জীবন! লাঞ্ছনার বিষে জর্জ্জরিত হৃদয়, বর্ব্বর রুক্ষ অসভ্য প্রহরী—ইহাদিগের সহিত একত্রে বাঁচিয়া কি সুখ! জগতে আমার জন্য করুণার এক বিন্দু অশ্রুও আজ সম্বল নাই! আজ আমি রিক্ত! পাথেয়টুকু হারাইয়া বসিয়াছি! কি ভীষণ এ জীবন-ভার বহিয়া বেড়ানো!

৪

কালো রঙের বন্ধ গাড়ী আমায় কারাগৃহে পৌঁছাইয়া দিল।

পূর্ব্বে দূর হইতে বাড়ীটাকে মন্দ দেখিতাম না। কতবার তাহার সম্মুখে উন্মুক্ত প্রান্তরে বসিয়া গান গাহিয়াছি, গল্প করিয়াছি। কিশোর জীবনের সে প্রাণ-ভরা উল্লাস, মনভরা স্ফুর্ত্তি লইয়া ইহারই সম্মুখে চন্দ্রালোকে বসিয়া ভবিষ্যৎ সুখের কত উদ্দাম কল্পনা করিয়াছি! রাজার প্রাসাদের মত সুদৃশ্য গৃহ! পাশ দিয়া ছোট নদী খর স্রোতে বহিয়া চলিয়াছে! এমন সুন্দর ছবির মত বাড়ী! আজ কিন্তু পূতি-গন্ধে তথায় প্রাণের স্পন্দনটুকুও চকিতে থামিয়া যায়!

আমার ঘর! জানালা নাই, সার্শি নাই। শুধু কতকগুলা লৌহ-গরাদ, বিরাট লৌহ কবাট, আর চারি ধারে পাষাণ-প্রাচীর। কোনোখানে এতটুকু স্নেহের চিহ্ন নাই! এই গরাদের মধ্য দিয়া, পশুশালায় পশুর মত, উন্মাদ-মূর্ত্তি অপরাধীর দলকে বাহির হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

৫

পাষাণ-প্রাচীর নিমেষে যেন তাহার কঠিন আলিঙ্গনে আমাকে চাপিয়া ধরিল। প্রহরীর সতর্ক দৃষ্টি সতর্কতর হইল! কোনো কষ্ট কোনো অসুবিধা যেন না হয়! খুব সাবধানে এখন এ অমূল্য জীবনটাকে রক্ষা করিতে হইবে—আপনা হইতে যেন সে ঝরিয়া না পড়ে! খুব হুঁসিয়ার! যেন আত্মহত্যা না করিয়া বসি!

এমনই রাজার যোগ্য আদরে, ছয়-সাত সপ্তাহ আমাকে বাঁচিতে হইবে! তার পর আমার এই দেহখানা ফাঁশিকাঠে চড়াইবার জন্য দেবতার অর্ঘ্যের মত সযত্নে ইহারা জল্লাদের হাতে তুলিয়া দিবে।

প্রথম দুই চারি দিন,—কি সে করুণা! মৃত্যুর অনলে ফেলিবার পূর্ব্বে শীতল স্নেহের অমৃত-সিঞ্চন! ক্রমে ইহা সহিয়া আসিল! কিন্তু তাহার পর আবার সেই পুরাতন পরিমিত ব্যবহার! আর মাঝে মাঝে বিদ্রূপের স্নিগ্ধ ধারা।

আমার বয়স, শিক্ষা, সংসর্গ ও চেহারার জন্য কিছু সুবিধা হইল। লেখাপড়া করিবার অনুমতি পাইলাম।

সকালে সন্ধ্যায় ভগবানকে ডাকিবারও হুকুম মিলিল। পরে প্রহরি-বেষ্টিত হইয়া মুক্ত বাতাসে একটু পরিভ্রমণ। আরও দু'-একজন হতভাগ্য বন্দীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে পাইলাম। তাহারা ইহারই মধ্যে একটু আনন্দ সংগ্রহ করিয়া লইয়া আরামে আছে। তাহাদিগের অপরাধ কি, জিজ্ঞাসা করিলাম। কেহ বলিল,—কি সে অভদ্র, কুৎসিত ভাষা—বলিল, চুরি। কেহ বা,—প্রবঞ্চনা। কেহ বা আর-কিছু! কাজগুলা যেন কত গর্ব্বের। আশ্চর্য্য ইহাদিগের ধারণা! অদ্ভুত ইহাদিগের সান্ত্বনার রীতি!

তবু ইহারা আমার দুঃখে সহানুভূতি জানাইত। ইহারাই আজ আমার একমাত্র সঙ্গী, বন্ধু! একদিন ইহাদিগকে কি ঘৃণাই করিতাম! আজ ইহাদিগের সহিত [illegible] কহিয়াই বাঁচিয়া আছি! নহিলে উন্মাদ হইয়া যাইতাম! কিন্তু ইহারা কি যথার্থই মানুষ নামের যোগ্য!

আহা, নিতান্ত হতভাগ্য! যে সাধু, তাহার স্তব-গান রচনা করিয়া ধন্য হইতে কে না চায়? যে ধনী, যে ভাগ্যবান, তাহার একটি প্রসাদ-বাণী লাভের জন্য কে না কাতর? কিন্তু এই সকল ঘৃণ্য, হতভাগ্য জীবকে মানুষ বলিয়া, ভাই বলিয়া যে বুকে টানে, জানি না, সে কেমন। কোথায় তার স্থান। কি উদার তাহার হৃদয়!

আর ঐ প্রহরীগুলা—তাহারাও সহানুভূতি দেখাইতে আসিত সে যেন পরিহাস। দুর্দ্দশায় পড়িয়া আজ প্রথম মানুষ চিনিলাম। ইহারা আমার সহিত কথা কহিতে, আমার দুঃখে সহানুভূতি জানাইতে কুণ্ঠিত নহে, তাহাতে এতটুকু ঘৃণা বোধ করে না। আমার মধ্যে এমন কোনো অসাধারণত্বের পরিচয় লইবার জন্য ক্ষেপিয়া ওঠে না! অলস দর্শকের মত লোলুপ-দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া থাকে না!

৬

ভাবিতেছি, এই কথাগুলা যদি লিখিয়া যাই, মন্দ হয় না! কথা কহিবার জন্য সঙ্গী যখন মিলিবে না, তখন এই কাগজ-কলমকেই সঙ্গী করিয়া লই! কিন্তু কি লিখিব? আমার এই ব্যর্থ চিন্তার রাশি কাগজের উপর সাজাইয়া কি লাভ? চারিটা প্রাচীরের বেষ্টনীর মধ্যে ধরা দিয়া নির্জ্জীব শৃঙ্খলিত জীবনে সুখ-দুঃখের মালা গাঁথিয়া কি ফল! আমি আজ ঠিক এ জগতের নহি তো! ইহ-পরকালের মাঝামাঝি জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি! আপনার বলিয়া আশ্রয় করি, এমন কে আছে আমার,—কি আছে, ভগবান্!

তবু এ অসহ্য বেদনার কথা লিখিয়া রাখিব।

দেখিয়া লোকে ঘৃণা করিবে? করুক! লোকের সমবেদনা তো এতটুকু জাগিয়া উঠিল না। তবে তাহার ঘৃণাকেই বা ভয় কেন!

অন্তরের মধ্যে যেন ঝড় বহিতেছে! একটা সংগ্রাম!—মৃত্যুর সহিত কঠোর, কঠিন সংগ্রাম!

জীবনের দিনগুলা যাহার এমন করিয়া গণিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার—উঃ—সে কি অবস্থা! আলো, হাসি,—সমস্তই একটি ফুৎকারে নিবিয়া যাইবে।

প্রতি মুহূর্ত্ত আমি যে ভীষণ যাতনা ভোগ করিতেছি—তুচ্ছ ফাঁশির রজ্জু তাহার অধিক কি যাতনা দিবে! সে তো বিরাট মুক্তির আভাস দিতেছে! এই বন্ধ বায়ু ও রুদ্ধ করুণার উপর হইতে বিরাট সঙ্কীর্ণতার প্রস্তরখানা সে যেন হিঁড় হিঁড় করিয়া সরাইয়া লইবে। তার পর,—কি সে আশা-আলোকের অপূর্ব্ব রাজ্যে, মুঞ্জরিত সুখের মধ্যে চকিতে বিলীন হইয়া যাইব!

আর এই লোকগুলা,—যাহারা আইন করিয়াছে! তাহারা একদণ্ড ভাবে না, মানুষকে ফাঁশির রজ্জুতে ঝুলাইতে মানুষের কি অধিকার। তাহারও প্রাণ আছে, চেতনা আছে, বুদ্ধি আছে, জ্ঞান আছে। একটা তুচ্ছ রজ্জুর বন্ধনে এ সমস্ত বাঁধিয়া নষ্ট করিবে। তাহার সঙ্গে কত সাধ আশা প্রেম কতখানি [illegible] নিমেষে [illegible] যাইবে। কি নৃশংস এই অনুষ্ঠান [illegible] কথা ভাবে না! তাহার [illegible] শুধু [illegible] জ্ঞান একটা কণ্ঠ, আর কিছু নাই। মূর্খ,—অন্ধ [illegible] আর হিংসাই জগতে তাহার সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিয়া রাখিয়াছে।

সেই জন্যই আমি লিখিয়া রাখিব। আমার তুচ্ছ ক্ষুদ্র বেদনাটুকুও ফুটাইয়া তুলিব। মনের মধ্যে কি এ দ্বন্দ্ব চলিয়াছে, কেহ দেখিবে না, বুঝিবে না, এতটুকু তার আভাস পাইবে না। কি তুচ্ছ শরীরের বেদনা। মনের মধ্যে বেদনার যে গুরুভার নিশ্বাস চাপিয়া ধরিতেছে, তাহার তুলনা নাই!

কোনো দিন কি কেহ এ কাগজগুলা পড়িয়া দেখিবে না,—কি কষ্ট সহিয়া একজন হতভাগ্য প্রাণ দিয়াছে! কে জানে! হয়তো কেহ দেখিবে না! হয়তো কোনো এক দুর্দ্দিনে, ঝড়ের মুখে উড়িয়া এই কাগজের টুকরাগুলা ধুলা-কাদা মাখিয়া পথের ধারে পড়িয়া থাকিবে—কালির রেখাটুকু অবধি আমার জীবনের শেষ নিশ্বাস-বায়ুর মত একান্ত নীরবে নিভৃতে মিলাইয়া যাইবে! লোকচক্ষুর একটা মৃদু ইঙ্গিতও সেগুলাকে স্পর্শ করিবে না!

৭

কিম্বা হয়তো এ কাগজগুলার উপর একদিন কাহারও দৃষ্টি পড়িবে—তখন সকলের মনে এমন একটি স্পন্দন উঠিবে যে ফাঁশির প্রথা উঠিয়া যাইবে! কত নির্দ্দোষ,

কত দুর্ভাগা যাতনার হাত হইতে মুক্তি পাইবে! কিন্তু তাহাতে আমার লাভ? আমার জীবন তো কঠিন রজ্জু-স্পর্শে বাহির হইয়া যাইবে!

প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে! মৃত্যু ঘটিবে! এই সূর্য্যের আলো, বসন্তের এই স্নিগ্ধ বাতাস, এই ফলে-ফুলে, পাখীর গানে ভরা, বিচিত্র শ্যাম ধরণী, রঙিন মেঘ, সমস্ত চরাচর—নিমেষে আমি হারাইয়া ফেলিব!

না! নিজেকে রক্ষা করিতে হইবে! আপনাকে বাঁচাইব!

কিছুতে এ মৃত্যু রোধ করা যায় না? আঃ, ইচ্ছা হয়, কারা-গৃহের এই পাথরের দেওয়ালে ঘা দিয়া মাথাটাকে চূর্ণ করিয়া ফেলি! লোকগুলা ক্ষোভে, নিরাশায়, হাহাকার করিয়া উঠিবে, আমার তখন কি সে আনন্দ!

## ৮

আগাগোড়া এখন অবস্থাটা একবার ভাবিয়া দেখি! আজ তিন দিন বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে! উকিল বলে, আপিল করিলে হয়! একবার শেষ চেষ্টা!

আট দিন দরখাস্তটুকু এ ঘর ও ঘর ঘুরিবে। পনেরো দিন পরে কোর্টের হাতে পড়িবে। তার পর নম্বর, রেজিষ্টারীর হাঙ্গামা আছে। তবে মীমাংসা হইবে, আপিলের অধিকার মিলিবে কি না!

আবার পনেরো দিন ধরিয়া প্রতীক্ষা! অধীর, কাতর প্রতীক্ষা! শেষে আবার সেই বিচারের অভিনয়! গবর্ণমেণ্টের উকিল বুঝাইবে, অন্যায় স্পর্দ্ধা ও ধৃষ্টতা এই বন্দীর! এমনভাবে অপরাধ প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, এখনও আপিল!

এমন করিয়া ছয় সপ্তাহ কাটিয়া যাইবে। বালিকার কথা ঠিক দেখিতেছি!

## ৯

একটা উইল লিখিলে হয়, মনে করিতেছি। কিন্তু বৃথা। মকদ্দমার খরচ দিতেই আমার যথাসর্ব্বস্ব বাহির হইয়া গিয়াছে! যাহা আছে, তাহার জন্য উইল করিলে কোর্টে আরও কিছু দণ্ড দিবার ব্যবস্থা হয় বটে!

সংসারে এখন আমার বৃদ্ধা মাতা, কিশোরী পত্নী এবং একটি ছোট মেয়ে আছে! তিন বৎসরের শান্ত মেয়েটি! গোলাপের মত তাহার রাঙা ঠোঁটে হাসিটুকু লাগিয়া আছে। উজ্জ্বল নীল চক্ষু, কোঁকড়া কেশের গুচ্ছ, দুই চারিটা মুক্ত কেশ মুখে-চোখে উড়িয়া পড়িতেছে—ফুলের গায়ে যেন লতা-পাতার ঝালর দুলিতেছে! ছয় মাস আমি তাহাকে দেখি নাই! দীর্ঘ ছয় মাস!

আমার মৃত্যুতে জগতে তিনটি নারী অনাথা হইবে—পুত্রহারা, স্বামিহারা, পিতৃহারা—তিন অভাগিনী! আইনের একটি ইঙ্গিতে তাহাদের একমাত্র আশ্রয়টুকু ঘুচিয়া যাইবে!

আমার যে দণ্ড হইয়াছে, স্বীকার করি, তাহা ন্যায্য—তাহার জন্য দোষ দিতেছি না! কিন্তু এই অসহায়া নারীগুলি, ইহারা কি দোষ করিয়াছিল?

লোকের ঘৃণা বহিয়া যে দুর্ব্বিষহ জীবন বহন করিবে, তাহার জন্য ইহারা তো এতটুকু দায়ী নহে। তবু ইহারই নাম বিচার। এবং ইহাই সে বিচারের চূড়ান্ত ব্যবস্থা!

বৃদ্ধা মাতার জন্য আমি কাতর নহি। তাঁহার জীর্ণ দেহটুকু ধূলিসাৎ করিবার পক্ষে এ আঘাত পর্য্যাপ্ত!

স্ত্রীর জন্য চিন্তা নাই! সে চির-রুগ্না, শয্যা-শায়িনী! রোগে তাহার জীবন-দীপ নিব-নিব—এ সংবাদ একটি ফুৎকারের মত শেষরশ্মিটুকু নিবাইয়া দিবে! অবশ্য যদি সে পাগল হইয়া না যায়!

লোকে বলে, উন্মাদের জীবন দীর্ঘ হয়। হোক দীর্ঘ, তবু সে মৃত্যুর মত বিরাম দান করে, শান্তি বহিয়া আনে!

কিন্তু আমার কন্যা! এই শান্ত শিশু! আমাদের কন্যা মেরি! হাসি, খেলা, গান লইয়াই সে আছে যে। অভাগিনী জানে না, তাহার মাথার উপর আজ কি বিপদ উদ্যত হইয়াছে! বজ্রের শিখার মত তাহার জীবন জীর্ণ, দীর্ণ হইয়া যাইবে—এই চিন্তাই যে আমার বক্ষঃপঞ্জরগুলাকে চূর্ণ করিয়া দিতেছে!

## ১০

এখনও রাত্রি শেষ হয় নাই। চোখে ঘুম নাই! অন্ধকার কারা-গৃহ, বাহিরে এতটুকু সাড়াশব্দ নাই! এখন কি করিয়া সময় কাটাই? রাত্রির এই শেষ দণ্ডটুকু একান্ত দুঃসহ।

ঘরের কোণে দীপ জ্বলিতেছিল। তাহা লইয়া দেওয়ালের চারি পাশ দেখিতে লাগিলাম। কোথাও কি এতটুকু ছিদ্র নাই—বাহিরের স্নিগ্ধ বায়ু-প্রবেশের জন্য ছোট একটু পথ? না!

দেওয়ালে কত রকমের মূর্ত্তি আঁকা রহিয়াছে! সে কত কথা, কত ভাষা, কোনোটি খড়ির অক্ষর, কোনোটি বা কয়লার! আহা, আমার মত হতভাগ্য জীবগুলা মনের ব্যথা পাষাণের দেওয়ালে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে! তাহাদিগের মর্ম্মের সমস্ত বন্ধন টুটিয়া গিয়াছে! তবু এ পাষাণ-প্রাচীর সান্ত্বনাচ্ছলে একটি কথা বলে নাই! একটু ক্ষীণ প্রতিধ্বনিও নহে! মূক, নীরব পাষাণ এমনি দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদিগের ব্যাকুল কণ্ঠের আর্ত্ত স্বর সেই পাষাণের গায়ে ঠেকিয়া চূর্ণ হইয়া গিয়াছে!

তাহাদিগের বেদনার কথা কি—তাই দেখিতে লাগিলাম! একটা কাজ জুটিয়া গেল! তাহাদিগের এই অশ্রুমাখা বেদনার মালা গাঁথিয়া সময় কাটাইয়া দিই! তবু মৃত্যুর কথা দুই দণ্ডের জন্য ভুলিয়া থাকিব।

ঠিক আমার শয্যার পার্শ্বে দেওয়ালের গায়ে তীরে-গাঁথা দুইখানি শোণিতাক্ত হৃদয়! শিল্পী যেন আপনার হৃদয়-শোণিত দিয়াই তাহার মধ্যে রাখিয়াছে,—প্রাণ-ভরা ভালোবাসা। আহা বেচারা! এখানে বসিয়া সারা দিনরাত্রি শুধু ভালোবাসার কথাই ভাবিয়াছে! তাহার পাশে কয়লার অক্ষরে কে লিখিয়াছে, 'সম্রাটের জয় হোক্!' কি আশা, আশ্বাসের কি মহান্ আকাঙ্ক্ষা এই অক্ষর-গুলিতে মাখাইয়া দিয়াছিল!

একধারে কে লিখিয়াছে, আমি মাথিয়াকে ভালোবাসি! আর একধারে 'এ' অক্ষর—শুধু একটি সাদা খড়ির রেখা! অন্ধকারে রূপার অক্ষরের মত সেটি ফুটিয়া উঠিয়াছিল—'এ' বুঝি তাহার প্রাণের কোনো প্রিয়জন,—এমা, কিম্বা এডিথ! আহা, এই এক অক্ষরে একটি ব্যথিত কাতর প্রাণের কতখানি দীর্ঘনিশ্বাস রহিয়াছে!

আমি বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম! আমার এই নিঃসঙ্গ নির্জ্জন মুহূর্ত্তে পাষাণের দেওয়াল যেন করুণা করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে! সে তাহার পাষাণ বক্ষে এত মর্ম্মব্যথা, এত গোপন কথা লুকাইয়া রাখিয়াছিল! আজ কোথায় তাহারা, এই সব হতভাগ্যের দল? কোথায় তাহাদিগের মাথিয়া, এমা, এডিথ! কোন্ গোলাপকুঞ্জের আড়ালে, কোন্ বাতায়নের ধারে বসিয়া আকাশের পানে তাহারা আজ চাহিয়া আছে! তাহাদিগের এ বিদায়ের বেদনা ঘুচিয়াছে কি না, কে বলিয়া দিবে?

দীপ লইয়া দেখিতে লাগিলাম। দেওয়ালের কোণে এ কি! এ যে ফাঁসিকাঠের ছবি! কে আঁকিয়া রাখিয়াছে! মূঢ়, বর্ব্বর! এমন করিয়া মৃত্যুকে আবাহন করিয়া লইয়াছে! এই পৃথিবী, এই জীবন, তাহার কাছে কি এতই ভার বোধ হইয়াছিল? দুই খণ্ড কাঠ সোজা উঠিয়াছে। মাথায় আর একটা কাঠ লাগানো, মধ্যে দড়ি ঝুলিতেছে—একদৃষ্টে আমি তাহার দিকে চাহিয়াছিলাম! মাথা ঘুরিতে লাগিল। হাত হইতে দীপ পড়িয়া গেল! কক্ষ অন্ধকারে পূর্ণ হইল। কি সে গাঢ়, তীব্র অন্ধকার, যেন ছুঁচের মত গায়ে বিঁধিতেছিল। অবসন্নভাবে আমি মেঝের উপর বসিয়া পড়িলাম।

## ১১

ফিরিয়া দুই হাতে মাথা রাখিয়া আমি শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। প্রাণটা অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল—এই পাষাণ দেওয়ালের প্রত্যেক কথাটি জানিবার জন্য কি বিরাট আগ্রহ।

অন্ধকারে দেওয়াল হাতড়াইতে লাগিলাম! মাকড়সার জালে হাত জড়াইয়া গেল। জাল মুক্ত করিয়া শয্যার উপর বসিলাম! ঘুমে চোখ ভরিয়া আসিতেছিল। নিদ্রা ভাঙ্গিতে দেখি, কক্ষে অস্পষ্ট আলো আসিয়াছে। আবার সেই পাষাণ দেওয়ালের সম্মুখে দাঁড়াইলাম। দেওয়ালের কোণে চারিটি নাম লেখা,—দাঁতো, ১৮১৫; পুলেঁ ১৮১৮; জিন মার্টিন ১৮২১; কাস্তের্গ ১৮২৩। নামগুলার সহিত কি এক ভীষণ স্মৃতি মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল!

দাঁতো ভ্রাতৃহন্তা! পিশাচ পুলেঁ তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছিল! জিন মার্টিন বন্দুকের গুলিতে বৃদ্ধ পিতার মাথা উড়াইয়া দিয়াছে! আর কাস্তের্গ—ডাক্তার কাস্তের্গ বন্ধুকে বিষ দিয়াছিল!

আমার সমস্ত প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। তাহাদিগের শেষ নিশ্বাসে এ গৃহের বায়ু এখনও যেন বিষাক্ত রহিয়াছে! এই শয্যার উপর তাহারা তাহাদিগের রক্তমাখা হৃদয়ের শেষ কথা, শেষ চিন্তাটুকু ঢালিয়া গিয়াছে! এই ঘরের মধ্যেই তাহারা চলা-ফেরা করিয়াছে! আজও তাহাদিগের দীর্ঘশ্বাস এ ক্ষুদ্র ঘরটিকে তপ্ত রাখিয়াছে—শীতল হইবার অবসরটুকু দান করে নাই!

তার পর আমি তাহাদিগেরই পিছনে এখানে আসিয়াছি! তাহারা যেন চারিধার হইতে হাত নাড়িয়া আমাকে ডাকিতেছে—ঐ না কণ্ঠস্বর শুনা যায়! আমি চক্ষু মুদিলাম। তাহাদিগের মূর্ত্তি যেন আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

এ কি সত্য, না স্বপ্ন! না এ মতিভ্রম! খানিকটা জল পায়ে লাগিল। কি, এ? মাকড়সা। বড় একটা মাকড়সাকে আমি পা দিয়া চাপিয়া মারিয়াছি। ইহারই জাল আমার হস্তস্পর্শে ছিঁড়িয়া গিয়াছে! আমার চেতনা হইল। এতক্ষণ যেন মূর্চ্ছিত ছিলাম! কি সব ছায়ামূর্ত্তি আমার চারিধারে ঘুরিতেছে!

না, না! মনকে সুস্থ সবল করিতে হইবে। পলে পলে মৃত্যু-যন্ত্রণা! ইহার গ্রাস হইতে উদ্ধার পাইতে হইবে। দাঁতো পুলেঁর দল কবরের নীচে নিদ্রা যাইতেছে। তাহারা এখানে আসিবে না, কখনো না! বৃথা তাহাদিগের চিন্তায় অবশ হইয়া পড়ি কেন! এ কারা-গৃহ হইতে পলায়ন বরং সম্ভব, কিন্তু মাটীর নীচে কবর ভেদ করিয়া বাহির হওয়া একেবারে অসম্ভব! তবে কেন আমি মিছা ভয়ে সারা হই?

## ১২

উজ্জ্বল প্রশস্ত দিবালোক। কারার চারিধার হইতে একটা কোলাহলের ধ্বনি আসিতেছিল। প্রকাণ্ড ভারী দ্বারগুলা মুক্ত ও বন্ধ করিবার শব্দে, চাবীর ঝন্-ঝন্ আওয়াজে, চীৎকার-ধ্বনিতে চারিধার মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল! এই নীরস, কঠিন পাষাণ-গৃহ আজ কি উল্লাস-সঙ্গীতে সহসা ভরিয়া উঠিল! চারিধারে আনন্দ, কোলাহল, সজীবতা! তাহার মধ্যে আমিই শুধু নিরানন্দ উদাস!

দ্বারের পাশ দিয়া একটা প্রহরী চলিয়া গেল। ডাকিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—এত গোলমাল কেন? এত আহ্লাদ কিসের?

প্রহরী উত্তর দিল,—ওঃ, কয়েদীগুলার পায়ে আজ যে বেড়ি দেওয়া হইতেছে···কাল উহারা তুলোঁয় যাইবে। তুমি দেখিবে ?"

সন্ন্যাসীর মত এই বৈচিত্র্যহীন, অপ্রসন্ন, নিঃসঙ্গ জীবন আর বহা যায় না! দেখিবার লোভ আমি সংবরণ করিতে পারিলাম না।

অতিরিক্ত সতর্কভাবে প্রহরী আমাকে একটা ঘরে লইয়া চলিল। বসিবার জন্য ঘরটায় একখানি আসনও ছিল না, শুধু প্রকাণ্ড একটা জানালা! মুক্ত জানালা! তাহারই গরাদের মধ্যে দিয়া আজ কতদিন পরে অনেকখানি আকাশ দেখিয়া বাঁচিলাম!

প্রহরী কহিল,—এখান হইতে দেখিতে পাইবে! বাজার মত বসিয়া ছাখো, কাহারও ঘেঁষ সহিতে হইবে না!

বক্তব্য শেষ করিয়া বিরাট শব্দে দ্বারে তালা লাগাইয়া সে বাহির হইয়া গেল।

জানালা দিয়া বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ-ভূমি দেখা যাইতেছিল! প্রাঙ্গণের সীমা উচ্চ প্রাচীরে ঘেরা! পায়রার খোপের মত জানালা-ভরা প্রকাণ্ড দালান, তাহারই মাঝে মাঝে দেওয়াল! জানালাগুলা অসংখ্য নরশিরে ভরিয়া গিয়াছে! সকলেই কৌতুক দেখিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। মুখে-চোখে একটা আগ্রহের চিহ্ন—কৌতূহলের বিরাট রেখা! নরকের প্রেতগুলা যেন একটু ফাঁক পাইয়া বাহিরের মুক্ত বায়ু ও আলো দেখিয়া আজ আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়াছে! প্রাঙ্গণের দিকেই সকলে চাহিয়াছিল। আর কিছু দেখিবার অবসর কাহারও ছিল না।

বারোটা বাজিল। কোণের ফটক খুলিল। অসংখ্য নূতন মূর্ত্তি আসিয়া রঙ্গস্থলে দেখা দিল। নিমেষে সেই মূক মৌন কারাগার বিচিত্র কলরবে মুখর হইয়া উঠিল। চারিদিকে একটা জীবনের সাড়া পড়িয়া গেল। উচ্চ হাস্য ও চীৎকারধ্বনি মুহূর্ত্তে স্থানটিকে আনন্দ-পরিপূর্ণ ক্রীড়া-ভূমিতে পরিণত করিল। যেন দৈত্যের দল ছুটী পাইয়া আজ হর্ষে মাতিয়া উঠিয়াছে!

বন্দীদলের নত দৃষ্টি, প্রহরীগুলার বীরদাপ—সমস্ত মিলিয়া একটা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিল।

বন্দীদিগের নাম ডাকা হইল। কি তাহাদিগের অপরাধ, দণ্ডের পরিমাণই বা কি। দণ্ডের পরিমাণ যাহাদিগের অধিক, তাহাদিগের নাম-ডাকের সহিত উচ্চ জয়ধ্বনি উঠিতে লাগিল। উৎসুক উদ্‌গ্রীব দর্শকের দল মনের আবেগ ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না! বন্দীর দল সৈন্যের মত যেন আজ যুদ্ধ জয় করিয়া ফিরিয়াছে, তাই এ বিরাট উল্লাসের উন্মাদ চীৎকার! দুই একজন দর্শক আনন্দে ডিগবাজী খাইল!

তার পর বন্দীর দলে পরস্পরে আলাপ-পরিচয় আছে কি না, তাহার সন্ধান হইল। যদি থাকে, তবে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া দাও, একসঙ্গে রাখিয়ো না! দণ্ডের কঠোরতা তাহা হইলে হ্রাস পাইবে এবং তাহা হইলে, তাহারা দিব্য আমোদ-আহ্লাদে দিন কাটাইয়া দিবে!

চারিদিককার এই বিচিত্র কলরব আমার নিকট অখণ্ড রাগিণীর ঝঙ্কারের মত ভাসিয়া আসিতেছিল। সে যেন কোন্ মায়া-লোকের বিচিত্র সঙ্গীতধ্বনি! কিন্তু নিতান্তই অর্থহীন, লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন রাগিণী! মৃদু বায়ু আমার তপ্ত ললাট স্পর্শ করিতেছিল। রৌদ্রের মধ্য দিয়া স্নিগ্ধ আশার রশ্মি যেন ফুটিয়া উঠিতেছিল। মনে হইতেছিল, ইহাই তো জীবন! এই রৌদ্র-কিরণ, মুক্ত বায়ু, উদার আকাশ,—এ সব হইতে দূরে থাকা—সেই তো মৃত্যু!

রৌদ্রটুকুও বায়ুর মত সরিয়া গেল! কে যেন তাহার উপর একটি সূক্ষ্ম কালো পরদা টানিয়া দিল। বিহঙ্গ-পক্ষের মত লঘু মেঘ পৃথিবী ও রৌদ্রের মধ্যে একটি স্বচ্ছ ব্যবধানের সৃষ্টি করিল। স্বপ্নের কুহক-জালের মত ঈষৎ নিবিড় ছায়া আসিয়া আলোকটুকুর গতি রোধ করিল। সহসা দুই এক পশলা বৃষ্টিও হইয়া গেল! প্রাঙ্গণ হইতে দর্শকের দল সরিয়া পড়িল। নীড়হারা পাখীর মত অসহায়ভাবে বন্দীর দল ভিজিতে লাগিল। দুই-একজন কাঁপিয়া উঠিতেছিল! তবুও নিস্তার নাই! কারণ, তাহারা যে বন্দী, তাহাদিগের আবার আরাম কি! স্বস্তি কি!

বৃষ্টি থামিলে প্রহরীরা শৃঙ্খল টানিয়া আনিল! পিছনে কামারের দল! বন্দীগুলিকে বসাইয়া দেওয়া হইলে শৃঙ্খল আঁটিয়া কামার তাহাতে মুগুরের ঘা দিল। কি পিশাচ, নিষ্ঠুর!

কেহ ভূমে লুটাইল, কেহ কাঁদিয়া উঠিল! প্রহরী-দলের গুঁতায় আদব-কায়দা আবার তখনই রক্ষা পাইল!

নিশ্চল পাষাণের মত দাঁড়াইয়া আমি সব দেখিলাম। তার পর ডাক্তারের পরীক্ষা!

তখন মেঘ কাটিয়া গিয়াছে। আবার সূর্য্যের আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে! কালো পরদাটি কে যেন দুই হাতে সরাইয়া লইয়াছে! ভিতর হইতে বন্দীর দলে কেহ শিষ দিল—কেহ-বা এক ছত্র গান গাহিয়া উঠিল!

তার পর সারি দিয়া সকলে বসিয়া গেল। এবার ভোজনের পালা। আহার্য্য আসিল। বড় বড় বাল্‌তি, তাহার মধ্যে সবুজ রঙের কি একটা জলীয় পদার্থ! এগুলায় স্বাদ নাই, গন্ধ নাই। যাহারা ভুক্তভোগী, তাহারা জানে, এ কি পদার্থ।

তবু তাহারা—বেচারা ক্ষুধিতের দল—তৃপ্তির সহিত তাহারই সদ্ব্যবহারে ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

আগ্রহের সহিত আমি সব দেখিতেছিলাম, কোনো জ্ঞান ছিল না। করুণায় আমার সমস্ত চিত্ত ভরিয়া উঠিয়াছিল। চোখে জল আসিয়াছিল।

সহসা একটা উচ্চ চীৎকার-ধ্বনি শুনিলাম, ওঠো, চলো। বন্দীর দলে কোলাহল পড়িয়া গেল। সকলে দাঁড়াইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে সকলে চলিতে আরম্ভ করিল।

আমার জানালার পাশ দিয়া তাহারা চলিতেছিল। আমাকে দেখিয়া একবার দাঁড়াইল। আমার বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। আমি যেন পশুশালার পশু! এমন করিয়া আমাকে দেখিতে হইবে!

একজন কহিল,—ফাঁশির আসামী ছাখো—ইহার ফাঁশি হইবে। চারিধারে একটা হাসির হল্লা পড়িয়া গেল। বর্ব্বর!

আমার মাথা ঘুরিয়া উঠিল! মনে হইতেছিল, আমি যেন শূন্যে ঝুলিতেছি!

কি করিয়া ইহারা জানিল যে, আমার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হইয়া গিয়াছে!

—বিদায়, বিদায়, বন্ধু!—নির্লজ্জভাবে তাহারা চীৎকার করিয়া উঠিল! একজন কহিল, "আমার চেয়ে ভালো—শীঘ্র ছুটী মিলিবে! আমাকে চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া জেলে পচিতে হইবে।

আমার কোনো চেতনা ছিল না। নড়িবার শক্তিটুকু অবধি নয়। আমার চোখের সম্মুখ দিয়া জলের স্রোতের মত বন্দীর দল চলিয়া গেল।

সহসা চেতনা ফিরিলে আমি শিহরিয়া উঠিলাম। ভাবিলাম, এই জানালার বাহিরে কত আলো, কত আনন্দ,—আর ভিতরে বায়ু, আলো, প্রাণ—সকলই রুদ্ধ। যদি এই গরাদগুলা না থাকিত! আঃ! গরাদ ধরিয়া প্রাণপণ বলে একবার নাড়া দিলাম! একটুও নড়িল না। আমিই আঘাত পাইলাম! অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিয়া আমি গর্জ্জিয়া উঠিলাম! রাগে, ক্ষোভে, আমার অন্তরখানা বিদীর্ণ হইবার উপক্রম করিতেছিল।

দূর হইতে কোলাহলের একটা অস্পষ্ট ধ্বনি আসিতেছিল। আমি জানালার গরাদ ধরিয়া বসিয়া পড়িলাম। দূরের কোলাহল ক্রমে আমার কর্ণে ক্ষীণ হইয়া আসিল। আলোটুকুর উপর কে যেন আবরণ টানিয়া দিতেছিল—একটা অস্ফুট চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইলাম।

## ১৩

যখন চোখ চাহিলাম, তখন রাত্রি হইয়াছে। নেয়ারের খাটে আমি শুইয়াছিলাম। আলো জ্বলিতেছে। প্রকাণ্ড ঘর, বিছানার সারি। তখন বুঝিলাম, আমি হাঁসপাতালে আসিয়াছি। চারিধার নিস্তব্ধ।

কিছুক্ষণের জন্য আমার জ্ঞান ছিল না। আমি স্পষ্ট জাগিয়া আছি, কিন্তু চেতনা নাই, কিছু মনে পড়ে না! কিছুকাল পূর্ব্বে কারাগৃহের মধ্যে এই হাঁসপাতালটি আমার নিকট কি ঘৃণার স্থান ছিল! আজ আর আমি সে লোক নহি। অপরিচ্ছন্ন মোটা চাদর, রোগের একটা তীব্র বিকট গন্ধ—চারিধারে পরিপূর্ণ অশান্তি, কি এক বিভীষিকা। চক্ষু মুদিলাম—নিদ্রার শীতল স্পর্শে সকল জ্বালা জুড়াইল!

সহসা ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল! উজ্জ্বল দিবালোক। বাহির হইতে কোলাহল শুনা যাইতেছিল! জানালার ধারে আমার বিছানা। বিছানায় বসিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখি, কয়েদীর দল কাছে বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে। তাহাদিগের পায়ের বেড়ির ঝনঝন্ শব্দে চারিধার মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। শুনিলাম, ভোরে একজনের ফাঁশি হইয়া গিয়াছে। উৎসুক দর্শকের দল তাহা দেখিয়া আসিয়া গগনভেদী উল্লাস-ধ্বনি তুলিতেছিল, এ কোলাহল তাহারই। নির্লজ্জ পাষণ্ড লোক সব! এই নিষ্ঠুর মৃত্যু দেখিয়া আনন্দে উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছে! তোমাদের মাথায় পড়িবার জন্য আকাশে বাজ নাই?

## ১৪

শীঘ্রই আমি সুস্থ হইয়া উঠিলাম, এমনই আমার দুর্ভাগ্য! হাঁসপাতাল ছাড়িতে হইল। আবার সেই বন্দীশালার রুদ্ধ কক্ষ! আমারই দীর্ঘনিশ্বাসের তপ্ত বায়ুতে সে কক্ষ ভরিয়া রহিয়াছে! চারিদিকে নিরাশা ও বিষাদের নিরানন্দ বিমর্ষ ভাব। সেই কক্ষে জীবনের শেষ মুহূর্ত্তগুলা কাটিবে!

কোনো অসুখ নাই! এই তরুণ, সুস্থ, সবল দেহ, রোগের গ্রাসে তাহা জীর্ণ হইবে কেন? শিরায়

মধ্য দিয়া তপ্ত রক্ত বহিয়া চলিয়াছে। এমন বুদ্ধি, এমন স্বাস্থ্য, মনটা তবু এক ভীষণ কীটের দংশনে পলে পলে জ্বলিয়া সারা হইতেছে।

হাঁসপাতাল হইতে ফিরিয়া আসিবার পর একটা কথা কেবলই মনে হইতেছে—সেখান হইতে পলায়নের সুযোগ ছিল। সে সুযোগ, মূর্খ আমি, কেন ছাড়িলাম! কি সহজ সুন্দর সে সুযোগটুকু! রাত্রির নিস্তব্ধ অন্ধকারে চুপি চুপি বাহির হইয়া পড়িলেই—কি সে মুক্ত স্বাধীনতার উদার বাতাস মিলিত! মাথার মধ্যে শিরাগুলা উত্তেজনায় দপ্ দপ্ করিয়া উঠিল। চোখের সম্মুখে চারিধারে নীল গোলার মত কি সব ভাসিয়া ভাসিয়া উঠিতে লাগিল!

যদি পলাইতাম! আহা! তাহাতে ইহাদেরই বা কি এমন ক্ষতি হইত! আপিলে যদি মুক্তিলাভ করি? কিন্তু সে সম্ভাবনাই বা কোথায়? সাক্ষীর দল হলফ্ করিয়া সকল কথা বলিয়াছে—শুনানীর চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে। এখন আপিলে কি ফল হইবে? কিছু না। হায়, সকলই বৃথা। নাই, কোনো আশা নাই! ফাঁশির রজ্জুই আমার শেষ নিশ্বাসবায়ুটুকু রোধ করিয়া দিবে। আপিলের ক্ষীণ আশা-সূত্র—কি তাহার বল!

যদি আজ ক্ষমা মিলিয়া যায়! ক্ষমা? কিন্তু কেন মিলিবে! এই যে অসংখ্য হতভাগ্যের দল! মোট বহিয়া, বেড়ি টানিয়া জেলে পচিতেছে,—কদর্য্য অন্নে ক্ষুধার শান্তি হইতেছে! কোথায় তাহাদিগের স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু? কোথায়ই বা তাহাদিগের গৃহ? তাহারা এই যাতনা সমানে ভোগ করিবে, আর আমি ক্ষমা লাভ করিয়া আনন্দে গৃহে ফিরিব! কেন, কি জন্য তাহারা আমাকে ক্ষমা করিবে? অন্যায় দৃষ্টান্তে দেশের লোকের বিপদ যে তাহাতে আসন্ন হইয়া উঠিবে! ক্ষমা নহে, ফাঁশি! ফাঁশিই আমার মুক্তির একমাত্র উপায়।

## ১৫

যদি পলাইতাম! সবুজ মাঠের উপর দিয়া, ছোট পাহাড় ঘুরিয়া, নদী-বন অতিক্রম করিয়া কোথায় কোন্ অজানা দেশের অভিমুখে ছুটিয়া চলিতাম! কাহারও মুখের দিকে চাহিতাম না, কাহারও দ্বারে আশ্রয় মাগিতাম না, এক মুষ্টি অন্নও না! গাছের ফলে ক্ষুধা, নদীর জলে তৃষ্ণা মিটানো, পাখীর গানে বিশ্রাম, তরুর তলে নিদ্রা! লোকালয়ে? না। যদি কেহ সন্দেহ করে? যদি ধরে? ছুটিতাম না! তাহাতে সন্দেহ জন্মাইতে পারে! মৃদু শান্ত পদক্ষেপে কত গ্রাম-নগর অতিক্রম করিয়া যাইতাম, তাহার সংখ্যা নাই। একটি ছদ্মবেশ সংগ্রহ করিয়া লইতাম! গ্রামের প্রান্তে এক নিবিড় ঝোপ আছে—সেইখানে গিয়া প্রথমে বিশ্রাম লইতাম! সেই ঝোপে কত শ্যাম সন্ধ্যা, কত শান্ত প্রভাত কাটাইয়া দিয়াছি! শৈশবে লুকাচুরি খেলা, সঙ্গীর দল লইয়া আনন্দে হুড়াহুড়ি! কি সে সুখের দিন! আজ সেই অতীতের একটি মুহূর্ত্ত, যদি নিমেষের জন্য ফিরাইয়া পাই!

আবার যখন আঁধার নামিবে, তখন পথে বাহির হইব! ভিন্সেনে যাইব! না! পথে নদী আছে, পার হইবার সময় বিঘ্ন ঘটিতে পারে! তবে, আর্পাজনে! না, বোধ হয়, সেণ্ট জার্মেণে গেলেই ভালো হয়। সেখান হইতে হেভার, হেভার হইতে ইংলণ্ড। কিন্তু সে সময় যদি পুলিশে ধরিয়া ফেলে? যখন ছাড়পত্র চাহিবে? তবেই বিপদ!

হারে হতভাগ্য, স্বপ্নভ্রান্ত জীব, এই তিন ফুট মোটা দেওয়াল অতিক্রম করাই যে দুঃসাধ্য ব্যাপার, অসম্ভব! তাহা হইলে, নাই, উপায় নাই,—মৃত্যু, মৃত্যুই আমার প্রিয়সুহৃৎ!

সোনার শৈশবের কথা মনে পড়িতেছে! যখন বালক ছিলাম, তখন কতবার এই জেলের ধারে ফাঁশি দেখিতে আসিয়াছি,—সে কি ভিড় জমিত! আর আজ!

## ১৬

দীপের আলো ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে! এখনই প্রভাত হইবে! গির্জ্জার বড় ঘড়িতে ছয়টা বাজিয়া গিয়াছে।

প্রহরী আসিয়া ধীরে ধীরে মাথার টুপি খুলিয়া অভিবাদন করিল। নম্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আমার কিছু খাইবার সাধ আছে কি না! আশ্চর্য্য! এমন বিনয়-নম্র ব্যবহার!

আমার সারা অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল! তবে কি আজই···?

## ১৭

হাঁ, আজ! কারাধ্যক্ষ স্বয়ং আসিয়াছিল! আমি কি চাহি, না চাহি, তাহারই সন্ধান করিতেছিল! আরও সে জিজ্ঞাসা করিল, কোনো ভৃত্য বা প্রহরী আমার মর্য্যাদার হানি করে নাই তো? আমার স্বাস্থ্য কেমন, রাত্রে নিদ্রা হইয়াছিল কি না? আমাকে 'স্যর' বলিয়া সে সম্বোধন করিল। কোন সন্দেহ নাই। আজ—আজই তবে সেই স্মরণীয় দিন! যে দিনের কথা মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিতে পারি নাই!

## ১৮

কারাধ্যক্ষ বা তাহার লোকজন—কাহারও যে কোনো ত্রুটি থাকিতে পারে, এ কথা সে মোটে বিশ্বাসই করিবে না। ঠিক কথা! ত্রুটির কথা তোলাই অন্যায়!

তাহারা কর্ত্তব্য করিয়াছে মাত্র! সতর্কভাবে তাহারা আমার প্রহরীর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে, আমার প্রতি কোনো পরুষ আচরণ করে নাই। আমার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট সন্তোষের কারণ নহে কি?

আর এই কারাধ্যক্ষ—এই ভদ্রলোকটি! মৃদু হাস্যের সহিত শান্ত আলাপ, সতর্ক অথচ প্রীতিমধুর দৃষ্টি, দীর্ঘ বলিষ্ঠ বাহু—কারাগৃহের প্রতিবিম্ব বলিলে চলে—পাষাণ-কারা যেন মানুষের মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! চারিধারে কারাগৃহের সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব! লোকজন, লৌহ-গরাদ, প্রস্তর-দেওয়াল,—সর্ব্বত্র! চাবি-তালাগুলাকে পর্য্যন্ত যেন রক্ত-মাংসের জীব বলিয়া মনে হয়। সকলে মিলিয়া আমাকে পাহারা দিতেছে! আর এই কারা-গৃহ,—নিষ্ঠুর কারা-গৃহ, অর্দ্ধ প্রস্তর ও অর্দ্ধ মানবদেহ-বিশিষ্ট প্রাণীরই স্বরূপ মূর্ত্তি। আমাকে চাপিয়া ধরিয়াছে, চারিধার হইতে জড়াইয়াছে, বাঁধিয়া রাখিয়াছে! লৌহ হৃদয় লইয়া আলিঙ্গন করিতে আসিয়াছে! দরিদ্র, হতভাগ্য আমি, আমাকে লইয়া আজ ইহারা কি করিবে?

## ১৯

শান্ত চিত্ত। কোনো ভাবনা নাই, দ্বিধা নাই! জেলের কর্ত্তা আসিয়া দেখিয়া গিয়াছেন—তাঁহার সহিত সাক্ষাতের পর-মুহূর্ত্ত হইতে ভালোই আছি! পূর্ব্বে মনে যে আশা রাখিতাম, এখন সেটুকুও যে ছাড়িতে পারিয়াছি, ইহা শুধু তাঁহারই বচনে!

সাড়ে ছয়টা—কি পৌনে সাতটা। সহসা আমার কক্ষের দ্বার মুক্ত হইল। পলিত-কেশ একটি লোক ভিতরে প্রবেশ করিলেন; আসিয়াই তাঁহার প্রকাণ্ড ভারী কোট খুলিয়া বসিলেন। পোষাক দেখিয়া বুঝিলাম, ইনি আচার্য্য-মহাশয়।

আমার সম্মুখে তিনি বসিলেন; মাথা নাড়িয়া আকাশের দিকে একবার চাহিলেন। এ দৃষ্টির অর্থ বুঝিতে আমার বিলম্ব হইল না! তিনি কহিলেন,—তুমি প্রস্তুত হইয়াছ, বৎস?

অস্বচ্ছ কণ্ঠে আমি কহিলাম,—প্রস্তুত ঠিক হই নাই,—তবে হাঁ, এখনই উঠিতে সম্মত আছি।

আমার দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটিতেছিল! প্রস্তুত,—একেবারে প্রস্তুত,—কিন্তু কিসের জন্য? আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। প্রাণের মধ্যে একটা বিকট শব্দ ধ্বনিয়া উঠিল।

আচার্য্য অনেক কথাই বলিতেছিলেন,—তাঁহার ঠোঁট নড়িতেছিল, হাত পা ঘাড়ও সেই সঙ্গে নড়িতেছিল। তিনি কি বলিতেছিলেন, তাহা জানি না, কারণ, কোনো কথাই মনের মধ্যে পৌঁছিতেছিল না।

আবার দ্বার খুলিল। এইবার জেল-কর্ত্তা স্বয়ং সশরীরে উপস্থিত। গায়ে দীর্ঘ কালো কোট, হাতে এক বাণ্ডিল কাগজ··মুখে তিনি বিষাদের দাগ টানিবার চেষ্টা করিলেন।

জেলকর্ত্তা কহিলেন,—আদালত হইতে সংবাদ আসিয়াছে। একটা তড়িৎশিখা আমার হৃদয়ের ভিতর দিয়া বহিয়া গেল।

আমি কহিলাম, কি! আদালত কি এখনই আমার মাথাটা চায়! সে-তো আমার পক্ষে গৌরবের কথা! এ মাথার উপর সরকারী উকিলের বিলক্ষণ লোভ, তাহা জানি, বেশ—আমি প্রস্তুত।

তিনি কাগজের ভাঁজ খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন,··· আদালতের চির-জটিল অস্পষ্ট বর্ণাক্ষরমালা—কতকগুলা বিকট দীর্ঘ শব্দের ঝঙ্কার—অনেক কষ্টে অর্থ বাহির করিতে হয়! আধ ঘণ্টা কাগজ ঘাঁটিবার পর অর্থ বুঝা গেল,—আমার আপিল প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে!

তিনি কাগজ হইতে মাথা না তুলিয়া এক নিশ্বাসেই বলিয়া গেলেন,—প্লে দি গ্রীভে ফাঁশি হইবে। সাড়ে সাতটায় আমরা কাঁসিয়ারজারি জেলে যাইব। অনুগ্রহ করিয়া অনুসরণ করিবেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত কাহারও কথায় আমি কান দিই নাই। জেলের কর্ত্তা ও আচার্য্যে বেশ গল্প জমিয়াছিল—দেশের ও দশের কথায় তাঁহারা মাতিয়া উঠিয়াছিলেন!

এমন সময় দ্বার খুলিয়া চারিজন সশস্ত্র প্রহরী ভিতরে আসিল! তাহারা যেন যমদূত! অভিবাদন করিয়া তাহারা জানাইল,—সময় হইয়াছে।

আমি কহিলাম,—বেশ, আমি প্রস্তুত—চলো!

তাহারা কহিল, আধ ঘণ্টার মধ্যেই যাত্রা করিতে হইবে! তার পর সকলে বাহির হইয়া গেল।

এখন একবার শেষ চেষ্টা! ভগবান, সত্যই কোনো আশা নাই?

পলাইব, আমি নিশ্চয় পলাইব! দ্বার, জানালা, ছাদ ভেদ করিয়া, যেমন করিয়া পারি, পলাইব। দেহের মাংসগুলাকে যদি রাখিয়া যাইতে হয়, তবু এই অস্থিকয়খানা লইয়া পলাইব!

কোথায় এমন যন্ত্র? অস্ত্র? রাক্ষসের মত বলে উদ্যমে যন্ত্রপাতি লইয়া যদি লাগিয়া যাই, তথাপি এ দেওয়াল ভাঙ্গিতে এক মাস সময় লাগিবে! কিন্তু আমার হাতে একটি পেরেক অবধি নাই! হা রে দুর্ভাগ্য, একান্ত দুরাশা!

## ২০

আমি কাঁসিয়ারজারি জেলে আসিয়াছি। নিজের ইচ্ছায় নয়—সতর্ক প্রহরিবেষ্টিত বন্দী অবস্থাতে আসিয়াছি। পথের কথাটুকু বলিবার মত।

সাড়ে সাতটার সময় আমার প্রহরী আসিয়া সেলাম করিয়া কহিল, সঙ্গে আসুন মশায়।

আদব-কায়দায় কোনো ত্রুটি নাই। আমি উঠিয়া তাহার অনুসরণ করিলাম। মাথা এমনই ভার বোধ হইতেছিল, আর পা দুটা এত দুর্ব্বল যে চলা যায় না! তবু চেষ্টা করিয়া চলিলাম। বাহির হইতে একবার আমার নির্জ্জন ঘরটির দিকে চাহিলাম। এত দিনের আশ্রয়—কেমন একটা মায়া পড়িয়া গিয়াছিল! আজ তাহা শূন্য রাখিয়া চলিলাম,—কি বিচিত্র দৃশ্য! কিন্তু অধিক ক্ষণের জন্য নয়। সন্ধ্যার সময় আবার এক নূতন অতিথি আসিয়া সে শূন্য ঘর পূর্ণ করিবে!

প্রাঙ্গণের সম্মুখে আচার্য্য বসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার আহার শেষ করিতেছিলেন। জেল-কর্ত্তা আমার করকম্পন করিলেন। তার পর চারিজন সশস্ত্র প্রহরীর দ্বারা বেষ্টিত হইয়া আমি চলিলাম।

হাঁসপাতাল হইতে একটি লোক অভিবাদন করিল। তখন আমি মুক্ত প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম! কিন্তু কতক্ষণের জন্য!

বাহিরে গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। সেই গাড়ী—যাহাতে চড়িয়া এখানে আসিয়াছিলাম। লম্বা গাড়ী, ভিতরটা রেলিঙ দিয়া দুই ভাগে বিভক্ত! যেন লোহা দিয়া কে মাকড়সার জাল বুনিয়াছে! দুইটি ঘরের স্বতন্ত্র দ্বার—একটি পিছনে, অপরটি সম্মুখে। গাড়ীর মধ্যে যেমন অন্ধকার, তেমনই ধূলা ও আবর্জ্জনার রাশি! ইহার তুলনায় আমার সে নির্জ্জন ঘর, সে ছিল প্রাসাদ-কক্ষ! এই কবরে জীবন্ত সমাধি-লাভের পূর্ব্বে বাহিরের দিকে একবার প্রাণ ভরিয়া চাহিয়া লইলাম। এই মুক্ত গগনের স্মৃতি লইয়া আঁধার সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হইবে! দ্বারের সম্মুখে দর্শকের দল সার দিয়া দাঁড়াইয়াছিল! টিপ-টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। বোধ হয় সারাদিনে এ বৃষ্টির বিরাম হইবে না! পথ ও প্রাঙ্গণ কাদায় ভরিয়া গিয়াছে। চারিধারে একটা বিমর্ষ ভাব!

গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। সম্মুখে সর্দ্দার প্রহরী ও সশস্ত্র প্রহরীর দল এবং আচার্য্য···পশ্চাতের কামরায় আমি একলা!

বাহিরে অশ্বপৃষ্ঠে আর চারিজন প্রহরী গাড়ীর সহিত চলিল। আমাকে পাহারা দিবার জন্য আটজন সশস্ত্র প্রহরী এবং তদতিরিক্ত লোকজন তো ছিলই! রাজার হালে চলিয়াছি!

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। জলে রাস্তার পাথর বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ঘোড়ার খুরে খট্‌খট্ শব্দ উঠিতেছিল।

পশ্চাতে সশব্দে জেলের ফটক বন্ধ হইল। সে শব্দও নিলাম। আমি যেন তন্দ্রাবিষ্ট হইয়াছিলাম—কোনো ভয় বা ভাবনা ছিল না! যেন আমার জীবন্ত কবর হইয়া গিয়াছে, এমনই ভাব! ঘোড়ার গলায় ঘণ্টা বাঁধা ছিল। গাড়ীর চাকা ও ঘোড়ার খুরের শব্দ একত্র মিলিয়া বেশ একটি বিচিত্র রাগিণীর সৃষ্টি করিল। যেন ঝড়ের পিঠে চড়িয়া কোথায় আমি নিরুদ্দেশ যাত্রায় বাহির হইয়াছি! যেন কোন্ স্বপ্নলোকে, ঘুমন্ত কোন্ পরী-কন্যার সন্ধানে চলিয়াছি!

গাড়ীর মধ্যকার ছিদ্র দিয়া পথ দেখিতে দেখিতে চলিলাম। এক জায়গায় প্রকাণ্ড অক্ষরে বৃদ্ধদিগের জন্য হাঁসপাতাল লেখা রহিয়াছে। এ জগতে লোকে বৃদ্ধ হইবার অবকাশ তবে পায়! আশ্চর্য্য, সন্দেহ নাই। এই তো আমার তরুণ বয়স। কিন্তু যাক্ সে কথা!

গাড়ী মোড় ঘুরিল। দূরে নোতর-দামের চূড়া দেখা গেল। পারি সহরের কুয়াশা ভেদ করিয়া গগনস্পর্শী চূড়া উঠিয়াছে। আমি ভাবিলাম, বাঃ, উহার উপর হইতে চারিধারটা একবার দেখিয়া লইলে হয়!

আচার্য্য নূতন করিয়া আলাপ সুরু করিলেন। তিনি অনর্গল বকিয়া চলিলেন। বাধা দিবার কেহ ছিল না। আমি সে কথায় কর্ণপাত করি নাই! আচার্য্যের গল্পের চেয়ে ঘোড়ার খুরের শব্দে বেশী মধুরতা ছিল! চারিধারে বিচিত্র কোলাহল। মাত্রা আর একটু বাড়িলে ক্ষতি কি!

সমস্ত শব্দ কানে আসিয়া পৌঁছিতেছিল! কিন্তু কোনোটি স্বতন্ত্রভাবে নহে; বেশ একটি মিশ্র রাগিণীতে—নির্ঝরের ধারাপাতের মত।

সহসা শুনিলাম, আচার্য্য বলিতেছেন,—কি বিশ্রী গাড়ী,—একটা কথা যদি শুনিবার জো থাকে!

কথাটি সত্য - খাঁটি সত্য, এতটুকু অতিরঞ্জিত নহে।

আচার্য্য কহিলেন,—তুমি বোধ হয় আমার কথা শুনিতে পাইতেছ না! কি বলিতেছিলাম,—হাঁ, ভালো কথা, কিসের সংবাদে পারি আজ সরগরম, জানো?

আমি শিহরিয়া উঠিলাম! নূতন সংবাদ আবার কিছু আছে নাকি? বোধ হয়, আমার কথা লইয়াই পারিতে হুলস্থূল বাধিয়া গিয়াছে।

আচার্য্য কহিলেন,—কাগজখানাও সন্ধ্যার আগে দেখিবার সুবিধা হইবে না! সন্ধ্যার পর আমি খপরের কাগজ পড়ি, একেবারে দিনের শেষ খপরটি অবধি পাওয়া যায়—তাহাতে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

সর্দ্দার প্রহরীর কথা ফুটিল। সে কহিল,—কি? এমন মজার খপর শোনেন নাই, এখনও?

আমি কহিলাম,—আমি জানি, বোধ হয়!

সে কহিল,—আপনি জানেন? আশ্চর্য্য! কি বলুন দেখি!

তুমি শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছ ?

সে কহিল, কেন মশায় ? রাজ্যের কথায় সকলের একটা মত আছে ! তা সে যে-ই হোক্ না কেন ! আপনি কয়েদী, তাহাতে কি আসিয়া যায় ? আমি ন্যাশন্যাল গার্ডের দিকে। ছেলেবেলায় তাহাদের দলে কাপ্তেনী করিয়াছি। ভারী ভালো লাগিত !

আমি বাধা দিয়া কহিলাম,—না মশায়, আমি অন্য কোন সংবাদ মনে করিয়াছিলাম।

সে কহিল,—তাই নাকি ! বলেন কি আপনি ? আপনি জানিলেন কি করিয়া ? কে আপনাকে সংবাদ দিবে ? বলুন তো, আবার কি খবর ? শুনি !

আচার্য্য কহিলেন,—তুমি কি মনে করিয়াছিলে ?

আমি কহিলাম,—সন্ধ্যার পর আমার আর মনে করিবার কিছু থাকিবে না, এই কথাই ভাবিতেছিলাম !

আচার্য্য কহিলেন,—আহা ! বড় দুঃখে, দুর্ভাবনায় তোমার সময় কাটিতেছে,—কি করিবে, বলো ! ইহার মধ্যে মনটাকে ভালো রাখিবার চেষ্টা কর !

সর্দ্দার প্রহরী কহিল,—আপনি একেবারে মনমরা হইয়া পড়িয়াছেন—কাস্তের্গ সারা পথ রসের গল্পে হাসাইয়া রাখিয়াছিল !

তার পর সে আপনার প্রতিপত্তির কথা তুলিল, পাপাভোঁর সঙ্গে সে গিয়াছিল—সারা পথ সে কি চুরুট ফুঁকিয়াছিল। তার পর স্কুলের সেই ছোকরাগুলা—বকিয়া, চীৎকার করিয়া কাণ ঝালাপালা করিয়া দিয়াছিল।

আচার্য্য কহিলেন,—পাগলের দল ! বেচারারা বুদ্ধির দোষে কষ্ট পায় বৈ তো নয়। কিন্তু মশায়,—আপনাকে বড় বিমর্ষ দেখিতেছি ! এত অল্প বয়স আপনার—

আমি কহিলাম—স্বরে বেশ একটু তীব্র রস ঢালিয়া দিলাম—কহিলাম,—অল্প বয়স ! বলেন কি ? আপনার চেয়ে আমি বড়। প্রতি ঘণ্টায় আমার দশ বৎসর করিয়া আয়ু বাড়িতেছে।

আচার্য্য কহিলেন,—তামাসা ! তাই ভাল। আমি তোমার পিতামহর বয়সী।"

আমি গম্ভীরভাবে কহিলাম,—তামাসা নয়। আমার ধারণাই তাই !

আচার্য্য নস্যদানি বাহির করিয়া ডালা খুলিলেন। কহিলেন,—রাগ করি না—ভাই, বুঝিলে ?

আমি কহিলাম,—না, না, রাগের কথা নয়। আমি রাগ করি নাই !"

এমন সময় গাড়ীর ধাক্কায় তাঁহার নস্যদানি উল্টাইয়া গেল। সমস্ত নস্যটুকু পড়িয়া গেল। শশব্যস্তে নস্যদানি তুলিয়া আচার্য্য কহিলেন,—যাঃ, সব পড়িয়া গিয়াছে। এখন উপায় ?

আমি কহিলাম,—"সহিয়া থাকুন—তুচ্ছ একটু আরাম সুখ,—আমাকে দেখিয়া সহ্য করিতে শিখুন।

আচার্য্য গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—রাখিয়া দাও তোমার সহ্য করা ! তোমার কি কষ্ট হে, বাপু ! বুড়া মানুষ—নস্য না লইয়া এতটা পথ থাকি কি করিয়া ? হায়, হায়, হায় !

আশ্চর্য্য ! আমার এ কষ্টের তুলনায় আচার্য্যের কষ্ট আরও বেশী ! মানুষ এমনই স্বার্থান্ধ বটে !

মনের শান্তি-সুখ হারাইয়া আচার্য্য স্থির হইলেন। ভিতরের কথাবার্ত্তা বন্ধ হইল। একঘেয়ে শব্দ করিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল।

ক্রমে সহরের কর্ম্ম-কোলাহলের স্রোতে আসিয়া মিশিলাম। গাড়ী কাষ্টম-হাউসের সম্মুখে দাঁড়াইল। লোকজন আসিয়া পরীক্ষা করিয়া গেল। যদি আমরা ছাগল কিম্বা আর কোন পশু হইতাম, তাহা হইলে এখানে কিছু দাক্ষণা দিতে হইত। কিন্তু মানুষ বিনা-মাশুলেই মুক্তি পাইয়া থাকে।

তার পর অসংখ্য আঁকাবাঁকা পথ ঘুরিয়া গাড়ী আসিয়া পড়িল পাথরে বাঁধানো বড় রাস্তায়। এই রাস্তা সোজা কাঁসিয়ারজারি গিয়াছে ! গাড়ীর বিকট শব্দে পথিকের দল অবাক হইয়া ফিরিয়া চাহিতেছিল—আর খবরের কাগজ-ওয়ালারা বগলে কাগজ লইয়া পথের এধার-ওধার ছুটাছুটি করিতেছিল।

সাড়ে আটটায় কাঁসিয়ারজারিতে আসিয়া পৌঁছিলাম। পার্শ্বে মূক উপাসনা-মন্দির। সম্মুখে দীর্ঘ সোপানের শ্রেণী এবং প্রকাণ্ড লৌহকপাট দেখিয়া আমার রক্ত হিম হইয়া গেল। গাড়ী থামলে আমার মনে হইল, হৃদয়ের স্পন্দনটুকু বুঝি এখনই থামিয়া যাইবে !

মনে সাহস আনিলাম। বিদ্যুতের ত্বরিত গতির মত চকিতে দ্বার খুলিয়া গেল। গাড়ীর অন্ধকার গহ্বর হইতে লাফাইয়া আমি নামিলাম। দুইজন প্রহরী আসিয়া দুটা হাত ধরিল। দুইধারে কাতার দিয়া সৈন্যের দল দাঁড়াইয়াছিল—তাহার মধ্য দিয়া আমি চলিলাম। আমাদিগকে অর্থাৎ আমাকে দেখিবার জন্য বাহিরে রীতি-মত ভিড় জমিয়া গিয়াছিল।

## ২১

সেই সৈন্যশ্রেণীর মধ্য দিয়া চলিবার সময় আমার মনে কেমন একটা স্বচ্ছন্দতা আসিল। মনে হইল, আমি যেন স্বাধীন—বন্দী নহি ! কিন্তু তার পর যখন সোপান অতিক্রম করিয়া ছোট দ্বার দিয়া অন্ধকার ঘর-গুলার মধ্যে আসিয়া পড়িলাম—তখন এক সুগভীর অবসাদ আসিয়া আমাকে সম্পূর্ণ অভিভূত করিয়া ফেলিল।

প্রহরী বরাবর সঙ্গে আসিল। আচার্য্য মহাশয় দুই ঘণ্টা পরে আসিয়া সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া বিদায় লইলেন। আরও কি সব তাঁহার কাজ আছে! সেই জন্য!

অবশেষে অধ্যক্ষের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তাঁহার হাতে প্রহরী আমাকে সঁপিয়া দিল। আমার মনে একটা কৌতুকের হাসি উঁকি দিল! সঁপিয়া দিল! আমার প্রিয়জনের হাতে আমায় সঁপিয়া দিল!

অধ্যক্ষ মহাশয় তখন অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। প্রহরীকে কহিলেন,—একটু সবুর করো—আমি বুঝিয়া লইতেছি।

সত্যই তো—জমাখরচের খাতায় তহবিল না মিলাইয়া একটা মানুষকে কি করিয়া তিনি জমা করেন? আর একজন হতভাগ্য বন্দীর অদৃষ্ট লইয়া তিনি তখন অতিরিক্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। প্রহরী বলিল,—বেশ, আমিও আমার কাগজপত্রগুলা একবার ঠিক করিয়া গুছাইয়া লই!

একতাড়া কাগজ বাহির করিয়া প্রহরীও তখন ব্যস্ত হইয়া উঠিল। আমি ঘরের কোণে দাঁড়াইয়া রহিলাম। লোহার মোটা গরাদের মধ্য দিয়া বাহিরে আকাশ দেখা যাইতেছিল—রৌদ্র দেখিয়া মনে হইতেছিল, আকাশের গায়ে কে যেন রঙ্‌ মাখাইয়া দিয়াছে! উজ্জ্বল নীল আকাশ!

ঊর্দ্ধপানে আমি চাহিয়াছিলাম। এক একবার মনে হইতেছিল—এখানে আমি দাঁড়াইয়া আছি, আর আমার স্ত্রী, কন্যা তাহারাও এই একই আকাশের নীচে আছে! এ জীবনে আর কি তাহাদিগের দেখা পাইব?

পাশে একটা ছোট কুঠ্‌রিতে প্রহরী আমাকে লইয়া চলিল। অন্ধকূপের মত ছোট কুঠ্‌রি! মোটা লোহার জালে জানালা দুটি ঘেরা। জানালার ধারে আসিয়া আমি বসিলাম।

কতক্ষণ বসিয়াছিলাম, মনে নাই! সহসা একটা অট্টহাসিতে ফিরিয়া চাহিলাম।

এ কি,—আর একজন লোক! বয়স তাহার পঞ্চাশের ঊর্দ্ধে—পিঠ্‌ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, মাথার চুল পাকিয়া গিয়াছে, অথচ বেশ মজবুত বলিষ্ঠ দেহ। চোখে-মুখে কেমন একটা বিকট ভাব! লোকটাকে সহসা দেখিলে প্রাণ যেন শিহরিয়া ওঠে—তার সঙ্গ হইতে দূরে থাকিবার জন্য প্রবল বাসনা জন্মে।

লোকটাকে পূর্ব্বে আমি লক্ষ্যই করি নাই। অথচ এই ঘরেই সে বসিয়াছিল।

আশ্চর্য্য! এ কি তবে মৃত্যু? আজ এই দস্যুর বেশে আসিয়া আমাকে দেখা দিয়াছে!

লোকটা কহিল,—তোমার ভাবখানা দেখিতেছি! কি এমন ভাবনায় মশগুল হে যে, একটা লোককে চোখে দেখিবার অবসর পাও না? তোমার নাম কি?

আমি কথা কহিলাম না। শুধু তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

সে কহিল,—কি! আমাকে দেখিয়া বুঝি অবাক্‌ হইয়া গিয়াছ? আমি একটা লগেজ,—ষ্টেশনের ছাপ-মারা হইয়া পড়িয়া আছি! গাড়ীতে তুলিয়া লইলেই হয়।

লোকটা রসিক! আমি কহিলাম,—তার অর্থ?

হো হো করিয়া সে হাসিয়া উঠিল; কহিল,—এমন কি কঠিন অর্থ যে, বুঝিলে না? আর ছয় সপ্তাহ পরে আমাকে ভবপারে পাঠাইবে—তার জন্য আজ "লগেজ বুক" হইয়া রহিয়াছি। অর্থাৎ ছয় ঘণ্টা পরে তোমার যে দশা, ছয় সপ্তাহ পরে আমারও তাই! এমন দিনে এমন বন্ধুর দিকেও তুমি ফিরিয়া চাও না?

আমার শিরাগুলা চড়্‌চড়্‌ করিয়া উঠিল।

লোকটা কহিল,—চুপ করিয়া ভাবিয়া আর কি হইবে বলো, বন্ধু? তার চেয়ে আমার কাহিনী বলি, শোনো—মন্দ লাগিবে না! সময়টুকু বেশ কাটিয়া যাইবে!

সে বলিতে আরম্ভ করিল,—আমরা কয় পুরুষ ধরিয়া চুরি-বিদ্যায় দক্ষতা লাভ করিয়াছি। এমন শাণিত বুদ্ধি ফাঁশি-কাঠের চাপে ঝরিয়া মরিবে! অদৃষ্ট!

ছয় বৎসর বয়সের সময় মা-বাপ হারাইয়া বসিলাম! লোকের পকেট কাটিয়া, বোকা ভুলাইয়া বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতে লাগিলাম।—হাজার হউক, বংশগত বিদ্যা কি না!

শীতের দুরন্ত রাত্রে, পথ-ঘাট যখন বরফে ভরিয়া যাইত, তখন শুধু পায়ে পথ চলাও রীতিমত অভ্যাস হইয়া গেল। তার পর ষ্টেশনে, হোটেলে, ট্রেণে লোকের পকেট কাটিতে দড় হইয়া উঠিলাম!

পনেরো বৎসর বয়সে প্রথম ধরা পড়ি। কয়েক ঘা বেত ও দুই চারি দিনের জন্য জেল হইল! জেল-ফেরত গৃহে ফিরিলে আমার প্রতিপত্তি বাড়িয়া গেল। দলের সর্দ্দার হইয়া উঠিলাম।

তার পর যত বড় বড় কাজে হাত দিলাম! সহরের বিখ্যাত জহরতওয়ালার দোকানে দল লইয়া উপস্থিত হইলাম। দোকান-ঘর উজাড় করিয়া ফেলিলাম—দুইটা দ্বারবান প্রাণ দিল! ক্রমে আমার দম্ভ বাড়িয়া উঠিল। দলের একটা হতভাগা স্বার্থপর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ধরাইয়া দিল! সাত বৎসর জেল ঘুরিয়া আসিলাম। বিরুদ্ধ প্রমাণ স্পষ্ট তেমন কিছু ছিল না—নহিলে জেল হইতে হয়তো আর বাহির হইতে পারিতাম না। রাগ ধরিয়া গেল সেই স্বার্থপর বিশ্বাসঘাতকটার উপর!

যখন বিচার শেষ হয়—সে তখন আদালতের বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল। তার প্রতি শুধু একটা রক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গেলাম। সে দৃষ্টিতে আগুনের হল্কা ছিল—

লোকটার হাড়ে হাড়ে সে আগুন বিঁধিয়াছিল। ভয়ে তার মুখ শুকাইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সাত বৎসর কাটিয়া গেল! তার পর আবার একদিন জেলের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

দুই দিন ঘুরিয়াই কাটিল। মুখে অন্ন জুটে নাই। প্রতিহিংসার জন্য দারুণ আক্রোশ জাগিয়াছিল।

রাত্রে জানালা ভাঙ্গিয়া হোটেলে ঢুকিয়া আহার করিলাম—পূর্ণ পরিতৃপ্তিতে। চুপি চুপি। কেহ জানিতে পারিল না।

সাত আট দিন পরে দলের দুইচারিজন লোকের সহিত দেখা হইল। তারা চুরি ছাড়িয়া চাষের ক্ষেতে, কেহ-বা অন্য কোন কাজে বেশ যোগ দিয়াছে। ভীরু কাপুরুষের দল!

নূতন করিয়া দল গড়িলাম। বাছাই-করা সব জোয়ান দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক।

তার পর কিছুকাল মহাসমারোহে কাজ চলিল। নিত্য লুঠ, নিত্য জয়, নিত্য আমোদ! আনন্দে জ্ঞান হারাইবার জো হইল!—কিন্তু আবার পুনর্মূষিক হইলাম। সঙ্গীর দল গা ঢাকা দিল। আমার কাজও বন্ধ হইল। রাগে দেহ কাঁপিয়া উঠিল।

তার পর একদিন পথে সেই বিশ্বাস-ঘাতককে দেখিলাম! আমাকে দেখিয়া সে কাঁপিয়া উঠিল! সবলে আমি তার চুলের মুঠি চাপিয়া ধরিলাম! কহিলাম, —কেমন? আজ?

সে কাঁদিয়া উঠিল, বলিল,—মাপ,—মাপ করো সর্দ্দার!

আমি কহিলাম,—বিশ্বাসঘাতকের ক্ষমা নাই—তা সে যে কাজেই হোক!

সে কহিল,—আমি তোমার গোলাম!

বিশ্বাসঘাতক গোলামকে এমনি করিয়া আমি শিক্ষা দিই—! বলিয়া তার পৃষ্ঠে প্রচণ্ড পদাঘাত করিলাম! ছিট্‌কাইয়া সে পাঁচ হাত দূরে গিয়া পড়িল। মুখ দিয়া গল্‌গল্‌ করিয়া রক্ত বাহির হইল। আমি কহিলাম,— উঠিয়া আয়!

সে আসিল। আমি তখন,—ওঃ, পিশাচের মত ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিলাম! আমার এমন দল, পুরানো সঙ্গীর দল—এই বিশ্বাসঘাতকটার জন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল! শয়তান!

পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া তার কাণ দুইটা কাটিয়া দিলাম। সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। আমার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিতেছিল! সেখান হইতে সরিয়া পড়িলাম!

তার পর কখন্ পুলিশে যাইয়া সব কথা সে বলিয়া দিল। পরে একদিন হাসপাতালেই সে প্রাণ দিল। আমি ধরা পড়িলাম। আমার ফাঁশির হুকুম হইয়া গিয়াছে। ঠিক হইয়াছে। কি বলো? অমন করিয়া লোকটাকে মারিলাম! যাক্, ফাঁশির জন্য আমি কাতর নহি! চুরির কাজে স্ফূর্ত্তি কমিয়া আসিয়াছিল—বোকার মত, হীন চোরের মত, আমার চুরি নয়। তাহাতে রীতিমত বুদ্ধি দেখাইতাম। বুদ্ধিমান, সাহসী সঙ্গীই বা মিলে কৈ! কাজেই জীবনে আর আকর্ষণ নাই! তবু মরিবার পূর্ব্বে বিশ্বাসঘাতককে যে নিজের হাতে দণ্ড দিয়াছি, ইহাই সুখ! শুনিলে তো বন্ধু, আমার কাহিনী। চুরির কথাও দুই একটা বলিতেছি। শুনিলে বুঝিবে, এ দিকটায় আমার বুদ্ধি কেমন খেলে! এমন মাথা ফাঁশি-কাঠে ঝুলিতে চলিয়াছে, দেশের পক্ষেও কি ইহা কম দুর্ভাগ্য।

লোকটার কথা শুনিয়া আমার আপাদ-মস্তক কাঁপিয়া উঠিল! এই রাক্ষস, পিশাচটার হেয় সংসর্গ হইতে এখন মুক্তি পাইলে বাঁচি!

সে কহিল,—তুমি বড় নিরীহ! ছ্যাঃ! ফাঁশি-কাঠে চলিয়াছ, এখনও মুখ বিমর্ষ! লোকে ইহাতে মজা পায়, জানো? তার চেয়ে তোফা আমোদ-আহ্লাদ করো, লোকে দেখুক, হাঁ, ফাঁশি-কাঠকে এ ডরায় না! মরণ ইহার খেলার সাথী। দেখিয়া অবাক স্তম্ভিত হইয়া যাইবে—বাহাদুর ঠাওরাইবে! আমার স্ফূর্ত্তিটা দেখিতেছ তো। দুঃখ করিয়া ফল কি!

আমি কহিলাম,—আপনি মহাশয় ব্যক্তি!

হো হো করিয়া সে আবার হাসিয়া উঠিল।

সে হাসির শব্দে ছোট ঘর কাঁপিয়া উঠিল। সে কহিল, —ওহো, 'মহাশয়' ব্যক্তি! আপনারা ভদ্র, 'মহাশয়', সে কথা মনে ছিল না! বটে, বটে! ভদ্র ব্যক্তিরও ফাঁশিতে ঝুলিবার সখ হয়—ভালো, ভালো!

কথাটার সহিত বেশ একটু টিট্‌কারী মিশানো ছিল।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। সে কহিল,—কি? আচার্য্যের জন্যই বুঝি আপনার বিলম্বটুকু! তা আপনি তো একজন জমিদার মানুষ, শুনিলাম। ফাঁশিতে চড়িতে চলিয়াছেন—অমন ভালো জামাটি নষ্ট হয় কেন? আমাকে দিন। এই শীতে তবু পরিয়া বাঁচিব। তার পর না হয় বেচিয়া চুরুট-তামাকের জোগাড় দেখিব!

আমি কোট খুলিয়া দিলাম। শীতে গা কাঁপিয়া উঠিল। সে কহিল,—আপনারা বড় লোক। এ শীত সহিবে না। নিন, আপনার কোট গায়ে দিন!

লোকটার কথার স্বর একটু ফিরিল। আমি কহিলাম,—এ শীত আমার সহ্য হইবে। কোটের প্রয়োজন নাই।

জানালার নীচে আসিয়া লোকটা কোটটাকে সূক্ষ্মভাবে দেখিতে লাগিল—উল্টাইয়া পাল্টাইয়া ভালো করিয়া দেখিল! পরে বলিল,—এ যে একেবারে নূতন! তা

বেশ, আপনার অনুগ্রহে ছয় সপ্তাহের তামাকের জোগাড় হইল। ধন্য মহাশয়! কিছু মনে করিবেন না। আমরা গরিব চাষা লোক, কথা জানি না, মান জানি না!

এমন সময় দ্বার খুলিয়া অধ্যক্ষ আসিয়া আমাকে একটা প্রহরীর জিম্মা করিয়া দিলেন এবং আর দুইজন প্রহরীর হাতে সেই লোকটার ভার দিয়া বাহিরে গেলেন।

আমরা বাহিরে আসিলাম। বাহিরে আসিয়া সে কহিল,—মনে রাখিবেন, মহাশয়, এখানে এই শেষ দেখা! আবার ছয় সপ্তাহ পরে দেখা হইবে। এই পুরানো বন্ধুত্বের খাতিরে সেদিন আমার জন্য অপেক্ষা করিবেন।

কথাটা শুনিয়া আমার হৃৎকম্প হইল। এ বলে কি? পাগল, না, বোকা? কে এ?

## ২২

ভারী মজার লোক কিন্তু! আমার কোটটি দিব্য লইয়া গেল!

আমি কি দান করিলাম? তাহা নহে! আমি ভাবিলাম, বুঝি সে তামাসা করিতেছে! তার পর চক্ষুলজ্জায় চাহিতে পারিলাম না!

পাকা পুরানো চোর! পা দিয়া যাহাকে দলিতে পারি, এমন স্পর্দ্ধার সহিত সে আমাকে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিল! রোষে, ক্ষোভে আমার চিত্ত গর্জ্জিয়া উঠিল।

মরণ আসিয়া দেখা দিয়াছে, এখনই নিষ্ঠুরভাবে আমাকে পিষিয়া মারিবে! এখনও আভিজাত্যের এত আস্ফালন! হারে মূঢ়!

## ২৩

বায়ু ও আলোকহীন ছোট ঘরে আবার আমি বন্দী! বন্দী হইয়াছি বলিয়া কি আলো-বায়ুতেও কোনো অধিকার নাই? বিচারের নামে, মানুষের প্রতি এমন দুর্ব্যবহার মানুষ করে! শাস্তি দেওয়াই যদি প্রয়োজন হয়, তবে অল্প খরচে আরও সহজ উপায় ছিল! প্রাচীন যুগের মত একটা থলির মধ্যে পুরিয়া নদীর জলে ডুবাইয়া দিলে চূড়ান্ত ব্যবস্থা হইত! এমন কড়া পাহারা, এত জবরবস্ত তদারকের পরিশ্রম ও ব্যয়টাও তাহা হইলে বাঁচিয়া যাইত!

ঘরে বিছানা ছিল না। প্রহরীকে বিছানার কথা বলিতে সে অবাক্ হইয়া গেল! যেন সে আকাশ হইতে পড়িয়াছে, এমনই ভাবখানা! অর্থাৎ আর ছয় ঘণ্টার জন্য বিছানা লইয়া আমি করিব কি?

যাহা হোক, ঘরের কোণে অধ্যক্ষ মহাশয় তখনই একটা বিছানা করাইয়া দিলেন। তাঁহার অসাধারণ দয়া! মরিবার সময় তাঁহার দয়ার কথা ভাবিয়া মরিতে পাইব! কিন্তু আমার ঘরের দ্বারে পাহারা মোতায়েন রহিল—পাছে বিছানার কম্বল গলায় জড়াইয়া ফাঁসি-কাঠকে আমি ফাঁকি দিই!

## ২৪

বেলা দশটা বাজিয়াছে।

আমার মেরির কথা মনে পড়িতেছে! হতভাগিনী কন্যা আমার,—আর ছয় ঘণ্টা পরে কোথায় এ পৃথিবী, কোথায়ই বা আমি! হাসপাতালের টেবিলে একটা কদর্য্য মাংসপিণ্ডের মত পড়িয়া রহিব। দেহ-ব্যবচ্ছেদ করিয়া তবে তাহারা মুক্তি দিবে! তার পর সেই টুকরা-টুকরা মাংস ও অস্থিগুলা ধরণীর কোলে বিছাইয়া দিবে—তখন আমার ছুটি মিলিবে! হায় মেরি, তোমার পিতার জীবনের এ কি পরিণাম!

অথচ এখানে কেহ আমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে না! করুণায় সকলের প্রাণ ভরিয়া রহিয়াছে! যত্ন বা সেবার এতটুকু ত্রুটি নাই! তবু কেহ আমাকে বাঁচিতে দিবে না! করুণা—কিন্তু কি নির্ম্মম তাহার বিধি! আমাকে হত্যা করিবে···কিছুতে ছাড়িবে না!

বেচারী মেরি আমার! পিতার সে কি ভালোবাসা তোমাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল! পিতার সে কি মধুর চুম্বনে তুমি তৃপ্তি পাইতে! তোমার ঐ কুঞ্চিত কেশের গুচ্ছে মৃদু দোল দিয়া পিতা আদর করিত—ফুলের মত তোমার কচি নরম মুখখানিতে হাসির ফোয়ারা ঝরিয়া পড়িত! আনন্দের কলহাস্যে সারা গৃহে সে কি বিচিত্র সঙ্গীতের ঝঙ্কার উঠিত! তার পর নিদ্রার পূর্ব্বে ছোট হাত দুটিতে মুঠি ভরিয়া পিতার সহিত বন্দনা-গীতে যোগ দিয়া দিনের সকল শ্রান্তি, সকল তাপ ঘুচাইয়া দিতে! কি সে আবেগপূর্ণ আন্তরিক আরাধনা! এমন সুখের স্বাদ জীবনে কে পাইয়াছে? কিন্তু আজ সে সকলই স্বপ্ন! হায় বালিকা, তেমন করিয়া তোমায় বুকে তুলিয়া কে আর অজস্র চুমায় তোমার ছোট মুখখানি ভরাইয়া দিবে? তেমন ভালো আর কে বাসিবে? সবার গৃহে ছোট ছেলে-মেয়েগুলি যখন সুখে-দুঃখে, উৎসবে-আনন্দে পিতার আদরে নাচিয়া মাতিয়া উঠিবে, তখন তোমার আঁখির কোণ শুধু জলে ভরিয়া রহিবে! গভীর বেদনার তাপে তোমার ঢল-ঢল মুখখানি শুকাইয়া যাইবে! ম্লান নেত্রে সবার পানে চাহিয়াই তোমার দিন কাটিবে! বৎসরের প্রথম দিনে না পাইবে কোনো উপহার, না পাইবে পিতার আদর! নাই, কিছু নাই, হা রে অভাগিনী, স্নেহকাঙালিনী! তোর হৃদয় স্নেহের জন্য আকুল তৃষিত হইয়া উঠিবে—কিন্তু তাহার পরিতৃপ্তির কোন আশা থাকিবে না! পিতৃহারা অনাথিনী মেরি!

জুরির দল যদি একবার আমার মেরিকে দেখিত,

তাহা হইলে এ মৃত্যুদণ্ড দিবার পূর্ব্বে আমার কথাটা বুঝি একটুও তাহারা বিবেচনা করিত! অবোধ সে তিন বৎসরের বালিকা! তবু তাহার ম্লান নেত্র দেখিয়া জুরিদের কঠোর চিত্ত নিশ্চয় চঞ্চল হইত। সন্দেহ নাই, কোনো সন্দেহ নাই! আমার মেরি,—তাহার দুঃখ দেখিলে কাহার প্রাণ না কাটিয়া যায়!

মেরি! যখন তাহার বয়স বাড়িবে, জ্ঞান হইবে, সকল কথা বুঝিবার শক্তি জন্মিবে, তখন কোথায় আমি! সারা পারির একটা কলঙ্ক-স্মৃতি মাত্র! আমার নামে তাহার প্রাণ কি শিহরিয়া উঠিবে না? আমার নামের সহিত জীবনের যত দুর্দ্দৈব, যত লজ্জা নিমেষে তাহার অন্তরে জাগিয়া উঠিবে! লোকের ঘৃণায় সমস্ত জীবন অসহ্য জ্বালায় ভরিয়া যাইবে! মেরি, আদরের মেরি আমার—পিতার নামে এক বিন্দু অশ্রুর পরিবর্ত্তে কি তোমার চক্ষু বীভৎস ঘৃণার দাহ বর্ষণ করিবে? না, না মেরি, একবিন্দু অশ্রু দিয়ো! শুধু একবিন্দু! হা ভগবান, আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি, পাপ করিয়াছি যে, সমাজ আজ এমন নিষ্ঠুর নির্ম্মমভাবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে উদ্যত!

আজিকার সূর্য্য যখন অস্ত যাইবে—তখন কোথায় আমি! এ পৃথিবীতে সকল অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছি! আজ আমার জীবনের শেষ দিন! ইহা কি সত্য? স্বপ্ন নয়?

বাহিরে অস্পষ্ট ও কিসের কোলাহল? আমার মৃত্যু দেখিবার জন্য সকলে বুঝি ছুটিয়া চলিয়াছে! কৌতূহলী দর্শক, স্পর্দ্ধিত প্রহরী, সজ্জিত আচার্য্য—আমাকে দেখিবার জন্যই সকলের এত আগ্রহ! মৃত্যু তবে সত্যই আজ আমাকে গ্রহণ করিবে! আমাকে? যে-আমি বসিয়া রহিয়াছি, নিশ্বাস ফেলিতেছি, দেখিতেছি, শুনিতেছি, বায়ু-স্পর্শ অনুভব করিতেছি—সেই আমি এখনই মরিব!

## ২৫

এ ব্যাপার আমারও কিছু অজানা নয়! প্লে দি গ্রীভের পাশ দিয়া যাইতেছিলাম—সে আজ বহুদিনের কথা! বেলা তখন এগারোটা বাজিয়াছিল। সহসা আমার গাড়ী থামিয়া পড়িল।

পথে বিস্তর লোক জমিয়াছিল। গাড়ীর মধ্য হইতে আমি মাথা বাহির করিয়া দেখি, আবালবৃদ্ধবনিতায় সারা পথ ভরিয়া গিয়াছে! নরশিরের সংখ্যা ছিল না। গৃহের প্রাচীর, বৃক্ষচূড়—কোনো স্থান বাদ যায় নাই। এবং অদূরে ঊর্দ্ধে স্থাপিত ফাঁসি-কাঠও দেখা যাইতেছিল। ফাঁসির সকল সরঞ্জাম প্রস্তুত ছিল।

আজও সেই দিন! কিন্তু আজ আমি দর্শক নহি, আজ আমাকে দেখিবার জন্যই সেখানে তেমনই লোক জমিয়াছে!

একটি রজ্জুকে শুধু অবলম্বন করিব—নিমেষে অমনি কি বিরাট অতলস্পর্শ অন্ধকারের মধ্যে নামিয়া পড়িব! জমাট অন্ধকার! তার পর···

আঃ, একখণ্ড প্রস্তর যদি কুড়াইয়া পাই তো তাহার আঘাতে মস্তকটা এখনই চূর্ণ করিয়া ফেলি!

## ২৬

মার্জ্জনা! ওগো মার্জ্জনা! আমায় মার্জ্জনা করো। হয়তো মুক্তি মিলিবে! রাজার প্রাণ করুণায় গলিবে—মার্জ্জনার আজ্ঞা বহিয়া এখনই দূত ছুটিয়া আসিবে! শীঘ্র, শীঘ্র এসো দূত! তখন এই সমস্ত অন্ধকার চকিতে মুছিয়া যাইবে এবং কি সে তীব্র দীপ্ত মুক্ত আলোর রাজ্যে প্রবেশ করিব! জয়ের সে কি বিরাট উল্লাসে আমার চিত্ত ভরিয়া উঠিবে!

আমায় প্রাণটুকু ভিক্ষা দাও! স্নেহ-মায়াভরা এমন সুন্দর পৃথিবী—প্রাণ যে ওগো, ছাড়িতে চাহে না! আমায় রক্ষা কর! তপ্ত লৌহশলাকায় তোমরা আমার সর্ব্ব দেহ বিঁধিয়া দাও—লোকালয়ে প্রবেশ করিতে দিয়ো না—বিশ বৎসর, পঁচিশ বৎসর জেলে ফেলিয়া রাখো! শুধু এই আকাশ, বাতাস, সূর্য্যের আলো হইতে বঞ্চিত করিয়ো না। বন্দী যে, সে ও চলে, দেখে, ভাবে, কথা কয়, সে-ও সুখী! শুধু এই প্রাণটাকে ভিক্ষা দাও,—আর আমার কোনো প্রার্থনা নাই!

## ২৭

আচার্য্য ফিরিয়া আসিল। পলিত কেশ, শান্ত কথা-বার্ত্তা, নম্র প্রকৃতি। শ্রদ্ধার যোগ্য পাত্র বটে।

আজই সকালে বন্দীর দলে তাঁহাকে জ্ঞান বিতরণ করিতে দেখিয়াছি। কিন্তু তাহাতে আমার কি লাভ! তাঁহার কথার দিকে আমার মন ছিল না! বৃষ্টির জল সার্শির গায়ে লাগিয়া যেমন ঝরিয়া পিছলিয়া যায়, আমার মনে লাগিয়া তাঁহার অমূল্য-বাণীও তেমনই পিছলিয়া যাইতেছিল!

তবু তাঁহাকে দেখিয়া প্রাণটা জুড়াইল! চারিধারে এই পরুষ রুক্ষতার মধ্যে তিনি যেন আনন্দ-শ্রী ফুটাইয়া তুলিলেন!

আমরা বসিলাম—তিনি চেয়ারে এবং আমি আমার সেই জীর্ণ শয্যার উপর।

তিনি কহিলেন,—ভাই!

কথাটা আমার হৃদয়ে বিঁধিল। তিনি কহিলেন,—ঈশ্বরে তোমার বিশ্বাস আছে?

আমি কহিলাম,—আছে।

—এই যে উদার ক্যাথলিক ধর্ম্ম—ইহার প্রতি তোমার ভক্তি আছে ?

আমি কহিলাম,—নিশ্চয় আছে।

—তবে শোনো। আচার্য্য বলিতে লাগিলেন। কি বলিতেছিলেন, তাহা আমার মনে নাই, কতক্ষণ বলিয়াছিলেন, তাহাও জানি না! আমি অন্যদিকে চাহিয়াছিলাম—সহসা তিনি কহিলেন,—কি? আমার চমক ভাঙ্গিল। আমি দাঁড়াইয়া উঠিলাম, কহিলাম,—অনুগ্রহ করিয়া আমায় একলা থাকিতে দিন। আমার কিছু ভাল লাগিতেছে না।

—কখন্ আমি আসিব, বলো।

—খবর দিব।

তিনি উঠিলেন, মৃদু কণ্ঠে কহিলেন,—নাস্তিক।

নাস্তিক! না। যতই কেন হীন হই না আমি, তবু নাস্তিক নই! ভগবান জানেন, তাঁহার প্রতি আমার কি গভীর বিশ্বাস! কিন্তু এ আচার্য্য নূতন কথা আর কি বলিবে? আমার সংক্ষুব্ধ আত্মা যাহা পাইয়া পূর্ণ তৃপ্তি পাইবে, তাহা দিতে ইহার সামর্থ্যই বা কোথায়? মাহিনা খাইয়া কতকগুলা বাঁধা গৎ বকিয়া শুধু অস্থির করিবে মাত্র!

খুনী ও ডাকাতের সম্মুখে মুখস্থ বিদ্যা জাহির করা যাহার পেশা, ক্ষুব্ধ আত্মাকে শান্তি দিবার চেষ্টা তাহার পক্ষে ধৃষ্টতা; ভগবানের নাম লইয়া এ কি খ-বৃত্তি! বিধাতার নামে এ কি পরিহাস! অথচ রাজধর্ম্মে অনুমোদিত হইয়া এই প্রথা কতকাল ধরিয়াই না চলিয়া আসিতেছে! আশ্চর্য্য!

কিন্তু এই বৃদ্ধ আচার্য্য! ইহারই বা দোষ কি? কি তাহার শিক্ষা! কি তাহার জ্ঞান! তুচ্ছ কয়টা মুদ্রার জন্য শুধু সে এই কাজ করিতেছে! ইহাই তাহার জীবিকার অবলম্বন।—নহিলে উদরপূর্ত্তি হয় না যে! এমন অশ্রদ্ধা দেখানো আমার পক্ষে উচিত হয় নাই! কিন্তু উপায় কি? আমার নিশ্বাস-বায়ুস্পর্শে চারিধার জ্বলিয়া যাইতেছে, মুখের কথায় বিষ বাহির হইতেছে, আমি শুধু উপলক্ষ, ভবিতব্য কঠিন!

প্রহরী আমার জন্য নানাবিধ আহার লইয়া আসিল! ইহজীবনের মত সাধ মিটাইয়া খাইয়া লও।

যথেষ্ট হইয়াছে! এমন কদর্য্য ঘৃণা, এমন হীনতা আর গলাধঃকরণ করা যায় না!

## ২৮

একটা লোক—মাথায় টুপি—হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত! ব্যস্ত ভাব, কোনদিকে তাহার লক্ষ্য নাই! হাতে গজের ফিতা ও কাগজপত্রের বাণ্ডিল! আসিয়াই সে দেওয়াল মাপিতে লাগিল! আচ্ছা—পাঁচ ফুট। এখানটা বদলানো দরকার। প্রভৃতি নানা কথা সে আপনার মনে বকিয়া যাইতে লাগিল।

প্রহরীর মুখে শুনিলাম, সে একজন কণ্ট্রাক্টর। কারাগৃহের সংস্কার হবে, তাই সে মাপ করিতে আসিয়াছে।

কাজ শেষ হইলে সে আমাকে কহিল,—আপনায় বুঝি আজ ফাঁশি হইবে? আহা!

আমি উত্তর দিলাম না। আমার পানে স্তম্ভিত দৃষ্টিতে সে চাহিয়া রহিল।

সে কহিল,—ছয় মাস পরে এ জেল আর চেনা যাইবে না। আগাগোড়া বিস্তর বদল হইবে। আর কি জমকালোই না দেখিতে হইবে।

অর্থাৎ তাহার কথার মর্ম্ম,—আমি নিতান্ত বেচারা, এমন কাণ্ড দেখা আমার অদৃষ্টে ঘটিবে না!

তাহার মুখে কাষ্ঠ হাসি দেখা দিল। প্রহরী তাহাকে কহিল,—এখানে দাঁড়াইবার হুকুম নাই! আপনার কাজ হইয়া থাকে তো বাহিরে গেলে ভাল হয়!

সে চলিয়া গেল। আর আমি—যে পাষাণ দেওয়াল সে ফিতা লইয়া মাপিতেছিল, সেই পাষাণ দেওয়ালেরই মত নিশ্চল মূক বসিয়া রহিলাম।

## ২৯

এমন সময় এক মজার কাণ্ড ঘটিল। প্রহরী বদল হইল। নূতন প্রহরীর অদ্ভুত ভাব-ভঙ্গী, বিশ্রী চেহারা, কর্কশ স্বর! সে যেন যমদূত!

প্রহরী কহিল,—ওহে, তোমার মনে দয়া-মায়া কিছু আছে?

আমি কহিলাম,—না।

আমার স্বরে একটা তীক্ষ্ণতা ছিল,—তবু সে হঠিবার পাত্র নহে। সে কহিল,—একটা কথা বলি, শোনোই না!

আমি কহিলাম,—অত রসিকতা আমার সহ্য হইবে না।

সে কহিল,—আমি বড় দুঃখী, ভাই, নেহাৎ হতভাগা। তুমি একটু দয়া করিলে যদি ভাল হয়, করো না! চিরদিন আমি কৃতজ্ঞ থাকিব!

চিরদিন! আমার সে 'চির' তো সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই ফুরাইয়া যাইবে! আমি কহিলাম,—তুমি কি পাগল? তোমার সুখদুঃখের খোঁজ লইয়া আমি মিছা মাথা ঘামাই কেন?

তবু সে ছাড়িবে না! কহিল,—বলি, শোনোই না কথাটা! তার পর চারিধারে চাহিয়া নিম্ন কণ্ঠে সে কহিল,—ত্যাখো দাদা, আমার যা কিছু সুখ, তা তোমার হাতে নির্ভর করিতেছে। নেহাৎ গরীব আমি। এ কাজে কি পরিশ্রম, আর মাহিনা কি কম! ইহার উপর আবার নিজের খরচে একটা ঘোড়া রাখিতে হয়। চাকরির

সুখ কত! তাই বুঝিয়া ভাই, মাঝে-মাঝে আমি লটারির টিকিট কিনি। জীবনে একটু কিছু করা চাই তো! কিন্তু এই যে আজ সাত-আট বৎসর লটারিতে এত টাকা দিতেছি, তা এ লটারিতে নয়, সব জলে দিয়াছি! আমার নম্বর যদি হয় ১৬, তো ঠিক ১১ নম্বরের টিকিট টাকা পাইয়া বসিয়া আছে। আবার যদি দেখিয়া শুনিয়া ১১ নম্বরের টিকিট কিনি, হয় ১৬ নয় ১৮ নম্বর টাকা পাইয়া বসে। বরাত ছাখো! তাই মনে করিয়াছি কি, জানো? কথাটা বলিয়া সে আমার দিকে চাহিল। আমি কহিলাম,—কি মনে করিয়াছ?

সে কহিল,—তাই মনে করিয়াছি, তোমার দ্বারা একটা সুবিধা হইতে পারে।

আমি আশ্চর্য্য হইলাম, কহিলাম,—আমার দ্বারা সুবিধা?

সে কহিল,—হাঁ দাদা, সে সব তোমারই হাতে। ছাখো, মানুষ মরিয়া গেলে ভূত-ভবিষ্যৎ সকলই দেখিতে পায়। তা তুমি এই কয় ঘণ্টা পরেই মরিতেছ, তাই বলিতেছি কি জানো, আমাকে যদি ঐ ঠিক নম্বরটি বলিয়া দাও তো আমি সেই নম্বরের টিকিটখানি কিনি। বেশ দুই পয়সা তাহা হইলে হাতে আসে। রাতারাতি বড়মানুষ হইয়া পড়ি, আর এই লক্ষ্মীছাড়া চাকরি ছাড়িয়া বাঁচি—ভূতকে আমি ভয় করি না, বুঝিলে কি না—কোনো বাধা নাই। আমার নাম কাসে পাপিকুব। বি নম্বর ঘর, ২৬ নম্বর বিছানা—মনে থাকিবে? আজই সন্ধ্যার পর তাহা হইলে বলিয়া দিয়ো, দাদা! দোহাই তোমার।

এ কথার আমি উত্তর দিতাম না। প্রবৃত্তি ছিল না—কিন্তু একটা উন্মত্ত আশা আমার মনে জাগিয়া উঠিল। একবার শেষ চেষ্টা। আমি কহিলাম, ছাখো, তুমি টাকা চাও?

—হাঁ, দাদা! আর পয়সার দুঃখ ভোগ করিতে পারি না!

আমি কহিলাম,—বেশ—আমি তোমায় রাজার ঐশ্বর্য্য দিব, অগাধ টাকা,—যদি এক কাজ করিতে পারো!

তাহার চোখ যেন জ্বলিয়া উঠিল! সে কহিল,—বলো, আমি এখনই করিব—যত বড় শক্ত সে কাজ হোক, তবু পিছাইব না।

আমি কহিলাম,—শুধু আমাদের পোষাক বদল করিতে হইবে, ব্যস—আর কিছু নয়!

—এই কাজ! ওঃ, এখনই রাজী আছি! বলিয়াই সে জামার বোতাম খুলিতে লাগিল।

ক্ষিপ্র গতিতে আমি উঠিলাম! বুকটা ধ্বক করিয়া উঠিল। আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়—এখনই সব পণ্ড হইবে! আঃ, ভগবান, ধন্য তুমি! নিমেষে আমি দেখিলাম, আমার সম্মুখে আগাগোড়া সমস্ত দ্বার যেন মুক্ত! কোথাও বাধা নাই, বন্ধ নাই! মুক্ত আকাশতলে আবার আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। মাথার উপর দিয়া পাখীর দল উড়িয়া চলিয়াছে! শীতল বায়ুর স্পর্শ অবধি যেন আমি স্পষ্ট অনুভব করিলাম! সে এক সম্পূর্ণ নূতন জীবন!

সহসা প্রহরীটা থমকিয়া গেল—কহিল,—ওহো! বুঝিয়াছি তোমার মতলব। তুমি পলাইয়া যাইতে চাও?

একটা ঢোক গিলিয়া আমি কহিলাম,—তাই। নহিলে তোমায় টাকা দিব কি করিয়া?

প্রহরী জামার বোতাম আঁটিতে লাগিল। আমার অন্তরের মধ্য দিয়া একটা তীব্র বিদ্যুৎ-শিখা বহিয়া গেল। মাথায় রক্ত চন্ চন্ করিয়া উঠিল।

সে কহিল,—না—তা কি হয়? ও সব হাঙ্গামায় আমি নাই। মরিয়া তুমি টাকার কিনারা করিয়ো ভাই, যেমন বলিলাম। এ ভাবে পলাইয়া? আরো, না—না।

আমি বসিয়া পড়িলাম। পা টলিতেছিল! আশা নাই! কোনো আশা নাই। নিরাশার সুগভীর বেদনায় রুদ্ধ হইয়া আসিল।

## ৩০

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আমি বসিয়াছিলাম। অতীতের সমস্ত কথা মনে পড়িতেছিল—স্বপ্নের বিচিত্র-মধুর কৈশোরের কথা! দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তার এই ভীষণ কণ্টক! সে কথাগুলি তাহার পার্শ্বেই যেন শুভ্র সুন্দর, কুসুমের রাশি!

প্রফুল্ল মুখ, নিশ্চিন্ত হৃদয়, উল্লাসে ভরা প্রাণ—কি সে মধুর দিন! উদ্যানের মাঝে ছুটাছুটি খেলা, সঙ্গীদের নির্ম্মল ভালোবাসা! সে কি সুখ! তার পর কৈশোরের স্বপ্নরাজ্যে নূতন আলোকের উন্মেষ! নিরালা কাননে পাশে ছিল শুধু তরুণী সঙ্গিনী!

দীর্ঘ টানা চোখ, কেশের রাশি, সুগৌর তনু, রক্তিম অধর—অপূর্ব্বরূপা চতুর্দ্দশী পেপা! বাগানে আমরা একত্র কত খেলা করিয়াছি! কত হাসি, কত গান, কত গল্প!

কলহেরও অন্ত ছিল না! তাহার প্রকৃতি ছিল শান্ত, মধুর! পাখীর বাসা চুরি করিয়া হৃষ্ট-চিত্তে ধীরে ধীরে যখন আমি গাছ হইতে নামিতাম, তখন তাহার সে ম্লান চোখ দেখিয়া জ্বলিয়া যাইতাম। সে দিন সে মিনতি করিয়া কহিল,—কেন তুমি বাসা চুরি করো—কেন? আহা, ছোট ছোট ছানাগুলি! ভারী নিষ্ঠুর তুমি!

এত বড় একটা বীরত্বের কাজ সারিয়া আসিলাম, কোথায় সে উৎসাহ দিবে! না, তিরস্কার? পাখীর বাসাটা ছুড়িয়া তাহার মুখে মারিলাম! গৃহে ফিরিলে যখন তাহার

মা জিজ্ঞাসা করিলেন—তোর মুখে ও কিসের দাগ রে? সে অসঙ্কোচে বলিয়া উঠিল,—পড়িয়া গিয়াছিলাম।

তার পর কতদিন আমার স্কন্ধে ভর দিয়া নদীতীরে সে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। গতি কখনও ধীর, কখনও দ্রুত! তীরে দাঁড়াইয়া নদীর তরঙ্গ দেখিতাম। সন্ধ্যা নামিয়া আসিত—চারিদিক ধীরে ধীরে আঁধারে অস্পষ্ট হইয়া উঠিত—মৃদু সঙ্গীতের মত নদীর জল তটের কূলে আছাড়িয়া পড়িত—আমাদের কণ্ঠস্বরও মৃদু হইয়া আসিত! কত গল্প বলিতাম—পল্লীর কথা, রাজকন্যার কথা, ব্যর্থ প্রণয়ের কত সে করুণ কাহিনী! মাঝে মাঝে সঙ্কোচে সরমে সে মুখ নত করিত!

সে এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যা! বাগানের কোণে বাদাম গাছের তলায় আমরা বসিয়াছিলাম।

দৈবাৎ পেপার হাতের রুমাল পড়িয়া গেল। তাড়াতাড়ি সেখানি তুলিয়া আমি তাহার হাতে দিলাম। স্পর্শে হাত কাঁপিয়া উঠিল!

সহসা পেপা কহিল,—এসো, খানিক ছুটি!

সূক্ষ্ম তনু লইয়া সে ছুটিয়া চলিল। বোল্‌তার মত লঘু তাহার সে গতিটুকু! কেশের গুচ্ছ ঝাউয়ের ঝালরের মত ঝরিয়া পড়িতেছিল···গলার সুন্দর রঙটুকু ফুটিয়া উঠিতেছিল—সে যেন ঠিক তামাটে মেঘে বিদ্যুৎ খেলিয়া যাইতেছে!

একটা কূপের পার্শ্বে সে বসিয়া পড়িল—ললাটে মুক্তার মত স্বেদের বিন্দু ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আমি তাহার পাশে আসিয়া বসিলাম। সে হাঁফাইয়া পড়িয়াছিল—নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল—কৃষ্ণ পল্লবের তলে চোখ দুটি যেন শ্বেতপদ্মের মত জাগিয়া ছিল! আমি তাহার পানেই চাহিয়া রহিলাম।

পেপা বলিল,—একটু পড়ি এসো! এখনও ত আলো রহিয়াছে। বই নাই তোমার কাছে?

পকেটে একখানি ভ্রমণ-কাহিনী ছিল। খুলিলাম। আমার স্কন্ধে মাথা রাখিয়া সে পড়িতে লাগিল। আমার পূর্ব্বেই তাহার পড়া শেষ হইতেছিল—তাহার বুদ্ধি বেশ তীক্ষ্ণ!

পাঠ শেষ করিয়া আমার পানে চাহিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, —তোমার পড়া হইয়াছে? তখন আমি সবে মাত্র পড়া সুরু করিয়াছি!

আমাদের উভয়ের কেশাগ্র মিলিল। তাহার নিশ্বাস আমার গালে লাগিল, উভয়ের ওষ্ঠও মিলিত হইল! তার পর যখন বই খুলিলাম, তখন মাথার উপর এক আকাশ নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে!

গৃহে ফিরিয়া সে ডাকিল,—মা, মা, আজ আমরা খুব ছুটিয়াছি! আমার মুখে কথা কেমন বাধিয়া গেল।

তিনি বলিলেন, তুই যে কিছু বলিস না রে? তোর মুখ অমন শুক্‌নো কেন? কি হইয়াছে?

কি হইবে? দুঃখ? না। আনন্দে আমার হৃদয়ের দুই কূল ছাপিয়া গিয়াছিল! সেই স্নিগ্ধ সুন্দর সন্ধ্যার কথা এ জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না!

এ জীবন? হায়, সে আর কতক্ষণ আছে?

৩১

কয়টা বাজিয়াছে জানি না! কিসের একটা মিশ্র শব্দ ভ্রমর-গুঞ্জনের মত কাণে আসিতেছে! বুঝি আমারি শেষ চিন্তাগুলা মাথার মধ্যে বিরাট কোলাহল বাধাইয়া তুলিয়াছে!

অপরাধের কথা ভাবিতে আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিতেছে, কিন্তু এ অনুতাপ এখন আর কেন!

শাস্তির পূর্ব্বে অনুতাপের যে বোঝা বুকে চাপিয়াছিল, এখন তাহা কোথায়? মৃত্যুর কথা ছাড়া আর কিছুরই স্থান হৃদয়ে নাই! অতীতের কথা ভাবিতে গেলেও ফাঁশির রজ্জু ভুলিতে পারি না! মধুর শৈশব, গৌরবোজ্জ্বল কৈশোর, আজ এমনই ভাবে রক্ত মাখিয়া সে লুটাইয়া পড়িবে! অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে রক্ত-নদীর ব্যবধান! যদি কেহ দয়া করিয়া আমার এ জীবনের কাহিনী পাঠ করেন, ঘৃণায় বিভীষিকায় কতখানি তিনি শিহরিয়া উঠিবেন! এ কি বিশ্বাসের যোগ্য কথা! কি রক্তপিপাসু আইন! হা নিষ্ঠুর মানুষ—আমি কি এমনই মন্দ? না, কখনও না।

আর কয় ঘণ্টা পরে সকল চিন্তা, সকল ভাবনার বিরাম ঘটিবে। অথচ সে আজ কয় দিনই বা! যখন নদীর তীরে, গাছের ছায়ায়, পত্র-মর্ম্মর পথে সহজ স্বাধীন চিত্তে স্বচ্ছন্দ গতিতে বেড়াইয়া আমার দিন কাটিত!

৩২

আমার এ রুদ্ধ ঘরের অনতিদূরে সুখের গৃহগুলি তরুণ-তরুণীর সুখগুঞ্জন, শিশুর কলোচ্ছ্বাসের বিহ্বল রাগিণীর উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ! আশা-নিরাশা ও সুখ-দুঃখের বোঝা বহিয়া অসংখ্য নরনারী পথ চলিয়াছে! বালকের দল হাঁকিয়া সংবাদপত্র বিক্রয় করিতেছে। জীবনের কি বিরাট স্ফূর্ত্তি চারিধারে ঝরিয়া পড়িতেছে। আর আমি?

পুরানো দিনের কথা মনে পড়ে। তখন আমি বালকমাত্র! নোতরদমে ঘণ্টা দেখিতে আসিয়াছিলাম। আঁকা-বাঁকা বিস্তর সোপান অন্ধকারে অতিক্রম করিতে আমার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল। উপরে উঠিয়া দেখি, সারা পারি সহরটিকে যেন আমার চরণ-তলে বিচিত্র গালিচার মত কে বিছাইয়া রাখিয়াছে!

তার পর ঘণ্টা দেখিলাম! কি প্রকাণ্ড ঘণ্টা!

কিন্তু আমি সারা সহর দেখিতেছিলাম! নোতরদমের গগনস্পর্শী চূড়া-শীর্ষ হইতে নিম্নে পথের লোকগুলাকে পিপীলিকার মত ক্ষুদ্র দেখাইতেছিল। এমন সময় সহসা আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া ভীমরোলে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল—বজ্রের মত ভীষণ নিনাদ! চূড়া কাঁপিয়া উঠিল! আমার পা কাঁপিয়া উঠিল। আমি মেঝের উপর বসিয়া পড়িলাম। পাষাণের মত নির্ব্বাক বসিয়াছিলাম! ঘণ্টা থামিয়া গেলেও প্রতিধ্বনি অসংখ্য ভ্রমর-গুঞ্জনের মত কাণে বাজিতেছিল!

আজও আমার তেমনই মনে হইতেছে! ঘণ্টাধ্বনি নাই, তবু যেন চারিধারে কোলাহল! একটা অস্পষ্ট শব্দের ঝঙ্কারে শ্রুতি ভরিয়া রহিয়াছে। ললাটের শিরা-গুলা দপ-দপ করিতেছে! ছায়ার মত অস্পষ্ট যেন আমি দেখিতেছি—আমার চারিদিকে অসংখ্য নর-নারী হর্ষ-কোলাহলে মাতিয়া চলা-ফেরা করিতেছে, তাহাদের উল্লাসের চীৎকার না ঐ শুনা যায়!

৩৩

ভিলা হোটেলের সূক্ষ্ম চূড়ার বিচিত্র ঘড়িটাও ঐ দেখা যায়! প্লে দী গ্রীভের পরুষ কঠিন প্রাচীরের পানে ঘড়িটা যেন চাহিয়া রহিয়াছে! কতকালের প্রাচীন জীর্ণ প্রাচীর। রং কালো, এত কালো যে দীপ্ত সূর্য্য-কিরণেও তাহার সে কৃষ্ণ আভা দূর হয় না!

যেদিন কাহারও জীবন ফাঁশির রজ্জু ধরিয়া অজানা লোকের ভীম অন্ধকারে ঝুলিয়া পড়ে, সেদিন প্লে দী গ্রীভের সকল দ্বারগুলার সম্মুখে অসংখ্য প্রহরীর চক্ষুও যেন কি এক কৌতূহলের দৃষ্টি লইয়া জাগিয়া ওঠে! হতভাগ্য মরণ-পথের যাত্রীবাই সে ব্যগ্র দৃষ্টির একমাত্র লক্ষ্য। লুব্ধ দৃষ্টির সম্মুখে আপনার জীবনের সকল কাহিনী সে শেষ করিয়া যায়, আর সন্ধ্যার ম্লানিমার মধ্যে হোটেলের ঐ জলন্ত ঘড়িটা দীপ্ত চন্দ্রের মত ফুটিয়া ওঠে!

৩৪

একটা বাজিয়া পনেরো মিনিট।

আমার এখনকার অবস্থা! মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। কে যেন মাথার মধ্যে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে! যখনই বসি, কিম্বা উঠিয়া দাঁড়াই, মনে হয়, মাথার মধ্যে কিসের একটা রুদ্ধ স্রোত যেন কল্ কল্ করিয়া ছুটিতেছে! যেন মাথার খুলি ভেদ করিয়া এখনই তাহা ছুটিয়া বাহির হইবে।

কি এক আতঙ্কে সারা অঙ্গ শিহরিয়া উঠিতেছে। অঙ্গুলি হইতে লেখনী খশিয়া পড়িতেছে! হাতে যেন তড়িৎ-তরঙ্গ ছুটিয়াছে।

দুই চোখের কোণ জলে ভরিয়া গিয়াছে, যেন আমি ধূমাচ্ছন্ন ঘরের মধ্যে বসিয়া আছি। বাহুমূলে কি এক বেদনা। কিন্তু আর পৌনে তিন ঘণ্টা মাত্র। তার পর আমার সকল যন্ত্রণা জুড়াইবে। চিরদিনের জন্য বিরাম লাভ করিব। কি এ তীব্র, অসহ্য সুখ!

৩৫

কেহ বলেন,—যন্ত্রণা? সে-তো কিছুই নহে—বিজ্ঞানের এমনই কৌশল যে, মৃত্যুর পথে যন্ত্রণা আমায় মোটেই সহিতে হইবে না। মোটে নয়?

এই ছয় ঘণ্টা ধরিয়া যে বেদনায় আমি সারা হইয়া যাইতেছি—ইহার চেয়ে মৃত্যুযন্ত্রণা কি এতই ভীষণ? এই যে প্রতি মুহূর্ত্ত অত্যন্ত ধীর গতিতে চলিয়াছে—আমার মনে হইতেছে, সে দ্রুত ছুটিয়াছে! বেদনার অসংখ্য সোপান বহিয়া আমি মৃত্যু-লোকে চলিয়াছি। অসহ্য যন্ত্রণা!

তবু ইহা কিছুই নয়?

প্রতি শিরা হইতে যেন রক্ত ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। বুকের উপর কে যেন পাষাণ-ভার চাপিয়া ধরিয়াছে—শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে।

কি যন্ত্রণা,—কে বুঝিবে, বুঝাইবেই বা কে? ফাঁশির পর-মুহূর্ত্তে, দ্বিখণ্ডিত নর-শির যদি একবার আসিয়া এ বেদনা বুঝাইতে পারিত, তবে আর যাহাই করুক, বিজ্ঞানের কৌশলের তারিফ্ সে কখনই করিত না—কখনও না!

চোখের পলক পড়িবারও অবকাশ ঘটিবে না। এক দণ্ডে সকলই শেষ হইবে। এই যে অসংখ্য কৌতূহলী দর্শক, এই যে অগণ্য রাজপুরুষের দল,—ইহারা এ যন্ত্রণার মাত্রা কি বুঝিবে! ভীষণ রজ্জু এখনই এক নিমেষে কণ্ঠ চাপিয়া ধরিবে—শরীরের সমস্ত রক্ত স্তম্ভিত রুদ্ধ হইয়া যাইবে। সমুদ্রের গতি রুদ্ধ হইলে রোষে সে যেমন ফুলিয়া উঠে,—বাধা পাইয়া সমস্ত ভিতরটা তেমনি ছুটিয়া বাহির হইবার জন্য বিরাট দ্বন্দ্ব বাধাইবে! হারে হতভাগা জীব, সেই দ্বন্দ্বের ভীষণ নিষ্ঠুর চাপে সব শেষ! ভিতরে-বাহিরে প্রবল সংঘর্ষ—সে কি ভয়ঙ্কর!

৩৬

রাজার কথাই বারবার এখন শুধু মনে পড়িতেছে। আশ্চর্য্য! মন হইতে এ চিন্তা যতই দূর করিবার চেষ্টা করি, ততই সব বৃথা হয়! দুই কাণের পাশে যেন কে বলিতেছে,—রাজা! এমন সময় এই সহরের মধ্যেই এক প্রকাণ্ড প্রাসাদের সজ্জিত কক্ষে তিনি বসিয়া আছেন। আমারই মত অসংখ্য প্রহরী তাঁহার দ্বারে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছে। তিনি প্রতিষ্ঠার উচ্চ আসনে,

আর আমি বন্দ নিম্নে—এই প্রভেদ! তাঁহার জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে—সে কি মহিমা, কি গরিমা, কি যশ, কি উল্লাস! চারিদিকে প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধার নির্ঝর ঝরিতেছে! তাঁহার সম্মুখে তীব্র স্বর শান্ত, দর্পিত শির নত হয়! তাঁহার চোখের সম্মুখে স্বর্ণ-রৌপ্য ঝলশিতেছে। সভাসদ্‌বেষ্টিত রাজাসনে বসিয়া তিনি আদেশ দিতেছেন; সসম্ভ্রমে সকলে সে আদেশ পালন করিতেছে। কখনও মৃগয়া, কখনও ব্যসন—কখনও নৃত্য, কখনও গীত। মুখের কথাটি শুধু একবার বাহির করা, অমনি চারিধারে অসংখ্য লোক বিলাস-প্রমোদের আয়োজনে শশব্যস্ত হইয়া উঠিবে।

রাজা! আমারই মত সে রক্ত-মাংসের জীব, ক্ষুদ্র মানুষ, এই রাজা! অথচ তাঁহারই লেখনীর একটি ইঙ্গিতে শুধু আমার কণ্ঠ হইতে ফাঁশিকাঠ সরিয়া যাইতে পারে। জীবন, স্বাধীনতা, ঐশ্বর্য্য, গৃহ,—সকল সুখ নিমেষে আমার করায়ত্ত হইতে পারে। আরও শুনিয়াছি, চিত্ত তাঁহার করুণায় ভরা! তবু আমার এই প্রাণটা কেহ বাঁচাইবে না,—একটা মানুষের অমূল্য প্রাণ!

৩৭

তবে এসো সাহস! মৃত্যুর বিভীষিকা দূর করিয়া দাও! কিসের আতঙ্ক, কিসের ভয়? এসো মৃত্যু—আমি তোমায় হাসি-মুখে আলিঙ্গন দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। এসো তুমি! মিত্র হও, শত্রু হও, এসো তুমি!

চক্ষু মুদিয়া দেখিব—উজ্জ্বল আলোকে চারিধার ভরিয়া গিয়াছে। আমার আত্মা সে কি আলোকের হ্রদে স্নান করিতে চলিয়াছে। মাথার উপর অনন্ত আকাশ আলোকে উজ্জ্বল, আর নক্ষত্রগুলা সেই শুভ্র আলোকের গায়ে যেন কতকগুলা কৃষ্ণ চিহ্ন! মখমলের মত কোমল আকাশে এখন যেমন হীরার টুকরার মত সেগুলা ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে, তখন আর সেগুলা ঠিক এমন থাকিবে না।

কিম্বা হয়তো হতভাগা আমি দেখিব, মৃত্যুর পারে কোথায় আলো, কোথায় বায়ু! বায়ু ও আলোক-হীন একটা গহ্বরের মধ্যে নামিয়া পড়িয়াছি, আমার চারিধারে অসংখ্য দানব বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে!

হয়তো বা দেখিব, সেই অস্ফুট অন্ধকারে আমার শিরহীন দেহখানা পড়িয়া আছে—আর কবন্ধের চারিধারে ভূত-প্রেতের উপদ্রব বাধিয়া গিয়াছে। সে যেন এক বিপুল ঝড়ের আঘাতে পৃথিবীর কোণের পর্দ্দা সরিয়া গিয়াছে, আর অসংখ্য দানবের দল ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে! চারিধারে নর-কঙ্কালের পর্ব্বত, আর তাহার নিম্নে রক্তের নদী বহিয়া চলিয়াছে! মাথার উপর আকাশে আলো নাই—নক্ষত্রগুলা শুধু অগ্নিময় পাখীর মত উড়িয়া বেড়াইতেছে।

আমার পূর্ব্বে যাহারা ফাঁশিকাঠে প্রাণ দিয়াছে, তাহারা আমার জন্য দল বাঁধিয়া আসিয়া যেন প্রতীক্ষা করিতেছে—তাহাদের ছায়া যেন আমি চোখে দেখিতেছি—সব রক্তহীন শীর্ণ দেহ, কোটরগত চক্ষু, শুষ্ক মুখ,—কি ভীষণ। অস্পষ্ট আলো-আঁধারে দাঁড়াইয়া অতি মৃদু কণ্ঠে তাহারা কথা কহিতেছে। মুখে কাহারও এতটুকু হাসির রেখা নাই। কি এক আতঙ্ক—কি এক অধীর উদ্বেগ—তাহাদের অন্তরে-বাহিরে একটা বিরাট দাগ টানিয়া দিয়াছে। কোনদিকে আর কিছু দেখা যায় না! শুধু ভিলা হোটেলের ঐ নির্ম্মম ঘড়িটা—ফাঁশিকাঠে চড়িবার সময় সে তার রুক্ষ মূর্ত্তি ও রক্ত চক্ষু লইয়া অচঞ্চল দৃষ্টিতে বিদায় দিয়াছিল! জগতে কোথাও আর কিছু নাই—এতটুকু করুণা অবধি নাই!

এমনি নানা কথা মনের মধ্যে আনাগোনা করিতেছে! এক দণ্ড নিষ্কৃতি নাই!

হায়—কি এ মৃত্যু? কে সে? আত্মার সহিত তাহার এত বিরোধ কেন? এক আঘাতে যখন সে দেহটাকে ধূলিসাৎ করিয়া দেয়, তখন মনের এই চেতনা, এই সূক্ষ্ম অনুভূতি, এই প্রেম, স্নেহ, দয়া, মায়া,—এমন সর্ব্বব্যাপী যে চিত্ত—এ সব সে কোথায় উড়াইয়া দেয়? পৃথিবী—কঠিন পৃথিবীর কি এতটুকু মায়া হয় না? এমন শক্তি নাই যে, এই মৃত্যুকে জয় করিয়া সে তাহার স্বহস্তে রচিত এই জীবনটাকে রক্ষা করে? ভগবান, কি বিচিত্র তোমার সৃষ্টি-লীলা! এ কি নিষ্ঠুর রহস্য! নির্ম্মম কৌতুক!

৩৮

একটু নিদ্রার জন্য কাতর হইয়া শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম।

মাথার মধ্যে যেন রক্তের স্রোত বহিয়া গেল। জীবনে ইহাই আমার শেষ নিদ্রা!

স্বপ্ন দেখিলাম!

—স্তব্ধ গম্ভীর রাত্রি! পাঠাগারে দুইজন বন্ধুর সহিত বসিয়া আছি। পাশের ঘরে স্ত্রী নিদ্রিতা—কন্যা মেরি তাহারই বুকের কাছে শুইয়া!

মৃদু স্বরে কথা কহিতেছিলাম। কেহ যেন ভয় না পায়। সহসা একটা শব্দে চমকিয়া উঠিলাম! তখনই সন্ধানের জন্য উঠিলাম! নিশ্চয় চোর আসিয়াছে!

চারিধারে সন্ধান করিলাম! কেহ নাই। জনপ্রাণীর চিহ্নও না!

চিমনির পাশে কি ও? কে?

এক নারী—রুক্ষ কেশ মুখের চারিধারে এলাইয়া পড়িয়াছে—মুখে একটা পরুষ ভাব! সে চক্ষু মুদিয়া ছিল! আমি কহিলাম,—কে তুই?

সে সাড়া দিল না। আমরা কহিলাম,—কে তুই, শীঘ্র বল্। তবু সে কথা কহিল না, চোখ মেলিল না!

বন্ধু কহিল, মুখের কাছে আলোটা ধরো—এখনই ঢিট্ হইবে!

মুখের কাছে বাতি ধরিলাম। তবু মুখে কথা ফুটিল না! আমি কহিলাম,—কথা বল্ না, মাগী! তবু সে অচঞ্চল। আমরা অস্থির হইয়া উঠিলাম। এ কি আপদ আসিয়া জুটিল!

বন্ধু কহিল, মুখে ধরো আলো!

এবার চিবুকের নীচে বাতি ধরিলাম। সে চোখ মেলিয়া চাহিল! কি ভীষণ সে দৃষ্টি! আমি চক্ষু মুদিলাম। সহসা হাতে একটা দংশন-জ্বালা অনুভব করিলাম! উঃ! চোখ চাহিয়া দেখি বন্দীশালা! আমার শয্যার সম্মুখে আচার্য্য দাঁড়াইয়া আছেন!

আমি কহিলাম,—আমি কি অনেকক্ষণ ঘুমাইয়া ছিলাম?

তিনি কহিলেন,—হাঁ! এক ঘণ্টা ঘুমাইয়াছ। তোমার কন্যাকে আনিয়াছি. মেরিকে। দেখিবে না? তোমাকে জাগাইতে না পারিয়া ইহারা আমাকে ডাকিয়াছে। তোমার কন্যা মেরি—

আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম,—মেরি! আমার কন্যা মেরি! কই সে? কোথায়, বলুন! দিন—আমার বুকে একবার তাহাকে তুলিয়া দিন!

৩৯

মেরি! গোলাপের মত তাহার রঙ, আঙুরের মত তুলতুলে কচি ঠোঁট-দুটি—আমার মেরি!

কালো পোষাকটিতে কি সুন্দর তাহাকে মানাইয়াছিল। আমি তাহাকে বুকে তুলিয়া লইলাম, কপালে গালে অজস্র চুমা দিলাম।

আমার পানে বিস্ময়ের সহিত সে চাহিয়াছিল। চোখে যেন কেমন এক ভাব! যেন একটা কাতরতার লক্ষণ! মাঝে মাঝে সে শুধু ঘরের কোণে তাহার দাইয়ের পানে ফিরিয়া চাহিতেছিল। দাই কাঁদিতেছিল।

মেরির গালে চুমা দিয়া বুকের মধ্যে তাহাকে চাপিয়া রুদ্ধ স্বরে আমি ডাকিলাম,—মেরি, মেরি আমার!

অত্যন্ত মৃদু ভাবে আমাকে ঠেলিয়া মেরি আপনার মুখ সরাইয়া লইল। কহিল,—আঃ—আপনি ছাড়ুন আমাকে!

আপনি!

প্রায় এক বৎসর পরে সাক্ষাৎ! এই এক বৎসরে মেরি আমায় ভুলিয়া গিয়াছে। আমার কথা, আমার মুখ, আমার আদর আজ মনের বাহিরে কোথায় সব সরিয়া গিয়াছে! তাহারই বা অপরাধ কি?

আমার এই দীর্ঘ শ্মশ্রু, মস্তকে জটার মত কেশের ভার, শীর্ণ পাণ্ডুর মুখ, কয়েদীর পোষাক, রুদ্ধ ভগ্ন কণ্ঠস্বর—কি করিয়া সে আমায় চিনিবে?

একমাত্র যে আমায় মনে রাখিবে বলিয়া হৃদয়ে সান্ত্বনা ও সুখ পাইতেছিলাম। আজ সে,—সে-ও আমাকে ভুলিয়া বসিয়াছে—চিনিতে পারে না। হা ভগবান!

আজ আমি তাহার "বাবা" নহি! নিজের মেয়ের মুখে পিতৃ-সম্বোধন, কচি ফুলের পাপড়ির মত তাহার হাসিমাখা মুখে সেই মধুর সম্বোধন,—বাবা! আজ আমি তাহা হইতেও বঞ্চিত। কি দারুণ অভিশাপ!

এ সময়, জীবনের এই শেষ মুহূর্তে একবার—শুধু একবার ঐ একটি সম্বোধনের বিনিময়ে আমার কন্যার মুখের ঐ একটি আহ্বান মুহূর্তের জন্য শুনিতে পাইলে চল্লিশ বৎসরের এই সুদীর্ঘ জীবন, আমি হাসি-মুখে ছাড়িয়া দিতে পারিতাম।

মেরি!—তাহার দুই হাত মুঠার মধ্যে পুরিয়া আমি ডাকিলাম,—মেরি, মা আমার—আমাকে চিনিতে পারো না?

সে তাহার উজ্জ্বল দীপ্ত চক্ষু আমার পানে ফিরাইয়া ভৎর্সনার স্বরে কহিল,—না।

আমি কহিলাম,—দ্যাখো, ভাল করিয়া চাহিয়া দ্যাখো—কে আমি?

সে কহিল,—কে আবার আপনি? আপনি একজন ভদ্রলোক। কি অম্লান তাহার কণ্ঠস্বর!

হায়, জগতের যে একটি জীবের হাতে সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছি, যাহার একটা কথা, একটা হাসির জন্য সর্ব্বস্ব বিকাইয়া দিতে পারি, তাহার মুখে আজ এই কথা। তাহার চোখে আজ এই দৃষ্টি!

আমি কহিলাম,—মেরি,—তোমার বাবা আছে?

সে কহিল,—আছেন, বলুন।

আমি কহিলাম—কোথায় সে?

মেরি আমার পানে চাহিয়া বলিল,—তিনি, বলুন।

হা রে কন্যা আমার! হা রে দীর্ণ পিতৃ-হৃদয়ের ব্যাকুলতা! আমি কহিলাম,—কোথায় তিনি?

মেরির চক্ষে নিমেষে একটা ম্লানিমা নামিল। আমি তাহা লক্ষ্য করিলাম। মেরি কহিল, স্বর্গে!

আমি কহিলাম—স্বর্গে? জানো কি মেরি, এ স্বর্গ কোথায়? এ স্বর্গের মানে কি?

মেরির চোখ ছল-ছল করিয়া আসিল।

সে শুধু ঘাড় নাড়িল! আমি মেরির মুখে চুমা দিলাম।

আমি কহিলাম,—মেরি, একবার ভগবানকে ডাকো!

সে কহিল, না মশায়,—দিনে দুপুরে বিনা-কাজে—তাঁহাকে ডাকিতে নাই। সকালে সন্ধ্যায় ডাকিতে হয়! সন্ধ্যাবেলা তাঁহার কাছে আমি প্রার্থনা করিব।

আমার সারা চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিতেছিল! এই কন্যা—এই মেরি—আমার! আমারই সে বুকের ধন! হায়, তবু সে আমার নয়! আমি আজ তাহার কাছ হইতে কত দূরে সরিয়া গিয়াছি! না, না, যেমন করিয়া পারি, তাহাকে বুঝাইব, যে আমিই তাহার সেই "বাবা!" স্বর্গে নয়, নরকে নয়, মর্ত্ত্যে। এই জেলের মধ্যে ফাঁশির জন্য আজ প্রস্তুত হইয়া বসিয়া রহিয়াছি!

আমি কহিলাম,—মেরি, তুমি চিনিতে পারো না,—আমি যে তোমার বাবা।

ভৎর্সনার স্বরে সে কহিল, না—

আমি কহিলাম, কেন মাণিক, আমাকে চিনিতে পারো না। দ্যাখো, চাহিয়া দ্যাখো,—সেই তোমাদের গোলাপ গাছগুলার ধারে চাতালে বসিয়া তোমাকে কত গল্প বলিতাম—পরীর গল্প, রাজার গল্প—

মেরির ছোট মুখখানি আবার আমি বুকে চাপিয়া ধরিলাম।

মেরি কহিল,—আঃ, ছাড়ো, লাগে!

তখন তাহাকে আমার হাঁটুর উপর বসাইয়া আমি বলিলাম,—তুমি পড়িতে জানো?

জানি!

একখানা খপরের কাগজ টানিয়া একটা জায়গা খুলিয়া আমি তাহার সম্মুখে ধরিলাম। সে পড়িতে লাগিল,—প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামী—

হঠাৎ সবলে আমি কাগজখানা টানিয়া লইলাম। কাগজখানা তাহার ধাত্রী কিনিয়াছিল। কাগজওয়ালারা খুব বড় বড় অক্ষরে আমার নামে জয়ধ্বজা তুলিয়া দিয়াছে! ফাঁশির তামাসা দেখিবার জন্য লক্ষ দর্শককে সমারোহের সহিত বিজ্ঞাপন দিয়া ডাকিয়াছে!

আমার মনের ভাব কালীর অক্ষরে বুঝাইবার নয়! আমার সে রুক্ষ শুষ্ক মূর্ত্তি দেখিয়া মেরি ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল! সে বলিল, দাও, আমার কাগজ দাও! আমি জাহাজ তৈয়ার করিব!

ধাত্রীর হাতে কাগজ দিয়া আমি কহিলাম,—ইহাকে লইয়া যাও—আর বাড়ীতে বলিয়ো—

মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল! কি বলিব,—জানি না! তার পর জানালার ধারে চেয়ারে আমি বসিয়া পড়িলাম। চক্ষু মুদিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিলাম। মাথার মধ্যে সোঁ সোঁ করিয়া রক্তের স্রোত ছুটিয়াছিল!

কোথায় তাহারা—যমালয়ের সেই দুরন্ত দূতগুলা আসুক। আর কি! জগতে আমার কেহ নাই, কিছু নাই, জীবনে আমার স্পৃহাও নাই! যে শিকল দিয়া ইহলোকের সহিত গাঁথা ছিলাম—আজ সে শিকলও ছিন্ন হইয়াছে! তবে আর কেন,—আর কেন এ মমতা?

## ৪০

আচার্য্যের হৃদয়ে করুণা আছে, কারাধ্যক্ষের প্রাণটাও পাষাণে গঠিত নয়! ধাত্রী যখন মেরিকে লইয়া গেল, তখন তাহাদের চোখেও জল আসিয়াছিল।

শেষ! এখন সব শেষ! শুধু সাহস, বল! পথে বিপুল জনতা, ফাঁশিকাঠের নিকট অগ্রসর হওয়া! তার পর কোথায় রহিবে জগৎ, আর কোথায়ই বা আমি!

## ৪১

কেহ হাসিবে, কেহ আনন্দে করতালি দিয়া উঠিবে, কেহ বা চীৎকার করিবে! অথচ ইহাদের মধ্যেই কত লোক—অদূর ভবিষ্যতে আমার পথের পথিক হইতে পারে! আমার জন্য আজ যাহারা তামাসা দেখিতে আসিয়া দল বাড়াইয়াছে, একদিন আবার তাদেরই মধ্যে কত লোক নিজেদের প্রয়োজনে এখানে আসিবে!

## ৪২

মেরি! মাণিক আমার!

ধাত্রী তাহাকে লইয়া গিয়াছে! বাড়ীর জানালার মধ্য দিয়া সে এই বিপুল জনতা নিশ্চয় লক্ষ্য করিবে, দেশে আজ মস্ত তামাসার আয়োজন হইয়াছে! কিন্তু এই ভদ্রলোকটির কথা তখন তাহার মনেও থাকিবে না। অথচ এই 'ভদ্রলোক'কে দেখিবার জন্যই আজ এত লোক আসিয়াছে এবং সেই ভদ্রলোক আর কেহই নহে, তাহার সেই স্বর্গগত "বাবা"।

তাহার জন্য কয়েক ছত্র লিখিয়া যাই। একদিন সে পড়িয়া বুঝিবে এবং পনেরো বৎসর পরে আজিকার দিনে এই মুহূর্ত্তটির কথা ভাবিয়া সে কাঁদিয়া সারা হইয়া যাইবে!

হাঁ! আমার সমস্ত কাহিনী তাহার জন্য লিখিয়া যাই! সমস্ত কথা অকপটে খুলিয়া বলিব। আমার সমস্ত ইতিহাস। কেন আজ দেশের বুকে রক্তের অক্ষরে আমার নাম চিরদিনের জন্য লেখা হইল! সেই কাহিনী-টুকু এই কয় মুহূর্ত্তের মধ্যে লিখিয়া ফেলি!

## ৪৩

আমার কাহিনী

[ সম্পাদকীয় বক্তব্য—বহু সন্ধানেও এই কাহিনীটি আমরা খুঁজিয়া পাই নাই। বোধ হয়, সময়-অভাবে বন্দী এই কাহিনী লিখিয়া যাইবার অবসর পান নাই। ]

## ৪৪

ভিলা হোটেলের কক্ষ হইতে।

ভিল হোটেল!···আমি এখানে আসিয়াছি! সে স্থানটা—ঐ যে আমার এই জানলার নীচেই! বিস্তর

লোক জমিয়াছে। কেহ চীৎকার করিতেছে! কেহ শিষ দিতেছে। কেহ বা হাসিতেছে।

এখন সাহস—শুধু সাহস! ঐ লাল রঙের কাঠের থাম দুইটা দেখিয়া আমার বুক কাঁপিয়া উঠিয়াছে!

কয়টা কথা শুধু বলিয়া যাইতে চাই! সরকারী উকিলকে ডাকিয়া পাঠানো হইয়াছে। তাঁহার জন্যই প্রতীক্ষা করিয়া আছি। যেটুকু সময় তবু এমনি করিয়া পাওয়া যায়!

ঐ যে কাহারা আসে! তবে সময় হইয়াছে! আর বিলম্ব নাই! সমস্ত দেহ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে! এই ছয় ঘণ্টা ধরিয়া, ছয় মাস ধরিয়া যাহা ভাবিতেছিলাম—তাহা ঘটিতে চলিল! এতক্ষণ ভাবিয়াছি—তবু মনে হইতেছে, এ মুহূর্ত্তটা কি অতর্কিতভাবে আজ আসিয়া পড়িল!

কতকগুলা অলিগলি, সোপান-শ্রেণী ঘুরাইয়া আমাকে লইয়া চলিল। শেষে একটা ছোট ঘরে আনিয়া দাঁড় করাইল। ছোট বায়ু-পথের মধ্য দিয়া আকাশ দেখা যাইতেছে। চারিধার কুয়াশায় ভরিয়া গিয়াছে! রৌদ্র নাই! আমি চেয়ারে বসিলাম।

ঘরে আরও তিন-চারি জন লোক ছিল—আচার্য্য ছিলেন!

সহসা আমার কেশে লৌহের শীতল স্পর্শ অনুভব করিলাম। কাঁচির শব্দ স্পষ্ট শুনিলাম। কেশের ভার নিমেষে আমার পদতলে লুটাইয়া পড়িল! আমি স্থিরভাবে বসিয়াছিলাম। আশ-পাশে সকলে চুপি চুপি কথা কহিতেছিল!

একজন কহিল, এ কি হইতেছে?

আর একজন কহিল,—মাথার চুলগুলা কাটিয়া—দাড়িটা কামাইয়া তবে লইয়া যাইবে।

চোখ তুলিয়া দেখি—কাগজের তাড়া ও পেন্সিল লইয়া একটা লোক প্রশ্ন করিতেছে—বুঝিলাম, সে কোন পত্রিকার সংবাদ-দাতা! কালিকার কাগজের জন্য তথ্য-সংগ্রহে আসিয়াছে! কাল ভোরে সংবাদপত্রের বাজারে আমার বিষয় লইয়া মহা ধূম বাধিয়া যাইবে! রোজগারের মরশুম! হায়, তখন কোথায় আমি?

একটা প্রহরী আসিয়া আমার হাত ধরিল। আমি কহিলাম,—আঃ!

সে কহিল,—ক্ষমা করিবেন। আপনার কি ব্যথা লাগিল?

এই সে লোক,—আমাকে যে ফাঁশিকাঠে ঝুলাইবে! সরকারী জল্লাদ! যে হাতে আমাকে সে স্পর্শ করিয়াছে, সেই হাতে কত লোকের সে প্রাণ লইয়াছে! এমন তাহার ভদ্র কথাবার্ত্তা—এমন শান্ত সুর! আশ্চর্য্য!

একটা সূক্ষ্ম দড়িতে আমার পা দুইটা ইহারা আল্‌গা করিয়া বাঁধিয়া দিল—যাহাতে আমার গতি লঘু হয়—দ্রুত না চলিতে পারি!

আচার্য্য ডাকিলেন,—এসো বৎস!

দুইটা প্রহরী আমার দুই হাত ধরিল। আমি ধীর-পদক্ষেপে আচার্য্যের অনুসরণ করিলাম।

বাহিরের দ্বার খুলিয়া গেল! খানিকটা কোলাহল, দমকা ঠাণ্ডা বাতাস ও অস্ফুট আলোক-তরঙ্গ একসঙ্গে ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল! বাহিরে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে। এই বৃষ্টি একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া আজ দেশের নরনারী এমন বীভৎস হৃদয়হীন অভিনয় দেখিতে আসিয়াছে! কি নির্লজ্জ কৌতুক-স্পৃহা! কাতারে কাতারে লোক দাঁড়াইয়াছে। ছাতা-টুপির সংখ্যা হয় না! চারিধারে সশস্ত্র প্রহরীর দল। পাছে কোনরূপ শান্তিভঙ্গ হয়! আমি বাহিরে আসিলেই চীৎকার উঠিল, —ঐ-ঐ-ঐ যে আসিয়াছে! একধারে বিপুল কর-তালির ধ্বনি উঠিল! রাজার যোগ্য সম্মানে আমি পথ চলিয়াছি! চমৎকার!

বাহিরে একটা ছোট ঠেলা গাড়ী ছিল। তাহাতে চড়িলাম। সশস্ত্র কয়েকজন প্রহরী গাড়ীর চারিধার ঘিরিয়া দাঁড়াইল। গাড়ী চলিল।

একদল ছেলে চীৎকার করিয়া উঠিল, "নমস্কার, মশায়! আর একজন কহিল—বহুৎ আচ্ছা। সুপ্রভাত!

একটি স্ত্রীলোক কহিল,—আহা, কাহার বাছা মরিতে চলিয়াছে গো!

চারিধারের এই বিকট কোলাহলে মনে সাহস আনিলাম।

পথে আমার জন্যই আজ এ বিপুল জনতা। আর একজন কহিল,—টুপি খুলিয়া ফ্যালো সব। সম্মান দেখাও!

যেন আমি রাজা চলিয়াছি!

আমি হাসিলাম। হায়, ইহারা টুপি খুলিতেছে—আমাকে মাথাটা খুলিয়া দিতে হইবে! ফুলের বাজারের পাশ দিয়া গাড়ী চলিতেছিল। মিষ্ট গন্ধে প্রাণ যেন মাতিয়া উঠিল। লাল, নীল, সাদা, নানা রঙের ফুলে শোভাও সুন্দর হইয়াছিল। বাজারে, বাড়ীতে—কোথাও তিলমাত্র স্থান নাই। লোক—কেবলই লোক—ঠাশাঠাশি ঘেঁষাঘেঁষি লোক! বাড়ীওয়ালারা বেশ দুই পয়সা কামাইয়া লইয়াছে! ক্রমে ভিড় বাড়িল! মুখে প্রফুল্লতা আনিবার জন্য প্রাণপণে আমি চেষ্টা করিতেছিলাম—কেহ যেন কাপুরুষ না মনে করে!

কিন্তু হায়—বৃথা দর্প! জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে এখনও এত মায়া কিসের জন্য? লোকের স্তুতি-নিন্দার প্রতি, এত শ্রদ্ধা, এত আগ্রহ কেন!

আচার্য্যের হাত হইতে ক্রশ লইয়া বুকে চাপিলাম, একান্ত আগ্রহে বলিলাম,—দয়া করো প্রভু—দয়া করো—বল দাও! ভগবান, হে আর্ত্তের বন্ধু!—

সমস্ত বাহ্য জগৎ ভুলিয়া চিন্তার মধ্যে মগ্ন হইবার সঙ্কল্প করিলাম! কিন্তু লোকের কোলাহলে একাগ্রতা ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। কেমন একটা কম্পন আসিল। সারা অঙ্গ তখন বৃষ্টির জলে ভিজিয়া উঠিয়াছে। আচার্য্য কহিলেন,—তুমি কাঁপিতেছ? শীত লাগিতেছে বুঝি?

মুখে বলিলাম, হাঁ! কিন্তু ভগবান জানেন, এ কাঁপন কিসের জন্য!

কয়েকটি নারীর করুণ সমবেদনার কথা কাণে গেল—আমার এই তরুণ বয়স দেখিয়া করুণায় তাহারা গলিয়া গিয়াছে!

ক্রমে সেই স্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম। আমার দৃষ্টি ও শ্রুতি-শক্তি ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিল। এই কোলাহল, এই অগণিত পরিচিত-অপরিচিত নর-শির—আমি উন্মাদের মত হইয়া পড়িলাম! এতগুলা লোক আমার পানে চাহিয়া আছে—ইহা ভাবিয়া অস্থির হইয়া পড়িলাম!

ক্রমে সেই মিশ্র কোলাহলের একটি বর্ণও আর আয়ত্ত করা দুরূহ হইয়া উঠিল। সমস্ত মিলিয়া একটা ক্ষীণ প্রতিধ্বনির মত কাণে বাজিতেছিল!

দোকানের নাম ও রাস্তার বিজ্ঞাপনগুলা আপনার মনে পড়িয়া যাইতে লাগিলাম!

একধারে নদী,—চোখে পড়িল। উপরে ছায়ার মত একটা উচ্চ চূড়াও অল্প দেখা যাইতেছে। ইহার মধ্যে কখন্ যে সেতু পার হইয়া এপারে আসিয়া পড়িলাম—জানিতে পারিলাম না!

সহসা গাড়ী থামিয়া গেল। আমি শিহরিয়া চাহিয়া দেখি, সম্মুখে সেই ফাঁশিকাঠ!

আচার্য্য বলিলেন, মনে এবার বেশ সাহস আনো!

তার পর আমার হাত ধরিয়া প্রহরীগুলা আমাকে উপরে তুলিল! মাতালের মত আমার পা টলিতেছিল, মাথা ঘুরিতেছিল।

আচার্য্যকে বলিলাম,—একটা কথা আছে।

তিনি কহিলেন,—কি?

আমি কহিলাম,—একটু সময় দিন। ক্ষমা—ক্ষমার জন্য আমি প্রার্থনা করিয়াছি···যদি দয়া হয়, যদি ক্ষমা মেলে! দোহাই আপনার! দয়া করিয়া একটু সময় দিন! একটু শুধু! আমি মরিয়া গেলে তখন যদি ক্ষমার খপর আসে, তখন আর কোন উপায় থাকিবে না! তাই—

আচার্য্য সরিয়া গেলেন। প্রহরী আসিয়া বলিল,—আসুন—সময় হইয়াছে!

আমি কহিলাম,—দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও ভাই! ক্ষমার খপরটা আসিতে দাও। এখনই দূত আসিয়া পৌঁছিবে—এমন তো কত-শত হইয়াছে! শুধু সময় দাও,—একটু সময়। তাহাতে কাহারও কোন ক্ষতি হইবে না!

সে কথা কেহ কাণেও তুলিল না।

ওঃ!—ঐ সব উৎসুক দর্শকের সারি! কি বিকট তাহাদের চীৎকার-ধ্বনি! মানবের কণ্ঠে ভাষা এমন পরুষ, এত ভীষণ!

তবে কি কেহ আমাকে রক্ষা করিবে না? কেহ বাঁচাইবে না? ক্ষমা হায়, কিছুতেই মিলিবে না?

প্রহরী দুইটা যমদূতের মত আসিয়া আমার হাত ধরিল। ফাঁশিকাঠের নিকটে আনিয়া আমায় দাঁড় করাইল।—আমার চারিধারে একটা কালো পর্দ্দা খাটাইয়া দিল। ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া চারিটা বাজিতেছে!

**শেষ**

# কঙ্কণা

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

শ্রদ্ধেয়

৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

স্মৃতিকল্পে

মহাশয়

প্রথম যৌবনে সঙ্কোচের অন্তরাল হইতে আনিয়া আমার লেখা ছোটগল্পগুলিকে আপনিই 'সাহিত্য'-পত্রে ছাপিয়ে গল্প-রচনায় আমাকে উৎসাহিত করেন। তার পর আপনার উৎসাহেই গল্প লেখায় আমার অনুরাগ বাড়ে।

আপনার স্মৃতি-পূজাকল্পে এ গল্পগুলি তাই আপনাকেই উৎসর্গিত করিলাম।

স্নেহমুগ্ধ

সৌরীন্দ্র

দোল-পূর্ণিমা. ১৩৪০

# কঙ্কণা

## মৃত্যুবাণ

### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### কবিরাজী ঔষধ

দক্ষিণেশ্বরের বিখ্যাত কালী-মন্দিরের একটু উত্তরে এবং শিবতলা ফেরি-ঘাটের ঈষৎ দক্ষিণে গঙ্গার ধারে পাশাপাশি দুখানি বাড়ী। জল-পথের যাত্রীরা বাড়ী দুখানি দেখিয়া তারিফ করে। এই বাড়ীর একখানির মালিক দোলগোবিন্দ চাটুয্যে; আলিপুরের ফৌজদারী আদালতে এককালে তাঁর অসাধারণ পশার-প্রতিপত্তি ছিল। তাঁর জেরার তীক্ষ্ণ বাণে অতি-যত্নে গাঁথা পাকা মকর্দ্দমাও একেবারে টুকরা-টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িত। চার বছর ডিস্‌পেপ্‌সিয়া রোগে জ্বালাতন হইয়া বিস্তর ডাক্তার-কবিরাজ দেখাইয়া আলমোরা নৈনীতাল হইতে সুরু করিয়া রাঁচি, মধুপুর ঘুরিয়া চন্দননগরে বাসা বাঁধিয়াও যখন শরীরে জুৎ পাইলেন না, তখন এই দক্ষিণেশ্বরের পৈতৃক ভিটায় আসিয়া তিনি আশ্রয় লইলেন। সে আজ এক বছরের কথা। সম্প্রতি আগড়-পাড়ার কাছে এক কবিরাজ পাওয়া গেছে। তাঁর নাম মৃত্যুঞ্জয় ব্যাকরণতীর্থ কবিভূষণ। কবিরাজ মহাশয় জাতে বৈদ্য; মেডিকেল কলেজে দুই বৎসর পড়িয়া বিলাতী চিকিৎসা-বিদ্যায় অধিক অগ্রসর হওয়ার সুযোগ না পাইয়া পূর্ব্বপুরুষের বটিকা-তৈল ও চূর্ণাদি লইয়া ব্যবসা সুরু করিয়াছেন; এবং নিরুপায় দোলগোবিন্দ সম্প্রতি আরোগ্য-লাভের আশায় মেডিকেল-কলেজে-পড়া এই বৈদ্যের হাতেই আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

পাশের বাড়ীতে থাকেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়—বেঙ্গল পুলিশে চাকরি করিয়া নানা ঘাটের জল খাইয়া, এ্যাসিষ্টান্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টের দুর্লভ পদে কয়মাস এ্যাক্টিনি করিয়া চাকুরি হইতে অবসর লইয়াছেন এবং জীবনের বাকী দিনগুলি পৈতৃক ভিটায় কাটাইয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়া জীর্ণ গৃহের সংস্কার-বর্দ্ধন প্রভৃতির দ্বারা তাকে হাল-ফ্যাশানের অনুরূপ গড়িয়া সেইখানে বাসা বাঁধিয়াছেন।

শৈশবে এক স্কুলে পড়াশুনা, একই মাঠে খেলাধূলা, একই ঘাটে স্নান,—তার পর কয় বৎসরের দীর্ঘ বিচ্ছেদ! দুই বন্ধু পরিণত বয়সে আবার আসিয়া পাশাপাশি মিলিয়াছেন। এ কয় বৎসরে দু'জনের জীবনে বসন্তের হাওয়ার পরশ যেমন লাগিয়াছে, বৈশাখী ঝঞ্ঝারও তেমনি অন্ত ছিল না!···কবে সেই কৈশোরে জীবনের পথে ছাড়াছাড়ি! তার পর বিভিন্ন পথে এতকাল চলিয়া আবার দেখা। আচারে ব্যবহারে অনেক পার্থক্য ঘটিয়াছে! বার্লি পান করিয়াও দোল-গোবিন্দ জোয়ানের বড়ি খোঁজেন, আর ত্রৈলোক্যনাথ একটা পাঁটার মুড়ি আরো পাঁচটা ব্যঞ্জনের সহিত ভোজন করিয়াও অনায়াসে তাহা পরিপাক করেন! দোলগোবিন্দ সকালে লেবুর রস পান করেন; আর ত্রৈলোক্যনাথ পান করেন দু' পেয়ালা গরম চা। দোলগোবিন্দ গোলমাল সহ্য করিতে পারেন না; আবার গোলমাল পাইলে ত্রৈলোক্য-নাথের বোখ চাপিয়া যায়। দোলগোবিন্দর গোয়ালে গরু, খাঁচায় পাখী, পায়ের কাছে আইরিশ টেরিয়ার—ত্রৈলোক্য-নাথ এই সব পশু-পক্ষী দু'চক্ষে দেখিতে পারেন না—ঘর নোংরা করিবার তারা একখানি! ত্রৈলোক্যনাথ সৌখীন, ফুল-ফলের গাছের সখ তাঁর প্রচণ্ড। ফৌজ-দারী উকীল হইলেও দোলগোবিন্দর মেজাজ এখন শান্ত, তবে গোঁ ভীষণ; আর ত্রৈলোক্যনাথ পাকা পুলিশ অফিসার ছিলেন মেজাজ এখনও তেমনি আছে। তা থাক! দুই বন্ধু আবার বহু কালের বিচ্ছেদের পর পরস্পরকে আরামে গ্রহণ করিলেন।

সেদিন দোলগোবিন্দর গৃহে বসিয়া দোলগোবিন্দ ও ত্রৈলোক্যনাথ নিম্নলিখিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। দোলগোবিন্দর হাতে ছিল কাগজের মোড়কে কয়েকটি বটিকা আর ত্রৈলোক্যনাথের হাতে আইরিশ শসার বীজ।

দোলগোবিন্দ কহিলেন—কবিরাজ মশায় বললেন, এ ঔষধটি তিনি প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য জিনিষের সারাংশ মিশিয়ে তৈরী করেছেন। বলেছেন, অগ্নিমান্দ্যের পক্ষে এ অমোঘ। নাম, হরপিঙ্গলজটা-ভাইটা-বটিকা। অর্থাৎ এতে প্রচুর ভাইটামিন আছে···

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন—বটে!

দোলগোবিন্দ কহিলেন—হাঁ, কবিরাজ মশায় বললেন, সব কটা ভাইটামিনই এতে আছে, শুধু ভাইটামিন এল্ ছাড়া…

একটু বিস্ময় ও আগ্রহের সহিত ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন—ভাইটামিন এল্ নাই? তাই তো!

ভাইটামিন দ্রব্যটা কি,—সে সম্বন্ধে ত্রৈলোক্যনাথের কোনো জ্ঞানই ছিল না। আজকালকার মাসিক-পত্র তো তিনি পড়েন না! ক্রিমিনাল প্রোসিডিয়োর কোড ও পেনাল কোড—দুখানি কোড্-বহির সমস্ত ধারা তিনি গড়গড় করিয়া আজো মুখস্থ বলিয়া যাইতে পারেন,… তার মধ্যে ভাইটামিন বলিয়া কোনো দ্রব্য তো কোথাও নাই! তবু…

দোলগোবিন্দ কহিলেন,—তা সব জিনিষই তো পাওয়া যায় না জগতে! একটি বড়ী সকালে, আর একটি রাত্রে শুতে যাবার সময়…এক মাসে আশ্চর্য্য ফল পাবো! অনুপান এক চামচ মধু আর আধ চামচ বাইকার্ব্বোনেট অফ সোডা। আর এই ওষুধ খাবার পর এক পেয়ালা করে ছাগল-দুধ। তবে ছাগলটি নীরোগ হওয়া চাই।

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—তার জোগাড়ও হয়েচে। আমার মুহুরি ঐ অবিনাশ। শেয়ালদা থেকে একটি নীরোগ ছাগল কিনে আনচে…ওর সন্ধানে ছিল একটি…

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—কিন্তু ছাগল রাখবে কোথায়? ত্রৈলোক্যনাথ ঘরের চতুর্দ্দিকে চাহিলেন; তার পর কহিলেন,—ভারী নোংরা জানোয়ার! তা ছাড়া তোমার ঐ শাকসব্জী লাগিয়েচো, ও সব মুড়িয়ে খেয়ে ফেলবে!

দোলগোবিন্দ কহিলেন—ঐ বাগানের কোণে একটি ঘর করে দেবো…খাশা থাকবে! এ তো কলকাতা সহর নয় যে শোবার ঘরের পাশে বারান্দায় ছাড়া জায়গা মিলবে না!

শেষের কথাগুলা ত্রৈলোক্যনাথের কাণে গেল না! তিনি কহিলেন,—কোন্‌খানে রাখবে?

দোলগোবিন্দ কহিলেন,—উত্তর ধারে ঐ যে বড় জামগাছটা আছে, ওর তলায়…খোলা জায়গা আছে খানিকটা; রোদ আসবে, হাওয়া পাবে…

উত্তর ধারে জামগাছের কাছে! ত্রৈলোক্যনাথ শিহরিয়া উঠিলেন। সর্ব্বনাশ! একেই তো বন্ধুর এই কুকুর আর গোরুর জ্বালায় তিনি তটস্থ! গোরুটা এক-বার তাঁর বোর্ডার হইতে আনা সখের কলাগাছ খাইয়া ফেলিয়াছিল,—তার উপর ছাগল দোশর জুটিতেছে! তিনি কহিলেন,—ওই আমার বেড়ার ধারে! …কিন্তু বেড়ার ধারে যে আমার সীজন্ ফ্লাওয়ারের সব বীজ ছড়িয়েচি! তার পর ওখানটায় কাশ্মীরী চন্দ্রমল্লিকা লাগিয়েচি! কি খরচ করেই জমি বানিয়েচি! আমার অত সাধের ফুলগাছ একটিও রাখবে না যে!…

হাসিয়া দোলগোবিন্দ কহিলেন,—মাঝখানে তো বেড়া আছে!

—না, না, না, না…ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন—তা হবে না। তুমি দক্ষিণদিকে তোমার ছাগল রাখো…

দোলগোবিন্দ কহিলেন,—তা হয় না। দক্ষিণদিকে গোয়াল, মুলতানী গোরু। তা ছাড়া ওদিকে তোমার দেওয়া সেই গোপালে-খোপা আমের চারাটা লাগিয়েচি…

বটে! নিজের গাছগুলিকে সাবধানে বাঁচাইয়া রাখিয়া পরের গাছের দিকে ছাগল লেলাইয়া দিবে! ত্রৈলোক্যনাথের মনের মধ্যে দুরন্ত পুলিশ অফিশার পুরা ইউনিফর্ম্ম আঁটিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল। এত কাল ধরিয়া তিনি স্থলে-জলে দোর্দ্দণ্ড শাসন চালাইয়া আসিয়াছেন·· যাকে যা হুকুম করিয়াছেন, তাই তামিল হইয়াছে। আর…না, —তার উপর তাঁর চোখের সামনে নানা রঙের ফুলে রঙীন বাগানখানি বিপুল শোভায় ভরিয়া জাগিয়া উঠিল। বড় বড় চন্দ্রমল্লিকা ব্ল্যাকপ্রিন্স,…সে সব গাছ এক দুরন্ত ছাগলে যেন মুড়াইয়া খাইতেছে! শিহরিয়া তিনি কহিলেন,—তা হবে না। আমার বেড়ার ধারে তোমার ছাগল রাখা হতেই পারে না।

ফৌজদারী উকীলের গোঁ দোলগোবিন্দর মনেও ফোঁশ করিয়া উঠিল। কত বড় পুলিশ অফিসারকে জেরায় জর্জ্জরিত বিপর্য্যস্ত করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন! পুলিশের সাহেব ডেপুটী কমিশনার অবধি তাঁর জেরায় প্রচণ্ড পৌষের শীতে ঘামিয়া একশা হইয়া গিয়াছে, আর এ তো বেঙ্গল-পুলিশের একটা এ্যাক্টিং সুপারিনটেণ্ডেণ্ট! তা ছাড়া হক্—'রাইট'! বড় বড় আইনের কেতাবগুলা বার-লাইব্রেরীর আলমারির কোণ হইতে তাঁর মাথার মধ্যে ছুটিয়া আসিয়া নৃত্য করিতে লাগিল! দোল-গোবিন্দ আত্মসম্মান-রক্ষায় আর জুলুম-জবরদস্তির প্রতি-কারে প্রয়াসী চিরদিন।

দোলগোবিন্দ কহিলেন,—আমার জমির যেখানে খুশী আমি ছাগল রাখবো, গণ্ডার রাখবো, বাঘ রাখবো, ভাল্লুক রাখবো, তাতে কার কি আপত্তি থাকতে পারে!

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—পেনাল কোডের ২৮৯ ধারাটি ভুলে যাচ্ছো ভাই…বলিয়া তিনি আবৃত্তি করিয়া চলিলেন,—

Whoever knowingly or negligently omits to take such order with any animal in his possession as is sufficient to guard against any probable danger to human life or any probable danger of grievous hurt from such animal shall be punished with

imprisonment of either description for a term which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both,

হাসিয়া দোলগোবিন্দ কহিলেন,—কিন্তু এ নিরীহ ছাগল! Human lifeকে endanger করবে কি করে?

ত্রৈলোক্যনাথ ঝাঁজিয়া উঠিলেন। এ ধারার জন্য …তাইতো, গাছপালার কোন উল্লেখ নাই! Mischief-এর নামগন্ধও নাই এ ধারায়! তিনি কহিলেন,—ছাগলের তো শিং আছে—গুঁতুতে পারে। যদি গুঁতোয়?

দোলগোবিন্দ কহিলেন,—যদি গুঁতোয়! যদি! 22 Calcutta-খানা খুলে ছাখো গে…বলিয়া তিনি কৌতুকে-ভরা দৃষ্টিতে ত্রৈলোক্যনাথের পানে চাহিলেন।

ত্রৈলোক্যনাথ কি ভাবিতেছিলেন; হঠাৎ বলিলেন, —২৬৮ ধারা! Public nuisance…সেটা মনে আছে? দুর্গন্ধ! ছাগলের গায়ে বোটকা গন্ধ…

দোলগোবিন্দ কহিলেন,—খুব মনে আছে। এ বোকা ছাগল নয়। বোকা ছাগল হলে তার দুর্গন্ধ… তাও 12 Bombay দেখো…বাইরামজীর কেশ রিপোর্টেড আছে। তাতে স্পষ্ট বলেচে—সেটা public nuisance হবে না, private nuisance. এবং therefore not one falling within the purview of the criminal law, কিন্তু তাও প্রমাণ-সাপেক্ষ, matter of evidence।

দোলগোবিন্দ হাসিলেন; হাসিয়া কহিলেন,—ও সব আইনের ভয় দেখিয়ো না। অনেক হাকিমকে আমি আইন শিখিয়ে এসেচি। তুমি তো বেঙ্গল পুলিশের তুচ্ছ একজন এ্যাক্‌টিং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলে হে! বলে, কত আইনের সৃষ্টি করে এলুম…

আইনের তর্কে ত্রৈলোক্যনাথ টিঁকিতে পারিলেন না। তিনি কহিলেন,—তুমি তাহলে তোমার বাগানের দক্ষিণে ছাগল রাখবে না?…লক্ষ্মীছাড়া ছাগল!

দোলগোবিন্দ কহিলেন,—না। লক্ষ্মীছাড়া ছাগল নয়। আমি মোটা দাম দিয়ে কিনচি…

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—আমার গাছপালা নষ্ট করে দেবে! অত দামী ফুল-ফলের গাছ…!

দোলগোবিন্দ কহিলেন,—মাঝখানে বেড়া আছে। তা ছাড়া আমার ছাগল বাঁধা থাকবে।

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—দড়ি ছিঁড়তে পারে না? …তখন?…জলপাইগুড়িতে দুটো ছাগলের কেশ করে এসেচি…

দোলগোবিন্দ কহিলেন—জলপাইগুড়ির ছাগল দড়ি ছিঁড়েচে বলে দক্ষিণেশ্বরের ছাগলও দড়ি ছিঁড়বে, এমন কোনো কথা নেই!…

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—তবু সে ছাগল!…মানুষ নয়…

দোলগোবিন্দ কহিলেন,—ছাগল ছাগলই হয়। ছাগল মানুষের মত হবে, এ কোনো দিন কেউ আশাও করে না! কোথায় কার ফুলগাছ আছে, যদি খায়, এর জন্য পড়শীরা ছাগল পুষবে না, এ কেমন কথা!

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—বেশ তো, ছাগল তুমি পোষো—ছাগল-দুধ খাও—তাতে আমার কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। আমার আপত্তি শুধু উত্তর দিকের ঐ কোণ নিয়ে। আমার ফুলগাছগুলো, তা ছাড়া আমার দক্ষিণের হাওয়াটুকু দুর্গন্ধে ভরে উঠবে…

দোলগোবিন্দ কহিলেন,—আমি মুর্দ্দফরাস নই। ছাগল পুষচি বলে সত্যি সত্যি কিছু আর ও জায়গাটুকুকে নরককুণ্ড করে রাখবো না। আমিও এই ভিটায় বাস করি। তোমার যেমন হাওয়ার দরকার, আমারো তেমনি…

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—বেশ। আমি বাঘ পুষবো। আর সে বাঘকে ঐ চন্দ্রমল্লিকার ঝাড়ের কাছে রাখবো। দেখি, তোমার ছাগলের ঘাড়ে মাথা ক'দিন থাকে!

দোলগোবিন্দ কহিলেন,—তুমি বাঘ পোষো, খোক্কোশ পোষো, আর তাদের তোমার বাগানে রাখো, ঘরে রাখো—আমি কোনো কথা তুলতে যাবো না। তারা যখন আমার কোনো ক্ষতি করবে, তখন আইন আছে, আদালত আছে,…তেমনি আমি ছাগল পুষচি, সে-ছাগল তোমার কোনো ক্ষতি করে যদি তো আদালতে গিয়ে আইনের সাহায্য নিয়ো…

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন—এই কথা! উত্তর দিকেই ছাগল রাখচো তুমি?

দোলগোবিন্দ কহিলেন,—আলবৎ! এই কথা। চোখ রাঙিয়ে আমায় ভয়ে হঠাবে, তা হতে পারে না।

ত্রৈলোক্যনাথ উঠিলেন, কহিলেন,—বেশ!

দোলগোবিন্দ কহিলেন,—উত্তম!

ত্রৈলোক্যনাথ চলিয়া গেলেন। দোলগোবিন্দ হাঁকিলেন,—বটা—

ভৃত্যের নাম বটা। বটা আসিলে দোলগোবিন্দ তাকে কহিলেন,—এই বড়ী নে। বাড়ীর মধ্যে পিশিমার কাছে দিগে যা। আমি যাচ্ছি খপরের কাগজখানা দেখে। বলবি, আমি গিয়ে অনুপান বলে দিলে তবে খলে বড়ী মেড়ে দেবে।

বটার হাতে কাগজের মোড়ক দিয়া দোলগোবিন্দ কহিলেন,—যা—

বটা চলিয়া যাইতেছিল; দোলগোবিন্দ আবার ডাকিলেন—ওরে শুনে যা···

ভৃত্য ফিরিল। দোলগোবিন্দ কহিলেন—ঘরামি এসেচে?

ভৃত্য কহিল—এসেচে। এসে পয়সা নিয়ে বাঁশ, দড়ি আর খোলা কিনতে গেছে।

দোলগোবিন্দ কহিলেন,—ভালো। তাকে জায়গা দিয়েছিস্···? জামগাছের গাঁ ঘেঁসে হবে···বুঝলি? আর ছোলা আনিয়ে রাখ্। মালীকে বল্, ঘাস জড়ো করে রাখবে। অবিনাশবাবু বেলা দশটা-এগারোটার সময় ছাগল নিয়ে আসবে।

ভৃত্য চলিয়া গেল। দোলগোবিন্দ আকাশের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ রহিলেন, তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিলেন, আমায় আইন দেখায় —হুঁঃ! পাগল।···বলিয়া তিনি খপরের কাগজ খুলিলেন।

---

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### নায়ক-নায়িকা

রাগে গস্‌গস্ করিতে করিতে ত্রৈলোক্যনাথ গৃহে ফিরিলেন; ফিরিয়া গঙ্গার ধারের বারান্দায় আসিয়া ডাকিলেন,—পঞ্চা···

ভৃত্য পঞ্চা আসিলে তিনি কহিলেন,—চটী জুতো···

ত্রৈলোক্যনাথ বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়া ইজি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। মনিবকে এই সকালেই এতখানি উষ্ণ দেখিয়া পঞ্চা ভয়ে সরিয়া পড়িল। ত্রৈলোক্যনাথ মনে মনে কহিলেন, উনি কত বড় উকিল, দেখে নেবো···

এক কিশোরী আসিয়া ডাকিল,—বাবা···

কিশোরীর হাতে চায়ের পেয়ালা। ত্রৈলোক্যনাথ কিশোরীর পানে চাহিলেন, কহিলেন,—কি? চা···? খাবো না···

কিশোরীর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সকালে উঠিয়া এক পেয়ালা এবং বেড়াইয়া ফিরিবা মাত্র আর এক পেয়ালা···এটা দৈনিক বরাদ্দ! না পাইলে···

কিশোরী কহিল—চা খাবে না! কেন, বাবা?

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—ইচ্ছা নেই···

মেজাজ যে ভালো নয়, কিশোরী এটুকু চেহারা দেখিয়াই বুঝিয়াছে। এ মেজাজ সে জ্ঞান হওয়া ইস্তক দেখিয়া আসিতেছে! কিন্তু পেন্সন লইবার পর এমন মেজাজ তো সহসা দেখা যায় না। কি হইল···?

ত্রৈলোক্যনাথ মেয়েকে সব কথা খুলিয়া বলিলেন; আরো বলিলেন, পাশেই ছাগল থাকিলে দুর্গন্ধে এ গৃহে বাস করা যাইবে না। জীবনের বাকী দিনগুলা যদি আরামে না কাটানো গেল তো বাঁচিয়া ফল!

কিশোরীর নাম তারাসুন্দরী। তারা কহিল,—কিন্তু বাবা, এ এক-গাদা ছাগল তো নয়, মোটে একটি···

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—হোক একটি, তবু ছাগল! আমার এত সাধের ফুলগাছ···কথায় বলে, ছাগলে কি না খায়। ও কি তার একটি রাখবে? জানিস্ তো আমার ফুলগাছের কত সখ!

তারা তা জানে। নার্শারির ক্যাটলগে একটা টেবিল একেবারে বোঝাই। তা ছাড়া পেন্সন লইয়া অবধি হাতে কাজ না থাকায় নিজের হাতে মাটী ঘাঁটিয়া গাছ পোঁতা, জঙ্গল সাফ করা···কতদিন সে অভিমান করিয়া বলিয়াছে,—আমার চেয়ে ঐ গাছগুলোকে তুমি বেশী ভালোবাসো বাবা। আজো তার প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিতেছে। নহিলে···সে কহিল,—কার খুশী কে ছাগল রাখচে, তার উপর রাগ করে তুমি চা খাবে না? আমি নিজে তৈরী করেচি যে-চা···

মেয়ের আর্দ্র স্বরে বাপের মন নরম হইল। ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—দে মা চা···দুঃখ করিস্ নে।

ত্রৈলোক্যনাথ চা পান করিলেন। তারা কহিল,— পুকুরধারে তোমার সেই নিউ-গিনির পেঁপে গাছে ফুল ধরেচে, দেখেচো বাবা?

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—কাল বিকেলে দেখেচি। ত্রৈলোক্যনাথ হাসিলেন; খুশীর হাসি। হাসিয়া কহিলেন,—হবে না? সেই ফজলু মাল্লাকে বলে নিউ-গিনির মাটী দেড়সের আনিয়ে ওখানে দিছি, তার সঙ্গে ক্যালসিয়ম্ সাল্‌ফেট্, পাঁচ পাউণ্ড। পেঁপে যা হবে, দেখিস্।···এবারে আর একটি জিনিষ আসচে···

তারা কহিল,—কি বাবা?

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—খাশ্ বেলুচিস্তানের নাশপাতি। আমার এক বন্ধু কোয়েটায় গেছেন, তাঁকে অনেক করে বলে দিয়েছি···

তারা কহিল,—কিন্তু নাশপাতির গাছ এ মাটীতে হবে?

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—আড়াই সের বেলুচি মাটীও সেই সঙ্গে পাঠাতে বলেচি। কেন হবে না? নিউ গিনির পেঁপে ফলতে পারে, আর বেলুচিস্তানের নাশপাতি ফলবে না? ভারতবর্ষের মাটীতে সোনা ফলে মা। আবার এই ভারতবর্ষের মধ্যে সেরা মাটী হলো বাংলা দেশের মাটী! ও নাশপাতি এখানে না ফলিয়ে আমি ছাড়বো না!···

অত বড় জবরদস্ত পুলিশ-অফিসার···মেয়ের কাছে যেন সরল শিশু! অপত্যস্নেহ এমন জিনিষ!

তারা কহিল,—আমি আসি। আজ তোমার ঐ গাছের আমলকির আচার তৈরী করচি···

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—যা। তবে যাবার আগে আমাকে একবার বড় পেনালকোড বইখানা দিয়ে যা…

তারা কহিল,—আইনের বই কি হবে, বাবা?

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—একটু দেখে রাখি। চর্চ্চার অভাবে না ভুলে যাই!

তারা কহিল,—ও ছাই-পাঁশ ভুলেই যাও বাবা! আইনের বই, না, জঞ্জাল! ওতে মানুষের কি কাজ হয়! জীবন ভারী হয়ে ওঠে। ছেড়ে দিয়ে বেঁচেচো। আবার কেন? তার চেয়ে দ্যাখো দিকি কেমন হাওয়া বইচে! সামনে গঙ্গা,—বসে বসে গঙ্গা ছাখো।

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—না রে পাগলী! দিয়ে যা,—আইনের রাজ্যে বাস করে আইন ছেড়ে কি বাঁচা চলে!

মস্ত ভারী বই বহিয়া আনিয়া পিতার হাতে দিয়া তারা চলিয়া গেল।

ছাদের ঘরের সামনে বড় বড় থালায় একরাশ আমলকি। সেগুলায় তারা মশলা মাথাইতেছিল, এমন সময় কে আসিয়া তার চোখ টিপিয়া ধরিল। তারা বলিল,—পোড়ারমুখী বীরী! ছাড়্ বলচি, আমার আচার নষ্ট হয়ে যাবে।

যে চোখ টিপিয়া ধরিয়া ছিল, সে হাত সরাইতে তারা চাহিয়া দেখে, বীরী নয়, শ্যামলাল।

শ্যামলাল তরুণ যুবা—দোলগোবিন্দর একমাত্র পুত্র। পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাশে একনমিক্সে এম-এ পড়িতেছে,—বয়স বাইশ বৎসর—দেখিতে বেশ সুশ্রী।

তারা কহিল,—আচারটা করতে দাও, ভাই—সত্যি! নাহলে খারাপ হয়ে যাবে।

শ্যামলাল কহিল,—একটা খপর দিতে এলুম।

তারা কহিল,—কি?

শ্যামলাল কহিল—কর্ত্তাদের মধ্যে ভারী ঝগড়া বেধেছে।

তারা কহিল,—শুনেচি।…ছাগল নিয়ে।

শ্যামলাল কহিল,—তুমি কার কাছে শুনলে?

তারা কহিল,—বাবার মুখে এইমাত্র।

শ্যামলাল কহিল,—কি ছেলেমানুসী, বল দিকিন্! বুড়ো বয়সে একটা তুচ্ছ ছাগল নিয়ে,—সত্যি বলচি, বাবার কেমন ঝোঁক! কে কবিরাজ ওঁকে বলেচে, ছাগল-দুধ, আর এক অদ্ভুত অযুধ দিয়েচে।

তারা কহিল,—কিন্তু তাঁর অসুখ যদি তাতে সারে?

শ্যামলাল কহিল,—ওযুধে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া সারে কখনো? হুঃ! এত তো ওসুধ দেখলেন! আমি বরাবর বলচি কষে বেড়ান দিকি গঙ্গার ধারে। কত বলি দু'বেলা হাওয়া খেয়ে বেড়ান ঐ ফেরি ষ্টীমারে দু'ঘণ্টা করে। ব্যস! আর রীতিমত খাওয়া। তা তো বাবা শুনবেন না! কাঁড়ি কাঁড়ি ওযুধ খাবেন শুধু! ওষুধ খেতে চান্, খান—তার ওপর বেড়াতে কি দোষ!… এখন আবার ছাগল-দুধের বরাদ্দ হলো। খাওয়া কমালে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া সারে কখনো! বিশেষ এই বয়সে!

তারা কহিল,—এই ছাগল নিয়েই তো যত গোল! বাবা বলেছিল, তোমাদের বাগানের ওধারে ছাগল রাখতে। কাকাবাবু বলেচেন—না, এই দিকে রাখবেন,—এইতে বাবা আগুন হয়ে উঠেচে। বাবার ফুলগাছ খেয়ে দেবে ছাগলে, দুর্গন্ধে আমাদের দক্ষিণের হাওয়া ভরে উঠবে! বাবার আশ্চর্য্য ভয়! ছাগলে গাছ খায় কি না, ছাখো আগে…তা না! আর একটা ছাগল রাখলে হাওয়া একেবারে দুর্গন্ধে মাটী হবে কি করে, তাও আমি বুঝতে পারি না!

শ্যামলাল কহিল,—আমার বাবাও তেমনি! ওঁকে যদি জ্যাঠামশায় অনুরোধ করে বল্‌তেন যে ওহে, এদিকটায় না রেখে ওদিকটায় ছাগল রেখো, তাহলে গোল হতো না! জ্যাঠামশায় অনুরোধ করে বললে বাবাও শুনতেন। তা না, জ্যাঠামশায় একেবারে আইনের কথা তুললেন। আর বাবাকে জানো তো! আইন ওঁর গীতা, আইন ওঁর ধর্ম্ম! আইন দেখালে উনি জ্বলে ওঠেন। ব্যস্, দু'জনে বেধে গেল। আমি পাশের ঘরে বসে কলেজের নোট লিখছিলুম—সব কথা শুনেচি। কি ছেলেমানুসীই যে দু'জনে করলেন,—আর কিছু না হোক, মাঝে থেকে আমরা দুজনে মলুম।

তারা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে শ্যামলালের পানে চাহিল। শ্যামলাল কহিল,—নয়? এই আষাঢ় মাসে আমাদের দুটি হাত এক হবার কথা হচ্ছিল…

লজ্জায় তারা মাথা নত করিল। শ্যামলাল কহিল,—বাবা ছাগল ছাড়বেন না, আর ঐ উত্তর দিকেই তাকে রাখবেন।

তারা কহিল,—আর বাবারো ধনুর্ভঙ্গ পণ, ঐ ছাগলকে…

শ্যামলাল কহিল—ছাগলকে বজায় রেখে ওঁদের মিল করানো যায় কি না দেখি! ওঁদের জন্য তত দরকার না থাকুক, আমাদের জন্য তো বটে!

বাহিরে জুতার শব্দ শুনা গেল। তারা কহিল,—বাবা আসচে।

শ্যামলাল ছাদে আসিয়া আলিসার উপর উঠিল। আলিসার পাশে একটা জাম গাছ। শ্যামলাল সেই গাছের ডাল ধরিয়া বাগানে নামিয়া চকিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

দুপুরবেলার মুহুরি অবিনাশ ছাগল লইয়া আসিল। প্রকাণ্ড ছাগল। দেখিয়া দোলগোবিন্দ খুশী হইলেন,

যেমন দেহ, তেমনি প্রকাণ্ড শিং। তিনি কহিলেন,—এখন ছায়াতে কোনো গাছে বেঁধে রাখো। ওর ঘর তৈরী হচ্ছে। সন্ধ্যার আগেই হয়ে যাবে'খন।—ছোলা আনানো আছে, ঘাস আছে।…ওরে বটা—

বটা আসিল। দোলগোবিন্দ কহিলেন,—তোর উপর ভার, এর খাওয়া-দাওয়ায় যেন কোনো গোল না হয়, দেখবি। যে কটা দিন বাঁচবো, এখন এরই ভরসায়, এরই উপর নির্ভর করে—বুঝলি তো!

শ্যামলালও সেখানে উপস্থিত ছিল। পাশে ত্রৈলোক্যনাথের গৃহের দিকে সহসা তার নজর পড়িল। সে দেখিল, ত্রৈলোক্যনাথ চিলকোঠার ছোট জানলা খুলিয়া চোরের মত সতর্কভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। ছাগল দেখিতেছেন, নিশ্চয়! তারা?…না, সে ওখানে নাই!

সন্ধ্যার সময় চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া ত্রৈলোক্যনাথ মেয়েকে বলিলেন,—বাড়ী ছাড়তে হলো এবার।

তারা কহিল,—কেন বাবা?

—ওঁদের ছাগল এসেচে। ত্রৈলোক্যনাথ একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

হাসিয়া তারা কহিল,—আসুক না বাবা। আমাদের কি! এই যে ছাগল এসেচে, তা আমরা তো জানতেও পাচ্ছি না।

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—জানবে, দুদিন-বাদে জানবে! সবুর করো।…এর চেয়ে চাটুয্যে যদি ওঁর কবিরাজী ওষুধের জন্য মধু চাই বলে একরাশ মৌচাক লাগাতো গাছে তো কোনো ক্ষতি ছিল না!

তারা কহিল,—বলো কি বাবা! মৌমাছির কামড়ে যে তা হলে অস্থির হতে হতো! সর্ব্বক্ষণ সশঙ্কিত!…

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন—মৌমাছি…বড় শান্ত জীব রে,… চাক ছেড়ে পরের বাগানে যায় না।

তারা কহিল—না, যায় না।

ওদিকে শ্যামলাল তার পিতাকে বুঝাইতেছিল,—গোরুর গোয়াল আর ছাগলের ঘর ঐ এক ধারে হলেই ভালো হতো বাবা! গোয়ালা দুধ দুইতো। তা ছাড়া বেণী গরুকে জাব দেয়, ছাগলকেও খাওয়াবে…সেইটেই সুবিধে হতো!

দোলগোবিন্দ কহিলেন,—তা হতো।

—তবে?

দোলগোবিন্দ কহিলেন—কিন্তু না, অসুবিধা হলেও ছাগল এই দিকে থাকবে। মুখুয্যে আমায় শাসায়, আইন দেখায়। হুঁঃ। যাহোক, আজ বেলা তিনটের এক পেয়ালা দুধ খেয়েচি—তার ফল পাচ্ছি। পেটটা… না, কৈ, ফাঁপেনি আজ! ওষুধটা ভালো রে। কবিরাজটি বিচক্ষণ…পথ্যও বেশ!

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### ছাগ-বিভ্রাট

ছাগল রহিয়া গেল। যে ঘর সে পাইল, তাহাতে তার অতৃপ্তি নাই! তবে মাঝে মাঝে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইবার আশায় লুব্ধ নেত্রে সে চারিদিকে তাকায়। ঐ সবুজ শ্যামল পত্রপল্লব, তৃণের গুচ্ছ… তা ছাড়া মুক্ত আকাশ! বন্ধন কে চায়? মানুষও মুক্তি-পিয়াসী! এ তো ছাগল—অবোলা জীব! তায়, সে মুক্তির মাঝেই এত দিন লালিত হইয়াছে! তাছাড়া ভুল ভকে পাইবার জন্য মানুষেরো যে আকাঙ্ক্ষার সীমা থাকে না! তবে?…

পূর্ণ আহার সত্ত্বেও ছাগলের দেহ তাই দিন দিন শীর্ণ হইতে লাগিল। দুধ তার কমিল। যারা ছাগল বেচে, তাদের হাতের কারসাজি অল্প নয়। দোলগোবিন্দ তাহা বুঝিলেন না। পরের মামলা-মকর্দ্দমাই করিয়াছেন চিরদিন, ছাগল পূর্ব্বে কখনো দেখেন নাই! এই প্রথম! কাজেই বটাকে বকিলেন, কহিলেন,—ওরে, দিবারাত্তির ঘরেই ওকে আটকে রেখেচিস্! ব্যাত ধরবে যে।

বটা কহিল—দাদাবাবু বলেচেন, ছাড়া পেলে যদি কারো গাছপালা খেয়ে দেয় তো থানা-পুলিশ হতে পারে…

দোলগোবিন্দ কহিলেন—থানা-পুলিশের খপর আমার চেয়ে বেশী সে জানে,—না? দাদাবাবু তোর ভারী আইনজ্ঞ!…খবর্দ্দার! তবে একেবারে ছেড়ে রাখিস নে—আমার ঐ গোপালেখোপা আমগাছগুলো আছে…তা ছাড়া বেগুণ-ক্ষেত…আর ঐ শাকগুলো—ব্রাহ্মী, বিশল্যকরণী—সেদিকে হুঁশিয়ার! জামগাছে লম্বা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখবি।

তাহাই হইল। ছাগ ভাবিল, মাথার উপর মুক্ত আকাশ তো মিলিল…কিন্তু তবু এই রজ্জুপাশ…ইহা হইতে মুক্তি…

দীর্ঘ দড়ি। ছাগল যত চলে, ততই সে গাছটাকে কেন্দ্র করিয়া জ্যামিতির গোলক রচনা করে মাত্র। বেচারী ছাগ, ভূগোল পড়ে নাই। পড়িলে বুঝিত, এমনি চক্রাকারে ঘোরা শেষ করিয়াই পাশ্চাত্য পণ্ডিতের দল আবিষ্কার করিয়াছিলেন, পৃথিবী গোলাকার! ঘোরা তুচ্ছ বস্তু নয়! ঘুরিতে ঘুরিতেই নব্য উকিল 'টাউট' সংগ্রহ করে, উমেদার চাকুরীর জোগাড় করিয়া লয়! মূর্খ ছাগ ঘোরার মূল্য কি বুঝিবে! তা ছাড়া ঘুরিতে ঘুরিতে চারিদিকে নিত্য সেই একই দৃশ্য দেখা… নেহাৎ একঘেয়ে, মামুলি ঠেকিল! কাজেই দু-দিন পরে তার মন বিষণ্ণ হইল; এবং চতুর্থ দিনে চুপ করিয়া কি যেন সে ভাবিতে লাগিল।

কথায় বলে, চিন্তাই উপায়-নির্দ্ধারণের হেতু। বুদ্ধদেব চিন্তা করিয়াছিলেন, তাই সে চিন্তার ফলে লাভ করেন, প্রার্থিত নির্ব্বাণ। কালিদাস চিন্তা করিয়াছিলেন, তার ফলে লাভ করিলেন, কাব্য ও নাটকের বিচিত্র পরিকল্পনা—এবং তার ব্যঞ্জনা। এমনি ভাবেই দুনিয়ার সমস্ত বড় ব্যাপারের মূলে দেখি, এই চিন্তা··· ফরাশী জাতি বন্ধন ছেদন করে এই চিন্তার ফলে। ছাগী এ সব খবর রাখিত না, তবু সে-ও চিন্তা করিতে লাগিল এবং চিন্তাদেবী তাহাকে আশু কৃপা করিলেন। সে কৃপার ফলে সে একদিন দড়ি ছিঁড়িয়া মুক্তির আনন্দ লাভ করিল; এবং এই আনন্দের প্রথম বেগ গিয়া লাগিল সামনের ঐ কঞ্চির বেড়ায়···যে বেড়া দোলগোবিন্দ ও ত্রৈলোক্যনাথের বাগান দু'টির মাঝখানে স্বতন্ত্র সীমারেখা রচিয়া দিয়াছিল। আনন্দের প্রথম বেগ প্রায় প্রবল হয়! ছাগীর আনন্দের বেগও প্রবল ছিল। তার ফলে বেড়ার বাঁধন খশিয়া গেল এবং ছাগী সম্মুখে দেখিল, সবুজ তৃণের রাশি, অথচ বাধা নাই। অতএব সেই তৃণগুচ্ছ, নবীন পুষ্পপল্লব সে পরমানন্দে বিশ্ব ভুলিয়া—স্বার্থপরায়ণ বিশ্বের নির্ম্মমতার কথা ভুলিয়া অবাধে চর্ব্বণ করিতে লাগিল।···একটু অসুবিধা ঘটাইতেছিল চারাগাছের সঙ্গে কঞ্চিতে আঁটা ছোট ছোট টীনের কয়টা টুকরা। এই টীন চারাগাছগুলির কণ্ঠে দুলিতেছিল; পরিচয়-লিপি—না, রক্ষা-কবচ!—পুলিশ অফিসার মহাশয় স্বহস্তে সে কবচগুলি আঁটিয়া দিয়াছিলেন। আর এখন? হায়, দৈব!

কাল অপরাহ্ন। ত্রৈলোক্যনাথ নিত্যকার মত বাগানে বেড়াইয়া কোথায় কি কাঠি-কুটা পড়িয়া জঞ্জালের সৃষ্টি করিল, দেখিয়া তাহা বাছিয়া ফেলিয়া দিতেছিলেন। সহসা তাঁর দৃষ্টি পড়িল সীজন্ ফুলের চিহ্নিত অংশের দিকে!

ছাগল?···সর্ব্বনাশ। তিনি পাগলের মত হাঁকিলেন,—পঞ্চা···

হাঁকিয়াই ছুটিয়া আসিলেন।

সরল ছাগ! সে জানে, এ তৃণ-পল্লবে তার জন্মগত অধিকার। কিন্তু দুর্বৃত্ত মানুষ সকলকে সর্ব্ব অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চায়, এ বার্ত্তা সে জানিত না! তাই সে ত্রৈলোক্যেনাথের মোটা লাঠির আঘাত পাইয়া বিশ্বফাটা প্রচণ্ড আর্ত্তরব তুলিয়া লাফাইয়া উঠিল। লাফাইবামাত্র পাশের সদ্যোজাগ্রত চন্দ্রমল্লিকার চারাগুলার উপর তার পা পড়িল। সে তো চারা নয়! ত্রৈলোক্যনাথের পাঁজরার হাড়! কাজেই নির্ব্বিচারে তার সর্ব্বাঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথের লাঠির পর লাঠির ঘা পড়িল! ছাগের প্রচণ্ড আর্ত্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে তারা ছুটিয়া সেখানে আসিল, আর আসিল পঞ্চা···

ব্যাপার বুঝিয়া পিতার হাত হইতে তারা লাঠি কাড়িয়া লইল, কহিল,—এ কি করচো বাবা! অবোলা পশু···মরে যাবে যে···

ত্রৈলোক্যনাথ গর্জ্জন করিলেন,—যাক্ মরে···

ওদিকে দোলগোবিন্দ আসিয়া হাজির—সঙ্গে শ্যামলাল। দোলগোবিন্দ চকিত নেত্রে যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁর সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল! তিনি কহিলেন,—ব্যাপার কি, মুকুয্যে?

মুকুয্যে কহিলেন—দেখে যাও। তখন বলেছিলুম, গ্রাহ্য করো নি! তোমার ছাগল এসে আমার সব গাছ মুড়িয়ে নষ্ট করে দিলে। কত টাকার জিনিস, জানো? এ সব সীজন ফুল···কাশ্মীরের নিশৎ বাগ থেকে আনানো·· কত যত্নে···

রাগে-দুঃখে ত্রৈলোক্যনাথের দুই চোখে জল আসিল! স্ত্রীর অন্তিম শয্যার পাশে বসিয়া যে-চোখে অশ্রু ঝরে নাই···সেই চোখে!···

দোলগোবিন্দ অপ্রতিভ হইলেন, কহিলেন—মাপ করো মুকুয্যে। তোমার যা ক্ষতি হলো, তার খেসারৎ দেবো···

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন—খেসারৎ আমি চাই না··· বলিয়া তিনি পঞ্চার দিকে চাহিলেন, ডাকিলেন,—পঞ্চা···

পঞ্চা সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—একটা দড়ি আন্। বাঁধ ছাগল—বেঁধে নিয়ে যা থানায়! এখন তো কাজী হাউসে যাক···তার পর আইন আছে, আদালত আছে...

আইন আর আদালতের নাম শুনিবামাত্র দোলগোবিন্দর অপ্রতিভ ভাব কাটিয়া গেল! তিনি রাগিয়া উঠিলেন। উত্তেজনা? হাঁ, উত্তেজনাই! রক্তের গন্ধ পাইলে বাঘ যেমন উত্তেজনায় মাতিয়া ওঠে, তেমনি!··· দোলগোবিন্দ কহিলেন,—আইন আদালত! কুছ পরোয়া নেই! বেশ, চলো আদালতে। আইনটা কি, কখনো শেখোনি তো—বে-আইন নিয়েই চিরকাল কাটিয়েচো। আইন কি, তা শিখবে চলো। ছাগলের গায়ে এই চোট, আর জখম!

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—কথার আওয়াজ নয়। যত টাকা খরচ হয়, এ মকর্দ্দমা করবো। বাড়ী বেচতে হয়, বেচবো, কলকাতা থেকে নর্টন সাহেবকে আনাবো। পঞ্চা, নিয়ে যা থানায়···ট্রেসপাশ···মিশচিফ!···

দোলগোবিন্দ কহিলেন,—আনো নর্টন সাহেবকে। কদিন ছাগল-দুধ খেয়ে আমার পেটটা ভাল আছে··· আমারো লড়বার কায়দাটা দেখে নিয়ো। No negligence—তোমার বেড়া ঠিক রাখো নি কেন?

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—আমার খুশী…

দোলগোবিন্দ কহিলেন,—তাহলে ছাগলেরও খুশী…

ত্রৈলোক্যনাথ রাগে কাঁপিতেছিলেন, কহিলেন,—বেশ!

দোলগোবিন্দও কাঁপিতেছিলেন, কহিলেন,—উত্তম!

তারা আসিয়া বাপের দুই হাত চাপিয়া ধরিল, ডাকিল,—বাবা…

তার দুই চোখে জল! স্বর বাষ্পরুদ্ধ…

শ্যামলাল দোলগোবিন্দকে ডাকিল,—বাবা…তার চোখে জল নাই। বিশুষ্ক মুর্ত্তি!

ত্রৈলোক্যনাথ মেয়ের পানে চাহিলেন। বুকের কোথায় যেন ঘা লাগিল। বুক কাঁপিয়া উঠিল। তিনি ডাকিলেন,—পদ্মা…

পদ্মা ছাগলকে বাঁধিতেছিল, ত্রৈলোক্যনাথের পানে ফিরিয়া চাহিল। ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন—আচ্ছা, এবারকারের মত ছেড়ে দে। বেড়া পার করে ও-বাগানে ঠেলে দে। আর হুঁশিয়ার…বেড়া মেরামত করে নে। কিন্তু ফের যদি ছাগল ঢোকে, তাহলে ছাগলের যা করবার, তা তো করবোই…তাছাড়া তোরও জরিমানা হবে, বুঝলি…

দোলগোবিন্দ ডাকিলেন,—মুকুয্যে…

ত্রৈলোক্যনাথ ফিরিয়া চাহিলেন; দোলগোবিন্দ কহিলেন, মাপ করো ভাই…

ত্রৈলোক্যনাথ বলিলেন,—না। এক পয়সা খেসারৎ নয়…আমি তো পয়সা রোজগারের কল বানাইনি। তবে বলে রাখচি, ছাগল বেঁধে রাখবে। ফের যদি ছাগল এ বাগানে আসে তো গুলি করে মারবো। শীকারে আমার হাত পাকা।

দোলগোবিন্দ বলিলেন,—বটে! ছাগল আমি বাঁধবো না। দেখি, তুমি কি করো।

ত্রৈলোক্যনাথ বলিলেন,—বেশ! বলিয়া মেয়ের হাত ধরিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

সন্ধ্যার পর ঘাটের ধারে নায়ক বসিয়াছিল,—শ্যামলাল! বিমর্ষ মুখ, মনে চিন্তার বোঝা। সমস্ত ব্যাপারের নিদারুণ লজ্জা তাকে একেবারে কাতর কুণ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছিল।

তারা আসিয়া তার পাশে বসিল, কাঁদো-কাঁদো স্বরে কহিল,—কি হবে?

শ্যামলাল একটা বড় রকম নিশ্বাস ফেলিয়া তারার পানে চাহিল; কহিল,—তাই ভাবচি, তারা…

তারা কহিল,—বাবা বন্দুকের বাক্স খুলে বন্দুক বার করেচে, নিজের হাতে সাফ করচে। তারা কাঁদিয়া ফেলিল।

শ্যামলাল কহিল—আর আমি দেখে এসেচি, বাবা এমনি মোটা মোটা পাঁচখানা আইনের বই বার করে মন দিয়ে তাই পড়চেন।

তারা কহিল—যদি বাবা ছাগলকে গুলি করে?

তারার হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া শ্যামলাল কহিল—ছাগল যেন আমাদের মৃত্যুবাণ হয়ে উঠেচে! ছাগলকে সরাতে পারি, তারা। কিন্তু বাবার শরীর…আজ-কাল তিনি একটু ভালোও আছেন…

তারা কহিল,—তবে?

শ্যামলাল কহিল,—তবে, সে কি ও ছাগল-দুধের গুণে? কখনো নয়। মনের বিশ্বাস।

তারা কহিল,—বিশ্বাসেরও তো দাম আছে।

শ্যামলাল কহিল,—তাই ভাবছিলুম…

সাগ্রহে তারা কহিল,—কি?

শ্যামলাল কহিল,—ঐ কবিরাজকে গোরুর দুধের ব্যবস্থা করতে বলবো…তাকে টাকা দেবো…

তারা কহিল,—তাতে যদি কাকাবাবুর শরীর আবার খারাপ হয়?

শ্যামলাল কহিল,—আমি ডাক্তারকে বলেচি—ডাক্তার বলেচে, ও কিছু নয়। তোমার বাবাকে নিয়ে দুবেলা ষ্টিমারে বেড়াও দিকিনি,—ছাগল-দুধের দরকার হবে না। তাছাড়া যদি কেউ বাবাকে এখন বলে, মোষ পুষুন্, আর সেই মোষের পাশে দু'ঘণ্টা করে রোজ বসে থাকুন্, শরীর ভালো হবে,—তাহলে ওঁর মনের যা বিশ্বাস, উনি তাতেও রাজী হবেন, আর ভালোই থাকবেন।

তারা কহিল,—কিন্তু…এ কি শুধুই বিশ্বাস?

শ্যামলাল কহিল,—অনেকটা তাই। চিরদিন পরিশ্রম করেচেন, এখন চুপচাপ বসে থাকা…কাজেই অসুখ! তাছাড়া একটা ফন্দী খেলেচি, তারা। আজ দুপুর বেলায় আমি এক মস্ত কাজ করেচি। একটা প্রবন্ধ লিখেচি—বাঙলার নাম দিয়েছি, 'ডিস্‌পেপ্‌সিয়া'। বাবার কাছে ডাক্তারী বই ঢের আছে, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া সম্বন্ধে তাতে বেড়ানোর কথা সবাই বলেচে! কলকাতার কজন ডাক্তারের সঙ্গে আমার কথাও হয়েছিল—তাঁরা বাবাকেও দেখেছেন। তাঁরা বলেন, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া-রোগের শতকরা নব্বইটার মূলে মনের অস্বাচ্ছন্দ্য। ওইটেই রোগের মূল…অস্বাচ্ছন্দ্য আর মনঃকষ্ট। এবং তার ওষুধ হলো, ভোরে আর সন্ধ্যায় বেড়ানো, এবং সময়ে আহার। আমার প্রবন্ধে আমি সেই কথাই লিখেচি। তাছাড়া লিখেচি, অনেকের ধারণা, এ রোগে ছাগল-দুধ ভালো পথ্য—সেটা ভুল। আমি লিখেচি, প্রথমটা ছাগল-দুধ ধরলে ভালো বোধ হওয়া বিচিত্র নয়—কিন্তু ছাগল-দুধ ক্রমাগত খেলে আমাদের পরিপাকের যন্ত্র দুর্ব্বল হয়, আর রক্তও ক্রমে

তরল হয়ে আসে। ছোট ছেলে-মেয়েদের পক্ষে মাঝে মাঝে ছাগল-দুধ ভালো—কিন্তু বয়স্ক পুরুষের পক্ষে ছাগল-দুধ বিষ, মৃত্যুবাণ! কারণ, ছাগল-দুধের জান্ অল্প, খেলে রক্তের জোর কমে যায়। আর জোর কমলে বাত হয়, থাইসিস হয়, নিউমোনিয়া হয়, ডেঙ্গু হয়—শেষে রক্তের দৌর্ব্বল্য-হেতু পক্ষাঘাত হবারও নিশ্চিত সম্ভাবনা। অর্থাৎ ছাগল-দুধে ভাইটামিন এল্ নাই। আর এই ভাইটামিন এল্‌ই হলো প্রাণের আসল শক্তি! তাছাড়া ছাগলের রোঁয়া যত রোগের ব্যাসিলির পক্ষে একটি ফোর্ট···এখানে তাদের জীবনী-শক্তি যেমন বাড়তে পায়, এমন আর কোথাও নয়! এই প্রবন্ধ আমি ভারতবর্ষে ছাপতে পাঠাবো। লেখকের নাম দেবো, শ্রীতারকানাথ সেন কবিরত্ন কবিভূষণ।

তারা একান্ত মনোযোগে শ্যামলালের কথা শুনিতেছিল। সে কহিল,—কিন্তু তারা ছাপবে কেন?

শ্যামলাল কহিল,—কেন ছাপবে না? তারা তো আর জানে না, তারকানাথ কে?

সত্য, তারকানাথই বা কি রকম নাম? তারকনাথই তো নাম হয়, জানি।

শ্যামলাল হাসিল, হাসিয়া কহিল,—তুমি তো তারা ···তারার অন্য নাম কি? নক্ষত্র। তাই থেকে,··· অর্থাৎ তোমার···

—যাও,—বলিয়া তারা শ্যামলালকে একটা ঠেলা দিল।

শ্যামলাল কহিল—তাছাড়া দ্বারকানাথ কবিরাজ ছিলেন না? মস্ত কবিরাজ! লোকে বলে, দ্বারিক কবিরাজ···সেই দ্বারকার সঙ্গে মিল খায় তারকা···তাই দু মানেই হয় বলে এই নাম দিচ্ছি···

তারা কহিল—ওঁর স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হবে না তো? ···দেখো···

শ্যামলাল কহিল,—না, না। এতে আমি লিখেছি, গঙ্গার হাওয়া সব-চেয়ে ভালো ওষুধ—আর সে ওষুধ সব ওষুধের সেরা। ষ্টীমারে দু' বেলা ঘণ্টা কয়েক বেড়াতে যদি কেউ পারে, তাহলে তার কখনো ডিস্‌পেপসিয়া হতে পারে না।—বুঝলে···বাড়ীতে চুপচাপ বসে থাকলে ক্ষিদে বা হজম হবে কি করে, বলো তো?

তারা কহিল,—দেখো, শেষে যেন···

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

### চোর-পুলিশ

একমাস কোনো উপদ্রব নাই। পঞ্চা আবার শক্ত করিয়া বেড়া বাঁধিয়াছে—ছাগলও ওদিকে নির্ব্বিবাদে ছাড়া থাকে। তবে দোলগোবিন্দর বাগানেও গোপালে খোপা আমগাছ; আর মানকচু, ব্রাহ্মী, বিশল্যকরণী প্রভৃতির চারা·· সেগুলার চতুর্দ্দিকে উঁচু করিয়া শক্ত বেড়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সেদিন সকালে উঠিয়া শ্যামলাল জানলায় দাঁড়াইয়াছিল—হঠাৎ দেখে, আমগাছের ধারে বেড়ার ঠিক পরেই ত্রৈলোক্যনাথের বাগানের যে অংশে সীজন্ ফুলের চারা জন্মিয়াছে, সেই জায়গাটায় ত্রৈলোক্যনাথ দাঁড়াইয়া তদ্বির করিয়া মজুরদের দিয়া মস্ত খানা খুঁড়াইতেছেন। এমন করিয়া খানা খোঁড়াইবার প্রয়োজন? আবার ত্রৈলোক্যনাথ মাঝে মাঝে তাদের বাড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন! কেন?···

সহসা বিদ্যুতের মত একটা কথা মনে হইল। তাই কি?···অন্তরাল হইতে শ্যামলাল দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

খানা খোঁড়া হইল। ত্রৈলোক্যনাথ তার উপর কয়েকটা কঞ্চি বিছাইলেন, তারপর লোকগুলাকে কি আদেশ করিলেন, তারা অমনি বড় বড় কয়খানা কলাপাতা আনিয়া কঞ্চির উপর বিছাইল, এবং বিছাইয়া ঘাস-পাতা ও তার উপর শুকনো পাতা-লতার জঞ্জাল আনিয়া ফেলিল। সেগুলার উপর আবার সবুজ ঘাস পাতা! সে কাজ শেষ করিয়া বেড়ার বাঁধন কাটিয়া তিনি দূরে নিক্ষেপ করিলেন, তার পর লোকজন লইয়া চলিয়া গেলেন।

মস্ত অভিসন্ধি! এবং এ দুরভিসন্ধি! ঠিক! শ্যামলাল বুঝিল, এই খানার নাম ফাঁদ পাতা। ত্রৈলোক্যনাথের মুখে সে কতদিন শুনিয়াছে, শীকারীরা বনের দুর্দ্দান্ত পশু ধরিবার জন্য এমনিভাবে ফাঁদ পাতে—পশু আসিয়া এই ফাঁদে পা দিলে গড়াইয়া একেবারে অতল গহ্বরে তলাইয়া যায়; আর অমনি শীকারীর দলও···ঠিক, এ তাই।

তার হাসি পাইল। লজ্জাও হইল। একটা তুচ্ছ ছাগলকে জব্দ করিবার জন্য এ কি ছেলেমানুষী! স্কুলের কোনো বদ ছেলে এ কাজ করিলে মাষ্টার মহাশয় তার কাণ মলিয়া দিতেন! আর একজন প্রবীণ ভদ্র লোক, শিক্ষিত···ছি!

সে সতর্কভাবে চারিদিকে চাহিল। এ ব্যাপার তারা দেখে নাই তো? না। ভাগ্যে দেখে নাই! দেখিলে সে লজ্জায় মরিয়া যাইত।

একটা ফন্দী আঁচিয়া শ্যামলাল মুখ-হাত ধুইয়া ত্রৈলোক্যনাথের গৃহে গেল, গিয়া ডাকিল,—জ্যাঠামশায়···

—কে? শ্যামলাল। এসো বাবা।···চা খাবে তো?

—খাবো, জ্যাঠামশায়···

চা আসিল। তারা আনিয়া দিল। পেয়ালা হাতে করিয়া শ্যামলাল কহিল—একটা কথা আছে, জ্যাঠামশায়···

—কি?

—আপনি আজকের কাগজ দেখেচেন ? আলিপুরে ফ্লাওয়ার শো হচ্ছে। আপনার ঘরের ওধারে যে আসল চীনে জবা ফুটিয়েচেন···ও তো প্রকাণ্ড একখানি বগী থালার মত···ওই ফুল শো'তে দিন না···

মুখখানাকে বিকৃত করিয়া ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—না বাবা, ও-সবে আমি নেই। প্রাইজ পাবো? মেডেল্? না। এ·· বাগানে ফুল ফোটে, বাগানের শোভা হয়, দেখে নিজে খুশী হই। গাছ থেকে সে ফুল পেড়ে গাছের শোভা আমি নষ্ট করতে চাই না। কেউ দেখতে চায়, এখানে এসে গাছে ফুল দেখে যাক্··

শ্যামলাল ভাবিল, এত মমতা! গাছের একটা ফুলের উপর এমন দরদ! পাছে গাছের শোভা নষ্ট হয় বলিয়া গাছের ফুল ছেঁড়েন না! অথচ একটা ছাগল। অবোলা প্রাণী! মানুষ এমনি অদ্ভুত জীব বটে! আর এই মানুষের মন···সে আরো কত বেশী অদ্ভুত!···

চা পান করিয়া শ্যামলাল উঠিল। তারা কহিল, —কোথায় যাচ্ছ ?

শ্যামলাল কহিল,—একটু বেড়িয়ে আসি। একবার কলকাতায় যাবো।

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন, তোমাদের ছাগলের খপর কি, শ্যামলাল ?

—ভালোই। বলিয়া শ্যামলাল চলিয়া আসিল।

সন্ধ্যা হয়-হয়। ত্রৈলোক্যনাথের অস্বস্তি ধরিতেছিল ···ছাগলটা ভাঙ্গা বেড়া দেখিয়াও তাঁর বাগানে আসিল না? এ কারসাজি! চাটুয্যে ফন্দী করিয়া তাকে এ ধারে আজ ঘেঁষিতে দেয় নাই। এ ফাঁদ তবে মিছা পাতা হইল?···না···ঐ যে···

ঝপ্ করিয়া একটা শব্দ। ত্রৈলোক্যনাথ ধীরে ধীরে উঠিলেন, চারিদিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে ডাকিলেন,—ওরে পঞ্চা···

—বাবু···

—খুব চুপি চুপি আয়। তোর দিদিমণি না জানতে পারে! আয়, আয়··শীকার পড়েচে···

পঞ্চাকে লইয়া তিনি বাগানে আসিলেন। ঠিক···এই যে। এবারে কোথায় যাবে, চাঁদ ?

পেন্সন লইলে কি হয়, ত্রৈলোক্যনাথের গায়ে এখনো যা জোর আছে·· পঞ্চা ও ত্রৈলোক্যনাথ দু'জনে ধরিয়া ছাগলকে তুলিলেন, তার মুখে একখান' কাপড় বাঁধিয়া ধরাধরি করিয়া তাকে আনিয়া একটা নৌকায় ফেলিলেন। ঘাটের একটু দূরে ছোট নৌকা বাঁধা ছিল। জেলেদের ইলিশমাছ ধরিবার নৌকা। কাদায় কাপড় ভরিয়া গেল। তা যাক··তার পর পঞ্চা সেটাকে ধরিয়া রহিল; এবং মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল।···চুপি চুপি···খুব হুঁশিয়ার!···

আধ ঘণ্টা! ছাগলকে গঙ্গার ওপারে ছাড়িয়া এপারে আসিয়া ত্রৈলোক্যনাথ ওপারের দিকে চাহিলেন, খুশী-মনে কহিলেন,—খা, কত গাছ খাবি, ফুল খাবি, কোশে খা···

তার পর ঘাট হইতে উপরে উঠিবামাত্র·· এ কে?··· সম্মুখে শ্যামলাল! তাঁর গা ছমছম করিয়া উঠিল। অত্যন্ত অপ্রতিভভাবে ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—কে? শ্যামলাল···

শ্যামলাল কহিল—এত কাদা মেখে কোত্থেকে আসচেন, জ্যাঠামশায়? মাছ ধরতে গেছলেন নাকি?

ত্রৈলোক্যনাথ মুখ না তুলিয়াই কহিলেন,—না, মানে, এই ওধারে একটু বেড়াতে গেছলুম। অর্থাৎ এই ওপারে ···বেলুড় মঠে। তা তুমি এ সময়ে! তারা ঘরে নেই?

শ্যামলাল কহিল,—আপনার কাছেই দরকারে এসেচি জ্যাঠামশায়···

তাঁহার কাছে! তাঁর বুকটা একবার ধড়াস্ করিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন,—কি দরকার?

—আমাদের ছাগলটা—

এই রে! ত্রৈলোক্যনাথের মনে হইল, বুকটাকে ফাঁশাইয়া তাঁর প্রাণ বুঝি এবার বাহির হইয়া যাইবে! ছাগল! চোখের সামনে ছাগলটা ছায়া-মূর্ত্তিতে উদয় হইয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিল! পাগলের মত কিছু না ভাবিয়াই তিনি বলিলেন,—কি ছাগল! কাদের ছাগল! ···ছাগল কেন?

শ্যামলাল সব দেখিয়াছে। সে অতিকষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া কহিল—আমাদের ছাগল···মানে, যে ছাগলটা আপনার ফুলগাছ খেয়েছিল···

কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—হ্যাঁ, তা, সে ছাগল কি করেচে?

শ্যামলাল কহিল,—সে ছাগলকে পাওয়া যাচ্ছে না। বাবা বাড়ী নেই। তিনি এসে মহা-রাগারাগি করবেন। তা ভয়ে বটা গিয়ে থানায় ডায়েরি করে এসেচে। পুলিশ এখন এসেচে তার তদারক করতে...মালী বলেচে, আপনার ভাঙ্গা বেড়া গোলে ছাগলকে সে এ বাগানে আসতে দেখেচে। তার পর···

আবার তারপর...? হাজত-ঘরের কড়িকাঠগুলা ত্রৈলোক্যনাথের চোখের সামনে পুতুলগুলার মতই নৃত্য করিতে লাগিল! তিনি কহিলেন,—সে ছাগল তো আমি দেখিনি, বাবা···

শ্যামলাল কহিল,—পুলিশ দেখে গিয়েছে, বেড়ার ধারে খানার ফাঁদ। ছাগল বেড়া গোলে এসে খানাতেই পড়েচে। খানা থেকে ওঠা তার সাধ্যের বাইরে··· তাহলে গেল কোথায়?···তার উপর মালী বলছিল···

ত্রৈলোক্যনাথ বলিয়া উঠিলেন,—কি বলছিল ?

আমি চোর? আমায় চোর ধরতে এসেচো···? তোমার বাবার ছাগল চুরি করেচি?

তাঁর মনে হইল, পুলিশের তদারক যেন শেষ হইয়া গিয়াছে এবং মালীর এজাহার লইয়া পুলিশ তাঁকেই চোর সাব্যস্ত করিয়া তাঁকে এবার সদরে চালান দিবে! উপায়?

শ্যামলাল অত্যন্ত কুণ্ঠিত-ভাব দেখাইয়া কহিল,—মালী বলেচে, গদাইয়ের নৌকোয় গদাইকে ছাগল নিয়ে ওপারে যেতে দেখেচে। নৌকোয় আরো দু'জন লোক ছিল। তাদের একজনকে আবার দেখতে নাকি···

নাঃ, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই! আকাশের গায়ে ওগুলা কি? নক্ষত্র? না। ত্রৈলোক্যনাথের মনে হইল, ওগুলা নিশ্চয় সরিশার ফুল। সারা পৃথিবীর রঙ যেন নিমেষে বদলাইয়া গিয়াছে! হলুদ-রঙের ছোপ্ চারিধারে। অপমানে লজ্জায় ত্রৈলোক্যনাথ সেইখানে বসিয়া পড়িলেন; ডাকিলেন,—বাবা শ্যামলাল···

শ্যামলাল কহিল—বটা এ কি বিভ্রাট বাধালে পুলিশে খপর দিয়ে, দেখুন তো···জ্যাঠামশায়। পুলিশকে এখন কি বলে বিদায় করি? বাবা বাড়ী নেই, আমি আইন-টাইন জানি না। তাই আপনার কাছে এসেচি···

শ্যামলালের দুই হাত ধরিয়া ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—আমায় রক্ষা করো, বাবা। সে ছাগল আমিই ওপারে ছেড়ে দিয়ে এসেচি। গদাইয়ের কোনো দোষ নেই! বেচারা! আমি বুঝি নি, না বুঝে ছেলেমানুষী করেচি। তুমি টাকা নাও বাবা, অন্য ছাগল কিনে আনো। আমি আর কিছু বলবো না। অবোলা প্রাণী, কোথায় ছেড়ে দিয়ে এলুম! মনে ভারী আপশোষ্ হচ্ছে···ঝোঁকের মাথায় কিছু বুঝলুম না···শেষে কশাইয়ের হাতেই যদি পড়ে? কি পাপ করলুম! এ যে কি অস্বাচ্ছন্দ্য···

তিনি প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন।

শ্যামলাল কহিল—আপনি!···তা··· তাইতো, জ্যাঠামশায়!···তা যাক্···আপনি যখন করেচেন—তা যাক—কোনোমতে এখন চাপা দিতে হবে! পুলিশকে গিয়ে বলি, ছাগল পাওয়া যাচ্ছে না···তার পর আর একটা ছাগল কিনে আনলেই হবে। আপনি ভাববেন না···আপনি তাহলে আসতে পারবেন না? আমি পুলিশকে এই বেলা বিদায় করে দি—বাবা বাড়ী ফেরবার আগে···

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—তাই করো, বাবা! তবে ঐ মালীটা···তাইতো! তা তোমার বাবা কোথায় গেছেন?

শ্যামলাল কহিল—ন'কাকা এসেছিলেন—তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবেন। এসে পাত্র দেখাবার জন্য বাবাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন···কলকাতায় নারকেলডাঙ্গায়···

শ্যামলাল চলিয়া যাইতেছিল, ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—তাহলে কি করবে বলো দিকি, বাবা?

শ্যামলাল কহিল,—গিয়ে পুলিশকে বিদায় করি কোনমতে।

—তাই করো, বাবা তাই করো,·· ত্রৈলোক্যনাথের স্বরে কি কাকুতি!

শ্যামলাল কহিল,—তবে আমার একটি অনুরোধ আছে, জ্যাঠামশায়—

—কি বাবা?

— এই তুচ্ছ ছাগল নিয়ে বাবার সঙ্গে আর মনান্তর রাখবেন না। এতে আমাদের কি কষ্ট যে হচ্ছে···

—এই! বোঝো তো সব। আচ্ছা, দ্যাখো দিকিনি তোমার বাবার এ কি ছেলেমানুষী···

শ্যামলাল হাসিল; মনে মনে কহিল, আপনারই কি কম! প্রকাশ্যে কহিল—বাবার গোঁ ভারী দুর্জ্জয়! অথচ ভালো কথায় তিনি এমন বশ হন যে, যা বলবেন, তাতে না করেন না! তবে কেউ একটু জেদ দেখালে···

ত্রৈলোক্যনাথ কহিলেন,—ঠিক তাই! দ্যাখো তো এই দেড় মাস আমি অশান্তি ভোগ করচি। একটা কথা কইতে পাই না কারো সঙ্গে!

শ্যামলাল কহিল,—বাবারো ছাগলের সখ মিটে আসচে। আবার তাঁর সেই পেট ভার, অক্ষিধে···

---

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

### মায়ার খেলা

দোলগোবিন্দ গৃহে ফিরিলেন, রাত্রি তখন ন'টা বাজে। তাঁর হাতে এ-মাসের একখানি ভারতবর্ষ। শ্যামলালকে দেখিয়া কহিলেন—তোর ভারতবর্ষ আজ এসেচে, নিয়ে বেরিয়েছিলুম···এতটা পথ মোটরে যাওয়া। তাছাড়া খুলতেই দেখি, ডিস্পেপ্সিয়া বলে একটা প্রবন্ধ বেরিয়েচে।

অত্যন্ত আগ্রহ-ভরে শ্যামলাল কহিল,—দেখি···

ভারতবর্ষ হাতে করিয়া শ্যামলাল দেখে, তারকানাথ কবিভূষণের লেখা সেই প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে! সে কহিল—এতে কি লিখেচে?

দোলগোবিন্দ কহিলেন,—ঐ পুরোনো কথা। তবে একটা নূতন কথাও আছে। এতে বলচে, ছাগলের দুধে নাকি নানা রোগ হতে পারে, বাত, যক্ষ্মা, এমন কি, পক্ষাঘাত পর্য্যন্ত···

এ্যাঁ! শ্যামলাল আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। সে কহিল—তাহলে···

তার কথায় বাধা দিয়া দোলগোবিন্দ কহিলেন,···

সত্যই হয় কি না, জানি না। তবে এই যেখানে পাত্র দেখতে গেছলুম, সেখানে একটি ভদ্রলোক কথায় কথায় বলছিলেন যে, ছাগলের রোঁয়া জিনিষটা নাকি যক্ষ্মা রোগের ব্যাসিলি বহন করে! তা থেকে যক্ষ্মা হওয়া বিচিত্র নয়! কোন্ বাড়ীতে এমনি একটা রোগ নাকি হয়েছিল···

শ্যামলাল কহিল,—তাহলে ছাগল-দুধ বন্ধ করে দি বাবা···

নিরুপায়ভাবে দোলগোবিন্দ কহিলেন,—তাই ভাবতে ভাবতে আসচি সারা পথ। কিন্তু আমার ক্ষিদেটা ওদিকে বেশ হচ্ছিল···মধ্যে কমলেও আজ আবার যা ক্ষিদে পেয়েচে···

শ্যামলাল কহিল—আজ হবে না? ঘুরেচেন কি রকম! তার উপর এই যে ভারতবর্ষে লিখচে—গঙ্গার হাওয়ার কথা। একবার পরখ করে দেখুন দিকিন···এতে কিছু আয়োজন করতে হবে না তো।

দোলগোবিন্দ কহিলেন,—অগত্যা। রোঁয়ার সম্বন্ধে আজ ঐ কথাটা···বিশেষ, ভারতবর্ষের এই প্রবন্ধ, আর নারকেলডাঙ্গার সেই কথা—দু কথা যখন এ মিলচে···

শ্যামলাল কহিল—তখন ছাগল-দুধ একবিন্দু আর আপনাকে খেতে দিচ্ছি না···

দোলগোবিন্দ কহিলেন,—সেই সঙ্গে আরো ভাবছিলুম, বাল্যবন্ধুর সঙ্গে এই বিচ্ছেদ! আমার তারামাকেও কতদিন দেখিনি···তিনি একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

শ্যামলাল প্রকৃতিস্থ হইল। এই নিশ্বাসের সঙ্গে বহুকালের সঞ্চিত কত বিদ্বেষ আর রাগ, মনের কত জঞ্জাল যে সাফ হইয়া যায়, এ বয়সে নিজেও সে তার বহু পরিচয় পাইয়াছে তো!

সকালে দোলগোবিন্দ গিয়া ডাকিলেন,—মুকুয্যে···

ত্রৈলোক্যনাথ বন্ধুকে দুই হাতে জড়াইয়া বুকে টানিয়া কহিলেন,—আমায় মাপ করো, চাটুয্যে···পুলিশে ক'বছর চাকরি করে শিষ্টাচার পর্য্যন্ত ভুলে গেছি আমি।

দোলগোবিন্দর গৃহে তারার কাছে শ্যামলাল তখন ছাগলের কথা আগাগোড়া খুলিয়া বলিতেছিল···সকালে গর্ত্ত খোঁড়া হইতে সুরু করিয়া সন্ধ্যায় ছাগল চুরি করা অবধি সমস্ত ঘটনা! ত্রৈলোক্যনাথের সে কি আতঙ্ক! আর কি গোয়েন্দাগিরিই সে করিয়াছে···

তারা কহিল,—কিন্তু ঐ তো ছাগল রয়েচে, দেখচি!

শ্যামলাল কহিল,—থাকবেই তো! কেন থাকবে না?

তারা কহিল,—তবে যে বললে, বাবা তাকে ওপারে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে এসেচে···?

শ্যামলাল কহিল,—সে আর একটা ফোক্‌রে ছাগল। সেটা কিনে এনে নিজেই তাকে তাড়া দিয়ে বেড়া পরে করে গর্ত্তয় ফেলে দিয়েছিলুম। ভাবলুম, দেখি, জ্যাঠামশায় কি করেন! অর্থাৎ চুরি গেছে যেটা, সেটা সেই জাল ছাগল। আমি ও অকৃত্রিম ছাগল, যার জন্য এত হুলস্থুল,—সে ঐ অক্ষত দেহে বর্ত্তমান রয়েচে!

শুনিয়া তারা সবিস্ময়ে কহিল—বাবা! এত বুদ্ধিও তোমার মাথায় খেলে! তা, কাকাবাবু তো ছাগল-দুধ ছাড়চেন, এখন ছাগল···

শ্যামলাল কহিল—বেচারী, অবোলা পশু! কোনো দোষ করে নি! তাই ভাবছিলুম, ওর গতি কি করবো···

তারা কহিল—বাবা কাল রাত্রে বলছিল, অন্যায় রাগ আমার—চাটুয্যে তার বাড়ীতে ছাগল রাখবে, তাতে আমার কেন রাগ···এ যে ভারী ছেলেমানুষী!··· বাবা বলছিল, তোমাদের ছাগল যখন হারিয়ে গেছে, তখন বাবার কোন্ বন্ধুকে লিখে কাশ্মীর থেকে একটা ভালো ছাগল আনিয়ে দেবে···তা···

শ্যামলাল কহিল—কি, তা?

তারা কহিল—এ ছাগল দেখে বাবা যদি বলে, কোথা থেকে এলো? তাহলে বাবাকে কি বলবে?

শ্যামলাল কহিল—বলবো, ওপার থেকে খুঁজে এনেচি, আজ ভোরে গিয়ে···তাছাড়া কাল রাত্রে বলেচেন, ছাগলটাকে পুষেচি যখন, তখন পথে ছেড়ে দিতেও পারি না! চাকর-বাকররা যদি কেউ চায় তো দিয়ে দে! তা মালীর খুব লোভ আছে ওর উপর। তায় নিজের হাতে খাইয়েচে-দাইয়েচে! বাবাকে বলে ওটা মালীকেই দিয়ে দেওয়াবো। তবে বাবার কড়া হুকুম,—বাড়ীতে ছাগল রাখা হবে না···

বাহিরে কথাবার্ত্তা শুনা গেল। তারা কহিল,—ঐ ওঁরা আসচেন, কাকাবাবু আর বাবা। পালাই···

শ্যামলাল কহিল,—কেন? পালাবে কেন?

তারা কহিল,—আমার ভারী লজ্জা করে···

—কেন? লজ্জা কিসের!

তারা কহিল,—না, লজ্জা করবে না! বলে, দুদিন বাদে ···ছি!···সত্যি, এখন ভারী লজ্জা করে, ওঁদের সামনে তোমার কাছে আসতে, কি, থাকতে। ঐ এসে পড়লেন ওঁরা···

শ্যামলাল তারার আঁচল ধরিল—তারা সবলে আঁচল ছাড়াইয়া পলাইয়া ছুটিয়া গেল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ত্রৈলোক্যনাথের সঙ্গে দোলগোবিন্দ আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন, ঢুকিয়াই কহিলেন,···কৈ? আমার তারা-মা কোথায় গেল? মাকে দেখতে ও-বাড়ী গেলুম, গিয়ে শুনলুম, মা আমার আমাকে দেখতে এখানে এসেচেন। মা না হলে এত মায়া কারো হয়? না, মা ছাড়া ছেলেকে আর কেউ এমন ভালোবাসতে পারে?

# বড়দিনের ছুটী

ল' পাশ করিয়া তখন হাইকোর্টে যাতায়াত সুরু করিয়াছি। বড়দিনের ছুটী হইতে দুদিন বাকী। অমর আসিয়া বলিল, ছুটীতে কোথাও যাচ্ছ?

কহিলাম—কোথায় আর যাবো! এইখানেই বায়োস্কোপ দেখে ছুটী কাটাবো।

অমর কহিল—তাতে আরাম পাবে না। এ-সময় ওরা যত পুরোনো ছবি চালায়। মফঃস্বলবাসীর পেট্রনেজ চায়,—তার উপরই ওদের নির্ভর।

আমি কহিলাম—তাহলে নিরুপায়।

অমর কহিল—চাল না বঙ্গ-পল্লীতে?

—তার মানে?

অমর কহিল—সেজমামা বন-দেশে এক আশ্রম বানিয়েচে অর্থাৎ প্রকাণ্ড ডেয়ারি-ফার্ম্ম, ফশলের ক্ষেত! Inspiring! একখানি বাঙলো আছে। এ-সময়ে ওখানে তাঁর season চলবে পুরা দমে।

আমি কহিলাম—কোথায়?

অমর কহিল—কাঁচড়াপাড়া জানো? ই. বি, আর লাইনে?

কহিলাম—জানি।

অমর কহিল—কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশন থেকে পূর্ব্বদিকে পথ গেছে জাঙুলে হয়ে হরিণঘাটা। হরিণঘাটায় আমরা যাবো না। আমাদের আশ্রম হলো খলশেয়, রাণাঘাটের কাছে। ঐ জাঙুলের পথে বাঁয়ে বেঁকে আট-দশ মাইল কাঁচা রাস্তা মাড়িয়ে অগ্রসর হলেই পাবো খলশে—যেন মরুর বুকে oasis!

আমি কহিলাম—কিসে যাবো?

অমর কহিল—তোমার টু-শীটার 'ফিয়াটে'।

—কাঁচা রাস্তা বলচো!

অমর কহিল—তেমন কাঁচা নয়। মানে, বর্ষায় বিশ্রী হয়ে ওঠে—এখন শীতের সময় দুর্গম নয়। একটু সতর্ক হয়ে যেতে হবে—গাড়ী জখম হবে না।

মন নাচিয়া উঠিল। এ্যাডভেঞ্চার! বেশ! এ্যাডভেঞ্চারের নামে রক্ত আজো গরম হইয়া ওঠে! বোধ হয়, আদি-যুগে বাঙালী 'ফাইটিং' জাতি ছিল, এ তাহারই জের!

অমর কহিল—আমার সঙ্গে যাবে বৌদি, টুনু, বড়দি আর মেজদি। কাজেই একসঙ্গে যাওয়া হবে না।

—কুছ পরোয়া নেই। আমি একাই যাবো। একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি! তোমরা কবে বেরুচ্ছ?

অমর কহিল,—এক্সমাস্ ঈভের আগের দিন। সন্ধ্যার মধ্যে না হয়ে ওঠে তো পরের দিন ভোরে। জানো তো, বাঙালী নারীর অক্ষৌহিণী নিয়ে যাওয়া! বিশেষ বৌদি চলেছে। তাদের টয়লেট আছে। তুমি আগের দিন চলো! আমি সেজমামাকে লিখে দেবো। তারা খুশী হবে'খন। সেজমামা ভারী আমুদে লোক! সেখানে আশ্রম যা বানিয়েচে, তাতে সব আছে। পাখী, লালমাছ থেকে সুরু করে মায় গ্রামোফোন, কটেজ পিয়ানো। The ideal sopt! কাছে বিল আছে। চাও তো বন্ধুকটা সঙ্গে নিয়ো। শীকার করা যাবে।

—রাইট-ও। কথা দিলাম—জ্যোৎস্না রাত্রি আছে। বেশ, সন্ধ্যার আগেই আমি যাত্রা করচি।

অমর কহিল—একখানা রাগ শুধু সঙ্গে নিয়ো—আর কোন লাগেজের দরকার নেই। সেখানে সব মিলবে।

বহুৎ আচ্ছা! নিমেষে কথা পাকা হইয়া গেল।

সন্ধ্যার আগেই বাহির হইলাম। পাড়ি যে-রূপ জমাইব ভাবিয়াছিলাম, তেমন জমিল না! গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের মত এদিক্‌কার পথ তেমন সুপথ নয়—মোটরের পক্ষে।

নৈহাটী ষ্টেশন পার হইয়া খানিক আগে দেখি, বাঁয়ে গঙ্গা। বুকে মস্ত চড়া দ্বীপের মত জাগিয়া রহিয়াছে। পথে ধুলার অন্ত নাই!

গ্রামের মধ্য দিয়া সোজা আসিতে আসিতে হঠাৎ দেখি, পথের চেহারা বদলাইয়া গিয়াছে! দুধারে বন—কুল আর খেজুরের সারি। গা কেমন ছমছম করিয়া উঠিল। কোথায় চলিয়াছি? ঠিক যেন বর্দ্ধমানের ও দিকে সেই দুর্গাপুরের জঙ্গলের মত! তেমন বড় না হোক, সে-জঙ্গলের একটি পকেট এডিশন! দুধারে যতদূর দৃষ্টি চলে, রেল-লাইনের চিহ্ন দেখা যায় না! লাইন দেখা সম্ভব নয়। সিগনালের আলো? কাঁচড়াপাড়ার অত-বড় ওয়ার্কশপ—তাহার আলো-রেখা! কিছু না! গাড়ী থামাইলাম। সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

দুজন চাষী আসিতেছিল—মাথায় কতকগুলি কাঠকুটা! জিজ্ঞাসা করিলাম—কাঁচড়াপাড়ার রেল-ষ্টেশন এই দিকে?

তারা বলিল—ইষ্টিশানে যাবে?

কহিলাম—হ্যাঁ।

তারা বলিল—ইদিকে ইষ্টিশান কোথায়? ছেড়ে এসেচো।

প্রশ্ন করিলাম—কোন্ দিকে যাবো?

তারা বলিল—যে পথে এসেচো, ঐ পথেই ফিরে যাবেন। যেয়ে প্রথম যে চৌমাথা পাবেন—বাঁয়ের পথ নেবেন—সিধে—তাহলে ইষ্টিশান পাবে।

মন্দ লাগিল না। পথে বাহির হইয়া নিরুপদ্রবে যাঁরা চলিতে চাহেন, আমি তাঁদের দলের নহি। চলিতে গিয়া বাঁকা-চোরা পথে পদে পদে বাধা যদি না পাইলাম, সে বাধায় মোড় না ঘুরিলাম, তাহা হইলে যৌবনের এ-হিল্লোল বুকে মিছা বহিয়া মরি।

গাড়ী ঘুরাইয়া আসিয়া চৌমাথা পাইলাম। বাঁয়ের পথ ধরিয়া খানিক আসিয়া পাইলাম—কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশন। সেখানে লোকজনের কাছে প্রশ্ন করিতে জাগুলের পথের সন্ধান মিলিল।

এপথে বাস চলে। ই-বি-আর লাইনের তলা দিয়া ওয়ার্কশপের স্বদেশী কোয়ার্টার্স ফুঁড়িয়া পথ! সেই পথে সোজা গাড়ী চালাইলাম—পূর্ব্বমুখে।

দু'পাশে অনিবিড় বন। লোকালয় আছে বলিয়া মনে হয় না। তবে মাঝে মাঝে ঝোপের মধ্য হইতে আলোর রেখা চোখে পড়ে!

অমর বলিয়া দিয়াছিল, বাঁয়ে মোড় লইতে হইবে। কিন্তু সে কোনখানে?

একটা একতলা কোঠাবাড়ী! দু'টি ভদ্রলোক বাড়ীর মধ্য হইতে বাহিরে আসিতেছিলেন, তাঁদের প্রশ্ন করিলাম,—খলশে যাবো কোন্ পথে?

তাঁরা পথ দেখাইয়া দিলেন, কহিলেন—এই রাত্রে মোটরে করে যাবেন! পথ জানা আছে?

কহিলাম—না।

তাঁরা কহিলেন—কোনোদিকে বেঁকবেন না—সিধে যাবেন।

প্রশ্ন করিলাম—কত মাইল হবে?

তাঁরা বলিলেন—এখান থেকে তা প্রায় পনেরো মাইল।

That's nothing! মনের আনন্দে পাড়ি দিলাম।

আনন্দ আহত হইতে লাগিল। যেন পাহাড়ের পাথর ভাঙ্গিয়া গাড়ী চালাইয়াছি। ঢেলাঢিলার অন্ত নাই। এমন ধূলার আবরণ-তলে আছে যে, চোখে দেখিয়া বুঝা যায় না। কিন্তু গাড়ী পদে পদে মাথা ঠুকিয়া দেহ দুলাইয়া জানাইয়া দিতেছিল!

মাঠ আর মাঠ···বন আর বন। জানি না, এ-বন দু'হাতে সরাইয়া এমন চক্রাকারে বক্র রেখায় এ-পথ কে রচিয়া রাখিয়াছে—কি প্রয়োজনে! নালাও আছে পথের বুক ভরিয়া। তার উপর গড়ানো সাঁকো। সাঁকোর দেহ যেন বাতগ্রস্ত রোগীর দেহের মত কুব্জ, ন্যুব্জ! এক একটা ধাক্কায় এমন ভয় মনে জাগিতেছিল, গাড়ী বুঝি বিগড়ায়।

ভালো ড্রাইভ করি বলিয়া নিজের মনেই শুধু আত্ম-প্রসাদ অনুভব করি, তা নয়—পাঁচজনেও প্রশংসা করিয়া বলে—হাঁ!

কিন্তু সে 'হাঁ' ঢিলা হইতে লাগিল এবং একটা সাঁকো পার হইতে ভাঙ্গা সাঁকোর ইটগুলা গেল খসিয়া—সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর সামনের চাকা হেলিয়া আটকাইয়া পড়িল!

উঠিয়া নাড়া দিয়া কোনো ফল হইল না। একা গাড়ী তোলা অসম্ভব!···উপায়?

প্রাণপণে টানাটানি করিয়া হিমশিম হইলাম! গাড়ীর চাকা টাইট আঁটিয়া রহিল—ভাঙ্গা ইটের ফোকরে!

উপায় আছে···একটি মাত্র! গাঁতি বা শাবল আনিয়া পাশের ইটগুলা খশাইতে পারিলে···

কিন্তু একার কাজ নয়। তাছাড়া গাঁতি বা শাবল কোথায় পাই? আকাশের পানে চাহিলাম। চাঁদের অমলিন জ্যোৎস্না—কুয়াশার চিহ্ন নাই! চারিদিকে কে যেন স্বচ্ছ রূপালি চাদর বিছাইয়া দিয়াছে! সামনে ধূলায় ধূসর পথ—চাঁদের আলোয় দেখাইতেছে যেন জলের ধূ ধূ প্রসার। নয়ন সে দৃশ্যে হয় মুগ্ধ—মন হয় চঞ্চল!

কিন্তু তখন কবিত্বের সময় নয়। গাড়ীর উদ্ধার চাই!

গাছপালা ভেদ করিয়া যতখানি দৃষ্টি চলে, চাহিয়া দেখিলাম! ঐ না দূরে···আলোর রশ্মি! বোধ হয়, লোকের বসতি আছে। মুহূর্ত্ত দাঁড়াইলাম। আলোর পানে দৃষ্টি রাখিয়া ঝোপ-ঝাপ ঠেলিয়া অগ্রসর হইলাম।

বনের কোলে মস্ত বাড়ী। পুরানো—তা হোক! ঘরের জানালা দিয়া আলোর রশ্মি পথে পড়িয়াছে!

অমরের সেজমামার বাড়ী নয় তো? দ্বারে হানা দিলাম।

ওভারকোট গায়ে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক আসিয়া দ্বার খুলিলেন। আমি কহিলাম,—সাহায্য চাই! আমার গাড়ী খানার মধ্যে পড়ে গেছে।

ভদ্রলোক কোনো কথা কহিলেন না—আমার পানে চাহিয়া রহিলেন। আমি কহিলাম,—এইটেই কি খলশে গ্রাম?

তিনি কহিলেন,—হ্যাঁ।

আমি কহিলাম,—এইটে শশধর বাবুর বাড়ী?

মৃদু হাস্যে তিনি মাথা নাড়িলেন।

আমি কহিলাম,—একখানা গাঁতি বা শাবল দিতে পারেন? আর দু'জন চাকর?

তিনি কহিলেন—রাত্রে চাকর কোথায় পাবো?

দারুণ পিপাসা পাইয়াছিল। কহিলাম,—এক গ্লাস জল পাবো?

তিনি কহিলেন,—পাবে। এসো।

তাঁর সঙ্গে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। বাড়ীখানি বহুকালের প্রাচীন; সংস্কার হইয়াছে। সেকালের সঙ্গে, একালকে মিশাইবার প্রয়াস চোখে পড়িল! ভিতরে ঢুকিয়া প্রকাণ্ড দর-দালান। দালানের কোলে মস্ত ঘর। ঘরে টেবিলের উপর টেবল-ল্যাম্প জ্বলিতেছে। জানালার মধ্য দিয়া এই আলো গিয়া পথে পড়িয়াছে। এই আলো দেখিয়াই আমি...

তিনি বলিলেন,—বসো...জল আনচি!

আমি বসিলাম, কহিলাম—আপনার নাম শশধর বাবু?

তিনি বলিলেন,—হ্যাঁ।

আমি কহিলাম,—আপনার ভাগনে অমর—আমার বন্ধু। আমায় বলেছিল, এখানে আসতে। বড় দিনের ছুটী...মানে... তাবাও তো কাল আসচে!

তিনি শুধু কহিলেন,—হ্যাঁ।

বলিয়া চলিয়া গেলেন। আমি চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। ওদিককার দেওয়ালের গায়ে বড় বড় শেল্‌ফ্‌ বইয়ে ঠাশা।

বিস্ময় বোধ করিতেছিলাম! এই কি ডেয়ারী? অমর বলিয়াছিল! তামাসা? আচ্ছা, কাল আসুক সে ...

শশধরবাবু জল আনিলেন...পান করিলাম!

কহিলাম, গাড়ীখানা...

তিনি কহিলেন, আজ তো কিছু হবে না! তা, ভয় কি! এ পথে গাড়ী চুরি যাবে না।

তা যাইবে না!

শশধরবাবু কহিলেন,—কলকাতা থেকেই আসা হচ্ছে?

কহিলাম—হ্যাঁ।

শশধরবাবু কহিলেন—অমর কাল আসবে?

কহিলাম—আপনি জানেন না?

শশধর বাবু চুপ করিয়া কি ভাবিলেন, পরে কহিলেন,—আসবে, শুনেচি। কবে—জানি না।

অমরের উপর রাগ ধরিল! মজার লোক! বাঃ!

না হয় কালই আমি আসিতাম—একসঙ্গে! আজ রাত্রে আসিয়া কি রাজত্ব ভোগ করিব!

আমিও যেমন...

হুজুগের নামে মাতিয়া চলিয়া আসিলাম! অজানা জায়গা—অপরিচিত সেজমামা! সে বলিয়াছিল, আমুদে লোক! আমোদের কোনো লক্ষণ তো কোথাও দেখিতেছি না! নিরেট গম্ভীর!

শশধরবাবু কহিলেন—রাত প্রায় ন'টা। খাওয়া-দাওয়া হবে?

বিরক্তি ধরিয়াছিল। কহিলাম—না।

শশধরবাবু কহিলেন—তাহলে শুয়ে পড়লেই ভালো হয় না?

কহিলাম—বেশ।

শুইতেই চাই—এ-গাম্ভীর্য্য চোখে দেখিতে হইবে না—তাই...

শশধরবাবু কহিলেন,—এসো...

তাঁর সঙ্গে চলিলাম। দু'তিনটা ঘর পার হইয়া সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলাম। শশধরবাবুর হাতে হারিকেন লণ্ঠন।

এত বড় বাড়ী—থাকেন একা! শুনিয়াছিলাম—সপরিবারে বাস করেন! গ্রামোফোন আছে, আরো কত কি...

হয়তো আছে! রাত্রে পুরী এমন নিঝুম! দিনের আলোয় হয়তো বাড়ীর চেহারা বদলাইয়া যাইবে!

একটা রাত্রি·· কাল অমর আসিতেছে!

দোতলার একটা ঘরে আমাকে আনিয়া শশধরবাবু কহিলেন—খাট আছে। মশারি ফেলে নিতে হবে। ব্যাগ সঙ্গে তো আছে? শীত খুব বেশী নয়। লেপ-কম্বল চাই?

ব্যাগখানা গাড়ী হইতে ঘাড়ে তুলিয়া আনিয়াছিলাম।

কহিলাম—না, এতেই শীত ভাঙ্গবে।

শশধরবাবু কহিলেন—আচ্ছা।...টেবিলে বাতি আছে। দিয়াশলাই সঙ্গে আছে? না, দেবো?

আমি কহিলাম দিয়াশলাই নাই।

—বিড়ি-সিগারেট বুঝি চলে না?—তা বেশ, দিয়াশলাই দিচ্ছি।

ওভারকোটের পকেট হইতে দিয়াশলাই বাহির করিয়া শশধরবাবু কহিলেন,—একটা দিয়াশলাইয়ের বাক্স এই রাখচি। বাতিটা জ্বেলে নাও।

বাতি জ্বালিলাম। শশধরবাবু কহিলেন—শুয়ে পড়ো। কেমন?

কহিলাম—হ্যাঁ।

শশধরবাবু লণ্ঠন হাতে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। কহিলেন—নতুন জায়গা, দরজা বন্ধ করেই শুয়ো। ভয় নেই। তবে কি জানো, ভামটাম আছে। পাড়াগাঁ—চারিধারে বন-বাদাড়!

আমার কেমন চেতনা ছিল না। মনে হইতেছিল, স্বপ্ন দেখিতেছি! শশধরবাবু চলিয়া গেলেন।

বাহির হইতে দ্বার ভেজাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শব্দ হইল, দ্বারে যেন তালা লাগাইতেছেন।

তালা! শিহরিয়া উঠিলাম। তালা কেন?

গিয়া দ্বার ধরিয়া টানিলাম। তাই! তালা বন্ধ! বাহির হইতে শশধরবাবু হাসিলেন—অট্টহাসি! গায়ে

কাটা দিল। সর্ব্বনাশ! পাগলের হাতে পড়িলাম না কি! দ্বার ধরিয়া নাড়িতে লাগিলাম। মিথ্যা! ওদিকে রাত্রির স্তব্ধতা চিরিয়া শশধরবাবুর সেই হাসি···

খোলা জানালার মধ্য দিয়া স্পষ্ট দেখিলাম, আকাশ-ভরা জ্যোৎস্না সে-হাসিতে কাঁপিতেছে!

খাটে আসিয়া বসিলাম। এ যে পাগল! তামাসা করিলেও পাগলের হাতে অমর আমাকে নিক্ষেপ করিতে পারে না। ভুল ঠিকানায় আসি নাই তো?

তাই বা কি করিয়া হইবে! নাম বলিলেন, শশধর-বাবু। তবে···?

বাহিরের জ্যোৎস্না আমার চোখে নিবিয়া ছায়ায় মিশিল!—প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে চেতনা ফিরিল।···

ওদিকে বাহিরে কলরব শুনিলাম। কলরব দ্বারের সামনে আসিয়া হাজির!···দ্বার খুলিল।

ভিতরে আসিলেন শশধরবাবু—সঙ্গে পাঁচ-সাতজন লোক। পুলিশ! কাঁধে চির-পরিচিত ইংরাজী হরফ B. P. বাঙ্গাল পুলিশ।

আমার কৈফিয়ৎ তলব হইল। কেন আসিয়াছি? কোথায় আসিয়াছি? তল্লাস চলিল।

আমি হতভম্ব!···

পুলিশ আমাকে লইয়া বাড়ীর বাহিরে আসিল। তাদের সঙ্গে হাঁটিয়া ধূলা ভাঙ্গিয়া আসিলাম,···দীর্ঘ পথ।

ষ্টেশন দেখা গেল—বুঝিলাম, রাণাঘাট ষ্টেশন।

থানায় আনিয়া পুলিশ আমাকে হাজতে পুরিয়া দিল। আমি কহিলাম—এর মানে? জুলুম?

পুলিশ বলিল,—কাল সকালে সব কথা শুনিব। আজ বিশ্রাম করো!

স্বপ্ন। স্বপ্ন। আরব-রজনীর একটা পরিচ্ছেদের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছি!···কিন্তু কোথায় তবে পরি-বানু? পারিসানা? বেদৌরা? মরজিয়ানা?···

অথচ···না, স্বপ্ন নয়! হাজত-ঘর স্বপ্ন হইতে পারে না, কি অপরাধ করিলাম,—তাহাও বুঝিলাম না।···

সকালে তদারকী।

শুনিলাম, যে গৃহে গিয়াছিলাম, সে গৃহের মালিক শশধরবাবু নিভৃত পল্লীতে আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছেন। কারণ, সকলের প্রকাশ্য বিদ্রোহের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া এ-বয়সে তিনি এক পঞ্চদশীর পাণিপীড়ন করিয়াছেন!

ছেলে-মেয়ে, জামাই—সকলে তাঁকে ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতে চায়—তাঁকে পাগল বানাইয়া আদালতের হুকুম লইয়া গার্জ্জেন হইয়া তাঁকে খর্পরে রাখিয়া সম্পত্তির হেফাজতা চায়! সে-কাজে তাঁর প্রধান মন্ত্রী করালী সরকার। করালীর সাহায্যে বাবাজীদের এ সকল জানিতে পারিয়া গহনা-গাঁটি, গবর্ণমেণ্টপেপার, শেয়ার, ব্যাঙ্কের খাতাপত্র-সমেত এইখানে বনের কোলে তিনি চলিয়া আসিয়াছেন। বাড়ীখানি করালীর পিতৃপুরুষের। শশধরবাবু সেটিকে সাজাইয়া গুছাইয়া তুলিয়াছেন! বধূটি করালীরই ভাগিনেয়ী। কিশোরী রূপসী বধূ লইয়া এই বাড়ীতে বুড়া বাস করিতেছেন।

ছেলেমেয়েদের তবু অভিসন্ধির অন্ত নাই। ছেলে শাসাইয়া গিয়াছে—তোমার বাড়ীতে ডাকাত লেলাইয়া দিব! মেয়ে বলিয়াছে—বৌ, না পোড়ারমুখী! তার নাক-কান কাটিয়া দিব!

একজনকে অতিথিবেশে ছেলেরা পাঠাইয়াছিল। মোটরে চড়িয়া সে আসিয়াছিল—দশ দিন পূর্ব্বে! আসিয়া বলে, মোটর খারাপ হইয়া গিয়াছে। এক রাত্রির মত যদি আশ্রয় দেন? ছেলেদের তরফ হইতে আসিয়াছে বা ছেলেদের চিনে, এমন আভাস শশধরবাবু পান নাই। বিশ্বাস করিয়া ভদ্র যুবাকে গৃহে স্থান দেন! এই ঘরে শুইয়াছিল। সকালে শশধরবাবু নীচে নামিয়া দেখেন, সিন্দুক ভাঙ্গা। প্রায় পনেরো হাজার টাকা মূল্যের জড়োয়া অলঙ্কার ও কয়েকখানা দলিলপত্র সাফ হইয়া গিয়াছে। একখানা চিঠি পান। ছেলে নরেশের লেখা। চিঠিতে লেখা ছিল,—

সপ্রণাম নিবেদন,

মার জড়োয়া গহনাগুলির জন্য লোক পাঠাইলাম। সেগুলি দিবেন।

শুধু এইটুকু! তাহা হইতে জানিতে পারেন, সে অতিথি ছেলেদের পাঠানো! আগাগোড়া অভিসন্ধি ছিল। লোহার সিন্দুকটা বড়—তাই সেটা দোতলায় তোলেন নাই।

আজ আবার মোটর বিগড়ানো নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক! পুলিশে জানাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমাকে দোত-লায় চালান করিয়া করালী সরকারকে সাইকেলে চড়াইয়া রাণাঘাটের থানায় পাঠান। খবর পাইয়া পুলিশ আসে।

শশধরবাবু কহিলেন—পুরোনো ছড়া ভুলে গেছ বাপু। বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান, এবারে তোমার ঘুঘু বধিব পরাণ!

মনের অস্বস্তি কতক ঘুচিল।·· সরল শান্ত ভাষায় বুঝাইয়া বলিলাম,—আমার নাম শ্রীসূর্য্যশেখর মিত্র। ওকালতি করি। শশধরবাবুর ছেলেদের চিনি না। তাঁর এ দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহের বৃত্তান্তও জানি না। আমার গাড়ী সত্যই বিগড়াইয়াছে—টু-শীটার ফিয়াট। নম্বর···

ইনস্পেক্টর বাবু কহিলেন—এ পথে মানুষ উদ্দেশ্য বিনা চলে না। হঠাৎ আপনি এই শীতের রাত্রে এ বনে···

কেন আসিয়াছি, বলিলাম।

শুনিয়া ইনস্পেক্টরবাবু কহিলেন—খলশে! সেখানে আবার দ্বিতীয় শশধরবাবু কে?

আমি কহিলাম—তাঁর ডেয়ারী আছে। মস্ত বাড়ী···

ইনস্পেক্টরবাবু কহিলেন—ও! শশিধরবাবু! শশধর বাবু নন তিনি··· ।

অন্ধকার আকাশে যেন আলোর রশ্মি ফুটিল!···

ঠিক! অমরের কাছে সেজমামার নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। বলিয়াছিল—শশিধর!

নামটা উদ্ভট! এমন নাম, কখনো শুনি নাই! ভাবিয়াছিলাম, ভুল শুনিয়াছি! শশিধর নাম হইতে পারে না—শশধর! নিজে হইতে ভুলটুকু শুধরাইয়া লইয়াছিলাম।

তবু আইনের ফাঁশ সহজে ছাড়িতে চায় না!

বাঙ্গাল পুলিশের ইন্স্পেক্টার ভারী strict। এক পেয়ালা চা চাহিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন—ক্ষমা করবেন। আপনি এখন হাজতের আসামী! আইন মোতাবেক খাবার পাবেন। আসামীকে চা দেবার নিয়ম নেই।

জবাব শুনিয়া চুপ করিয়া গেলাম!

বেলা প্রায় সাড়ে নটা···

ইন্স্পেক্টর আমাকে লইয়া বাহির হইবেন, শশধর বাবুর গৃহে তদারক করিতে···সহসা থানার দ্বারে এক মোটর আসিয়া হাজির!

দেখি, অমর! সঙ্গে···

পথে সে আমার টু-শীটার দেখিয়া সন্ধান করে। খবর পায় নাই। সেজমামার বাড়ী গিয়া শুনিয়াছে—তার কোনো বন্ধু পূর্ব্বরাত্রে আসে নাই!

আমার কোনো বিপদ ঘটিয়াছে ভাবিয়া তাই সে বৌদিদের নামাইয়া সোজা আসিয়াছে থানায়—পুলিশের সাহায্যে উদ্ধারকল্পে!···

মুক্তি মিলিল। শশধর ছাড়িয়া শশিধরে কূল পাইলাম।

অমর কহিল—বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে যদি সম্পর্ক রাখতে, তাহলে বুদ্ধি খাটিয়ে শশি কেটে শশ করতে না। শশিধর মানে মহাদেব। শিরে যিনি শশীকে অর্থাৎ চন্দ্রকে ধারণ করেন!···বুঝলে?

মহাদেবই বটে! সেজমামার সরল অমায়িকতা —মাটীর মানুষ! এইজন্মই বাঙালীর ঘরে ছোট ছোট মেয়েরা মাটী লইয়া যেমন-খুশী শিব গড়িয়া বিপদে পড়ে না! আশুতোষ মহাদেব—খুশী আছেন সকল সময়। সেজমামাও তাই!

সেজমামার মেয়ে রাণু—মেয়েটি আরো চমৎকার! বয়স কত? তেরো, নয় চৌদ্দ! বড় জোর পনেরো বৎসর!

বেথুনে পড়ে নাই। সেজমামা প্রগতি-বাদী মাসিক-কাগজ পড়েন না! তথাপি···

খাশা মেয়ে।

আমাদের সঙ্গে রাণু শীকারে চলিল। শীকার হইতে ফিরিবামাত্র নিজের হাতে চা, বিস্কুট, রুটি, টোষ্ট! বিশ্রাম জানে না!

সেজমামা বলেন—ওর জন্যই এ-বনে রাজ্যসুখ ভোগ করচি!

আমারও মত তাই! বনের মায়া আমাকে পাইয়া বসিল। দুদিনের জায়গায় ছুটীর সব ক'টা দিন সেই বনে কাটাইয়া আসিলাম!

এ ভ্রমণের বৃত্তান্ত এইখানেই শেষ করিতে পারিতাম! কিন্তু জের এইখানে চোকে নাই। কলিকাতায় ফিরিয়া কবিতা লিখিতে লাগিলাম!

এবং একদিন অমর আসিয়া বলিল—চলো না খলশেয় এই সরস্বতী-পূজার ছুটীতে—শুধু তুমি আর আমি!

কহিলাম—বেশ!

রবিবাবুর গান মনে পড়িতেছিল,—অলি বার বার ফিরে যায়, অলি বার বার ফিরে আসে। তবে তো ফুল বিকাশে। আমার ভাগ্যে কতবার যে আসা-যাওয়া চলিবে···

মন বলিল—খুশী! খুশী! এ আসা-যাওয়ায় খুশীর অন্ত নাই!

অমর শয়তান—এ রহস্য বুঝিয়াছিল।

সেদিন চা পান করিতেছি, রাণু বলিল,—চলুন, কেষ্টনগর ঘুরে আসি!···

অমর কহিল—আমি যাবো না।

রাণু কহিল—আপনি যাবেন! সুধীবাবু?

আমি কহিলাম—চলো না অমর!···

অমর কহিল—আমি না যাই, তোমরা যাও দুজনে! সেজমামার মত আছে, সেজমামীরও···

বিস্ময় বোধ করিলাম। আমার সঙ্গে মেয়েকে ছাড়িয়া দিবেন! আমার চিত্তবনে এই রেণু···

বুকটা কেমন দুলিয়া উঠিল! রাণু মুখ নামাইল। তার সলজ্জ ভাব!

অমর কহিল—আমাদের কাছ থেকে দূরে গিয়ে—

মানে, একটু আড়ালে—দুজনে দুজনকে জিজ্ঞাসা করো রাণু, সেই কথা। দুটি হৃদয়ের নদী একত্র মিশিবে যদি…

—যাও অমরদা…বলিয়া সলজ্জ-হাসির মৃদু বিদ্যুৎ ছিটাইয়া রাণু দিল ছুট।…

প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ আর কাহাকে বলে!

জগতে কোনো কাজ নিষ্ফল হয় না! সেই বড়দিনের ছুটী—অমর আমাকে খলশেয় টানিয়া আনিবে কেন?

ভবিতব্য!

যথাসময়ে দুই পরিবার হইতে 'শুভ-পরিণয়ে' চিঠি ছাপিয়া চারিদিকে বিতরিত হইল।

ফুলশয্যার রাত্রে আমি বলিতেছিলাম—আচ্ছা রাণু, আমায় তুমি ঠিক কখন্ ভালোবাসলে?

রাণু কহিল—অমরদা এসে যখন তোমার সেই নিগ্রহের কথা বলে…থানার হাজতে কি লাঞ্ছনা…

আমি কহিলাম,—আমাকে দেখবার আগেই…?

রাণু কহিল—হ্যাঁ।…তুমি…?

আমি রাণুর পানে চাহিয়া ছিলাম। যার এই রাণু আছে, দুনিয়ায় তার চাহিবার আর কি আছে!

রাণু কহিল—বলো…

আমি কহিলাম—আসবার আগে কলকাতাতে অমরের মুখে যখন শুনি, সেজমামার একটি মেয়ে আছে রাণু…

মুখ বাঁকাইয়া রাণু কহিল,—যাও! সব-তাতে তোমার চালাকি!

আমি কহিলাম—চালাকি নয় রাণী…সত্যি কথা।

# রাক্ষেল

জীবনটাকে যুদ্ধ জানিয়া শুধু লড়িয়া চলিয়াছি! দারিদ্র্য, ভীষণ দারিদ্র্য! অভাব আর অনুযোগ! এ সবের সঙ্গে মানুষকে এত লড়াও লড়িতে হয়! পদে-পদে পরাজয়, তবু জীবন ঝরিয়া পড়ে না—ইহার চেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার দুনিয়ায় আর কি আছে!

ছেলেবেলা হইতে মনে কেবলি উচ্চ-আশা-তরু রোপণ করিয়া আসিতেছি! দিকে দিকে যে আনন্দ, ঐশ্বর্য্যের যে প্রাচুর্য্য···তার একটি কণা আজও আয়ত্ত করিতে পারিলাম না! তবু এ-লড়ার যেমন বিরাম নাই, আশার বিদ্যুৎও তেমনি সে-অভাবের কালো মেঘ চিরিয়া আজও চমক দিতে ছাড়ে না!

লিখি, শুধু লিখি—গল্প আর উপন্যাস। লোকে বলে, লেখা আমার আসে ভালো! কল্পনার তুলিতে যে-সব নর-নারীর ছবি আঁকি, বাস্তবের সঙ্গে তাদের মিল তেমন না থাকুক, সে ছবি লোকের ভালো লাগে! কিন্তু ঐ পরিচয়টুকু··· এ ভালো লাগাইবার জন্য খাটিয়া যে সারা হইতেছে, কি করিয়া তার দিন চলে, সেদিকে কেহ ফিরিয়া চায় না—এমনি সকলে উদাসীন!

ভাঙ্গা স্যাঁৎসেঁতে মেশ। সেই মেশের একটা ঘরে পড়িয়া আছি। ভাড়া কখনো দিই, কখনো দিতে পারি না। যখন দিতে পারি না, তখন তাড়া খাই! তাড়া খাইয়া কাগজের বাণ্ডিল খুলিয়া বসি,—বসিয়া আট-দশ-বারো-ষোল পৃষ্ঠা ভরিয়া কষিয়া গল্প লিখি, লিখিয়া মাসিক পত্রের দ্বারস্থ হই। আমার লেখার প্রতি তাদের মায়া আছে; বিরাগ নাই—জানি! যেহেতু পাঁচজন পাঠক আমার লেখা চায়। কিন্তু কাগজওয়ালা গম্ভীর মুখে বলে, —আবার গল্প! কাগজে জায়গা কৈ?

আমার বুক ধ্বক্ করিয়া ওঠে! কাগজে একটু জায়গা করিয়া না দিলে আমার মাথা গুঁজিবার জায়গাটুকু যে উবিয়া যায়! মিনতিতে কণ্ঠ ভরিয়া মৃদুস্বরে বলি—যা হয়, দেবেন। একটা লিখেছিলুম···

কাগজওয়ালা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকে! দীর্ঘ-শ্বাসের বোঝায় আমার বুক ভরিয়া ওঠে। নিরুপায় আর্ত্তের কণ্ঠে বলি—নেহাৎ ফিরে যাবো? আমার বড্ড অভাব!

কাগজওয়ালার পানে তাকাই। মুখ তার আরো গম্ভীর! টেবিলের ড্রয়ার টানিয়া গণিয়া গণিয়া সাতটা না আটটা টাকা তুলিয়া আরো গম্ভীর মুখে সে বলে—গল্পটা রেখে তবে এই নিয়ে যান!

হায়রে, পুরা দশটা টাকাও নয়! কিন্তু উপায় কি? সেই সাত-আট টাকাই লক্ষ টাকার মত সযত্নে রুমালে বাঁধিয়া মেশে ফিরি। টাকা তিনেক কাছে রাখিয়া পাঁচটা টাকা বাড়ীওয়ালাকে ফেলিয়া দি, কাতর স্বরে বলি—এই পাঁচ টাকা রাখো,ভাই! তার পর এবারে যে উপন্যাসখানা ফেঁদেচি···শ'খানেক টাকা কপি-রাইটের জন্য পাবোই—আশা আছে!

সেই আশা! দুরাশার পাহাড়ে চড়িয়া আবার শেষে নিরাশার গহ্বরে গড়াইয়া পড়ি!

চৈত্র মাসের দিকে আর পূজার মরশুমে দু'চার টাকা হাতে আসিয়া ঠেকে। কাগজে কাগজে তখন যেন বাচ-খেলার বাজি! দিকে-দিকে নহবৎ বাজিতে থাকে! বাঁধা রোশনাইয়ের ব্যবস্থা! দীয়তাং ভুজ্যতাং রব! উহারই মধ্যে পাঁচ-সাতখানা কাগজে তখন একটু চড়া-দরে গল্প বিকায়!

সম্প্রতি দু'একজন নূতন প্রকাশক উপন্যাসের জন্য আসিয়া তাগিদ দেয়। এ-পথে তারা নূতন পথিক, একেবারে আমাদের মারিবার চেষ্টা করে না; কাজেই যাহাতে বাঁচি, বাঁচিয়া শস্তা দামে দু'চারিখানা নভেল তাদের জোগাইতে পারি, সেদিকে লক্ষ্য আছে! বিনয়-বচন এবং পয়সা তারা দেয়। যে-সব কাগজ-বা বইওয়ালা বাড়ী-ঘর বানাইয়াছে, বুকে তারা পাহাড়ের মত মস্ত পাথর লইয়া বসিয়া আছে—গলে না, টলে না! যাদের রক্ত-মাংস বেচিয়া পয়সা করিতেছে, তারা বাঁচিবে কি খাইয়া, সেদিকে লক্ষ্য নাই—যেন পাষাণ-দেউলের দেবতা! পায়ে মাথা কুটিয়া মরিলেও এক তিল বিচলিত হয় না! তাদের চোখের সামনে নিত্য কত নব-নব লেখক আসিতেছে, যাইতেছে···সেদিকে নজর দিতে গেলে তাদের ব্যবসা চলে না!

এক-একবার মনে হয়, বাঙলার পাঠক-পাঠিকাদের ডাকিয়া বলি, কেহ তোমাদের আনন্দ যদি দিয়া থাকে, বা আনন্দ দিবার ব্রত লইয়া থাকে তো সেই এই আমরা, আমরা!···তোমরা জানো না, ভালো বাঁধাই ভালো ছাপা ঐ বইগুলির পাতায় পাতায় আমাদের প্রাণের কতখানি আমরা ঢালিয়া দিই! না খাইয়া, না পরিয়া, পাওনা-দারের লাঞ্ছনা, প্রকাশকের দারুণ অবহেলা সহিয়া যে-প্রাণ প্রতিক্ষণে ছিঁড়িয়া যাইতেছে, সেই প্রাণকেই কোনোমতে গুছাইয়া তুলিয়া বইয়ের পাতায় ধরিয়া দিই! আমাদের প্রাণ বেচিয়া দোতলার উপর উহারা তেতলা বাড়ী তুলিতেছে, আর আমাদের বাড়ীওয়ালা স্যাঁৎসেঁতে মেশের ভ্যাপ্‌শা অন্ধকার ঘর হইতে ঘাড় ধরিয়া দিনে তেত্রিশবার আমাদের পথে বাহির করিয়া দিবার জন্য

হুঙ্কার ছাড়িতেছে!—ইহার প্রতিকার তোমরা করিবে না? যাহাতে এই সব 'শাইলকে'র হাত হইতে আমরা নিস্তার পাই!

কিন্তু বৃথা ক্রন্দন! বৃথা এ আর্ত্তনাদ! পাঠক-পাঠিকারা বইয়ের সন্ধান রাখে! সে-বই যে লেখে, তার সঙ্গে কিসের সম্পর্ক! এত সন্ধান রাখিতে গেলে চলে না! জীবন বড় ক্ষুদ্র, ক্ষণিক, অবসর বড় অল্প!···

থাকিয়া থাকিয়া মন যেন আক্রোশে জ্বলিতে থাকে! যদি সে-উপায় থাকিত! হয়তো বিরাট অগ্নি-দাহে জ্বলিয়া 'বিসুবিয়াসে'র মত দুনিয়াকে দগ্ধ করিয়া ছাইয়ের নীচে চাপা দিতাম! তার এ বে-দরদ জন্মের মত ঢাকা পড়িয়া যাইত!

আবার সেই পূজার মরশুম। দু'চারিটা গল্প লিখিতে পারিলে হাতে কিছু পয়সা আসিবে; সে পয়সায় চৈত্র মাস পর্য্যন্ত মোটা অভাবগুলা···

ঘরে আম-কাঠের ছোট তক্তাপোষে বসিয়া গল্প লিখিতেছি। কামরার অপর সাথী যামিনী ইন্সিওরেন্স অফিসের কেরাণী। সন্ধ্যায় একটা টুইশনির জোগাড় করিয়াছে—সেই টুইশনি-চাকরি রাখিতে গিয়াছে! এমন সময় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। তাঁর গায়ে গরদের কোট, হাতে মোটা লাঠি। মাথার চুল সাদা। চেহারাখানি বেশ বনিয়াদি গোছের।

তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। আমার তক্তাপোষের পাশে ছোট জানলা। সেই জানলা দিয়া আলোর যে রশ্মিটুকু তখনো ভাসিয়া আসিতেছিল, সেই আলোয় লেখা চলিতেছিল!

অভ্যাস! আঁধারের জীব—আঁধারেও কলম চলে। আলোর জন্য পয়সা লাগে। সে-পয়সা কে দিবে? কাগজ হইতে চোখ তুলিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাঁর পানে চাহিলাম। নূতন কোনো পাব্লিশার না কি? প্রাণে আশার ঝলক্···

ভদ্রলোক কহিলেন—এই বাড়ীই তো "আরাম-নিবাস" মেশ—৫২ নম্বর বাড়ী?

কহিলাম—হ্যাঁ। বসুন।

ভদ্রলোক চারিধারে চাহিলেন,—এইটেই না দোতলার পশ্চিম-দিকের ঘর?

কহিলাম—হ্যাঁ।

ভদ্রলোক কহিলেন—এই ঘরেই আমাদের অনাদি থাকে?

অনাদি! কি জানি কি মনে হইল, খালি তক্তাপোষের পানে তাকাইয়া কহিলাম—হ্যাঁ।

ভদ্রলোক কহিলেন—আমি তার শ্বশুর।

কহিলাম—ও।

ভদ্রলোক কহিলেন—অনাদি তো বই লিখেই চালাচ্ছে। অন্য কোনো চাকরি-বাকরি করে না?

চট্ করিয়া পরিচিত রাজ্যটুকুর উপর চোখ বুলাইয়া লইলাম! অনাদি? লেখক অনাদি? ও! বুঝিলাম, ইনি অনাদি চাটুয্যের কথা বলিতেছেন!

ঠিক—এই মেশের এই কামরাতেই তিনি থাকিতেন! হঠাৎ তাঁর উপন্যাসগুলার কাট্তি বাড়িয়া যাওয়ায় অবস্থা ফিরিয়াছে···তাই আলাদা কোথায় এক-তলা একটা বাসা লইয়াছেন!

ভদ্রলোক ক্ষণেক চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—সে-স্ত্রীলোকটা এখনো সঙ্গে আছে?

রুদ্ধ নিশ্বাসে বসিয়া রহিলাম। স্ত্রীলোক? ভদ্রলোক আবার একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, কহিলেন—রাস্কেল! অথচ কি তার অভাব ছিল? কিছু না! শ্বশুর-বাড়ীতে বাবুর পোষালো না। শুনেচি, স্ত্রীলোকটা তারই কোন আত্মীয়ের বিধবা স্ত্রী! অল্পবয়সে বিধবা হয়—তার পর শ্বশুর-বাড়ীতে নানা অত্যাচার। বাবাজীর মমতা হলো—তাকে আশ্রয় দিলেন। তার পর থেকেই···

ভদ্রলোক থামিলেন। পরে নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—মেয়েটা আমার ভারী দুঃখ পাচ্ছে! রাস্কেল এত বই লেখে,—আমি পড়িনি—তবে শুনেচি, মন্দ লেখে না! সে-সব লেখায় নারীর ব্যথায় ভারী দরদ জানায়! অথচ নিজের স্ত্রীর ব্যথার পানে চাইতে জানে না! রাস্কেল! তা, মেয়ে আমার খুব ভালো, সেই স্বামীর ধ্যানে তন্ময়! ওর লেখা বইগুলো পয়সা দিয়ে কেনে। একখানা নয়—ত্রিশ-চল্লিশখানা করে! কিনে জানাশুনা যে যেখানে আছে, তাদের বিলোয়। স্বামীর খ্যাতি রটাবার জন্য! হুঁঃ, স্বামী তো ঐ রাস্কেল!

আমি কহিলাম,—বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাই তাকে বাড়ী নিয়ে যাবেন বুঝি?

ভদ্রলোক কহিলেন—না। সে-স্ত্রীলোকটাকে সে ছাড়তে পারবে না—স্পষ্ট বলেচে। একটু লজ্জা হ'লো না!—লিখেছিল—তার স্ত্রীর চেয়ে সে কোনো অংশে নীচু নয়। যখন তাকে আশ্রয় দেছে, তখন ছাড়তে পারবে না! সে তার জীবনের আশা, উৎসাহ, কল্পনার উৎস—এমনি নানা কথা!···রাস্কেল!

আমার বুক কাঁপিতেছিল! পাশের তক্তাপোষে থাকে যামিনী—অনাদি বাবু নয়। যদি আসে? ধরা পড়িয়া যাইব!

তবু লেখক অনাদির জীবনের এই রহস্যটুকু অপূর্ব্ব! ইহা হইতে বেশ একটা গল্প বানানো যায়! সে-গল্প লিখিলে পকেটে দু'পয়সা আসিবে। অনাদি, সেই নাম-না-জানা বিধবা নারী এবং এই শ্বশুর, আর গৃহকোণ

বাসিনী অনাদির বেদনার্ত্তা পত্নী! শুনিবার কৌতূহল বাড়িয়া চলিয়াছিল। কহিলাম—তা, হঠাৎ তাঁর সঙ্গে দেখা...?

বাধা দিয়া ভদ্রলোক কহিলেন—ঐ মেয়ের জন্য! আমার ঐ এক মেয়ে! চার-পাঁচটি গিয়ে এই একটিতে ঠেকেচে! তা মেয়েকে দেখলে কে বলবে, তার বুকে এত ব্যথা! মা আমার হাসি-মুখেই আছে!...পূজো আসচে, কদিন ধ'রে মেয়ে বায়না নিয়েচে—তাঁর সঙ্গে দেখা করো বাবা, তিনি বড় দুঃখে আছেন! তার উপর আবার হাঙ্গামা এই, সেই স্ত্রীলোকটার একটা ছেলে হয়েছে! তারা নিশ্চয় এখানে থাকে না! তোমরা থাকতে দেবে কেন?

আমি কহিলাম—না, তারা আলাদা থাকে। এখানে তাদের কখনো আনেও না!

ভদ্রলোক কহিলেন, হুঁ! কাণ্ডজ্ঞানটুকু একদম লোপ পায় নি! তা কি করবো? মেয়ের কথায় আসতে হলো। এখানে আসা আমার পোষায় না বাপু! তার সঙ্গে দেখা হলো না, ভালোই হলো! দু'দিন আগে আসতে-আসতে পেছিয়ে গেছি! তাকে ক্ষমা করা আমার পক্ষে কতখানি দুঃসাধ্য, বোঝো তো!

কহিলাম—বুঝি বৈ কি।

—তা...থামিয়া ভদ্রলোক পকেট হইতে বড় একটা 'পার্শ' বাহির করিয়া তাহার মধ্য হইতে একতাড়া নোট তুলিয়া কহিলেন—একশো টাকা আছে। মেয়ের ইচ্ছা...তাই দিয়ে যাচ্ছি! তুমিই রাখো। সে এলে তাকে দিয়ো। যদি জিজ্ঞাসা করে, বলো, তার এক ভক্ত পাঠক প্রণামী দিয়ে গেছে!...মেয়ে এই কথাই বলতে বলেচে!...আর যদি অভাবে পড়েচে তুমি বুঝতে পারো, আমাকে জানিয়ো—আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আসবে। মেয়ে বলে, সে রাজ-ঐশ্বর্য্য ভোগ করচে, আর তার স্বামী...

ভদ্রলোকের স্বর গাঢ় হইয়া আসিল। কাশিয়া গলাটা সাফ করিয়া লইয়া তিনি কহিলেন—এমন স্ত্রীর দাম বুঝলো না! নেহাৎ রাস্কেল!...হ্যাঁ, আমার নামটা লিখে রাখো বাপু। চন্দ্রকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৭ নম্বর বলভদ্র রোড, মাণিকতলা। ঠিক ঐ মাণিকতলার পোলের কাছে ...চুপি চুপি যেয়ো।

টাকাটা ট্যাঁকে গুঁজিয়া তাড়াতাড়ি ঠিকানা লিখিয়া লইলাম। কহিলাম,—ঠিকানা খুঁজে বাড়ী ঠিক বার করবো'খন!

ভয় হইতেছিল—টুইশনি সারিয়া যামিনী যদি আসিয়া পড়ে?

ভদ্রলোক কহিলেন—অনাদির কাছে আমার নাম কো না...! বাবুর আত্ম-সম্মানে আঘাত লাগতে পারে...মহাপুরুষ কি না! মহৎ কর্ত্তব্য সাধন করচেন! স্ত্রী, শ্বশুর—সে কর্ত্তব্যের পথে তারা মহা-বাধা!...তা হ'লে চললুম। সে বাসায় নেই, ভালোই হয়েচে! আমার ভাবনা ছিল। বলো, একজন পাঠক দিয়ে গেছে! না, না, বলো—পাঠিকা! নারীর উপর তাঁর ভারী সম্মান, ভারী দরদ—টাকাটা তা হ'লে শিরোধার্য্য করতে তার বাধবে না! শ্বশুর দিয়ে গেছে শুনলে হয়তো স্পর্শ করতে ঘৃণা হবে!...রাস্কেল!

ভদ্রলোক কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বিদায় লইলেন। নীচে সদর অবধি তাঁর সঙ্গে গিয়া সম্মান-প্রদর্শনে ত্রুটি রাখিলাম না। পথে মোটর ছিল। তিনি মোটরে চড়িলে মোটর ছাড়িয়া দিল। আমিও নিশ্বাস ফেলিয়া নিজের ঘরে আসিলাম।

অন্ধকার বেশ ঘনাইয়া আসিয়াছে। নোটের তাড়া বাহির করিয়া গণিলাম...একশো টাকা। নগদ একশো!

একসঙ্গে এতগুলা টাকা চক্ষে কখনো দেখি নাই! ইহ-জন্মে হয়তো দেখিব না! বুকের মধ্যে যা' হইতেছিল —অনাদি চাটুয্যে, সেই নাম-না-জানা বিধবা নারী, অনাদির পত্নী!

সাধ্বীকে মনে মনে নতি জানাইলাম! করো, এমনি করিয়াই নিজের কর্ত্তব্য তুমি সাধন করো! আর তুমি শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁচিয়া থাকো বৃদ্ধ, দীর্ঘ দীর্ঘ কাল! তোমার মেয়ের আব্দার রাখিতে এমনি করিয়া অভাবগ্রস্ত জামাতাকে অর্থ-দানে...

বাহিরে জুতার শব্দ! নোটগুলা কাগজের তলায় চাপিয়া রাখিলাম! যামিনী ঘরে প্রবেশ করিল।...কহিল, —অন্ধকারে বসে লিখচো?

কহিলাম—হ্যাঁ...

—সে কি হে?

কহিলাম,—অন্ধকারে লেখকদের চোখ জ্বলে!—না জ্বলে, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের এত গভীর তত্ত্ব তারা কি করে পেতো?

যামিনী হাসিল।...

রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা। গল্প লেখা হয় নাই, হইবে না। যেজন্য লেখা, টাকা? আছে—সে-টাকা আজ এই পকেটে!

যামিনী রুটিন মানিয়া চলে; আহারাদি চুকাইয়া অফিসের একতাড়া কাগজ পাড়িয়া বসিল। আমার মনের সামনে আলো-করা এক বিচিত্র পুরীর ছবি জাগিতেছিল —উৎসবে-আনন্দে সে পুরী জলজল করিতেছে!

ডাকিলাম—যামিনী...

—কেন?

— চলো, বায়োস্কোপে যাই—নয় থিয়েটারে তোমাকে চাঙোয়ায় খাওয়াবো···

বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে যামিনী আমার পানে চাহিল।

আমি নোটের তাড়া দেখাইলাম,—কহিলাম—দেখচো, একশো টাকা! লেখা প'ড়ে এক ভক্ত পাঠিকা পাঠিয়েছেন—প্রণামী!

যামিনীর দুই চোখ বিস্ফারিত! সে কহিল—ঐ 'দিব্যদ্যুতি গ্রন্থ-প্রকাশ-সমিতি'র লোক দিয়ে গেল বুঝি?

—না, না! আমার স্বরে তীব্র ঝাঁজ! আনন্দের দারুণ মত্ততা! কহিলাম—এ ভক্ত পাঠিকার প্রণামী!

—প্রণামী।

—হ্যাঁ। আমার জন্য নয়! অনাদি চাটুয্যের জন্য। অনাদি চাটুয্যে। সে রাস্কেল স্ত্রীকে ত্যাগ ক'রে এক বিধবাকে নিয়ে অবৈধ প্রণয়ে মত্ত হয়ে আছে; আর তার সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর দুঃখ-অভাব ঘুচোবার জন্য এ-টাকা পাঠিয়ে দিয়েচে অর্থাৎ তার অসংযমে ইন্ধন!··· হায়রে, আমরা···? বাড়ীতে বিধবা মা···ছোট অসহায় ভাই-বোন! তাদের অন্ন দেবার চেষ্টায় পাগল হয়ে বেড়াচ্ছি! এ-টাকা অনাদি চাটুয্যেকে আমি দেবো না। কেন দেবো? সে তো কোনো দুঃখ জানায়নি! এই অনাদি চাটুয্যে কেমন লোক, জানি না। তবে তার স্ত্রী? দেবী! এই দেবীর প্রসাদ আমিই গ্রহণ করবো। আমার বিপন্ন সংসার—নায়িকাদের কথা শুধু কল্পনায় জাগে—জীবনে কোনো নায়িকার দেখা পেলুম না—পাবার নয়! শুধু এ-টাকা কটা কেন? অভাব হলে চন্দ্রকান্ত বাবুর কাছে যাবো। অন্যায়? কিসের অন্যায়? এই চন্দ্রকান্ত তার রাস্কেল জামাইয়ের অভাব না থাকলেও এত টাকা তাকে দিতে আসে, সে না চাইতে!···আর আমি? শুধু ঐ নিষ্ঠুর প্রকাশক আর কাগজওলাদের জুতোর ঠোক্কোর খাবো? তারা ঠকাচ্ছে—তা জেনেও অভাবে জর্জ্জরিত থাকবো? না···

যামিনী কহিল—কিন্তু···

—কিসের কিন্তু! কিন্তু নয়! তুমি এসো আমার সঙ্গে—চাঙোয়ায়। তার পর এম্পায়ারে। আমোদ করতে চাই আমি···জয়ের আনন্দ! না, কোনো কথা শুনবো না। এসো, এসো তুমি!

# পুরুষস্য ভাগ্যম্

বি, এ পাশ করিয়া বিরাজলাল পল্লীগ্রামের একটা স্কুলে মাষ্টারী করিতেছিল! ল' পড়িবার বাসনা ছিল না। আইনের পথ যে শতকরা নিরানব্বই জন বাঙালীর ছেলের ধ্রুব পথ, তা সে জানে; সেই সঙ্গে সে আরো জানে, ধ্রুব পথে ভবিষ্যৎ একান্ত অধ্রুব; কাজেই ধ্রুব পথে অধ্রুব ভবিষ্যতের সন্ধানে বাহির হওয়া সে সমীচীন বুঝিল না! সে কাজটা ঠিক adventureও নয়, rash ও negligent act হইবে!

এ্যাড্‌ভেঞ্চারের দিকে বিরাজলালের একটা ঝোঁক আছে ছেলেবেলা হইতে! যখন ছোট ছিল, পিশির কাছে পক্ষিরাজ ঘোড়ার গল্প, তালপত্রের খাঁড়ার গল্প, পাতালপুরীর রাজকন্যার গল্প শুনিয়াছে; তরুণ বয়সে কলিকাতার কলেজে পড়িতে দু-চারিখানা মাসিক পত্রে হাসের বিচিত্র গল্পও পড়িয়াছে। কাজেই···।

কিন্তু এগ্‌জামিনের তাড়া, দারিদ্র্য, আর মুরুব্বিহীন সংসারের ধান্দা—এমনি কারণে এ্যাডভেঞ্চারের সন্ধানে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রার সুযোগ কখনও ঘটে নাই।

আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নয়। এতদিন পড়ার আড়ালে থাকায় সে অস্বচ্ছলতা কোনো বিভীষিকা জাগাইতে পারে নাই। আজ বি, এ পাশ করিবার পর সে আড়াল ঘুচিলে বিরাজলাল স্পষ্ট দেখিল, সাম্‌নে জীবনের পথ সাহারা মরুর মত ধূ-ধূ করিতেছে! যতদূর লক্ষ্য হয়, ওয়েসিশের শ্যামল ছায়ার চিহ্নও নাই।

অথচ দাঁড়াইয়া থাকিলে চলে না। কাজেই মাষ্টারি লইতে হইল। কলেজে সেক্সপীয়র শেলী পড়িবার সময় জীবনের বহু ছবি মনে জাগিত। সে ছবি প্রেম-স্নেহ-আরাম-বিরামের বিচিত্র বর্ণে রঙীন্। আশ-পাশের দু-চারিটা খবরও নজরে পড়ে নাই, এমন নয়! কাজেই তার চিত্ত ঐ রঙের পিপাসায় ক্ষণে-ক্ষণে আকুল হইত!

আকুল হইলেও কুলের কোনো হদিশ পাইতেছিল না। বন্যা-রিলিফ, সেবা-মিশন, খাদি-বিক্রয় প্রভৃতি পুণ্য-ব্রত গ্রহণের কথাও মনে উদয় হইত। কিন্তু সে কাজে উত্তেজনা কৈ? তাছাড়া রঙীন ভবিষ্যতের পথ ওদিকে মোড় ফিরিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

মা বলিতেন—বি-এ পাশ করলি তো! এবার বিয়ে করে একটি টুক্‌টুকে বৌ আন্।

বিরাজ জবাব দিত,—নিজের চিন্তাতেই আকুল হয়ে আছি, এর উপর বৌ! অমন সাধ মনের কোণেও এনো না মা!

মা কহিলেন—কি যে তোর গোঁ, কিছু বুঝি না। সবাই বিয়ে করচে···

বিরাজ কহিল—বিয়ে করলে দুঃখ বাড়বে বৈ ছাড়বে না।

মা কহিলেন—আমাদের শাস্তরে বলে, বৌ লক্ষ্মী। বিয়ে করলে বৌয়ের পয়ে, দেখিস্ রে, তোর ভাগ্য ফিরবে।

বিরাজ কহিল—বৌ অপয় নিয়েও আসতে পারে। তোমরাই তো বলো,—বিশুমামার সব গেল তাঁর বৌয়ের পয় নেই বলে!

মা সে কথা কাণে না তুলিয়া কহিলেন—তোর যত সৃষ্টিছাড়া কথা! ভালো কথা তো কইতে শিখলি না। আমি মেয়ে দেখে ঠিক করেছিলুম। হেলুর এক শালী আছে। হেলুর শ্বশুর কোন্ আপিসে চাকরি করে···

বিরাজ কহিল—বিয়ে আমি করবো না, মা! একা বেশ আছি। আমার মনে বাসনা আছে, পৃথিবী ঘুরবো—চীন, জাপান, মায় উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু অবধি।· ঘুরে জগতে একটা কীর্ত্তি রাখবো·· যে-কীর্ত্তি কোনো বাঙালী কোনো দিন অর্জ্জন করতে পারে নি! রোজ-গার করে পয়সা আমি জমাতে চাই! সেই পয়সায় ভূ-প্রদক্ষিণ করবো!

মা কহিলেন—বড় ভালো কথা! বাড়ী-ঘর ছেড়ে টো-টো করে ঘোরা! শেষে সে-দেশ থেকে একটা ম্যাথ-রাণী কি ঝাড়ুদারণী বিয়ে করে ফিরে এসো আর কি!

হাসিয়া বিরাজ কহিল,—তুমি পাগল হয়েচো মা! বিয়ে আমি করবোই না! সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করে তুলবো বিয়ে করে, এমন নিরেট আমি নই!

সন্ধ্যায় লাইব্রেরীতে গিয়া নিত্যকার মত খবরের কাগজ টানিয়া বিরাজ চাকরি-খালির বিজ্ঞাপনের পাতায় চক্ষু বুলাইতে লাগিল। দেশের নানা খবর জানার পূর্ব্বে এই খবরেই তার বেশী অনুরাগ। কত বিজ্ঞাপন যে নিত্য পড়ে! বিজ্ঞাপনের ধাঁচ্ তার মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। ধারা এক!

——বি-এ পাশ শিক্ষক চাই। ওলকচুয়া হাই ইংলিশ স্কুল। বেতন মাসে বারো টাকা। টুইশন দু-একটি মিলিতে পারে।

——ল-এজেণ্ট চাই। বেতন মাসে পণেরো টাকা। দু'হাজার টাকা নগদ জামিন। রায় হরবল্লভ এষ্টেট্; দশাননপুর।

—পাঁচটি ছেলের জন্য প্রাইভেট টিউটর চাই। বেতন মাসে পাঁচ টাকা—এক বেলার আহার অমনি মিলিবে। শিক্ষকের শরীর বলিষ্ঠ হওয়া দরকার। নিত্য সকালে

বিকালে ছেলেদের শরীর-চর্চা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে হইবে। নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন—শ্রী পতিরাম বক্সী, উকিল, হাতীমারা, জেলা ফরিদপুর!—

বিরাজ ভাবিল, পাঁচ টাকায় টিউটর চায়! পড়ানো, তার উপর আবার শরীর-চর্চা! এক বেলা আহার! ওঃ, বাসন মাজিতে হইবে না?

ইচ্ছা হয়, মুষ্ট্যাঘাতে গার্জেন পতিরামের অবধি শরীর দুরমুস্ করিয়া দিয়া আসে। সঙ্গে সঙ্গে দেশের দুর্দশা ভাবিয়া তার বুক একেবারে অন্ধকারে ভরিয়া গেল। দেশের লোকের কাছে দেশের লোকের এই তো দাম! আর বিদেশী যদি সে কথা তোলে, পিত্ত অমনি জ্বলিয়া ওঠে! রাগে গর্-গর্ করিতে করিতে সে আর একখানা কাগজ উল্টাইল! এক অদ্ভুত বিজ্ঞাপন চোখে পড়িল। বিজ্ঞাপনটি ইংরাজি ভাষায়। অর্থ এই—একটি তীক্ষ্ণধী চতুর যুবার প্রয়োজন। হৃদয়-বৃত্তি-সমস্যার সমাধানে তৎপর সাহিত্য-রসিকের আবেদন শুধু গ্রাহ্য হইবে। বেতন যথোপযুক্ত দিতে রাজী। নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন। 'কথাশিল্পী' কেয়ার-অফ্ এডিটার 'খাণ্ডার।'

বিজ্ঞাপনটি বিরাজ পাঁচ সাতবার পড়িল। পড়িয়া আর যারা বসিয়া কাগজ পড়িতেছিল, তাদের পানে চাহিল। তারা তখন নোয়াখালির কোন্ পুলিশ-দারোগার গোরু চুরির বিবরণ লইয়া তর্কযুদ্ধে মাতিয়াছে: শাণিত বচন-শরে পরস্পরকে জর্জ্জরিত করিবার প্রয়াসে মরিয়া! চমৎকার সুযোগ! বিরাজ এ-সুযোগ উপেক্ষা করিল না; তাড়াতাড়ি বিজ্ঞাপনটুকু ছিঁড়িয়া পকেটস্থ করিয়া সরিয়া পড়িল।

সরিয়া সে আসিয়া বসিল নদীর ধারে। ও-পারে গাছপালার মাথায় নিবিড় অন্ধকার! কালো জলে ছল-ছল রাগিণী! বিরাজ বসিয়া ভাবিতেছিল, কি কাজ? কেরাণীগিরি? বোধ হয়, না। তাহাতে হৃদয়-বৃত্তির কি প্রয়োজন? তা ছাড়া ঐ সাহিত্য-রসিক বিশেষণ? নিশ্চয়, কোন কাগজের সাব-এডিটারী! নয়তো কোনো পাকা পাব্লিশার বিলাতী নভেলের তর্জ্জমার কাজে লোক চায়! বাড়ী ফিরিয়া কাগজ-কলম লইয়া 'খাণ্ডার' সম্পাদকের কেয়ারে কথাশিল্পীর নামে সে দরখাস্ত লিখিয়া ফেলিল। পরের দিন সে-দরখাস্ত ডাকে দিল।

এক সপ্তাহ পরে উত্তর আসিল!

মহাশয়, এই পত্র-সমেত যত শীঘ্র সম্ভব আমার সহিত ১৭নং ফুলতলা রোড বহুবাজারে দেখা করিবেন। সাক্ষাতে সকল বিষয়ের আলোচনা হইবে! আপনার গাড়ী-ভাড়া-বাবদ স্বতন্ত্র মণি-অর্ডার-যোগে পাঁচটি টাকা পাঠাইলাম। শ্রীজয়গোপাল হালদার!

আনন্দের আতিশয্যে বিরাজের চিত্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। জয়গোপাল! জয় গোপালই বটে! এই গোপালকে অবলম্বন করিয়াই জীবনের পথে জয়-যাত্রা সুরু হোক!...

বিরাজ ডাকিল—মা—

মা রান্নাঘরে ঝোল সাঁতলাইতেছিলেন, কহিলেন,—কেন রে?

বিরাজ কহিল,—আমি চান করতে চল্লুম। তোমার রান্না যা হয়েচে, চট্ করে তাই ধরে দাও। এই ট্রেণে এখনি আমায় কলকাতায় যেতে হবে।

মা বিরক্তি-ভরা স্বরে কহিলেন—তুই জ্বালাস্ নে, বাপু!...

বিরাজ শিশি হইতে হাতে তেল ঢালিয়া কহিল,—চাকরি, মা চাকরি! বুঝি, প্রভু জয়-গোপালজী দয়া করিলেন। দেরী নয়! এই দশটা বারোর ট্রেণেই যাবো।

ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া ন'টা বাজিল।...

কাঁধে গামছা ফেলিয়া বিরাজ চলিল পুকুরে স্নান করিতে।

## ২

বহুবাজার ১৭নং ফুলতলা রোড খুঁজিয়া পাইতে বিলম্ব ঘটিল না। চাঁপাতলার একটু দক্ষিণে একটা সরু গলি। রোড হইল কি করিয়া—তাহা লইয়া ঐতিহাসিকেরা রীতিমত গবেষণা করিতে পারেন। ১৭ নম্বরে মেশ মিলিল। সেখানে জয়গোপাল হালদারের সন্ধানও মিলিল।

দোতলার ঘরে একখানা রং-চটা চেয়ারে বসিয়া আছে। বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ বৎসর। সামনে ক্যাম্প-টেবিলের উপর এক তাড়া কাগজ। জয়গোপাল নিবিষ্ট মনে কি লিখিতেছিল। ঘরের একধারে একখানা তক্তাপোশ, তার ওপাশে একটা বেতের শেল্ফ্; শেল্ফে রাজ্যের পুরানো ম্যাগাজিন, আর বাঙলা মাসিকপত্র—একেবারে আণ্ডিল হইয়া আছে।

সবিনয়ে বিরাজলাল কহিল,—জয়গোপাল বাবু কোন্ ঘরে থাকেন?

কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া জয়গোপাল কহিল—আমার নাম জয়গোপাল।

বিরাজ খুশী-মনে কহিল—আমি শ্রীবিরাজলাল গঙ্গোপাধ্যায়। আপনি আসবার জন্য লিখেছিলেন...

জয়গোপাল কহিল,—ও...হ্যাঁ। বসুন ঐ তক্তাপোষে।

বিরাজ বসিল। জয়গোপাল তার পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া তাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ঘড়িওয়ালা যেমন করিয়া ঘড়ির কলকব্জা দেখে, তেমনি ভাবে।

বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিবার পর কহিল,—এখানকার পথ-ঘাট জানা আছে ?

বিরাজ কহিল,—বউবাজারের ?

জয়গোপাল কহিল—না। কলকাতার।

বিরাজ কহিল,—মোটামুটি রাস্তাগুলো জানি !

—লেকের দিকটা ?

—জানি। আমি বি, এ পাশ করেচি বঙ্গবাসী কলেজ থেকে। লেকের দিকে প্রায় বেড়াতে যেতুম। তখনো সব রাস্তা তৈরী হয়নি।

—গড়িয়া হাটের পথ জানা আছে ?

—গড়িয়া হাট জানি।

জয়গোপাল কিছুক্ষণ কি ভাবিল, পরে কহিল,—কাজ যা করতে হবে, তাতে বুদ্ধির দরকার। আর সে কাজ খুব গোপনীয়।

বিরাজ কহিল,—বুদ্ধির গর্ব্ব করা শোভন হবে না। তবে বলতে পারি, আমি নির্ব্বোধ নই। আর কথা গোপন রাখা ? যখন চাকরি করতে এসেচি, তখন ও আদেশ পালন করতেই হবে।

—বেশ। বলিয়া জয়গেপোল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল ; তার পর কহিল,—বাঙলা সাহিত্যের চর্চ্চা করেন ?

বিরাজ কহিল,—কিছু কিছু করি। মানে, পড়ি।

জয়গোপাল কহিল—প্রলয়কুমার হালদারের লেখা পড়েচেন ?

বিরাজ কহিল—আজ্ঞে, না। তবে তাঁর নাম শুনেচি। লেখা পড়া হয়নি। তার কারণ, বি-এতে স্যান্‌স্‌কৃট ছিল, তার ব্যাকরণ-সন্ধি সমাস নিয়ে বিব্রত ছিলুম। পাশ করে দেশেই আছি। সেখানে লাইব্রেরী আছে। তবে তাতে হালের লেখকদের বই পাওয়া যায় না। বাঙলা সাহিত্যে আমার অনুরাগ আছে।

বিরাজকে আর একবার লক্ষ্য করিয়া জয়গোপাল কহিল—আচ্ছা, বই দেবো। পড়ে নেবেন। মানে, আমিই লেখক প্রলয়কুমার। ছোট গল্প লিখি, উপন্যাস লিখি। তবে জয়গোপাল নামে লেখা ছাপ্‌লে পাঠক-পাঠিকার চিত্ত পাছে বিরূপ হয়, এই ভেবেই প্রলয়কুমার ছদ্ম-নামে ছাপাতে দিই।

কথাটা বলিতে বলিতে জয়গোপাল উঠিয়া এক তাড়া মাসিক-পত্র আনিয়া বিরাজের সামনে রাখিয়া কহিল—পড়ে দেখবেন। অর্থাৎ কাজ করুন। হাত-খরচের জন্য পঞ্চাশ টাকা পাবেন। তার পর কাজটি করে দিতে পারলে নগদ এক হাজার টাকা মিলবে। লেখাপড়া করাতে চান, ষ্ট্যাম্প-কাগজে ? তাও করাতে পারেন। উকিল-খরচ আমি দেবো।

বিরাজের বুকটা ধড়াশ করিয়া উঠিল। এই তো গলির মোড়ে জীর্ণ ঘর ! আর ঐ আসবাব ! একখানা তক্তাপোষ, একটা টেবিল, আর ঐ পুরোনো ম্যাগাজিনের বস্তা ! অথচ টাকার লম্বা বহর। ব্যাপার কি ? উইল জাল ? না, অমনি কোনো রকম গভীর ফন্দী আছে ? ধরা পড়ার ভয়ে তাকে দিয়া সারিতে চায় ?

জয়গোপাল কহিল, কাজটা কি, বলি। কিন্তু তার আগে ভালো কথা, চাকরি নিতে রাজী আছেন তো ?

বিরাজ কহিল—কাজটা কি, না শুনলে—

জয়গোপাল হাসিল, হাসিয়া কহিল,—ভয় নেই। জাল-জুচ্চুরি নয়। কাজ ভালো। তবে বুদ্ধি সাফ হওয়া চাই ! মায় বাঙলা সাহিত্যে একটু জ্ঞানও সেই সঙ্গে। আপনার যখন বি-এ-তে স্যান্‌স্‌কৃট ছিল, তখন সাহিত্য এক রকম চলে যাবে। আমার বই পড়লে up to-date হবেন। তবে কাজের কথার আগে কিছু খান। বেলা চারটে বেজেচে। বলিয়া সে হাঁকিল—সুখন—

সুখন ভৃত্য আসিল। জয়গোপাল কহিল,—এক পো লুচি, আধ-পো আলুর দম, আর চার আনার রসগোল্লা চট্ করে নিয়ে আয় দিকিনি। মাংস ? আপনি মাংস খান, নিশ্চয় ?...আচ্ছা, একটু কোর্ম্মাও অমনি আনবি। যা চট্ করে। যাবি আর আসবি।

সুখন চলিয়া গেল।

জয়গোপাল কহিল—হ্যাঁ, এবার কাজের কথা বলি। আমাদের একখানা মাসিক-পত্র আছে,—"চাঁদোয়া"। সেই কাগজে আমি লিখি গল্প আর উপন্যাস। সম্পাদক আমিই।

এই অবধি বলিয়া জয়গোপাল চুপ করিল। তার পর চকিতের জন্য একবার বাহিরের মুক্ত আকাশে দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া কহিল,—যা বলবো, খুব গোপনীয় কথা। কখনো প্রকাশ না হয় !

বিরাজের কৌতূহল জাগিয়াছিল অপরিসীম। সে কহিল—না, প্রকাশ হবে না।

জয়গোপাল কহিল—'চাঁদোয়া' কাগজে কবিতা লিখতেন এক মহিলা। তাঁর নাম শ্রীমতী নীলিমা দেবী। চমৎকার কবিতা। নিরাশ প্রাণের নিশ্বাসে ভরপুর। আর সব কবিতায় এক সুর।...তাঁর সঙ্গে আলাপ করবো বলে পত্রাঘাত করেছিলুম, তাঁর কবিতার স্তুতি-গান করে—অবশ্য বেনামীতে। কিন্তু কোনো জবাব পাইনি। সন্ধান নিয়ে জেনেচি, তিনি কুমারী, শিক্ষিতা এবং বয়সে তরুণী...

বিরাজের দুই চোখ বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। লভ্ ?

জয়গোপাল কহিল—আমার নিজের উপর বিশ্বাস আছে প্রচুর। সাহিত্যে আমার শক্তি সামান্য নয়। এ বিশ্বাসও রাখি, দ্বিতীয় বার যদি নোবেল প্রাইজ এদেশে কেউ আনতে পারে তো সে আমিই আনবো—এই লেখার মারফৎ। বাঙলার কথা-সাহিত্যে যদি কেউ জীবন

জাগিয়ে থাকে তো সে আমি, শ্রীমান্ প্রলয়কুমার। কথা-সাহিত্যের যজ্ঞশালায় আমার এক একটি রচনা বেরিয়ে ছোটে যেন অশ্বমেধের অশ্ব। কার সাধ্য, তাকে পরাজয় করে? তাই আমি অপরাজেয় কথা-শিল্পী…

উত্তেজনায় জয়গোপালের চোখে আগুনের হল্কা ফুটিয়া উঠিতেছিল। কথাশিল্পী, নীলিমা দেবী…এ দুয়ে যোগ কোথায়, বিরাজ তাই ভাবিতেছিল।

জয়গোপাল কহিল,—এ আমার কথা নয়। সুবিখ্যাত ক্রিটিক শ্রীযুক্ত ব্রীড়াময় বাবু ছাপার অক্ষরে লিখে দেছেন এ কথা! কিন্তু সে কথা যাক্—আমি এই কথাশিল্পে নীলিমা দেবীর চিত্ত জয় করতে চাই। তাঁর ঠিকানা দেবো। নিজের মুখে নিজেকে পুরুষ-সমাজে প্রচার করতে পারি, কিন্তু মহিলা-সমাজে?—ওঁদের মনের বাস্তব পরিচয় জানি না। তাই আপনাকে আমার সাহিত্য প্রচার করতে হবে। সমাজে নয়। নীলিমা দেবীর কাছে। উপায়ও আমি বলে দেবো…

বিরাজ জয়গোপালের পানে কুতূহলী দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

জয়গোপাল কহিল,—আমার লেখা তাঁকে শুনিয়ে-পড়িয়ে—যেমন করে হোক্, তাঁর চিত্তকে আমার প্রতি জাগ্রত উন্মুখ করে তুলতে হবে। তা হলে বিবাহে বাধা থাকবে না। এদেশে এখনো romanticism দেখা দেয়নি। নীলিমা দেবীর বাবা সারদা লাহিড়ী পয়সাওয়ালা জমিদার। ভারী একরোখা, কিন্তু কন্যাস্নেহে বিভোর। সম্প্রতি এই অহিংসা-মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েচেন—মেয়ের সঙ্গে। তাই বোধ হয় নীলিমা দেবীর কবিতা আর পাই না! কাজেই…

সুখন খাবার লইয়া আসিল। জয়গোপাল কহিল—খেয়ে নিন। খেতে খেতে শুনবেন…

তাই হইল। জয়গোপাল কহিল—বুদ্ধিমান যুবা চেয়েছিলুম। ঐ স্বদেশী মন্ত্রে আপনিও দীক্ষা নিন্—এবং ওঁদের সঙ্গে সঙ্গে সহকর্ম্মিতা-সূত্রে মিশে আমার রচনার প্রতি…বুঝেচেন? আপাততঃ হাত-খরচার জন্য পঞ্চাশ টাকা রাখুন। যদি আমাদের বিবাহ ঘটাতে পারেন, তা হলে হাজার টাকা পুরস্কার পাবেন।

বিরাজ দেখিল, মন্দ নয়! মজার চাকরি বটে! রোমান্স আছে, এ্যাডভেঞ্চারও যে নাই, এমন নয়! কিন্তু ডিটেকটিভ উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদের মত বিশ্রী রহস্যে ভরা। ধনী গৃহস্বামী খুন হইয়া পড়িয়া আছে—কোথাও এমন কিছু কাগজ-পত্র বা প্রমাণের চিহ্ন নাই, যা ধরিয়া সমস্যার সমাধান হয়!

পরক্ষণে মনে হইল, তবু সে উপন্যাসও পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদের জের টানিয়া ঘনীভূত রহস্যের অন্ধকার ভেদ করিয়া বিরাট কলেবরে ফুলিয়া ফাঁপিয়া অতিকায় হইয়া ওঠে তো! এবং শেষের পরিচ্ছেদে ঘারের পাশে হত্যাকারী ধরা পড়িয়া যায়! এও তেমনি…

জয়গোপাল কহিল,—বড়বাজারে পিকেটিংয়ের ব্যাপারে সেদিন অনেকগুলি মেয়ে ধরা পড়েন, তাঁদের মধ্যে নীলিমা দেবীও ছিলেন। শুনে আমি কোর্টে গেছলুম; কিন্তু তাঁকে দেখতে পেলুম না। পুলিশ বললে, তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েচে সেই মাণিকতলার ওধারে এক মাঠের ধারে!…

বিরাজ জয়গোপালের পানে চাহিয়া রহিল, কোনো কথা বলিল না।

জয়গোপাল কহিল,—আজই মাথা খাটিয়ে উপায় করে ফেলবো। আপাততঃ আমার বইগুলো পড়ে দেখুন।

৩

নীলিমা দেবীর ঠিকানা লইয়া পরের দিন সকালে বিরাজ তাঁর বাড়ী দেখিয়া আসিল। প্রকাণ্ড বাড়ী…পুরোনো; সামনে একটু বাগান। দোতলায় তরুণী-কণ্ঠে গান চলিয়াছে,—

ভোরের পাখী জেগে কহে
আজ কি আশার বাণী!
ওই বাণীর সুরে ভরে নে তোর
জীর্ণ পরাণখানি!

খাশা গলা! কে গাহিতেছে? নীলিমা দেবী? কে জানে!…

বিরাজ ভাবিল, প্রলয়ের এ কি বিচিত্র প্রণয়-সাধনা! কাব্যে কি উপন্যাসেও এমন দেখা যায় না। উপন্যাসের প্লটের অস্ত্রে নারীর চিত্ত জয় করিবে! এমন কথা তার কল্পনার অগোচর ছিল! তবে রাত্রে জয়গোপালের লেখা 'প্রণয়-টীকা' গল্পে এমনি অদ্ভুত কাণ্ড একটা পড়িয়াছে বটে! কিন্তু সে গল্প। আর এ…

ফুলতলা রোডের মেশে ফিরিয়া রিপোর্ট সারিবার পর বিরাজ কহিল,—এ আমি ঠিক বুঝতে পারচি না। তার চেয়ে আপনি ঘটক পাঠিয়ে প্রস্তাব করুন না!

জয়গোপাল কহিল,—ঘটক পাঠিয়েছিলুম। মেয়ে বিবাহ করতে চায় না। বলে, দেশে স্বরাজ আসার পূর্ব্বে ছোট সুখ, ছোট বিলাস-আরামের চিন্তাও সে মনে স্থান দেবে না। তা ছাড়া বাপ পয়সাওয়ালা—হয়তো ব্যাঙ্কার পাত্র খোঁজে! কিন্তু পয়সার চেয়েও বড়-ধনে ধনী আমি, তা বোঝে না!

বিরাজের চোখের সম্মুখ হইতে চরাচর বিলুপ্ত হইয়া গেল। ঐ পাশের বাড়ীর ছাদ, গলির ওধারকার ফুলুরির দোকান,—সব!…মস্ত একখান সাদা কাগজে সারা ছানিয়া যেন কে মুড়িয়া দিল। সেই মোড়কের উপর বড় লাল হরফে শুধু লেখা আছে,—স্বরাজ!

জয়গোপালের কথায় তার চেতনা ফিরিল। জয়গোপাল কহিল,—নীলিমা দেবীর কবিতা দেখবেন?

একখানা পুরানো 'চাঁদোয়া' খুলিয়া জয়গোপাল কহিল,—পড়ুন…

বিরাজ পড়িল,—আমার মনের আঙিনাতে, পূর্ণিমারি চমক্-পাতে আসতে বলি…

জয়গোপাল কহিল,—ছুটো গল্প 'চাঁদোয়ার' ছেপেচি। ছুটোতেই নায়িকার নাম দিয়েচি নীলিমা। সে-গল্পে ওই কবিতার ছত্রও বেমালুম পূরে দিয়েচি!

বিরাজের কাছে এ যেন কলম্বাসের আমেরিকা-আবিষ্কার! গল্প-উপন্যাস সে পড়ে—নিছক তার রস-উপভোগের জন্য। কিন্তু তা বলিয়া এত বড় উদ্দেশ্য থাকে গল্পের পিছনে? তার কেমন তাক্ লাগিয়া ছিল!

বিরাজ কহিল,—কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারচি না, ছুম্ করে আপনার তারিফ কি-ভাবে সুরু করি! গিয়ে নাহয় সামনে দাঁড়ালুম! আলাপও নাহয় কোনোমতে হলো…

জয়গোপাল কহিল,—সেইটি ভেবে স্থির করতে হবে। অর্থাৎ এমন একটা situation…যে, আমার গল্প ছাড়া আর কোনো বিষয়ে কথা উঠতে পারে না!

বিরাজ ভাবিল, বই লইয়াই নীলিমার কাছে উপস্থিত হইবে! বলিবে,এই প্রলয়কুমারের লেখার ভারী পশার আজকাল! এ কথা বলিয়া বই গছাইয়া দিবে!… কিন্তু তার পর? কোন্ কথার ছলে আবার গিয়া ও-বাড়ীতে ঢুকিবে, সেই না মুস্কিল! বিশেষ এ-যুগে… সাহিত্যে প্রেম যখন অচল হইতে বসিয়াছে।

বৈকালে বিরাজ আবার গমনোদ্যত হইল। জয়গোপাল কহিল,—চললেন?

—হ্যাঁ। একটা প্ল্যান স্থির করেচি।

—কি প্ল্যান?

—ঐ মাসিকে গল্প পড়ছিলুম। বাসের ভাড়া ভোলা। তেমনি। ওঁদের বাড়ী গিয়ে বল্বো, বাসের ভাড়া নেই। পকেট কেটে চোরে ব্যাগ নিয়ে গেছে। আনা-চারেক চাই। ধার! আবার তা শোধ দিতে যাবো! বিরাজের ছুই চোখ দীপ্ত হইয়া উঠিল!

জয়গোপাল কহিল,—মন্দ হবে না। কিন্তু অভিনয়ে খুঁত না থাকে…

বিরাজ কহিল,—পকেটটা ছিঁড়ে তবে যাবো। ছেঁড়া পকেট দেখলে…

জয়গোপাল কহিল,—চেষ্টা করে দেখুন। কিন্তু তার চেয়ে…অাচ্ছা, আমিও ভেবে দেখি!…

বিরাজ বাহিরে গেল।

একদালিয়া রোডে সেই বাড়ী। সন্ধ্যার অন্ধকারে ভূতের মত দাঁড়াইয়া আছে। বাড়ীর কোনো ঘরে আলো নাই। ব্যাপার কি? সব জেলে গেল না কি! বিরাজের গা কাঁপিল।

কেহ নাই? বিরাজ দাঁড়াইল। হাতে জয়গোপালের লেখা একগাদা বই। দৃষ্টি কিন্তু বাড়ীর পানে।…

বহুক্ষণ এমনি-ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। মন অধীর হয়, দেরী কিসের? পা কিন্তু সরিতে চায় না। বুকও কাঁপিয়া ওঠে!

হঠাৎ পিছনে ভোঁ-ও! মোটরের হর্ণ। বিরাজ চমকিয়া লাফাইয়া উঠিল, কিন্তু রক্ষা পাইল না; মাড্-গার্ডের ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া গেল।…সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর মধ্যে একটা আর্ত্ত রব,—রোখো, রোখো…

ছুনিয়া আঁধারে ভরিয়া গেল। বিরাজ চক্ষু মুদিল। নিবিড়-কালো অন্ধকার। তার পর যখন আবার চোখ চাহিল, তখন দেখে, ঘরের মধ্যে কোমল শয্যায় শুইয়া আছে। সামনে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। ভদ্রলোকটি কহিলেন,—এই যে, চোখ চেয়েছে। ডাক্তার এলো, নীল?

মৃদু মধুর স্বরে বীণা বাজিল—না বাবা।

বিরাজ উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল।

প্রৌঢ় বলিলেন,—উঠো না। শুয়ে থাকো।

বিরাজ আবার চক্ষু মুদিল। কেমন আরাম বোধ হইতেছিল! স্বপ্ন? বুঝি, তাই!

ডাক্তার আসিলেন; হাত-পা নাড়িয়া মুচড়াইয়া মহাধূম বাধাইয়া দিলেন। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হইল; সঙ্গে সঙ্গে আদেশ,—নড়া হবে না।…

সকলে ডাক্তারের সঙ্গে বাহিরে গেলেন। বিরাজ আবার একা। ভাবিল, স্বপ্ন দেখাই চলিয়াছে! কিন্তু মধুর স্বপ্ন! চোখ চাহিতে ইচ্ছা হয় না! চক্ষু মুদিয়া মনকে কল্পনার পাখায় চড়াইয়া দিল! এমনি ভাসিয়া চলা…ভারী আরামের! সারাজীবন যদি…আঃ!

আবার সেই বীণার সুর কানের পাশে,—একটু ছুধ খান্।

বিরাজ চোখ চাহিল। সাম্‌নে দেবী-মূর্ত্তি। দেবী তরুণী, পরণে খদ্দর, ফিরোজা রঙের শাড়ী, ফুলদার… গায়ে সেই-রঙের ব্লাউশ।

বিরাজ কহিল,—দিন।…

ছুধ নয়, স্বর্গের সুধা! নহিলে শরীরের সব গ্লানি নিমেষে এমন অদৃশ্য হয়!

দেবী বলিলেন,—এমন ভয় হয়েছিল! উঃ! ডাক্তারবাবু বললেন, চোট্ খুব সামান্য। শুনে তবে নিশ্বাস ফেলে বাঁচি। নতুন ড্রাইভারটা যেন অন্ধ!

বিরাজের বুক ছাঁৎ করিয়া উঠিল। চোট সামান্য!

তবে এখনি বিদায় লইতে হইবে !···আবার সেই নোংরা আব হাওয়ায় ? এ বেশ লাগিতেছিল।

তরুণী কহিল—আমাদের গাড়ীর আলোটাও খারাপ হয়েছিল। আর ফটকের ধারে বড় বটগাছ থাকায় গ্যাসের আলো আসে না তো ! মোদ্দা, কি করছিলেন আপনি অন্ধকারে ফটকে দাঁড়িয়ে ?

বিরাজ ফ্যাল্‌-ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। এই উচ্ছ্বসিত রূপের সামনে মনিব জয়গোপালের রচনার কথা তুলিতে লজ্জা হইতেছিল। ভারী তো লেখা !

বিরাজ কোনো কথা কহিল না।

তরুণী কহিল—শুয়ে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন। ভালো কথা, আপনার বাড়ীর ঠিকানা ? একটা খপর দি···তাঁরা কত ভাবচেন। আপনার আজ ফেরা হতে পারে না···

বিরাজ একটা নিশ্বাস ফেলিল—নিরুপায়ের বেদনার্ত্ত নিশ্বাস ! যাইতে কি সে-ই চায় ! কিন্তু—

বিরাজ কহিল,—এখানে আমার কেউ নেই। খপর কাকে দেবেন !

কথাটা বলিয়া বিরাজ তরুণীর পানে চাহিল। তরুণী তার পানে চাহিয়াছিল—রাজ্যের করুণা-মাখানো দৃষ্টি ! সে দৃষ্টির স্পর্শে বিরাজ একেবারে গলিয়া গেল।

প্রৌঢ় আসিলেন, কহিলেন—গায়ে খুব বেদনা ? ও মা নীল, তুমি এক ডোজ আর্ণিকা দাও। হোমিওপ্যাথি ওষুধের শক্তি অসাধারণ।

তরুণী হাসিল, কহিল,—এই ব্যথায় এক ফোঁটা আর্ণিকা কি করবে, বাবা ?

প্রৌঢ় কহিলেন,—তুই জানিস্ না মা ওষুধের গুণ। ঐ এক ফোঁটায় বিশল্যকরণীর ফল পাওয়া যাবে।

বিরাজ কহিল—না। আমি যেতে পারবো।

দুই চোখ কপালে তুলিয়া প্রৌঢ় কহিলেন—পাগল ! দু-চার দিন নড়া হবে না বাপু।

## ৪

সকালের হাওয়ায় হাসির বান ডাকিয়াছিল। বিরাজের ঘরেই তরুণী বসিয়া ছিলেন।

বিরাজ কহিল—আপনার নামই নীলিমা দেবী ? আপনার কবিতা চাঁদোয়ায় ছাপা হয় ?

তরুণী তাচ্ছল্যের ভাবে কহিল,—রাবিশ। কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েচি। দেশের এই দুর্দ্দিনে ও-সব মিথ্যা হা-হুতাশ কবিতার ছন্দে বাঁধা পাগলামি !

বিরাজ কহিল—কবিত্ব পাগলামি নয়।

নীলিমা কহিল—তা নয় ! কিন্তু আমরা কাগজে যা ছাপি, তা পাগলামি। শুধু চাঁদ, তারা, ফুল, পাখী, চিত্ত-গগন, মন-বন···এ-সব ছাড়া দুনিয়ায় আসল বস্তু আছে—যা জানা উচিত। মানুষের মনকে রূপ-যৌবনের পূজায় সঁপে দিলে মনকে দুর্ব্বল করা হয় ! মনকে গড়া দরকার। দেশ দরিদ্র,—আর্ত্ত, আতুরদের সেবায় মনকে মহীয়ান্ করতে হবে।

কথা শুনিয়া বিরাজের তাক্ লাগিয়া গেল ! তরুণীর মন যেন স্বদেশীর অগ্নিতে প্রোজ্জ্বল যজ্ঞশালা !

তবু নিমকের কথা মনে জাগিতে ছিল। মনিব জয়গোপালের নিমক ! কি ফাঁকে সে কথা তোলা যায় ?

কথায় কথায় নীলিমা কহিল,—আপনার সঙ্গে একটা বইয়ের প্যাকেট ছিল না ? আপনার অনুমতি না নিয়ে প্যাকেট খুলে আমি বইগুলো দেখেচি। প্রলয় হালদারের লেখা—ঐ চাঁদোয়ার সম্পাদক !

আশার আলোয় বিরাজের মন ঝলমল করিয়া উঠিল।

তরুণী কহিল—স্বভাব মানুষ ছাড়তে পারে না ! তাই পড়েচি। ওঁর লেখা ভালো লাগে না। নারীকে শুধু আয়ত্ত করার কথা···যেন নারী পথের ধূলায় পড়ে আছে ! পুরুষের বক্ষ ছাড়া তার যেন আর কোথাও আশ্রয় নেই ! ছি ! নারীকে এ-ভাবে অপমান করবার কল্পনা যারা করে,আমি তাদের অভদ্র, ইতর মনে করি ! তাদের সঙ্গ বর্জ্জন করা উচিত।

বিরাজের বুক ধ্বক্ করিয়া উঠিল। মনিবের লেখা পড়িয়া সে কেমন হতভম্ব হইয়া ছিল ! যত নায়িকা—পথে, ঘাটে নায়ক দেখিবামাত্র একেবারে পায়ের উপর লুটাইতে চায়। বাস্তবের সঙ্গে মিল কোথায় ? এমন ব্যাপার জীবনে সে কখনো দেখে নাই ! মেশে সে-ও থাকিত···পাশের বাড়ীর মহিলারা গানও গাহিত। সে-গান সে শুনিয়াছে—কিন্তু ঐ গল্পের মত মেশের পানে মহিলা চাহিয়া থাকে, চোখে অধীর তৃষা বা গানের সুরে প্রাণের সাধ ভাসাইয়া দেওয়া—এ সব বাজে।

নীলিমার মুখে এ-কথা শুনিয়া তার সে ভাবগুলা আবার শক্তি পাইয়া কোমর বাঁধিয়া রুখিয়া দাঁড়াইতেছিল।

বিরাজ কহিল,—গল্প লেখা চাই। অথচ কি নিয়ে সব লেখে, বলুন ?

নীলিমা কহিল,—প্লটের ভাবনা কি ! বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পড়ে আছে। মায়া-মমতা, স্নেহ-প্রীতি···নারীকে মানুষ বলে, বন্ধু বলে লেখা যায় না ? প্রিয়া ছাড়া সংসারে মা-বোন-মেয়েও তো আছে।

তর্কের স্রোতে বিরাজ ভাসিয়া চলিল। মাথা তুলিবার তার সামর্থ্য রহিল না। অপরিচিতা তরুণীর সঙ্গে জীবনে সে কখনো মেশে নাই—বিশেষ এ-তরুণী আবার বুদ্ধির স্ফুলিঙ্গ ! তা ছাড়া সাহিত্য লইয়া আলোচনার অবসর তার এমন করিয়া কোনো দিন মেলে নাই।

নীলিমা কি ভাবিল, তার পর কহিল—ছুটোছুটি করচি বটে, কিন্তু একটা কথা থেকে থেকে মনে জাগচে।

—কি ?

নীলিমা কহিল,—দেশের সব দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার হয়েচে। যারা অন্ন-বস্ত্রের অভাব ঘুচোবার জন্য যুদ্ধ করচে, তাদের কাছে আশা রাখি না। ঐ যুদ্ধে তারা এমন ডুবে আছে যে, দেশ বলে কোনো পদার্থ আছে, এ বোধ তাদের নেই, সে খেয়ালও নেই। কিন্তু যারা ধনী, অর্থাৎ যাদের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান আছে, কিম্বা যাদের মাথায় সংসার পাহাড়ের বোঝা তুলে ধরেনি, তাদের কথা বলচি।

বিরাজ নীলিমার পানে চাহিল। কি কথা ?

—অশিক্ষা আর কুশিক্ষা—এ দুটো দূর করা চাই। এ কাজের ভার নিন ধনী আর সংসার-নির্লিপ্তের দল। আরাম-বিলাসে কতুর হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। মনকে এই সব বিষয়ে সচেতন করে তোলা চাই। এ কাজগুলোর ভার যদি আমরা হাতে নিতে পারি…বাবা এ আইডিয়ায় একেবারে মেতে উঠেচেন! বলেন,—ঠিক বলেচিস্ মা। এ কাজগুলো আমরা হাতে নি। মানুষের মনকে তৈরী করা যাক। মন যদি একবার তৈরী হয়ে ওঠে, তা হলে সব কর্ত্তব্য সকলে স্থির করে ফেলবে। বাদানুবাদ বা বক্তৃতার দরকার থাকবে না।…

পরের দিন সকালে বিরাজ কহিল,—আমি বাড়ী যাবো। আপনাদের দয়া জীবনে ভুলবো না।

নীলিমা কহিল,—গরু মেরে জুতো দান বলে' কথা আছে না ? মোটরের ধাক্কায় আপনাকে জখম করে, এই সেবা বা আশ্রয়—এও তেমনি নয় কি ? নীলিমা হাসিল।

সে হাসি নয়, বিদ্যুৎ! বিরাজ সে-বিদ্যুতের শিখায় কাঁপিয়া উঠিল।

বিরাজ কহিল,—তা নয়। ভাগ্যে ধাক্কা খেয়েছিলুম! মনকে তাই মস্ত শিক্ষা দেবার সুযোগ পেয়েচি। সে শিক্ষার দাম মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝচি।

নীলিমা কহিল,—আপনার সে বইগুলো ?

বিরাজ কহিল,—হ্যাঁ, কাজটা শেষ করা চাই…

নীলিমা কহিল—ওগুলো আপনার খুব প্রিয় সামগ্রী …না ?

বিরাজ থমকিয়া দাঁড়াইল, পরে কহিল,—তা নয়। চাকরি নিয়েচি কি না! প্রলয়কুমারের লেখা প্রচার করবো বলে। কি করি ? পেটের দায়! অবস্থার উন্নতি কে না করতে চায়, বলুন ?

নীলিমা কহিল,—আর কোনো কাজ পেলেন না ?

বিরাজ কোনো কথা বলিল না।

নীলিমা কহিল,—আপনার অবস্থা স্বচ্ছল নয় ?

স্বরে করুণার আভাস! বিরাজের চিত্ত টলিল; কিন্তু কিছু বলিতে পারিল না। দারিদ্র্যে এই যে কি লজ্জা…!

এ নীরবতার অর্থ নীলিমা বুঝিল। সে কহিল—বলুন না আপনার পরিচয়। তাতে লজ্জা কি! মনের দারিদ্র্যই লজ্জার বিষয়। অর্থ-দারিদ্র্যে লজ্জা থাকতে পারে না। সামর্থ্যই তো স্বচ্ছলতার একমাত্র মাপকাঠি নয়। Tact…না হয় accidena—অর্থ স্বচ্ছলতার এই দুটোই মূল হেতু বলে আমি মনে করি।

বিরাজ কহিল,—আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার!

সে একটা নিশ্বাস ফেলিল!

নীলিমা কহিল—দেশেরও তাই। অন্ধকার-দেশের মানুষের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হতে পারে না।

কথায় হেঁয়ালি! বিরাজ ঠিক মর্ম্ম বুঝিল না; মুখ নত করিল।

নীলিমা কহিল—লজ্জার কথা নয়। আপনি অভাব অস্বচ্ছলতা ঘুচোবার জন্য পরের দ্বারে করুণাপ্রার্থী না হয়ে বই ফিরি করে বেড়াচ্ছেন, এতে আপনার মনুষ্যত্বেরই পরিচয় পাই। বেশ, ও-বই আমি কিনবো …কত দাম বলুন ?

বিরাজ কুণ্ঠা বোধ করিল, কহিল—বিক্রী ঠিক নয়। তবে…

নীলিমার দৃষ্টিতে যেন একরাশ শাণিত তীর…বুঝি, সেগুলা বিরাজের অন্তর বিদ্ধ করিবে!

বিরাজ কহিল—একজনের চাকরি নিয়েচি—এই প্রলয়কুমারের লেখা প্রচার…

বিরাজ চাকরির সর্ত্ত বলিয়া ফেলিল। তবে একটু ঘুরাইয়া বলিল। স্পষ্ট ভাষায় বলিতে পারিল না যে, এই নীলিমার চিত্তকে জয়গোপালের দিকে বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্যই তার সাধনা! কি করিবে? নহিলে অর্থ মিলিবে না। এই অর্থে দারিদ্র্য ঘুচিবে, ভূ-পর্য্যটনের ব্যয়ও সংগ্রহ হইবে! শুধু অর্থের প্রেরণা নয়, এ্যাডভেঞ্চারের সখ আছে, এ-কথা সে প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিল না।

মানুষ তা পারে না। বিশেষ বয়স যদি তরুণ এবং শ্রোতা যদি হয় তরুণী রূপসী!

নীলিমা হাসিল, হাসিয়া কহিল—এ কি পণ্ডশ্রম করচেন! সাহিত্য ছেলেখেলার বস্তু নয়। পাঠক-পাঠিকাও শিশু নয়…

বিরাজ অপ্রতিভভাবে কহিল—আমি তাহলে আসি।

নীলিমা কহিল,—ও চাকরি ছেড়ে দিন। ওতে মনের ঐশ্বর্য্য বাড়ে না। পরের মন জোগাবার চেষ্টা—এ বিশ্রী! যাক্,—দয়া করে বইগুলি আমায় দিন। দাম এনে দি!

৫

গভীর রাত্রি। বিরাজের চোখে ঘুমের দেখা নাই। একরাশ চিন্তা ক্ষিপ্ত সৈন্যের মত মস্তিষ্ক-ক্ষেত্র চষিয়া কুচ-কাওয়াজ সুরু করিয়া দিয়াছে, ভীষণ বিক্রমে।

একটা কথা উঁচু মাথায় সবার উর্দ্ধে উঠিয়াছিল—সে এই নীলিমা দেবীর কথা! ইনি দেবী! জয়গোপালের মত একটা আত্মসর্ব্বস্ব লোকের হাতে চিত্ত সমর্পণ করিবেন! এ চিন্তা কাঁটার মত বুকে বিঁধিতেছিল!

ও-লেখা পড়িয়া সত্যই যদি নীলিমা দেবীর চিত্ত বিচলিত হয়? বইগুলা সরানো চাই…পড়িতে দেওয়া ঠিক নয়! কিন্তু কি বলিয়া চাহিবে? সত্য কথা বলিবে?

না। তাহা হইলে লজ্জার কালিতে ডুবিয়া মিস্ কালো হইয়া যাইবে! সে কালি হইতে নিজেকে কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিবে না।

নিঃশব্দে ফেরত লওয়া যায় না?…চাকরি? নিমক? জয়গোপালের চাকরি না হয় করিবে না। তার দেওয়া টাকা কয়টা ফেরৎ দিবে। পয়সা-রোজগারের ক্ষেত্র বিশাল। না হয় মাথায় মোট বহিয়া খাইবে। তা বলিয়া এমন নির্লজ্জভাবে…

ঘড়িতে দুটা বাজিল। তার মাথার মধ্যে আগুনের স্রোত বহিতেছিল! বিরাজ বুঝি জ্বলিয়া খাক্ হয়!

দোতলার ঘরে বইগুলা আছে…সেই টেবিলের উপর রাখিয়াছিলেন। সেগুলা লইয়া এই রাত্রির অন্ধকারে নিঃশব্দে সরিয়া পড়া! মাথায় রক্ত চন্-চন্ করিয়া উঠিল! টেবিলের উপর হইতে কাগজ লইয়া সে লিখিল,—

দেবী, ক্ষমা করিবেন। বই ফেরত লইয়া চলিলাম। দাম রাখিয়া গেলাম। বারো টাকা ছ'আনা। কাগজে মোড়া রহিল।

আমি অমানুষ। যদি কখনো মানুষ হইতে পারি তো শ্রীচরণে এ কালিমা-কাহিনী নিবেদন করিব। কর্ম্মক্ষেত্রের সন্ধান পাইয়াছি। মোট বহিব। দারিদ্র্যে লজ্জা নাই—বুঝিয়াছি।

অনুগত
শ্রীবিরাজলাল

চিঠিখানা সে পড়িল। পড়িয়া বাহিরের দিকে চাহিল। চারিদিকে সুগভীর স্তব্ধতা। কানন-তরুপুঞ্জে ঝিল্লীর রাগিণী…সে রাগিণীতে কি মোহ!

বিরাজ উঠিল এবং সন্তর্পিত ধীর পায়ে দোতলায় আসিল। চারিদিক অন্ধকারে ভরা, নীলিমার দুটি চোখ শুধু এ-অন্ধকারে বাতি জ্বালিয়া ধরিয়াছে! সেই বাতির আলোয় তার প্রাণ আলো হইয়া আছে! আলো জ্বালিবার দরকার নাই!

সেই বসিবার ঘর। ওধারে টেবিলের উপর বই আছে। আলো? না, জ্বালিবে না।…

টেবিলটার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সে চলিল…এই টেবিল, এই বই! হাতড়াইয়া বই লইল। কাগজে মোড়া বারো টাকা ছ'আনা দাম টেবিলের উপর রাখিল। তার পর বইয়ের গোছা লইয়া ফিরিল। এবার আরো সাবধান! হাতে জিনিষ রহিয়াছে…হয়তো চুরি!

একটা প্রকাণ্ড ধাক্কা। সেই গ্রামোফোনের টেবিল, নিশ্চয়। ওঃ! পায়ে চোট লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামো-ফোনটা গিয়া পড়িল মেঝের উপর…কি শব্দ! যেন দুনিয়া ফাটিয়া গেল! সঙ্গে সঙ্গে কলরব জাগিল,—কে? কে? …রামদীন…গঙ্গাসিং…জল্দি আও…

রাত্রির নিবিড় অন্ধকার যেন অট্টহাস্যে জাগিয়া উঠিল। পৃথিবী দুলিয়া কোথায় সরিয়া গেল! বিরাজ বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া।…বাহিরে ঐ আলো, চীৎকার। চীৎকার এই দিকেই আগাইয়া আসে! বিরাজ চেতনা পাইয়া বইয়ের বড় আলমারির পিছনে লুকাইল।… পরক্ষণে ঘরে লোকজনের প্রবেশ; এবং কোলাহল-কলরব প্রভৃতি।

নীলিমা কহিল,—ঐ যে কাপড় দেখা যাচ্ছে! ঐ আলমারির পিছনে…

সারদা লাহিড়ী হাঁকিলেন,—রামদীন্…

প্রচণ্ড মূর্ত্তি একেবারে বিরাজের চোখের সামনে! কি বিভীষিকা! ভয়ে বিরাজ চক্ষু মুদিল। কিন্তু একটা ঝড়ের বেগ সবলে তাকে টানিয়া আনিল…চেয়ারে ধাক্কা খাইয়া সে ভূতলশায়ী হইল। বিরাজ আবার চক্ষু মুদিল।

নীলিমা কহিল—আপনি…!

সারদা লাহিড়ী কহিলেন—বিরাজ! এর মানে?

ছল-ছল দৃষ্টিতে বিরাজ তাঁদের পানে চাহিল। মুখে স্বর ফুটিল না। চোখে শুধু করুণ কাতর দৃষ্টি!

নীলিমা নারী…তরুণী! সে দৃষ্টির ভাষা নীলিমা বুঝিল। তার বুকে মমতার নির্ঝর বহিল।

অগ্নিমন্ত্রে পুড়িয়া বুক তার ছাই হয় নাই!

রামদীন্ কহিল—পুলিশ বোলায়েঙ্গে, দিদিমণি?

নীলিমা কঠিন স্বরে কহিল,—না! তোমা যা…

ভৃত্যের দল বিদায় লইল। লাহিড়ীর কেমন দ্বিধাভরা দৃষ্টি…রাজ্যের প্রশ্ন সে দৃষ্টিতে জল্‌জল্ করিতেছে!

নীলিমা তা লক্ষ্য করিল। লক্ষ্য করিয়া বিরাজের পানে চাহিল, তার হাত ধরিয়া কহিল,—উঠুন…

মন্ত্রচালিতের মত বিরাজ উঠিল। নীলিমা কহিল—কৌচে বসুন। কি হয়েছিল, বলুন আমায়…

বিরাজ কাঁদিয়া ফেলিল, কাঁদিয়া কহিল—আমি চোর। আমায় পুলিশের হাতে দিন···

নীলিমা স্থির দৃষ্টিতে চকিতের জন্য চাহিল, তার পর কহিল,—কি হয়েচে, বলুন—শুনি।···তার পর···

কম্পিত স্খলিত স্বরে বিরাজ ব্যাপারখানা খুলিয়া বলিল, কহিল,—ঐ টাকা কটা·· আর এই সে বইগুলো···

লাহিড়ীর দৃষ্টি তখনো পলকহীন!

নীলিমা কহিল—বই ফেরত নিন, তাতে দুঃখ নেই। কিন্তু এ কষ্ট কেন করলেন? অসুখ শরীর, এখনো সুস্থ হন্‌নি···

বিরাজ ভাবিল, এই দেবীর সহিত ছলনা করিতে আসিয়াছিলাম তুচ্ছ দুটা পয়সার লোভে···!

বিরাজ কহিল—চিঠিতে সব কথা লিখেছি···

নীলিমা চিঠিখানা হাতে লইয়া পড়িল, পড়িয়া বিরাজের পানে চাহিল, কহিল—ওঃ! আচ্ছা, কথা দিন্, আমার অনুমতি ছাড়া যাবেন না···

বিরাজ মাথা তুলিয়া চাহিল। নীলিমার চোখে সেই দীপ্তি! সে দীপ্তিতে তার অন্তরখানা দেখা যায় না?

বিরাজ কহিল—আপনার অনুমতি ছাড়া যাবো না।

লাহিড়ীকে নীলিমা কহিল,—তোমায় সব কথা বলচি।

লাহিড়ী কহিলেন—আমি অবাক হয়ে গেছি।

নীলিমা কহিল—বিরাজ বাবুর মন বড় উঁচু। কিন্তু গরীব—ভবিষ্যৎ রচনা করতে চান—পথ নির্দ্দেশ করতে পাচ্ছেন না···

লাহিড়ী অবাক্! নীলিমা কহিল—আপনি শুনে যান। কথা দিয়েচেন, আমার অনুমতি না পেলে যাবেন না! সে কথা রক্ষা করবেন।

ঘাড় নাড়িয়া বিরাজ জানাইল, তাহাই হইবে।

সকালে বিরাজ গুম্ হইয়া বসিয়াছিল বিছানার উপর। বাদাম-গাছের ডালে বসিয়া একটা পাখী ডাকিতেছিল। ঘরের বাহিরে যাইতে পা ওঠে না! ভৃত্যগুলা হয়তো সত্যই ভাবিয়াছে, সে চোর···কাল রাত্রে চুরি করিতে উপরে উঠিয়াছিল!

লাহিড়ী আসিয়া কহিলেন—তুমি রাঢ়ীশ্রেণী! না?

লাহিড়ীর পানে বিরাজ চাহিল। লাহিড়ী কহিলেন, —আমরা বারেন্দ্র। তোমার কে আছেন?

বিরাজ কহিল—মা, আর একটি ছোট বোন্।

লাহিড়ী বাঙ্‌লার সামাজিক ইতিবৃত্ত বিবৃত করিয়া চলিলেন, এই রাঢ় আর বরেন্দ্রভূমি·· দুটা প্রদেশের মধ্যে এমন ব্যবধান গড়িয়া উঠিল কি করিয়া! সে ব্যবধান আজ ভাইকে ভাইয়ের পাশ হইতে বহুদূরে সরাইয়া রাখিয়াছে!

নীলিমা কহিল—আমাদের কাজে বিরাজ বাবুকেও সঙ্গে নাও বাবা। উনি শিক্ষকতা করছিলেন তো, গ্রাজুয়েট···

লাহিড়ী কহিলেন—আমি এ কথা নিত্য ভাবি। সেই কথাই বলছিলুম,—এই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাই, কিন্তু রাঢ়ী-বারেন্দ্রে ব্যবধান দূর করবার কথা তো কখনো তুলি না। অথচ এতে যাগযজ্ঞের কোনো প্রয়োজন নেই।

নীলিমা বাপের কথার অর্থ না বুঝিয়া বাপের পানে চাহিয়া রহিল।

লাহিড়ী তা লক্ষ্য করিলেন, কহিলেন—এই অহিংসা-মন্ত্রের মর্ম্মটুকু দেশের লোককে বুঝোতে নারী আর পুরুষ আজ সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে। অথচ···এমনি বহু কথা তিনি বকিয়া চলিলেন।

উপসংহারে লাহিড়ী কহিলেন—বিরাজকে দেখে আমার ভারী ভালো লেগেচে। আমাদের এই কাজে ওকে যদি সঙ্গে নিতে পারি।···কিন্তু কি করে, সেই কথাই ভাবচি। তা, বিরাজ···

বিরাজ তাঁর পানে চাহিল।

লাহিড়ী কহিলেন—দেশের ভবিষ্যতের সঙ্গে নীলিমার ভবিষ্যৎও আমায় অস্থির করে রেখেচে। কলরব-সভার মধ্য থেকে কাকে এনে তার হাতে ওর ভার দেবো, ভেবে পাচ্ছি না। কলরবের মধ্যে মানুষের আসল পরিচয় পাওয়া যায় না! তাই···

নীলিমা ডাকিল—বাবা···

বাবার কথায় যেন কিসের আভাস! লজ্জায় তার স্বর বাধিয়া গেল।

লাহিড়ী কহিলেন—আমার কেবল মনে হয়, হিন্দু-মোসলেম এক করতে চাচ্ছি, অথচ তার আগে রাঢ়ী-বারেন্দ্র মেলানোর কথা কেন ওঠে না? সারা রাত ঐ চিন্তা যে কোথা থেকে আমার মাথায় প্রবল হয়ে উঠলো! সে ব্যবধান যাতে ঘুচোতে পারি, সে চেষ্টা করা উচিত, খুব উচিত! তোমাদের বুঝিয়ে দেবো···

বিরাজ অদূরে বাগানের বাতাবি গাছটার পানে চাহিয়া ছিল···বেশ বড় বড় ফল। তা ছাড়া মালতীর ঝাড়ে একরাশ ফুল বর্ণে-গন্ধে কি বিচিত্র-বেশে সাজিয়া উঠিয়াছে! হাওয়ার দোলায় ফুলের ঐ প্রমোদ-নৃত্য··· এবং মনের বনেও যেন স্তবকে স্তবকে ফুলের রাশি ফুটিয়া উঠিতেছিল!

লাহিড়ী কহিলেন—তোমার মা আছেন, না? চলো, তাঁর কাছে আমরা তিন জনে যাই। এ ভবিতব্য··· নিশ্চয়। না হলে তুচ্ছ কখানা বই নিয়ে আমার বাড়ী তুমি আসবে কেন? এসে ঐ গাড়ীর ধাক্কায়···

নীলিমার দিকে দেখাইয়া বিরাজ কহিল—জীবনের কোনো ধারণা আমার ছিল না। কোন্ পথ ঠিক পথ,

তাও বুঝিনি! এর কথায় বুঝেচি। নিজের ভবিষ্যতের পানে চাওয়া চাই—ঠিক। না হলে মানুষে আর ইতর পশুতে কোনো প্রভেদ থাকে না!

লাহিড়ী কহিলেন—তাহলে নীলিমাকেই চিরদিনের জন্ম তোমার পথের সঙ্গী করে নাও! অনেকেই এখানে আসে দেশের কাজে, নীলও তাদের সঙ্গে মেশে। কিন্তু কারো প্রতি ওর এত দরদ দেখিনি···

তিনি নীলিমার হাত ধরিলেন। নীলিমা লজ্জায় ঝাঁকিয়া হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিল, কহিল—যাও···

হাসিয়া লাহিড়ী কহিলেন—আমার যাবার সময় এগিয়ে এসেচে, মা। তাই যাবার আগে সংসারে তোমায় সুপ্রতিষ্ঠিত দেখে যেতে চাই! আমি আসচি··· একখানা চিঠি আছে কর্ম্মী সমিতির। পড়লুম না তো! এমন ভুল হচ্ছে আজ!···

লাহিড়ী চলিয়া গেলেন! নীলিমা ও বিরাজ দু-জনেই চুপ।

অনেকক্ষণ পরে নীলিমা কথা কহিল, বলিল,—কি ভাবচেন?

বিরাজ কহিল—জয়গোপাল বাবুর কথা। তিনি কি ভেবে আমায় চাকরি দিলেন, আর···

নীলিমা কহিল—এই! তা তাঁর বই আর টাকা যা এ্যাডভান্স নিয়েচেন, ফিরিয়ে দিয়ে আসুন না!

বিরাজ কহিল—কিন্তু···

হাসিয়া নীলিমা কহিল—তাঁকে বলবেন, কাব্য লিখে নারীর চিত্ত মুগ্ধ করবেন, এমন রচনা-শক্তি তাঁর নেই! তার উপর ঐ-সব লেখায়? যাতে নারীর অপমানের সুর বাজে! এ জ্ঞানটুকু অন্ততঃ তাঁকে দিয়ে আসবেন!··· আমাদের কাজের একটা প্ল্যানও আজ ঠিক করে ফেলতে চাই···আসতে ভুলবেন না!

বিরাজ নীলিমার পানে চাহিল—নীলিমার চোখে হাসির দীপ্তি!

নীলিমা কহিল,—এত ঘড়ি ঘড়ি বাবার মত বদলায়! কোনদিন বলেন, খদ্দরেই দেশের মুক্তি! কোন দিন বলেন, না রে, সব চাষের মাঠে জড়ো হ। আজ আবার নতুন সুর দেখচি, রাঢ়ী-বারেন্দ্র···

সে হাসিল! বিরাজ ভাবিল, সর্ব্বনাশ। এ মতও যদি বদলায়।

চিঠি হাতে লাহিড়ী ঘরে ঢুকিলেন, কহিলেন,—কামাখ্যা চৌধুরীর সে বইখানা খুঁজে দে তো মা···সেই "অভঙ্গ বঙ্গের অখণ্ড জাতি"। তাতে ভারী প্রাঞ্জল ভাষায় লেখক বুঝিয়েচেন, রাঢ়ী-বারেন্দ্র একই শ্রেণীর, একই পর্য্যায়ের। শুধু যাতায়াতে অসুবিধা ছিল বলেই··· বুঝলে, বিরাজ! কিন্তু আজ সে বাধা আর নেই। তবে? রাঢ়ীকে কাছে পেয়ে সে-সুযোগ আমি···

তাঁর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বিদ্যুতের মত নীলিমা সে ঘর হইতে সরিয়া পড়িল।

# বন-ঝাড়

নন্-কো-অপারেশনের দুন্দুভি-নাদ শুনিয়া সরকারী চাকরি ছাড়িয়া দিলাম। জেলা স্কুলে হেড মাষ্টারী করিতেছিলাম। আরামের চাকরি! কি যে খেয়াল জাগিল!

ভাবিয়াছিলাম, চাকরির জন্য যদি স্বরাজ না মেলে? দু-চারিটা মিটিংয়ে বক্তৃতা করি নাই, এমন নয়। তবে কোন্ কথার কি দাম—মাষ্টারীর কৃপায় বুঝিতাম। কাজেই দু'দিনে মোহ ভাঙ্গিল!

তার উপর সংসার ছিল মস্ত—বহু পোষ্য। স্বরাজের আশা ক্রমে দুরাশায় পরিণত হইতেছিল। কর্পোরেশনে প্রবেশ লাভ করিব, তাও ঘটিল না! বুদ্ধির ছিল একান্ত অভাব!

তাই ছ'মাস পরে খদ্দর এবং মাদ্রাজী চটী রাখিয়া আবার চাকরির সন্ধানে মাতিলাম। ইউনিভার্শিটির পাশগুলায় উঁচু নম্বর আর মেডেল পাইয়াছিলাম। সেজন্য ধনী শ্বশুর মিলিয়াছিল; এবং তাহারি ফলে গৃহিণীর গায়ে অলঙ্কার।

সেগুলা একে একে চলিয়া যায় দেখিয়া মন ছম্‌ছম্ করিয়া উঠিল। চেতনা জাগিল। এ-মন গোলাম-খানায় বড় হইয়াছে। কাজেই গোলামী ছাড়া অন্যত্র আরাম পাইবে কেন?

নন্দীপুরের জমিদার জগদীশ চৌধুরী কৌন্সিলের মেম্বার। তাঁর একজন প্রাইভেট সেক্রেটারী চাই। ইংলিশে এম-এ—পাব্‌লিক কাজে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে, এমন লোকের আবেদন গ্রাহ্য হইবে! কাগজে এমনি ধরণের বিজ্ঞাপন দেখিলাম।

ভাগ্যে নন্-কোতে ঢুকিয়া পাব্লিকের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়াছিলাম! বরাত ঠুকিয়া দরখাস্ত দিলাম।

এক সপ্তাহ পরে পত্র পাইলাম—শীঘ্র দেখা করিবেন।

একটু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইলাম। খদ্দর পরিয়া যাইব? না, খদ্দর রাখিয়া?

পাঁচজনে পাঁচটা পরামর্শ দিল। সে-পরামর্শ শিরোধার্য্য করিয়া একখানা খদ্দরের চাদর ঘাড়ে চাপাইলাম। যদি প্রয়োজন হয়, সেটাকে ট্রেড্ মার্ক বলিয়া চালানো যাইবে!

গ্রহ ছিল ভালো। চাকরিতে বাহাল হইলাম।

জগদীশ চৌধুরীর বয়স হইয়াছে,—বিপত্নীক। ছেলে-মেয়েরা থাকে কলিকাতায়। তিনি জমিদারীর নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ান। তবে পাকা আস্তানা বাঁধিয়াছেন হলদিপুরে। নদীর ধারে মস্ত বাড়ী, বাগান। কৌন্সিলে মাতন করার উপর আর একটা সখ আছে—বাঙলার সামাজিক ইতিহাস রচনা। মাল-মশলা সংগ্রহ হইতেছে। এ-কাজে মোটা-টাকা ব্যয় করেন। সংবাদ-সংগ্রহে উৎসাহ এমন অপরিসীম যে, নামজাদা বড়লোকদের কুৎসা বেচিয়া দু'চারিজন ওস্তাদ লোক নগদ বেশ দু' পয়সা আদায় করিয়া যায়।

চৌধুরী মহাশয় আমায় বলিলেন, বৎসরের মধ্যে বেশীর ভাগ আমাকে তাঁর সঙ্গে হলদিপুরেই বাস করিতে হইবে। কৌন্সিলে মিটিং হইবার সময় কলিকাতায় আসিব অর্থাৎ তাঁর সাথের সাথী হইয়া থাকিব। বক্তৃতা লিখিয়া দেওয়া, কৌন্সিলের কাজে সহায়তা করা এবং তাঁর গ্রন্থ-রচনার কাজে আমাকে লাগিয়া থাকিতে হইবে। মাহিনা মোটা। ইচ্ছা হইলে সপরিবারে হলদিপুরে বাস করিতে পারি। সেজন্য ভালো পাকা বাড়ী, দাস-দাসী ও পাচক পাইব বিনামূল্যে; জমিদারীর মাছ, তরী-তরকারী সেলামী—সেগুলা বাহুল্য, তাহাও বুঝাইয়া দিলেন।

অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন না হইলে এমন চাকরি মিলে না! খেয়ালের ঝোঁকে সরকারী চাকরি ছাড়িয়া যে মনস্তাপ পাইয়াছিলাম, ঘুচিল। বিপুল আনন্দে অন্তর ভরিয়া উঠিল।

চৌধুরী মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম, পরিবারবর্গ এখন কলিকাতায় থাকিবে। ছেলে-দুটি সদ্য স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছে। দু'তিন মাস পরে তাহাদের আনিব।

খুশী-মনে মনিব কহিলেন—আচ্ছা!

চৌধুরী মহাশয় আগাম কিছু হাতে দিলেন। আমি দিন-ক্ষণ দেখিয়া যাত্রা করিলাম।

নদীর তীরে চৌধুরী মহাশয়ের মস্ত প্রাসাদ। শুনিলাম, বীরভূমের প্রাচীন বাগ্‌দী রাজাদের আমোলে এই গৃহে একদিন নানা আমোদ-বিলাস অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। প্রাসাদের স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; চৌধুরী মহাশয় বহু টাকা ব্যয় করিয়া মেরামত করিয়াছেন। বাড়ীর নাম রাখিয়াছেন, রঞ্জা-বাস। আমার আস্তানাটি প্রাসাদের একধারে। সেটিও বেশ। বাড়ীতে চিঠি লিখিয়া দিলাম,—বর্ষা কাটিলে তোমাদের এখানে আনিব। দেশ দেখিয়া প্রাণ জুড়াইবে।

রঞ্জা-বাসের চারিদিকে বেড়িয়া প্রকাণ্ড বাগান—পার্কের মত। এই পার্ক ছাড়াইয়া ছোট গ্রাম। ক'খানা কুটীর—ছোট একটি পোষ্ট-অফিস আছে। স্কুল আছে।

লাইট রেলোয়ের ষ্টেশনটি একেবারে গ্রামের সীমানায়। নির্জ্জনতার উপর চৌধুরী মহাশয়ের ঝোঁক একটু বেশী।

আমার কাজ বড় ছিল না। সকালে মনিবের ঘরে বসিয়া চা পান করিতাম; তার পর ঘণ্টাখানেক ঘুরিয়া আসিতাম। আটটা হইতে নটা পর্য্যন্ত নানা গল্প চলিত। তার পর বিশ্রাম। বৈকালে চারিটার সময় ডাকিয়া দিতাম। সন্ধ্যায় ছুটী। চৌধুরী মহাশয় বলিতেন—দরকার পড়লে তোমায় খাটাবো মিহির।

আমি কহিলাম,—খাটতে আমি রাজী।

বেড়াইয়া প্রচুর আনন্দ পাইতাম। বনে-বনে পাখীর গান। নদীর জলে তরঙ্গের লীলা। তার উপর শ্রাবণের মেঘ যখন আকাশ জুড়িয়া গাছপালা ছুঁইয়া নদীর বুকে নামিয়া আসিত, তখন আমার কবিতা লিখিবার বাসনা হইত। ছন্দ-মিলের গোলযোগ ঘটিত, তাই। নহিলে এত বিচিত্র ভাব আসিয়া মনে দোলা দিত...... কিন্তু সে কথা থাক।

একদিন এক ঘটনা ঘটিল। অকস্মাৎ। সেই ঘটনার কথা বলি।

দু-দিন দুরাত্রি অনবরত বর্ষণের পর বৈকালের দিকে ধারার বিরাম ঘটিয়াছে। ঘরের মধ্যে বসিয়া বসিয়া অস্বস্তি ধরিতেছিল, তাই বনের পথে বাহির হইয়া পড়িলাম। আম, জাম, অশ্বত্থ, বকুল, তাল আর খেজুরের গাছ। যেন বিচিত্র কুঞ্জ সাজাইয়া রাখিয়াছে! নদীর ধার দিয়া বনের পথে বহুদূর চলিলাম। এক জায়গায় খানিকটা মুক্ত প্রান্তর। সেই প্রান্তরে একটা গাছের গুঁড়ির উপর বসিলাম!

দুদিনের ছুটীর পর সূর্য্য তখন প্রদীপ্ত তেজে জ্বলিয়াছে। বসিয়া বসিয়া নদীর পানে চাহিয়া আছি—নদীতে নৌকা নাই। দূরে কোথায় মাদল বাজিতেছে—সঙ্গে সঙ্গে একটা সুরের সাড়া। মন কেমন উদাস, শূন্য! কোন চিন্তা মনে ছিল না—এ কথা বেশ মনে আছে!

সহসা মনে হইল, চাপা গলায় কাছেই যেন কারা কথা কহিতেছে! এখানকার বাগ্দী বাসিন্দা নয়। যেন...

চমকিয়া চারিদিকে চাহিলাম। চলিতে চলিতে কেহ কথা কহিলে যেমন শুনায়, ঠিক তেমনি। দুই কাণ খাড়া করিয়া রহিলাম। তাদের গোপন কথা শুনিব বলিয়া নয়—এক আশ্চর্য্য আগ্রহে! সে স্বর ক্রমে স্পষ্টতর হইতে ছিল। যারা কথা কহিতেছে, তারা আমার দিকে আসিতেছে!

কি কথা বুঝিতে পারিলাম না। শুধু মৃদু মর্ম্মর—দুজনে নির্জ্জনে যেন বড় গোপন-কথা চলিয়াছে! যেন প্রণয়ের কল-কাকলী...নিভৃত-নির্জ্জনে! একটি কণ্ঠ পুরুষের, অপরটি নারীর, তাও বুঝিলাম। বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এ তল্লাটে এমন কথা কহিবার মত লোক তো দেখি নাই। তবে...?

চারিদিকে চাহিলাম। কেহ নাই। গাছের ফাঁকে ফাঁকে যতদূর দৃষ্টি চলে...জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই। শুধু দুটা স্বরের কাঁপন বাতাসে ভাসিয়া চলিয়াছে!

কতক্ষণ এ-ভাবে কাটিল, মনে নাই। আমি যেন চেতনহারা! আমার মন, আমার দুই চোখের দৃষ্টি, আমার শ্রুতি একাগ্র গভীর কৌতূহলে সেই স্বর লক্ষ্য করিয়া আছে!

কিন্তু নাই। নাই! কেহ নাই! পাশে নাই! দূরে নাই! আছে শুধু কণ্ঠস্বর! এ বিজনে কে কথা কয়? কারা? ও কারা? সারা দেহে রোমাঞ্চ হইল। উঠিয়া দাঁড়াইলাম। সে স্বর যেন দূরে, আরো দূরে চলিয়াছে। যেন কথা কহিতে কহিতে কাছ হইতে তারা দূরে চলিয়াছে! আমি সে স্বরের পিছনে চলিলাম, সম্পূর্ণ চেতনহারা!

আরো দূরে দু-তিনটা বড় গাছ—লতায়-পাতায় সেগুলায় মিলন-ডোর। সেই লতা-বল্লরীর ফাঁকে ছায়ার মত...স্পষ্ট দেখিলাম, দুজন লোক। একজন কিশোর, অপরটি তরুণী! আমি দাঁড়াইলাম।

গোধূলির ম্লানিমা ঘনাইয়া আসিতেছিল। আকাশে মেঘ নাই। দূরে বহু দূরে গ্রাম-ছাড়া কৃষকেরা ঘরে ফিরিতেছে। তাদের কণ্ঠের দুই চারিটা কর্কশ স্বর শুনা যাইতেছিল।

মাথার উপর একটা শব্দ! চমকিয়া চাহিয়া দেখি, একরাশ হাঁস উড়িয়া চলিয়াছে। তার পর আবার সেই তরুণ-তরুণীর পানে চাহিলাম। সেই কিশোর-কিশোরী! সে ছায়া মিলাইয়া গিয়াছে!

মনে মনে হাসিলাম। মানুষ নয়—ছায়া! আমার মনের মোহ! বিভ্রম! মানুষ থাকিতে পারে না। বিশেষ এ যুগের সভ্যতার পরশ পাওয়া মানুষ! লতা-বল্লরীর কাছে গেলাম। কেহ নাই! দুটা বড় বড় বট গাছ। লতার মালায় দুটা গাছকে যেন কে কঠিন ডোরে বাঁধিয়া রাখিয়াছে!

বয়সে ধিক্কার জন্মিল। আকাশে বাতাসে রঙীন স্বপ্ন রচি—যেন প্রিয়া-বিরহী যক্ষ! তাই বলিয়া বাতাসের গায়ে কিশোর-কিশোরী দেখা! উন্মাদ আর কাকে বলে?

অনেক দূরে আসিয়াছিলাম। ঘুরিয়া মাঠের উপর দিয়া ফিরিবার উদ্যোগ করিলাম! আট দশ মিনিট চলার পর এক জায়গায় দেখি, তালপাতার ছাউনি একখানা কুটীর—তার সঙ্গে লাগিয়া আছে ছোট একটু ক্ষেত—একটা ডোবা। এই কুটীরের মধ্য দিয়া পায়ে-চলা পথ। কুটীরের গায়ে কাঁটা-খেজুরের নিবিড় ঝোপ।

এমন পথও থাকে! সেই পথে চলিলাম। কুটীরের

ছোট প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিব, দাওয়া হইতে নামিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিষ্ঠ-পেশী এক পুরুষ। হুঙ্কার দিয়া সে তার দেশের ভাষায় প্রশ্ন করিল,—এখানে কেন?

আমি কহিলাম—এ পথে এসেছিলুম। বাড়ী ফিরচি।

সে আমার আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করিয়া কহিল,—হুঁ!

—কুথায় থাকিস?

বুঝাইয়া দিলাম। সে প্রশ্ন করিল—চৌধুরীদের তুই কে বটে?

কহিলাম—কেহ নই, মাহিনা-করা ভৃত্য।

—হুঁ! বড় ঘরানা নোস্! আচ্ছা যা! এখানে আর আসিস্ নে।

প্রথমে ভয় ও চমক! তার পর বিস্ময়-কৌতূহলের সীমা রহিল না!

বুঝিলাম, এখানকার পুরানো বাসিন্দা। এখনকার বনিয়াদী বাঙালীর ঘেঁস সহিতে নারাজ।

মুখে-চোখে তাই অমন বিরক্তি!

চলিয়া আসিতেছি, সে কহিল—দাঁড়া! আমি চাষ করি, তাই ওরা ছোটলোক ভাবে। কিন্তু আমার বাপ-দাদারা একদিন ছিল ঢালী। বিষ্ণুপুরের রাজার কথা শুনেচিস? আমার বাপ-দাদারা ছিল রাজার গড় চৌকিদার। সেরা শাস্ত্রী! লড়াই করতো।

গল্প মন্দ লাগিবে না! বসিয়া গেলাম—তাহারি দাওয়ায়। কহিলাম—এই বনের মধ্যে বাস করচো! এত বড় লোক হয়ে··?

সে বলিল—বড় নই! বড় নই! ছোট জাত। বাগ্দী। বাগ্দী বলে ভদ্দর নোকেরা নাক ওল্টায়। এক-দিন কিন্তু এই বাগ্দীদের গুল্‌তি আর হাতের টিক—তার কদর ছিল।

প্রাঙ্গণে দুটা তালগাছ পাশাপাশি উঠিয়াছে—আকাশে মাথা তুলিয়া। তার পাতায় বাস্তরোল তুলিয়া সন্ধ্যার বাতাস বহিয়া চলিয়াছে।

লোকটা নিশ্বাস ফেলিল। আমি কহিলাম,—তোমার নাম কি?

সে কহিল—দলু। আমার ঠাকুর্দা ঐ মহালে জন্মে-ছিল। ওখেনে ছিল আমাদের আস্তানা! এখন যে-বাবু এসেচে, ওই বাবুর বাপ এসে এ-সব জমি কেড়ে দখল করে। আমার ঠাকুর্দা বাড়ী ছাড়বে না—তারাও না ভুলে স্বস্তি পাবে না! আমাদের সাত-পুরুষের বাস—তাদের খেয়ালে ছাড়বো! কেন? জুলুম!

আপন-মনে দলু অনেক কথা বলিয়া চলিল। রাজার আমোলে কত খাতির ছিল, কত আদর। রাজা কোথাও গেলে তাদের দল চলিত রাজার আগে আগে—ঢাল-সড়কী কাঁধে বাঁধিয়া। আর আজ? ছোটলোক বাগ্দী বলিয়া লোকে তাদের দূর-ছাই করে। দুর্দ্দশা আর কাহাকে বলে?

কথার শেষে কপালে করাঘাত করিয়া দলু আর একটা নিশ্বাস ফেলিল।

আমি উঠিবার উদ্যোগ করিলাম। অন্ধকার নামিতে-ছিল। এই পথ···সাপের ভয় আছে।

দলু কহিল,—বোস্···

বলিয়া সে উঠিয়া গেল; ফিরিল একটা ভারী লোহার ডাণ্ডা হাতে লইয়া। কহিল,—এ দণ্ড রাজার দেওয়া। বাগাতে পারিস্?

হাতে লইলাম। বেশ ভারী—বাগানো কঠিন! দণ্ডের ডগার দিকে মাথার খুলির মত কি একটা ছিল! এক কালে রঙ-করা ছিল। কালের প্রভাবে সে রঙ ঝরিয়া খশিয়া গিয়াছে! তবু বুঝা যায়। কটি হইতে একটা ছোরা বাহির করিয়া কহিল—এ ছোরা রাজার দেওয়া। আমাদের কাছে বরাবর আছে। এ ছোরা রাজার ইজ্জৎ রক্ষা করেচে। আমাদের বংশের ইজ্জৎও রেখেচে এই ছোরা। এ ছোরার নাম শূলী।

ছোরাখানা হাতে লইয়া দেখিলাম! কি ধার! এমন ইস্পাত চোখে দেখি নাই। ঝক্-ঝক্ করিতেছে! যেন আয়না—সদ্য তৈয়ারী!

ছোরার দু'চারিটা কাহিনী শুনিবার পর বিদায় লইলাম। দলু বলিয়া দিল, আর কখনো যেন এ পথে না আসি!

কহিলাম,—কেন?

দলু কহিল—এ বনে দেওতা আছে; সেকালের তারাও আসে। বনের মায়া ছাড়তে পারে নি! আমার সঙ্গে দেখা হয়। কথা কয় না।

আমার শরীরে রোমাঞ্চ! ভয় হয় নাই—এমন কথা বলিতে পারি না। তবে এম-এ পাশ করিয়া সে ভয়ের নাম মুখে আনা চলে না।

দু তিন দিন আবার বর্ষার সমারোহ চলিল। বাড়ীর বাহির হইলে দলুর কাহিনী প্রতিক্ষণে মনে জাগিত। চৌধুরী মহাশয়কে সে কথা বলি নাই। হয়তো দলুকে তিনি জানেন! হয়তো তার সঙ্গে দেখাও হইয়াছিল! দলুর মনের ভাব প্রসন্ন নয়।

সেদিন বর্ষা থামিলে চৌধুরী মহাশয় ডাকিলেন—মিহির!

তাঁর পানে চাহিলাম। বাহিরের পানে তিনি তাকাইয়া ছিলেন, কহিলেন—চলো না, একটু ঘুরে আসা যাক্।

দু'জনে বাহির হইলাম। বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। পার্কের সীমানায় পর বন-রাজির শ্যামল শোভা। এ

যেন গাছের দেশ! উদ্ভিদের রাজ্য! চৌধুরী মহাশয় কহিলেন,—গাছের প্রাণ আছে, জানো?

কহিলাম—জানি।

চৌধুরী মহাশয় কহিলেন—শুধু প্রাণ নয়। মানুষের মধ্যে যেমন সাধু, অসাধু—বিনয়ী, অহঙ্কারী আছে—গাছেদের মধ্যেও তেমনি! এবং নিজেদের সে সাধুতা-অসাধুতা, বিনয়-অহঙ্কার সম্বন্ধে তারা বেশ সচেতন। এ কথা জানো?

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাঁর পানে চাহিয়া রহিলাম। তিনি কহিলেন,—ঐ তাল, খেজুর! তাল হলো অহঙ্কারী, এবং সে অহঙ্কার এমন গগনস্পর্শী যে, কারো পানে সে দৃক্‌পাত করে না—মদ-গর্ব্বে বিভোর! সকলকে সে দেখে ছোট, তুচ্ছ। খেজুরও অহঙ্কারী—তার অহঙ্কার ইতর-ধরণের; পরকে সহ্য করতে পারে না। তার আশে-পাশে আর কেউ বড় হতে চাইলে তাদের কাঁটার আঘাত দেয়। ঐ যে কলার ঝাড়—ও গাছগুলো নারীর মত অসহায়—একটু বাতাসের আঘাত সইতে পারে না। পরের হাতের পীড়ন সয় নির্ব্বিবাদে, নীরবে। ঐ বট—উদার, মহৎ! আশ্রয় দিতে কোনো দিন বিমুখ নয়। এটা লক্ষ্য করেচো কতকগুলো গাছের প্রকৃতি পুরুষের মত, নিজের পৌরুষে মাথা তুলে আছে—ঝড়-জল বুক পেতে নেয়—হিংসায় গর্জ্জন তোলে…আবার কতকগুলো মেয়েদের মত—ঋজু, শান্ত, নিরীহ!

বিস্ময়ে আমি তাঁর পানে চাহিলাম। কোনো কথা বলিতে পারিলাম না। চৌধুরী মহাশয় বলিলেন—পাঁচ-সাত বৎসর পূর্ব্বে একখানা বইয়ে এ-কথা পড়ি। ইংরাজী বই। তার একটা কথা আজও মনে আছে। লেখক বলেছিলেন—ওকের সংলগ্ন লতা-বল্লরী দেখে মনে হয়, যেন এক কিশোরী তন্বী বাহুলতা দিয়ে পুরুষকে আঁকড়ে রয়েচে! সে বই পড়ার পর থেকে গাছপালা দেখ্‌লে ঐ কথা আমার মনে জাগে। সেজন্য গাছপালা ভাঙতে কাটতে আমি দিই না। কেউ কাটচে দেখলে আমি শিউরে উঠি।

আমার মনে পড়িল সেদিনকার কথা। সেই মৃদু মর্ম্মর বাণী…এই বনের তলে! সেই কিশোর-কিশোরীর ছায়া-রেখা! কথাটা তাঁকে বলিলাম।

চৌধুরী মহাশয় কহিলেন—সে পথে বুঝি গেছ! হ্যাঁ,…একটা কথা শুনি বটে—আর পাঁচজনের মুখে। তারা নাকি দেখেচে…ভয়ে সেদিক পানে কেউ যায় না।

দুই পা অগ্রসর হইলাম। চৌধুরী মহাশয় কহিলেন, দলুকে দেখেচো, বোধ হয়। এক বাগ্দী প্রজা। ভারী গোঁয়ার। রাজার আমলে তার বাপ-দাদা শাস্ত্রীর কাজ করতো। ঐ বাড়ীতে আস্তানা বেঁধে তারা থাকতো। বাবার আমোলে তাদের বাড়ী ছাড়তে হয়। আমাদের উপর একটা আক্রোশ আছে। বাড়ী ছাড়ার জন্য ঠিক নয়, আক্রোশের অন্য কারণ আছে।

চৌধুরী মহাশয় স্তব্ধ হইলেন। অদূরে একটা লোক দুটা বলদ তাড়াইয়া আনিতেছিল। চৌধুরী মহাশয়কে দেখিয়া সবিনয়ে সে প্রণাম করিল। চৌধুরী কহিলেন—চাষের খপর কি রে?

সে বলিল, বৃষ্টিতে সব নষ্ট হইতে বসিয়াছে।

সে চলিয়া গেলে চৌধুরী কহিলেন—বাবার এক পিসতুতো ভাই ছিলেন—রাখাল-কাকা। তাঁর মা-বাবা মারা গেলে আমাদের বাড়ীতে থাকতেন। কোনো কাজকর্ম্ম দায়ঝক্কি না থাক্‌লে যা হয়, তাই হলো। তিনি হলেন বিষম খেয়ালী। বাবা তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। এ বাড়ীতে বাবা তাঁকে নিয়ে আসেন। তাঁর বয়স তখন বছর সাতাশ! ঐ দলুর এক মেয়ে ছিল। মেয়ের বয়স শুনেচি তখন আঠারো বৎসর। রাখাল-কাকার সঙ্গে সেই মেয়ের ঘনিষ্ঠতা ঘটলো। এমন ঘনিষ্ঠতা যে, তার সঙ্গ ছেড়ে এক নিমেষ থাকতে পারতেন না। বাবা তাঁকে ঘরে বন্ধ করে রাখ্‌তেন। রাখাল-কাকা জান্‌লা গলে লাফিয়ে পড়ে দলুর ওখানে ছুটলেন। কোনো রকমে বশ করতে না পেরে বাবা তাঁকে শেষে দূর করে দেন। দলু তাতে ক্ষেপে ওঠে। সে এসে এমন গোলযোগ বাধিয়ে তোলে যে, বাবা এখানকার বাস তুলে দেশে চলে যান; আর আসেন নি। দলু নাকি শাসিয়ে ছিল, প্রাণে মারবে। পাগ্‌লা গোঁয়ার……কি করতো, বলা যায় না!

আমি কহিলাম,—পুলিশে খপর দিলে…

বাধা দিয়া চৌধুরী কহিলেন,—মশা মারতে কামান পাত্‌বার রুচি বাবার হয় নি।… দলু এক-পয়সা খাজনা দেয় না—দিব্যি আছে। কি হবে ঘাঁটিয়ে? আমি বলেচি, কিছু দিতে হবে না বাপু, তুই চুপ্‌চাপ্ থাক্ ওখানে।

আমি কহিলাম,—মেয়ে?

—জানি না, কোথায় গেছে। শুনতে পাই, রাখাল-কাকা তাকে নিয়ে গা-ঢাকা দেছে! এই জন্যই দলুর সম্বন্ধে আমি উদাসীন। বেচারী! তার উপর এই জুলুম! গরীব বলে তার মেয়ের ইজ্জৎ নেই? রাখাল-কাকার সে আচরণে লজ্জায় ঘৃণায় আমাদের মাথা দলুর কাছে হেঁট হয়ে আছে।

চৌধুরী মশায় নিশ্বাস ফেলিলেন। গাছের কোলে কোলে অন্ধকার তখন ঘনাইয়া আসিয়াছে।

চার-পাঁচদিন পরের কথা। বনের বুকে ছোট্ট এই ট্রাজেডিটুকু আমার বুকে সুগভীর রেখাপাত করিয়াছিল। ছোট-বড় সকল ভেদ ভুলিয়া হৃদয়ে-হৃদয়ে এই

যে মিলন-আকুলতা······আমাদের রচা ভদ্রতার মান-সম্ভ্রম মর্য্যাদার অস্ত্রে সে মিলন-সূত্র নির্ম্মূল করায় সত্যই আমাদের কোনো অধিকার আছে কি? শিক্ষা, সঙ্গ, সংস্কারের সকল বাঁধ কাটিয়া এ প্রশ্ন আমার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল!

বৈকালে আবার বাহির হইলাম। একা। মনের খেয়ালে সেই বট-গুল্মের দিকে চলিয়াছিলাম।

ঐ সে গাছ। সেই লতা-বল্লরীর মালা দুলিতেছে! অস্ত-সূর্য্যের আলো—তার পিছনে ছায়া! দুয়ে মিলিয়া চমৎকার ছবি রচিয়াছে!

শিহরিয়া উঠিলাম······ঠিক যেন এক কিশোর আর কিশোরী—মিলনের বাঁধনে গাঁথা!

মাথায় রক্ত ছলাৎ করিয়া উঠিল! শরীরে আবার রোমাঞ্চ! কিন্তু এমন মোহ আমাকে আচ্ছন্ন করিল যে নড়িবার শক্তি নাই! এখনো···এখনো ঐ চোখের সামনে কিশোর কিশোরীর মিলন-ছায়া···সুস্পষ্ট, জীবন্ত!

তার পর সে ছায়া কখন্ সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলাইয়া গেল—বুঝিতে পারিলাম না। চোখের সামনে দেখি, জাগিয়া আছে শুধু দুটি শাখা—লতার গ্রন্থিতে বাঁধা! যেন আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি!

চৌধুরী মহাশয়ের কথা মনে জাগিল। গাছের প্রাণ! গাছের প্রকৃতি! মনে শিহরণ বহিয়া গেল—বিদ্যুতের শিখার মত। আন-মনে চলিতে চলিতে দলুর কুটীরের পাশে আসিলাম। তালপাতার সেই ছাউনি···ছাঁচি-কুমড়ার লতা উঠিয়াছে···স্তবকে স্তবকে ফুল।

নিস্তব্ধ কুটীর। সারা অঙ্গ ছম্ ছম্ করিয়া উঠিল। ভাবিলাম, ফিরি···

কিন্তু কে যেন টানিয়া আমায় কুটীরের প্রাঙ্গণে আনিয়া ফেলিল। দাওয়ায় বসিয়া আছে দলু। চোখ লাল টক্ টক্ করিতেছে।······সামনে একটা ভাঁড়। জায়গাটায় কেমন একটা দুর্গন্ধ।

বুঝিলাম, তাড়ি গিলিয়া নেশা করিয়াছে।

গেঁয়ার লোক! তার উপর নেশা! ফিরিতে-ছিলাম।

দলু হাঁকিল—শোন্···

সে স্বরে যেন বাজ হাঁকিল!

সেই দণ্ড, সেই ছোরা! ফিরিতে হইল। খুব শান্ত স্বরে কহিলাম,—তোমার অসুখ করেচে?

দলু হাসিল—ষ্টেজের সাজা নায়ক যেমন কৃত্রিম হাস্য-রব তোলে, তেমনি অট্ট-হাসি!

দলু নামিয়া আসিয়া বলিল—শরীরটা ক'দিন জুৎসই নেই।···তা ঝড়-বৃষ্টি নামচে, এ ধারে এখন এসেচিস্ কেন?

কহিলাম—তোমায় দেখতে।

দলু কহিল—হুঁ! তারপর ভাঁটার মত চোখ তুলিয়া আমার মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল—অবিচল দৃষ্টি!

দলু আমার হাত ধরিল। আমি শিহরিয়া উঠিলাম। মনে হইল, যেন আমি পাষাণে পরিণত হইয়া গিয়াছি!

দলু কহিল,-ঘরের মধ্যিকে আয়······আকাশের পানে তাকিয়েচিস্?

এতক্ষণ তাকাই নাই। এখন আকাশের পানে চাহিলাম। মেঘের পরে মেঘ জমিতেছে—ঘন কালো মেঘ। সত্যই আমার চেতনা ছিল না।

আমার হাত ধরিয়া দলু আমাকে ঘরে লইয়া গেল। ঘরের মেঝেয় তালপাতায় বোনা একটা চ্যাটাই·········এক কোণে দড়ির আলনা। সেই আলনায় চওড়া-পাড় মোটা ক'খানা শাড়ী।

দলুর মেয়ের? কহিলাম—ও শাড়ী কে পরে দলু?

দলু দেখিল, কহিল—আমার মেয়ের শাড়ী।

—তোমার মেয়ে আছে?

দলু চুপ করিয়া আমার পানে চাহিয়া রহিল, তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—ছিল। এখন নেই!

চৌধুরীর রাখাল-কাকার কথা মনে পড়িল। এই বাগ্দীর মেয়ের জন্য সকল স্নেহ-ঐশ্বর্য্য সে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

দলু কহিল—সে আসে। বৃষ্টি-বাদল হলে—রাত্রে। ঝড়ের রাতে আসে। এসে আগলে ঘা মারে—চেল্লায়!···

······আমি আগল ধরে বসে থাকি। ঢুকতে দিই না। সে আগড়ে নাড়া দেয়। ভারী জোর নাড়া। বন্ধ আগলের বাইরে হা-হা করে কাঁদে! আমি শুনি, আর বুকে হাত চেপে গুম হয়ে বসে থাকি। তাকে ঢুকতে দেবো না! সে কাঁদে···কেঁদে চেল্লায়—বাপো রে—ঝড়-বাদলে মোলেম রে! আমায় ঘরকে ঢুকতে দিবিক নে?

দলুর মুখে-চোখে যে ভাব, দেখিলে আতঙ্ক হয়!

দলু কহিল—ঐ মেঘ করচে। এখনি সে আসবে। ঝড় উঠলেই আসবে। তুই বোস, আমি আগল বন্ধ করে দিয়ে আসি।

দলু সত্যই বাহিরে গেল। আমার দেহে কাঁপন উঠিল। ভয়ের কাঁপন।

বাহিরে যাইব? পা সরে না! ভয়ে গা ছম্‌ছম্ করিতেছিল।

যদি দলু···?

খুন করা বিচিত্র নয়! ভাবিলাম, এ দুর্য্যোগে এই পাগলটার পাল্লায় আসিয়া জুটিলাম!

দলু তখনি ফিরিল, ফিরিয়া কহিল—বোস। ঐ চ্যাটাইয়ে।

বসিতে হইল। দলুও বসিল। বসিয়া উৎকর্ণ রহিল। যেন কে আসিবে—তাহারই প্রতীক্ষায়! কখন্···কখন্

আসে! কখন্ তার পায়ের ধ্বনি জাগে—তাহাই চাহিয়া!

ক্ষণ, না যুগ! সময় কাটে না। বুকের উপর মুগুর পড়িতেছিল—দুম্ দুম্ দুম্। সে শব্দ স্পষ্ট কাণে শুনিতে ছিলাম! গৃহে ফিরিবার আশা লুপ্ত,—কেবল মনে হইতেছিল, শেষ কোন্ কথাটি বলিয়া দলু কখন্ আমার ঘাড় চাপিয়া ধরিয়া সেই ছোরা!···

মনে কি হইতেছিল—বুঝাইতে পারিব না! দুনিয়াটা যেন ছোট একটা মার্বেলের মত সামনে গড়াইয়া চলিয়াছে—সীমাহীন বাধাহীন প্রান্তর-পথে!

সহসা চারিদিক কাঁপাইয়া ঝড় উঠিল। তালপাতার জীর্ণ ছাউনি মুহুর্মুহু দুলিতে লাগিল। বুঝি এখনি খশিয়া পড়িয়া যাইবে!

দলু তেমনি বসিয়া আছে। আকুল প্রাণে বাহিরের পানে চাহিয়া। যেন সেই প্রাচীন যুগের ভীম-ভয়ঙ্কর কাপালিক! আর তার পাশে আমি? বলির জীব! মাথার উপর খড়্গ যেন সমুদ্যত রহিয়াছে—প্রতিক্ষণ! কখন্ ঘাড়ে পড়ে!

সহসা দলু চীৎকার করিয়া উঠিল,—ওই ওই ওই এসেচে············আগল ঠেলচে।···যা, চলে যা······ তুই চলে যা······দূর হ সর্ব্বনাশী।

দলু যেন ক্ষেপিয়া উঠিল। ভয়ে আমি সত্যই কাঁপিলাম! বুকের মধ্যে······সে কথা কেহ বুঝিবে না।

বাহিরে উদ্দাম বায়ুর মত্ত হুঙ্কার। পাতার ছাউনি ভয়ঙ্কর দুলিতেছে।

দলু ছুটিয়া বাহিরে গেল। পাথরে ক্ষোদা পুতুলের মত আমি বসিয়া রহিলাম।

সারা পৃথিবী ইন্দ্রিয়ের স্পর্শাতীত কোন্ অদৃশ্য লোকে মিলাইয়া গেল! কতক্ষণ এমন ঘটিয়াছিল, জানি না।

যখন চোখ চাহিলাম—অর্থাৎ চেতনা পাইলাম—দেখি, ঘরে চাঁদের আলো। দলু ঘরে নাই!

ধীরে ধীরে দাওয়ায় আসিলাম। দেখি, দলু আগলের পিছনে দাঁড়াইয়া আছে! তার হাতে সেই ছোরা।

চাঁদের আলোয় চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে। এখন দেখিলে মনে হয় না, একটু আগে অমন প্রলয়-সাজে এই বিশ্বই সাজিয়াছিল।

ডাকিলাম, দলু···

দলু ফিরিয়া দেখিল। দাওয়ার কাছে আসিয়া কহিল, —গেছে। দুজনেই গেছে। দেখবি, কোথায় গেছে?

দলুর মত্ততা এখনও কাটে নাই। হাতে ছোরা। ভয়ে তার আদেশ পালন করিলাম। আমাকে লইয়া দলু আসিয়া দাঁড়াইল সেই বট গাছের পাশে।···

ছোরা দিয়া বটের মূলে মাটী খুঁড়িতে লাগিল। কি ক্ষিপ্র! হাতে যেন অসুরের বল! আমি তন্দ্রাচ্ছন্নের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম।

দলু মাটীর তলা হইতে তুলিল—কখানা অস্থি, দু-চারখানা অলঙ্কার, একটা শাড়ী, ওয়াচ ঘড়ি। ঘড়িটা সোনার তৈয়ারী।

সেগুলা আমার হাতে দিয়া কহিল—দেখ্‌চিস্!—ছাখ্, বড় মানুষ লোক—আমার মেয়ের সর্ব্বনাশ করে পালাতে চায়! বলে, বাগ্দীর মেয়েকে বিয়ে করবে কি! হুঁ:! মেয়ে তাকে তবু ছাড়বে না! দিলুম বসিয়ে এই ছোরা দুজনের বুকে! এ ছোরা রাজার ইজ্জৎ রেখেচে,আমার ইজ্জৎ রাখবে না?···কিন্তু ছাড়ে না। তবু আসে···পিছু পিছু আসে। মেয়েটা! রাতে···বাদলের রাত্রে! মাটীর নীচে থাকতে পারে না—হাঁপিয়ে ওঠে। আমি বাপ···হাজার হোক্, মেয়ে তো!······

দলু মাটীর পানে চাহিয়া রহিল।

তার পর কি করিয়া কত রাত্রে গৃহে ফিরিলাম, খেয়াল নাই।

পরের দিন ঘুম ভাঙ্গিল—তখন বেশ বেলা হইয়াছে। শুনিলাম, চৌধুরী মহাশয়ের ডাক আসিয়াছে।

গিয়া শুনিলাম, দলু প্রজা কাল রাত্রে মারা গিয়াছে। আমার সারা দেহে রোমাঞ্চ। শিরায় শিরায় রক্ত যেন স্পন্দন হারাইল। একবার মনে হইল, আমি সেখানে রাত্রে সত্যই ছিলাম? না, সে স্বপ্ন?

তাঁর সঙ্গে দলুর ঘরে আসিলাম। চারিদিকে নানা টুকি টাকি। আমার রুমালখানাও পড়িয়া আছে, দেখিলাম! স্বপ্ন তো নয়! রাত্রে আমি এইখানেই ছিলাম!

দলুর দেহ প্রাঙ্গণে পড়িয়া আছে—যেন এক বিশাল মহীরুহ ঝড়ের আঘাতে উপড়িয়া পড়িয়াছে!

টুকি-টাকি দেখিলাম। সেই গহনা···অস্থি-কঙ্কাল··· সেই সোনার ঘড়ি!

চৌধুরী মহাশয় ঘড়িটা হাতে লইয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিলেন; কহিলেন,—বাবার ঘড়ি। রাখাল-কাকাকে দিয়েছিলেন। রাখাল-কাকা ব্যবহার করতেন। ডালায় বাবার নাম লেখা।

দেখিলাম, নাম শ্রীভগবান চৌধুরী।

আমার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল। মনে হইতেছিল, সারা পৃথিবী যেন ভূমিকম্পে দুলিয়া উঠিয়াছে। প্রলয়-কম্প!···

সে তো স্বপ্ন নয়! দুর্য্যোগের পর দলুর সঙ্গে ঐ বটের মূলে গিয়াছিলাম!···

কিন্তু দলুই বা কখন্ বাড়ী গেল, গিয়া মরিল! আর আমি কি করিয়া গৃহে ফিরিলাম···

সে-রহস্য আজও বুঝিতে পারি নাই।

# প্রহসন

মা-বাপ কি নাম রাখিয়াছিলেন, জানি না। মেশের সকলে তাকে বলিত, বৃকোদর।

চেহারায় পৌরাণিক যুগের বীর-বৃকোদরের সহিত মিল আছে, এমন কথা কেহ বলিবে না। বীর-বৃকোদরের সহিত সাক্ষাৎ কাহারো না হইলেও তাঁর বর্ণনা তো পড়িয়াছি, এবং বাংলা ষ্টেজে যে-সব সাজা বৃকোদরের দেখা পাই, তাদের কাহারো সঙ্গে কোথাও শরীর-গত মিল নাই! বুদ্ধির ব্যাপার লইয়া খুব অনেকখানি প্রাচুর্য্যের সিম্বল-স্বরূপ একদা তার নাম রটিল বৃকোদর। সেই অবধি তার বৃকোদর নামটাই বাহাল রহিয়া গেল।

এ-নাম সে অবশ্য স্বীকার করিত না। মাসিকে-সাপ্তাহিকে নিত্য সে কবিতা ছাপাইত, গল্প ছাপাইত, এবং কত-কি প্রবন্ধ; সেগুলির নীচে দস্তখৎ করিত, পলাশ সেন।

আমি তখন দু'দুবার বি-এ ফেল করিয়া পাশের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া একটা মার্চেন্ট অফিসে এপ্রেন্টিশিতে ঢুকিয়াছি,—পলাশ আমার রুম-মেট্। কাগজে কাগজে রচনা ছাপাইবার ফলে বাতাসে যে ইমারৎ সে রচনা করিত, তার আদ্‌বা প্ল্যান আমার অবিদিত ছিল না—তার খুঁটীনাটী নানা বর্ণনায় আমাকে সে চকিত বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিত।

আমি নিঃশব্দে বিনা-তর্কে তার সে-বর্ণনায় সায় দিয়া যাইতাম। বেচারী! সে যদি আকাশ-কুসুম রচনা করিয়া আনন্দ পায়, তাহাতে আমার কি ক্ষতি! কাজ কি বেচারীর কল্পনার রঙীন ফানুশ নির্ম্মম আঘাতে ফাঁশাইয়া দিয়া! এই কারণেই আমার উপর তার বিশ্বাস ছিল অটল, এবং বহু সময়ে নির্ভরও যে না করিত, এমন নয়!

সেদিন শনিবার। সন্ধ্যার পূর্ব্বে অফিস হইতে ফিরিয়াছি—ফিরিয়া শেল্‌ফের উপর পলাশের জড়ো-করা এক রাশ্ বাংলা সাপ্তাহিকের মধ্য হইতে একখানা কাগজ টানিয়া পড়িতে বসিলাম। মেশের দাসী মানদা আসিয়া কাঁশিতে মুড়ি ও কচি শসা ধরিয়া দিয়া গেল; মুড়ি চিবাইতে চিবাইতে সাপ্তাহিক কাগজের দেশ-সমস্যা-সমাধানের সারগর্ভ উপায়াদির গহনে মনকে ছাড়িয়া দিয়াছি, এমন সময় পলাশ আসিয়া ডাকিল—নিতাই দা……

আমি তার পানে চাহিলাম; কহিলাম—কি?

পলাশ কহিল—তোমার কথা ভাবতে ভাবতে আসছিলুম। তুমি আজ সকাল-সকাল এসেচো—ভালোই হয়েচে!

সাগ্রহে প্রশ্ন করিলাম,—কেন বলো তো?

পলাশ কহিল—জাইগান্টিক থিয়েটারের দুখানা টিকিট পেয়েচি। পাঁচ টাকার শীট্—নতুন নাটক খুলচে, 'ঘটোৎকচ'। শুনেচি ভারি গ্র্যাণ্ড। মুটু দত্ত সাজচে ঘটোৎকচ! যাবে?

সাপ্তাহিক কাগজে এইমাত্র একালের হোমরা কবি উমাকান্ত তলাপাত্রের লেখা কবিতায় পড়িতেছিলাম—পুলকের প্লাবন! পলাশের মুখে-চোখে যেন সেই প্লাবন লাগিয়াছে! আমি কহিলাম,—কটায় থিয়েটার ভাঙ্গবে?

পলাশ কহিল—রাত একটায়। তার বেশী প্লে হবার জো নেই—জরিমানার ভয় আছে।

আমি কহিলাম—বেশ। যাবো।

পলাশ কহিল—আর একটু কথা আছে···

পলাশ তক্তাপোষে বসিল, বসিয়া পকেট হইতে একখানা সবুজ রঙের ছাপা 'প্রবেশ-পত্র' বাহির করিয়া কহিল—এই ছাখো দুটো শীট্—'প্রথম শ্রেণী'।

তার আনন্দ-গদ্‌গদ ভাব তখনো কাটে নাই! আমি কহিলাম—কিন্তু ও কি-রকম বই? ঘটোৎকচ!

পলাশ কহিল,—বুঝচো না? এই যে democratic movement দেশে চলেছে—পৌরাণিক ঘটোৎকচকে একেবারে মডার্ণ ইভলিউশনের ছাঁচে ঢালা হয়েচে কি না! প্লে দেখলেই বুঝবে। এখন যে কথা বলছিলুম—

আমি কহিলাম—বলো।

পলাশ কহিল—'গম্বুজ' সাপ্তাহিক কাগজ আছে, জানো তো! কাগজখানার আজ-কাল ভারী পশার। সেই গম্বুজের সম্পাদক হলেন নবকুমার রক্ষিত। নবকুমার-বাবুর এক সাকরেদ বক্রেশ্বর প্রামাণিক—'গম্বুজে' সে-ই নাট্য-সমালোচনা লিখতো; তার সঙ্গে নবকুমার বাবুর একটু মনান্তর ঘটেচে—একটা সমালোচনা নিয়ে। সে এক মস্ত episode—আর এক সময়ে বলবো। কাজেই নাট্য-সমালোচনা লেখবার লোক পাচ্ছে না। আমায় বলেচেন,—আমি ভার নিয়ে বসেচি। তাই এই টিকিট নবকুমারবাবু আমাকে পাঠিয়ে দেছেন।

আমি কহিলাম—ভালো। থিয়েটার দেখার সঙ্গে 'টু-পাইস' আসবে তাহলে!

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া পলাশ কহিল—পয়সা পাবো না—এ্যামেচার! তবে এর পরে সব থিয়েটারের দ্বার হবে অবারিত—ভালো শীট্, সেই সঙ্গে চা-চপ-কাটলেট—একটা অন্তরঙ্গতা! চাই কি, মস্ত একটা সুযোগ পাবো। কখনো যদি নাটক-টাটক লিখি—নয়?

থিয়েটারী-পলিটিক্সের কোনো সংবাদই রাখি না। কহিলাম,—এমনি করেই বুঝি ন্যাট্যকারের পদে আজ-কাল লোকে প্রোমোশন পায়?

হাসিয়া পলাশ কহিল,—এক-রকম তাই বৈ কি! স্টেজটাকে হাঁড়ি করবার সুযোগ মেলে! ঐ যে মনসা মিত্তির—'গন্ধমাদন' নাটক লিখে সদ্য বেনেফিট-নাইট পেলে। সে তার প্রথম জীবনে ছিল 'নাট্যামোদ' কাগজের সম্পাদক। তার কাজ ছিল, অক্টোপাশ থিয়েটারের নাট্য-সমালোচনায় মধু বৃষ্টি করা। তার ফলে অক্টো-পাশে আজ সে নাট্য-সম্রাট!

বিস্ময়ে বিমূঢ় আমি নির্ব্বাক নেত্রে পলাশের পানে চাহিয়া রহিলাম।

পলাশ আরো অনেক কথা বকিয়া চলিল। সেদিকে আমার মন ছিল না। আমি শুধু ভাবিতেছিলাম, কাল সকালে অফিসের বড় বাবুর গৃহে যাইবার কথা আছে—তাঁর ছেলেটিকে খানিকক্ষণ অঙ্ক কষাইতে হইবে—টিউটর দেশে গিয়াছে, ভালো নূতন টিউটর পাওয়া যাইতেছে না—তাই! ভাবনা হইল, রাত্রি জাগিয়া থিয়েটার দেখার দরুণ সেখানে পৌঁছিতে যদি বিলম্ব হয়! তবু……

বিনা-পয়সায় পাঁচ টাকার শীটে বসিয়া থিয়েটার দেখা—সে লোভ সম্বরণ করা কঠিন। আমার মত দশায় যাঁরা পড়িয়াছেন, তাঁরাও বুঝিবেন!

পলাশ শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। ঝীকে ডাকিয়া বামুনকে ডাকিয়া নিমেষে হৈ-চৈ বাধাইয়া দিল। পাশের ঘরের ত্রিগুণাবাবু আসিয়া কহিলেন—কি হে বৃকোদর, আমরা কি এমন দুঃশাসন হয়ে উঠেচি যে আমাদের রক্ত-পান-লোভে লালায়িত হয়ে উঠলে!

পলাশ কহিল—ঘটোৎকচ দেখতে যাচ্ছি জাইগান্টিকে।

হাসিয়া ত্রিগুণাবাবু কহিলেন—ঘটোৎকচ! তাই বলো! তাই বীর বৃকোদর এমন উচ্ছ্বসিত!

কথাটার রস সম্যক্ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া পলাশ বিস্ময়াবিষ্টের মত আমার পানে চাহিল। হাসিয়া আমি কহিলাম—তামাসা করচে। ঘটোৎকচের বাবা ছিলেন মধ্যম পাণ্ডব, বীর বৃকোদর কি না। তাই ঘটোৎকচ বৃকোদরের স্নেহের পাত্র!

## ২

ঘটোৎকচ প্লে মন্দ লাগিল না। পুরাণকে ছাঁটিয়া-কাটিয়া যে ডৌল দিয়াছে, বাহাদুরী আছে। অর্থাৎ হিড়িম্বা রাক্ষস-রাজের কন্যা—কিশোরী কন্যা। রাক্ষসগুলা জাতিচ্যুত, তাই মানুষের প্রতি তাদের বিদ্বেষের অন্ত নাই। মানুষ পাইলেই খাইয়া বসে। হিড়িম্বা তো সেই রাক্ষসের মেয়ে। সেও মানুষের যম।

বৃকোদর বনের পথে শ্রান্ত দেহ মেলিয়া এক বৃক্ষতলায় নিদ্রিত—মানুষের গন্ধ পাইয়া কিশোরী হিড়িম্বা সেই পথে আসিয়া উপস্থিত। কিন্তু খাইবে কি! দশন মেলিবামাত্র ওষ্ঠ মুদিত হইল। হিড়িম্বা মজিল! বৃকোদরের মাথা ধূলায় লুটাইতেছে দেখিয়া নিজের কোলে সে-মাথা তুলিয়া এক তরু-তলে সে বসিল—বসিয়া গজল সুরে একখানি গান বা গাহিল, সে গান, সে সুরের তুলনা নাই! কটা ছত্র মনে গাঁথিয়া আছে!

জাগ্ গো জাগ্ গো, এ দিল্ পাক্ গো
হরষ-বন্যার প্লাবন খুব-খুব!
এ বন-জঙ্গল, প্রণয়-মঙ্গল-
সায়র—তায় আজ দিই গো দিই ডুব!

গান থামিলে বীর বৃকোদর জাগিলেন, এবং জাগিয়া তিনিও একখানা গান ধরিয়া দিলেন। তারপর বাপের সঙ্গে বাধিল হিড়িম্বার দারুণ বিরোধ। ·ওদিকে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ভীমের তর্কও শেষ হয় না! এই তর্ক আর বিরোধ লইয়াই নাটক ফাঁপিয়া জমাট্ বাঁধিয়া প্রকাণ্ড কাণ্ড হইয়াছে!

যুধিষ্ঠির বলেন—সে যে রাক্ষসী!

ভীম বলেন—তরুণী! তার প্রেম! তার ভালোবাসা! ভালোবাসায় জাতি নাই, আইন নাই, নিয়ম নাই, শৃঙ্খলা নাই! চিত্ত যখন অপর চিত্তের দ্বারে কাঙাল হয়, তখন সে কাঙালকে ঘৃণা নয়, তার পাত্রটিকে পূর্ণ করিয়া দেওয়া চাই! এমনি ভালো ভালো বেশ লাগসৈ কথা! একালের সাপ্তাহিক কাগজের সম্পাদকীয় স্তম্ভে গবেষণাত্মক যত কিছু জ্ঞানের কথা নিত্য পড়ি, নাট্যকার সেগুলা আশ্চর্য্য কৌশলে এই ভীম-হিড়িম্বার মুখে গুঁজিয়া দিয়াছেন!

পটক্ষেপ হইলে উচ্ছ্বসিত আনন্দে পলাশ কহিল—একেই বলে আর্ট! পুরাণের ভীম-হিড়িম্বাকে সর্ব্বকালের নায়ক-নায়িকায় রূপান্তরিত করেচে! Eternal interest! লেখকের অদ্ভুত শক্তি।

শক্তি-সম্বন্ধে আমারো সংশয় ছিল না। শক্তি না থাকিলে 'ঘটোৎকচ' নাটকের অভিনয় দেখিতে এত লোকই বা কেন এ-থিয়েটারে আসিয়া জুটিবে?

ঘড়িতে এ্যালার্ম দিয়া রাখার ফলে পরের দিন বড় বাবুর গৃহে হাজিরা দিতে কোনো ত্রুটি ঘটে নাই। সেশান হইতে বাসায় ফিরিলাম, বেলা তখন এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে।

ঘরে ঢুকিয়া দেখি, পলাশ তার তক্তাপোষের বিছানায় পড়িয়া বুকের নীচে বালিশ ঠাশিয়া কি লিখিতেছে। পাশে এক-রাশ লম্বা স্লিপ-কাগজ। জুতা-জামা ছাড়িয়া একটা বিড়ি টানিয়া স্নান করিতে

যাইতেছি, পলাশ ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল; বসিয়া স্লিপগুলা জড়ো করিয়া ডাকিল,—নিতাইদা—

থমকিয়া দাঁড়াইলাম। পলাশ কহিল—অভিনয়ের সমালোচনা লিখলুম। তোমাকে শোনাবো।

আমি কহিলাম—ও যে অনেকখানি। নেয়ে-খেয়ে বসে শুনলে চলবে না ?

পলাশ কহিল,—না। মানে, এখনি এ কাপি প্রেশে দিয়ে আসতে হবে, ওদের কাগজ বেরোয় বুধবারে। প্রুফ দেখতে হবে। এইবেলা কাপি প্রেশে না দিলে এ-হপ্তায় ছেপে বার করা যাবে না।

নাছোড়বান্দা! আমারো একটা কৃতজ্ঞতা আছে তো! অগত্যা বসিতে হইল।

পলাশ বক্তৃতা সুরু করিল—প্রথম দিকে নাটকটাকে বুঝোবার চেষ্টা করেচি। হতভাগা দেশ! পুরোনো ভাবে আজো মশগুল! নবভাব, imagination কিছু নেই! পৌরাণিক যুগকে মডার্ণ যুগে এনে এই রূপ দেওয়ায় লেখক আশ্চর্য্য শক্তি দেখিয়েচেন! সেটুকুর তারিফ না করলে লেখকের উপর অবিচার হবে। এই ব্যাখ্যার পর অভিনয়ের সমালোচনা করেচি।

স্লিপ লইয়া সে পড়িতে যাইতেছিল। সহসা কি ভাবিয়া তাহা রাখিয়া পলাশ কহিল—আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় নিতাইদা ?

পলাশ থামিল কি মনে হয়, না বুঝিয়া আমিও তদবস্থ!

পলাশ কহিল,—ঐ হিড়িম্বা। একালের বাণী যেন মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করেছিল হিড়িম্বায়—নয় ?

আমি কহিলাম—ঐখানেই তো লেখকের শক্তি! প্রতিভা!

পলাশ যেন একটু মুষড়াইল। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল—লেখকের প্রতিভার ফলে তা ঘটে নি। এটুকু ঘটেচে শুধু তারিণীর গুণে! মিস তারিণী ছাড়া আর কেউ ও-পার্ট প্লে করতে পারতো না—এ আমি জোর গলায় বলতে পারি এবং সেই কথাই আমি এই সমালোচনায় বলেচি—অকুতোভয়ে:

তারিণী।—ও:! হিড়িম্বা'র ভূমিকায় যিনি নামিয়াছিলেন, তাঁর নাম মিস্ তারিণী!

পলাশ কহিল—আচ্ছা নিতাইদা, ঐ তারিণীকে একদম্ কিশোর বয়সের দেখায় নি ?

—তা দেখিয়েছিল।

পলাশ কহিল—অথচ ঐ জাইগান্টিকে তিনি প্লে করচেন আজ দশ বৎসর। তার আগে ব্যাবিলনিয়ানে সাত বছর, তার আগে তাজ থিয়েটারে—না, না, তাজ নয়! মধ্যে একবার ক'মাসের জন্য মনুমেণ্টালে। ও:, ওঁর সমকক্ষ অভিনেত্রী বাঙলা ষ্টেজে আর নেই। এদেশের সারা বার্ণহার্ড। উনি আবার খুব ভালো নাচতে পারেন—তা জানো! An all-round আর্টিষ্ট!

সমালোচনা রাখিয়া পলাশ কত কি বকিয়া চলিল,—অনর্গল। উচ্ছ্বাসে এমন মত্ত যে পড়ার কথা বুঝি ভুলিয়া গিয়াছে। সহসা ঘড়িতে বারোটা বাজিতে তার হুঁশ হইল। তক্তাপোষ হইতে তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া নীচে নামিয়া চাদরখানা টানিয়া গলায় জড়াইয়া সে কহিল—প্রেশের বেলা হয়ে যাচ্ছে। পড়া এখন হলো না, নিতাইদা। প্রুফ এলে তোমায় শুনতে হবে মোদ্দা, তুমিও তো প্লে দেখেচো! তোমারো দু'চারটে suggestions—মানে, যাতে সমালোচনাটুকু literary gem হয়। গম্বুজের সঙ্গে আমার সম্পর্কও ঘনিষ্ঠ হবে এই সমালোচনার জোরে। বুঝলে তো ?

বকিতে বকিতে পলাশ বাহির হইয়া গেল। আমিও নিশ্বাস ফেলিয়া কলতলায় গিয়া মাথায় জল ঢালিলাম।

৩

বৃকোদর বলিয়া বিদ্রূপ করিলে কি হইবে, পলাশ ছোকরা বাহাদুর বটে! দুমাসে নাট্যজগতে সে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। গম্বুজের সম্পাদক নবকুমার বাবু মেসের বাসায় যখন তখন তার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন; জাইগান্টিকের দেশপ্রসিদ্ধ অভিনেতা নুটু দত্ত আসিয়া অভিনয়-সম্বন্ধে তার দু-চারিটা সদুপদেশও গ্রহণ করে। তাছাড়া থিয়েটারের টিকিটই সে শুধু পায় না, নিজে চিঠি লিখিয়া ফ্রী পাশ দেয়।

অকস্মাৎ একদিন পলাশ আসিয়া আমায় বলিল—রিহার্শালে যাবে ? জাইগান্টিকে 'কুমার-সম্ভব' নাটক হবে। তাতে আমি কিছু কিছু শিক্ষা দেবো—motions, expressions....

বিস্ময়ে আমি হতভম্ব রহিলাম। রিহার্শালে যাওয়ার লোভ—তাইতো! রাজা, রাণী, মন্ত্রী, নায়ক সাজিয়া যারা আমাদের সামনে একেবারে পূর্ণ মূর্ত্তিতে আসিয়া উদয় হয়, যবনিকার অন্তরালে তাদের আসল মূর্ত্তি কেমন, কি করিয়া ঘষা-মাজায় অমন অখণ্ড সৌন্দর্য্যে গড়িয়া অনবদ্য শ্রীতে বিভূষিত হয়, তার না দেখিবার সাধ হয় ? কহিলাম,—যাবো।

পলাশ কহিল—ঠিক সাতটায় তৈরী হয়ে নেবে।

রিহার্শালে গেলাম। 'ঘটোৎকচে' যেটুকু শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম জাগিয়াছিল, তাহা রক্ষা করা কঠিন হইল! সেদিনকার সেই ভাবময়ী কিশোরী হিড়িম্বা—স্ব রূপে তাকে চেনা দায়। স্থূল দেহ! মুখে-চোখে কদর্য্য ভঙ্গী, মলিন বর্ণ—একখানা বেঞ্চে বসিয়া বিড়ি খাইতেছিল—পাশে

একটা শালপাতার ঠোঙায় ক'খানা কচুরি, ফুলুরি, ব্যঞ্জন প্রভৃতি।

পলাশের খুব খাতির দেখিলাম। ষ্টেজে চড়িবামাত্র হিড়িম্বা উঠিয়া মস্ত বাক্স খুলিয়া পাণ দিল, সেই সঙ্গে জর্দ্দা। তাকে ঘিরিয়া ম্যানেজার প্রভৃতির নানা প্রশ্ন!

পলাশ ডাকিল,—রতি কোথায়? রতি! শুনে যাও ··

হিড়িম্বা ওরফে তারিণী কহিল—যাচ্ছি মশাই! একটু সবুর করুন।

মুখে সে একখানা বড় কচুরি পূরিয়া দিয়াছিল। কথা তাই অপূর্ব্ব সুরে ধ্বনিয়া উঠিল।

আমি বিস্মিত হইলাম। এই রতি! বিশ্বের ললামভূতা, চির-যুগের মানসী প্রতিমা রতি!

রতি আসিল। পলাশ তাকে বিবিধ ভঙ্গী দেখাইতে প্রবৃত্ত হইল। আমি পাশ কাটিয়া সরিয়া পড়িলাম।

অভিনয়-রাত্রে পলাশের সঙ্গে জাইগান্টিকে হাজির হইলাম। আমায় ভালো শীটে বসাইয়া পলাশ চলিয়া গেল, বলিল—বসো। ভিতরে গিয়ে একবার দেখে আসি—বিশেষ রতির বেশ-ভূষাটুকু আমি না দেখলে চলবে না।

যথাসময়ে অভিনয় সুরু হইল। বাঁধিয়া-ছাঁদিয়া নিজেকে যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করিলেও রতির দেহ আমার চোখে কদর্য্য ঠেকিতেছিল। যেন ফাটা-ছেঁড়া টায়ারের মধ্য হইতে টিউবটা ঠেলিয়া আসিতেছে! পলাশকে সে-কথা বলিলাম।

পলাশ কহিল—তোমার ভুল। তার পর imagination, বিভ্রম, expression, সারা বার্ণহার্ড, নাজিমোভা, টেম্পো প্রভৃতি আরো বহু অসংলগ্ন কথার শেষে কহিল,—মনকে train করতে হবে। দেহের কথা ভুলে একেবারে তার মধ্যে প্রবেশ করা চাই। যাকে বলে, inner soul!

কিছু বুঝিলাম না। বিনা পয়সায় অভিনয়ই দেখি, তার আর্ট কোথায়—বুঝি না। আদার ব্যাপারী! কাজেই নিঃশব্দে বসিয়া অভিনয় দেখিতে লাগিলাম।

অভিনয় ভাঙ্গিলে বাসায় ফিরিলাম। কুঁজা হইতে জল গড়াইয়া পান করিলাম; পানান্তে শুইয়া পড়িব, দেখি, পলাশ গুম্ হইয়া বসিয়া আছে! কহিলাম—শোবে না?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া পলাশ ডাকিল—নিতাইদা···

আমি কহিলাম—কেন?

পলাশ চুপ করিয়া রহিল—ক'সেকেণ্ড মাত্র! তার পর কহিল—একটা জিনিষ লক্ষ্য করেচো কি না জানি না! তাই জিজ্ঞাসা করচি···

কহিলাম—কি?

পলাশ আমার পানে চাহিল। যেন ভূত দেখিয়াছে, এমনি তার মুখের ভাব! পলাশ কহিল,—যখন অভিনয় হচ্ছিল, তারিণীকে লক্ষ্য করেছিলে?

লক্ষ্য! প্রশ্নটা ঠিক বুঝিলাম না। কহিলাম—কি লক্ষ্য?

পলাশ মৃদু হাসিল। হাসিয়া কহিল—আমার পানে থেকে-থেকে উদাস চোখে চাইছিল···

বুকের মধ্যে কি যেন ধ্বক্ করিয়া উঠিল। পলাশ এ বলে কি! ঐ চল্লিশ বৎসর বয়সের ঢ্যাপ্‌শা অভিনেত্রী···

পলাশ কহিল—আমি expression বাৎলে না দিলে ও আর কোনো বইয়ে নামবে না, বলেচে! বলে এত দিন অভিনয়ের কিছুই জানতো না—আমার কৃপাতেই এখন শিখেচে। অর্থাৎ আমার কৃপায়—বুঝলে?

একটা নিশ্বাস কোথা হইতে আসিয়া আমার বুকের মধ্যে ঘূর্ণী রচিয়া তুলিল। দম্ যেন বন্ধ হইয়া যাইবে! শিহরিয়া পলাশের পানে চাহিলাম।

পলাশ কহিল—বেচারী হতভাগিনী পতিতা। সে চুপ করিল। তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—এই রতির পার্টটা আমিই ওকে শিখিয়েচি। ভারী নম্র—এত বড় অ্যাকট্রেস—তা এতটুকু অহঙ্কার নেই—শিশুর মত সরল! আর শেখবার কি প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা!··· পলাশ থামিল; থামিয়া চকিতের জন্য কি ভাবিল, ভাবিয়া আবার কথা কহিল,—আমার 'বৃকোদর' নামটা কি রকম করে ও শুনেচে! একটু রহস্যচ্ছলে বলছিল,—আপনার কাছে শিক্ষা আদায় করবার দাবী আমার আছে, পলাশ বাবু! আমি বললুম—কেন? তাতে একটু হেসে আমায় বললে—যেহেতু আমি হিড়িম্বা, আর আপনি বৃকোদর! বৃকোদরের সঙ্গে হিড়িম্বার কি সম্পর্ক ছিল, বলুন তো? কথাটা বুঝলুম। বুঝতে আমার ভারী লজ্জা হলো। তারিণীও এ-কথা বলে একতিল দাঁড়াতে পারলো না—ছুটে আমার সামনে থেকে সরে গেল।···

আমার বুকের মধ্যে রাজ্যের যত নীতি-কথা ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। এমন প্রচণ্ড ভিড় যে কোনো কথা বাহির হইবার পথ আর খুঁজিয়া পায় না! কাজেই আমার সেই যথাপূর্ব্ব ভাব—অর্থাৎ হতভম্ব!

আমার কথা কহিবার প্রয়োজন ছিল না। তার অবসরও বোধ হয় মিলিত না। পরক্ষণেই পলাশ কহিল—তার পর যখন ফিরে এলো, যেন নতুন মানুষ! একটু আগে যে-কথা সহসা বলে ফেলেছিল, তার একটু ছায়াও তার মনের কোণে লুকোনো নেই! আশ্চর্য্য সারল্য!

পলাশ উদাস নয়নে খোলা জানালার মধ্য দিয়া বাহিরে আকাশের পানে চাহিয়া রহিল। দেখি, সারা আকাশ তখন জ্যোৎস্নায় ভরিয়া গিয়াছে।

চাহিয়া চাহিয়া পলাশ একটা নিশ্বাস ফেলিল তার পর কহিল—মানুষকে ঘৃণা করা পাপ—সকল অবস্থাতেই। মানুষমাত্রেই নারায়ণ—এ-কথা আমাদের শাস্ত্রে আছে। নয়?

কহিলাম—হ্যাঁ, শাস্ত্রে ঐ কথাই ঠিক আছে।

পলাশ চুপ করিয়া রহিল—আমিও। ঘুম পাইতেছিল; কিন্তু এ-সব কথায় এমন উত্তেজনা আছে, ভাবিলাম, না, এখন ঘুম নয়, ঘুমকে জয় করা চাই।

পলাশ আবার কথা কহিল, বলিল—ভালোবাসা পাপ নয়—এ-কথাও আমাদের শাস্ত্রে বলে!

আমি কহিলাম—তা বলে।

—তবে?…

ছোট্ট প্রশ্ন! প্রশ্নটা করিয়া পলাশ আবার ধ্যানস্থ না হোক্, ধ্যানীর মত স্তব্ধ হইল।

পলাশের শাস্ত্র-জ্ঞান সহসা প্রবল হইতে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম!

কিন্তু বিস্ময়ের কি-বা আছে? আমার বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ বৎসর। বিবাহ না করিলেও প্রেম, ভালোবাসা—এগুলার অর্থ বুঝি। কথাগুলা কেমন যেন বেমানান ঠেকিতেছিল! এ কালের সাহিত্য খুব মন দিয়া পড়ি—ইহাদের লেখায় কাপট্য নাই, মিথ্যাচার নাই—খাঁটী কথাই আগাগোড়া লেখেন! এঁদের রচনার প্রতি ছত্র পাঠ করিয়া উচ্ছ্বসিত হই! সেই সঙ্গে মন চীৎকার করিতেচায়,—ঠিক, ঠিক, ঠিক কথা! ভাঙ্গো, ভাঙ্গো প্রাচীর কাটো বাঁধন!

নেহাৎ মার্চেণ্ট অফিসের ক্ষুদ্র এপ্রেণ্টিশ,—কোথাও কারো গৃহে প্রাচীর ভাঙ্গিতে, বা বাঁধন কাটিতে গেলে পাছে অনর্থ ঘটে, এই আতঙ্কে মনের বেদনা মনের কোণে নির্জীব হইয়া মাথা গুঁজিয়া নুইয়া পড়ে, আর চোখের সামনে রাজ্যের বিভীষিকা সরীসৃপের মত কিলবিল করিতে থাকে!

## ৪

দু'চারিদিন পরে সারা আকাশের রঙটাই যেন বদলাইয়া গেল! বৃষ্টিতে কলিকাতার রাস্তাগুলা জলে জলময় হইয়া উঠিয়াছে। সদ্য একখানা মাসিক পত্রে কাশ্মীরের ভৌগোলিক রাজধানী শ্রীনগরের ছবি দেখিয়াছিলাম। আমার মনে হইতেছিল, এই কলিকাতা সহর সহসা যেন সেই শ্রীনগরে রূপান্তরিত হইয়াছে! জলের কোলে বাড়ীগুলা যেন সেই কাশ্মীরী হাউসবোট!

পথের জল ভাঙ্গিয়া হাঁটিয়া আসার ফলে মাথা টিপ্-টিপ্ করিতেছিল। মানদা দাসীর খোসামোদ করিয়া সামনের দোকান হইতে নগদ এক আনা মূল্যে দু'পেয়ালা চা আনাইয়া গলাধঃকরণ করিয়া আপাদমস্তক মুড়িয়া তক্তাপোষে বসিয়া আছি, বাহিরে তখনো ঝুপঝুপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, এমন সময় চোরের মত পলাশ আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল, ডাকিল,—নিতাই-দা……

—কে? পলাশ!

—হাঁ।…বসে আছো যে!

কহিলাম—শরীরটা ভালো নেই!

পলাশ কহিল—তাইতো!

পলাশ আসিয়া তক্তাপোষে বসিল। আমি কহিলাম—কাল সন্ধ্যা থেকে কোথায় ছিলে?

আগের সন্ধ্যা হইতে পলাশের কোনো পাত্তা ছিল না। দু'চারিবার মনে কেমন অস্বস্তি জাগিয়াছিল। কিন্তু মিছা অস্বস্তি! কত দিকে তার কত কাজ! ভবিষ্যৎকে রাঙাইয়া তুলিবার জন্য তুলি-হাতে চারিদিকে রঙ খুঁজিয়া ফিরিতেছে! আমি এক নগণ্য এপ্রেণ্টিস!

তবু কহিলাম—কোথায় ছিলে কাল থেকে? দেখা নেই—খপর নেই!

মাথা নাড়িয়া পলাশ মৃদু হাসিল, কহিল-একটু episode হয়ে গেছে।

Episode! চমকিয়া তার পানে চাহিলাম।

পলাশ কহিল,—মানে, সেই এক দিন আভাসে একটা কথা জানিয়েছিলুম…

একটা কথা? পলাশ তো আভাসে আমায় একটা কথা জানায় নাই। বহু, বহু কথা জানাইয়াছে। তার মধ্যে কোন্‌টাকে ইঙ্গিত করিতেছে?

কহিলাম—কি কথা—বলো তো? মনে পড়চে না।

মৃদু হাস্যে পলাশ কহিল—মানে, ঐ তারিণী-সুন্দরীর কথা।

তারিণী! বদ চেহারার সেই অভিনেত্রীটা! আঃ—vulgar!

মুখের কথায় সে-ভাব অবশ্য প্রকাশ করিলাম না… উৎকর্ণ বসিয়া রহিলাম।

পলাশ কহিল—আমার প্রতি তারিণীর সেই……

কি—পলাশ নিজেও চট করিয়া বলিতে পারিল না। আমার অধীরতার সীমা নাই। সে-অধীরতা বুঝি চোখের দৃষ্টিতে প্রকাশ পাইয়াছিল। সোৎসাহে পলাশ কহিল—সে আমায় ভালোবাসে, নিতাই-দা! বুঝেচো? আমায় পাশে চায় সাথী, বন্ধু-হিসাবে!

বিস্ময়ে আমার দুই চোখ বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। আমি কহিলাম—ভালোবাসা?

পলাশ কহিল—আমায় বলছিল, অভিনয় কি বস্তু, তার ইঙ্গিত পেয়েচে সে আমার কাছে। তার আগে অভিনয়ের নামে যে-বস্তু ষ্টেজে চালিয়ে এসেচে,—তা ছেলেখেলা, নিছক ফাঁকি।

অর্থাৎ? পলাশ নিজেই অর্থ বলিল,—বাঙলা ষ্টেজে renaissance-এর যুগ চলিয়াছে। নূতনে-প্রাচীনে প্রবল সংঘর্ষ! এ সংঘর্ষে প্রাচীনের যত ফাঁকি, যত ধাপ্পা, সব ভাঙ্গিবে। নূতন-দলের বিরাট শক্তি, বিপুল আর্টিষ্টিক জ্ঞান···

এমনি বড় বড় কথায় সে যেন ঝড় বহাইয়া দিল। ও-কথার ধার ধারি না। পূর্ব্বে এক টাকায় টিকিট কিনিয়া কচিৎ কখনো থিয়েটার দেখিতাম—এপ্রেন্টিসিতে ঢুকিতে সে-বালাই ঘুচিয়াছে। নেহাৎ সখ জাগিলে চার আনা ফেলিয়া সিনেমায় যাই—তাও ন'মাসে, ছ'মাসে। এখন পলাশের কল্যাণে ফ্রী-পাশ। আর্ট, রস, মস্কো, কাচালভ্—ও-সবের ধার ধারিতে চাহি নাই কোনোদিন।

পলাশের কথার মর্ম্ম এই—নূতন দলের জলদবরণী, ঘৃতাচীবালা, মন্দাকিনী অভিনেত্রীদের কীর্ত্তি রটাইতে কখানা সাপ্তাহিক আদা-জল খাইয়া লাগিয়া গিয়াছে। নিত্য নব-নব সাপ্তাহিকের আবির্ভাব হইতেছে। বেচারী তারিণী ভড়কাইয়া গিয়াছে, কাগজের সমালোচনার ধার কোনোদিন সে ধারে নাই, এমনিতে বড় হইয়া উঠিয়াছে! আজ তাকে অভিনয় শিখাইয়া, তার অভিনয়ের সূক্ষ্ম রসকে সর্ব্বসাধারণকে বুঝাইয়া তাকে যশের মঞ্চে খাড়া রাখিতে হইবে···

তাই সে পলাশের সাহায্য চায়। এত বড় গুণী, নাট্যরসে সুরসিক একজন এমন বন্ধু পাশে থাকিলে তারিণী আজও নাট্যজগতের একচ্ছত্রা সম্রাজ্ঞী থাকিতে পারিবে! তার সিংহাসন কাড়িবার শক্তি জলদবরণী-দলের হইবে না। এমনি প্রকাণ্ড কাহিনী বিবৃত করিয়া পলাশ বলিল—কাল থিয়েটার ভাঙ্গলে তারিণী নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেল তার বাড়ীতে। মনের যত কথা নিবেদন করে আমার পায়ে মাথা রাখলো···

বাধা দিয়া আমি কহিলাম—তুমি সেখানে গেছলে! তার বাড়ীতে?

একটা কটু বিশেষণে তারিণীকে অভিহিত করিতে যাইতেছিলাম। পলাশ বুঝিয়াছিল। বুঝিয়াছিল বলিয়াই সে কখিয়া উঠিল, কহিল—চুপ! সকলকে এক কোঠায় ফেলো না নিতাই-দা! তুমি জানো না! তারিণী,—She has a great mind and artistic refinement! তার culture···

বাধা দিয়া কহিলাম, কিন্তু সে···

পলাশ কহিল—না, সে আর্টিষ্ট! তাছাড়া আমি তাকে ভালোবাসি।

—ভালোবাসো! ঐ huge uncouth body! একটা মাংসপিণ্ড···

পলাশ কহিল—দেহ অতি তুচ্ছ! দুদিনে জরায় জীর্ণ হয়! এ দেহের মধ্যে আছে যে-মন—বিশেষ, তারিণীর অন্তর···তা ঠিক···তা···

আমার মন কেমন ঝাঁজিয়া উঠিয়াছিল। নব-সাহিত্য-শিল্পের অত সাধনাতেও মনের আদিম বর্ব্বর সংস্কার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। আমি কহিলাম—পাঁকের বুকে পদ্ম—এই কথা বলতে চাও?

পলাশ কহিল—তাই!

বৃথা তর্ক! তবু পলাশকে বুঝাইলাম—নাট্য-শিল্পের উন্নতি চাও, ভালো কথা। উন্নতি করো। তাদের উপদেশ দাও, শিক্ষা দাও। তা বলিয়া অন্তরের গোপন কথা শুনিবার জন্ম নিমন্ত্রণ গ্রহণ···

পলাশ যেন ক্ষেপিয়া উঠিল! কহিল,—মাপ করো নিতাই-দা—তুমি এ বুঝবে না। এ হলো intellectual companionship.—এর অভাবে বাঙালী জাতটা যে-তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেল। হীন সংস্কারের বাঁধন আজো কেটে উর্দ্ধে উঠতে তুমি পারলে না! এই দরদের অভাবেই বাঙলার ললিত-শিল্পকলা আজ রসাতলে যেতে বসেচে!

সেই পলাশ! দেশের বীর বৃকোদর! 'পযুজ' কাগজে দু'দিন নাট্য-সমালোচনা লিখিয়া উদারতার পরাকাষ্ঠায় সেও মহাত্মাকে ছাপাইয়া যাইতে চায়! কাল্‌চারের এমন শক্তি! বিস্ময়, শ্রদ্ধা—নানা বৃত্তির স্পর্শে মনটা কিম্ভূত কি-একটা-কি হইয়া গেল!

পলাশ কহিল—আমি তারিণীকে সাহায্য করবো—কথা দিয়ে এসেচি।

কিছুক্ষণ নীরবে তার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। তার পর কহিলাম—উত্তম!

পলাশ কহিল—যে ব্রত গ্রহণ করেচি, তাকে সফল করবোই। এর জন্য আত্মীয়-বন্ধুর বিরাগ, ঘৃণা যদি শিরোধার্য্য করতে হয়—হঠবো না! রিফর্ম্মাররা চিরদিন বিরাগ সয়েচেন—তবু ব্রতভঙ্গ করেন নি! আমারো moral courage-এর অভাব কখনো হবে না, আশা করি।

পলাশ উঠিয়া টেবিলের উপর হইতে কখানা কাগজের স্লিপ লইয়া ফাউণ্টেন পেন হাতে করিল।

আমি ডাকিলাম—মানদা···

মানদা আসিল। আমি কহিলাম—আদা আছে?

—আছে!

—কখানা কুচিয়ে দাও তো। সর্দ্দির মত হয়েচে! আদায় উপকার হবে।

মানদা কহিল—একখানা ঐ ঠ্যালা গাড়ীতে এলেই পারতে দাদাবাবু। তা না, হেঁটে জল ভেঙ্গে আসা! জ্বর হলে এই বিদেশ-বিভুঁয়ে কে দেখবে, বলো দিকিন্? মায়ের বাছা! হুঃ!

মানদা এমন শাসন মাঝে-মাঝে করে। দশ টাকা মাহিনা পায়, সত্য—কিন্তু বেইমান নয়!

৫

পলাশের সহিত অন্তরঙ্গতায় বাধা পড়িল। সন্ধ্যার পর আর তার দেখা মেলে না। পাঁচজনের মুখে শুনি, নাট্য-জগৎটায় উলট-পালট না ঘটাইয়া সে ছাড়িবে না! সেই কাজে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গিয়াছে!

তার শেল্‌ফে রাজ্যের কাগজ আসিয়া জড়ো হয়। টানিয়া তার একখানার পাতা খুলিয়া তাহাতে চক্ষু বুলাই। অন্য কাগজওয়ালারা গম্বুজকে গালি দেয়—বলে, 'গম্বুজ না জাম্বুবান'! এবং ইহা লইয়া পাঁচ ছ—কলম গালি বিদ্রূপে ভরিয়া অসঙ্কোচে সে রচনা কাগজে ছাপায়—তাহাতে পলাশকেও নাম ধরিয়া যা-খুশী বলে—সে-সব পড়ি। অফিসের কলম-পেশা কাজের পর এ-সব গালি-কুৎসা পড়িয়া আরামও পাই না, এমন নয়!

সেদিন দেখি, 'গম্বুজে' একটা সনেট বাহির হইয়াছে—পলাশের লেখা। জাইগান্টিকে নূতন অপেরা 'পরীরাণী'তে তারিণী নায়িকা সাজিয়াছিল; তাকে লক্ষ্য করিয়া লেখা। পলাশ লিখিয়াছে—

চেনে না জানে না যারা তোমার অন্তর—
তারা জানে, তুমি শুধ্ স্থূল কলেবর!
তা হ'লে কি হয়? কিন্তু মনখানি তব
নাট্য-রসে ডুবু-ডুবু! ভাব নব-নব
বুদ্বুদের সম তায় নিত্য দেয় দেখা—
হীরা-চুনী-সমতুল জ্যোতিষ্কের রেখা!
দেখা দিলে সদ্য এই পরী-রাণী-বেশে—
চরণে চটুল নৃত্য, ছন্দ এলোকেশে,
অধরে হাসির ঝর্ণা—পল্লবিনী লতা!
কেমনে বাখানি লীলা? না জুয়ায় কথা!
লোকে বলে, জন্ম তব গণিকার কুলে—
সে যে দৈব-ঘটনা গো, বিধাতার ভুলে!
মলিন যে-পঙ্ক দেখি' কুঞ্চনাই নাসা—
জন্মে তায় পদ্মফুল—রূপে-বাসে খাশা!

সাহিত্যে একটা কথা দেখি, শিহরণ! আমার প্রাণে-মনে সাহিত্যের সেই শিহরণ জাগিল! নাট্যশিল্প এমনি সনেটে গৌরব-গর্ব্বে আকাশ স্পর্শ করিবে নিশ্চয়! 'গম্বুজ' ফেলিয়া 'নাটের হাট' কাগজ খুলিলাম। প্রথমেই 'নাট্য প্রসঙ্গ'। তাহাতে দেখি, সুস্পষ্ট ভাষায় লিখিয়াছে, পলাশের সহিত তারিণীর ঘনিষ্ঠতার কথা। আরো লিখিয়াছে,—'গুজব শুনিতেছি, শ্রীমতী তারিণী নাকি অপরাহ্ণ-বেলায় বদ্ধ হইবেন এবং এ-বন্ধনে যাঁহাকে বাঁধিবেন, তিনি···নামটা প্রকাশ করে নাই—নামের জায়গায় কটা ফুট্‌কি বসাইয়া মন্তব্য করিয়াছে,—'বাঙলার রূপ-বাণী যাঁর লেখনীতে মূর্ত্তি ধরিয়াছে, তাঁহাকে!'

শরীরে সত্যই রোমাঞ্চ ঘটিল। দুনিয়া ঘুরিতেছে, ছেলেবেলায় ভূগোলে পড়িয়াছিলাম—সে-ঘোরার কোনো পরিচয় এ যাবৎ পাই নাই! এখন এই 'নাট্য-হাটের' নাট্য-প্রসঙ্গ-পাঠে সে-ঘূর্ণন প্রত্যক্ষ অনুভব করিলাম। বুঝিলাম ভূগোলের কথা মিথ্যা নয়, দুনিয়া সত্যই ঘুরিতেছে। নহিলে এই তক্তাপোষ, দেওয়াল, জানালা-দরজা—এ-গুলা এমন দুলিবে কেন?

কাগজ রাখিয়া শুইয়া পড়িলাম। চক্ষু মুদিয়া পলাশের কথা ভাবিতে ছিলাম। কোথায় গৃহ! সে গৃহে মা-বাপ, ভাই-বোন কে আছে, জানি না। পয়সার স্বচ্ছলতা কেমন, তাহাও অবিদিত। সহরে আসিয়া কাগজ লিখিয়া বেড়ায়—থিয়েটারের ষ্টেজে জীবনের সমস্ত ভবিষ্যৎ সঁপিয়া দিয়াছে! তা দিক্! কিন্তু ঐ তারিণী! সেই বিপুল-কলেবরা অভিনেত্রীর কথা মনে জাগিল। ষ্টেজে বসিয়া বিড়ি টানিতেছিল—পাশে ঠোঙায় কতকগুলা কচুরি আর কুমড়ার ঘাঁট। কচুরি খাওয়ায় অপরাধ হয় না, তবু···কেমন কদর্য্যতা!

গা কেমন নিশ্‌পিশ্‌ করিয়া উঠিল। নিঃসঙ্গতা অসহ্য বোধ হইল। পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ চকিতে সরিয়া এমন বিশ্রী কদর্য্যতায় সে ভরিয়া উঠিল! খোলা-জানালার বাহিরে ঐ নীল নির্ম্মল আকাশ—সে আকাশে যেন কালো কালির স্রোত বহিয়া চলিয়াছে! সে কালিতে চারিদিক একেবারে কালো হইয়া গিয়াছে!

ঘরের বাহিরে আসিলাম। দেখি, ত্রিগুণা বাবু! সজ্জিত বেশে বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন।

কহিলাম,—কোথায় চলেছেন?

ত্রিগুণা বাবু কহিলেন—সিনেমায়।

কহিলাম—দাঁড়ান। আমি যাবো।

ত্রিগুণা বাবু কহিলেন—আমার সঙ্গে গেলে চার আনার শীট্ কিন্তু।

আমি কহিলাম—বটে! আমায় কি এমন গদিদার রাজ-চক্রবর্ত্তী দেখলেন যে চার আনার শীটে বসতে কুণ্ঠিত হবো, ভাবচেন! আমার দৌড় ঐ চার আনা অবধি।

ত্রিগুণা বাবু কহিলেন—বৃকোদরের সঙ্গে গেলে পাঁচ টাকার শীট্ মেলে।

কহিলাম,—সে ভিক্ষার দান!

বায়োস্কোপ হইতে ফিরিলাম—রাত্রি প্রায় বারোটা।

ফিরিয়া দেখি, ষ্টাচুর মত কে বিছানায় বসিয়া! সে পলাশ!

বিস্মিত হইলাম। কহিলাম,—আজ রিহার্শাল নেই?

পলাশ কহিল—না। তার স্বর তীব্র। রাজ্যের আক্রোশ যেন সে স্বরে মিশানো!

বিস্ময় বাড়িল। জামা খুলিয়া দড়ির আনলায় ঝুলাইয়া রাখিতেছিলাম।

পলাশ ডাকিল—নিতাই-দা—

তার স্বর আর্দ্র। তার পানে ফিরিয়া চাহিলাম।

পলাশ কহিল,—এরা এত বড় বেইমান! এমন বিশ্বাসঘাতক! তোমার কথাই দেখচি ঠিক।

কহিলাম—কাদের কথা বলচো?

পলাশ কহিল—ঐ তারিণী···

—কি হয়েচে?

পলাশ কহিল—থিয়েটার থেকে ছুটী নিয়েছিল। তাও আমার চেষ্টায়। আমি একখানা নাটক লিখেচি—'সংযুক্তা'। সে বই জাইগান্টিকে প্লে করবার জন্য ওরা নিয়েচে। তাতে তারিণী সাজবে 'সংযুক্তা'। সে বই রিহার্শালে পড়বার আগে সে একমাস ছুটী নিয়েছিল—মানে, শরীর সারাতে।

পলাশ থামিল; পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—কথা ছিল, আমার সঙ্গে রাঁচি যাবে। আমিও যাবো। সেখানে খোলা জায়গায় নিরালায় সংযুক্তার পার্টটা রীতিমত ষ্টাডি করবে, আমার কাছে expressions গুলো শিখবে। পরশু যাবার কথা। ডাকবাঙলোয় গিয়ে উঠবো—উঠে একখানা বাঙলো দেখে নেবো। সব ঠিক। লেখার মূল্য হিসাবে আড়াইশো টাকা নগদ পেয়েছিলুম। তার কাছেই সে টাকা গচ্ছিত রেখেছিলুম।

এইটুকু বলিয়া পলাশ যেন হাঁফাইয়া পড়িল। একটু থামিয়া দম লইয়া আবার বলিল,—আজ নিত্যকার মত থিয়েটারে গিয়েছিলুম। গিয়ে কি শুনলুম, জানো?

গভীর আগ্রহে প্রশ্ন করিলাম,—কি?

পলাশ একটা নিশ্বাস ফেলিল। সে নিশ্বাস নয়, ঝড়! পলাশ কহিল—তারিণী ঘাটশীলা গেছে। থিয়েটারে কাজ করে হারাণ। চীফ্ গার্ড। একটা লক্কড় হতভাগা—মাতাল—চোর! তার সঙ্গে তারিণী চলে গেছে। সেখানে মাসখানেক থাকবে! অথচ··

পলাশের দুই চোখে জল ছাপিয়া আসিল। আমি কহিলাম—এতে দুঃখ কি?

পলাশ কহিল,—দুনিয়ায় প্রেম না থাক্—কৃতজ্ঞতাও নেই? ঐ তারিণী! কত সেধে আমায় দিয়ে কত সুখ্যাতি লিখেয়েচে গম্বুজে। তামাসা করে অনেকে বলতো, কাগজের নাম পাল্টাও, পাল্টে নতুন নাম দাও, —'তারিণী'। সে সব নিন্দা বিদ্রূপ আমি গ্রাহ্য করিনি!

নৈরাশ্যের বেদনায় পলাশ যেন ভাঙ্গিয়া গলিয়া পড়িল! আমি ডাকিলাম—পলাশ—

ঝড়ের মত আর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া পলাশ কহিল,—আমিও শোধ নেবো। ঐ সংযুক্তা নাটকে নায়িকার পার্ট দেওয়াবো—পার্ব্বতীকে। সখী সাজে—সাজুক। কুছ্ পরোয়া নেই! তারিণী দেখবে সে অভিনয়। আর দেখবে, আমার তৈরী করবার শক্তি কতখানি!

কথাটা বলিয়া পলাশ গুম্ হইয়া রহিল। আমি তাকে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করিলাম, করিয়া ডাকিলাম—পলাশ···

পলাশ আমার পানে চাহিল।

আমি কহিলাম,—ও-সব ছেড়ে একটা চাকরি-বাকরি···

বাধা দিয়া পলাশ কহিল—পাগল! বাঙলার নাট্য-জগৎ তাহলে রসাতলে যাবে! তা হয় না নিতাই-দা। আমার জীবনের যা ব্রত···

অপরাধ করিয়াছি, বুঝিলাম। প্রাণ যার এতখানি রস-শিল্প-সম্ভারে পরিপূর্ণ, তাকে বলি চাকরি করিতে! মার্চেন্ট অফিসের নগণ্য এপ্রেন্টিস্! আমি! স্পর্দ্ধা বটে!

কুঁজা হইতে জল গড়াইয়া পান করিলাম; তার পর বিছানায় দেহ-ভার এলাইয়া দিলাম।

একবার শুধু পলাশের পানে চাহিলাম। দেখি, সে চেতনা পাইয়াছে। পাইয়া কাগজ আর ফাউণ্টেন পেন লইয়া বসিয়াছে—নিশ্চয় কবিতা লিখিবে! নৈরাশ্যের এত বড় বেদনা,—বাঙলা দেশ ও বাঙালীকে সে-বেদনার পরিচয় না দেওয়া তার জীবনের ব্রত···

ঘুমে চোখ আচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছিল। চক্ষু মুদিলাম। কাল অফিস আছে, রোমান্সের চর্চ্চা আমার সাজে না!

---

# সঙ্কেতিকা

এ-কাহিনীর গোড়ার দিকে কোনো নূতনত্ব নাই, বৈচিত্র্য নাই,—সেই মামুলি ধরণ।

অর্থাৎ বহু উদার-চিত্ত পিতার মত ধনগোপালের পিতা মৃত্যু-কালে কিছু টাকা-কড়ি রাখিয়া গিয়াছেন; কাজেই বি, এ ফেল করিয়া ধনগোপাল পুনরায় কলেজের ফটকে মাথা গলাইবার প্রয়োজন বোঝে নাই। মনের আনন্দে কবিতা লিখিয়া বেড়ায়। সে-কবিতা মাসিক কাগজে ছাপা হয়; তবে নিজের নামে নয়। ধনগোপালের বিশ্বাস, পিতৃ-দত্ত নামে charm নাই—কবিতার সঙ্গে সে-নাম আঁটিয়া দিলে লোকে তার কবিতা পড়িবে না! তাই সে ছদ্ম-নাম লইয়াছে,—পাপড়িবরণ হাজরা। কবিতার খ্যাতি কতখানি রটিয়াছে বলিতে পারি না, তবে পাপড়িবরণ নামটা আজ মাসিক-পত্রের পাঠক-পাঠিকার অবিদিত নয়।

কবিতা-রচনায় ধনগোপাল ওরফে পাপড়িবরণের নিষ্ঠা খুব। অর্থাৎ দুনিয়া হইতে ফুল-ফল, নদী-নির্ঝর, পাখী-হরিণ,—এ সব একদম ছাঁটিয়া দিয়াছে। তার কবিতার কারবার শুধু তরুণী নারীকে লইয়া! তরুণীর হাসি, চাহনি, কথা—এ সব লইয়া বহু কবি বহু কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। পাপড়ি কবিতা লেখে তরুণীর মাথার কাঁটা, চুলের ফিতা, স্নো, ক্রীম, নাগরা জুতা—এই-সব লইয়া। একশ্রেণীর পাঠক-পাঠিকা পায় নাই, এ কথা যদি কেহ মনে করেন, তবে তাহা ভুল। কিন্তু তার কবিতার বিশ্লেষণ বা প্রতিভার পরিচয় দিবার উদ্দেশ্য আজ আমাদের নাই। কাজেই এ বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন দেখি না।

সন্ধ্যা হয়-হয়। কচি-কাঁচা মাসিকের অফিস হইতে বাহির হইয়া ধনগোপাল আসিয়া ট্রামে চড়িল; সঙ্গে ভূষণ। ভূষণ কচি-কাঁচার সহকারী সম্পাদক; গল্প লিখিয়া নাম কিনিয়াছে। তার লেখা গল্পে নারীর দল অসঙ্কোচে এমন সব কাজ করিয়া বেড়ায়,এমন হল্লা তোলে যে পাঠকের দল পড়িয়া হাঁ করিয়া ভাবে, কবে সে লেখা সার্থক করিয়া বাঙলার নারী সঙ্কোচের ভারী-পাথর দূরে ঠেলিয়া মুক্ত পথে অমনি অবাধ আনন্দে বিচরণ করিবে! তার লেখা পড়িয়া একদল সমালোচক বলে,—লেখায় এমন আবেগ, এতখানি সাহস তার পূর্ব্বে আর কেহ দেখাইতে পারে নাই!

ট্রামে বসিয়া ভূষণ তার সদ্য-লেখা গল্প "চূণের ডিপো"র কথা পাড়িয়াছিল। ডিপোর পাশে রাজীব সরকারের মেয়ে শুকতারার চরিত্র সে আঁকিয়াছে জীবন হইতে; কল্পনার মায়ায় সে-চরিত্র এতটুকু রঞ্জিত নয়! সামনের বেঞ্চে বসিয়া এক তরুণ অখণ্ড মনোযোগে ভূষণ-কৃত নিজ গল্পের সমালোচনা শুনিতেছিল।

ধর্ম্মতলার মোড়ে ট্রাম থামিলে ভূষণ ও ধনগোপাল কার্জ্জন পার্কে গিয়া বসিল। এই মুক্ত পার্কে বসিয়াই তারা কল্পনার রশদ সংগ্রহ করে। তরুণটির হাতে তেমন কাজ ছিল না। সে আসিয়া তাদের পাশেই বিচরণ জুড়িয়া দিল! মধুপ যেমন ফুটন্ত কমলের মোহে তার আশে-পাশে ঘোরে, বুঝি তেমনি মোহ!

ভূষণের লক্ষ্য এড়াইল না। ভূষণ কহিল—আপনি এখানে বসবেন?

সে কহিল—না। মানে…

ধনগোপাল কহিল—বসুন না…।

দুজনে সরিয়া বেঞ্চে জায়গা করিয়া দিল। ধনগোপাল কহিল,—ইনি হচ্ছেন এ-যুগের সব চেয়ে প্রতিভাবান কথা-শিল্পী ভূষণ সমাদ্দার।

গর্ব্ব-ভরা হাস্যে ভূষণ কহিল—আর ইনি কবিবর পাপড়িবরণ। আসল নাম ধনগোপাল হাজরা! আপনি…?

বিনয়-কুণ্ঠিত স্বরে তরুণ কহিল,—আমার নাম অমূল্য। আমি গালার দালালী করি। তবে আপনাদের কাগজের পাঠক। আপনারা বাঙলার গৌরব—আপনাদের সঙ্গে আলাপ করতে পেয়েচি, এ যে কত বড় সৌভাগ্য…!

ভূষণ কহিল—হাঁ, সে কথা অনেকেই বলেন!

ধনগোপাল কহিল—ট্রামে বসেই দেখেচি, আপনি কি শ্রদ্ধা-ভরে আমাদের পানে চেয়ে আছেন। এর কারণ আর কিছু নয়,—মানে, আমাদের সঙ্গে আপনাদের একটু তফাৎ আছে কি না! অর্থাৎ, আমরা পৃথিবীটাকে ঠিক পাট, গম, তিসি ফলাবার উর্ব্বর ক্ষেত্র বলে মনে করি না। সে-সবের অন্তরালে যে নারীর চিত্ত—সেই চিত্ত নিয়েই আমাদের কারবার!

অমূল্য এমন দুর্ম্মূল্য বাণীর অর্থ ঠিক বুঝিল না। তার কেমন তাক্ লাগিয়া গেল। সে কহিল,—কিন্তু শুধু নারীর চিত্ত কেন নেবেন? পুরুষ…?

অত্যন্ত তাচ্ছিল্য-ভরে ভূষণ কহিল—নেহাৎ হতভাগা জীব!

ধনগোপাল কহিল—কুৎসিত, বিশ্রী—একদম্ ভ্যাবা-গঙ্গারাম! ছন্দ গুলিয়ে দ্যায়, ভাবের আদ্যশ্রাদ্ধ করে!

অমূল্য নীরবে দু'জনের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। অদূরে ট্রামের ঘড়ঘড়ানি শব্দ। তার মনে হইল, ও শব্দ

পুরুষ তুলিতেছে। তুলিয়া সন্ধ্যার এই অমল স্নিগ্ধতাটুকু চিরিয়া ফাঁশাইয়া দিতেছে।

ধনগোপাল কহিল,—আমার একটা কবিতায় লিখেছি, পড়েছেন কি না, জানি না···

অমূল্য ধনগোপালের পানে মুগ্ধ সম্ভ্রমে চাহিল।

ধনগোপাল কহিল,—শুনুন,—

তুমি নারী হাস্যে-ভাষ্যে-লাস্যে করো বিচিত্রা ধরণী!
দাস্য-মাত্র পুরুষের। তবু সে এ-বৈচিত্র্যে অশনি
হুঙ্কারিয়া চলে, হায়! দগ্ধ হয়, যত শোভা, রূপ।
রে পুরুষ, সরে যা রে, দূরে যা রে,—নিঝুম, নিশ্চুপ।

ভূষণ কহিল—এত বড় কথা এ-পর্য্যন্ত কেউ বলতে পেরেচে? বাঙলায় তো নয়ই—আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি, not even in the Continent! এইজন্যই পাপড়ি-বরণের ।র আমি তারিফ করি।

অমূল্য বেচারী চুপ করিয়া রহিল। অদূরে ঐ হোয়াইট-এ্যাওয়ে লেডলর দোকানের মাথায় প্রকাণ্ড নিশান উড়িতেছে। তাহাতে মস্ত হরফে লেখা, SALE! তার মনে হইল, সারা বাঙলা দেশটাকে যেন saleএ চড়াইবার ইঙ্গিত ও! যে-বাঙলা আজ ভুষি তিসি গম ছোলার চাষের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে! ঠিক কথা! সে সব অতি তুচ্ছ সামগ্রী! নারীর চিত্ত—তা ছাড়িয়া মানুষ ঐ সব অসার ব্যাপারে এমন বিভ্রান্ত অচেতন থাকে কি বলিয়া!

অমূল্যর স্তম্ভিত ভাব ছাড়িবার নয়! ধনগোপাল কহিল,—'কচি-কাঁচা' আপিস জানেন?

অমূল্য কহিল,—জানি।

ধনগোপাল কহিল—রোজ বিকেলে আসবেন। আমরা সাড়ে পাঁচটা অবধি আপিসে থাকি। আপনার এদিকে বেশ টেষ্ট আছে, দেখচি।

অমূল্য কহিল—তা আছে। তবে যে-কাজে ঢুকেচি···

ভূষণ কহিল—ছেড়ে দিন্।

অমূল্য কহিল—বাবা ভারী strict। তাঁর সঙ্গে রোজ বেরুতে হয়।

ধনগোপাল কহিল,—বিকেলের দিকে অবসর পান্ না?

অমূল্য কহিল—চেষ্টা করবো। কোনো ফিকিরে···

ভূষণ কহিল—তাই করবেন। ফিকির জিনিষটা ভালো। চর্চ্চায় ওটা বাড়িয়ে তুলতে পারলে গল্পের প্লট, উপন্যাসের প্লট মাথায় জলজল্ করবে। গল্পের প্লটে বেশ মোচড় দিতে পারবেন। আমরা ছেলেবেলা থেকে ফিকির-ফন্দীরই চর্চ্চা করে আসচি।

অমূল্য শুধু কহিল—হুঁ!

এমনিভাবে তরুণ ভক্ত-লাভ ঘটিল।

## ২

তার পরে যা ঘটিল, তাহাতে বোধ হয় একটু বৈচিত্র্য আছে। সে কথা বলি।

অমূল্যকে যেন ভূতে পাইল! তার কারণ ছিল। বাড়ীতে বাপের কড়া শাসন! নিত্য নিয়মিত সময়ে কাজে বাহির হইতে হয়। তার উপর তিন-চার মাস বিবাহ করিয়াছে। পাত্রী মলিনমালা রূপসী—কাব্যে ও কবিতায় ঝোঁক বিলক্ষণ। মাসিক পত্রে যে-কবিতাই বাহির হোক, মলিনমালা তাহা কণ্ঠস্থ করিবে। দুই দিদি ভালো লেখা-পড়া করিয়াছে। বড়টি গল্প লিখিয়া সেবারে কেশবর্দ্ধিনী তৈলের প্রতিযোগিতায় নগদ পাঁচ টাকা পুরস্কার পাইয়াছে; সেই অবধি নানা মাসিক-পত্রে তার লেখা ছোট গল্প ছাপা হয়। মেজদি কবিতা লেখে—ভাব যেমন ঝাঁজালো, ভাষাও তেমনি! এ-কালের সাম্য-সুরে বীণার তার বাঁধিয়াছে, এবং···

কিন্তু মলিনমালার কথা বলিতেছিলাম। মলিনমালা কবিতা লেখে না, গল্পও লেখে না। তবে গল্প, উপন্যাস আর কবিতা পড়িবার সে যম! তার জ্বালায় বাপকে দু'তিনটা লাইব্রেরীতে চাদা জোগাইতে হয়; এবং ছোট ভাই নড়ু বন্ধু-বান্ধবের বাড়ী হইতে ভালো মন্দ বই সংগ্রহ করিয়া বেড়ায়। অমূল্য স্ত্রীর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারিত না বলিয়া মান-অভিমান না চলিত, এমন নয়। কাজেই অমূল্যকে স্ত্রীর চিত্ত-চয়নের জন্য বাঙলা সাহিত্যের ললিত-কলার দিকে মনোযোগ দিতে হইয়াছে। তার ফলে স্ত্রী পিত্রালয়ে গেলে অমূল্য কাজের ফাঁকে হরসুখদাসের ফার্ম্মের নাম করিয়া শ্বশুরালয়ে গিয়া ওঠে এবং চকিত-মিলনের আনন্দে বিভোর হইয়া পরক্ষণে ছোটে ঠাকুরদাস গণপৎ-রামের গদিতে গালার দর সংগ্রহ করিতে!

## ৩

দশ-বারো দিন পরে 'কচি-কাঁচা' অফিসে আসিয়া অমূল্য পৌঁছিয়া দেখে, ধনগোপাল বসিয়া নিবিষ্ট মনে প্রুফ দেখিতেছে। ঘরে সে একা। ভূষণ একটা ব্লক সংগ্রহ করিতে 'জনার্দ্দন' পত্রিকার অফিসে গিয়াছে।

অমূল্যকে দেখিয়া ধনগোপাল কহিল—আসুন···

অমূল্য কহিল—একটা কবিতা লিখেচি।

—কবিতা?

—হাঁ। আপনার ষ্টাইল অনুকরণ করবার চেষ্টা করেচি।···দেখে দেবেন?

—দেবো-বৈ কি। প্রুফটা দেখে নি।···'সঙ্কেতিকা' বলে একটা কবিতা লিখেচি। স্রেফ নতুন idea এবং একদম মডার্ণ নোটে ভরপুর।

অমূল্য মুগ্ধ বিস্ময়ে মুখব্যাদান করিয়া দাঁড়াইল। ধনগোপাল প্রুফে মন দিল।

সময়ে সংসারের শোক, দুঃখ, ব্যথা, ভয়, আনন্দ, মোহ—সব কাটে! অমূল্যর মোহও কাটিল। সে মুখ বন্ধ করিয়া প্রুফের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

ধনগোপাল কহিল,—শুনবেন? আর এক মিনিট···

এক মিনিট পরে ধনগোপাল 'সঙ্কেতিকা' কবিতা পড়িয়া শুনাইল,—

সদা করি হায়, হায়!
প্রাণ চায়, প্রাণ চায়
খোঁপা-বাঁধা মাথাটুক্,
তার নীচে টুক্‌টুক্
রাঙা গাল, রাঙা ঠোঁট—
সুধার হরির লোট্!
তুষারের মত সাদা ধপধপে ঘাড়খানি,—
হাওয়ার বসন-তলে ভরা বুক, হাতছানি।

* * *

সাঁঝের আকাশে ওই ছোট-ছোট ফোট-তারা—
বাতায়নে দোলে ফুল,—দুটি পদ্ম আঁখি-তারা!
শাড়ীর আঁচলটুকু প্রেমের নিশান, সে যে—
বাতি জ্বলে তার আড়ে—বুকের মণির তেজে।
যেদিন দেখিব সখি, বুঝিব, কবির ব্যথা
বুঝিয়া ডেকেছো তারে—শুনিবে কি তার কথা?
সেদিন মানিব নাকো কোনো বাধা কোন বন্ধ—
প্রাচীর-দেওয়াল ভাঙ্গি রচিব সুন্দর রন্ধ্র—
চরণ-কমল-পাশে পৌঁছিয়া নিমেষে তবে
ওই বুকে রাখি মুখ, কবি তার ব্যথা কবে!

অমূল্যর দুই চোখ প্রশংসার আভাসে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে কহিল,—কিন্তু···

অর্থাৎ কবিতা দুর্ব্বোধ ঠেকিলেও কথাগুলা,—হাওয়ার বসন, ঠোঁট গাল, খোঁপা, বাতি, বুকের মণি ভারী ভালো লাগিল। ও কথাগুলার অন্তরালে কেমন স্বপ্ন, মায়া, কত বিভ্রম···

ধনগোপাল কহিল—মানে ঠিক বুঝলে না! না বোঝাই স্বাভাবিক! একটু বেশী psychological হয়েচে।

অমূল্য কহিল—শুধু psychological ও নয়।

ধনগোপাল গর্ব্বস্ফীত বক্ষে কহিল—না। Intellectual-ও হয়েচে, মানি। এইখানেই আমার বৈশিষ্ট্য! Even রবীন্দ্রনাথ—আপনি দলের লোক, দরদী, তাই ভরসা করে বলচি, রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেও এই intellectuality-টুকুর অভাব!···

অমূল্যর মুখে কথা সরিল না—সে থ হইয়া রহিল।

ধনগোপাল কহিল—এগুলো হলো অভিসারের ইঙ্গিত। Modern noteটুকু লক্ষ্য করেচেন? আমাদের দেশের বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস; ওদেশের বার্ণস্, মুর এ-সম্বন্ধে কিছু-কিছু লিখেচেন। তার নকল করায় কবি-প্রতিভার পরিচয় ফোটে না। আমি Modern যুগের অভিসার-সম্বন্ধে লিখচি কি না। গুরুজনের ভয়, দুনিয়ার ভয়, খপরের কাগজে কুৎসার ভয় এখন প্রেমিক-প্রেমিকাকে একদম মূর্চ্ছাতুর করে রেখেচে। তরুণী নায়িকা সঙ্কেত জানাবে অতি সাবধানে—খালি কতকগুলো symbol দিয়ে। খোলা চিঠি নয়, হাতছানি নয়—সেগুলো not quite safe

ধনগোপালের মুখে যেন কথার বান ডাকিয়াছিল। সে অর্থ বুঝাইয়া দিল,—নায়িকা যদি নায়ককে চায় তো চিঠি-পত্রে কোন রকমে commit না করিয়া বাতায়নে দুটা পদ্ম ঝুলাইয়া দিবে, শাড়ীর আঁচল দুলাইবে, বাতি জ্বালিবে,—তাহা হইতেই নায়ক বুঝিবে, আহ্বান আসিয়াছে! বাধা-বন্ধ নাই—শুধু চলিয়া এসো!···বাতি জ্বালায় সেকালের idea আছে বটে,···কিন্তু সেটুকু বেশ রোমান্টিক!···এখন বাতি জ্বালার প্রয়োজন নাই, সহরের পথ অন্ধকার নয়—গ্যাসের আলোয় উজ্জ্বল! তবু ঐ রোমান্স···

অর্থ শুনিয়া অমূল্য কহিল—চমৎকার!

৪

'সঙ্কেতিকা' কবিতা ছাপিয়া বাহির হইবামাত্র 'কচি-কাঁচার' দলে কলরব বাধিয়া গেল। যারা কবিতা ছাপাইবার উমেদার, তারা আসিয়া বলিল,—এ কবিতার তারিফ ঘরে ঘরে। ট্রামে আজ ঐ কবিতার কথাই হইতেছিল। পথে, বায়োস্কোপে, খেলার মাঠে, এমন কি, বড়বাজারের কাপড়ের দোকানগুদামে অবধি আর অন্য কথা নাই—ঐ সঙ্কেতিকা!

ধনগোপালের পিঠ চাপড়াইয়া ভূষণ কহিল—Epoch-making কবিতা লিখেচো।

ধনগোপাল কহিল—Culture-এর ফল ফলবেই!

দু'চার দিন পরের কথা। দোতলার অফিস ঘরের খোলা জানালা হইতে পাঁচ-ছখানা বাড়ীর ওধারে গলির মধ্যে যে তেতলা বাড়ী—তার ছোট্ট বারান্দা চোখে পড়ে! বারান্দায় একটি খাঁচা—খাঁচার মধ্যে পাখী।

বেলা তখন দুটা বাজিয়া গিয়াছে। ধনগোপাল আর-একটা epoch-making কবিতা লিখিবার অভিপ্রায়ে আকাশের পানে চাহিয়াছিল, ভাব সংগ্রহ করিতে! সহসা চোখে পড়িল, ঐ বারান্দায় খাঁচার সামনে এক তরুণী মূর্ত্তি! রঙের আভায় বাতাসে চাঁপার বরণ ফুটিয়াছে! তরুণীর মাথায় বসন নাই,—খোলা

চুল পিঠ বহিয়া ঢেউ তুলিয়া দিয়াছে! হাত তুলিয়া খাঁচা খুলিয়া তরুণী পাখীকে খাবার দিতেছিল! নিটোল ছুখানি হাত…

ধনগোপালের চোখে আর পলক পড়ে না!…

তরুণী চলিয়া গেল; পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিল। আবার চলিয়া গেল; আবার আসিল। এই আসা-যাওয়ায় ধনগোপালের কবিতার ভাব তার পায়ের তলায় পড়িয়া ঝরিয়া মরিল। মরুক—ধনগোপাল সেজন্য কাতর নয়!

বৈকালের দিকে আবার দেখা। তরুণী বেণী বাঁধিতে বাঁধিতে আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইল,—এবং চলিয়া যাইবার সময় একবার…দুজনের দুই চোখের দৃষ্টি মিলিল, তরুণী সরিল না—নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল,—মিনিট দুই! তার পর চলিয়া গেল।

ষ্টীমার চলিয়া গেলে নদীর বুকে যেমন ঢেউ ফোটে, ধনগোপালের বুকেও তেমনি ঢেউ! ছোট, বড়—নানা আকারের! তার বুক এমন বিশাল, তা বুঝি ধনগোপালও জানিত না!

ঘরে থাকা দায় হইল। বাড়ীটা নিশানা করিয়া মোড় বাঁকিয়া গলিতে ঢুকিল। এই বাড়ী? হাঁ। ভুল নাই। এই ১৭।১ নম্বর। ঠিক!…

অফিসে ফিরিয়া গ্রাহকদের খাতা খুলিয়া দেখে, না, ও ঠিকানায় গ্রাহক নাই।—সদ্য যে-সংখ্যায় তার সঙ্কেতিকা বাহির হইয়াছে, সেই কাগজখানা অফিসের দরোয়ান-মারফৎ সে ১৭।১ নম্বর বাড়ীতে পাঠাইয়া দিল; উপরে complimentary লিখিতে ভুলিল না। পিয়ন-বুকের মারফৎ পাঠাইল।

দরোয়ান ফিরিল, পিয়ন-বুকে নাম সহি আছে—প্রিয়লতা।

বাঃ! খাশা নাম! প্রিয়লতাই বটে! লতার মতই দেহ-ভঙ্গিমা! দোদুল খোঁপা, বর্ণ-সুষমা অমনি চোখ জুড়ানো, মন-ভুলানো!

ধনগোপাল বাড়ীটার দিকে চাহিল। বাড়ীর পাশে একটা শিমুল গাছ। অজস্র লাল ফুলে আকাশ রাঙা হইয়া আছে! তরুণীর রঙের আভায় ফুলের রঙের আভা…যেন দুধে-আলতায় মিশিয়াছে! ধনগোপালের বুকে ও-রঙের পরশ লাগিল।…

তার পর সিঁড়িতে জুতার শব্দ। ধনগোপালের মন রাগে জ্বলিয়া উঠিল—কিন্তু হুঁশিয়ার হওয়া চাই। ওধারে যেটুকু দেখিয়াছে—যে কল্প-লোক—তার সন্ধান যেন আর কেহ না পায়!

ভূষণ, যতীশ, পান্না, অধর—ইস্, মস্ত একটা দল! তাদের সঙ্গে অমূল্য! ধনগোপাল উঠিয়া দাঁড়াইল, ভূষণ কহিল,—কোথায় চললে?

ধনগোপাল কহিল,—ভারী মাথা ধরেচে। একবার মাঠের দিকে যাবো।

ভূষণ কহিল—কিন্তু অধর একখানা নাটক লিখেচে—দময়ন্তী…একেবারে modern!

অধর কহিল—শেষের দিকটা স্রেফ নূতন। আমার idea নল রাজা দময়ন্তীকে বনে ছেড়ে গেলে দময়ন্তী ফুঁশে উঠলো—বটে! তোমার জন্য বনে এলুম, আর তুমি আমায় ছেড়ে যাও! জ্বলো বুকে আগুন—নরকের আগুন হলেও ছাড়ান নেই!

যতীশ কহিল—ভারী interesting তো! বাঃ!

পান্না কহিল—এই তো চাই! নাহলে মামুলি পতি-চরণ-সেবা—I don't quite follow, how একজন নারী নিজের সত্তা হারাবে ঐ স্বামীর জন্য! স্বামী পুরুষ-মানুষ! দুনিয়ায় পুরুষের অভাব আছে?

তর্কটা ঘনীভূত হইয়া উঠিবার জো!

ধনগোপাল কহিল—না, থাকিতে পারচি না…

পান্না কহিল—এক কাজ করলে হয়…

—কি?

—মাঠে গিয়েই পড়া যাক্…

ভূষণ কহিল—মন্দ নয়। মুক্ত প্রান্তরে মুক্ত প্রাণের কথা…

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ধনগোপাল কহিল,—ওঃ। মাথা খসে যাচ্ছে!

ভূষণ কহিল—তাহলে বেরিয়ো না। তুমি থাকো। আমরা disturb করবো না।

সদলে তারা চলিয়া গেল। আঃ!

তার যখের ধন যেন রক্ষা পাইল! ধনগোপাল বাঁচিল…

তার পর প্রায়ই তেমনি ঘটে। ওদিককার বারান্দায় সেই মুখ। সেই আঁচলের দোলা! সেই চোখের দৃষ্টি! …ধনগোপাল হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকে! ও দিককার সে-দৃষ্টি যেন এই ঘরেই কাহার সন্ধানে ঘোরে! ধন-গোপালের প্রাণের মধ্যে কেমন করিতে থাকে!

তার কল্পনা কোথায় লুকাইল,—কাগজে-কলমের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচিয়া গেল।…

আর একদিন।

বেলা পাচটা বাজে। অমূল্য বসিয়াছিল। ধনগোপাল তার কবিতা দেখিয়া দিতেছিল—সতর্ক দৃষ্টি ঐ বারান্দায়…

বারান্দার প্রান্তে বাতায়ন। বাতায়নে আজ লাল পদ্ম…দুটি! ঐ যে রেলিঙে শাড়ীর প্রান্ত, ঠিক নিশানের মত—এবং তরুণীর হাতে বাতি! বাঃ! আশ্চর্য্য!

তার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে কহিল—আচ্ছা, কবিতা রাখলুম—এক সময় দেখে দেবো···

অমূল্য কহিল—আমিও তাই বলতে যাচ্ছিলুম।

অমূল্যর স্বরে চাঞ্চল্য! ধনগোপাল তার পানে চাহিল।

অমূল্য কহিল—আপনি দেখে রাখবেন, আমার ডাক এসেচে। প্রিয়া···

প্রিয়া?···

ধনগোপালের বিস্ময়ের সীমা নাই!

অমূল্য কহিল—আপনার সঙ্কেতিকার সেই সঙ্কেত! দেখচেন না? ঐ জানলায়?

অমূল্য অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে দেখাইল—ধনগোপালের সেই মায়া-লোক—বারান্দায় সেই তরুণী-তীর্থের পানে··

ধনগোপালের বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল।

মৃদু হাসিয়া অমূল্য কহিল—আমার স্ত্রী! ওটা আমার শ্বশুর-বাড়ী। আমার স্ত্রী মাসখানেক হলো এসেচেন—বাড়ীতে বাবা ভারী strict কি না! ওখান থেকে দুজনে বায়োস্কোপ দেখতে যাবো। বলে এসেছিলুম, সময় হলে সঙ্কেত জানিয়ো, আসবো। আমি এখানে আছি, আমার স্ত্রী জানেন। তাই ও সঙ্কেত···

অমূল্য দাঁড়াইল না, দ্রুত চলিয়া গেল।

ধনগোপাল স্তম্ভিত দৃষ্টিতে আকাশের পানে চাহিয়া রহিল। আকাশে সে রঙ নাই! শিমুল ফুলগুলার অমন যে লাল পাপড়ি···তাও যেন শুকাইয়া মলিন! শুধু কালো জঞ্জাল!

পায়ের তলায় পৃথিবী দুলিতেছিল। ধনগোপাল চেয়ারে পিঠ ঠেশিয়া বসিয়া চক্ষু মুদিল! হায় সখী! হায় সঙ্কেতিকা!

# হারানো রতন

বয়স বেশী হইয়াছে—তা হোক্! দুনিয়ার আমোদ-আহ্লাদের দিকে মনের ঝোঁক এখনো বেশ প্রবল রহিয়াছে! চাঁদনী রাত, তরুণী নারীর অঙ্গ-লীলায় চপল হিল্লোল, গানের সুর,—এ-সবে এখনো তেমনি বিহ্বলতা! গৃহে অভাব-অভিযোগের তীব্র আর্ত্তনাদ, গৃহের বাহিরে সকল-ভোলা স্বপ্ন-বিভ্রম! ইহারি মধ্যে এই পাঁচ ইয়ারের দিন কাটিতেছিল একই ভাবে! পরিচিত বন্ধুর দল—যারা এ-দলকে চিনিয়াও এ-দলে পুরাপুরি ভিড়িত না,—তারা দলের নাম দিয়াছিল, বোহেমিয়া। 'হেসে খেলে নাওরে যাদু, কবে যাবে শিঙে ফুঁকে'—বোহেমিয়া-দলের ইহাই ছিল প্রধান মন্ত্র।

সাধক এঁরা, নিশ্চয়। নহিলে গৃহে যখন ষোল বছরের ছেলে অন্তিম শয্যায় খাবি খায়, সতেরো বছরের আইবুড়ো মেয়ে পাড়ার লোকের গঞ্জনা সহিয়া ম্লান মূর্ত্তিতে ঘরের কোণে মলিন বেশে পড়িয়া থাকে, তখন তাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া বরানগরের ওধারে জীর্ণ বাগান-বাড়ীতে বসিয়া রঙ্গ-বিলাসিনীর গানের সঙ্গে মোজেলের বোতল-সুধায় মশ্গুল থাকিতে কোন্ বাপে পারে!

সেদিনকার মজলিশে নন্দ আসিয়া যখন দেখা দিল, তখন তাকে চিনিয়া ওঠা দায়! মাথার চুল বেবাক কালো, সামনের তিনটা দাঁত বাঁধাইয়া ঝকঝকে করিয়া তুলিয়াছে এবং পাটের রঙের গোঁফ-দাড়ি চাঁচিয়া মুখখানাকে বেবাক্ সাফ্ করিয়া ফেলিয়াছে! গালের উপর যে টোল ছিল, তাও ভরাট হইয়া উঠিয়াছে!

নন্দ আসিয়া কহিল,—খপর কি?

কণ্ঠের স্বরে পরিচয় অগোপন রহিল না। রতন কহিল,—বাঃ! এ যেন ভাঙা বাড়ী ম্যাকিণ্টশ-বার্ণের হাতে পড়ে আনন্দ-নিলয়ে পরিণত হয়েচে!

রতন হালদার 'প্রলয়-ডম্বরু' সাপ্তাহিকের সম্পাদক। তা ছাড়া বিবিধ মাসিক-পত্রে সে ছোট গল্প লেখে, এবং প্রকাশকদের তাগিদে নগদ মূল্য লইয়া উপন্যাসও মাঝে মাঝে জোগান দেয়। তার কথাবার্ত্তায় সর্ব্বদাই তাই সাহিত্য-রসের একটু ছিটা থাকে।

নন্দ কহিল,—ঐ কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফে মুখখানা ভারী বিশ্রী দেখাতো। তার পর একটা দাঁত এমন কষ্ট দিচ্ছিল যে, না ফেলে থাকা গেল না। দাঁত বাঁধানোর ফলে তোব্ড়ানো গাল আবার জেগে উঠলো এবং দাড়ি-গোঁফ-কামানোর ফলে এখন···চেয়ে ছাখো, I look just quite young. দাড়ি-গোঁফ কামাও হে:। বত্রিশ বছর অবধি মানুষের দাড়ি-গোঁফ রাখা চলে, তার পর ঐ দাড়ি-গোঁফ বয়সটাকে অসম্ভব বাড়িয়ে তোলে!

রতন কহিল—যা বলেচো! কিন্তু আমার নিশানা যে এই দাড়ি-গোঁফ। ক'খানা বইয়ে ছবি ছাপা হয়েচে এই দাড়ি-গোঁফ সমেত। লোকে এই দাড়ি-গোঁফ থেকেই আমাকে চেনে। এখন কামালে পাঠক-পাঠিকার সঙ্গে আবার নতুন ভাবে পরিচয় স্থাপন করতে হবে।

নন্দ কহিল,—বয়স কত কম দেখাবে, সেটা ভাবো! যৌবনের মেয়াদ ফশ্ করে দশ বছর এখনি বেড়ে যাবে তাতে!

কথাটা কাণে মন্দ লাগিল না। দাঁত বাঁধানো এমনি চলে না,তাহাতে কিঞ্চিৎ ব্যয় আছে। দাড়ি-গোঁফ কামানো —ক'টা পয়সার ওয়াস্তা মাত্র! এখনি? মন্দ কি!

মজলিশে আজ নূতন দু'চারিটি অতিথি আসিবার সম্ভাবনা আছে। তারা আসিবার পূর্ব্বে যদি 'প্রলয়-ডম্বরু'র চতুর সম্পাদক, গল্প-উপন্যাস-রচয়িতা পরিচয়ের সঙ্গে চেহারাটাও চলনসই করিয়া তোলা যায়! রতন কহিল,—দাড়ি-গোঁফ ফেলিতে আমি রাজী এখনি!

খুশী-মনে নন্দ কহিল—হুঁ! এখনি নাপিত ডাকাচ্ছি। চার পয়সা খরচ। তার পর একখানা গিলেট ক্ষুর কিনো—দেড় টাকাতে মিলবে। রোজ সকালে খানিকটা কসরৎ। মোদ্দা, আরাম যা পাবে, এই আমি যেমন পাচ্ছি!

রাইট-ও! নাপিত আসিল এবং সাহিত্যিকের দাড়ি-গোঁফ তখনি চাঁচিয়া সে সাফ্ করিয়া দিল। তবে চার পয়সা নয়; সে দু'আনা চাহিল। রতন ব্যাগ খুলিয়া একটি নিকেলের দু'আনি বাহির করিয়া তার হাতে দিয়া কহিল,—রাইট-ও!

নন্দ কহিল—তোমাকে চেনা যাচ্ছে না।

অধর কহিল—ত্রিশ বছর বয়স বলে মনে হচ্ছে!

রামময় কহিল—বয়স কত?

রতন কহিল—আসল বয়স পঁয়তাল্লিশ। তবে সাজে চল্লিশ বলেই খ্যাতি।

অধর কহিল—তা, তোমার মাথায় টাক নেই—চুলগুলি শুধু সাদা হয়েচে! একটু রঙ করা দরকার।

বড় আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া রতন নিজের চেহারা দেখিল। ইস্, এ যে তরুণ বেশ! ত্রিশ বছর বয়সেও মুখ এমন ঢলঢলে ছিল কি না সন্দেহ!

রতন নিত্য থিয়েটারে যায়; সম্পাদকীয় ছাড়-পত্রের জোরে গ্রীন-রুমেও তার প্রবেশ-অধিকার অব্যাহত। অভিনয়ের সে সমালোচনা করে; এবং

তার ফলে থিয়েটারে গেলে এক পেয়ালা চা ও দু'শ্লাইস্-রুটী তার জন্ম নিত্য বরাদ্দ আছে। তাছাড়া নূতন নাটকের অভিনয়-কালে হীরো অভিনেতার ঘরে দু'চার গ্লাস রঙীন পানীয় এবং দু-খানা চপ্-কাট্লেটও মেলে। তবে অভিনেত্রীগুলা তাকে ঠাকুর্দ্দা বলিয়া ডাকে। এই ডাকে সে যেন একেবারে মরমে মরিয়া যায়! ঠাকুর্দ্দা! সত্যই কি সে ষাট-পঁয়ষট্টি বৎসরের বুড়া? তারা তো জানে না, পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের নীচে বুকের মধ্যে আঠারো-উনিশ বছর বয়সের সেই মন এখনো তেমনি রঙীন, তাজা রহিয়া গিয়াছে! কাঁচা-পাকা গোঁফ-দাড়ি-গুলার জন্মই সে ঐ ঠাকুর্দ্দা ডাকে প্রতিবাদ কখনো তুলিতে পারে নাই। অথচ এই দাড়ি-গোঁফে বহুকাল অভ্যস্ত বলিয়া কামানোর কথা মনে উদয় হয় নাই—কোনোদিন না। এখন সে ভাবিল, এবার একবার ঠাকুর্দ্দা বলিয়া তারা ডাকুক তো, দেখি!

অধর কহিল—আমাদের পাড়ার ঐ বক্কেশ্বর ঘোষ! তিপ্পান্ন বছর বয়সে আবার সেদিন বিয়ে করলে না? মেয়ের মা আপত্তি তুলেছিল। তাই বিয়ের দিন পাকা গোঁফজোড়া কামিয়ে ফেলতে বক্কেশ্বর একেবারে যেন পঁচিশ বছরের ছোকরা ফুটে বেরুলো! দাঁতগুলি আগা-গোড়া বাঁধানো, চুল দিব্যি কালো, গোঁফ কামানো—মুখখানি যেন টুকটুকে পাকা আম!

রামময় উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল,—ওঃ, ধন্য বিজ্ঞান! দাঁত বাঁধানো, চুলের কলপ…এ সব কি ছিল সেকালে? একবার যদি বুড়ো হলুম তো ব্যস্, জন্মের মত গেলুম! আর এখন? যৌবনকে ফিরিয়ে আনা কত সহজ! শুধু কিছু পয়সা খরচ করলেই হলো।

হাসিয়া রতন কহিল—সে-কালকে দোষ দিয়ো না। পড়াশুনা তো করলে না! যযাতি রাজা ছিলেন—জানো কি? তাঁরো যৌবন তিনি ফিরে পেয়েছিলেন। কেমন করে? মহাভারতে সে কথা লেখা নেই—মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র পড়েচো? ভারী পুরোনো বই… বিজ্ঞানের নানা কথা তাতে আছে। তাতে স্পষ্ট লেখা আছে—

দন্তানি বধবন্ধানি কেশে কৃষ্ণকলপ্ হি চ।
যযাতি যৌবনে যাতি ক্ষৌরকার-খুরস্থিকা॥
অর্থাৎ………

তাকে সাপ্তাহিকের সম্পাদকী করিতে হয়—কাজেই এই সব শ্লোক-রচনা-শক্তি তার আছে। নহিলে সাপ্তাহিকের মালিককে খুশী রাখা কেমন শক্ত, তাহা ভুক্তভোগীরা বিলক্ষণ জানেন!

নন্দ কহিল—আর অর্থাৎ থাক। ওদিকে বাগানে গাড়ী ঢুকচে, বোধ হয়।

অধর কহিল—তুমি এগুলোর বাঙলায় তর্জ্জমা ছাপো না কেন? এই যে ওমর খৈয়ম নিয়ে দেশে হুলস্থুল বেধে গেছে! কত বাঙলা তর্জ্জমা বেরুচ্ছে। আর আমাদের এমন শাস্ত্র-পুরাণ…

রতন কহিল—তেমন দরদী পাবলিশার পাই না যে!

অধর কহিল—মোদ্দা, তোমাকে তোমার বড় ছেলের সম-বয়সী দেখাচ্ছে প্রায়…বলিয়া সে হা-হা করিয়া হাসিল।

রতন কহিল—তুমিও গোঁফটা কামিয়ে ফ্যালো হে। ও কালো-সাদা গোঁফ বিশ্রী দেখাচ্ছে।

হতাশভাবে অধর কহিল—বাড়ীতে জানো না তো…

কথাটা সব খুলিয়া বলিতে হইল না। ইঙ্গিতেই বাড়ীর মধ্য হইতে যে বজ্রস্বর ও অগ্নিতীক্ষ্ণ মেজাজের ছবি ফুটিল, সে ছবির সঙ্গে পাঁচ ইয়ারের পরিচয় আছে যথেষ্ট এবং বহুকাল যাবৎ!

রামময় কহিল—তোমার গৃহিণী তোমাকে চিনতে পারবেন তো হে?

অবিনাশ কহিল—আলবৎ। আজ পঁচিশ বছর হলো বিবাহ করেচি। আমাদের আবার love-marriage আমার বড়দি'র ননদ তিনি—

নন্দ কহিল—আমার ও-ফ্যাশাদ হয় নি। কেন না, গৃহেই নব-কলেবর হয়ে গেল। এক জন বুড়ো জ্ঞাতি মরেছিল—সেই ওজুহাতেই। মোদ্দা গোঁফ-দাড়ি আর রাখচি না। অফিসে আজ বড় সাহেব আমাকে নিয়ে একটু মজা করে নিলে, বললে—Are you Nanda? or his younger brother? আমি বললুম—No, Sir. the self same Nanda, but grown younger both in body and mind! শুনে সাহেব হাস্তে লাগলো। মোদ্দা, রতন, তুমি একটা কাজ করতে পারলে ভালো হয়।

রতন কহিল,—কি?

নন্দ কহিল,—তোমার বাড়ীতে একটা খপর পাঠালে পারতে! ফিরবে তো সেই দুগভীর রাত্রে। শেষে চাকরে দোর খুলে দেবে না! সে দোর খুলে দিলেও গৃহিণী হয়তো চিনতে না পেরে আমোল দেবেন না!

রতন কহিল—যা বলেচো! আজ পঁচিশ বছর ধরে গৃহিণীর সঙ্গে ঘর করচি, আর আমাকে তিনি চিনতে পারবেন না? পাগল! তবে একটু কৌতুক হবে—সেটার দাম যে ঢের হে!…কথাটা বলিয়া রতন হাসিল।

## ২

যখন মজলিশ ভাঙ্গিল, রাত তখন দুটা বাজিয়াছে। পরের দিন ভোরের ট্রেণে মিস্ পট্কা ও তার ভগ্নী মিস্

শট্‌কা দুজনেই মুজরায় বাহির হইবে। বেলগাঁওয়ে আর বেশীক্ষণ থাকিতে পারিবে না।

পটকা ও শটকা বিদায় লইবার পর বাবুদের আহারের দিকে যখন হুঁশ পড়িল, তখন ঠাকুরকে তাড়া দিতে আসিয়া দেখে, দুটো বামুনই সিদ্ধিপান করিয়া এমন অচেতন যে উনুনে আগুন নাই এবং বাগান-অঞ্চলের চার-পাঁচটা কুকুর মিলিয়া মাছ আর মাংসটুকু সাবাড় করিয়া দিয়াছে! মাংসর হাঁড়ি লইয়া চারটে কুকুর তখনো তন্ময়। কুকুরগুলাকে তাড়াইয়া বামুনগুলার পিঠে নন্দ সজোরে লাথি বসাইয়া দিল, ব্রাহ্মণ বলিয়া মানিল না। বামুনগুলা আর্ত্তনাদ তুলিয়া পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে ভূতের মত একধারে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্ষুধায় তখন সকলের নাড়ী জ্বলিতেছে। এখন এতরাত্রে এই নির্ব্বান্ধব পুরীতে আহার মিলিবার কোনো সম্ভাবনা নাই। অগত্যা একখানি ট্যাক্সি মজুত ছিল, তাহাতেই পাশাপাশি সকলে উঠিয়া বসিল। ভৃত্যটাকে রামময় বাগানে রাখিয়া গেল। মালীর সঙ্গে সে বাসন-পত্র চৌকি দিবে।

রতনের বাড়ী শিমলা ষ্ট্রীটে। বাড়ীর অদূরে ট্যাক্সি হইতে নামিয়া সে গৃহে আসিল। সদরের দ্বার খোলা থাকে। বাবু প্রত্যহ অধিক রাত্রে ফেরেন। তাস, পাশা, দাবা, নয় গান-বাজনা, নয় থিয়েটারে রিহার্শাল বা অভিনয়···এ তো তার নিত্য লাগিয়া আছে।

সদরে খিল লাগাইয়া অন্দরের মুখে সে পকেট হইতে চাবি বাহির করিল। এ দ্বারে তালা দেওয়া থাকে। তাহার একটা চাবি ঘরে থাকে, আর একটা রতনের কাছে। সেই চাবি দিয়া দ্বার তালা খুলিয়া রতন অন্দরে ঢুকিল, এবং হাত-পা ধুইয়া একেবারে নিজের ঘরে আসিল।

ঘরের মেঝেয় খাবার ঢাকা থাকে। রতন নিঃশব্দে আহার সারিয়া মুখ-হাত ধুইয়া একটা বিড়ি টানে; তার পর বিড়িটা নিঃশেষ হইলে চুপ-চাপ গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়ে। এ তার বাঁধা রুটিন।

আজ ঘরে ঢুকিয়া দেখে, খাবার ঢাকা নাই। মনে পড়িল, ঠিক! বাগানে ভোজ ছিল বলিয়া খাবার রাখিতে নিষেধ করিয়াছিল! কিন্তু ক্ষুধার বেগ প্রচণ্ড। এ ক্ষুধার নিবৃত্তি না হইলে চোখে ঘুম আসিবে না! কাজেই গৃহিণীকে তুলিতে হয়। চাদরখানা আন্‌লায় রাখিয়া সে গৃহিণীকে ধাক্কা দিল—শুনচো গো?

গৃহিণী চিরাভ্যাসবশতঃ নিদ্রামগ্না। ধাক্কা-খাইবামাত্র তাঁর ঘুম ভাঙ্গিল। ঘুম ভাঙ্গিতে আলোয় যে মূর্ত্তি চোখে পড়িল, তা তাঁর সম্পূর্ণ অপরিচিত! তিনি ভয়ে আর্ত্তনাদ তুলিলেন। নিস্তব্ধ নিশীথ। নারী-কণ্ঠে সে ভীষণ আর্ত্তনাদ কাছাকাছি দশ-বারোটা বাড়ীকে কাঁপাইয়া জাগাইয়া দিল! সে আর্ত্তনাদ শুনিয়া রতন প্রথমে চমকিয়া উঠিয়াছিল। তার পর খেয়াল হইল, ঠিক! গোঁফ-দাড়ি-হীন মুখ, গৃহিণী চিনিতে পারেন নাই! সে কহিল—ভয় নেই গো। আমি, আমি—তোমার প্রাণের কর্ত্তা···

গৃহিণীর ভয়ের প্রথম বেগ তখন কমিয়াছে, কিন্তু এই অপরিচিত তরুণের মুখে উক্ত দ্বিতীয় বাণী শুনিবামাত্র তার স্পর্দ্ধা দেখিয়া তাঁর ভয় আরো বাড়িয়া গেল। তিনি আর একটা আর্ত্তনাদ তুলিয়া ছুটিয়া একেবারে ঘরের বাহিরে আসিলেন। স্ত্রীবুদ্ধি·· ভয়ে সেটুকু একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। বাহিরে আসিয়াই তিনি ঘরের দ্বার টানিয়া তাহাতে শিকল আঁটিয়া দিলেন।

প্রথম আর্ত্তনাদে গৃহ ও পাড়া কাঁপিয়া উঠিয়া ছিল; দ্বিতীয় আর্ত্তনাদে সকলে জাগিয়া প্রশ্ন তুলিল—ব্যাপার কি?

রতনের বড় ছেলে বিপিন গৃহে ছিল না। সদ্য বিবাহিত, শনিবার পাইয়া সে গিয়াছে শ্বশুর-বাড়ী। একটা ভৃত্য। গৃহে আর কেহ নাই। ভৃত্য চীৎকার শুনিয়া সদর খুলিয়া একেবারে পথে গিয়া দাঁড়াইল। তার বুকখানা যেন ফাটিয়া যাইবে, ভয়ে এমনি ধড়্‌ফড়্‌ করিতেছে। গৃহে চোর না ডাকাত পড়িল?...তুচ্ছ চাকরির মায়ায় প্রাণটা খোয়াইবে শেষে!

পাড়ার পাঁচ-সাত জন ছোকরা বাড়ী ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিল। চাকরটাকে সামনে পাইয়া প্রশ্ন করিল—ব্যাপার কি রে ভোলা?

সে ব্যাপার জানিত না; ভয়ে কাঁপিতেছিল। ছোকরারা তাকে ছাড়িয়া বাড়ীর মধ্যে আসিয়া ঢুকিল। গৃহিণী তখনো দোতলার দালানে দাঁড়াইয়া হাউ-মাউ করিতেছেন।

সত্য কহিল—কি হয়েচে জ্যাঠাইমা?

জ্যাঠাইমা ব্যাপার খুলিয়া বলিলেন। শুনিয়া তারা রাগে অগ্নিশর্ম্মা! তারা পাড়ায় থাকিতে এক ব্যাটা বওয়াটে মাতাল আসিয়া দোতলায় ওঠে!

গোপাল কহিল—হাতে ছুরি-ছোরা আছে?

কেশব কহিল—সিঁধ-টিঁধ দ্যায়নি তো?

বিষ্ণু কহিল—আপনার গয়নার সিন্দুকের চাবি কোথায়?

গৃহিণী কহিলেন—ঐ ভাখো বাবা, দরজা ঠেলচে।

প্রচণ্ড কোলাহলে প্রমাদ গণিয়া রতন তখন ঘরের দ্বার ঠেলিতেছে এবং চীৎকার করিতেছে,—ওরে

শোন্, আমি চোর নইরে শোন, আমি, আমি··· শ্রীরতন হালদার।

বয়স্কের দলও ইতিমধ্যে আসিয়া হাজির। জগবন্ধু শশব্যস্তে প্রশ্ন তুলিল—পালিয়েচে ?

সত্য কহিল—না।

মেঘু কহিল—ঐ যে ঘরের মধ্যে দোর ঠেলচে আর বলচে—আমি ! ওরে, আমি রতন হালদার।

শিবনাথ কহিল—উনি রতন হালদার ? ছুঁচো ব্যাটা—পাজী ব্যাটা।

হরপ্রসাদ কহিল—ভদ্দর লোকের মত সাজ-পোষাক ?

গৃহিণী তখন মুখে ঘোমটা টানিয়াছেন ; সত্যর মারফৎ জানাইলেন, হাঁ।

শ্রীকান্ত কহিল—মোড়ে ঐ যে মেশটা আছে···ঐ যে ছোঁড়াগুলো সন্ধ্যা হতেই তাশ পেটে আর টপ্পা গায়, বিকেলে মেয়েরা ছাদে উঠতে পারে না তাদের জ্বালায় ! বোধ হয়, ঐ মেশেরই কোনো বখা ছোঁড়া···

গোপাল কহিল—ঘর থেকে টেনে এনে বেদম্‌সে দেবো ক'ঘা ?

বংশী বলিল—না, না। তার চেয়ে পুলিশ ডাকো। যেমন আস্পর্দ্ধা, তেমনি জেলে গিয়ে তার ঠেলা বুঝুক ! মার-ধর করে কি হবে ? রাজ-দ্বারে শাসিত হওয়া দরকার !

শ্রীকান্ত কহিল—হাঁ, তাই করো। আমরা চৌকি দিচ্ছি। পালাবে আর কোথা দিয়ে ? মোদ্দা, রতন এখনো ফেরেনি ? ছাখো দিকিন কাণ্ডখানা ! বিপিন কোথায় ?

বিপিন রতনের পুত্র। গৃহিণী জানাইলেন, সে শ্বশুর-বাড়ী গিয়াছে।

বংশী কহিল—মোদ্দা, এ ব্যাটা ঢুকলো কোথা দিয়ে ?

ছোকরার দল আপশোষ করিল, হাতের সুখটা হইল না !

বংশী কহিল—পাগল ! মারের চোটে গুঁড়ো হয়ে যাবে। তখন উল্টো ঠ্যালা সামলানো দায় হবে।

সত্য-কোম্পানি পথে বাহির হইয়া পড়িল পুলিশ ডাকিতে। বয়স্ক-দলে গল্প চলিতে লাগিল।

শ্রীকান্ত কহিল—বুকের পাটা বোঝো ! সোজা উপরে চলে এসেচে !

বংশী কহিল—জানো না তো, ভদ্র লোকের সাহস একটু বেশীই হয়। শোনোনি লালবাজারের পুলিশ কোর্টের ঘটনা ? অনেক দিনের কথা। পুলিশ কোর্ট তখন ভেঙ্গে এমন ছন্নছাড়া হয় নি ! লালবাজারে তখন একটা কোর্ট বসতো। কি জমাট ভিড় ঠেলে গিয়েছিলুম একবার সাক্ষী দিতে। দেখে এসেচি কাণ্ড ! তা, বেলা সাড়ে দশটায় হাকিম এজলাসে বসেচে। লোক গিস্‌গিস্ করচে···সার্জ্জেণ্ট, কন্‌ষ্টেবল। তার মধ্যে এক ভদ্র লোক এজলাসে ঢুকলেন, সঙ্গে সঙ্গে একটা কুলি। কুলির ঘাড়ে মই। ভদ্রলোকের ইঙ্গিতে কুলি দেওয়ালে মই লাগালো ; আর ভদ্রলোক ঘড়ির কাঁটা ঘুরুলেন দু'চার বার ; তার পর ঘড়িটায় কাণ ঠেকিয়ে কি শুনলেন। শুনে ঘড়ি নামিয়ে বগলে পূরলেন। কুলি মই খুলে নিলে—তার পর দুজনে সটান বেরিয়ে এলো। খোলবার আধঘণ্টা পরে সকলের হুঁশ হলো, তাই তো, ঘড়ি খুলে যে নিয়ে গেল, ও কে ? আর কে ! কেউ বললে, মেরামত করবার জন্য নিয়ে গেছে– সরকারের লোক ! তার পর সে ঘড়ি আর ফিরলো না···

শ্রীকান্ত কহিল,—চুরি ?

বংশী কহিল,—তা নয় তো কি !

হরপ্রসাদ কহিল,—একেই বলে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।···ওই যে দোরে ফের ঘা দিচ্ছে। শুনচো ?

বেচারা রতন দ্বারে করাঘাত করিতেছিল, অবিশ্রাম। সেই সঙ্গে চীৎকার করিতেছিল,—দোর খুলে ছাখো হে, আমি, আমি রতন কি না ! ও বংশীদা·· বলি ও শ্রীকান্ত, চোখে ছাখো। কথায় বিশ্বাস না হয় যদি···

বংশী কহিল,—হ্যাঁ। দেখবো। একটু সবুর করো দাদা। পুলিশ আসুক।

পুলিশ আসিল ; দুই কনেষ্টবল এবং সার্জ্জেণ্ট সাহেব। আসিয়া কহিল,— কোন্ ঘরে ?

—ওই, ওই, ওই। যেন থিয়েটারের ষ্টেজের উপর একপাল সখী কোরাসে গান ধরিল !···

সার্জ্জেণ্ট আদেশ দিল কনষ্টেবলকে—খোলো কেওয়াড়ি।

তারা গিয়া শিকল খুলিল ; হাঁকিল,—আও।···

ছোট আহ্বান। তার পিছনে অকথ্য গালি জুড়িল ! চোর তবু আসে না।

সার্জ্জেণ্ট হাঁকিল—পাকড়কে লে' আও।

কন্‌ষ্টেবলরা তখন চোরকে পাকড়াইয়া বাহিরে আনিল। সকলে সভয়ে চাহিয়া দেখে, সম্পূর্ণ নিরস্ত্র এক বাঙালী···দিব্য চাঁচা-ছোলা মুখ !

রতন ডাকিল,—শ্রীকান্ত······তার স্বর করুণ !

শ্রীকান্ত বিরক্তভাবে কহিল,—কে ব্যাটা চোর— পরমবন্ধুর মত ডাকে ছাখো না !

সার্জ্জেণ্ট বলিল,—ইহাকে চিনেন ?

শ্রীকান্ত কহিল,—কস্মিন্ কালে না !

রতন কহিল,—আমি রতন—চিন্‌তে পারচো না ? দাড়ি-গোঁফ আজ সন্ধ্যার পর কামিয়েচি !

সার্জ্জেণ্ট কহিল, · Smelling of liquor ! মাতোয়ালা ! কথার সঙ্গে সঙ্গে তার পিঠে সজোরে এক ঘুষি বসাইল।

সত্য-কোম্পানির হাতও নিশপিশ করিয়া উঠিল। রক্ত দেখিলে বাঘ যেমন ক্ষেপিয়া ওঠে, ঐ একটি ঘুষি দেখিবামাত্র ছোকরা ভলান্টিয়ারের দল—

অজস্র কিল-চড়-ঘুষি। রতন আর্ত্তনাদ তুলিল,—উঃ বাপ রে!

সার্জ্জেণ্ট ও কনষ্টেবলরা ধাক্কা দিয়া তাকে লইয়া পথে আসিল।

শ্রীকান্ত কহিল,—তোমরা থাকো হে সত্য-গিন্নী একা রইলেন। রতন এখনো ফেরেনি।

সত্য কহিল,—আমি থানায় যাবো, ভাবছিলুম।

বংশী কহিল,—কিছু ভাবতে হবে না। ইন্‌স্‌পেক্টর এখনি আসবে তদারকে। মোদ্দা, রতন গেল কোথায়? রাত তিনটে বাজে। থিয়েটার তো এত রাত্রি অবধি হয় না।

গৃহিণী ঘোমটার মধ্য হইতে জানাইলেন, নেমন্তন্ন গিয়াছেন কাশীপুরে।

৩

ভোরের বেলায় আসামী লইয়া ইন্‌স্‌পেক্টর আসিলেন রতনের গৃহে। ভৃত্যটা সামনে ছিল। ইন্‌স্‌পেক্টর কহিলেন,—রতনবাবু আছেন?

আসামী রতন কহিল,—আপনার সঙ্গেই তিনি বরাবর আছেন, মশায়!

ইন্‌স্‌পেক্টর কহিহেন,—চোপ।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া রতন ডাকিল,—ওরে ব্যাটা ভোলা···

ভোলা ভৃত্য। চোরের মুখে নিজের নাম শুনিয়া তার বড় ভয় হইল। পুলিশ ভাবিবে, চোরের সঙ্গে তার হয়তো ষড় ছিল! রতন কহিল,—দৌড়ে একবার নন্দবাবুর বাড়ী গিয়ে বল্‌গে, বাবুর ভারি বিপদ; শীগ্‌গির আসুন। তিনি যতক্ষণ না আসেন, ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু একটু বিশ্রাম করুন এখানে এবং আমাকেও দয়া করে বিশ্রাম করতে দিন।

ইন্‌স্‌পেক্টর কহিলেন,—বেশ।

রতন কহিল,—চা খাবেন?···গেলি না ভোলা? মজা পেয়েচিস, না? দেখবি?

ইন্‌স্‌পেক্টর কহিলেন,—যা রে, বাবুকে ডেকে আন্।

ইন্‌স্‌পেক্টর আসার সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকৌতুকে রতনের গৃহে আসিয়া জমিয়া গেল। রতন ডাকিল—ওরে ও বাঁটুল—

বাঁটুল শ্রীকান্তর নাতি। সে সবিস্ময়ে রতনের দিকে চাহিল। রতন কহিল,—তোর ছোট দিদিমাকে বল্‌গে যা,···

সকলে অবাক্! বদমায়েসটা এত পরিচয়ও জানে! বাঁটুল যে রতনের স্ত্রীকে ছোট দিদিমা বলিয়া ডাকে, সে খপরও উহার অবিদিত নয়!

বংশীও আসিয়াছিল। দিনের আলোয় আসামীকে লক্ষ্য করিয়া সে কহিল,—লোকটার বয়স হয়েচে। নেহাৎ ছোকরা তো নয়। তবু এ বয়সে এমন দুর্ম্মতি!

সত্য কহিল—জানোনা ছোটমামা, আজকাল অনেক বুড়ো দেখা দেছে, যারা শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে মিশতে চায়। বুড়ো হয়ে গেছে, তবু মুখে বলে, আমরা তরুণ, আমরা সবুজ, আমরা কাঁচা!

বংশী কহিল,—জেলের খাঁচায় ঢুকে কাঁচা এবার বাঁচো গে যাও!

হরপ্রসাদ কহিল,—ভাগ্যে মেয়ে-বৌ এখানে নেই··· না হলে একটা ঢি-ঢি পড়ে যেতো। তা ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু ও কি বলে? কি মতলবে এসেছিল?

ইন্‌স্‌পেক্টর কহিলেন,—কিছুতে সে কথা বার করতে পারচি না। মতলব আবার কি! নিছক চুরি। কেশটা ভারী আর ভদ্রমহিলাকে সাক্ষী দিতে যেতে হবে আদালতে, তাই না···

বয়স্ক-দল ভাবিত হইয়া কহিলেন,—তাইতো! তা রতন গেল কোথায়? এখনো তার ফেরবার নামটি নেই···

শ্রীকান্ত কহিল,—কাল যে শনিবার গেছে···

রতন কহিল,—ওহে বংশী, ও শ্রীকান্ত, বলি ও হরপ্রসাদ, আমায় স্রেফ ভুলে গেলে! একটা চোরের মত হাজত-ঘরে রাত্রি-যাপন! অপরাধ? না, নিজের ঘরে রাত্রে প্রবেশ করে স্ত্রীকে ডেকেছিলুম···

শ্রীকান্ত কহিল,—থাম্ ব্যাটা—তোর এক-গেলাশের ইয়ার পেয়েচিস্—না? থাকতো রতন, মজা দেখিয়ে দিত!

রতন কহিল,—তাকে আর দেখাবার সুযোগ দিলে কৈ ভাই? দেখলে না, দেখাতেও দিলে না!··· শুনবে রহস্য? বলি শোনো—কাল রাত্রে আমি দাড়ি-গোঁফ ফেলে দিয়েচি! তাই চিনতে পারচো না। ভালো করে দিনের আলোয় চেয়ে ছাখো দিকিন আমার পানে···

বংশী হাসিয়া কহিল,—ঢের দেখেচি। প্রমাণ দিতে পারো, তুমি রতন?

রতন কহিল,—পারি! আচ্ছা, মনে পড়ে, বছর দশেক হলো, সেই ভুতুর ঠাকুরমার শ্রাদ্ধে আমার সঙ্গে তুমি গেছলে কীর্ত্তনের বায়না করতে···সেখানে তুমি রাজী কীত্তুনির গান শুনে এমন মুগ্ধ হলে যে তোমায় আনা দায়!

পাড়ায় বংশী চিরদিন নিজের সুনাম রক্ষা করিয়া আসিয়াছে·· ভয়ানক সচ্চরিত্র, কখনো আড়-চোখে কোনো নারীর পানে চাহে নাই! অসতর্ক মুহূর্ত্ত জীবনে তার ঘটে নাই? ঘটিয়াছে। কিন্তু সে-সংবাদ খুব অন্তরঙ্গ ঐ দু-এক জন বন্ধু ছাড়া বাহিরের বিশ্বে গোপন রহিয়া গিয়াছে। রাজী কীর্ত্তনওয়ালীর ওখানকার কথাটা সত্য। তাই সে ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি সে বলিল,—থাম্ ব্যাটা মাতাল!

রতন হতাশভাবে কহিল,—এ কথা যদি না মানো দাদা, তা হলে তোমার কাছে আমার অস্তিত্ব প্রমাণের আর কোনো আশাই দেখচি না···তোমার মনে পড়ে শ্রীকান্ত···? সেই গ্রহণের স্নানের দিন সেই গলির পথে একটা স্ত্রীলোক পথ হারিয়ে কাঁদছিল—তুমি তাকে সঙ্গে নিয়ে···

আর বলিতে হইল না।

শ্রীকান্ত সগর্জ্জনে কহিল,—চোপ্‌ হতভাগা! আমায় তেমন লোক পেয়েচিস্‌, বটে! সন্ধ্যা-আহ্নিক পূজার্চ্চনা নিয়ে আমি আছি·

মুখে এ কথা বলিলেও চোখের সামনে জাগিয়া উঠিল সাত-আট-বছর পূর্ব্বেকার সেই দৃশ্য। ঝুপ-ঝুপ বৃষ্টি, সেই বৃষ্টিতে স্ত্রীলোকটাকে ছাতায় ঢাকিয়া সে গলির পথে চলিয়াছিল···ঐ কিনুর কারখানার দিকে, এমন সময় রতনের সঙ্গে দেখা!

চট্‌ করিয়া মনে হইল, এ তবে রতনই? সে কথা আর কেহ তো জানে না। একটু-আধটু নেশা করিলেও অবিনাশ এ দিকে খাঁটী—কথা যা দেয়, তার খেলাপ করে না।

দুজনের কাছে ধমক খাইয়া রতন ইন্‌স্‌পেক্টারের শরণ লইয়া কহিল,—একবার রতন বাবুর স্ত্রীকেই নাহয় ডাকুন মশায়। রাত্রে আঁৎকে উঠেছিলেন ঘুমের ঘোরে—এখন দিনের আলোয় আমাকে দেখুন একবার—চিন্‌তে পারেন যদি?

প্রস্তাব শুনিয়া রাগিয়া সকলে আগুন! ব্যাটার স্পর্দ্ধার সীমা নাই!

নন্দ আসিয়া হাজির হইল। সে প্রশ্ন করিল,—ব্যাপার কি?

আনুপূর্ব্বিক ব্যাপার তাকে বলা হইলে সে উচ্চ-হাস্য করিয়া উঠিল; পরে কহিল,—আচ্ছা মজা তো! দাড়ি-গোঁফ কামানোর দরুণ এমন শাস্তি।

রতন কাতর স্বরে কহিল,—নিজের স্ত্রীর এই কাজ। আমার কত-বড় ইজ্জৎ সাহিত্য-জগতে···

নন্দ কহিল,—ছিঃ! তোমারই বা কি! পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে যার সঙ্গে চলা-ফেরা, বসা-দাঁড়ানো, সে আজ দাড়ি-গোঁফ কামিয়েচে বলে তাকে ছুট্‌ করে দেবে!··· তা, বৌদি কোথায়? আমি একবার তাঁর সঙ্গে বোঝা-পড়া কর্‌তে চাই।

ইন্‌স্‌পেক্টর কহিলেন,—মজা তো মন্দ নয়! আমায় একটা রিপোর্ট তবু লিখে ফেল্‌তে হবে। Cognizable case বলে যখন হাত দিয়েচি—তা যাক, আমি তা হলে যাই।

রতন কহিল,—শুধু হাতে যাবেন? আমায় নিয়ে না?

হাসিয়া ইন্‌স্‌পেক্টর কহিলেন,—থাক্‌। আপনি এখন বিশ্রাম করুন। আমি বরং একটা মুচলেকার ফর্ম্ম পাঠিয়ে দেবো, সেটায় সই করে দেবেন। তার পর কাল একবার—সে আমি নয় আর এক দফা এসে বলে যাবো'খন।

রতন কহিল—কিন্তু আর একটু বসুন। চা আসচে···

চা আসিল। ইন্‌স্‌পেক্টর চা পান করিয়া বিদায় লইলেন; সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার যত লোক তামাসা দেখিয়া হাসিয়া খুশী-মনে সরিয়া পড়িল।

নন্দ তখন গৃহমধ্যে আসিয়া বৌদির সঙ্গে মহা দ্বন্দ্ব বাধাইয়া তুলিল,—ছি বৌদি, এই কি হিন্দু-স্ত্রীর আচরণ! পঁচিশ বছর যে-স্বামীর সঙ্গে ঘর কর্‌চেন, তাকে চিন্‌তেও পারলেন না!

রতনের গৃহিণী কহিলেন—চেনবার আর অবসর পেলুম কখন্‌, বলো? প্রথমে ঘুম-চোখে ঐ মূর্ত্তি দেখে ভয়ে চীৎকার কর্‌লুম—তার পর সেই ভয় নিয়ে ছুটে বাইরে এসে ঘরে শিকল টেনে দিলুম। শেষে অত যে হৈ-হৈ ব্যাপার—আমি একধারে ভূতের মত দাঁড়িয়ে, আমায় আর দেখতে দিলে কৈ।

রতন গম্ভীর স্বরে কহিল,—এ লাঞ্ছনার পর সংসারে কি আর আমি বাস কর্‌তে পার্‌বো? অসম্ভব! আমি ভাবচি, বৈরাগ্য নেবো,···

গৃহিণী কহিলেন,—থামো। ঢের হয়েচে! পাড়াশুদ্ধ ঢী-ঢী।

রতন কহিল,—সেইজন্যেই তো আমার পক্ষে সংসারে থাকা সম্ভব নয়। সকলে কি ভাবলো, বলো তো! শয়নে-স্বপনে, ধ্যানে-জাগরণে যে-স্বামী হিন্দু নারীর উপাস্য দেবতা, সেই স্বামীর সঙ্গে এমন পরিচয়! তাছাড়া আমার মান-ইজ্জৎ! অন্য কাগজওয়ালারা সং সাজিয়ে কাগজে আমার ছবি বার কর্‌বে, কত ছড়া কাটবে,—'প্রলয়-ডম্বরু'র সম্পাদকী চাকরি আমার পক্ষে বজায় রাখা আর কি সম্ভব হবে?

গৃহিণী কহিলেন,—তুমি এক কাজ করো। তারা কিছু করবার আগে তুমি নিজেই নিজের কাহিনী লিখে—তোমার 'প্রলয়-ডম্বরু' কাগজে ছেপে বার করে দাও।

রতন কহিল,—তুমি মোদ্দা কি ভেবেছিলে বলো দিকিনি—যে তোমার রূপে মুগ্ধ হয়ে কোনো তরুণ প্রণয়ী···

গৃহিণী কহিলেন—গলায় দড়ি! গলায় দড়ি! তোমার মত আমি আক্কেল হারিয়ে বসে নেই তো!

শেষ

# সুপর্ণা

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়



পূজনীয়

শ্রীযুক্ত বটুকদেব মুখোপাধ্যায়

করকমলেষু

৩য়—৩২

# সুপর্ণা

## হায় নারী

কে ? মনে নাই। তবে একজন কবি যেন বলিয়াছেন, 'রমণীর মন সাধনার ধন।' বিশ্ব-নারীর মনের সাধনায় তাই দেখি, বহু কবি কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছেন ! আমি সামান্য কেরাণী। বিশ্ব কত বড়, তার মাপ করিবার শক্তি নাই, বিশ্বের নারীর খোঁজ লইবার প্রয়োজন বুঝি না। বুঝিলেও···

কিন্তু সে কথা যাক্। একটিমাত্র পত্নী ! তাঁকে পাইবার জন্য দুশ্চর তপস্যা করিতে হয় নাই ! না লক্ষ্যভেদ, না রথে চড়িয়া রাজন্যবর্গের সঙ্গে বিপুল সংগ্রাম ! একান্ত সুপাত্র-বোধে তাঁর পিতা-ঠাকুর, নগদ অর্থ এবং রজত-কাঞ্চনাদি সহ তাঁকে আমার হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। এমন সুলভে স্ত্রী লাভ করিয়াছি, কিন্তু তাঁর মন আমার কাছে চিরদিন দুর্লভ রহিয়া গেল।

স্ত্রীর মন পাইবার জন্য আমার সাধনার বিরাম নাই ! প্রথম বয়সে ছন্দে গাঁথা কবিতার মালা—এসেন্স, হেয়ার-অয়েল, পমেড্, পাউডার, সদ্য-প্রকাশিত কাব্য-উপন্যাস, বায়োস্কোপ দেখানো—অর্থাৎ সামাজিক বিধি-নিয়মের ক্রমিক অনুশীলন !

তবু দেখিয়াছি, যেখানে তাঁর সঙ্গে একটু মতভেদ হইয়াছে, সেইখানেই তিনি রাগে জ্বলিয়াছেন, যেন আগুন ! বিনয়ে অবনত হইয়াও তাঁকে স্বকীয় মতে আনিতে পারি নাই ! হুঙ্কারে তাঁর রোষের দাহ তীব্র হইয়াছে ! মিনতি-বর্ষণে সে-দাহ শান্ত হয় নাই !··· তাই নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবি, বাঙালীর ঘরে ঘরে প্রেমের পরিণতি যদি এভাবে ঘটিয়া চলে,—তাহা সহিয়াও বাঙালী পুরুষ আজও টিকিয়া আছে কি করিয়া ! অতএব বাঙালীর মার নাই।···

কিন্তু এ-সব হইল দর্শনের তত্ত্ব-কথা। আমি ছাঁপোষা বেচারী কেরাণী। ও-সব বড় কথা লইয়া মাথা ঘামানো মিছা ! না লিখি কবিতা, না লিখি গল্প বা নাটক—তা লিখিলে দু'চারিটা অমন কথা গোঁজামিলে যত্রতত্র চালানোর অর্থ থাকে। তা যখন নয়, তখন যা বলিতে বসিয়াছি,—নারীর মন—সেই কথাই বলি।

বিবাহের পর প্রথম দু'তিন বছর বুঝি কাটে ভালো—এ শুধু আমার কথা নয়। দীনু বলে, রমেশ বলে, হীরু বলে, ও-পাড়ার দামুদাও এ-কথায় সায় দেয় ! তার পর··· ?

জানি না, এমন ভাগ্যবান স্বামী বাঙলার মাটীতে আছেন কি না, স্ত্রীর প্রণয়ে যাঁর বুক স্নিগ্ধ, কোমল ! স্ত্রীর চোখের দৃষ্টিতে আগ্নেয়-গিরির পরিবর্ত্তে যিনি সুধা-সমুদ্র দেখিয়াছেন।···যদি বাঙলা-দেশে অজানা তেমন কোনো ভাগ্যধর বাঙালী স্বামী কেহ থাকেন তো হে ভাগ্যধর, এ অভাগ্যের লহ নমস্কার !

দায়ে পড়িয়া এ সব কথা গোড়ায় বলিতে হইল। যে যুগ, পুরুষের বেদনায় কাহারও দরদ জাগে না। তাই ! তা ছাড়া বুড়া মানুষ—বাজে বকা কেমন একটা ব্যাধি ! কিন্তু আর ভূমিকা নয় !

অফিসের ছুটী হয় পাঁচটায়—সার্ক্‌লারে লেখা তাই ! কিন্তু কাজে তা ঘটিতে দেখিলাম না। সন্ধ্যা সাতটার পূর্ব্বে কোনদিন অফিসের বাহিরে আসিতে পারিলাম না। বুদ্ধি-চাতুর্য্যের অভাব ? হয়তো তাই !

স্ত্রী বলেন—বাসনগুলো সব ভেঙ্গে গেছে—বদল দিয়ে নতুন বাসন কিনে আনো,—সত্যি, এতে আর চলে না !···

মাঝে মাঝে শুনি ! কিন্তু সকালের অফিসের রুদ্র বাঁশী কাণে বাজে—সব ভুলিয়া যাই ! সে রাত্রে স্ত্রী অনুযোগ তুলিলেন খুবই—তাঁর সঙ্গে বচন তীব্র হইয়া উঠিল। অগত্যা পণ করিলাম, আর নয়···

সকালে উঠিয়া দেখি, দাসী কলতলায় বাসন মাজিতেছে। ভাঙ্গা থালাবাটি সাজাইয়া একখানা গামছায় বাঁধিয়া বাসনের দোকানে গেলাম। কেনাবেচার হিসাব করিয়া ভাঙ্গা দশখানা বাসন, তার সঙ্গে নগদ সাত টাকা এগারো আনা আড়াই পয়সা গাঁট হইতে দিয়া দুখানা বগী থালা, দুটা ঘটি, দুইটা বাটি লইয়া গৃহে ফিরিলাম।

ভাবিয়াছিলাম, গৃহে আজ একালের ঐ জয়ন্তী-বন্দনা-গোছ একটু প্রীতি-অভ্যর্থনা মিলিবে। কিন্তু কোথায় দেখি, স্ত্রীর মুখ একেবারে পূর্ণিমার চন্দ্র ! সে

স্নিগ্ধ-দীপ্তি নাই,—শুধু আকারে সুগোল! দুই চোখ? সেদিকে চাহিতে পারিলাম না! মনে হইল, ছেলেবেলায় টেক্সট-বুকে পড়া সেই বিশাল prairie—দাবানলে ঘেরা!

সরিয়া পড়িতেছিলাম। স্ত্রী বলিয়া উঠিলেন—কর্ত্তামি, হায়রে! দাসী-বাঁদী একটা পড়ে আছি। তাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেতো?

দেখি, গামছার বাঁধন খুলিয়া গৃহিণী বাসন দেখিতেছেন। দেখিয়া কহিলেন,—যা ভেবেচি। এত বড় দুখানা বগী না এনে তিনখানা মাঝারি আনলে পারতে! দুটো গেলাসের কি দরকার! গেলাস এনামেলের কিনলেও চলতো—এই গেলাসের বদলে যদি একখানা কাঁশি আর···

দোতলার ঘরে বড় ঘড়িতে 'ঢং-ঢং' করিয়া নটা বাজিল। হৃৎকম্প হইল। সর্ব্বনাশ! দশটায় অফিস। স্নানাহার সারিয়া হাঁটা পথে ঠিক সময়ে পৌঁছাইব কি করিয়া?

স্ত্রী বকিতে লাগিলেন। আমি নির্লিপ্তের মত মাথায় তেল দিয়া স্নান করিতে গেলাম।···

আর একদিনের কথা বলি। রাত্রে আহার করিতে বসিয়াছি, স্ত্রী বলিলেন,—এই ইলিশ মাছের দিন। পাঁচ আনা ছ' আনায় লোকে একটা ইলিশ কিনচে। দুঃখী-গরীবেও খাচ্ছে। আর এ এমন বাড়ী,—এ বছর কেউ জানলো না, ইলিশ মাছের কি স্বাদ।

আমি কহিলাম—কেন, বাজার থেকে আনাও না কেন?

স্ত্রী কহিলেন—তাকে ইলিশ মাছ বলে না! গঙ্গার ধারে গেলে টাটকা মাছ মেলে···

দুঃখ-দুর্দ্দশার লক্ষ কাহিনী স্ত্রী বলিয়া চলিলেন। Heredity! কৈ? আমি তাঁর ঊর্দ্ধতন বহু পুরুষের ইতিবৃত্ত হাতড়াইতে লাগিলাম, আমার শ্বশুর-বংশে কথকতায় কাহারও গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল না! বাঙলার ইতিহাসে তেমন কোনো বৃত্তান্ত···কৈ? নাই। না!

পরের দিন। অফিসের পর হালদার ডাকিল—ওহে নারান···

আমি কহিলাম,—কেন?

হালদার কহিল—চলো না একবার গঙ্গার ধারে। মেয়ের বাড়ী-তত্ত্ব পাঠাতে হবে···ইলিশ মাছ। দেখে দুটো কিনে আনি···

পূর্ব্ব-রাত্রের মান-পর্ব্ব মনে পড়িয়া গেল। বেশ! কহিলাম—চলো।

বাগবাজারের ঘাট। পাঁচটা ইলিশ কেনা হইল। দাম তিন টাকা ছ' আনা। হালদার কহিল,—আমি দুটো নেবো···

আমি কহিলাম—বেশ!

ভাবিলাম, এ বছর যেমন ইলিশ কিনি নাই,—না কিনিয়া পাপ করিয়াছি,—তেমনি এই ত্রি-মৎস্যে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক্!

খুশী-মনে গৃহে ফিরিলাম। চীৎকার করিয়া কহিলাম,—এই মাছ এনেচি, গো—এসে ছাখো···

উঠানে মাছ ফেলিলাম।

গৃহিণী আসিলেন না। দোতলার বারান্দা হইতে মাছ দেখিয়া সঝঙ্কারে কহিলেন—বেশ করেচো! ও মাছ কে খাবে? আজ না ভুতি-ঠাকুরঝির বাড়ীতে রাত্রে সব নেমন্তন্ন! সকালে কথা হলো···

ঠিক। আমি হতভম্ব! স্ত্রী কহিলেন,—এ তো মাছ খাওয়ানো নয়। গায়ের ঝাল মেটানো! ঐ যে কাল বলেছিলুম···যা খুশী করো ঐ মাছ নিয়ে···

আমি নিশ্বাস চাপিয়া হাত ধুইয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া তক্তাপোষে শুইয়া পড়িলাম।

সে মাছ চলিয়া গেল পড়শীদের গৃহে। আমি কহিলাম,—মানে···

স্ত্রী কহিলেন,—দাম দেবো'খন। রাগ করে এ মাছ নাই আনতে। এ তো আদর নয়—পীড়ন!

আকাশের পানে চাহিয়া নিশ্বাস ফেলিলাম।

আর-এক দিন।

বিবাহের সময় গীত-বাদ্যে স্ত্রীর একটু অনুরাগ ছিল। তার প্রমাণ গৃহে এখনো আছে—এক টেবিল-হারমনিয়ম। সেটা বাজে কি না, জানি না। তবে কিছুকাল পূর্ব্বে স্ত্রী বলিয়াছিলেন,—বাবার কাছ থেকে বাজনাটা এনেছিলুম। তা কখনো বাজালুম না!

আমি কহিলাম—কেন বাজাও না?

স্ত্রী কহিলেন—দেখচো না অবসর! তোমাদের বাড়ী এসে কোন্ সাধটা মিটলো?···তার উপর কিসে বসে বাজাবো!

তা সত্য। বাড়ীতে চেয়ার নাই! কি করিব চেয়ার লইয়া? তাই। এ কথা হইয়াছিল প্রায় দু'বছর আগে!

আজ অফিসের পরে অবিনাশের সঙ্গে গৃহে ফিরিতেছিলাম। পথে একটা দোকানে নিলাম হইতেছিল। দুজনে দাঁড়াইলাম। কেমন নেশা লাগিল! একখানা বাজনার চেয়ার (music stool) দেখিলাম। দু বৎসর পূর্ব্বে স্ত্রীর সেই অনুযোগের কথা মনে পড়িল। ভাবিলাম, এই দিয়া যদি দেবীর চিত্ত প্রসন্ন করিতে পারি। সকালে ধমক খাইয়া আসিয়াছি। ছেলে বিশু ছুটিয়া সিঁড়ি দিয়া

নীচে আসিতেছিল, হোঁচোট খাইয়া পড়িয়া ঠোঁট কাটিয়াছে, হাঁটু ফুলাইয়াছে। স্ত্রী ভৎর্সনা করিয়াছিলেন—কোথেকে মানুষ হবে! ছেলেপিলের একটু শাসন নেই! খালি আদর আর প্রশ্রয়! আমরাও আদর পেয়েচি বাপ-মার কাছে—সত্যি, অনাদরে-অবহেলায় মানুষ হইনি!

পাঁচ টাকা চার আনায় ষ্টুল কিনিয়া কুলির মাথায় চাপাইয়া গৃহে আসিলাম।

গৃহে প্রবেশ-মাত্র হাঁকিলাম,—ওগো···এইবারে খুশী হবে, নিশ্চয়।

অন্ধ জাগো—কিবা রাত্রি, কিবা দিন!

স্ত্রী-ভাগ্য বলিয়া কথা আছে—ভাগ্যই! নহিলে···

ষ্টুল দেখিয়া স্ত্রী জ্বলিয়া উঠিলেন,—কত টাকা আমার এ পিণ্ডিতে খরচ হলো, শুনি?

ভড়্‌কাইয়া গেলাম। কিন্তু তা গেলেও কি নিস্তার আছে! দাম বলিলাম। স্ত্রী কহিলেন—চণ্ডীটার গায়ে জামা নেই—তার জামা এনে দিলে কাজ হতো! তা নয়, এলো এক বাজনার চেয়ার! ও চেয়ার নিয়ে কি হবে, শুনি?

আমি কহিলাম,—তুমি বসে বাজনা বাজাবে।

স্ত্রী মুখ-চোখের যা-ভঙ্গী করিলেন—বায়োস্কোপের ছবির পর্দাতেও তেমন ভঙ্গী কখনো দেখা যায় নাই! বুক হু-হু করিয়া উঠিল।

স্ত্রী কহিলেন,—যত বয়স হচ্ছে, সখ তত বাড়চে! কিন্তু আমার দ্বারা গান-বাজনা হবে না। শোনবার সখ থাকে, দেখে-শুনে একটি যুবতী স্ত্রী আনো···

আমি ভীত, কম্পিত, মূর্চ্ছিত-প্রায়!

অচিরে চেতনা ফিরিল। শুনিলাম, স্ত্রী বলিতেছেন, এই যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পয়সা আনা—সে পয়সায় দুটো ভাল জিনিষ খাও—তা নয়! রাজ্যের বাজে সখে সে পয়সা নষ্ট করা! তাতে বাধে না? আর সেদিন এক ভিখিরীকে দু' আনা পয়সা দিয়েছিলুম—তাতে কি চোখ রাঙানি!···জ্বলে গেলুম! জ্বলে গেলুম! কবে যে এ সংসার থেকে ছুটী মিলবে—হাড় জুড়োবে···

বচনের বন্যা বলিয়া কথা আছে! স্ত্রীর কণ্ঠে সেই বচনের বন্যা বহিয়া চলিল।

তক্তাপোষে পড়িয়া নানা কথা ভাবিতেছিলাম। স্ত্রীর মন···সত্যই জীবনে তা দুর্ল্লভ রহিয়া গেল!

এই যে কবি-মহাকবির দল করুণাময়ী মমতাময়ী বলিয়া কত না বিশেষণে নারীকে বিভূষিতা করিতেছেন—সে নিছক কল্পনা? না, তাঁদের ঘরে বিড়ম্বনা নাই? কিম্বা তাঁরা ঐ-মনের সাধনায় স্তব-স্তুতির বচন-বিন্যাসে শুধু কৌশল ফলাইতেছেন?

গভীর সমস্যা! এ সমস্যার সমাধান কিসে হয়, তার উপায় আপনারা বলিতে পারেন?

# উপসর্গ

তারানাথ বি-এ পাশ করিয়া গৃহে বসিয়া ছিল। লেক-রোডের কাছে নূতন বাড়ী; বিষয়-সম্পত্তি কিছু আছে; কাজেই ল' পড়ার প্রয়োজন ছিল না। তবে সুবিধা পাইলে কোনো রকম ব্যবসা খুলিয়া বসিবে, ইহাই ছিল তার সঙ্কল্প।

সুদীর্ঘ অবসর। গৃহে বসিয়া সে খবরের কাগজ এবং রাজ্যের কাব্য-উপন্যাস পড়ে। ভোরের দিকে ও সন্ধ্যায় নূতন পল্লীর পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহাই তার দিনের কাজ।

কাব্য-উপন্যাস সে পড়ে বটে, কিন্তু তারি একটা পৃষ্ঠায় কোনো দিন ঢুকিয়া পড়িবে, এমন কল্পনা তার মনে কোনোদিন স্থান পায় নাই। অর্থাৎ কাব্য পড়িলেও তার চিত্তটুকু ঠিক কবি-জনোচিত ছিল না।

কিন্তু দৈবাৎ একদিন ঘটনা যা ঘটিল, উপন্যাসের পাতায় তেমন ঘটনার কথা সে বহুবার পড়িয়াছে। কাল—সন্ধ্যার অব্যবহিত পর-ক্ষণ; শ্রাবণ মাস। আকাশে কালো মেঘের ঘন-ঘটা—মাঝে মাঝে দু'চার পশলা বৃষ্টি হইতেছে; দিনের বেলায় সূর্য্য একবারো দেখা দিবার অবসর পায় নাই। তারানাথ নিত্যকার মত বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। পথে জল-কাদা তেমন নাই।

এধারটায় কাদা এখনো জমিতে পারে না। হালের তৈরী পথ। অনেক পয়সা খরচ করিয়া পথ তৈয়ারী হইয়াছে, সেজন্য বোধ হয় কাদা জমাইতে পথের চক্ষুলজ্জা হয়। কিন্তু সে কথা থাক্!

তারানাথ বেড়াইয়া ফিরিতেছিল। একটা গলির মুখ। ধাঁ করিয়া একখানা ট্যাক্সি পশ্চিম দিক্ হইতে আসিয়া গলিতে ঢুকিল। পিছল পথ। ট্যাক্সির টায়ার সে পিছলে কেমন বেটক্করে গড়াইতে, গাড়ী গিয়া ধাক্কা দিল পাশের একটা বড় শিশুগাছে—গাছটা মড়-মড় করিয়া উঠিল, এবং ট্যাক্সিখানা গাছে ঠেকিয়া আরো পিছলাইয়া এক ধারে কাৎ হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্ত্তনাদ উঠিল।

তারানাথ চকিতে চমকিয়া উঠিল, স্বপ্ন? না…? নিমেষের জন্য তার চেতনা যেন বিলুপ্ত হইল! চমকের ভাব কাটিতে সে চাহিয়া দেখে, আলো-আঁধারের মধ্যে ট্যাক্সিটা কাৎ হইয়া পড়িয়াছে, আর তার মধ্যে বস্ত্রাবৃত……

ছুটিয়া সে সেখানে গেল। তখন তার দুই হাতে কোথা হইতে এমন প্রচুর-শক্তি আসিয়া জমিল, যে প্রচণ্ড-বিক্রমে ট্যাক্সির হুড্ ঠেলিয়া, হাত ধরিয়া দুটি প্রাণীকে টানিয়া বাহির করিল। একজন পুরুষ, প্রৌঢ়; আর একজন নারী, তরুণী। তাঁদের বেশ—ছিন্ন, কলেবর—কর্দ্দমাক্ত। দু'জনেরই চোট্ লাগিয়াছে—তবে চোটের চেয়ে আতঙ্ক বেশী। তরুণী কাঁপিতেছিল। প্রৌঢ় দাঁড়াইয়া ডাকিলেন,—নীরু……

তরুণী কহিল,—এই যে বাবা।

প্রৌঢ় তার কাছ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইলেন, তরুণীর হাত ধরিয়া কহিলেন,—হাত-পা ভাঙেনি তো? লাগেনি বেশী? প্রৌঢ় সস্নেহে তরুণীর গায়ে হাত বুলাইলেন।

তরুণী কহিল—না বাবা। তবে পা বেশ নাড়তে পারচি না। তোমার খুব লেগেচে—না?

প্রৌঢ় কহিলেন—বিশেষ কিছু হয়নি।

তরুণী কহিল,—তোমার জন্যই আমার ভয়…

প্রৌঢ় কহিলেন—মস্ত ফাঁড়া কেটেচে। প্রাণটা যে……

তারানাথ চুপ করিয়া ছিল না। ততক্ষণে সে ড্রাইভারকে টানিয়া বাহির করিয়াছে। ড্রাইভারের মাথা কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে। সে মূর্চ্ছিত।…

প্রৌঢ় অগ্রসর হইয়া আসিলেন, কহিলেন,—ভগবান তোমায় পাঠিয়েছিলেন্ বাবা। তা, ড্রাইভারটি বেঁচে আছে তো?

তারানাথ কহিল—বেঁচে আছে। তবে অজ্ঞান হয়ে গেছে। জল চাই।

তরুণী কহিল—এই যে একটা কল আছে। জল পাবো না?

প্রৌঢ় কহিলেন—রাত্রে কি কলে জল থাকে মা?

উদ্বিগ্নভাবে তরুণী কহিল—তবে কি হবে?

তারানাথ কহিল—আপনাদের তেমন চোট্ লাগেনি তো?

প্রৌঢ় কহিলেন,—না!

তারানাথ কহিল—এই কাছেই কাবো বাড়ী থেকে আমি টেলিফোন্ করি আম্বুলান্সের জন্য। যদি আঘাত গুরুতর হয়ে থাকে? কি জানি…

প্রৌঢ় কহিলেন—খুব ভালো কথা, বাবা। আমরা এখানে দাঁড়াই ততক্ষণ।

তারানাথ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।…এবং টেলিফোন করিয়া দশ-বারো মিনিট পরেই ফিরিল। ফিরিয়া দেখে, ড্রাইভার শুইয়া আছে, এবং পাশে ডোবার জলে বসন-প্রান্ত ভিজাইয়া নিঙড়াইয়া সেই জল তরুণী ড্রাইভারের মাথায় কপালে দিতেছে। পথের গ্যাসের ম্লান আলো তরুণীর মুখে পড়িয়াছে। সে আলোয় তরুণীর মুখে উদ্বেগের কাতরতাটুকু তারানাথের দৃষ্টি এড়াইল না।

স্কটের সেই লাইনগুলা চট্ করিয়া তারানাথের মনে জাগিল,—

When pain and anguish wring the brow,
A ministering angel, thou !

ঠিক কথা! নিভৃত কুঞ্জে প্রণয়ীর বাহু-বন্ধনে, কিম্বা বাতায়নে-প্রতীক্ষমাণা নায়িকার বেশে নারীকে তেমন মানায় না, যেমন মানায়, আর্ত্তের শিয়রে এই সেবা-ময়ীর বেশে!

প্রৌঢ় কহিলেন—টেলিফোন করলে বাবা?

তারানাথ কহিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, করেচি। আম্বুলান্স এখনি আসবে।

প্রৌঢ় ডাকিলেন—নীরু…

নীরু কহিল—বাবা…

প্রৌঢ় কহিলেন—ওর মূর্চ্ছা ভাঙলো?

নীরু কহিল—না।

প্রৌঢ় কহিলেন—একে আঘাত, তায় Shock…

তারানাথ কহিল—বাঁচবে বৈ কি। দেখি…

নীরু কহিল—আপনি ডাক্তার?

তারানাথ কহিল—না।

নীরু কহিল—কাছে কোনো ডাক্তার নেই?

তারানাথ কহিল—কাছাকাছি…কৈ, খেয়াল তো হচ্ছে না। অনর্থক দৌড়োদৌড়ি করার চেয়ে আম্বুলান্স ডাকাই ভালো নয়?

নীরু কহিল—আম্বুলান্সের জন্যই আপনি গেছলেন বুঝি?

তারানাথ কহিল—হাঁ। এখনি আসবে!

নীরু কহিল—আঃ, বাঁচলুম। বেচারী।

করুণ নয়নে নীরু ড্রাইভারের পানে চাহিল। শিখ ড্রাইভার। রং ফর্শা, বয়স অল্প। বেচারীরা কি বিপদই না মাথায় করিয়া ছোটে!…নীরু একটা নিশ্বাস ফেলিল। তার পর কহিল—এক কাজ করা যাক। যতক্ষণ না আম্বুলান্স আসে, ততক্ষণ আপনি বরং ওর মাথাটা ধরে বসুন, আমি ঐ ডোবা থেকে জল এনে মুখে-চোখে দি। কপালের রক্তটা…আচ্ছা, দুর্ব্বো ঘাস ছেঁচে দিলে রক্ত বন্ধ হয় না? শুনেছিলুম…

তারানাথ কহিল—তা আমি জানি না। তবে গাঁদা-ফুলের পাতার রসে…শীত কাল…ঠিক কথা। কিন্তু গাঁদা-পাতা এখানে কোথায় পাবো…? তার চেয়ে আপনি ওকে ধরুন—আমি মুখে-চোখে জলের ঝাপ্টা দি…

তাহাই হইল। অনেকক্ষণ…

আম্বুলান্স গাড়ী আসিল। এবং তারা আহত ড্রাইভারকে গাড়ীতে তুলিয়া হাসপাতালে লইয়া গেল। নীরু কহিল—একটু খপর পাবো তো?

আম্বুলান্সের ড্রাইভার কহিল,—ফোন্ করবেন। আমরা একে শম্ভুনাথ-হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি।…

আম্বুলান্স চলিয়া গেলে নীরু কহিল—বেচারীর গাড়ীখানা?

প্রৌঢ় কহিলেন—থানায় ফোন্ করে দেবো'খন। তারা গাড়ী খবরদারীর ব্যবস্থা করবে।

তারানাথ কহিল—আপনাদের বাড়ী?

প্রৌঢ় কহিলেন—কাছেই।

তারানাথ কহিল—চলুন, আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসি।

প্রৌঢ় কহিলেন—তোমার বাড়ী বুঝি এইধারেই?

তারানাথ কহিল—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

প্রৌঢ় কহিলেন—এসো বাবা, সঙ্গেই এসো। তোমার ঋণ কখনো শুধতে পারবো না। ভগবান তোমাকে পাঠিয়েছিলেন। তোমার নাম?

তারানাথ কহিল—শ্রীতারানাথ মিত্র।

প্রৌঢ় কহিলেন—আমার নাম কেশবনাথ ঘোষ। রিটায়ার করেচি। এটি আমার মেয়ে…বলিয়া তিনি ডাকিলেন—নীরু—

নীরু কহিল,—বাবা—

প্রৌঢ় কহিলেন—হেঁটে যেতে পারবি?

নীরু কহিল—পারবো। কতদূরই বা…

প্রৌঢ় কহিলেন—পায়ে লাগছিল, বললি যে! তা, আমার কাঁধে বরং ভর দিয়ে চল্।

নীরু কহিল,—দরকার নেই বাবা। তোমারই বরং চলতে কষ্ট হবে।

তারানাথ কহিল—আমার কাঁধে আপনি ভর দিন্…

প্রৌঢ় কহিলেন—কোনো দরকার নেই। আমার জীবনে এর চেয়ে অনেক বড় বড় accident গেছে। ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়েচি পাহাড়ের নীচে, খদে…কিছু হয়নি। বড় মজবুৎ গড়া আমার শরীর, বুঝলে কি না! বলিয়া প্রৌঢ় উচ্চহাস্য করিলেন।

## ২

পরের দিন সকালে তারানাথের ঘুম ভাঙ্গিলে উঠিয়া সে দেখে, আকাশে মেঘ নাই! চমৎকার রৌদ্র ফুটিয়াছে। এই রৌদ্রের কিরণে সমস্ত দুনিয়ার চেহারাখানা যেন বদ্লাইয়া গিয়াছে! সে আসিয়া খড়খড়ির ধারে দাঁড়াইল। ওধারে বড় রাস্তায় ট্রাম চলার দরুণ একটা ঘড়ঘড় শব্দ…পথে লোকজন চলিতেছে। ওই পথ বৃষ্টির জলে কাল ঝাপ্সা ছিল—গাছগুলার ওধারে সমস্ত চরাচর মেঘে ঢাকা, অস্পষ্ট; দৃষ্টি আর চলে না! দুনিয়া কতটুকু হইয়া গিয়াছিল, ছোট সীমারেখায় ঘেরা! আজ মেঘ নাই,

রৌদ্রের কিরণে কতদূর আকাশ, কত দীর্ঘ পথ ঐ দেখা যাইতেছে! চারিদিকে আলো! দুনিয়ার মুখে হাসি একেবারে জ্বলজ্বল্ করিতেছে!

দাঁড়াইয়া একবার সে কালিকার কথা ভাবিল···সেই ট্যাক্সি-দুর্ঘটনা! সত্যই ঘটিয়াছিল? না, সে মেঘে-ঢাকা আঁধার রাত্রির স্বপ্নের আবছায়া?

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল, সকালে কেশব ঘোষের গৃহে চায়ের নিমন্ত্রণ আছে। ছোট্ট পরিবার। কেমন সজ্জিত সুন্দর গৃহ···পারিপাট্যের কোনো অভাব নাই। রিটায়ার্ড ডিষ্ট্রিক্ট-জজ পয়সাওয়ালা মানুষ শুধু নন, উদার মন! খাশা ভদ্রলোক! আর তাঁর মেয়ে নীরু?

নীরজা? না, নিরুপমা? নিরুপমাই। সে যেন কোন্ কল্প-লোকের জীব! চমৎকার!

মুখ-হাত ধুইয়া পরিষ্কার বেশভূষায় সাজিয়া তারানাথ বাহির হইয়া পড়িল। দিদি কাল শ্বশুর-বাড়ী হইতে আসিয়াছে। দিদি কহিল,—চা খাবিনে?

তারানাথ কহিল—না, এক বন্ধুর বাড়ী চায়ের নিমন্ত্রণ আছে।···

সেই পথ—নিত্যকার পায়ে চলা, পরিচিত। আজ এ পথও যেন পরম রমণীয় কমনীয় হইয়া উঠিয়াছে!

ঐ গলি। গলির শেষে ফটকের গায়ে দোদুল মালতী-লতার ঝাড়। তার ফুল-পাতাগুলা পথের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে—পথে কে আসে, দেখিবার আগ্রহে তারা যেন কঞ্চির মাচায় মুখ গুঁজিয়া থাকিতে চায় না! ফিরাইয়া দিলেও আবার লাফাইয়া ঘুরিয়া দুলিয়া এদিকে ঝুঁকিয়া পড়ে! ফটকের সামনে টুলে দরোয়ান বসিয়াছিল, তারানাথকে দেখিয়া সেলাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তারানাথ ফটকে ঢুকিল।···

—আসুন—ললিত কণ্ঠে কি সুমধুর অভ্যর্থনা! তারানাথ বিহ্বলের মত চোখ তুলিয়া চাহিল—চাহিতে দেখে, গাড়ী-বারান্দার উপর যে লম্বা দালান, সেই দালানে চেয়ারে বসিয়া নীরু। তার পায়ের কাছে তুলার বাণ্ডিলের মত লোমে-ঢাকা একটা কুকুর। তাকে দেখিয়া কুকুরটা ডাকিয়া উঠিল। তার আদরে ব্যাঘাত ঘটিল, তাই তার বিরক্তি। নীরু তাকে ধমক দিয়া কহিল—চুপ।

কুকুরটা চুপ করিয়া এক ধারে সরিয়া বসিল।

নীরু তারানাথকে লইয়া গিয়া ড্রয়িং-রুমে বসাইল, কহিল,—বাবাকে খপর দি···

নীরু চলিয়া গেল। সামনে মস্ত আয়না। তারানাথ উঠিয়া দাঁড়াইয়া আয়নায় দেখিয়া নিজের জামা-কাপড় ঝাড়িয়া লইল, মাথার বিস্রস্ত চুলগুলাকে হাত দিয়া নাড়িয়া সুবিন্যস্ত করিল, তার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া ঘরের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

কেশব ঘোষ আসিলেন। তাঁর হাতে এক গোছা ক্যানা ফুল। তিনি কহিলেন,—এসেচো! নীরু, বয়কে বলো, আমরা তৈরী।

সঙ্গে সঙ্গে নীরু ঘরে ঢুকিল। সে কহিল—বয় নিয়ে আসচে···

চা আসিল, এবং টোষ্ট-রুটী, ডিমের পোচ, ফল, স্বদেশী মিষ্টান্ন।

চায়ের সঙ্গে গল্প সুরু হইল, কালিকার ঘটনা লইয়া। কেশব ঘোষ কহিলেন,—আমার এক বেয়ারাকে পাঠিয়েচি শম্ভুনাথ হাসপাতালে। ড্রাইভারের খপর নেবার জন্য।

চমৎকার সুযোগ! তারানাথ এ সুযোগ ত্যাগ করিল না, কহিল—আমিও চা খেয়ে যাবো, ভেবেচি।

কেশব ঘোষ কহিলেন—যাবে? বেশ—চলো, আমরাও যাই। নীরু যাবি?

নীরু কহিল—যাবো, বাবা। কাল রাত্রে ভালো ঘুমোতে পারিনি। চোখের সামনে কেবলি সে বেচারার সেই মুখ ভেসে বেড়িয়েচে।

কেশব ঘোষ কহিলেন—খেয়ে সকলে যাই, চলো। আবদুল আছে তো? গাড়ী বার করুক।

তার পর নানা কথাবার্ত্তা—তারানাথ কি করে? গৃহে তার কে আছে? কেশব ঘোষ কহিলেন,—আমার একটি ছেলে—সে এখন বিলাতে। বারে ঢুকবে, তার সাধ। আর এই মেয়ে—বি-এ পড়ছিল, এগ্জামিন দিলে না—হঠাৎ কি খেয়াল হলো। মানে, আমার স্ত্রী ইন্‌ভ্যালিড্ হলেন,—তাঁকে কে দেখে, এই ওজুহাতে পড়া ছেড়ে দিলে। আমার ইচ্ছা ছিল, বি-এটা দেয়! তবে ঘরের কাজে খুব পটু। এই যে মিষ্টান্ন দেখচো, এ ওর নিজের হাতে তৈরী। একটা না একটা খাবার প্রত্যহ ওর নিজের হাতে তৈরী করা চাই। তাছাড়া আমার স্ত্রীকে সঙ্গ দিয়ে, তাঁর সঙ্গে নানা গল্প করে তাঁকে এমন যত্নে রেখেচে···

তারানাথ কহিল,—তাঁর কি অসুখ?

কেশব ঘোষ কহিলেন—মানসিক অবসাদ—mental derangement। থেকে থেকে কেমন হয়ে যান—যেন পাগলের মত ভাব! তবে সে-ভাব দু'চার দিনের বেশী থাকে না, তাই রক্ষা। নাহলে—কেশব ঘোষ চুপ করিয়া কি ভাবিলেন, পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—এই মনের জন্যই মানুষ মানুষ। তার বিকার ঘটলে অবস্থা মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। অনেক জায়গায় ঘুরেচি—ওদিকে কাশ্মীর, এদিকে সিলোন্; তা কোথাও কিছু হলো না। তাই ঘরে ফিরে চুপচাপ এসে বসেচি।

তারানাথ করুণ ম্লান দৃষ্টিতে কেশব ঘোষের পানে চাহিল।

কেশব ঘোষ কহিলেন—মানে, সেবারে দার্জ্জিলিংয়ে ল্যাণ্ড্-স্লিপ হয়ে আমার বড় মেয়ে আর জামাই একসঙ্গে প্রাণ হারান্—সেই shock-টার পর থেকেই···

কেশব ঘোষ চুপ করিলেন। তারানাথের চোখের সামনে পাহাড়ের ধ্বংস-স্তূপের উপর হত্যালীলার এক ভয়ঙ্কর ছবি ফুটিয়া উঠিল! শিহরিয়া সে চক্ষু মুদিল।

যথাসময়ে বাহিরে মোটরের হর্ণ বাজিল। কেশব ঘোষ কহিলেন—চলো, বাবা।

তিনজনে হাসপাতালে আসিলেন। ড্রাইভার ভালো আছে। জ্ঞান হইয়াছে। ভয়ের কোন কারণ নাই। নীরু কহিল—বাঁচলুম। যে ভাবনা হয়েছিল!

৩

কেশব ঘোষের সমাদরে-স্নেহে তাঁর গৃহে তারানাথের গতি বেশ সঘন অব্যাহত হইয়া উঠিল। তারানাথ ভাবিত, উপন্যাসে যেমন পড়া যায়—সেই চায়ের টেবিল; লেশের পর্দা; স্নেহ-সমুদ্র-চিত্ত প্রৌঢ় অভিভাবক; তাঁর আদরের তরুণী কন্যা, এবং সে-কন্যা রূপসী ও শিক্ষিতা; রুগ্না গৃহিণী; চায়ের টেবিলের অদূরে পিয়ানো এবং সে-পিয়ানোর ধারে বসিয়া তরুণীর গান; ক্ষণে ক্ষণে সমাজ ও সাহিত্য লইয়া সরস আলোচনা··· তার জীবনে অকস্মাৎ যখন সে সব আয়োজন এমন পুঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে—এবং এতগুলি আয়োজনের সমষ্টি উপন্যাসে যে পরিণতির পথে অগ্রসর হয়, তেমনি সম্ভাবনা তার জীবনেও···

এ কথা ভাবিতে বসিলে তার বুকের মধ্যটা বিষম বেগে দুলিয়া ওঠে···অথচ ভবিষ্যতের কোনো কূল-কিনারা সে খুঁজিয়া পায় না।···

সেদিন তারানাথ মাথায় ব্রশ চালাইতেছে, নীরুদের ওখানে যাইবার জন্য। মা বলিলেন—আজ বেরুস্ নি রে···

তারানাথ কহিল—কেন?

মা কহিলেন—বিমলার মামাশ্বশুরের একটি মেয়ে আছে না—তা, ওর মামাশ্বশুর আজ তোকে দেখতে আসবেন···

বিমলা তারানাথের দিদি। ক'দিন মায়েতে-মেয়েতে এই পরামর্শই চলিতেছিল।

তারানাথ কহিল,—কেন?

মা কহিলেন,—বিয়ের জন্য—আর কেন?

তারানাথ কহিল—কে বললে তোমাদের যে, আমি বিয়ে করবো?

মা কহিলেন—শোনো ছেলের কথা! তুই বলবি, তবে তোর বিয়ের কথা পাড়বো! কেন—তোর আপত্তি কিসের শুনি? এ মেয়ে এ, বি, সি, ডি পড়চে, ইংরাজি শিখচে। বাপ কাটোয়ার উকিল, বেশ দু'পয়সা রোজগার করে···

তারানাথ কহিল—আমি তোমাদের এ, বি, সি, ডি মেয়ে বিয়ে করচি কি না। জানোয়ার, জড়ভরত! ফার্ষ্ট বুক খুলে পড়াতে হবে··A sly fox met a hen ···ও-সব হবে না। আমার সাফ্ কথা!

মা কহিলেন—তুই যে অবাক্ করলি রে! এ্যাঁ, ইংরাজি শিখচে মেয়ে—এ'ও পছন্দ নয়?

তারানাথ কহিল—না।

মা কহিলেন—না তো বাড়ীতে একটু থাকতে হানি কি! ভদ্দর লোক আসচে কত দূর থেকে···

তারানাথ কহিল—আসে, জলটল খেয়ে বাড়ী যাবে, আমায় বলোনি কেন আগে? আমার কাজ আছে, আমি থাকতে পারবো না।

মা কহিলেন—কি তোমার কাজ, তাও বুঝি না! বাড়ীতে তো একদণ্ড থাকো না—কোথায় কি কাজকর্ম্মে ঘুরচো, তুমিই জানো! তা, দাঁড়িয়ে অপমান করাবে···?

তারানাথ সে কথার জবাব না দিয়াই চলিয়া গেল।

পথে বাহির হইয়া তারানাথ মনে মনে গর্জ্জন করিতেছিল,—Impudence! স্পর্দ্ধার সীমা নাই! ···কাটোয়ার মেয়ে বিবাহ করিতে হইবে! মোটরের হর্ণ শুনলে যে মূর্চ্ছা যাইবে···না জানে শাড়ী পরিতে, না জানে জুতা পায়ে হাঁটিতে! ছ্যা···এ-বি-সি-ডি পড়িতেছে—তবেই আর কি, আমার মাথা কিনিয়া ফেলিবে! ওঃ!

সহসা পাশ হইতে ললিত কণ্ঠের আহ্বান—তারা-নাথ বাবু···

চমকিয়া তারানাথ চাহিয়া দেখে, নীরু। তার সঙ্গে একটা বেয়ারা। তারানাথ কহিল—আপনি···?

নীরু কহিল—আপনাকে চমকে দেবো, ভেবেছিলুম। বাবাকে বললুম, তারানাথবাবু রোজ আসেন, তাঁর বাড়ীতে আমরা একদিনও যাই না, এ ভারী অন্যায় হচ্ছে। বাবা বললেন, চলো, আজ আমরা তাকে ডেকে আনি। তা আর তর্ সইলো না, বেয়ারাকে নিয়ে অম্নি বেরিয়ে পড়লুম। ও বললে, বাড়ী ও চেনে।

তারানাথ ভাবিল, সর্ব্বনাশ! আজ কাটোয়ার সেই কে উকিল আসিতেছে—গায়ে পিরাণ আঁটা, কোথাকার জংলী! আর আজই···? তাছাড়া তার বাড়ীর য হাল···

সে কহিল,—আজ আমার বাড়ীতে কেউ নেই

যে···আপনারা আসবেন, এ তো ভালো কথা! আমি নিজেই ভাবছিলুম, একদিন নিয়ে আপনাদের আসবো। মাকেও বলেছিলুম···

নীরু কহিল—তাইতো, কেউ নেই? তা বেশ, আর একদিন—আজ তা হলে বরং লেকে যাওয়া যাক···

তারানাথ কহিল,—বেশ।

নীরজা বেয়ারার দিকে চাহিয়া কহিল—তুই বাবাকে গিয়ে বল্‌বি—আজ আর তারানাথ বাবুর বাড়ী যাওয়া হবে না—আমরা লেকে চললুম। বাবা যদি আসতে চান তো আসতে বলিস্‌।···বুঝলি?

বেয়ারা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে বুঝিয়াছে; এবং পরক্ষণে বিদায় লইল।

নীরজা কহিল—চলুন···

তারানাথ চলিল। নীরজা কহিল—চমৎকার জায়গা হয়েচে ঐ লেক, না?

তারানাথ কহিল—হ্যাঁ।

পথিকের দল দুজনের পানে চাহিয়া দেখিতেছিল, এমনি,···অলস কৌতূহলে। তাদের সে দৃষ্টির স্পর্শে তারানাথের গা ছম্‌ ছম্‌ করিতেছিল।··

দুজনে লেকে আসিয়া বসিল। নীরজা কহিল—আপনি সাঁতার জানেন?

তারানাথ কহিল—জানি।

নীরজা কহিল—আমিও জানি। তবে অভ্যাস নেই···একদিন এই লেকে সাঁতার দেবেন? দেখুন, আমি রাজি আছি।

তারানাথ কহিল—বেশ।

নীরজা কহিল—ঐ দ্বীপটা চমৎকার···ওখানে একদিন গিয়ে বসলে হয়।

তারানাথ অন্যমনস্কভাবে কহিল,—হ্যাঁ···সে কি ভাবিতেছিল।

নীরজা তো কথা কহিতেছে বেশ সহজ স্বচ্ছন্দ ভাবে—তারানাথের জবাব কিন্তু ছোট হইতেছে! তারানাথ লক্ষ্য করিল। কিন্তু কি লইয়া বড় কথা সে সুরু করে? কি এমন কথাই বা নিজে হইতে কহিবে? কহিবার মত একটা কথা আজ শুধু প্রকাণ্ড সুদীর্ঘ পরিসরে ফাঁপিয়া উঠিতেছে! সে কথার আড়ালে বিশ্বের আর সব কথা তলাইয়া যায়! কিন্তু কখন্? কখন্ সে সে-কথা বলিবে?···খুব সংক্ষেপে সে বলিতে চায়, তোমায় আমি ভালোবাসি, নীরু! তার পর আরো-ছোট একটি প্রশ্ন—তুমি আমায় ভালো বাসো?···

তারানাথ নীরজার পানে চাহিল, নীরজার স্থির দৃষ্টি জলের উপর ন্যস্ত। নীরজা কি ভাবিতেছে?···তার বুকে যে-কথা বাজে···তাই কি?

কিন্তু কি বলিয়া ডাকিবে? নীরু? কখনো নাম ধরিয়া ডাকে নাই। ডাকটুকু ছাড়িয়াই এতদিন যা-কিছু কথা কহিয়া আসিয়াছে।···সহসা নীরু বলিয়া সম্বোধন কেমন যেন বাধিতে ছিল! কাশিয়া সে কহিল,—কি ভাবচেন?

নীরজা কহিল,—কত কথা যে মনে আসচে! কত দূর-দূরান্তে আমার মন ভেসে চলেছে···নীরজা একটা নিশ্বাস ফেলিল।

তারানাথের বুকখানা ছাঁৎ করিয়া উঠিল! মনের এই দূর-দূরান্তে ভাসিয়া চলা···কত কথার আনাগোনা? তবে···আনন্দে তার মন দুলিয়া উঠিল! এইবার···

নীরজা বলিল,—একটা গান গাই?

সন্ধ্যার তরল অন্ধকার পাৎলা ছাই-রঙা চাদরের পর্দা বিছাইতেছিল।

তারানাথ কহিল—গান্।

নীরজা গাহিল—

মেঘের পরে মেঘ জমেছে আঁধার নেমে আসে।
আমায় কেন বসিয়ে রাখো একা দ্বারের পাশে?

তুমি যদি না দেখা দাও, করো আমায় হেলা—
কেমন করে কাটবে আমার এমন বাদল-বেলা?

একবার দু'বার তিনবার নীরজা গানটি গাহিল। তারানাথের বুকের মধ্যটা ব্যথায় ভরিয়া আকুল ভারী হইয়া উঠিল। এ কি তাকে লক্ষ্য করিয়াই গাহিতেছে? তার কেবলি মনে হইতে লাগিল, নীরজার দুই হাত ধরিয়া বলে,—থামাও, থামাও তোমার গান, নীরজা···' তোমার বাদল-বেলা আরামে কাটিবে। আমি তোমায় হেলা করি নাই, হেলা করি নাই···

গান থামিল। তার পর দুজনেই চুপ······ওই দূরে দূরে ক'টা আলোর রশ্মি ছুটিয়া চলিয়াছে—মোটরের আলো! ওপারে ও কে গান গায়? কি গায়?

ওরে বল্‌ তারে বল্‌,
প্রাণ কি সে চায়,···
বেলা যে ফুরায়।

ঠিক কথা! বেলা ফুরায়—বেদনা বাড়িয়া চলে! প্রাণের কথা বলিয়া ফ্যাল্—আর দেরী নয়!

তারানাথ ডাকিল—নীরজা···দেবী······

নীরজা কহিল—ডাকচেন?

তারানাথ কহিল—হ্যাঁ।

নীরজা ফিরিয়া চাহিল, কহিল—কি?

নীরজার স্বর বেশ সহজ! তারানাথ কাশিল! তার কথা বাধিয়া গেল। নীরজা কহিল—কি বলচেন? উঠতে চান?

তারানাথের সব কথা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল। সে কোনো মতে বলিল,—হাঁ। তার পর আবার কাশি… কাশিয়া কহিল—রাত হয়ে যাচ্ছে, না?

—বেশ, উঠুন। নীরজা উঠিয়া দাঁড়াইল।

তারানাথের মনে হইল, কাছের ঐ গাছে নিজের মাথাটাকে ঠুকিয়া ছেঁচিয়া সে চূর্ণ করিয়া দেয়! কাপুরুষ! এটুকু সাহস যদি না থাকে, তবে তরুণীর প্রেম কামনা করো কি বলিয়া?

উঠিয়া একটু অগ্রসর হইতেই কেশব ঘোষের সঙ্গে দেখা। তিনি কহিলেন—এর মধ্যে উঠলে তোমরা?

নীরজা কহিল—তারানাথবাবু বললেন, রাত হয়ে গেছে…

কেশব ঘোষ কহিলেন—বাড়ীতে বুঝি কাজ আছে?

তারানাথ কহিল,—না।

কেশব ঘোষ কহিলেন—তবে চলো আমার ওখানে! একটা নতুন বই এনেচি। তোমাদের দেখাবো।…

## ৪

আরো আট-দশ দিন পরের কথা।

দুপুরে আহারাদি সারিয়া তারানাথ একখানা বাঙলা উপন্যাস পড়িতেছিল। পড়ায় মন লাগিতেছিল না; মন ঘুরিতেছিল সেই মালতী লতার ঝাড়-ঘেরা গৃহের আশে-পাশে। কিন্তু দু'ঘণ্টা পূর্ব্বে সেখান হইতে আসিয়াছে, এখনি আবার যাওয়া? কি বলিয়া যায়? কাজেই…

ভৃত্য পঞ্চা আসিয়া একখানা চিঠি হাতে দিল। ডাকের চিঠি নয়। তারানাথ কহিল—কে আনলে এ চিঠি?

পঞ্চা কহিল—ঘোষ সাহেবের বাড়ীর বেয়ারা…

ও! তারানাথ চিঠি খুলিয়া দেখে—নীরজা লিখিয়াছে! বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। সে চিঠি পড়িল। লেখা আছে,—

তারানাথবাবু,

আজ ঠিক সাড়ে পাঁচটায় আসা চাই। বেড়াতে যাবো। কোনো আপত্তি শুনবো না। ঠিক আসচেন তো? না এলে ভারী রাগ করবো।

নীরজা…

সাধ হইল, চিঠিখানা সে বুকে চাপিয়া ধরে! এ যেন পাখীর গান, ঝর্ণার জল, ফুলের গন্ধ! কি আরাম এই কটি ছত্রে! প্রণয়ের কোনো লীলা কোথাও নাই! তবু এই যে কথাটুকু,…না এলে ভারী রাগ করবো। আঃ! লক্ষ্মীছাড়া পঞ্চাটা রহিয়াছে! নহিলে…

সে তার নাম-ছাপা চিঠির কাগজে পরিষ্কার অক্ষরে লিখিল,—

নীরজা দেবী

নিশ্চয় যাবো। রোষের বা অভিমানের কোনো হেতু থাকবে না। কৃতজ্ঞ হৃদয়ের ধন্যবাদ নিন।

তারানাথ

খামে পুরিয়া চিঠিখানা পঞ্চার হাতে দিয়া তারানাথ কহিল—দিগে যা…আর অমনি আট আনা বখশিসও বেয়ারাকে দিবি, বুঝলি?

ঘাড় নাড়িয়া পঞ্চা চলিয়া গেল।……

কিন্তু বেলা এখন একটা…সাড়ে চার ঘণ্টা! কি করিয়া এই দীর্ঘ সময় কাটানো যায়?

আয়নার সামনে গিয়া সে দাঁড়াইল। আর একবার কামাইয়া লইলে হয়…দাড়িগুলা…হুঁ! খুর-ব্রশ-সাবান বাহির করিল। সকালের কামানোর উপর আবার দাড়ি-গোঁফ চাঁছিল। তার পর কাপড়-জামা! আলমারি খুলিয়া ঘাঁটিয়া টানিয়া বাছিয়া একপ্রস্থ পোষাক বাহির করিল। এই সঙ্গে…ঠিক! সে পঞ্চাকে ডাকিল।

পঞ্চা আসিলে তাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিল,—পাম্প-শুটায় ক্রীম্ লাগাতে পারো না রোজ?… বার কর্ জুতো। কালো পাম্প—লাগা ক্রীম্।

পঞ্চা কহিল,—আজ্ঞে খেয়ে উঠে…

তারানাথ কহিল—না, আগে ক্রীম দে, দিয়ে তার পর খেতে যাবি…

তবু অনেকখানি সময় এখনো বাকী…

সে গ্রামোফোনে রেকর্ড চাপাইল।…অসহ্য! গ্রামোফোন বন্ধ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।…

কথায় বলে, কণ্টক-শয্যা! ভারী ছোট কথা… শয্যা নয়, কণ্টক-গৃহ! না হয় একটু আগেই যাই… ক্ষতি কি! যদি…

কি আর ভাবিবেন? না হয় কেশব ঘোষের সঙ্গে খানিকটা ফিলজফির চর্চ্চা হইবে।…

সুবাসিত সাবান মাখিয়া স্নান করিয়া জামায় সেণ্ট্ ঢালিয়া সজ্জিত বেশে তারানাথ বাহির হইল।…

নীরজা কহিল,—বাবা বাড়ী নেই। এক মুস্কিল বেধেচে।

মুস্কিল! তারানাথ কহিল,—কি হয়েচে?

নীরজা কহিল—মানে, আমার এক মাসিমা তাঁর জাওয়ের মেয়ের বিয়েয় কেষ্টনগর গেছেন। দুটি ছেলেমেয়ে—সে পাড়াগাঁয়ে তাদের এত আগে থেকে নিয়ে যাবেন না বলে আমাদের এখানে রেখে গেছেন। ছেলেমেয়েরা খুঁৎখুঁৎ করচে। বাবা কি কাজে বেরিয়ে গেলেন।…সেই ছেলেমেয়েদের একটু ভোলাবার জন্য

আমায় বলে গেছেন, ওদের নিয়ে বায়োস্কোপে যেতে হবে। কি একখানা কমিক্ ছবি আছে পিক্চার প্যালেশে! তাই আপনার শরণ নিতে হলো।

—তার আর কি! বলিয়া তারানাথ একটা কৌচে বসিয়া পড়িল। নীরজা ডাকিল,—দিবু…

দশ বছরের একটি ছেলে লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া হাজির। হাফ্-প্যাণ্ট পরা, গায়ে টুইল সার্ট, পায়ে একজোড়া করিয়া গিদ্ধড় বুট্। ছেলেটির এক হাতে ব্যাট, অপর হাতে বল, বগলে এক-রাশ কাঠি আর ছেঁড়া কাগজ। একটু আগে লজেন্সেস খাইয়াছে; দু'গালে তার রস একেবারে ল্যাবড়ানো রহিয়াছে।

নীরজা কহিল—টুনি কোথায়? এবারে তৈরী হও দুজনে।

দিবু কহিল—টুনি ঐ চায়ের কেট্‌লি নিয়ে চা তৈরী করচে…

নীরজা দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া কহিল,—চা তৈরী করচে!

পরক্ষণেই ওদিকে ঝন্-ঝন্ শব্দ! নীরজা ছুটিয়া গেল এবং পর-মুহূর্তে ছ'বছরের একটি মেয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া আনিল! মেয়েটার হাত কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে—ফ্রকে চা লাগাইয়াছে—মুখে চায়ের ভিজা পাতা ও চিনির রস! ব্যাপার দেখিয়া তারানাথের চক্ষু-স্থির! এই পরিচ্ছন্ন স্বর্গলোকে এ দুটো ছেলেমেয়ে যেন বিপ্লবের মত।

নীরজা টুনিকে বকিল, পরে বেয়ারাকে ডাকিয়া আদেশ দিল,—এর হাত-মুখ ধুইয়ে একটা ফ্রক পরিয়ে দে। আর দিবু, তুমি মুখ-হাত সাফ করে ফেলো… নাহলে বায়োস্কোপ দেখাতে নিয়ে যাবো না।…

স-পাঁচটায় বাহিরে মোটরের হর্ণ বাজিল। দিব্যনাথ এবং টুনিকে লইয়া তারানাথ ও নীরজা আসিয়া মোটরে উঠিয়া বসিল। বিশ মিনিটে পিকচার প্যালেশ।

নীরজা একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া কহিল—টিকিট কিনুন্…

তারানাথ কাতর দৃষ্টিতে নীরজার পানে চাহিল, কহিল—আমি এ সামান্য অধিকারটুকু…

হাসিয়া নীরজা কহিল—মাপ করবেন। বেশ, তাই হোক্।

তারানাথ গিয়া টিকিট কিনিল—চারখানা ফার্ষ্ট ক্লাশ।

টিকিট কিনিয়া ফিরিয়া নীরজার পানে চাহিল। নীরজা তখন সাহেবী-পোষাক-পরা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তীব্র আগ্রহে কথা কহিতেছে। তার মুখে-চোখে হাসি!

তারানাথ ডাকিল—আসুন…

নীরজা কহিল—যাচ্ছি। আপনি এগোন এ-দুটোকে নিয়ে…

দু'হাতে দিবু ও টুনির হাত ধরিয়া তারানাথ গিয়া সীটে বসিল—নিজের এক পাশে জায়গা খালি রাখিল নীরজার জন্য।

ভিতরে দর্শকের দলে হাসি, কৌতুক ও কলরবের যেমন অন্ত নাই, পোষাকে বর্ণের বৈচিত্র্যেরো তেমনি অন্ত নাই!…

ঘণ্টাধ্বনি…আলো নিবিল। তারানাথ অধীর হইল—নীরজা? ছবি সুরু হইয়া গেল। প্রথমেই গেজেট। টুনি এবং দিবুর বকুনিও সেই সঙ্গে সুরু। ওটা? গাড়ীর পিছনে লোক নেই কেন? কামানের শব্দ কৈ? বা রে!…মেমটা কি করচে?…প্রশ্নের জ্বালায় তারানাথ অতিষ্ঠ হইল। ওদিকে নীরজারও দেখা নাই!

ড্রামাও আরম্ভ হইয়া গেল—কমেডি; হারল্ড লয়েডের। ছবির দিকে তারানাথের এতটুকু মন নাই। নীরজা? মনের মধ্যে সহস্র প্রশ্ন জাগিতেছিল। নীরজা? মনের বাহিরে দিবু ও টুনির তেমনি প্রশ্নের পর প্রশ্ন! বুঝাইলে থামে না, বকিলে আরো প্রশ্ন তোলে। এক তিল বিরাম নাই। তারানাথের মনের অবস্থা ভালো ছিল না। তার উপর প্রশ্ন, আর নানান্ বায়না! তার মনে হইতেছিল, এদুটার মাথা ঠকাঠক্ ঠুকিয়া দেয়! এ সন্দেহও তার মনে জাগিল, ছেলে-মেয়ের জ্বালায় জ্বলিয়া নীরজার মাসিমা ইহাদের এখানে ফেলিয়া হরিদ্বারের ওদিকে পলাইয়া যান নাই তো? বাপ, কি ছেলেমেয়ে! জীবন্ত বর্গীর হাঙ্গামা!

অবশেষে Interval…আঃ!

আলো জ্বলিতে তারানাথ চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখে,—নীরজা? না, সে কোথাও নাই। তার ভাবনা হইল। দুশ্চিন্তার রাশি আসিয়া একেবারে অক্ষৌহিণী সেনার মত মনকে ছাইয়া ফেলিল।

দিবু কহিল—ডাল ভাজা খাবো।

টুনি কহিল,—ঐ চকোলেট…

মৃদু বায়না ক্রমে তীব্র বিরক্তির সহিত মিশিয়া সশব্দ হইয়া উঠিল। পাশের দর্শকের দল কৌতুকে মাতিয়া তাদের পানে চাহিতে লাগিল।

রোষে ক্ষোভে নৈরাশ্যে জ্বলিয়া ছেলেমেয়েদুটার হাত ধরিয়া টানিয়া তারানাথ বাহিরে আসিল… চকোলেট কিনিল, ডাল-ভাজাও। টুনি ও দিবু কত দিনকার দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের মত যে ভঙ্গীতে সে-গুলার সদ্ব্যবহার করিতেছিল, দেখিয়া তারানাথের পিত্ত

জ্বলিয়া গেল। বায়নার তখনো অন্ত নাই! একটা বাঁশী···দিবু কহিল—আমার একটা ফুটবল চাই—কিনে দিন। তারানাথ ভাবিল, ইহাদের এখানে ফেলিয়া পলাইতে পারিলে সে বাঁচে! কি আশা লইয়া আসিয়া-ছিল, আর···

ভিতরে ছবি চলিতেছে। তারানাথ গেল না। ভাবিল, গাড়ীখানা?

পথে বাহির হইয়া যতদূর দৃষ্টি চলে,·· কেশব ঘোষের মোটরের চিহ্নও নাই! তবে কি···? না,অসম্ভব। কিন্তু গেল কোথায়? সেই লোকটা কোনো ছলে···? সে চমকিয়া উঠিল। Elopement? সর্ব্বনাশ! গিয়া কেশব ঘোষের কাছে সে কি কৈফিয়ৎ দিবে? কোন্ মুখেই বা ফিরিবে সে?···না, ফেরা হইবে না! এখান হইতে সটান···! কিন্তু ছেলেমেয়ে দুটা? তাদের নাহয় থানায় জিম্মা করিয়া দিবে!···

তারানাথ কি পাগল হইবে? তার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিতেছিল!···চেতনা নাই···বুকে শুধু ঐ এক প্রশ্ন! মস্ত কাঁটার মত সর্ব্বক্ষণ বিঁধিতেছে···নীরজা, নীরজা!···

বায়োস্কোপ ভাঙ্গিল। দলে-দলে লোক গৃহে ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছে। টুনি ততক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে! তাকে বুকে তুলিয়া দিবুর হাত ধরিয়া তারানাথ হতভম্বের মত দাঁড়াইল। মুখের চেহারা যা হইয়াছে···যেন সে সদ্য খুন করিয়া আসিয়াছে! উদ্বিগ্ন আকুল দৃষ্টিতে বেচারী সকলের মুখের পানে তাকাইতেছে···ইহাদের মধ্যে নীরজাকে যদি খুঁজিয়া পায়! কিন্তু··

—মাপ করুন তারানাথ বাবু···

সেই পরিচিত স্বর! আঃ!

তারানাথ চাহিয়া দেখে, নীরজা! হাসি-ভরা মুখ, আর তার পাশে সাহেবী পোষাক-পরা সেই ভদ্র-লোক!···পাজী, শয়তান! তার সন্ধ্যাটাই আজ মাটী করিয়া দিয়াছে!

একটা সংশয়·· ক্রূর দৃষ্টি! চকিতের জন্য! না, নীরজার ওই হাসি-মুখ···কিন্তু আশ্চর্য্য!

নীরজা কহিল—আপনাকে বড কষ্ট দিয়েচি, মাপ করবেন! শুধু এঁর দোষে···

বলিয়া নীরজা পাশের ভদ্র লোকটির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। তারানাথ রাগে গুম্···মেয়েটা তখনো বুকের উপর ঝুলিতেছে। চকোলেট, আর টুনির লালা-রসে তার সিল্কের দামী শার্টটার শ্রী যা হই ···

নীরজা কহিল—আলাপ করিয়ে দি। ইনি আমাদের বন্ধু শ্রীযুক্ত তারানাথ মিত্র বি-এ। আর···

নীরজার মুখে মৃদু হাসি, লজ্জার ঈষৎ আভায় সে হাসিতে অপরূপ মাধুরী! নীরজা বলিল,—এঁর নাম নিশীথচন্দ্র বোস···

ভদ্রলোক হাসিয়া কহিলেন—এঁর পাণিগ্রহণের জন্য নির্ব্বাচিত পাত্র! বাঙলা ভাষাটুকু ঠিক হলো তো···? বলিয়া তিনি নীরজার পানে চাহিলেন।

নীরজা কহিল—উনি থাকেন শিলঙে···সেখানে কারবার করেন।

ভদ্রলোক কহিলেন—এবং সামনের অঘ্রাণ মাসে ইনিও শিলঙ যাবেন। যেহেতু অঘ্রাণে আমাদের বিবাহ হবে।···

কথাগুলা বাজের মত তারানাথের কাণে বাজিল!··· নীরজা বলিতেছিল—আজ সকালে ইনি কলকাতায় এসেচেন। আমাদের ওখানে গেছলেন সন্ধ্যার আগে—আমার দেখা পাননি। সেখান থেকে খপর পেয়ে এখানে আসেন···এম্পায়ারে মহিলারা মিলে 'দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর' প্লে করচেন আজ—চ্যারিটিতে। তার দু'খানা টিকিট ওঁকে গচিয়েছিল। তাই আমায় নিয়ে যাবেন বলে আমাদের ওখানে গিয়েছিলেন···তাছাড়া ওঁর দিদিও এম্পায়ারে এসেছিলেন কি না, আমাকে তিনি দেখতে চেয়েছিলেন। কাজেই যেতে হলো। ভেবেছিলুম, শীগ্‌গির ফিরে আসবো, আপনাকে একলা রেখে গেছি··· তা, কথায় কথায়···

তারানাথ কোনো জবাব দিল না। নিশীথ কহিল—ভদ্দর লোক লগেজ ঘাড়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন! চলো, তোমাদের গাড়ীতে তুলে দি। কাল সকালে তোমাদের ওখানে যাবো। আমি আবার পরশু শিলঙ্ যাচ্ছি···

গাড়ীতে চড়া এবং বাড়ী আসা·· সে যেন অস্পষ্ট স্বপ্নের আব্‌ছায়া! গাড়ীতে নীরু কি-সব বকিতেছিল, অনেক কথা! এবং তারানাথ তার উত্তরে কি যে বলিয়াছে, সেদিকে তার কোনো চেতনা ছিল না···

পরের দিন সকালে খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে হঠাৎ কি-একটা বিজ্ঞাপন দেখিয়া তারানাথ কোথায় একখানা চিঠি লিখিল; এবং দিন পনেরো পরে ভগ্নীপতি নিকুঞ্জ আসিয়া বলিল—ব্যাপার কি হে? তুমি শেষে চেৎলা হাই স্কুলে হেডমাষ্টারি করতে ঢুকলে যে!

হাসিয়া তারানাথ কহিল—চুপ করে এ বয়সে বসে থাকা ঠিক নয়। নিষ্কর্ম্মা বেকার বসে থাকলে···

নিকুঞ্জ কহিল—মাথায় বোল্‌তার চাক বাঁধে। না?

হাসিয়া তারানাথ কহিল—যা বলেচো! বোল্‌তার চাকই বটে। চম্পক-বর্ণের মোহ—সেই সঙ্গে বিকট জ্বলুনি! ওঃ!

মা আসিলেন, আসিয়া কহিলেন—এমন খেয়ালী ছেলে যদি বাপের জন্মে দেখে থাকি! কাজই যদি কিছু করবি তো একটা ব্যবসা-ট্যাবসার ইচ্ছা, তাই না হয় কর্! তা নয়, কোথায় ছেলে-ঠ্যাঙানির চাকরী করতে জুটলো! নব্বই টাকা মাইনে! এ টাকায় তোর এমন কি দরকার বাপু!

তারানাথ কহিল—টাকার জন্য নয়, মা। একটা কাজ নিয়ে থাকা—

মা কহিলেন—তার পর এই বিয়ে...

মা জামাতার দিকে চাহিলেন, সখেদে জানাইলেন,—তোমার মামা অত ধরলেন···ভাগ্যে সেদিন আসতে পারলেন না, তাই! নাহলে কি ভাবতেন! দিব্যি লেখাপড়া-জানা মেয়ে···

তারানাথ কহিল—লেখাপড়া-জানা মেয়ের নাম আর মুখে এনো না মা। লেখাপড়া-জানা মেয়ের নামে আমার প্রাণে কেমন আতঙ্ক জাগে।

মা কহিলেন—শোনো কথা! একদিন বললে, লেখা-পড়া-জানা মেয়ে চাই—পোঁটা-ঝরা মুখ্যু মেয়ে বিয়ে করবো না! আবার আজ বলচে, লেখাপড়া-জানা মেয়ের নাম করো না!—তা নিকুঞ্জ, তুমি এসেচো বাবা, ও কি চায়—তুমি বুঝে তার একটা বিহিত করে যেয়ো। আমার যেন গোলক-ধাঁধায় বাস হয়েচে। পাগল হবো!

# বর্ষাতি

বেলা তিনটা হইতে মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়াছে। আষাঢ় মাস। আধ ঘণ্টার মধ্যে কলিকাতার রাস্তা জলের নীচে অদৃশ্য হইয়া গেছে।

সেদিন শনিবার। এদিকে বিবাহের লগনশা—ওদিকে মাঠে ম্যাচ্—মাঝে এই বৃষ্টি! কি করিয়া যে কি হইবে! ঘর-বাহিরে লোকের আকুলতার আর সীমা নাই!

কাষ্টম্ অফিসের একটি ঘরে বসিয়া বিনোদ। তার হাতের কলম সরিতে চায় না! বড় জানালার ফাঁক দিয়া বাহিরের আকাশ যেটুকু দেখা যায়, তাহারি পানে সে চাহিয়া ছিল। বাহিরে ঘন ঘোর অন্ধকার। বর্ষণ থামিবার কোনো লক্ষণ নাই।

অবনী আসিয়া কহিল,—আজ না তোমার সেই ফ্রেণ্ডের বিয়ে?

বিনোদ কহিল,—হ্যাঁ।

অবনী কহিল,—কি করে যাবে?

সমস্যা! বিনোদ কহিল,—তাই ভাবচি।

অবনী কহিল,—না গেলেও নয়!

—তাই।

ফ্রেণ্ডটি বিনোদের বাল্য-বন্ধু অজয়। অজয় বিলাত গিয়াছিল; ফিরিয়াছে। নব্য ব্যারিষ্টার। বিনোদ কাষ্টম অফিসে শ'খানেক টাকা মাহিনার নগণ্য কেরাণী। আজও তবু প্রীতির অভাব ঘটে নাই।

বিনোদও একদিন উচ্চ আশা-মঞ্চের উপর নিজের ভবিষ্যৎকে তুলিয়া ধরিয়াছিল। কিন্তু ভাগ্য! এখন সে থাকে কলিকাতার মেশে, প্রতি শনিবারে অফিসের পর দেশে যায়—সোমবার দশটায় বাড়ী হইতে অফিসে আসে। দেশ কাছে—তেলিনীপাড়ায়।

অজয়ের বিবাহে আজ নিমন্ত্রণ যাইবে বলিয়া সে স্থির করিয়াছিল, অফিস হইতে মেশে ফিরিবে; সেখান হইতে পোষাক বদল করিয়া সোজা কন্যাপক্ষের গৃহে গিয়া উঠিবে। কন্যার পিতা বিমল চক্রবর্ত্তী ডিষ্ট্রিক্ট্ জজ—বিবাহের জন্য লেক রোডের কাছে একখানা বাড়ী ভাড়া লইয়াছেন; সেই বাড়ীতে বিবাহ হইবে।

পাঁচটা বাজিল, বৃষ্টির তবু বিরাম নাই। বিনোদ একখানা রিক্শ ডাকাইয়া তাহাতে চড়িয়া কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে আসিল। একটা সৌখীন বর্ষাতি-কোট কিনিল। বর্ষাতির প্রয়োজন ছিল,—আজ না কিনিলেও চলিত! তবে নেহাৎ নিরুপায়! কাজেই।

মেশ পটলডাঙ্গায়। এদিকে পথ আজ আর পথ নাই—যেন নদী বহিতেছে! ট্যাক্সিগুলা পথের মধ্যে জলে অর্দ্ধমগ্ন পড়িয়া আছে। রিক্শয় চড়িলে ভিজিয়া সারা হইতে হয়।

বাসায় আসিয়া বেশ-ভূষা বদল করিয়া সে বুঝিল, রিক্শয় যাত্রা নাস্তি! গদির রং জামায়-কাপড়ে এমন ছোপ লাগাইয়া দিয়াছে!—যেন সে বহুরূপীর চিত্র-বিচিত্র বেশ! সে-বেশে সৌখীন আসরে গিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা চলে না! ট্যাক্সির তো ঐ অবস্থা!

চট্ করিয়া খেয়াল হইল, এস্প্লানেডের ট্রাম বন্ধ নয়—ও পথে জল তেমন জমিতে পায় না! ঠিক! এখান হইতে একটা ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া এস্প্লানেডে গিয়া ট্রাম ধরিবে। খরচ হইবে। তা' হোক্, জামা-কাপড় ভিজিবে না! তার পর লেক রোডের কাছাকাছি একখানা ট্যাক্সি লইলেই চলিবে।

তাহাই করিল। গায়ে দামী বর্ষাতি-কোট—জল লাগিবে না!...বিবাহ-বাড়ীতে এ-কোটটা রাখিবে কোথায়?...মিছা চিন্তা। যা' হয়, তখন দেখা যাইবে।

বিবাহ-বাড়ীতে অসুবিধার অন্ত নাই। পয়সা খরচ করিলেও এ-জলে আরাম পাওয়া সত্যই দুষ্কর!

বাড়ীর সামনে মস্ত কম্পাউণ্ড; আপাদ-মস্তক হোগলায় ঘেরা। হোগলার নীচে বিচিত্র রঙীন কানাৎ-আঁটা; তাহাতে চীনা লণ্ঠন, নেটের পর্দ্দা, নানা সরঞ্জাম। চেয়ার দিয়া আসর সাজানো। বর তখনো আসে নাই; কন্যা-যাত্রীর কলরবে আসর মুখরিত। বিনোদ আসিয়া সেই আসরের একধারে চুপ করিয়া বসিল।

আদর-আপ্যায়নের অভাব নাই! পাগড়ী-ধারী 'বয়' আসিয়া সামনে ট্রে ধরিল; ট্রে'র উপরে পাণ, চুরুট, সিগারেট, দিয়াশলাই। বিনোদ ভাবিল, বর্ষায় মন্দ হইবে না। সে চুরুট খায় না—তবু কেমন লোভ হইল। চার-পাঁচটি চুরুট তুলিয়া লইল; একটা ধরাইয়া বাকীগুলা বর্ষাতি-কোটের পকেট ফেলিল। অভ্যাস নাই! চুরুটের টান্ সহিবে কেন? কাশি থামাইয়া সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া এক সময় মুখের চুরুট ভূমে ফেলিয়া সেটাকে জুতা দিয়া চাপিয়া মাড়াইল।

আলাপ করিবে, এমন একটি লোক নাই! সে হাত-ঘড়ির পানে চাহিতেছিল—সাতটা বাজিয়াছে। সাড়ে আটটায় হাওড়ায় তাহাকে ট্রেণ ধরিতে হইবে। নহিলে...

বাড়ীতে কতটুকু বা থাকিতে পায়! দু'বৎসর বিবাহ হইয়াছে—পত্নী শান্তি আজও স্নেহে-প্রেমে সেই সদ্য-বিবাহিতা নব-বধূ! লজ্জা আছে, সেই সঙ্গে মান, অভিমান, রোষের স্ফুলিঙ্গ, সোহাগের অশ্রু···এগুলাও! ভাগ্যে এগুলা আছে, তাই প্রাণটা কোনোমতে আরাম পায়, নূতন করিয়া আবার ভবিষ্যতের স্বপ্ন-রচনায় বিভোর হয়!

কিন্তু মুস্কিল বাধিল। ডাকিয়া কেহ কথা কহে না! কাহাকেও বলিতে পারে না—মশায়, আমার ট্রেণের তাড়া আছে, দয়া করিয়া যদি কোথাও একধারে একটা আসন পাতিয়া···

তেমন লোক কৈ? তা ছাড়া এ-আসর ইঙ্গ-বঙ্গীয় —ইহাদের কায়দা-কানুন তার অবিদিত! সে ভাবিল, চুপি চুপি সরিয়া পড়িবে না কি? কিন্তু অজয়···তার সঙ্গে দেখা না করিয়া সরিয়া পড়া ভালো হইবে না। কালও তার অফিসে আসিয়া বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছে—আসা চাই! কোনো ওজর শুনব না! এমন বন্ধু···না। সরা ঠিক হইবে না।

বর আসিয়া সামনে আবার ট্রে ধরিল! এবারও তিন-চারটি চুরুট সে তুলিয়া লইল। লজ্জা ছিল না! আশে-পাশে নিমন্ত্রিতের দল কেহই চুরুট লইতে কার্পণ্য করিতেছে না—দু'চারিটার কম চুরুটও কেহ লয় না!···

কিন্তু আর নয়। হাত-ঘড়িতে···ইঃ, আটটা বাজে! বিনোদ উঠিল। একটি ভদ্রলোক কহিলেন,—পাতা হয়েচে। যারা বস্‌তে চান, আসুন।

বিনোদ আরামের নিশ্বাস ফেলিল। ভগবান্ এক-জন মাথার উপর আছেন! তিনি অন্তর্যামী—বিনোদের মন কি চায়, চিরদিন তাহা বুঝিয়াছেন! বুঝিয়া···

পাতা পড়িয়াছে বাড়ীতে। সেখানে আসিতে হইল। সামনের হল-ঘরে এক খানসামা নিমন্ত্রিতদের ছাতা ও বর্ষাতি-কোট লইয়া পাশের আনলায় রাখিতেছে। বর্ষায় বর্ষাতি-কোট অনেকের গায়ে—কাজেই এই বন্দোবস্ত! দোতলার বারান্দায় পাতা পড়িয়াছে। ব্যবস্থা ভালো। গোর-গোল নাই—যাহা দিবার, পাতে দেওয়া হইয়া গিয়াছে, আহার করিতে বিলম্ব ঘটিবে না!

আহার সারিয়া নীচে নামিয়া বর্ষাতি কোট হাতে লইয়া বিনোদ শুনিল—বর আসিয়াছে, আসরে আছে। বিবাহ শেষ রাত্রে।

তখন বৃষ্টি থামিয়াছে! কালো মেঘের গা চিরিয়া দু'চারি টুকরা সাদা মেঘ—তার বুকে চিকিমিকি পাঁচ-সাতটা নক্ষত্রও উঁকি দিতেছে! গাড়ীভাড়ার পয়সা বাঁচিবে ভাবিয়া বিনোদ আশ্বস্ত হইল! একবার মনে হইল, বর্ষাতি-কোটটা—তাই তো। অনর্থক বাজে খরচ হইয়া গেল!···যাক্, অসময়ে কাজে লাগিবে।

সে আসিয়া আসরে বরের সঙ্গে দেখা করিল, কহিল,—আজ আর বস্‌বো না, ভাই—বাড়ী যেতে হবে। ট্রেণের টাইম···

অজয় কহিল,—বৌ-ভাতের খাওয়ার দিন আসা চাই যোদ্দা···একা নয়, যুগলে।

—নিশ্চয়! নিশ্চয়!

বিদায় লইয়া বিনোদ পথে বাহির হইয়া পড়িল। বৃষ্টি নাই। বর্ষাতি-কোট আর গায়ে চড়াইতে হইল না।

## ২

সকাল বেলা। চমৎকার রৌদ্র ফুটিয়াছে। কেমন আলস্য হইতেছিল, বিনোদ তাই বিছানায় পড়িয়া রহিল। শান্তি চায়ের পেয়ালা হাতে ঘরে ঢুকিল, কহিল,—শ্রীহরির পার্শ্ব-শয়ন এখনো চলেছে! ওঠো, ওঠো···বেলা হয়ে গেছে। আর শুয়ে থাকে না! চা তৈরী।

—উঠি।

বিনোদ উঠিল; তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুইয়া চায়ের পেয়ালায় মনোনিবেশ করিল।

শান্তি কহিল—অমন করে ভিজ্‌তে হয়! জুতো-জোড়া ভিজে চ্যাপ্ চ্যাপ্ কর্‌চে! যেন আমসত্ত্ব! মা গো! ঐ ভিজে জুতো পায়ে এই পথ এসেচো! যদি অসুখ করে? তখন মর্ মাগী তুই ভেবে!

শান্তির এ-মূর্ত্তি বিনোদের বড় ভালো লাগে! যেন সে অসহায়—তাকে দেখা-শুনা করায় অহরহ তাই এমন সতর্কতা!

হাসিয়া সে কহিল,—তুমি সেবা করবে।

কৃত্রিম কোপের ভাবে শান্তি কহিল,—ব'য়ে গেছে আমার! ইচ্ছে করে অসুখ ডেকে আন্‌বে—আর আমি করবো সেবা! কখ্‌খনো না!

বিনোদ কহিল,—কাল যে-বৃষ্টি গেছে, শান্তি—সেই জলে নেমন্তন্ন খাওয়া!

শান্তি কহিল,—না হয়, একখানা গাড়ী ক'রেই যেতে! ট্রামে কেন যাওয়া! দু'পয়সার এসাশ্রয়টুকু না-ই করতে।

বিনোদ কহিল,—দু'পয়সা নয়! বড্ড বেশী খরচ হতো! তোমার একটা কথা যোদ্দা রেখেচি—দেখেচো? বর্ষাতি কিনেচি! বহুদিন থেকে বল্‌চো! না হলে বর্ষাতি-কোট আমার সাজে না, সত্যি! পঁচিশ টাকা দাম পড়ে গেল।

শান্তি কহিল—কিনে ভালোই করেচো। কত দরকারে লাগে, বলো দিকিনি।···বিদেশে পড়ে আছো—জল-বৃষ্টি—কত অসাবধানে থাকো! ভাবনায় এখানে সারাক্ষণ কাঁটা হয়ে থাকি!···নেহাৎ নাকি উপায় নেই!

শান্তির কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইল। সে একটা নিশ্বাস ফেলিল।

বিনোদ কহিল,—তোমার জন্য একখানা ভালো সিল্কের শাড়ী কিন্‌বো ভাব্‌ছিলুম—তা' আর হলো না। ঐ বর্ষাতি-কোট কিনে ফেল্‌লুম।

শান্তি কহিল,—আমি খুব খুশী হয়েচি। শাড়ী পেলে এত আহ্লাদ হতো না, সত্যি!

বিনোদ কহিল,—তা' আমি জানি। সতী সাধ্বী স্ত্রী!

শান্তি কহিল,—থামো, থামো। তুমি খুব পণ্ডিত, আমি জানি।

সকালের আলাপ এই পর্য্যন্ত। তার পর শান্তি ঢুকিল রান্নাঘরে; চা খাইয়া বিনোদ গেল বনমালীদের বাড়ী। বনমালীর গৃহে 'তেলিনীপাড়া বান্ধব নাট্য-সমিতি'র রিহার্শাল বসে—রবিবারে আসর ভালো করিয়া জমে। কলিকাতা-বাসী অনেকেই শনিবার রাত্রে দেশে আসে, তাই।

আসর সারিয়া বিনোদ বাড়ী ফিরিল বেলা বারোটায়। শান্তি আসিয়া দেখা দিল না। খাওয়ার সময় ছোট খুড়ী আসিয়া কাছে বসিলেন। বিনোদের ভালো লাগিল না।

ছোট খুড়ী কহিলেন,—বৌমা আজই চুঁচড়োয় যাবেন?

চুঁচুড়ায় শান্তির পিত্রালয়। সহসা চুঁচুড়া যাওয়ার কথা শুনিয়া বিনোদ বিস্মিত হইল, কহিল,—চুঁচড়ো! আমি তো চুঁচড়ো যাওয়ার কথা জানি না।

—জানিস্ না?

—না।

—সে কি রে! বৌমা সেই চান করে ইস্তক বায়না ধরেচেন, গেল-রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখেচেন—মন অস্থির হয়েচে—কিছু ভালো লাগ্‌চে না

রাত্রে দুঃস্বপ্ন! কৈ, শান্তি তো এমন দুঃস্বপ্নের কোনো আভাস দেয় নাই! চায়ের পেয়ালা আনিয়া দেখা দিল, হাসি-মুখ, খুশী-মন! তেমন দুঃস্বপ্ন দেখিলে বিনোদকে বলিত না?

ছোট খুড়ী কহিলেন—তুইই তো নিয়ে যাবি? না হলে কার সঙ্গে যাবেন!

বিনোদ ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, গম্ভীর স্বরে কহিল,—আমার সময় হবে না…

—তবে কার সঙ্গে যাবেন?

বিনোদ কহিল,—হাবুলকে ডাকাও। সে পারে, নিয়ে যাবে।

তার পর চুপচাপ…

আহার শেষ করিয়া বিনোদ উঠিবার উদ্যোগ করিল, ছোট খুড়ী বলিলেন,—তোর মত আছে তো? আমি বলেচি, বিনোদের যদি অমত না থাকে, যাও বাছা!…তা, কি বলিস্?

বিনোদ কহিল,—আমার মতামতে কিছু এসে যাবে না!

তার বিরক্তি ধরিয়াছিল। বিদেশে সারা সপ্তাহ পড়িয়া থাকে, একটা দিন বাড়ী আসে…শান্তির সঙ্গ চাহিয়া মন কতখানি আকুল হয়!…সেদিকে শান্তির খেয়াল নাই! তাদের প্রেম এখনি এমন পুরানো হইয়া গেল? অভিমানে তার বুক ভরিয়া উঠিল।

নিজের ঘরে আসিয়া সে বসিল। অভিমানের দু'চারিটা বচনের লোভ ছাড়া কঠিন! শান্তি একবার আসিলে হয়… বসিয়া বসিয়া অভিমানের কয়েকটা তীব্র বচন সে মনে মনে আঁচিতে লাগিল!

কিন্তু শান্তির দেখা নাই। একখানা খবরের কাগজ ছিল, বিনোদ সেখানা লইয়া তার পৃষ্ঠাগুলা বার-বার পড়িল। রাজ্যের খবর মুখস্থ হইয়া গেল। এখনো আসে না? শান্তি করিতেছে কি?

উঠিতে হইল। নীচের দালানে আসিয়া দেখে, শান্তির হাতে ছোট একটা পুঁটলি—শান্তি হাবুলকে বলিতেছে,—আর কিছু নেবার নেই, ভাই। চলো…

সম্মুখে বিনোদকে দেখিয়া শান্তি কহিল,—আমি চুঁচড়োয় যাচ্ছি…

গম্ভীর কণ্ঠে বিনোদ কহিল,—বেশ!

শান্তি কহিল,—হাত জোড়া, তাই নমস্কার করতে পারলুম না। মনে মনে নমস্কার জানাচ্ছি।

বিনোদ কোনো কথা কহিল না। তার মনে হইতেছিল, শান্তি অনুমতি চাহিবে! চাহিল না! …কবে ফিরিবে সে-কথাটা…?

তা'ও বলিল না! শান্তি ঘর ছাড়িয়া বাহিরের উঠানে নামিল। বিনোদ অবিচল দাঁড়াইয়া রহিল, যেন পাথরের মূর্ত্তি! এমন ব্যাপার সে কখনো কল্পনা করে নাই! তার শান্তি…

বিনোদ নড়িল না। শান্তি ও হাবুল সদরের চৌকাঠ পার হইল। পথে গাড়ী। ছোট খুড়ী বলিলেন,—হাবুলকে দিয়ে খপর পাঠিয়ো, মা,—আমি ভারী ভাব্‌বো…

—হ্যাঁ খুড়ীমা, খপর পাঠাবো। বলিয়া শান্তি বাহির হইয়া গেল। বিনোদের চোখের সামনে ঘর-দালান, দুনিয়া—সব অস্পষ্ট ঝাপ্‌সা হইয়া গেল…সে যেন চেতনা-হীন…

চেতনা ফিরিল হাবুলের কথায়। হাবুল আসিয়া বলিল,—তোমার বিছানায় বালিসের তলায় চিঠি আছে—বৌদি তাতে সব কথা লিখে গেছেন। তোমায় সে-চিঠি পড়্‌তে বল্‌লেন!…

কথাটা এক-নিশ্বাসে শেষ করিয়া ভাবুল সদরের দিকে ছুটিল। পথে ও-দিকে চলন্ত গাড়ীর একটা শব্দ··· এদিকে বিনোদের অন্তর চিরিয়া মস্ত এক নিশ্বাস!···

বিনোদ দোতলায় উঠিল; উঠিয়া নিজের ঘরে আসিল। বালিশের তলায় চিঠি—শান্তির লেখা!··· চিঠি খুলিয়া বিনোদ পড়িল, লেখা আছে—

—মেশের উপর তোমার কেন এত টান, বুঝিয়াছি। প্রিয়তমা প্রণয়িনী পাইয়াছ! ভালো! তোমার বর্ষাতি কোটটা গুছাইয়া রাখিতে গিয়া হাতে পড়ে, হীরার ব্রুচ—তাহাতে টিকিট আঁটা—'প্রাণের প্রিয়তমা শ্রীমতী নীহারিকাকে প্রেমোপহার'! ব্রুচটা ফেলিয়া দিই নাই। তোমার আলমারির ড্রয়ারে রাখিয়া দিয়াছি। রবিবারের দিনটা পাড়াগাঁয়ে আমার মত মূর্খ পচা জানোয়ার স্ত্রীকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিবার কোনো প্রয়োজন ছিল না! তোমায় ছুটি দিয়া গেলাম—কোনো চক্ষু-লজ্জা করিয়ো না। নীহারিকার কাছে যাও। সে আশা-পথ চাহিয়া আছে!—প্রেমোপহার পাইলে প্রেমের বন্যায় তোমাকে ভাসাইয়া দিবে।

ভ্রমরের কথা আমি শিরোধার্য্য করি—যতদিন তোমার বিশ্বাস, ততদিন আমারো বিশ্বাস। যতদিন তোমার ভালোবাসা, ততদিন আমারো ভালোবাসা। আমি স্ত্রী—তাই বলিয়া যাহা করিবে, তাহাই মানিয়া চলিতে আমি পারিব না! হয়তো কালের দোষ—কিন্তু এ-কালেই জন্মিয়াছি। সেকালে জন্মিলে হয়তো তোমার নীহারিকার দাসী হইয়া তাহার পরিচর্য্যা করিতে পারিতাম! কিন্তু এ-কালের মনকে সেকালের ছাঁচে তৈয়ার করিতে পারি নাই। পারিবও না।

আমি চুঁচুড়ায় চলিলাম। সোমবার তুমি কলিকাতায় গেলে ফিরিব। তার পর আবার শনিবারে চলিয়া যাইব। তোমার সামনে দাঁড়াইয়া তোমায় অপ্রতিভ করিতে যেমন পারিব না, তেমনি নিজের দুর্ভাগ্য বহিয়া সাধ্বী সতীর মত তোমার পরিচর্য্যাও করিতে পারিব না। ইহাতে যদি অপরাধ হয়, ক্ষমা করিয়ো।

শান্তি

চিঠি পড়িয়া বিনোদ হতভম্ব! নীহারিকা! হীরার ব্রুচ! প্রেমোপহার!—এ-সব কি কথা! শান্তি এ-সব কাহিনী কোথায় পাইল! তবে কি রাত্রে এই স্বপ্নই দেখিয়াছে?

পাগলামি!

কিন্তু না!···

আলমারির ড্রয়ার টানিয়া দেখিলে গোল মিটিয়া যায়! বিনোদ আসিয়া কম্পিত বুকে ড্রয়ার টানিল। ড্রয়ারের মধ্যে একটি ভেলভেট্-কেশের মধ্যে সত্যই হীরার ব্রুচ; আর তাহাতে আঁটা ছোট স্লিপে লেখা আছে—'প্রিয়তমা প্রণয়িনী শ্রীমতী নীহারিকাকে প্রেমোপহার!'

বিনোদের মাথা ঘুরিয়া গেল—পায়ের তলায় মাটী দুলিয়া উঠিল। নীহারিকা! কে এ নীহারিকা? হীরার ব্রুচই বা কোথা হইতে আসিল?···

আরব-রজনীর কাহিনী সত্যকার জগতে সত্যই ঘটে?···

বর্ষাতি-কোটটা বিছানার উপর সে মেলিয়া ধরিল, তার পকেট হাতড়াইয়া দেখে, কিছু নাই। মনে পড়িল,—চুরুটগুলা!···কাল নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে বহু চুরুট হাতাইয়া সরাইয়া পকেটে পূরিয়াছিল! অফিসের বন্ধু অধরবাবু চুরুট ভালোবাসেন। তাঁর জন্য···

সে-চুরুট কোথায় গেল?

তবে···? তাই! নিশ্চয় তাই! বর্ষাতি বদল হইয়া গিয়াছে! কিন্তু কাহার সঙ্গে বদল হইল? সে যেখানে বর্ষাতি রাখিয়াছিল, সেখানে দ্বিতীয় বর্ষাতি ছিল না। শুধু গোটাকয়েক ছাতা! ভুল!···ভুল হইয়াছে—কোনো সন্দেহ নাই!—এখন এ-ভুল শুধরাইতে···

কোথায় যায়? চুঁচুড়ায় শান্তির কাছে? না, কলিকাতায় অজয়ের ওখানে?

চুঁচুড়ায় গিয়া লাভ নাই! শান্তির কাছে কি করিয়া প্রমাণ দিবে, নীহারিকাকে সে জানে না, চিনে না—এ-ব্রুচ চক্ষেও সে দেখে নাই—কেনা দূরের কথা! অজয়ের কাছে যাওয়াই কর্ত্তব্য—সেখানে হয়তো ব্রুচ হারানোর জন্য মস্ত কলরব চলিয়াছে!

বিনোদ দাঁড়াইল না—কাপড় বদলাইয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিল।

নীচে বঁটি পাতিয়া ছোট খুড়ী নারিকেল-পাতা কাটিয়া তাহা হইতে ঝাঁটার কাঠি বাহির করিতেছিলেন। তিনি কহিলেন,—চুঁচুড়োয় যাচ্ছিস?

—না, কলকাতায়।

—কলকাতায়?

—হ্যাঁ, আপিসে একটা জরুরী কাজ আছে।

—ফিরবি?

—যদি কাজ মেটে, ফিরবো। না হলে থেকে যেতে হবে।

বিনোদ দাঁড়াইল না—বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় অজয়ের গৃহে পৌঁছিয়া বিনোদ শুনিল,—অজয় বাড়ী নাই। শিবপুরে তার এক মামাতো বোনের বিবাহ—শিবপুরে নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছে। সে-রাত্রে ফিরিবে না!

বিপদ আর কাহাকে বলে!

সে বাড়ী ফিরিল না। কার জন্য ফিরিবে? শান্তি

নাই। তাই সে অত্যন্ত ব্যাকুল চিত্তে মেশের বাসায় ফিরিল।

বাসার লোক তাকে দেখিয়া অবাক! শান্তনুবাবু কহিলেন,—কি ভায়া, অসময়ে বিদ্যুৎ-বিকাশ!

বিনোদ কথা কহিল না। শান্তনুবাবু কহিলেন,—বৌমার সঙ্গে কলহ না কি?—ভুল করেচো ভায়া! এ-কলহের পরে দূরে থাকা মূঢ়তা। ব্যথা তাতে চতুর্গুণ বাড়ে। মুখ-ভার করে কাছে-কাছে থাকাতেও আরাম প্রচুর! তাতে মাধুর্য্য আছে।

কথাটা কতখানি খাঁটি, বিনোদ তাহা হাড়ে-হাড়ে বুঝিয়াছে। শান্তি যখন চুঁচুড়ায় যায়,—যাচিয়া তখন দু'টা কথা কহিলে এখন এমন হুতাশ্বাসে মরিতে হইত না। সঙ্গে করিয়া শান্তিকে চুঁচুড়ায় লইয়া গেলেও হয়তো সেই ভারি-মুখেই এক সময়ে হাসির ঝিলিক ফুটিয়া এ-মনান্তরের অবসান ঘটিত! আবার মনে হইল, সকালে আড্ডা দিতে পাড়ায় যদি সে না বাহির হইত, তাহা হইলে এ-ব্যাপার ঘটিতে পারিত না! এমনি বহু চিন্তা মনকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল। এত দিন শান্তিকে কাছে পাইয়াও তাহার সান্নিধ্য ছাড়িয়া পাঁচজন বন্ধুকে লইয়া সে বাজে আসর বসাইয়াছে—হাতের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলিয়াছে! সে-সব দিন-ক্ষণ অগ্নিকণার মত মনের আঁধার পটে জ্বলিতে নিবিতে লাগিল। হায় রে, সাধে লোকে বলে, দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্ম্ম আমরা বুঝি না! মাসের মধ্যে ক'টা দিন বা শান্তির সান্নিধ্য মেলে! সে-দিনগুলাতে সব ভুলিয়া শান্তির উপরই যদি সকল মন ন্যস্ত করিত!…

চিন্তার সঙ্গে নিশ্বাসের বোঝায় বুক ভারী হইয়া ওঠে।…নিজের ঘরে বাতি নিবাইয়া বিছানায় সে পড়িয়া রহিল। আঁধারের অস্পষ্টতায় শান্তিকে বুকের কাছে নিবিড় করিয়া যেন পাওয়া যায়—আলোর তীব্রতায় শান্তির চিন্তাও দূরে সরিয়া থাকে।

শান্তনুবাবু আসিয়া কহিলেন,—খাবে চলো, ভায়া!

বিনোদ কহিল,—পেটটা ভার আছে। খাবো না।

শান্তনুবাবু কহিলেন,—ও ব্যথার নিশ্বাসে! খেলে সেরে যাবে।

বিনোদ কহিল,—না।

শান্তনুবাবু কহিলেন,—কথা শোনো ভায়া। না হয় কাল অফিস-ফেরত বাড়ী যাও—বউমার চরণ স্পর্শ করে সন্ধি করো! ওঁদের উপর মান করে কোনো বীর আজ পর্য্যন্ত অটল থাকতে পারেন নি—না রাজা রামচন্দ্র, না সেকন্দর শাহ্, না নেপোলিয়ন!

বিনোদ কোনো জবাব দিল না। শান্তনুবাবু কহিলেন,—থাকো ভায়া তবে বিরহ-তপোবনে আনমনে উদাসী! বিরক্ত করবো না। এ-সময় বন্ধুর সান্ত্বনা-বচন মনে শর-শয্যা রচনা করে—জানি, ভায়া, জানি। এ ভোগ তো একদিন ভুগেচি… যখন গৃহিণী ছিলেন!

শান্তনুবাবু বিদায় লইলেন। বিনোদ বিছানায় পড়িয়া রহিল। তার মনে হইতেছিল, দুনিয়ার আঁট-সাঁট বাঁধা বিধি-ব্যবস্থার স্ক্রুপগুলা কোথায় যেন ঢিলা হইয়া গিয়াছে—দুনিয়া তাই নড়্‌গড়্‌ করিয়া নড়বোড়ে ভাবে ঘুরিতেছে! কোথাও শৃঙ্খলা নাই!

রাত্রিটা কোনো মতে কাটিয়া গেল। ভাগ্যে নিদ্রা-দেবীর প্রাণে মমতা আছে! ব্যথাতুর, শোকাতুরের প্রতি ভাগ্যে তাঁর মমতার মাত্রা একটু বেশী! নহিলে মানুষ বোধ হয় দুনিয়ায় বাঁচিতে পারিত না! সন্তাপ-হারিণী নিদ্রা—কথাটা ভারী সত্য!

সকালে অফিস। কাজে-কর্ম্মে বিনোদ মনকে ডুবাইয়া দিল। কিন্তু এত সহজে মনকে আঁটিয়া উঠিবে, ক্ষুদ্র মানুষের এমন কি সাধ্য আছে!

তবু উপায় যখন নাই…

বৈকালে অফিস হইতে ফিরিয়া সে সাজসজ্জা করিল। অজয়ের গৃহে আজ ফুলশয্যা, বৌ-ভাত। নিমন্ত্রণ আছে। নিমন্ত্রণে যাইবার জন্য চাঞ্চল্য বেশী। হীরার ব্রুচের সন্ধান করিতে হইবে।…

অজয় বাহিরের ঘরে ছিল। বিনোদকে দেখিয়া কহিল,—একা যে! শান্তি দেবীকে আনোনি?…

বিনোদ কহিল,—না ভাই! নিরুপায়!

অজয়ের কাছে গোপনে সে বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিল। শুনিয়া অজয় কহিল—আমার স্ত্রীর নাম নীহারিকা।

নববধূর নাম নীহারিকা! তাই তো!

কিন্তু তাহাকে প্রেমোপহার দিতে কে আসিল? শুধু প্রেমোপহার নয়—প্রিয়তমা প্রণয়িনী! বিনোদের গায়ে কাঁটা দিল। ব্রুচটা সে সঙ্গে আনিয়াছিল, কহিল,—এই ছাখো!…

স্লিপের লেখাটুকু দেখিয়া অজয় হাসিল, কহিল,—দেখ্‌চি, তাঁর কোনো ভূতপূর্ব্ব lover-এর উপহার! কার লেখা, তা' অবশ্য চিন্‌তে পারচি না!

বিনোদ যেন কাঠ! কহিল,—তুমি হাস্‌চো!

অজয় কহিল,—কাঁদ্‌তে বলো? যদি কেউ তাঁকে ভালোবেসে থাকে!…ভালোবাসার উপর কি কারো হাত আছে, ভাই? আমার স্ত্রীকে তুমি ছাখোনি, বোধ হয়—তাই বুঝ্‌বে না! She is so lovable! তা' ছাড়া I feel myself proud। সত্যি বিনোদ, এঁকে দেখে ভালো না বেসে থাকা যায় না! আমি তো শুভদৃষ্টির সময় থেকেই ভালোবেসে ফেলেচি! Love-mad,c rally!

বিনোদ অবাক্! অজয় কহিল,—দাও, তাঁকে এটা দেখাই নিয়ে গিয়ে! একে ভালোবাসা, তার সঙ্গে হীরার ক্রচ! নারী-জাত, yes—they adore both··· দেখে ভারী খুশী হবেন!···

মন্ত্র-চালিতের মত বিনোদ অজয়ের পানে চাহিয়া রহিল, অজয় ক্রচ লইয়া অন্দরের দিকে গেল।

বিনোদ যেন পাথরের 'ষ্ট্যাচু'! বাহিরে তুমুল কলরব। লোকজনের হাঁকাহাঁকির অন্ত নাই। পাণ, চা, তামাক, চুরুট...সেই সঙ্গে—ওরে শিবু, এই দু'টি ভদ্দর লোককে নিয়ে গিয়ে চট্ করে খাইয়ে দে—এঁরা অপেক্ষা করতে পারবেন না—ট্রেণে ফিরবেন। যেন সেই Pandemonium! তার ঘরেও লোকজনের আসা-যাওয়ার বিরাম নাই। ব্যস্ত-ভাব! কেহ ফিরিয়া চাহে না—আসে, আসিয়া কি খোঁজে এবং পরক্ষণে চলিয়া যায়!

আধ ঘণ্টার পরে অজয় ফিরিল, কহিল,—না হে, হাতের লেখা তিনিও সনাক্ত করতে পারলেন না। তবে শুনলুম, এমন প্রণয়ী তাঁর দু'তিনটি আছেন—ভারী জ্বালাতন করেন! এ উপহার কার হাতের—তিনি ঠিক ধরতে পারলেন না। তবে এখনি সন্ধান পাবো। এ-বস্তু এখন তোমার কাছেই রাখো।

বিনোদ বিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিল। অজয় তো ভারী মজার মানুষ! স্ত্রীর প্রণয়-লীলা লইয়া এমন আমোদ বোধ করে! বিলাত যাওয়ার ফল!

অজয় কহিল,—এখানে বসে থাকবে কুনোর মত? না, আসরে আসবে?

বিনোদের কিন্তু এ সব অসহ্য বোধ হইতেছিল। সে কহিল,—এখানেই থাকি।

—বেশ!···

## ৪

ঘণ্টাখানেক পরের কথা। বিনোদের সে নিভৃত কোণটিতে ক্রমে কোলাহল-কলরবের ঢেউ আসিয়া লাগিল। পাঁচ-সাত জন ভদ্রলোক আসিয়া জায়গা জুড়িয়া বসিলেন।

বাহিরে হাস্য-কলরবের অন্ত নাই। একজন ভদ্রলোক বলিতেছিলেন,—হাত ভারী সাফ!···কিন্তু তা-ই বা কি করে বলি! ভুল নিশ্চয়! না হলে বদলি একটা বর্ষাতি দিয়ে যাবে কেন? যেটা দিয়ে গেছে, quite fresh! আনকোরা নতুন—তার পকেটে এক-রাশ চুরুট!

বিনোদের দুই চোখ বিস্ফারিত হইল। কবে সেই কলেজে-পড়া miracle-এর কথা মনে জাগিল।

সে উঠিয়া দাঁড়াইল। সামনে একটা বেয়ারা—তাকে বলিল,—অজয়বাবুকে একবার খপর দাও তো শীগ্‌গির···

অজয় আসিল। বিনোদ কহিল,—বোধ হয়, মার্কের কিনারা হবে!

অজয় কহিল,—কি রকম?

যে-কথা শুনিয়াছে, বিনোদ বলিল।

অজয় কহিল,—বাইরে এসো।

দু'জনে বাহিরে আসিল।

বাহিরে দোহারা গড়নের এক সৌখীন ভদ্রলোক—বয়সে প্রৌঢ়। তখনো তাঁর মুখে সে-কাহিনীর জের চলিয়াছে। শ্রোতাদের মুখে কৌতুক-হাস্য।

অজয় ডাকিল,—প্রকাশদা···

ভদ্রলোক কহিলেন,—কি বলচো, ভায়া?

—একবার এদিকে আসবেন?

—নিশ্চয়।

প্রকাশদা উঠিয়া আসিলেন। অজয় কহিল,—এ জিনিষটা দেখুন তো।

বিনোদের কাছ হইতে ক্রচ লইয়া অজয় প্রকাশদার হাতে দিল। প্রকাশদা ক্রচ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, কহিলেন,—বাঃ! এই তো সে বস্তু···আমার হাতের লেখা টিকিটটুকু অবধি···

হাসিয়া অজয় কহিল,—এঁর সঙ্গেই আপনার বর্ষাতি কোট বদল হয়েচে···সেজন্য এঁর গৃহে অশান্তির সীমা নেই! শান্তি দেবী গৃহ ছেড়ে মান-ভরে পিত্রালয়ে গেছেন।

প্রকাশদা কুতূহলী দৃষ্টিতে বিনোদের পানে চাহিলেন; অজয় তাঁকে বিনোদের করুণ কাহিনী খুলিয়া বলিল।

শুনিয়া প্রকাশদা কহিলেন,—আমার গৃহেও বিভ্রাট অল্প ঘটেনি, ভায়া! অর্থাৎ আমি একটু···মানে, স্ত্রৈণ! দু'দিন পরিচয় হ'লেই জানতে পারবে। কাজেই আগে থাকতে স্বীকার করায় আমার বিন্দুমাত্র লজ্জা নেই!

হাসিয়া অজয় কহিল,—বিশ্বাস হয় না, দাদা! স্ত্রৈণ মানুষ পরকীয়ার প্রেমে বিভোর হয় না! আপনার এই নীহারিকা-প্রীতি···

—ও! প্রকাশদা হাসিলেন; কহিলেন,—এটুকু latitude আমি পেয়েচি! শ্যালিকাদের প্রতি প্রণয়-পোষণে আমার অধিকার আছে। গৃহিণী প্রসন্ন মনে আমাকে সে অধিকার দান করেচেন। নীহারিকা আমার সব-চেয়ে প্রিয়তমা শ্যালিকা—তাই তাঁর প্রতি আমার প্রেমও অগাধ!

—তবে আপনার বিভ্রাট ঘট্‌লো কিসে?

প্রকাশদা কহিলেন,—পাণ-তামাক দ্রব্যগুলি আমি

উপভোগ করবো, নীহারিকার দিদি বরদাস্ত করতে পারেন না। আমি পাণ-চুরুটের একটু বেশী ভক্ত ছিলুম। একবার দাঁতের রোগ হয়—ভারী কষ্ট পাই। ডাক্তারের ব্যবস্থায় কাজেই পাণ-চুরুট ত্যাগ করতে হয়! তোমার দিদি এ-সম্বন্ধে ভারী হুঁশিয়ার! দু'চার বার আমার ভুল-চুক ঘটেছিল—মানুষমাত্রেরই ভুল হয়, জানো তো ভাই! তা সে ভুল-চুকের জন্য দীর্ঘ সপ্তাহকাল তীব্র segregationএর ব্যবস্থা করেন। একটিও কথা কননি, আমার ঘরে আসেন নি, একশয্যা গ্রহণ করেন নি! দ্বীপান্তর-বাসের চেয়েও কঠোর শাস্তি! প্রিয়তমা আসে-পাশে ঘুরুচেন—কথা কইচেন না, হাস্‌চেন না, আমার পানে চাইছেন না—যেন ঠিক ট্যাণ্টালাসের কাপ্‌! তৃষাতুরের সামনে পেয়ালা-ভরা স্নিগ্ধ পানীয়, অথচ তাতে অধর-স্পর্শ ঘট্‌চে না!···আমি তাঁকে বলি, তুমি যখন এত strict, তোমার উচিত ছিল আমার গৃহিণীপনা ছেড়ে হাইকোর্টের বেঞ্চে বসা!—তা সে-রাত্রের কথা বলি, শোনো—

বাধা দিয়া অজয় কহিল,—কিন্তু গোপনে আমার স্ত্রীর চিত্ত-হরণের এই চেষ্টা—এর নালিশ দিদির কাছে আমি পেশ করবো!

হাসিয়া প্রকাশদা কহিলেন,—করো। তাতে আমার acquittal হবে।—সেই কথাই বলি, শোনো—অর্থাৎ বিয়ের দিন রাত্রে আমার বর্ষাতি খোয়া যায়—তার সঙ্গে ঐ প্রেমোপহার! বাসরে এ উপহার নীহারিকার হাতে দেবো, সঙ্কল্প ছিল—অর্থাৎ একটা triangleএর আভাস জাগ্‌বে! পুরানো প্রেম নূতন প্রেমের স্পর্শে টেঁকে কি না, তারও পরীক্ষা হতো! বর্ষাতির সঙ্গে রুচ অদৃশ্য হতে মন খারাপ হয়ে গেল। বাসরে গেলুম না। রিক্ত হাতে যাওয়া সাজে না, তাই। গভীর রাত্রে বদলি-বর্ষাতি ঘাড়ে শোবার ঘরে এসে শয্যা গ্রহণ করি! এ-বর্ষাতির পকেটে কতকগুলো চুরুট তখন লক্ষ্য করি! ঐ লক্ষ্য!—তা' নিয়ে কিছু ঘট্‌তে পারে, কল্পনায় আসে নি! মনের সে-অবস্থায় কল্পনা সাড়া তোলে না! শোবার ঘরে বর্ষাতি ছিল।—তোমার দিদির একটা স্বভাব আছে—ভালো বলো, আর মন্দই বলো,—প্রত্যহ সকালে আমার জামার পকেট সার্চ্চ করেন। কাল সকালে সার্চ্চ করে ঐ বর্ষাতির পকেটে এক-গাদা চুরুট পান। আমি বসে একটা হিসাব দেখ্‌চি, তিনি দুম্‌ করে খাতার উপর চুরুটের রাশ ফেলে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর মুখের পানে চেয়ে আমি দেখি—সে কি ভাব! কবিরা বলে গেছেন, ঝড়ের পূর্ব্বক্ষণে প্রকৃতির স্তম্ভিত ভাব! ঠিক তেম্‌নি! সে ভাবে দারুণ ঝঞ্চা, আর বিপ্লবের আভাস! আমার মত পত্নী-প্রেমিক ছাড়া সে-লক্ষণ অপরের বোধগম্য হবে না···

হাসিয়া অজয় কহিল,—তার পর?

প্রকাশদা কহিলেন,—তার পরও শুনতে চাও, ভায়া? তার আর পর নেই—ট্রাজেডির ঐখানে সুরু, ঐখানেই ইতি। তার পর দু'জনে বাক্যালাপ বন্ধ। বীর-নারী চাঁদবিবির মত তিনি উদ্ধত-শিরে চলাফেরা করুচেন—কথাটি কন না! আমি সেধে বহুবার কথা কইতে গেছি, মিনতি-ভরা বচনে তুষ্ট করতে চেয়েছি, তিনি তাতে দৃক্‌পাত করেন নি!

অজয় কহিল,—তা' হলে চলুন, এই বামাল-সমেত আপনাকে তাঁর সামনে খাড়া করে দি। এতে না কুলোয়, বন্ধু বিনোদ আছে। তার বাচনিক এজাহার। বিনোদের দশা আরো সঙ্গীন কি না—চুঁচড়োর কোর্টে আপনাকে বুঝি-বা হাজির হ'তে হয় সাক্ষ্য দিতে!

বিনোদ কহিল,—তার প্রয়োজন আছে! এবং যত শীঘ্র সম্ভব···

প্রকাশদা কহিলেন,—বেশ!

# দুই পরিচ্ছেদ

পুরীর সমুদ্র-তীর। তিথি ভালো—পূর্ণিমা। চাঁদের শুভ্র জ্যোৎস্না আর সাগরের নীল জল—সারা পৃথিবী যেন বিচিত্র স্বপ্নে বিভোর!

চক্রতীর্থের দিকে বালির উপর ক্ষিতিনাথ শুইয়া আছে। জীবনে কত আশা, কত নিরাশা,—কত জয়, কত পরাজয়—সে-সবের কোলাহল এ দৃশ্য-বৈচিত্র্যে মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে! শুইয়া শুইয়া সে তাই স্বপ্ন দেখিতেছিল।

ষোল বৎসর পূর্ব্বেকার কথা মনে জাগিতেছিল। সেদিনও এমনি জ্যোৎস্না! সাগর-জলে নীল রঙের এমনি হোলি! প্রথম যৌবন!···সে আসিয়াছিল পুরীতে—এগ্জামিনের পর আরাম-আনন্দ উপভোগ করিতে। পুরীতে মাসিমার বাড়ী। সে একা আসিয়াছিল। কোনো কাজ ছিল না, চিন্তা ছিল না, নিত্য আসিয়া বসিয়া থাকিত এই বেলাভূমির উপর—চোখের সামনে জাগিত ধু-ধু সাগরের অসীম প্রসার! অসীমের তরঙ্গে সে তার মনকে ভাসাইয়া দিত। জীবনে কত আশা, কত সাধ—সাগরের ঢেউয়ের দোলায় দুলিতে দুলিতে না-দেখা কোন্ কল্পলোকে উধাও হইয়া চলিত—সে কল্পলোক কোথায় গিয়া মিশিয়াছে, কোন্ চারু-কুঞ্জে।

এই সাগরের তীরে একদিন যে ঘটনা ঘটিল, কল্পনাতেই শুধু তেমন ঘটে! তাও ক্বচিৎ।

সেদিনও নিত্যকার মত সে এই বালির বুকে বসিয়া ছিল। সকালের সূর্য্য তখন জলের বুক হইতে ধীরে ধীরে আকাশে উঠিতেছে—দিকে দিকে আবীরের রঙ,—দীপ্ত উজ্জ্বল দৃশ্য!···একটু পরে সে স্নান করিবে—স্নান করিয়া বাড়ী ফিরিবে। এ তার নিত্যকার কাজ; সহসা একটা আর্ত্ত রব।···

স্বপ্ন ফেলিয়া চাহিয়া ক্ষিতিনাথ দেখে, সমুদ্রে ঢেউয়ের মাতন। জলে দাঁড়াইয়া একজন মহিলা আর্ত্ত রব তুলিয়াছেন। আকুল রব! আর একটু দূরে ফেনপুঞ্জের উপর একরাশ কালো রেশম···ঢেউয়ে দুলিতেছে, সরিতেছে! সে-কালো রেশমের ফাঁকে-ফাঁকে চাঁপার বর্ণাভাস!

ব্যাপার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। ক্ষিতিনাথ স্পোর্টস্ম্যান! খেলাধূলায় যেমন মজবুত, সাঁতারেও তেমনি!

সাগরের ঢেউয়ের মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সে সেই কালো রেশমের গোছা হাতে ধরিয়া তীরে তুলিল এক কিশোরীকে। ঢেউয়ের আঘাতে, ভয়ে কিশোরী প্রায় মূর্চ্ছিতা।

তীরে তুলিয়া কিশোরীকে সে শোয়াইয়া দিল······

কিশোরী চোখ চাহিল। চোখের সামনে তরুণ ক্ষিতিনাথ। কিশোরীর সারা দেহে-মনে লজ্জার কাঁপন! বসনে অঙ্গ ঢাকিয়া কিশোরী ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল।

মহিলা কহিলেন,—ভাগ্যে তুমি ছিলে বাবা···

তাঁর চোখে জল, স্বরে উচ্ছ্বসিত আনন্দ!

ক্ষিতিনাথ কহিল—আপনারা লোক না নিয়ে জলে নেমে ভালো করেননি।

মহিলা কহিলেন—বেড়াতে এসেছিলুম। জলির সাধ হলো, বল্লে, নেমে বাড়ী যাবো কাকিমা! কি সর্ব্বনাশই হচ্ছিল! আমি কি আর বাড়ী ফিরতুম···

তাঁর গায়ে কাঁটা দিল। ক্ষিতিনাথ কহিল—আপনারা কোথায় থাকেন?

—ফ্ল্যাগষ্টাফের ঠিক পিছনে।

ক্ষিতিনাথ কহিল—একটু জিরিয়ে নিন, তার পর আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসবো।

মহিলা কহিলেন—যাবে বাবা? আমি বল্তে পার্‌ছিলুম না···মন তাই চাইছিল।

এমনি করিয়া আলাপ। কিশোরী কুমারী।

এত বড় ব্যাপার—জীবনে এমন ঘটে না! ক্ষিতিনাথ যেন কল্প-লোকে উধাও হইয়াছে।

তরুণ বয়স। ক্ষিতিনাথের সারা পৃথিবী, জীবনের যত স্বপ্ন, এই জলি ওরফে জলদবালাকে কেন্দ্র করিয়া অপরূপ আশা গড়িয়া তুলিল। সে আশা মিটিতে বাধা ঘটিল না।

জলির বাবা কলিকাতায় ওকালতি করেন। নাম-ডাক আছে, গাড়ী আছে, বাড়ী আছে, দাস-দাসী সকলই আছে; নাই শুধু সঙ্গতি সে সঙ্গতির জোরে মেয়েকে বড় ঘরে বধূ করিয়া পাঠান। মেয়ের লেখাপড়া তাই অগ্রসর হইতেছিল··বিবাহের কথা তুলিতে বাপের বুক কাঁপিত।

নানা দিক দিয়া ক্ষিতিনাথ যোগ্য পাত্র। মোটর না হাঁকাইলেও তার যা আছে, তাহাতে চলিয়া যায়। তা ছাড়া লেখা-পড়ার যে পরিচয় ইতিমধ্যে পাওয়া গিয়াছে, সে ভাবে লেখাপড়া চলিলে একখানা মোটর কেনা অসম্ভব হইবে না। তার উপর ক্ষিতিনাথ নিজে হইতে যখন প্রস্তাব করিয়া বসিল এবং জলির প্রাণ রক্ষা করিবার দরুণ জলির দিক হইতে কৃতজ্ঞতাও তো একটা আছে! এমনি

জল্পনা চলিতেছে, এমন সময় কাকিমার কাছে ক্ষিতিনাথ কথাটা স্পষ্ট খুলিয়া বলিল।

প্রজাপতির জয়! দুটি চিত্ত-নদী একত্র মিশিল।

আজ সমুদ্র-তীরে বসিয়া সেই পুরানো কথা ক্ষিতিনাথের মনে পড়িতেছিল।

সেদিনের সেই জলি আজ গৃহিণী-বেশে পাশে!

স্বপ্নলোক হইতে গৃহিণী আসিয়া সত্যই পাশে দাঁড়াইলেন। ক্ষিতিনাথ তাঁর পানে চাহিল,—স্বপ্নরেখাগুলা নিমেষে অমনি দীপ্ত হইয়া দেখা দিল। সে রেখার স্পর্শে ষোলটা বৎসর কোথা দিয়া যে মুছিয়া গেল!

গৃহিণী জলদবালা সেই কিশোরী জলির কমনীয় বেশে প্রথম-যৌবনের রমণীয় মোহে ভরিয়া যেন দেখা দিলেন! ক্ষিতিনাথের চোখে আজ যেন তিনি সেদিনের সেই জলি! সদ্য জল হইতে তাঁকে তোলা হইয়াছে। রেশমের মত কেশের রাশি মুখে লাগিয়া আছে! ভয়ে নীল—মুদিত চক্ষুপল্লব! রত্নখনির মধ্য হইতে সাগর যেন তাঁহাকে তুলিয়া ক্ষিতিনাথের কোলে দিয়াছে! ধরণীর আদিম দিনে মন্থনে-পাওয়া সেই দেবী কমলা!

ক্ষিতিনাথ কহিল— একটু বসো না গা!

সঝঙ্কারে গৃহিণী কহিলেন—হ্যাঁ, বসবার সময় বটে এখন! তোমার মত অমন খেয়াল নিয়ে কাজ করলে আমার চলে না।

ক্ষিতিনাথের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল! সমুদ্র-তীর তেমনি আছে, বেলাভূমিও সেই! কিন্তু সেদিনের সেই কিশোরী জলি……

ছোট একটা নিশ্বাস পড়িল।

গৃহিণী কহিলেন—ছেলেমেয়েগুলো খাবে না? খুঁজে খুঁজে আমি হায়রাণ। তোমারই সখ ছিল, এখানে এসে পিকনিক কর্বে! বড় সহজ কি না! নিজে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে তো দিব্যি চলে এলেন! যাকে ভুগতে হয়, সে-ই জানে।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ক্ষিতিনাথ গৃহিণীর পানে চাহিয়া রহিল।

গৃহিণী কহিলেন—হাঁ করে কি দেখচো? ওঠো একবার দয়া করে। লুচির টিনটা ভুলে এসেচি—যাও তুমি। আনো।

ক্ষিতিনাথ যেন চেতন-হারা! কথাটা কাণে গেল কি না, সন্দেহ!

গৃহিণী কহিলেন,—রাঘোকে পাঠিয়েচি কুঁজো আনতে। সত্যি, ছেলেমানুষ—এত পারবে কেন? ছোট খোকাকে বয়ে নিয়ে এলো—কম পাজী,—এমনিতে হাঁটতে চায়—আজ হাঁটলে উপকার হবে যে! বায়না নিলে, রাঘোর কাঁধে চড়ে যাবে—পায়ে লাগচে! তুমি তো দিব্যি হুকুম দিয়ে চলে এলে!—মর্ বাঁদী তুই, সে হুকুম তামিল কর্।

ক্ষিতিনাথ কহিল—আমাকে বল্লে না কেন? দু' চারটে জিনিষ নিয়ে আসতুম।

—কাকে বলবো? হুকুম করেই অমনি ভোঁ দৌড়! পাছে কিছু ফরমাশ করি! পুরুষমানুষ তো! এসে খুঁজে মরি, কোথায় আছেন? কোথায় গেলেন? ধূ-ধূ বালির মধ্যে খুঁজে বার কর্তে পারি কি! রাঘো দেখে আমায় বল্লে—বাবু ওধারে আছেন।…এলুম। তা, আসবে কি দয়া করে? জানি, আমাদের সঙ্গ তোমার বিষ বোধ হয়! নেহাৎ ছেলেমেয়েগুলো না কি…

বাধা দিয়া ক্ষিতিনাথ কহিল—না—না, চলো। তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলুম। তা কোথায় বসবার ব্যবস্থা করলে?

—ঐ সাগরের গর্ভে।

—চটো কেন?—ক্ষিতিনাথের স্বর ক্ষমাপ্রার্থী অপরাধীর মিনতিতে ভরা।

—সাধে চটি? আমি মানুষ, তাই! ঝক্কি আমাকেই পোয়াতে হয় যে! পড়তে আর কারো পাল্লায়, হুঁ, দেখিয়ে দিত কত ধানে কত চাল! সংসার করতে হলে এমন গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ালে চলে না!

কথায় কথা ও রাগ বাড়িবে…অগত্যা ক্ষিতিনাথ উঠিল, কহিল—ছেলেরা কোথায়?

গৃহিণী কহিলেন—ওধারে আমার চিতে সাজাচ্ছে!

আর কথা নয়! ক্ষিতিনাথ ছেলেমেয়েদের উদ্দেশে চলিল।

রাঘো ফিরিল; তার হাতে টিনের বড় কৌটা। গৃহিণী কহিলেন—আর একবার যা বাবা রাঘো, ডিশগুলো ফেলে এসেচি…

ক্ষিতিনাথ কহিল—থাক্ না ডিশ!

—বটে! বালির ওপর খাবে! তা খাবে একদিন—যে তোমার ছেলেমেয়ের ওপর টান! দাঁড়াও, আগে মরি! আমি বেঁচে থাকতে এটুকু হতে দিতে পারবো না। আমি ওদের মা, বাপ নই।

এ যুক্তি অকাট্য।

ছেলেমেয়েরা ছুটাছুটি করিয়া ফিরিতে লাগিল। ক্ষিতিনাথ বসিল। তার মনে নানা চিন্তা…কেন এমন হয়? দুনিয়ার রঙ দিনে দিনে কেন এমন বদলাইয়া যায়, ভগবান? মানুষের মন যদি……

গৃহিণী ডাকিলেন—ওগো…

ক্ষিতিনাথ তাঁর পানে চাহিল।

গৃহিণী কহিলেন,—কি ভাবচো?

ক্ষিতিনাথ কহিল—কি আবার ভাববো?

—ভাবচো বৈ কি! দিন-রাত ভাবনা! কিসের ভাবনা, বুঝি না!

…ক্ষিতিনাথের মনে ভরসা জাগিল—গৃহিণীর স্বর যেন একটু কোমল! ভাবনার কথা বলিয়াছেন!

ক্ষিতিনাথ হাসিল। কহিল,—কি ভাবচি বলবো?… তোমার মনে পড়ে…?

—কি?

—এই সমুদ্রতীরে আমাদের সেই প্রথম দেখা…জল থেকে তোমায় তুললুম যেন সাগরের রাণী…

মুখ ঘুরাইয়া গৃহিণী কহিলেন—থামো। বয়স বাড়চে। এ বয়সে কাব্যি মানায় না। যা বলি, শোনো। কাগজের ঠোঙায় নুণ আছে, ফেলে এসেচি। একবারটি গিয়ে নিয়ে এসো—না হলে সব কি করে খাবে? বেগুন ভাজা আছে, আচার আছে।

ক্ষিতিনাথ স্তব্ধ।

গৃহিণী কহিলেন,—দেরী নয়। ওঠো। ছেলেরা এখনি আমার গায়ের মাংস খেয়ে ফেলবে…

ক্ষিতিনাথ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া নুণের ঠোঙা আনিতে চলিল।

ও দিকে গৃহিণী কৌটা খুলিয়া লুচি ভাগ করিতে বসিলেন।

সাগরের ঢেউ আছাড় খাইয়া কূলে লুটাইতে লাগিল।

# অর্ব্বাচ

কোথা হইতে কথাটা আরম্ভ করি,—সমস্যায় পড়িয়াছি! দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিল,—মস্ত দল।

'অম্বালিকা' মাসিক পত্রের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক উৎসব। মালিক শশধর দত্ত পার্টি দিয়াছে। পার্টিতে দলের যত লেখক আর কবি, চিত্র-শিল্পী এবং বিজ্ঞাপনের ক্যানভাশারদের লইয়া একটু আমোদ করা।

বাগান শশধরের মামার। এককালে আসা-যাওয়া ছিল। দোতলার বড় ঘরে ঝাড়-লণ্ঠন এখনো কাপড়ের ঢাকায় বাঁধা তেমনি ঝুলিতেছে—দেওয়ালে দেওয়াল-গিরি। ফার্ণিচার আছে—জীর্ণ। নীচে বাগান—বন-গমনের উদ্যোগ করিয়াছে। পুকুর আছে—ঘাটের সিঁড়িতে ভাঙ্গা ইট বুড়ার ভাঙ্গা দাঁতের মত—আলগা, খশা! পুকুরে পানা থাকিলেও জলের অভাব নাই। এ জল জোগায় আকাশের মেঘ—তাহাতে পয়সা খরচ হয় না।

খাওয়া-দাওয়া, গান-বাজনার আয়োজন হইয়াছে মন্দ নয়—কিন্তু ব্যাপার তবু দক্ষযজ্ঞে শিব-তাণ্ডবের মত! সহরের বাহিরে নিষ্পরোয়া মুক্তি পাইয়া সকলে এখানে প্রাণের রাশ ছাড়িয়া দিয়াছে।

দোতলার ঘরে বসিয়া লেখক ধরণী দুঃখ করিতেছিল, তরুণ-দল কাহাকেও মানে না। ঐ যে পেলব সেন!—পেলবের লেখা কাট-ছাঁট করিয়া ধরণীই প্রথম সে লেখা ছাপিতে দেয় "পরদেশী সেঁইয়া" পত্রিকায়! এখন পেলবের নাম হইয়াছে—সে দল গড়িয়াছে! ধরণীকে তারা পোঁছে না!

ধরণী অনেক দিনের লিখিয়ে—শশধরের সঙ্গে একটা কি সম্পর্ক আছে, কাজেই 'অম্বালিকা' তার লেখা বাদ দিতে পারে না।

মুকুল চাটুয্যে ইণ্টার ফেল করিয়া কলেজ ছাড়িয়া দিয়াছে! এখন শুধু কবিতা লেখে। তার কবিতায় হুইটম্যান, সুইনবার্ণ, ইয়েটস্ একেবারে টগবগে ফুটন্ত ফেনায়িত! রবীন্দ্রনাথকে তার সামনে কেহ কবি বলিলে সে ফোঁশ্ করিয়া ওঠে, বলে,—কি তিনি নতুন ভাবটা দিয়েচেন! আরিষ্টক্রেশির বুদ্বুদ! তর্কের মুখে ফ্রাঞ্চ লাটিন,—এত কথা সে আনিয়া ফেলে যে অপর পক্ষ হতভম্ব হইয়া যায়!

ধরণীর কথায় মুকুল বলিল,—এতে আবার মানামানি কি, মশায়! লেখাটা নিয়ে মাসিকের অফিসে পৌঁছে দেওয়া! তা'হলে দেখচি, পোষ্টম্যান, কম্পোজিটাররাও একদিন বুক ফুলিয়ে আমাদের সামনে এসে বলবে,—তোমাদের প্রতিষ্ঠার মূলে আমরা! আমরা না থাকলে লেখার প্রচার কি করে হতো!…আপনি হাসালেন!

কাঁচা-পাকায় অভিমান আর আস্ফালনের এমনি তর্ক এখানে চলিতেছিল। আস্ফালন-ওয়ালারা ছিল দলে ভারী—কাজেই অভিমানের সানুনাসিক সুর স্বরগ্রামে তেমন খেলিতে পারিল না।

এমন সময় সহসা একটা কলরব উঠিল। ব্যাপার কি?

যে যেখানে ছিল, ছুটিয়া গিয়া দেখে, ঘাটের রাণায় বিমূঢ়ের ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া আছে পদ্মনাথ—সিক্ত বেশ, দুই চোখ সিঁদুরের মত রাঙা—রুদ্র মূর্ত্তি। তার পাশে তেমনি সিক্ত বেশে কুসুম শিকদার। মুখ-চোখের ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয়, যেন সেকন্দর শাহ সদ্য ভারত জয় করিয়া মাসিডনের ফটকে ফটো তুলাইতে দাঁড়াইয়াছে! তেমনি পোজ্!

অর্থাৎ চার-পাঁচজনে সাঁতার কাটিতেছিল, দেখিয়া পদ্মনাথের লোভ হয়, সাঁতার শিখিবে! দু-চারিবার কশরতি দেখাইয়া লোভ বাড়ে—সেই সঙ্গে সাহস। এবং একটু গভীর জলে অগ্রসর হইবামাত্র তলাইবার জো! কুসুম শিকদার ছিল সিঁড়ির উপর—ঝাঁপ দিয়া জলে পড়িয়া তাকে তীরে তুলিয়াছে। প্রাণটা খুব বাঁচিয়া গিয়াছে।

ইনি সেই কুসুম শিকদার—পঁচিশ বৎসর বয়সেই বাঙলার কথা ও নাট্য সাহিত্যে যিনি নরওয়ে-সুইডেনের হাওয়া বহাইয়া দিয়াছেন। কাব্যে ছন্দ-মিল ভাঙ্গিয়া নূতন-রূপ দিয়া নোবেল প্রাইজের জন্য কেবলের প্রত্যাশা করিতেছেন

শিকদারের ভক্ত অনেক—শিকদারের বাপের পয়সা আছে। চাটগাঁয়ের ওদিকে মস্ত জমিদারী। শিকদার বি-এ পড়ার নামে হষ্টেলে আস্তানা পাড়িয়া বাঙলা সাহিত্যের উন্নতি করিতেছে আজ সাত বৎসর! সে ম্যাচ দেখিতে যায়, সিনেমায় যায়, শিবপুরে যায়, দমদমার এরোড্রোমে যায়, মিটিংয়ে যায়। কাজেই……

একজন ভক্ত তখনি ছোট রিপোর্ট লিখিয়া ফেলিল, বলিল,—রাগ করো আর যাই করো, এ খপর আমি এখনি পত্রিকায় পাঠাবো। জানাবো—সাহিত্যিক কর্ত্তৃক সাহিত্যিকের জীবন-রক্ষা! লোকে বুঝবে, আমাদের সাহিত্য বাঁশীর সাহিত্য নয়—বলিষ্ঠ সাহিত্য—জল থেকে ডুবন্ত মানুষকে তুলে বাঁচাবার শক্তি রাখে এ সাহিত্য।…

কিন্তু না! এ কথাগুলা এমন সবিস্তারে বোধ হয় না বলিলেও চলিত!

কারণ, আমাদের কথা ঠিক ইহার পরের ঘটনা লইয়া।

২

পদ্মনাথের কৃতজ্ঞতার সীমা নাই। প্রাণটা গিয়াছিল ·· ভাগ্যে কুসুম শিকদার···

পদ্মনাথ সমালোচনা লেখে। আগে গল্প লিখিত; কিন্তু চারিদিকে এমন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা দিল—দলের বাহিরে আর কাহারো লেখা গল্পকে তারা গল্প বলিয়া স্বীকার করে না! তার উপর বাপ মারা গেলেন! সংসার বলিয়া একটা ভাঙ্গা গাড়ী পড়িয়াছিল পল্লীর প্রান্তে—সেটাকে তারই গড়াইয়া লইয়া চলা চাই!

বাপের মনিব-সাহেবটি লোক ভালো; তাকে ডাকিয়া বাপের কাজে বসাইয়া দিল। মাহিনা আপাততঃ একশো টাকা। ম্যাটিকের পর আর কোনো পাঠ সে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। এমন অবস্থায় একশো টাকা···

চাকরি লওয়ার আরও একটি বিশেষ হেতু ছিল। গল্প লিখিয়া সে-গল্প সে ছাপিত—'পুষ্পহার' মাসিকে। পুষ্পহারের সম্পাদক অবিনাশের ছিল নিজের ছাপাখানা। অবিনাশের স্ত্রী শ্রীমতী মধুমতীর নাম নিশ্চয় শুনিয়াছেন! উপন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি দিগ্বিজয়িনী সম্রাজ্ঞী! বছরে তাঁর তেত্রিশখানি উপন্যাস বাহির হয়—'উপন্যাস-কুরুক্ষেত্র-সিরিজ'। এই পদ্মনাথকে মধুমতী কেমন স্নেহ-দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন! তার অসুখের সময় সিরিজের শৃঙ্খলা-রক্ষা-কল্পে পদ্মনাথ দুই চারিখানা উপন্যাস লিখিয়া মধুমতীর নামে ছাপিতে দিয়া শ্রীমতীর সুনাম রক্ষা করিয়াছিল। এজন্য এ-পরিবারে সে আত্মীয়োপম হইয়া উঠিয়াছে।

এ-আত্মীয়তার বাঁধন সুদৃঢ় করিবার দিকে উভয় পক্ষেই আগ্রহ ছিল।

পদ্মনাথের আগ্রহের হেতু—অবিনাশের কন্যা বিহ্বলা। সে যেন সপ্তদশ বসন্তের মালা! বিহ্বলা কবিতা লেখে। মাসিকে সে-কবিতা ছাপা হয়।

মধুমতীর আগ্রহের হেতু—পদ্মনাথ একশো টাকা মাহিনার চাকরি পাইয়াছে। সাহিত্যিক হইলেও টাকা-রোজগারের দিকে তার দৃষ্টি আছে।

তাই এ-গৃহে পদ্মনাথের যাতায়াত আছে। বিবাহের কথা পাকা। উভয় পক্ষ বলে, হাতে কিছু টাকা জমুক।···নদীতে জোয়ার আসিবামাত্র বড় নৌকা দড়ির বাঁধন খুলিয়া জলে পাড়ি দেয় না—একটু সবুর করে। জোয়ার একটু জমিলে জল গভীর হয়—তখন গভীর জলে পাড়ি দিলে কোথাও চড়ায় বাধিবার ভয় থাকে না! পদ্মনাথ, মধুমতী ও বিহ্বলা—এ সত্য স্বীকার করে, শিরোধার্য্য করে!



৩

পদ্মনাথ কুসুমকে ছাড়িল না—কৃতজ্ঞ চিত্তে তাকে আনিয়া হাজির করিল মধুমতীর গৃহে।

ব্যাপার শুনিয়া বিহ্বলা চমকিয়া উঠিল কহিল—সাঁতার জানো না! সাঁতার কাটতে গেলে কি বলে?

পদ্মনাথ কহিল—গ্রহ।

কুসুম কহিল—ভাগ্যে আমি সিঁড়িতে ছিলুম—জলে নামিনি। তাহলে···

তাহা হইলে কি, ভাবিয়া বিহ্বলার আতঙ্ক হইল।

মধুমতী কহিল—তুমিই কুসুম শিকদার! লেখক! এই বয়সেই খুব নাম করেচো তো! তোমার লেখা আমি পড়িনি—তবে নাম শুনেচি।

কুসুম কহিল—নাম···তা হয়েচে আমার।

বিহ্বলা কহিল—পদ্মবাবু যে গল্প লেখা ছেড়ে দিলেন···

পদ্মনাথ কহিল—সময় কৈ! তাই এখন সমালোচনা লিখি।

কুসুম কহিল—উঠি তা হলে।

পদ্মনাথ কহিল—চলুন, বায়োস্কোপে যাই। যাবে বিহ্বলা?

বিহ্বলা কহিল—বায়োস্কোপ!

পদ্মনাথ কহিল—হ্যাঁ। মানে, কুসুমবাবুর honourএ।

—বেশ।

তিনজনে বায়োস্কোপে চলিল। হেদুয়ার মোড়ে ট্রামে চাপিল। ট্রামে উঠিয়া কুসুম কহিল—যদি আমি না থাকতুম ওখানে···

পদ্মনাথ কহিল—তাহ'লে ডুবে যেতুম!

কুসুম কহিল—এখন বায়োস্কোপে যাওয়াও হতো না।

—না।

কুসুম হাসিল। সে হাসি গর্ব্বের!

ট্রামের ভাড়া দিতে কুসুম পকেটে হাত ঢুকাইল। পদ্মনাথ কহিল—না, আমি দিচ্ছি!

বায়োস্কোপের টিকিট। কুসুম সাগ্রহে হাউসের সামনে আঁটা বড় ছবির দিকে মনোনিবেশ করিল। দৃষ্টি···

পদ্মনাথ কহিল—আসুন—

কুসুম বক্রদৃষ্টিতে চারিদিক দেখিয়া লইয়াছে—পকেটে হাত ঢুকাইয়া বলিল—ক'টাকার শীট নেবেন?

পদ্মনাথ বলিল—টিকিট আমি কিনেচি। এক টাকা দু-আনার শীট।

কুসুম কহিল,—আপনি কেন টিকিট কিনলেন! না, না—কত? তিনখানা!···তিনটাকা ছ-আনা!

কুসুম তখনো পকেট হইতে হাত বাহির করে নাই।

তার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া পদ্মনাথ কহিল—তা, হয় না, আপনি আমার জীবন রক্ষা করেচেন···

তিনজনে গিয়া সীটে বসিল।

খাতিরের সীমা নাই! চা! চকোলেট! আইস্‌ক্রীম!

কুসুম কহিল—কত?

পদ্মনাথ পকেট হইতে নোট বাহির করিল।

কুসুম কহিল—না, এটা তা বলে···

পদ্মনাথ কহিল—বিলক্ষণ!

কুসুমকে তার পর পদ্মনাথ ছাড়িতে চায় না! একে প্রাণ বাঁচাইয়াছে, তার উপর এত বড় লিখিয়ে—

বায়োস্কোপ—থিয়েটার—কার্ণিভাল—সর্ব্বত্র তাকে সঙ্গে করিয়া যাওয়া চাই! এবং সমস্ত খরচ···

বিহ্বলা কহিল—এ যে রাজসূয় যজ্ঞ করচো!

পদ্মনাথ কহিল—বলো কি, বিহ্বল! আমার জীবন ···সে তো গিয়েছিল!

বিহ্বলা কহিল—তা বলে যে রেটে খরচ করচো, তাতে সে জীবনকে রক্ষা করা শক্ত হবে!

পদ্মনাথ কহিল—একটা কাজে তো—

বিহ্বলা কহিল—তারো সীমা থাকে!···ও-ই বা কেমন লোক! তুমি এত পয়সা খরচ করচো—ওর বাধচে না কৃতজ্ঞতা! মানুষের চক্ষুলজ্জাও তো হয়···

পদ্মনাথ কহিল—পকেট থেকে পয়সা তো বার করে।

ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বিহ্বলা কহিল—ছাই!

পদ্মনাথ কহিল—আজ কথা আছে—নাট্যমন্দিরে যাবো। শিশির ভাদুড়ী বহুদিন পরে 'আলমগীর' সাজচে।

বিহ্বলা কহিল—কুসুম শিকদারও সঙ্গে যাবে?

পদ্মনাথ কহিল—নিশ্চয়।

বিহ্বলা কহিল—তা'হলে তোমরা দু'জনে যাও—আমি যাবো না।

পদ্মনাথ ডাকিল—বিহ্বলা···

আবেগে তার স্বর গাঢ়।

বিহ্বলা কহিল—না, দু'নৌকোয় পা দেওয়া আমার চলবে না। যেতে হয় তোমার সঙ্গে যাবো—নয় কুসুম শিকদারের সঙ্গে; দু'জনের সঙ্গে যাবো না। এ যেন সুভদ্রা দেবী চলেছি! একদিকে জগন্নাথ আর অন্য দিকে বলরাম!—আমার একটা ইজ্জৎ আছে। দেখেচো, 'গবাবাম' কাগজে ছড়া বেরিয়েচে! আমি যাবো না,—আমার স্পষ্ট কথা।

৪

থিয়েটারে যাইবার জন্য পদ্মনাথ আসিয়া শুনিল বিহ্বলা গিয়াছে গ্লোবে বায়োস্কোপ দেখিতে, কুসুমের সঙ্গে!

পদ্মনাথ নিশ্বাস ফেলিল—বিহ্বলা তাহা হইলে যে কথা কাল বলিয়াছিল···

পরের দিন সকালে কুসুম আসিল পদ্মনাথের মেশে। পদ্মনাথ তখন তার সাদা জুতায় খড়ি মাখাইতেছে।

কুসুম কহিল—একটা কথা আছে···

—বলো···

অন্তরঙ্গতায় 'আপনি' ঘুচিয়া দুজনেই এখন 'তুমি' বলিতেছে। কুসুম কহিল—সেদিন যদি জলে আমি না লাফিয়ে পড়তুম, তাহলে কি হতো?

পদ্মনাথ কহিল—আমি ডুবে মারা যেতুম।

—তা যদি মারা যেতে, তা হলে বিয়ে হতো না—এই বিহ্বলার সঙ্গে?

—না।

কুসুম কহিল—কাল গ্লোবে গিয়েছিলুম—বিহ্বলা আর আমি। অনেক কথাই হলো।···আমার উপর বিহ্বলার শ্রদ্ধা আছে—প্রীতি আছে। আমি কবি, আমি গল্প লিখি, আমি নাট্যকার। আমার লেখার সমালোচনা করে তুমিও লিখেচো—বাঙলা সাহিত্যে আমি অপ্রতিদ্বন্দ্বী···

পদ্মনাথ কহিল—হ্যাঁ।

কুসুম কহিল—তার উপর আমার বাবার পয়সা আছে—চাটগাঁর জমিদার।

পদ্মনাথ কহিল—হ্যাঁ।

কুসুম কহিল—বিহ্বলা আমায় ভালোবাসে। বেচারী সে কথা কাল আমায় বলেচে।

মাথার উপর আকাশখানা সশব্দে যেন ফাটিয়া গেল। পদ্মনাথ স্তম্ভিত—বজ্রাহত! বিহ্বলা···তার শক্তি! তার···

প্রকাণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস ঝড়ের মত পদ্মনাথের মনের মধ্যে উদয় হইয়া সেখানকার যা-কিছু সাধ-আশা—গন্ধ বর্ণ, হাসি-ভাষা সব ভাঙ্গিয়া ছিঁড়িয়া চূর্ণ করিয়া দিল।

কুসুম কহিল—আমি তোমাকে জীবন দান করেচি—সে মস্ত ঋণ। সে ঋণ তুমি শোধ করো—বিহ্বলাকে দাও—আমি চাই।

—বিহ্বলা!

—হ্যাঁ। সে তোমার প্রার্থী নয়। সে আমাকে বলেচে—তুমি তাকে মুক্তি দিলে আমাকে···

পদ্মনাথ কহিল,—বিহ্বলা এ কথা বলেচে?

—হ্যাঁ।

পদ্মনাথের পায়ের নীচে মাটী দুলিয়া উঠিল···

কিন্তু সাহিত্যে এই সুরই বাজিয়া উঠিয়াছে!—প্রাণের এই কামনার সুর··

কোনোমতে দু'হাতে বুক চাপিয়া পদ্মনাথ কহিল—

বিহ্বলা যদি বলে থাকে,—বেশ, তাই হবে! আমি তাকে মুক্তি দিলুম!

কুসুম চলিয়া যাইতেছিল। পদ্মনাথের কি মনে পড়িল। সে কহিল—দাঁড়াও।

কুসুম দাঁড়াইল। পদ্মনাথ ঘরে ঢুকিয়া বাক্স খুলিল, —খুলিয়া তার মধ্য হইতে একখানা ফটো বাহির করিল —করিয়া ফটো আনিয়া কুসুমের হাতে দিয়া কহিল,—এ ফটো নাও, বিহ্বলার। এতে আমার আর কোনো অধিকার নেই আজ থেকে!

কুসুম নিশ্বাস ফেলিল। এ-নিশ্বাস সে চাপিয়া রাখিতে পারিল না। লেখক-কুসুমের অন্তরের নিশ্বাস!

কুসুম কহিল—কিন্তু স্মৃতিটুকু—তাও ত্যাগ করচো।

পদ্মনাথ কহিল—আসল যদি দিতে পারি, তুচ্ছ স্মৃতি নিয়ে কি করবো? তাতে তো পিপাসা ঘোচে না!

কুসুম হাসিয়া কহিল—এই জন্যই তোমার গল্প লেখা শেষ হয়ে গেছে। স্মৃতির দাম আসলের চেয়ে অনেক বেশী। স্মৃতি থেকে অনেক কিছু গড়তে পারতে—আসলে তা গড়া সম্ভব নয়।—তা যাক্, তুমি যা ভালো বুঝবে করবে, তাতে আমার কোনো কথা থাকতে পারে না।...

কুসুম আসিল বিহ্বলার কাছে। বিহ্বলা কহিল—এগ্‌জিবিশনে যাবো, ভাবচি। এসো...

কুসুম কহিল—শরীরটা কেমন...

বিহ্বলা কহিল—তবে পদ্মাবাবুকে বলে পাঠাই।

কুসুম কহিল—একটা এ্যাস্‌পিরিন খেয়েচি! মাথা-ধরা ছেড়েচে। এসো...

দু'জনে ট্রামে আসিয়া চড়িল। কুসুম টিকিট কিনিল।

এগজিবিশনের টিকিটের দাম আট আনা...কুসুম সে টিকিটও কিনিল।...

মেলায় কি ভিড়! বিহ্বলা কহিল—দেশী এত জিনিষও এখন দেশে তৈরী হচ্ছে! বাঃ! ছাখো শিল্কের রুমাল... আর এই ফুলদানীগুলো...

বাছিয়া কয়েকটা দ্রব্য সে একত্র জড়ো করিল, কহিল—এগুলোর কত দাম?

ষ্টল-কীপার কহিল,—তিন টাকা দশ আনা।

বিহ্বলা উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল—টাকা সঙ্গে আনিনি, দিন তো কুসুমবাবু,—বাড়ী গিয়ে মায়ের কাছ থেকে...

কুসুম পকেটে হাত ঢুকাইল—শিহরিয়া দুই চোখ কপালে তুলিল।

বিহ্বলা কহিল—কি হলো?

কুসুম কহিল—কে পকেট মেরেচে! পার্শ নেই!

—বলেন কি?

—তাই। দেখি, পড়ে গেল কি-না—

পাগলের মত কুসুম ষ্টলের বাহিরে আসিল। তারপর—

বিহ্বলা কহিল—মা মশায়, পিক-পকেট। জিনিষ রাখুন। অন্য সময় এসে নেবো।

সে আসিয়া ষ্টলের বাহিরে দাঁড়াইল—কুসুম? ঐ যে!

কুসুম ফিরিল। বিহ্বলা কহিল,—পেলেন?—

—না।

—কত ছিল পার্শে?

কুসুম মনে মনে হিসাব কষিল, কষিয়া বলিল—তা নোটে-টাকায় আর খুচরোয় মিলিয়ে প্রায় সাঁইত্রিশ টাকা সাড়ে তিন আনা।

বিহ্বলা সমবেদনা জানাইয়া কহিল—আমার জন্য লোকসান!

কুসুম কহিল—উপায় কি, বলো!—তবে তোমার জিনিষগুলো পছন্দ হয়েছিল।...ওদের না হয় বলে যাই—এক সময়ে এসে আমি নিয়ে যাবো।

বিহ্বলা কহিল,—থাক! বাধা পড়লো যখন—কিন্তু ভারী তেষ্টা পেয়েচে! এক পেয়ালা চা পেলে...

কুসুমেরও গলা শুকাইয়া কাঠ! সে কহিল,—পার্শ নেই।

বিহ্বলা কহিল—থাক। দাম দেবেন কি করে?

কুসুম কহিল—হুঁ। আচ্ছা দেখি, ওখানে একটা বইয়ের ষ্টল আছে। তাতে দেখলুম আছে আমাদের মাখন খাস্তগীর। তার কাছ থেকে একটা টাকা চেয়ে নিয়ে আসি—ধার! বাড়ী ফিরতে ট্রামের ভাড়াও তো লাগবে...

বিহ্বলা কহিল—ধার যদি মেলে, তা'হলে পাঁচ টাকাই নিন না...

কুসুম কহিল—দেখি।

৫

আর একদিনের কথা।

বিহ্বলা কহিল—কার্ণিভালে যেতে এমন ইচ্ছা হচ্ছে। চলো...

কার্ণিভালের টিকিট দু'আনা করিয়া! এ সব কথা না রাখিলে বিহ্বলার চিত্ত কি করিয়া জয় হয়! প্রেমের সাধনায় এই ভালাই মন্দ!

ট্রামে চড়িবে, সহসা বিহ্বলা ডাকিল,—বিলাস...

একজন যুবা আসিয়া পাশে দাঁড়াইল, কহিল,—কোথায় চলেছো?

বিহ্বলা কহিল—কার্ণিভালে।

সে কহিল—বটে! আমিও যাবো-যাবো ভাবচি—যাওয়া হয় না সঙ্গীর অভাবে!

—এসো না…

বিহ্বলা পরিচয় করাইয়া দিল। এঁর নাম, বিলাস সরকার—ব্রকের কারবার আছে—বেশ ছ'পয়সা রোজগার করেন! আর ইনি সেই বিখ্যাত কবি-ঔপন্যাসিক-নাট্যকার শ্রীযুক্ত কুসুম শিকদার।…

ট্রামে উঠিতে কণ্ডাক্টার আসিল। বিলাস পার্শ বাহির করিল; বিহ্বলা কহিল—না, না। তুমি আমাদের গেষ্ট…

তারপর কুসুমের পানে চাহিয়া কহিল—তিনখানা টিকিট নাও…

কুসুম তিনখানি টিকিট লইল—শুধু ট্রামে নয়—কার্ণিভালের প্রবেশ-দ্বারেও!… খরচ এক টাকার কম, তবু মন ঝাঁজিয়া উঠিল!

তারপর…হুইপ… ডেয়াকপ্লেন… মারমেড… রবার গার্ল!

বিহ্বলা কহিল—না,… না বিলাস, তুমি গেষ্ট…তুমি পয়সা দেবে কি! পয়সা আমরা দেবো…

কণ্ঠ আবার শুষ্ক হইল! বিহ্বলা কহিল—চা…

কুসুম কহিল—এসো…

চায়ের ষ্টল…এক পেয়ালা চা! বিহ্বলা কহিল—সে কি আমি একলা খাবো! তোমরা…? না, না,…

ষ্টলওয়ালাকে নিজেই বলিল—আরো ছ' পেয়ালা দিন তো…

কার্ণিভাল হইতে বাহিরে আসিল…রাত্রি বারোটা। বিহ্বলা কহিল—অনেক পয়সা খরচ হয়ে গেছে। না, আর নয়। এসো বাড়ী ফিরবো হেঁটে…

বিলাস কহিল—আমি বিদায় নি। আমি যাবো ভবানীপুরের দিকে। ঐ দিকেই এখন থাকি কি না!

—ও!

বিলাস বিদায় লইল।

বিহ্বলা কহিল,—হাঁটতে কষ্ট হবে না?

কুসুম কহিল—না।

গম্ভীর স্বর।

একটা মোড়ে আসিয়া বিহ্বলা কহিল,—আমি জানি, গলি আছে—short cut…এসো…

কুসুমের যেন চেতনা নাই—বিহ্বলার ইঙ্গিতে সে চলিল—এ-গলি, ও-গলি… প্রায় আধ ঘণ্টা…

কোথায়, কার গৃহের ঘড়িতে একটা বাজিল।

বিহ্বলা কহিল—তাইতো! আর যে চিনতে পারচি না। এই ইম্‌প্রুভমেণ্টের জ্বালায় এমন হয়েচে!…তুমি চেনো না?

—না।

কুসুম চেনে না সত্য। সে সাহিত্য-চর্চ্চা করে—ও-পাড়ার পথে চলে। চীনা পাড়ার দিকে আসিবে কি কারণে!

পা টনটন্ করিতেছিল। বিহ্বলা কহিল—সত্যি, পা ধরে গেছে।

ঘুরিতে ঘুরিতে আবার সেই কার্ণিভালের তাঁবুর পাশে! সামনে খালি ট্যাক্সি…

বিহ্বলা কহিল—ট্যাক্সিটায় উঠুন। আমি আর হাঁটতে পারচি না। সত্যি!

অগত্যা ট্যাক্সি…

সে-রাত্রে বিহ্বলাকে নামাইয়া, নিজে বাসায় ফিরিয়া কুসুম ট্যাক্সি ভাড়া দিল,—ছ' টাকা দশ আনা! তার উপর মারমেড, হুইপ…এ সবে তিন আনা করিয়া টিকিট—মোট খরচ হইয়া গিয়াছে—দশ টাকার উপরে!

তার কেমন রোখ চাপিল। নোট-বুক খুলিয়া, হিসাব কষিতে লাগিল। বিহ্বলার প্রেম-সাধনায় এ পর্য্যন্ত… হিসাবের অঙ্ক দেখিয়া মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করিয়া উঠিল। সে গিয়া বিছানায় ঢুকিল, ঢুকিয়া লেপ মুড়ি দিল।

৬

পরের দিন সকালে দৃশ্য-পরিবর্ত্তন। পদ্মনাথের বেশ—আজ সাদা জুতায় খড়ি ঘষা নয়। পদ্মনাথ ঘরের সামনে বারান্দায় বসিয়া রুমালে সাবান ঘষিতেছিল।

কুসুম কহিল—নমস্কার!

পদ্মনাথের বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। উপন্যাসের বাহিরে—বাস্তব জীবনে—বুকে এমন ক্রিয়া সত্যই হয়… তরুণ বয়সে এতখানি আশা-ভঙ্গ!…তারপর ওখমান আসিয়া যদি সামনে উদয় হয়…

পদ্মনাথ হাসিল—অতি মৃদু-মলিন হাসি।

কুসুম কহিল—এই নাও সে 'ফটো'…

বিহ্বলার সেই ফটো—কুসুম পকেট হইতে বাহির করিয়া পদ্মনাথের সামনে রাখিল। পদ্মনাথ বিস্ময়ে হতভম্ব।

কুসুম কহিল—ক'দিন প্রেমচর্চ্চায় যা ব্যয় হয়েচে—এ রেটে ব্যয় সহ্য হবে না। এখনো উপায় আছে, কিন্তু বিবাহ হলে নিরুপায় হতে হবে!…তাই আমি বিহ্বলাকে তোমার হাতেই ফিরিয়ে দিতে এসেচি… অমলিন, কলঙ্কবিহীন!

পদ্মনাথের চোখের সামনে পৃথিবী এতদিন বিশ্রী বিমলিন ছিল—আলোয় যেন কালো ছায়া! সে ছায়া সরিয়া এখন আবার আলো জাগিল—স্মিত, দীপ্ত!…

কুসুম কহিল—তার উপর imhertinence…সকালে প্রেসের একটা কম্পোজিটারকে দিয়ে এই চিঠি পাঠিয়েছিল!…আমার গল্প-নর-নারীই ভালো…এতকাল ধরে

গল্পে-উপন্যাসে প্রায় সাড়ে তিনশো modern কিশোরী-নারীর ছবি এঁকেচি। কিন্তু এই বিহ্বলা—well, my mind coulb not imagine her likae !……চিঠিখানা পড়ো… …আমার সামনে নয়—তবে হাঁ, I abandon all claim। বুঝচি, মানস-সুন্দরী ছাড়া সত্যকার সুন্দরী—এ ভাগ্যে বোধ হয় পাবো না…

কুসুম চলিয়া গেল, পদ্মনাথ রুমাল রাখিয়া বার-সোপ রাখিয়া চিঠি পড়িতে লাগিল। চিঠি বিহ্বলা লিখিয়াছে কুসুমকে !

…ক্ষমা করবেন কুসুমবাবু ! যত বড় লেখক আপনি হোন, এবং নারীকে যত বোকা করেই আপনার সাহিত্যে আঁকুন—নারীর বুদ্ধি আছে।

লিরিকে বা কাব্যে নারীর চিত্ত জয় করা যায় না—এই প্রগতির যুগেও নয় !

দু'পয়সা ব্যয় করতে আপনি মিথ্যার আশ্রয় লন—বলেন, 'পার্শ' গেছে পকেট-মারের হাতে! অথচ কিশোরী-নারীর সঙ্গ-সাহচর্য্য-সখিত্ব আপনি কামনা করেন—ভরপুর রকমে !

নারী ভালোবাসে মানুষকে। নারী তার দামও বোঝে—এবং সে দামের মর্য্যাদাও সে করে। কিন্তু বাক্য-বাগীশ প্রণয়-বিলাস—তাদের প্রণয়ে নারীর রুচি নাই, অভিলাষ নাই! আপনাকে পরীক্ষা করছিলুম। পুরুষের সঙ্গে মিশে বেহালে, তার খেয়ালে সে নিজেকে বিসর্জ্জন দেয় না—এটুকু মনে রাখবেন। কৃপণকে নারী অবজ্ঞা করে !

আপনি লেখেন বলেই আপনার হাতে এ জীবন তুলে দিতে আমি অক্ষম ! পদ্মনাথবাবু লেখা ছেড়েচেন—মানুষ হবেন, আশা আছে। আপনার মত নিজেকে বাঁচিয়ে প্রণয়-যজ্ঞ তিনি জানেন না—এই সব কারণে আমি তাঁকে ভালোবেসেচি।

তাঁর শ্রদ্ধা-সখ্যের অপমান করতে আপনি এতটুকু কুণ্ঠিত হননি ! তাঁর সঙ্গে আমার বিবাহ হবে—এতদিনের অন্তরঙ্গতা ! তা দেখেও আপনার বিশ্বাস হলো, তাঁকে হটিয়ে দিতে পারলে আমার চিত্তে আপনার আসন স্থাপিত হবে এবং সেই কথা অসঙ্কোচে আমায় বলতে সঙ্কোচ করলেন না ! বন্ধুর অগোচরে এ-বিশ্বাসঘাতকতা—এর তুলনা আছে ? ছি ! নারী এমনি অসার ! এতই হীন ! নারীকে এত খেলো কি করে ভাবলেন !

আপনার মন-গড়া frivolous নারী—তার স্থান যদি কোথাও থাকে, তো আপনার উর্ব্বর মস্তিষ্কে, আর আপনার লেখা গল্প-উপন্যাসের পাতায় ! ও-রকম নারীর দেখা বাস্তব জগতে পাবেন না—ভদ্র গৃহে—বাঙলা দেশে তো নয়ই !

গল্প লেখেন বলে তার নেশায় বিভোর হয়ে মানুষকে দেখছেন ভূত। কিন্তু মানুষ আজো মানুষ—ভূত নয় !

আশা করি, এর পর যে উপন্যাস লিখবেন, তাতে একেবারে—

কিন্তু সে ইঙ্গিত আমি কেন দিই…?

চিঠি পড়িয়া পদ্মনাথের সারা দেহে রোমাঞ্চ…চেতনা যেন বিলুপ্তপ্রায়।

চেতনা হইল ছিরুর কথায়। ছিরু কহিল—চিঠি…

ছিরু বিহ্বলাদের ছাপাখানায় এপ্রেন্টিস ! পদ্মনাথ চিঠি খুলিল—এ'ও বিহ্বলার লেখা। বিহ্বলা লিখিয়াছে—

স্বাগত—স্বামী।

মজার কাহিনী আছে—বলবো ! পারো, তা নিয়ে একটা গল্প লিখো। 'অম্বালিকায়' না ছাপে, আলাদা বই করেই ছাপিয়ো। রেকর্ড থাকবে—একজন ওস্তাদ লিখিয়ের জীবনে মস্ত এ্যাডভেঞ্চারের।

আজ আপিসের পর এসো—এসো। এতদিন আসোনি কেন ?—দুষ্টু !

# টোপ

কালী-পূজার পর। পাটনা থেকে রজনীনাথ কলকাতায় আসছিলেন। রজনীনাথ অম্বালায় থাকেন। পাটনায় বড় মেয়ের শ্বশুর-বাড়ী। পথে মেয়ে-জামাইকে একবার দেখে আসবেন, তাই পাটনায় নেমেছিলেন।

পঞ্জাব মেলে কি প্রচণ্ড ভিড়! বার্থ রিজার্ভ পাওয়া যায় নি! তা বলে যাওয়া বন্ধ হতে পারে না। ঠাশাঠাশি করে কোনমতে রাত্রি কাটানো!

গায়ে চায়না সিল্কের কোট, কাঁচি ধুতি পরা, পায়ে পেটেণ্ট-লেদারের আলবার্ট স্যু···সুশ্রী চেহারা, হাবে-ভাবে সম্ভ্রমের পরিচয় জ্বলজ্বল্ করচে। কথাবার্তায় তেমনি অমায়িকতা! সহযাত্রীরা সমাদরে তাঁকে কামরায় স্থান দিলেন।

যাঁরা অভ্যর্থনা করে স্থান দিলেন, তাঁরা প্রচণ্ড সৌখীন। পোষাকে-পরিচ্ছদে, কথায়-বার্তায় ঐশ্বর্য্যের স্বর্ণকিরণ ঝলসে উঠ্চে! তাঁদের মধ্যে এমনি কথাবার্তা চলেছিল,—

—আপনার সে রেশের ঘোড়াটা কি বেচে ফেললেন, মনোরঞ্জনবাবু? আর নাম দেখি না। বুঝলে হে লালগোপাল, সেবার অমন যে তেজী ঘোড়া 'ইয়ং প্রিন্স,' তাকে কলকাতা আর বোম্বাই, দু'জায়গাতেই হারিয়ে দিলে!

লালগোপাল বললে,—বটে! তা সে ঘোড়া··?

মনোরঞ্জন বললেন—বেচেছি। কি দর পেলুম, জানো?···বিশ্বাস করবে? নগদ সাড়ে তিন লাখ টাকা।

—সাড়ে তিন লাখ! বলেন কি···?

মনোরঞ্জন একটু বক্র হাসি হেসে একবার চারিধারে চাইলেন, তারপর বললেন,—ওর একটি পয়সা কম নয়। লর্ড জুলিস্‌বেরি কিনেচেন। এবারে ডার্বিতে ঐ-ঘোড়া ছুটচে রে! সেবার ঐ আমেরিকান টুরিষ্টদের সঙ্গে জুলিসবেরি কলকাতায় এসেছিলেন—ঘোড়া দেখে তিনি একেবারে পাগল! আমায় মহাপীড়াপীড়ি—শেষে লাটসাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারির সুপারিশ অবধি। দিলুম ছেড়ে ঘোড়া। টাকার জন্যই তো রেশে ঘোড়া দেওয়া! তা, সেই টাকাই যখন পাওয়া গেল।··আমি তো ও ঘোড়া কিনেছিলুম, সেই পাগলা ফকির কাছ থেকে মোট দশ হাজারে। ক্যাপ্ মেম মরে যেতে সে নিলেন গেল না···?

কথাটা শেষ করে মনোরঞ্জন ডাকলেন—ওহে ও পণ্টু···কাগজে কি এমন মহাখপর বেরুলো যে তন্ময় হয়ে গেলে! দু-চারটে কথা কও··

বলেই তিনি পণ্টু নামা সহযাত্রীর হাত থেকে খপরের কাগজখানা টেনে নিলেন। পণ্টু ঘোর আপত্তি জানিয়ে বলে উঠলো,—আহা, দাও ভাই—আমি ওই প্রাইড প্রস্‌পার লিমিটেডের পাটের দর দেখছিলুম—ডিভিডেণ্ট কমাচ্ছে, অথচ আমার বিস্তর টাকা ওদের শেয়ারে আটকে আছে!···

মনোরঞ্জন একটা সিগার ধরিয়ে তাচ্ছল্যের ভাবে বললেন,—তুমি পাগল···তাই অমন কাঙ্কিনাড়া কামার-হাটির শেয়ারগুলো বেচে কোথাকার কি প্রাইড প্রসপারে শেয়ার নিলে!

পণ্টু বললে,—কোটালির মহারাজ দু'হাত ধরে অনুরোধ করলেন—তিনি ঐ মেম বিয়ে করে এসেচেন না বিলাত থেকে—সে মেম হলো আবার ল্যাঙ্কাশায়ারের এক মস্ত মিলের ডিরেক্টরের বোন···তা সেই মেমের ভাই নিজে মহারাজকে মুরুব্বি পাকড়েছিল···

পণ্টুর কথায় বাধা দিয়ে মনোরঞ্জন বললেন,—ঐটে তোমরা ভারী ভুল করো। পয়সা-কড়ির ব্যাপারে পরের গরজ দেখতে যাওয়া মস্ত মূর্খতা! আমি কি-টাকাটা নিয়েই না ছিনিমিনি খেলি! কখনো ঠকতে দেখেচো?

লালাগোপাল বললে,—কৈ, না।

সনাতন বিশ্বাস মস্ত রূপার ডিবে খুলে সাম্‌নে ধরে বললে,—পাণ···

সকলে একটা একটা পাণ তুলে নিলেন।···জর্দ্দা, সুর্ত্তি সেই সঙ্গে। তারপর কথাবার্ত্তা সুরু হলো,—হালিশপুরের নবাবের নতুন জার্মান হাউণ্ড নিয়ে। কুকুরের জন্য এক জার্মান খানশামা রাখা হয়েচে। তার মাহিনা, মাসে পাঁচশো টাকা। তাছাড়া ছ'মাস কুকুর সিমলের পাহাড়ে থাকবে···ঐ কুকুরের সঙ্গে সে সাহেবও।

লালগোপাল বললে,—কুকুরের দাম পড়েচে বারো হাজার টাকা, না?

পণ্টু বললেন,—না, এগারো হাজার।

মনোরঞ্জন বললেন,—এই সব ফোতো চালেই এখানকার রাজা-মহারাজা নবাব-বাদশাগুলো গেল! ···ওই যে বাগবাজারের রাজা···হুঁঃ, এরোপ্লেন কিনলে না একখানা! আমার কাছেই তো তাঁর ধার রয়েচে তিন লাখ, ওই জুয়োমারি আর নশীবগঞ্জ পরগণা বাধা রেখেচেন।···তাছাড়া দ্বারভাঙ্গার কাছে আছে সাতান্ন হাজার, বুড়ো মুচোলকারের কাছে এক লাখ, দিল্লীর রাম্পানি ব্রাদার্সের কাছে ছত্রিশ হাজার···এমনি খুচরো দেনা যে কত, তার আর

সংখ্যা নেই! নবাবি কি কমেচে কিছু? কোথা থেকে যে শোধ দেবে, জানি না!···বাণী সেদিন কালীঘাটে গিয়ে দশ হাজার টাকা দান করে এলেন, নকুলেশ্বরতলায় ধর্ম্মশালা তৈরী করবার জন্ম!···ও সব জানা আছে ভাই···উপরে তাজামাজা যত ছাখো, ভিতর একদম ফোঁপরা!···

রজনীনাথ চুপ করে বসে এই সরস আলোচনা শুনছিলেন। তাঁর রোমাঞ্চ হচ্ছিল—লোকটা টাকার কুমীর···আর ভারতবর্ষের কারো হাঁড়ির খপর অবিদিত নয়, দেখচি! কে এই মনোরঞ্জন বাবু···? বড় গড়গড়ায় অম্বরী তামাক চলেছে, গড়গড়ার সঙ্গে আঁটা প্রচুর আভরণ, যেন গোটা তাজমহলকে রংচং করে সামনে বসিয়ে তার চূড়োয় কলকে চড়িয়েছে!···

ট্রেণ হুশ-হুশ শব্দে চলছে···হাওয়ার বেগে··· মাঝে মাঝে কয়লার গুঁড়ো কামরার মধ্যে ছড়িয়ে, বিরাট উল্লাসে, উৎসাহে···আবছায়ার মত ছোট ছোট ষ্টেশনগুলোকে টকাটক্ পার হয়ে···এবং রজনীনাথ স্তম্ভিত চিত্তে রুদ্ধ নিশ্বাসে এই ধনী সমাজের গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে চলেছেন······

মোগলসরাই। একটা হৈ-হৈ কলরব। প্লাটফর্ম্মে যাত্রীর ছুটোছুটি···ওপাশে লোহার রেলিঙের ও-ধারে দাঁড়িয়ে অসংখ্য থার্ড-ক্লাসের যাত্রী পয়সা দিয়ে টিকিট কিনে যেন চোর হয়ে আছে। বেচারার দল!···পাছে তারা ছিট্‌কে প্লাটফর্ম্মে এসে মেলের কামরার দ্বারে হানা দেয়, তাই লৌহদ্বার বন্ধ, আর তার সমনে সতর্ক পাহারা মোতায়েন!···

হাফ-প্যাণ্ট-পরা কোট-গায়ে, মাথায় শোলার টুপি, এক কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রৌঢ় বাঙালা-সাহেব রজনীনাথের কামরায় ঢুক্‌লেন—ঢুকেই উচ্ছ্বসিত স্বরে বললেন—Ah me! মনোরঞ্জন বাবু! ট্রেনেই দেখা··· বাঃ, ভারী সুলক্ষণ!

এক গাল হেসে মনোরঞ্জন বললেন,—কেন? ব্যাপার কি, পল?

পল-সাহেব বললেন,—আপনার ওখানেই যাচ্ছিলুম···আপনাকে পাবো কি পাবো না ভেবেও··· কোথায় আছেন, ঠিকানা তো চট্ করে পাবার উপায় নেই। অথচ দরকার খুব···

মনোরঞ্জন বললেন—তা, গেলেও পেতে না! হঠাৎ বাড়ী থেকে এক টেলিগ্রাম পেলুম···অষ্ট্রেলিয়া থেকে এক সাহেব এসেচেন,—আঁশফল আর করমচার সন্ধানে। মস্ত কারবার ফাঁদচে তারা সেখানে—জ্যাম্ করবে, জেলি করবে। এখান থেকে আঁশফল আর করমচা চালান দিতে হবে, তার বন্দোবস্তর জন্ম এসেচে। তা, বেচারীর শরীর খারাপ—কলকাতা থেকে নড়তে পারবে না, কাকুতি জানিয়ে টেলিগ্রাম করেছিল, তাই আসতে হলো! ছিলুম বহুদূরে। জিয়োগ্রাফি পড়েচো? ডেরা-গাজী-খাঁ জানো? সেইখানে গিয়েছিলুম।···

পল দুই চোখ কপালে তুলে বললেন—ডেরা গাজী খাঁ! সেখানে হঠাৎ···?

মনোরঞ্জন বললেন—সেখানে নতুন রেল-লাইন পাতা হচ্ছে—সিধে আফগানিস্থান অবধি। মজুর-লোক ষ্ট্রাইক্ করেচে···তাই। মানে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আর আফগান গবর্ণমেণ্ট—দু'গবর্ণমেণ্ট মিলে লাইন পাতচেন কি না···এদিকে লাট সাহেবের অনুরোধ, ওদিকে কাবুলের বড় উজীর তিরদী বেগের করুণ মিনতি—কাজেই যেতে হলো···

পল সাহেব বললেন,—ষ্ট্রাইক চুকেছে?

একটা ভ্রূভঙ্গী করে মনোরঞ্জন বললেন—নিশ্চয়। শর্ম্মাকে কখনো কোনো কাজে নিষ্ফল হতে দেখেচো?

পল বললেন—তা বটে! তা আমার কাজটা···

মনোরঞ্জন বললেন—কি তোমার কাজ, শুনি।

পল বললেন—জানেন তো এখন আমি ম্যায়মুমিয়ার নবাব-এষ্টেটে শাহজাদাদের গার্জ্জেন-টিউটর ···বড় শাহজাদা বিলাত গেছলেন বেড়াতে। সেখানে এক বে-এক্তিয়ারী কাজ করে ফেলেচেন। এক বড় ঘরের মেয়ের ব্যাপার···ফৌজদারী মকর্দ্দমা অবধি··· এক লক্ষ টাকা না হলে মিটবে না। এষ্টেটে এবার আদায়-পত্র কম···কাজেই এই লক্ষ টাকা সংগ্রহ করতে হবে। নবাব-সাহেব কাছাকাছি কারো কাছে হাত পাতবেন না—ইজ্জৎ যাবে। তাই কাল আমাকে সন্ধ্যার পর ডেকে চুপিচুপি বললেন, পল, তোমারা'পর মেরা ইজ্জৎ! আমি মাথা চুলকে বললুম—ঠিক বলতে পারি না—তবে চেষ্টা দেখবো ···যদি আমাদের কর্ত্তা থাকেন! নবাব বললেন, কালই তুমি বেরিয়ে পড়ো—যদি পারো তো এই যে নতুন ইশলামিয়া কলেজ খুলচি, এর প্রিন্সিপাল হবে তুমি। মাহিনা মাসে সাড়ে তিন হাজার; তার উপর এই লোনের দালালীর দরুণ, পঁচিশ হাজার টাকা দেবো!

হেসে মনোরঞ্জন বললেন—চলো। তার আর কি! তোমার যদি একটা উপকার হয়—আচ্ছা! কিন্তু শুধু জুয়েলারিতে হবে না। এষ্টেটটি বন্ধক দিতে হবে। তবে সুদ কমিয়ে দেবো। তুমি চার পার্শেণ্টেই দিয়ো···কতকগুলো টাকা বাক্সয় বন্ধ রেখে কি লাভ? যদি কারো উপকার হয়, হোক্, সেই সঙ্গে নিজের একদম্ লোকসান না হয়···বুঝলে কি না!

পল একেবারে অনুগ্রহার্থীর লুটিয়ে-পড়া ভঙ্গীতে

বললেন,—আজ্ঞে, আপনার এই দয়াতেই তো ও-চরণে গোলাম হয়ে আছি।...

রজনীনাথ অবাক! এমন মহাপুরুষ ইনি···? পরার্থে এমন আগ্রহ—এ যে কলিকালে দুর্লভ বস্তু! মনোরঞ্জনের উপর শ্রদ্ধা যে না হলো, এমন নয়! তবে, এত বড় ধনী—মনে করলে একটা সেলুন রিজার্ভ করে অনায়াসে যাত্রা সমাধা করতে পারেন, তা না করে সকলের সঙ্গে মিলে এই সেকণ্ড ক্লাসের কামরায় বহু অসুবিধার মধ্যে...?

মনোরঞ্জন তাঁর এ সম্ভ্রমের ভাব লক্ষ্য করলেন,... করে বললেন,—আপনি ভালো করে বসতে পারচেন না—না? ওহে পণ্টু- ওঁকে ঐ বেঞ্চটা ছেড়ে দাও। উনি একটু আরামে বসুন। উঁচুদরের লোক—চেহারা দেখে বুঝতে পারচো না?

পণ্টু তখনি সসম্ভ্রমে বেঞ্চ খালি করে দিলে, মনোরঞ্জন বললেন—আপনি ঐ বেঞ্চে বসুন। রাত্রে একটু নিদ্রারও প্রয়োজন আছে তো···

রজনীনাথ অপ্রতিভ···; বললেন,—বেশ আছি।

মনোরঞ্জনের বার-বার অনুরোধ···অগত্যা রজনীনাথকে সে বেঞ্চ দখল করতে হলো। তিনি ধন্যবাদ জানালে মনোরঞ্জন বললেন, আহাহা নিজেদের মধ্যে এগুলো আর কেন! আমরা বাঙালী,···মিশুক জাত। বাঙালী হয়ে যদি বাঙালীর সুখ-দুঃখ না বুঝবো তো বাঙালাদেশে না জন্মে কাবুলে কিম্বা নিকারাগুয়ায় জন্মালে পারতুম! এই আমায় সকলে বলে, ফার্ষ্ট ক্লাশ কম্পার্টমেণ্ট রিজার্ভ করে যান না কেন? আমি বলি, ইংরেজ কোম্পানীকে অনর্থক কতকগুলো পয়সা দিয়ে ফল? তাছাড়া পাঁচজনের সঙ্গে মিলে-মিশে গল্প করে যাবো, তার আনন্দ···

তারপর পরিচয়···আপনার নাম? কোথায় থাকা হয়?

রজনীনাথ পরিচয় দিলেন।

—বিষয়-কর্ম্ম?

রজনীনাথ বললেন,—তিন পুরুষ ঐ অম্বালাতেই বাস। কাঠের কারবার আছে, তাছাড়া জমিজমা। আর রেলোয়ে কণ্ট্রাক্ট···

—ও তাহলে পয়সা বেশ করেচেন।

—আজ্ঞে না। অমনি দিন চলে যাচ্ছে কোনো রকমে!

—কোথায় যাওয়া হচ্ছে এখন?

—কলকাতায়।

—কোথায় থাকা হবে?

—হরিতকী বাগানে এক আত্মীয় থাকেন; তাঁর ওখানে।

—হরীতকী বাগানে! আত্মীয়টি কে, নাম কি, বলুন তো?

—মৃত্যুঞ্জয় ঘোষাল। তিনি সামান্য চাকরী করেন··· এক মার্চেণ্ট অফিসের বড় বাবু।

—ও!···তা আসবেন দয়া করে আমার ওখানে··· যখন আলাপ-পরিচয় হলো। অম্বালায় আমাকেও বোধ হয় একবার যেতে হবে। একটা জমি বাঁধা আছে। সেটা দেখে-শুনে বন্দোবস্ত করবার জন্য! গাণ্ডার সিংকে জানেন? তারা দু'পুরুষ ধরে বাস করচে সুরাটে। ঐ বাড়ীই আছে শুধু অম্বালায়। শুনেচি, মস্ত বাড়ী। কখনো দেখিনি······

## ২

হরীতকী বাগানে মৃত্যুঞ্জয় ঘোষালের ছোট দোতলা বাড়ী। বাহিরের ঘরে বসে রজনীনাথ কাকে চিঠি লিখছিলেন... ঘরের সজ্জায় কোনো বৈচিত্র্য নেই! একখানা তক্তাপোষ, তার উপর সতরঞ্চ পাতা; দু'পাশে দুটো তাকিয়া, তার উপর দোয়াত-দান, কলম, পেন্সিল, ছেলেদের খাতা-বই, ভাঙ্গা একটা চায়ের পেয়ালা, কাঠিশূন্য দিয়াশালাইয়ের বাক্স একটা, আর একরাশ পুরানো পত্রিকা কাগজ।

বাড়ীর সামনে একখানা মোটর এসে দাঁড়ালো। প্রাইভেট কার্। গাড়ীর দ্বার খুলে পরক্ষণেই রজনীনাথের সামনে এসে দাঁড়ালেন, সেই পাঞ্জাব মেলের মনোরঞ্জন বাবু।

রজনীনাথ চিঠি লেখা বন্ধ করে শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন,—আসুন···

হেসে মনোরঞ্জন বললেন—এলুম।···মানে, এসেছিলুম ঐ বীডন্ ষ্ট্রীটে। এক বন্ধুর অসুখ, তাঁকে দেখতে। ফেরবার মুখে দেখলুম, হরিতকী-বাগান লেন ···ভাবলুম, পরিচয়টা একবার ঝালিয়ে যাই।

রজনীনাথ বললেন—আপনার অনুগ্রহ!

—তা, মৃত্যুঞ্জয় বাবু কোথায়? তাঁর সঙ্গেও আলাপ······

রজনীনাথ বললেন—আপিসের বাবু—তার কি আলাপের অবসর আছে? খেতে বসেচে, এখনি বেরুতে হবে।··

—বটে! তা ভালোই হলো। আমাদের ওখানে সন্ধ্যার পর চলুন না···একটু গান-বাজনা আছে। এলুম বহুদিন পরে কি না—সকলের সাধ। কি বলেন?

—বেশ, যাবো।

—ঠিকানা মনে নেই নিশ্চয়!···আমার গাড়ী পাঠাবো'খন। ড্রাইভার তো বাড়ী দেখে গেল! কি বলেন?

—বেশ।

—কখন আপনার সুবিধা হবে? আটটা?

—হাঁ।

তা হলে ঐ আটটাতেই গাড়ী পাঠাবো।…তেমন কিছু জরুরি কাজ তো নেই…? দেখুন, কোনো ক্ষতি হবে না ?

—না।

—তাহলে আর বসবো না। বলেই মনোরঞ্জন পকেট থেকে ঘড়ি বার করলেন। বেশ দামী ঘড়ি—রঙ-চঙে পাথর বসানো। ঘড়ি খুলতে নানা রঙের জ্যোতি চিক্‌মিক্ করে ঠিকরে পড়লো।…

মনোরঞ্জন বললেন,—মানে, বেলা ঠিক দশটায় বাবু-সেরাইয়ের মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবার কথা আছে। বাবু-সেরাই কোথায়, জানেন ? নেপালের কাছে। সেখানকার কাঠের নাকি ভারী নাম !…

রজনীনাথ বললেন,—নেপালের কাঠ তো খুবই ভালো বলে শুনি। তবে কখনো কারবার করিনি…

বটে! আচ্ছা, লাগে যদি তো আমিই জোগাড় করে দেবো…

মৃদু হাস্য বিলিয়ে মনোরঞ্জন বিদায় নিলেন। রজনীনাথ ক্ষণেক স্তম্ভিত দাঁড়িয়ে রইলেন, তার পর আবার চিঠি লিখতে বসলেন।…

…বালিগঞ্জের এক নিরালা পল্লীতে মস্ত বাড়ী, সঙ্গে বাগান। মোটর থেকে রজনীনাথ নামবামাত্র দুটি ভদ্রলোক তাঁকে অভ্যর্থনা করে ড্রয়িং-রুমে এনে বসালেন। মস্ত ঘর। সোফা-কৌচে সজ্জিত। মাঝখানে জাজিম পাতা। জাজিমের উপর হারমোনিয়ম, বেহালা, বাঁয়া-তবলা, পাখোয়াজ প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য-যন্ত্র।…জাজিমের উপর দশ-বারোজন ভদ্রলোক বসে নিবিষ্ট-চিত্তে গল্পগুজব করচেন। এক ধারে সাদা আচ্‌কানের উপর কালো মখমলের ফতুয়া-আঁটা, মাথায় হিন্দুস্থানী টুপি, একটা সিড়িঙ্গে রোগা লোক তানপুরার তারে আঙুলের ঘা দিয়ে পিড়িং-পিড়িং আওয়াজ তুলচে…ঘরে ইলেকট্রিক আলোর ঝাড় জ্বলছে।

রজনীনাথ জাজিমে বসতে যাচ্ছিলেন,—ট্রেনের কামরার সেই লালগোপাল বললেন—উহুঁ হু—ঐ সোফায় দয়া করে…

পাণ এলো, রুপার গোলাপ-পাশে গোলাপ-জলের ঝারা…তামাক, সিগার…প্রচণ্ড ধূম! কিন্তু মনোরঞ্জন বাবু ? মনোরঞ্জন বাবু কোথায় ?

রজনীনাথ সারা ঘরে দৃষ্টি বুলিয়ে মনোরঞ্জনকে দেখতে পেলেন না।

পণ্টু বললে,—মনোরঞ্জন বাবু একটু ব্যস্ত আছেন। বাবু-সেরাইয়ের মন্ত্রী এসেচেন…ভারী দরকারী কাজ…

লালগোপাল বললে—ওই পাশের ঘরে উনি আছেন।…আমি বরং খপর দি…

রজনীনাথ বললেন—থাক্, থাক্। ব্যস্ত করবার দরকার নেই।

পণ্টু বললে—না, না, তিনি বলেচেন, আপনি এলেই যেন তাঁকে জানানো হয়।

লালগোপাল বললে—ধন্নুলাল এখনো আসেনি। মস্ত গাইয়ে। তার বাড়ী যোধপুর…এখানে এসেচে মুলৌরীর কুমার-সাহেবের সঙ্গে। তা, মনোরঞ্জন বাবুকে সেলাম না করে গেলে তার তৃপ্তি হবে না…

পল্টু বললে—এককালে অনেক পয়সা খেয়েচে কি না। মনোরঞ্জন বাবুর গান-বাজনার কি সখ না ছিল তখন। তাছাড়া মুলৌরীর কুমার-সাহেবকে পেলে কার দৌলতে ? বেইমান নয়।

লালগোপাল বললে,—রাজপুত জাত কখনো বেইমান হয় না। দেখলুমও তো ঢের এই মনোরঞ্জন বাবুর কাছে থেকে…। তাহলে আমি খপর দি…

লালগোপাল ছুটলো খপর দিতে। যে-লোকটি তানপুরার তারে আঙুলের ঘা দিচ্ছিল, তাকে নির্দ্দেশ করে পল্টু বললে,—ওর নাম শোনেননি ? ফিরোজ খাঁ…লক্ষ্ণৌয়ের ওস্তাদ। তবে এখন পড়ে গেছে বাঙলায় থেকে ম্যালেরিয়ায় ভুগে। তবু এক একখানি আলাপে এখনো নগদ পঞ্চাশ টাকা গুণে নেয়…

বাপ—বাদশাহী ব্যাপার! রজনীনাথের চক্ষুস্থির! এত বড় ধনীর সভায় তার মত পাড়াগেঁয়ে লোক! তা নয়তো কি! অম্বালার এক সামান্য কাঠের কারবারী সে, আর মনোরঞ্জন বাবু ? রাজা-মহারাজ লাট-বেলাটের মান্য বন্ধু!…

লালগোপাল ফিরে এলো, এসে বললে—আপনি ঐ ঘরে চলুন…

রজনীনাথ সঙ্কুচিতভাবে বললেন—ও ঘরে কেন! আমি বেশ আছি। ওঁদের দরকারী কথাবার্ত্তা হচ্ছে…

লালগোপাল বললে—তা হোক্! ওঁর ঐ স্বভাব …যাঁর উপর শ্রদ্ধা হয়, কিম্বা মন পড়ে, তাঁকে একেবারে মাথায় করে রাখেন!…

ভাগ্য! ভাগ্য! এত বড় লোকের বন্ধুত্ব…ট্রেনের কামরায় আলাপ বৈ তো নয়! এমন আলাপ কত হয়—ঐ জলের গায়ে আঁক কাটার মত সে! এমন আর কবে ঘটেচে! রজনীনাথ ভাবলেন, মহাপুরুষের বিশেষত্ব এইখানে!

তাঁকে উঠতে হলো—এক ধারের ঐ ঘর। ঘরে চেয়ার-টেবিল, কোণে একটা পিয়ানো আছে।

মনোরঞ্জন বললেন—আসুন…বলেই তিনি পরিচয় করিয়ে দিলেন—মেরা দোস্ত বাবু রজনীনাথ ব্যানার্জী…বড়া ভারী টিম্বার-মার্চেণ্ট…অম্বালা-রহনেওয়ালা…আর

ইনি বাবুসেরাই এষ্টেটকা মন্ত্রী, সাব গম্‌ন্তেবজঙ্গ মহারাজজী…

সেলাম-তশ্‌লিম্ প্রভৃতি হলো।… তার পর মনোরঞ্জন বাবু বললেন,—একটু মাপ করুন। হিসেবটা…আর অল্পই আছে।

হিসাব-পত্র কি চলতে লাগলো। হঠাৎ মনোরঞ্জন বাবু বললেন—বীরদী কাঠ কি? জানেন… রজনী বাবু? আপনি তো কাঠের একজন জহুরী…

—আজ্ঞে না।

—মন্ত্রী-মহারাজ বলচেন, সে ভারী মজবুত্ কাঠ… এখানকার সেগুনের চেয়ে ভালো বই খারাপ হবে না।…

—আজ্ঞে না, জানি না। ও-নামও কখনো শুনিনি!

—আপনাকে তবে কথাটা বলি—যদি পরামর্শ দিতে পারেন; মানে, এঁদের এষ্টেটে মস্ত সায়েন্স কলেজ খোলা হচ্ছে…স্যর জে, সি, বোস্‌কে পরে নিয়ে যাবার সঙ্কল্প আছে। এখন ফ্রান্স থেকে এক মস্ত বৈজ্ঞানিক এসেচেন। তিনি হিসাব দিয়েচেন, পনেরো লাখ টাকা নিয়ে নামতে হবে। তাই মহারাজ-জী আমার কাছে এসেচেন। টাকা আমি দিতে পারি—রাজীও আছি! এঁরা সাত পারসেণ্ট্ সুদও দেবেন…ভালো কথা, বেশ! তা, এঁরা বন্ধক দিতে চাইচেন কাল্লুয়া-জঙ্গল। মন্ত্রী মহারাজ বলচেন, সে-জঙ্গলে দু'লাখ বীরদী গাছ আছে। উনি বলচেন, সেই গাছেরই এক-একটার দাম পাঁচশো টাকা হবে। তা হলে হলো দু'লাখ ইন্‌টু পাঁচশো…কত হয় হে নন্দলাল?

নন্দলাল একটা কাগজ দেখিয়ে বললে—এই যে আমি মাল্‌টিপ্লাই করেচি। এই · অর্থাৎ হলো গিয়ে দশ-কোটি টাকা…

মনোরঞ্জন বললেন—হুঁ! তাছাড়া শিশু, শাল, সেগুন—এ-সবও রাশি-রাশি…এ তো সব বুঝলুম। কিন্তু ঐ বীরদী গাছ…নাম শোনা নেই। তা, দেখে আসা যায় না?

মন্ত্রী মহারাজ বললেন,—আলবৎ! মেহেরবানি হয় যদি? মহারাজা-বাহাদুর বহুৎ সেলাম জানিয়ে বলে দেছেন, তিনিও তাহলে ভারী আপ্যায়িত হবেন।

হাস্য-মুখে মনোরঞ্জন বললেন—কি বলেন রজনী-বাবু? দেখুন, যাবেন? জঙ্গলটাও দেখা হয়—আর হিঁদুর ছেলে, সেই সঙ্গে তীর্থযাত্রা—হা-হা-হা… আপনার যদি মত থাকে, দেখুন—মহারাজ-বাহাদুরের অতিথি হয়ে…

রজনীনাথ মৃদু হাস্য করলেন মাত্র, কিছু বললেন না।

মনোরঞ্জন বললেন—আচ্ছা। হিসাব তো হলো। টাকাও মজুত্। আপনাকে মোদ্দা দু-চারদিন দেরী করতে হবে, মহারাজ-জী। তার পর…

মন্ত্রী-মহারাজ কাকুতি জানালেন—দেরী হোয়, উস্‌মে ক্যা…লেকিন কামঠো হোনা চাহি, বাবু-সাব…

—আচ্ছা, আচ্ছা, আশ্বাস দিচ্ছি, কাম হয়ে যাবে। বলে মনোরঞ্জন মন্ত্রী মহারাজের পিঠ চাপড়ে তাঁকে অভয় দিলেন। তার পর বললেন—এখন থোড়া গাহনা-বাজনা হোক…

গান-বাজনা চুকলো রাত এগারোটায়। তার পর আহার…যেন রাজসূয় যজ্ঞের ব্যাপার! রকমারি ডিশ্… পাত্রও তেমনি—সোনা-রূপার ছোট দোকান যেন!…

রাত্রে বিদায়-ভাষণাদি হলো, তা'ও সুমধুর! তার পর রজনীনাথের হরীতকী-বাগানে যাত্রা—মনোরঞ্জনের সেই মোটরে চড়িয়া।

## ৩

পর-পর চার-পাঁচ দিন মনোরঞ্জনের আদর-আপ্যায়নের ঘটায় রজনীনাথ যেন জর্জ্জরিত হয়ে পড়লেন। রোজ বেড়ানো, থিয়েটার, বায়োস্কোপ… সমারোহের অন্ত নেই।

সেদিন বায়োস্কোপ থেকে রজনীনাথকে নিয়ে মনোরঞ্জন বালিগঞ্জের গৃহে ফিরলেন। সামনে একজন সাহেবী-পোষাক-পরা ছোকরা; তাঁকে দেখে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানাবামাত্র মনোরঞ্জন বললেন—কি হলো?

ছোকরা বাঙালী-সাহেবটি বললে,—ব্লকহেড সাহেব সমস্ত কাঠ ইজারা নিতে রাজী। আপনার ঐ বন্ধকী খতে সর্ত্ত আছে তো, আপনি বীরদী কাঠ ইজারা দিতে পারবেন?

—নিশ্চয়।

—মাসে পাঁচ হাজার করে সে দিতে চায়।

—সেলামি?

—ঐটেই কিছু কম করতে বলেচে,—বলচে, পনেরো হাজার নিন। ভাড়ার জন্য সে ভালো জামিন দিতে রাজী। জামিন দেবে ঐ আর্ম্মানি…

তার মুখের কথা লুফে মনোরঞ্জন বললেন—আর্ম্মানি মানে তো ঐ আপকার সাহেব?

—হাঁ।

ঘাড় নেড়ে মনোরঞ্জন বললেন—না। সেলামি কম করা হবে না। করিমগঞ্জের নবাব সাহেব নিজে আজ সকালে এসেছিলেন। তিনি বলে গেছেন, সেলামি তিনি দেবেন পঁচিশ হাজার—আর ইজারার ভাড়া মাসে সাত হাজার। ও-গাছ তাঁর দেখা আছে। তিনি বলে

গেছেন, ও-গাছের প্রত্যেকটার দাম ন'শো টাকা। আর কাঠ আনতে কোনো হাঙ্গাম নেই। জঙ্গলের নীচে খরস্রোৎ নদী। সেই নদীতে কাঠ ভাসিয়ে দাও। এসে মিশেচে ফরাক্কাবাদের কাছে গঙ্গার বুকে। ব্যস্— সেখানে ডিপো খুলে বসো, বসে কাঠ তুলে নাও।

ছোকরা প্রশ্ন করলে,—তাহলে···?

—না, না, না। পঁচিশ হাজার সেলামি দিচ্ছে! আমি তাতেই রাজী হচ্ছি না। এখন বয়স হয়ে পড়চে হে, কাচ্ছা-বাচ্ছাগুলোর কথা ভাবতে হবে তো। সেলামি আমার পঞ্চাশ হাজার চাই। তবে হ্যাঁ, একসঙ্গে দিতে না পারো, লেখা-পড়ার সময় বিশ হাজার দাও—তার পর চার মাসে বাকী ত্রিশ হাজার। ভাড়া ঐ দশ হাজার। এ সর্ত্ত ছাড়া বিলি করবো না। নিজেই নাহয় লোক রেখে গাছ কাটিয়ে কাঠ আনাবো। এই আমার এক বন্ধু বসে আছেন, আম্বালায় কাঠের মস্ত কারবার। ওঁর ওখানে সে কাঠ পাঠিয়ে দেবো। উনি বেচে আমায় দাম দেবেন।

কথাটা বলে তিনি রজনীনাথের দিকে ফিরলেন; বললেন,—আসুন রজনী বাবু!

সেই ড্রয়িং-রুম। রজনীনাথ বললেন—ওটা কি বন্ধক হয়ে গেছে? ঐ বীরদী কাঠের জঙ্গল?

—নিশ্চয়। ও কি ফেলে রাখতে আছে? আমি সেদিন ডক্টর ফ্যাক্সিমিলির সঙ্গে দেখা করে খোঁজ নিয়েচি। তিনি ও-এষ্টেটে প্রায় সাত বছর ছিলেন, রয়েল সার্জ্জন··· তিনি বললেন, ও ফরেষ্টের দাম বিশ কোটি টাকা, মনোরঞ্জন বাবু।

—বলেন কি?

—তাই!···লোক আসচে কম? মহারাজ ফশ-করাঙ্গা, হুশেনাবাদের নবাব, তোগড়ার রাজা, তাছাড়া একটা বণিক্ কোম্পানী অবধি ও-ফরেষ্ট ইজারা নেবার জন্য আকুল। বেশী কথা কি, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট অবধি দর দিচ্ছে।

রজনীনাথ বিস্ময়ে মূর্চ্ছিতপ্রায়! তাঁর চোখের সামনে নেপালের পার্ব্বত্য-ভূমির নীচে কুবেরের ভাণ্ডার মুক্ত সৌন্দর্য্যে যেন ফুটে উঠলো—রাশি রাশি রত্ন—কি তার জৌলুশ!···ওঃ! রাত্রে ফেরবার সময় রজনীনাথ বললেন, —আপনি পঞ্চাশ হাজার সেলামি পেলে ও-জঙ্গল ইজারা দেন? আর দশ হাজার টাকা ভাড়া?

—হাঁ, তা দিই। রোজ এই লোকের পর লোক আসা—আর পারা যায় না।···আমাকে শীগ্‌গির সেই ডেরা-গাজী-খাঁয় ফিরতে হবে। টেলিগ্রাম এসেচে দু'খানা। ···টাকার কাজ নয়, ব্যাপার! তবু একটা জাতীয় ব্যাপার কি না! একদিকে ব্রিটিশ-রাজ, অপর দিকে আফগান, তাদের এত বড় কাজে সামান্য একজন বাঙালীর নামটুকু যদি থাকে···হয়তো এ পথে একদিন বাঙালীর উন্নতি ঘটতে পারে! শুধু সেই জন্যই। একটু স্বার্থহানি করেও জাতের জন্য যদি নিজের···

রজনীনাথ বললেন—আমাকে দেবেন ও জঙ্গল? তবে জামিন···

মনোরঞ্জন তাঁর হাত ধরে বললেন,—ছি, ছি, ছি, বন্ধুত্বের মধ্যে আবার জামিন কি? আপনার কথাই সব। সেলামিও নাহয় পরেই দিতেন। কিন্তু আমায় চলে যেতে হচ্ছে কি না—এক মামাতো ভাইয়ের কন্যাদায় —আমাকে ধরেচে, তার পঁচিশ হাজার টাকা দরকার। সাহায্য!···যাক্···পর তো নয়! একটা ইজ্জৎ-ওয়ালা ঘরে বর পাচ্ছে—তবে তাদের বেজায় কামড়। তা হোক্, মেয়েটা যদি সুখে থাকে! তাই সব চুকিয়ে যেতে চাই।···আম্বালায় ফিরে একবার নাহয় বেড়াতে চলুন না ডেরা-গাজী-খাঁয়। আমি আছি। কোনো কষ্ট হবে না।···কখনো গেছেন ওদিকে?

—না।

—যাবেন, যাবেন। পাহাড়ের কি দৃশ্যই দেখবেন! আঃ! কালিদাস কি অমনি অমনি অত বড় কবি হয়েচেন? ঐ পাহাড় দেখে মুগ্ধ হয়েই না রঘুবংশ, কুমার-সম্ভব লিখে গেছেন। না হলে এখানে এই সব ঘেঁটু-বন-দেখা কবি—তাদের দৌড় আর কতদূর হবে, বলুন?

আবার অবান্তর কথায় সময়ের অপব্যয়! রজনীনাথ বললেন,—বেশ, তাহলে পাকা কথা রইলো। সেলামি আমি দেবো। কাল। চেক নয়, নগদ। আপাততঃ বিশ হাজার—আমার সঙ্গে আছে। পৈত্রিক বাড়ী একখানা আছে এই শাহানগরে; সেটা ভেঙ্গে পড়ে গেছে। তার ঘর-দোর তোলা, মেরামতি প্রভৃতির ব্যবস্থা করে যাবো, ভেবেছিলুম। তা, এটা তো ছাড়া উচিত নয়।

—কখনোই নয়! এমন লাভ···বিশেষ আপনার যখন এই কাঠের ব্যবসা আছে···

—ট্রেণে আপনার সঙ্গে ভারী শুভক্ষণে দেখা হয়েছিল। ট্রেণে অমন কত যাতায়াত করচি—কিন্তু এমন? বিধাতার অভিপ্রেত···

—দেখুন, ভবিতব্য! আমার দ্বারা যদি সামান্য উপকারও আপনার হয়, তা হলে আমি নিজেকে খুব কৃতার্থ মনে করবো। ক'দিনের বা জীবন! এর মধ্যে পরস্পরে কেউ কারো সাহায্য যদি করতে পারি—এতটুকু কারো উপকারে লাগি···তাহলেই তো জীবনের সার্থকতা। নাহলে খাওয়া-দাওয়া,—সে তো পশুতেও করচে।

—কাল রাত্রে আমি টাকা নিয়ে আসবো।

—বেশ। আমার এটর্ণিকে থাকতে বলবো। তার

পর পরশু রেজেষ্ট্রী। আমিও তাহলে তার দু'দিন পরেই —মানে, এই হপ্তাতেই বেরিয়ে পড়তে পারবো।

* * * *

পরের দিন, রাত আটটা। টাকা নিয়ে মনোরঞ্জনের মোটরে রজনীনাথের প্রবেশ।

মোটর মনোরঞ্জন পাঠিয়েছিল।...অনর্থক বন্ধুর ট্যাক্সি-ভাড়া কেন গচ্চা যায়!

মনোরঞ্জন বললেন,—আসুন, বন্ধু। এটর্ণিও হাজির।

সাহেবী-পোষাক-পরা এক ভদ্রলোকে বললেন—ইনি...?

—হ্যাঁ।

এটর্ণি বললেন—দলিলখানা পড়ুন।

রজনীনাথ দলিল্ পড়তে লাগলেন। বাঁধি গৎ। বেশ পরিষ্কার, প্রাঞ্জল ভাষা! চৌহদ্দী দেওয়া, গাছের সংখ্যা অবধি...পাকা-পোক্ত দলিল!

হঠাৎ একটা হুড়মুড় শব্দ! চমকে রজনীনাথ চেয়ে দেখেন, চকিতে একরাশ কনষ্টেবল, সার্জ্জেণ্ট, ইন্‌স্‌পেক্টর, —একেবারে ঘরের মধ্যে!

ব্যাপার কি?

মনোরঞ্জন নিঃশব্দে সরে পড়ছিলেন। সার্জ্জেণ্ট লাফিয়ে এসে তাকে পাকড়ে গর্জ্জে উঠলো—ও ইউ রোগ্!

রজনীনাথ অবাক্।

এটর্ণি গ্রেপ্তার হলেন। তার পর ভীষণ একটা সংগ্রাম। পাশাপাশি ঘরগুলো থেকে লালগোপাল, পল্টু প্রভৃতি সহচরবৃন্দ...মোগলসরাইয়ের পল্ সাহেব, বাবুসেরাইয়ের মন্ত্রী, সেই ছোক্‌রা সাহেববেশী দালাল, মায় সেই লক্ষ্ণৌয়ের ওস্তাদজী অবধি...তাঁর মাথায় সে টুপি নেই, সে ফতুয়া-চাপকান প্রভৃতি অন্তর্হিত...মূর্ত্তি সেই—গায়ে একটা ছেঁড়া গেঞ্জি, ম্যালেরিয়া-জীর্ণ গুলিখোর বাঙালীর মূর্ত্তি! তা হোক, চিনতে বাধে না। ...সাজানোয় অপূর্ব্ব কেরামতি! বাঃ!

ব্যাপার জানা গেল। এরা মস্ত জুয়াড়ি, বেশ ভারী দল। নানা ফন্দীতে বহু লোককে ঠকিয়ে বেড়াচ্ছে। কর্ম্মক্ষেত্র শুধু ক্ষুদ্র কলকাতায়, বা বাঙলা দেশটুকুতেই নয়, বিস্তীর্ণ ভারত-ভূমি এঁদের লীলাক্ষেত্র! কেউ রাজা সাজেন, কেউ মন্ত্রী...লাখ দু'লাখ ছাড়া মুখে কারো কথা নাই। ব্যবসা, বন্ধকী কারবার—এমনি। সম্প্রতি দিল্লীতে গাঁজাবাদের নবাবী তখ্‌ত বন্ধক দিইয়ে এক লালচাঁদ ভাটিয়ার পঁয়ত্রিশ হাজার ঘাল করে এসেছেন। তারি গ্রেফ্‌তারী ওয়ারেণ্ট—বহু সন্ধানে এই আস্তানায় দলটিকে পাওয়া গেছে।

রজনীনাথ বললেন—এ্যাঁ! বলেন কি! আমিও যে বিশ হাজার টাকা দিতে এসেছি। এই ড্রাফ্‌ট্, দলিল...

ইন্সপেক্টর বললেন—আপনাকে কি বলে লোভ দেখিয়েছিল?

রজনীনাথ বললেন,—আমাকে এঁরা মুখে কিছু বলেননি। তবে ওঁদের বড় বড় কথাবার্ত্তা শুনে আমিই লোভাতুর হয়ে...বীরদী কাঠের জঙ্গল জমা নিচ্ছিলুম। ঐ বাবুসেরাইয়ের মন্ত্রী-মহারাজ...

ইন্‌সপেক্টর বললেন—ঐ তো ওদের টোপ্। এরা ঐ বড় বড় কথার টোপেই শীকার গাঁথে। তাহলে আপনার নালিশ...

রজনীনাথ বললেন—আমায় মাপ করুন। আমি আম্বালায় থাকি। ট্রেণে আলাপ। সাক্ষী দিতে হলে বহুদিন এখানে থেকে যেতে হবে। তাতে ক্ষতি হবে। টাকা এখনো ছাড়িনি—আমার কাছেই আছে।...ভাগ্যে আপনারা এসে পড়লেন! আর দশ মিনিট দেরী হলেই গিয়েছিলুম...

ইন্‌সপেক্টর বললেন—টোপ গিলেছিলেন! ওঃ, খুব রক্ষা পেয়েচেন। একেই বলে ভগবানের লীলা!

রজনীনাথ শিউরে উঠলেন। এ কথা আর-একবার তাঁর মনে উদয় হয়েছিল...কাল ঠিক এমনি সময়ে.. টাকা দেবার জন্য যখন তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন...

তাঁর শরীর রোমাঞ্চিত হলো—ভগবানের লীলাই বটে! মাথার উপর ভগবান তাহলে আছেন!

# ভক্ত

প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক দাশরথি চক্রবর্ত্তীর কথা বলিতেছি। তাঁর নাম জানেন না, এমন বাঙালী বোধ হয় ভূ-পৃষ্ঠে নাই। সুতরাং সবিস্তার পরিচয় দিবার প্রয়োজন দেখি না।

সম্প্রতি বাঙলা দেশে hero-worshipএর যে ধুয়া সুরু হইয়াছে, তাহা দেখিয়া দাশরথি চক্রবর্ত্তী আশা করেন, কবে তাঁর জন্মোৎসব-উপলক্ষে জয়ন্তীর ব্যবস্থা বুঝি হয়!

তাঁর লেখা "পাঁচ খুন" উপন্যাসের প্রথম সংস্করণ তিন মাসে ফুরাইয়া গেলে দ্বিতীয় সংস্কারখানি চড়া দামে এক ওস্তাদ পাবলিশার কিনিয়া ফেলিয়াছে! দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ। সেই বইয়ের প্রুফ দেখিতে দেখিতে তিনি ডাকিলেন—অমর্ত্ত...

অমর্ত্ত ওরফে অমৃত তাঁর লিটারারী এজেন্ট, সমালোচক, পাবলিসিটি-অফিসার ইত্যাদি। অর্থাৎ অমৃতকে সব কটা আখ্যায় ভূষিত করা চলে! অমৃত তাঁর পাশটিতে সদা সর্ব্বক্ষণ বসিয়া আছে! অমৃতদের পৈত্রিক প্রেস আছে—সেই প্রেসে দাশরথি চক্রবর্ত্তীর বত্রিশখানি গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে।

দাশরথির আহ্বানে অমৃত কহিল,—কেন?

দাশরথি কহিল—গলির মধ্যে এই ছোট বাড়ীতে বাস করা চলে না, দেখচি।

অমৃত কহিল—কেন?

দাশরথি কহিল,—বরানগরের ওদিকে, কিম্বা বালি-উত্তর-পাড়ায় গঙ্গার ধারে একখানি ছোট বাগান বাড়ী যদি পাই...

অমৃত এ কথার অর্থ বুঝিল না, তীক্ষ্ণ কৌতূহলী দৃষ্টিতে দাশরথির পানে চাহিয়া রহিল।

দাশরথি কহিল—সেদিন ঐ "অলকানন্দা" মাসিক পত্রের তরফ থেকে দুটি ভদ্রলোক এসেছিলেন—interview করতে! এই ছোট ঘরে তাঁদের বসাতে মাথা যেন কাটা গেল। তাই ভাবচি...

দাশরথি দেওয়ালের পানে চাহিল—যেন ভাবনার খেই ঐ দেওয়াল ফাটিয়া বাহির হইবে!

অমৃত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। দাশরথির ভাবনার খেই ধরিবে, এত দিনের ঘনিষ্ঠতাতেও তার সে বুদ্ধি বিকশিত হয় নাই!

দাশরথি কহিল—গঙ্গার ধারে যদি একটি বাগান-বাড়ী পাই—অর্থাৎ শস্তা ভাড়ায়—তাহলে কেউ interviewর জন্য এলে গাছের তলায় বেদী দেখিয়ে দিতে পারি, দেখিয়ে বলি,—এইখানে এই আসনে বসে সাহিত্যের ধ্যানে আমি তন্ময় হই! অর্থাৎ বেশ গুছিয়ে দু'কথা বলা চলে! যখন সকলের 'জয়ন্তী' হচ্ছে, আমার কেন না হবে? কার চেয়ে আমি কম! আমার বইয়ের বিক্রী কত! মানে, দিগন্তপ্রসারী ছায়া-তলে বসে সাধনা করি—তাই আমার রচা নর-নারী দিকে দিকে এমন অবাধে বিচরণ করে বেড়ায়! অর্থাৎ যে অভিনন্দন লিখবে, সে মাল-মশলা পাবে প্রচুর। কি বলো?

অমৃত কহিল—খাসা হবে! নিশ্চয়! বেশ, আমি চেষ্টা দেখবো।

* * *

অমৃত কাজের লোক। লেখকের যদি ভক্ত মেলে তো সে ভক্ত যেন এই অমৃতলালের মতই হয়! বাঙালীর পরশ্রীকাতরতা ও ভক্তি-হীনতা বলিয়া সম্প্রতি যে-অপবাদ রটিয়াছে, সে অপবাদও তাহা হইলে ঘোচে!

কিন্তু আমরা অমৃত-জীবনী লিখিতে বসি নাই—সুতরাং অমৃতর কথার এ স্থান নয়।

পাঁচ দিন পরে অমৃত আসিয়া কহিল—বাগান-বাড়ীর সন্ধান পেয়েচি। বাড়ীটা সুবিধার নয়। না হোক—মস্ত বাগান। দক্ষিণেশ্বরের কাছে। ভাড়া পঁচিশ টাকা। আমগাছ আছে প্রচুর, কাঁঠাল গাছও তেমনি; গাছের আম-কাঁঠাল জমা দিলে ভাড়ার টাকা উঠে আসবে।

দাশরথি কহিল—তুমি এখনি কথা কও।

অমৃত কহিল—দুজনে যাই, চলো। বাড়ীওয়ালা থাকে বাগবাজারে!

দাশরথি কহিল—বেশ...

বৈকালের দিকে বাগবাজার যাত্রা।...বাগান-বাড়ীর মালিক শ্রীযুক্ত হীরালাল সেন। বাহিরের ঘরে বসিয়া তিনি একখানা কেতাব পড়িতেছেন!

ভৃত্য গিয়া সংবাদ দিল—দুটি বাবু...

হীরালাল সেদিকে ক্ষেপ করিল না।

দাশরথি ও অমৃত সামনের দালানে দাঁড়াইয়াছিল—ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিল।

ভৃত্য আবার ডাকিল—বাবু

বাবু খিঁচাইয়া কহিলেন—যা—দিক্ করিস নে।

ভৃত্য কহিল—দুটি বাবু এসেচেন...

হীরালাল কহিলেন—এখন দেখা হবে না। যেতে বল্!

ভৃত্য দাশরথির পানে চাহিল—অমৃত ইঙ্গিত করিল;

ভৃত্য আবার কহিল—দক্ষিণেশ্বরের বাগান-বাড়ী ভাড়া নেবেন বলে—

হীরালাল কেতাব হইতে মুখ না তুলিয়া কহিল—ভাড়া দেবো না···

এ কথার উপর কথা নাই! দাশরথি অমৃতের দিকে চাহিল।

অমৃত কহিল—আশ্চর্য্য!

দাশরথি কহিল—মিছিমিছি এতখানি সময় নষ্ট হলো! প্রুফগুলো দেখা হতো।

অমৃত কহিল,—বসন্ত বললে, হীরালাল সেনের বাগান-বাড়ী—হীরালাল সেন ভাড়া দেবে।

দাশরথি কহিল—বর্ব্বর!

দিন পনেরো কাটিয়া গিয়াছে।

ককেশিয়ান থিয়েটারে একটা নূতন নাটক খুলিয়াছে—ডিটেক্টিভ নাটক! অমৃতর প্রেসে সে-নাটক ছাপা হইতেছে! অমৃত দুখানা পাশ পাইয়াছে। সেই পাশের জোরে দাশরথি ও অমৃত আসিয়াছিল থিয়েটার দেখিতে!

বসন্তর সঙ্গে দেখা। অমৃত কহিল,—তোমার কথায় হীরালাল সেনের বাড়ী গেছলুম। হীরালাল দেখা করলে না—তার উপর বলে পাঠালে, বাগান-বাড়ী সে ভাড়া দেবে না।

বসন্ত কহিল—সে কি! কালও হীরালাল আমায় বলচে, বাগানটা পড়ে আছে—এক পয়সা আয় দেয় না—যা পায়, তাতেই ভাড়া দেবে।

অমৃত কহিল,—আশ্চর্য্য!

বসন্ত কহিল—আশ্চর্য্য বৈ কি! কিন্তু দাড়াও—সেও এসেচে থিয়েটার দেখতে। তাকে আমি দেখচি—এখনি মোকাবেলা হয়ে যাবে।

তাহাই হইল। বসন্ত হীরালালকে টানিয়া আনিল; বাগান-বাড়ীর কথা পাড়িল। বসন্ত কহিল—এঁরা গেছলেন—তুমি বলে দেছ, বাড়ী ভাড়া দেবে না?

হীরালাল যেন আকাশ হইতে পড়িয়াছে—এমনি ভাব! সে ভাব কাটিলে হীরালাল কহিল—কবে আপনারা গেছলেন?

অমৃত তারিখ বলিল।

হীরালাল কিছুক্ষণ কি ভাবিল, পরে কহিল—ও, মাপ করবেন মশায়! ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ার বাতিক আমার এ বয়সেও যায়নি! সেদিন একটা বইয়ের মধ্যে আমি তন্ময়—তাই হুঁশ্ করিনি। পরে চাকরটাকে বকেছিলুম—বলেছিলুম—তখন মন দিয়ে বই পড়চি, আর তখন গেছিস দিক্ করতে! একটু পরেই ভদ্র-লোকদের ঘরের মধ্যে আনলে পারতিস্!

বসন্ত কহিল—এঁর নাম দাশরথি চক্রবর্ত্তী—প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক। ইনি তোমার বাগান ভাড়া নিতে চান···

হীরালাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দাশরথির পানে চাহিয়া রহিল, পরে কহিল—ও···তা বেশ তো···

বসন্ত কহিল—কি বই হে, যার নেশায় অমন তন্ময় হয়ে উঠেছিলে!

হীরালাল কহিল—এ বই লেখা বই—"দম্‌বাজী"। আপনার লেখা না?···

নিশ্বাস ফেলিয়া দাশরথি চক্ষু মুদিল, বুঝি মনে মনে বলিতেছিল, তোমার মহিমা প্রভু! কত ভক্তকে কত মূর্ত্তিতে যে গড়িয়া তুলিয়াছ!

হীরালাল কহিল—আপনি আমার বাগান ভাড়া নেবেন? এ তো ভালো কথা! আপনার বইগুলো কোন্ না তাহলে অমনি পাবো—উপহার! হাঃ হাঃ হাঃ!

দাশরথির চিত্তে তখনো মোহের ঘোর! সে কহিল—আপনি মহৎ ব্যক্তি!

# অনিন্দিতা

দু-দু'বার বি-এ ফেল করিলেও তৃতীয়-বার বি-এ পরীক্ষা দিবার উৎসাহ বঙ্কুর এক-তিল কমে নাই। তার কারণ, বি-এ পরীক্ষা দেওয়া উপলক্ষ মাত্র—নহিলে কলিকাতায় নির্ব্বিবাদে বাস করিবার হেতু থাকে না! তা ছাড়া আশার রাগিণী তখনো মিলায় নাই! এবং দেবী বীণাপাণির চরণ-নূপুরের নিক্কণ তাকে রীতিমত দিগ্‌ভ্রান্ত রাখিয়াছে! তার মন ভারতের গণ্ডী ছাড়িয়া রুশ, জার্ম্মান, ফরাশী, সুইডিশ, নরওয়েজিয়ান্ মুলুকে কাফে, মিউজিক হল প্রভৃতির আশে-পাশে রূপ-রসের পিয়াসে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে!

বঙ্কুর বাড়ী কাঁচড়াপাড়ার ওদিকে, থাকে সে কলিকাতায় মাতুলের গৃহে। এগজামিন চুকিলে এবার গৃহে ফিরিল না—সামনে তাদের 'ভাব-বন্যা সমিতি'র বার্ষিক অধিবেশন। বাড়ীতে চিঠি লিখিয়া দিল,—

পরীক্ষা চুকিয়াছে। এবার রীতিমত তদ্বির করিব। এগজামিনাররা এখন চায়, একটু মেলা-মেশা, একটু আনুগত্য। এই ট্রেড-সিক্রেট জানা ছিল না বলিয়া দু-দু'বার মিথ্যা খাটিয়া এগজামিন দিয়াছি। এবারে কাজ পাকা করিয়া দেশে ফিরিব ইত্যাদি।

বাড়ীতে এ-কৈফিয়ৎ দিবার প্রয়োজন ছিল না—যেহেতু বিধবা মার চিত্ত পুত্র-স্নেহে বিগলিতপ্রায় এবং পুত্রের উপর তাঁর বিশ্বাস প্রচুর!

সেদিন ছিল বঙ্কু হরশঙ্করের গৃহে ছোট মজলিশ্। হরশঙ্করের বাড়ী কালীঘাটে। সেখানে গল্প-গান হাসি-খুশীর মাত্রায় মনটা কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিল।

রাত্রি এগারোটা বাজিলে মজলিশ্ ছাড়িয়া বঙ্কু আসিয়া দোতলা-বাসে চাপিয়া বসিল। খোলা ছাদ। আকাশে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না—তরুণ প্রাণ কত কি কুহক-স্বপ্ন রচিতে সুরু করিল। চৌরঙ্গীর একধারে বিস্তীর্ণ মাঠ—যেন সেই আরব-রজনীর আলো-ছায়ার মায়ায় আচ্ছন্ন!

প্লাজার সামনে বাস থামিল। বায়োস্কোপ ভাঙ্গিয়াছে—সাহেব-মেমের জটলা। পথের বুকে রূপের বিদ্যুৎ! হাসির ঝর্ণা! তার অপরূপ মোহ! কি ভাবিয়া প্লাজার সামনে বঙ্কু নামিয়া পড়িল! রূপের রোশনি তার প্রাণে নেশা জাগাইয়াছিল!

নিমেষের জন্য সে যেন নিশ্চেতন! চেতনা ফিরিল একটা ফিটনওয়ালার আহ্বানে—আইয়ে বাবু।

খালি ফিটন। বিপুল জনতা রূপের ফিনিক্ ফুটাইয়া চকিতে অদৃশ্য হইতেছে! শেষে পথে সে একা—আর ঐ একটা পাহারাওয়ালা, অদূরে সার্জেণ্ট।

বঙ্কু কহিল,—না, গাড়ী চাই না।

সে দ্রুত এসপ্লানেডের দিকে চলিল।

একটু আগে—এক তরুণী! চলিতে চলিতে থমকিয়া দাঁড়াইয়া সুগভীর দুশ্চিন্তায় যেন কাহাকে খুঁজিতেছে!

স্বপ্ন? না। বঙ্কু স্পষ্ট দেখিল, সত্যই তরুণী! পায়ে নাগরা, পরণে সিল্কের শাড়ী; এবং তরুণী একাকিনী!

গতির বেগ বাড়াইয়া সে তরুণীর সম্মুখে আসিল। তরুণীর দুই চোখে কাতর করুণ দৃষ্টি—বঙ্কুর বুকে তীক্ষ্ণ তীর বিঁধিল। এত বড় পথ—তরুণী একা! বিশ্ব-সাহিত্যের পৃষ্ঠা হইতে এ যেন জীবনের এক টুকরা খশিয়া চৌরঙ্গীর পথে পড়িয়াছে! বঙ্কুর বুক কাঁপিল। কি বলিবে? কোন্ কথা? সভয়ে পথের দিকে চাহিল—পুলিশ?

কি জানি, কি কথার কি অর্থ তরুণী গ্রহণ করিবেন—এবং ঐ ভয়-চকিত মূর্ত্তি সহসা যদি তার কণ্ঠস্বরে আরো ভীতি-বিহ্বল হইয়া ওঠে! যদি···

এক হাজার প্রশ্ন বঙ্কুর বুকে ঝড়ের মত ফুঁশিয়া উঠিল। তরুণী থমকিয়া দাঁড়াইল। তার চোখের দৃষ্টি? বঙ্কু ভাবিল, যে কবি হরিণ-নেত্রে তরুণীর চোখের উপমা দেখিয়াছিলেন, সার্থক তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টি! এ-চোখেও ঠিক তেম'নি দৃষ্টি!

বঙ্কুর জীবনে চরম মুহূর্ত্ত! মিথ্যা সঙ্কোচে, লজ্জায় চিরদিনের জন্য বুঝি-বা নৈরাশ্য সার করিতে হয়! কণ্ঠকে সকল জড়তা হইতে মুক্ত করিয়া বঙ্কু কহিল—আপনি কাকে খুঁজচেন?···

এ কথায় তরুণী যেন অকূলে কূল পাইল! ছুটিয়া বঙ্কুর কাছে আসিয়া কহিল—আমি ভারী বিপদে পড়েছি!

বিপদ! বঙ্কুর আপাদ-মস্তক কাঁপিয়া উঠিল! এ যে বিষ্ণু চক্রবর্ত্তীর লেখা নূতন উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদের সঙ্গে হুবহু মিলিয়া যাইতেছে! পথ বিজন, নিশীথ সঘন, কামিনী একাকিনী! সেও দিগ্‌ভ্রান্ত পথিক, তার বুকে কম্পন! বাকী পরিচ্ছেদগুলা চকিতে বিদ্যুতের শিখার মত মনকে ছুঁইয়া গেল।

বঙ্কু কহিল—কি হয়েচে, বলুন তো? যদি কোনো সাহায্য···

তরুণী কাঁদ-কাঁদ স্বরে কহিল,—দাদার সঙ্গে এসে-ছিলুম বায়োস্কোপ দেখতে। সে যে কোথায় গেল···

সে কি! বন্ধু কহিল,—কোন্ বায়োস্কোপে?

তরুণী কহিল,—এম্পায়ারে।

—তিনি কোথায় গেলেন?

তরুণী কহিল—দাদা ভারী খেয়ালী। ছবি নিয়ে আমার সঙ্গে তর্ক হলো। মতের অমিল, অমনি রেগে উঠে গেল। তার পর বায়োস্কোপ ভাঙ্গতে কোথাও তাকে দেখতে পাচ্ছি না! লোক-জনও চলে গেছে···

তার দুই চোখ সজল, আর্দ্র; স্বরে একরাশ বেদনা।

বন্ধু কহিল—গাড়ী···?

তরুণী কহিল—ঘরের গাড়ীতে এসেছিলুম। গাড়ীও দেখতে পাচ্ছি না।

বন্ধু কহিল—তাইতো, বিপদের কথা!···তা আপনার বাড়ী কোথায়?

তরুণী কহিল—অনেক দূরে। মাণিকতলায়···

বন্ধু কহিল—একখানা ট্যাক্সি ডেকে দেবো···?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া তরুণী কহিল—একটু আগে পর্য্যন্ত সাহসের অন্ত ছিল না। এখন নির্জ্জন পথে ভয় হচ্ছে···

—ভয়।

তরুণী কহিল—তাই। নারী সত্যই অসহায়। দাদার সঙ্গে সেই কথাই হচ্ছিল। ছবি দেখতে দেখতে আমি বললুম—তোমরা আমাদের অসহায় ভেবো না—ভীরু ভেবো না। আমি একা বাড়ী যেতে পারি। দাদা বল্লে, মেয়েমানুষ মেয়েমানুষই! মেয়েমানুষের যা কিছু সাহস,—মুখে! যতক্ষণ ঐ পুরুষের পাশে নিরাপদে আছে, ততক্ষণ! পুরুষের আশ্রয়ে আছে বলে বুঝতে পারে না, সে আশ্রয়-চ্যুত হলে মেয়েদের ভয়ের অন্ত থাকে না!

তরুণী থামিল, পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—দাদার কথাই ঠিক। এখন দেখচি। দাদা নেই—মনে হচ্ছে, সারা দুনিয়া যেন সেই রূপকথার দৈত্যের মত ভয়ানক মূর্ত্তি নিয়ে ছুটে আসচে আমাকে গ্রাস করবার জন্য! কোথায় যেন লুকোতে চাই!···নারীর দর্প ভগবান্‌ও সহ্য করেন না। নারী এমনি অসহায়!

তরুণীর চোখের কোলে অশ্রুর বিন্দু! আকাশের চাঁদ সে অশ্রু দেখিয়া কাঁপিয়া কাতর চিত্তে টুকরা মেঘের আড়ালে লুকাইল!

বন্ধু কাঠ! কি করিবে? কি সে করিতে পারে?

তরুণী কহিল,—আপনার বাড়ী কোথায়? মানে, আপনি কোন্ দিকে যাবেন?

বন্ধু কহিল—শ্যামবাজার।

—তাহলে দয়া করে যদি···মানে, ট্যাক্সিতেই আমায় পৌঁছে দিয়ে যান্! আপনার গাড়ীভাড়া অবশ্য···

বন্ধু শিহরিয়া উঠিল।

তরুণী ভাবিতেছে, পাছে তাকে ট্যাক্সি-ভাড়া দিতে হয়, তাই এ-বিপদে নীরবে পাশে দাঁড়াইতে বন্ধু কুণ্ঠিত হইতেছে! সে কহিল,—ছি ছি! গাড়ীভাড়ার কথা কি বলচেন!

তরুণী কহিল—ভাড়া আমি দেবো। তরুণীর দৃষ্টিতে মিনতি!

বন্ধু কহিল,—কৃপা করে সে ভারটুকু···

তরুণী মৃদু হাসিল, কহিল,—আচ্ছা। একটা ট্যাক্সি ডাকুন···

সামনে ট্যাক্সি। তরুণী উঠিয়া বসিল। বন্ধু সসঙ্কোচে ড্রাইভারের পাশে বসিতে যাইতেছিল, তরুণী কহিল—ও কি! দয়া যদি করলেন তো কেন আমাকে এতখানি হীন ভাবচেন! না, ভিতরে এসে বসুন!

এত নিশ্বাস বন্ধুর বুকে জমিয়া ছিল! কম্পিত বুকে বন্ধু আসিয়া ভিতরে বসিল। তার পা টলিতেছিল। বুঝি, পড়িয়া যাইবে! ভাগ্যে তরুণী তার হাত ধরিয়া ফেলিল! তরুণী বলিল—কি বলে বাইরে বসছিলেন—বলুন তো? আপনি দরোয়ান? না বেয়ারা?

তরুণী মৃদু হাসিল। সে হাসি যেন রকেটের ফুল কাটিয়া রঙীন আলোয় তার প্রাণকে মাতাইয়া দিল!···

ট্যাক্সি চলিয়াছে ক্ষিপ্র বেগে—সার্ক্‌লার রোড ধরিয়া।

তরুণী কহিল—ঠিক যেন মাসিকপত্রের গল্প—না? আমার এই বিপদ! আপনি এলেন, শীতের কুয়াশা ভেঙ্গে দিল্-জাগানো ফাগুন-হাওয়ার মত...

বন্ধুও তাই ভাবিতেছিল! মাঝে মাঝে তার চেতনা বিলুপ্ত হইতেছিল···

স্বপ্ন! এ স্বপ্ন। কিন্তু পরক্ষণে গাড়ীর দোলায় তরুণীর পরশ, শাড়ীর খশ্‌খশানি শব্দ, এসেন্সের সুবাস! তার মনে হইতেছিল,—এ গাড়ী যদি এমনি ছুটিয়া চলে, বিরামহীন গতিতে দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি ধরিয়া···একেবারে সেই পৃথিবীর শেষ প্রান্ত অবধি···! আঃ! তাহা হইলে দুনিয়ায় আর চাহিবার তার কি-বা থাকে!

তরুণী কহিল,—ভগবান্ সত্যই আছেন···নয়? নাহলে এ-বিপদে আপনাকে পাবো কেন?

বন্ধু কহিল,—তা বটে!

সে চলিয়াছিল বাসে চড়িয়া···সহসা প্লাজার সামনে কি যে ঘটিল, কেন যে নামিল···!

এ-ব্যাপারের কল্পনাও সে করে নাই! না।

তরুণী কহিল—আপনিও বায়োস্কোপে গেছলেন?

বন্ধু কহিল,—না।

—তবে ?

বন্ধু কহিল—কালীঘাট থেকে ফিরছিলুম। এক বন্ধুর বাড়ী আমাদের সাহিত্যের মজলিশ ছিল।

তরুণী কহিল—সাহিত্যের মজলিশ!…থামিয়া সে বন্ধুর পানে চাহিল; পরে কহিল,—আপনি লেখেন বুঝি…মাসিক পত্রে ?

বন্ধু কহিল—লিখি। আমাদের লেখা কিন্তু ছাপতে দিই না। এই সামনের আষাঢ় থেকে আমাদের কাগজ বেরুবে, 'ভাব-বন্যা'। বিজ্ঞাপন দেখেন নি ?

তরুণীর মুখ সস্মিত। তরুণী কহিল—'ভাব-বন্যা'! ও—হ্যাঁ, বিজ্ঞাপন দেখেছি বটে! তা সে আপনাদের কাগজ ?

—হ্যাঁ।

তরুণী কহিল—আমার নাম-ঠিকানা লিখে রাখবেন। গ্রাহক হবো। কাগজ বেরুলেই ভি-পিতে পাঠাবেন। বার্ষিক মূল্য কত ?

বন্ধু কহিল—দু'টাকা ছ'আনা।

তরুণী কহিল—এত কম দাম কেন করলেন ? সাড়ে-ছ'টাকা করলেই ঠিক হতো। কম দাম করলে লোকে ভাবে, কিছু নয়, বাজে কাগজ।

বন্ধু কহিল—যা বলেচেন !…আচ্ছা, ভেবে দেখবো।

তরুণী কহিল—দেখবেন।…

তার পর চুপচাপ! স্বপ্নের চকিত দোলায় বন্ধুর মন আরামে বিভোর! এ-নিমেষ না ফুরায়! ট্যাক্সি সবেগে ছুটিয়াছে, ছুটিয়াছে, ছুটিয়াছে!

মাণিকতলার মোড়। গাড়ী পূব-দিকে বাঁকিল। নূতন পুল। তরুণী কহিল—হাঁ, নাম-ঠিকানা… ভুলে যাবেন না যেন। আমার নাম শ্রীঅনিন্দিতা দেবী, ১০ নম্বর ভৈরব বারিকের লেন। আচ্ছা, কার্ড দেবো'খন! আপনি একটু বসবেন তো! না, আমায় নামিয়ে দিয়েই পালাবেন ?

সমস্যা! পালানো! বলিলেই কি পালানো চলে? বন্ধুর প্রাণ তো নড়িতে চায় না! কিন্তু কি পুণ্য করিয়াছে যে মাণিকতলায় ভৈরব বারিকের ১০ নম্বর গৃহে কায়েমিভাবে পড়িয়া থাকিবে!

জন-হীন পথ। পথের দুধারে বড় বড় বাগান। খানিকটা আসিবার পর তরুণী বলিল—ডাইনে গলি।

গলির মুখে প্রথম বাড়ী। সামনে বাগান। বাগানের মধ্যে একতলা বাড়ী। চাঁদের আলোয় যতটুকু দেখা যায়, ছোট বাড়ী হইলেও বেশ সৌখীন রুচি-বিশিষ্ট।

ফটক বন্ধ। তরুণী কহিল—আমার কাছে চাবি আছে।

সে অগ্রসর হইল।

বন্ধু যেন চেতনাহীন! তরুণী ফিরিল, কহিল,—গাড়ীতেই বসে থাকবেন? নামবেন না?…

বন্ধু গাড়ী হইতে নামিল। তরুণী দাঁড়াইয়া কি ভাবিল, ভাবিয়া কহিল,—কিন্তু তাইতো! কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের জন্য আপনাকে এখন নামালে আপনার প্রতি অন্যায় করা হবে। এদিকে ট্যাক্সিও মেলে না—কি করে ফিরবেন! বাড়ীর লোক দেরী দেখে কত ভাবচেন! না! তার চেয়ে…

বন্ধু মুষড়াইয়া পড়িল। সে তো কাতর নয় তরুণীর কৃতজ্ঞতাটুকুকে সার্থক করিয়া তুলিতে! বাড়ীতে কে-বা ভাবিবে! রাত্রে না ফিরিলে কি-বা ক্ষতি! কিন্তু তরুণীর এমন কথার উপর বলিতে পারে না যে, না—এইখানেই আমি থাকিয়া যাইতে পারি! তাহাতে কোনো অসুবিধা ঘটিবে না!

তরুণী অনিন্দিতা কহিল—ট্যাক্সির ভাড়া কত হলো ?

দুই হাত জোড় করিয়া বন্ধু কহিল,—সেটা…

তরুণী কহিল,—ও—আচ্ছা। কিন্তু দেখুন, একটু দয়া করতে হবে। বলুন, করবেন…

সে একেবারে বন্ধুর দুই হাত চাপিয়া ধরিল। বন্ধুর সারা দেহ কাঁপিল।

বন্ধু কহিল—কি করতে হবে, বলুন!

অনিন্দিতা কহিল—কাল সকালে…না…সকালে বেরুবো না। সন্ধ্যায়। হ্যাঁ, দয়া করে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আপনাকে আসতে হবে। বাবা-মা ভারী খুশী হবে… আমি তাদের বলবো, আপনার এ করুণা, এ মহত্ত্বের কথা। ট্যাক্সির ভাড়া যা পড়ে, মানে, আপনার বাড়ী অবধি—আপনাকে বলতে হবে। ভাড়া আজ আপনি দিন। কিন্তু এ ভাড়াটুকু চুকিয়ে দেবার অনুমতি আমায় দিতে হবে। তা না দিলে আমি রাগ করবো, আপনার সঙ্গে আর কখনো কথা কবো না। বলুন।

বন্ধুর দুই হাত তখনো তরুণীর হাতের বন্ধনে। বন্ধু কহিল—রাজী…

—আচ্ছা, আজ তবে Good Night…

স্খলিত স্বরে বন্ধু কহিল—Good Night!

তরুণী ফটকের চাবি খুলিল, তার পর ছুটিয়া আসিয়া বন্ধুর হাত ধরিয়া কহিল—কাল সত্যি আসচেন? সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়?

—আসবো!

—নিশ্চয় আসবেন। আমার এমন ভালো লাগচে। সত্যি, ঠিক যেন নভেল! নয়? এর শেষটা কি হয়—ভারী মজা হবে—না?—বলিয়া তরুণী ফিরিল, ফটকের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল; বন্ধু ট্যাক্সিতে চড়িয়া ড্রাইভারকে কহিল—চালাও শ্যামবাজার…

ট্যাক্সিতে চড়িয়া বন্ধু চক্ষু মুদিল।…

২

কি করিয়া বন্ধুর রাত্রি কাটিল, তার বর্ণনায় পাঠককে যাতনা দিবার বাসনা নাই! ভুক্তভোগী ভিন্ন বন্ধুর সে-অবস্থা কেহ বুঝিতে পারিবেন না!

সকালেও সেই বিহ্বলতা! আকাশ-বাতাস এক রাত্রে যেন বদ্‌লাইয়া গিয়াছে! পৃথিবীর চাকা ক'খানা সহসা যেন বিগড়াইয়া থামিয়া গিয়াছে···বেলা আর বাড়িতে চায় না! কখন্ সকাল হইয়াছে। দুপুরের দিকে সূর্য্যকে মধ্য-গগনে আসিয়া হাজিরা দিতে হইবে, সূর্য্য যেন সে কথা ভুলিয়া গিয়াছে! অলস মন্থরভাবে সে ঐ বড় নারিকেল গাছগুলাকে আঁকড়াইয়া পূবের আকাশেই নিথর দাঁড়াইয়া আছে!

বিরক্ত চিত্তে বন্ধু গিয়া ছাদে উঠিল। পথের কলরব, চীৎকার—যতখানি এড়ানো যায়!

ছাদের কোণে বসিয়া গত রাত্রির কথা সে ভাবিতে লাগিল। ঘটনা সত্য। ভুল নাই! ব্যাগ হইতে ট্যাক্সিওয়ালাকে নগদ পাঁচ টাকা চার আনা গণিয়া দিয়াছে!···নিষ্ঠুর! সকালেই কেন যাইতে বলিল না? হা অনিন্দিতা, সারা বেলা বন্ধুর কি করিয়া কাটিবে, কি দারুণ অধৈর্য্য তার বুকে—তাহা বুঝিলে না!

প্রাণে তার ভাব-সমুদ্র উথলিয়া উঠিল। কবিতার ছন্দে সে-ভাব বাধাহীন বিপুল স্রোতে নাচিয়া ভাসিতে চায়!···

ঠিক! ওবেলায় অনিন্দিতাকে দেখাবে·· কবিতা। সে বলিয়াছে, যেন নভেলের মত।

নিঃশব্দে ছাদ হইতে নামিয়া বন্ধু নিচের ঘরে আসিল। খাতা টানিয়া কবিতা লিখিতে বসিল,—

জোস্‌না রাত্রি, বিপুল পন্থ, পান্থ চলেছে একা—
বক্ষে তাহার শত শত ভাব ছায়ার আখরে লেখা!
স্বপন-মগ্ন-ভাব-বিলগ্ন—সহসা আচম্বিতে
করুণ নয়নে চাহি তার পানে দাঁড়ালে, অনিন্দিতে!
স্বপ্ন না, মায়া? কুহকের ছায়া? তারকা পড়িল খসি?
চেতন মিলিতে চেয়ে দেখি, হাসে ভূতলে গগন-শশী।

উমাপদ আসিয়া ডাকিল—বন্ধু···

ভৃত্যকে দিয়া বন্ধু বলিয়া পাঠাইল—বল্, বাড়ী নেই···

ভৃত্য একটা স্লিপ দিয়া কহিল,—বাবু চিঠি দিয়ে গেলেন···

বন্ধু স্লিপ পড়িল। উমাপদ লিখিয়াছে,—

কামাখ্যা হালদারের কাছে দুপুর বেলায় যাওয়া চাই। তাঁকেই সভাপতি করা হবে। তুমি, আমি আর নেপাল—তিনজনে যাবো। বেলা বারোটায় গাড়ী নিয়ে আসবো। আজ সভাপতি ঠিক করতে না পারলে কার্ড ছাপাতে দেবে কবে? বাড়ী থেকো।

বন্ধু জ্বলিয়া উঠিল। সভাপতি! এতটুকু দয়া নাই! তিনজনে যাইবার কি প্রয়োজন? সব বাড়াবাড়ি।

দুপুর বেলায় উমাপদ আসিল গাড়ী লইয়া। বন্ধু বাহির হইল। ঘরে পড়িয়া থাকা চলে না—এ-ভাবে প্রহর গণা অসম্ভব! শেষে কি পাগল হইবে?

সভাপতি স্থির করিতে, প্রেসে ঘুরিতে বেলা পাঁচটা বাজিয়া গেল। উমাপদ কহিল,—একবার মার্ত্তণ্ডর কাছে যাবে না? তার কাগজে একটা advance notice......

বন্ধু কহিল—আমাকে ক্ষমা করো ভাই···আমার ভারী মাথা ধরেচে। তা ছাড়া...

উমাপদ কহিল—তা ছাড়া কি?

বন্ধু কহিল—একটা বিশেষ engagement আছে···পরে বলবো'খন। সমিতির পক্ষেও মস্ত acquisition-এর সম্ভাবনা···

উমাপদ নির্ব্বাক নেত্রে ক্ষণেক বন্ধুর পানে চাহিয়া রহিল, পরে কহিল,—বেশ।

৩

সাজ-সজ্জায় একটু বৈচিত্র্য-সম্পাদন করিয়া বন্ধু পথে বাহির হইল এবং শ্যামবাজারের মোড় হইতে ট্যাক্সি লইয়া চলিল মাণিকতলার বাগানে—কৃতজ্ঞতার পূর্ণ পাত্র গ্রহণ করিতে।

গলির মুখে সেই ·বাগান-বাড়ী। ফটকের সামনে গাড়ী হইতে ·নামিয়া ভাড়া চুকাইয়া দিয়া বন্ধু বাগানে প্রবেশ করিল। মালী সামনে ছিল, কহিল—আসুন—

বন্ধুর বুক কাঁপিতেছিল। তাকে আনিয়া বাহিরের ঘরে বসাইয়া মালী বিদায় লইল। বন্ধু সপ্রতিভ দৃষ্টিতে ঘরের চতুর্দ্দিকে চাহিল।

অল্প হইলেও সৌখীন আসবাব-পত্র। তবে গৃহে এতটুকু কলরব নাই! একধারে একটা শেল্‌ফ্। শেল্‌ফে কতকগুলো বই। ঝকঝকে বাঁধানো। উঠিয়া বন্ধু শেল্‌ফ হইতে একখানা বই টানিল। সঙ্গে সঙ্গে একটি মিষ্ট বাণী—এই যে! এসেচেন!

বন্ধুর হাত কাঁপিল; বইখানা পড়িয়া গেল। বইখানি তুলিয়া শেল্‌ফে রাখিয়া সে ফিরিয়া চাহিল। সামনে অনিন্দিতা দেবী। রূপের প্রভা ঝলমল করিতেছে—বিজলী-বাতি সে রূপের পাশে ম্লান বোধ হইল।

অনিন্দিতা কহিল—বসুন···

বন্ধু বসিল। অনিন্দিতা সামনের কৌচে বসিল,

কহিল,—আপনাকে নিরাশ করলুম। বাড়ীতে কেউ নেই। এক আত্মীয়ের বড় অসুখ। সকলে সেখানে। আমিও গেছলুম। ঘণ্টাখানেক হলো, ফিরেচি। আপনার সঙ্গে engagement, আপনাকে আসতে বলেচি, তাই।

কৃতজ্ঞতায় বন্ধুর প্রাণ ভরিয়া উঠিল। অনিন্দিতা কহিল—চা খান। আনি।

অনিন্দিতা উঠিয়া গেল। বন্ধু ভাবিল, চমৎকার হইয়াছে! একান্তে তরুণীর কাছে সে আপনার পরিচয় বিশদভাবে দিতে পারিবে—মন তার সাহিত্য-রসে কতখানি রসালো, নারীর প্রতি প্রীতি-প্রেমে প্রাণ কতখানি পরিপূর্ণ—নারী-প্রগতির দিকে তার উৎসাহ কত প্রচণ্ড···

অনিন্দিতা ফিরিল, ফিরিয়া কহিল—ভালো কথা, কাল ট্যাক্সিভাড়া কত দিলেন?

বন্ধু কহিল—সে তো দেওয়া হয়ে গেছে।

—তা হোক। সে ভাড়া আমার দেওয়া উচিত···

বন্ধু কহিল—না হয় এ সামান্য কাজটুকু···সেজন্য কতবার হাত জোড় করেচি···

তার স্বরে মিনতি।

অনিন্দিতা কহিল—না, না, সে কি···প্রথম আলাপেই আপনার কাছে···

করুণ মিনতি-ভরা স্বরে বন্ধু কহিল,—আমি করজোড়ে প্রার্থনা করচি···

—না, এ ভারী অন্যায়! আপনার কথায় 'না' বলতে পারবো না, জানেন। কিন্তু এমন অন্যায় অনুরোধ আর কখনো করবেন না তা বলে!

বন্ধু কহিল,—বেশ, আপনার আদেশ শিরোধার্য্য করবার সুযোগ দেবেন···

তরুণীর চোখের দৃষ্টিতে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল! বন্ধুর প্রাণ পুলকে ভরিল।

চা আসিল,—সেই সঙ্গে টোষ্ট, ডিম, কেক···

তার পর কাব্য-লোকে উধাও যাত্রা!

অনিন্দিতা কহিল—আপনি লেখেন, বলছিলেন না?

বন্ধু কহিল—লিখি।

—গল্প? না, কবিতা?

—দুই।

অনিন্দিতা কহিল—আমার বড্ড সখ, লিখি। লেখার অবসর খুব—কিন্তু লিখতে পারি না।

বন্ধু কহিল—লিখতে পারেন না—সে কথাই নয়! লেখবার ইচ্ছা যখন আছে, তখন লেখেন না কেন? না লেখা অপরাধ!

—এত লোক তো লিখচে। সব কি ভালো? জঞ্জালেরো সৃষ্টি হচ্ছে! আমি সে-জঞ্জাল আর বাড়াই কেন?

বন্ধু কহিল,—আপনার লেখা জঞ্জাল হতে পারে না।

—কেন?···

—কেন!—বন্ধু অনিন্দিতার পানে চাহিয়া কহিল—আপনার মুখে cultureএর সুস্পষ্ট রেখা! কথায়···

কথায় কি, বন্ধু ভাবিয়া পাইল না।

—যান! কি যে বলেন! মৃদু হাস্যে অনিন্দিতা জানলার দিকে মুখ ফিরাইল।

বন্ধু তার পানে চাহিয়া রহিল। তার দৃষ্টি মুগ্ধ, বিহ্বল!

অনিন্দিতা কহিল,—কালকের কাহিনীটুকু লিখবো, ভাবছিলুম। কিন্তু এই বাড়ী আসা অবধি—ব্যস্—তার পর কি যে হবে, ভেবে পাচ্ছি না!

বন্ধু কহিল—হুঁ!

সেও তা ভাবিয়াছে। তার পর কি—কল্পনার তুলি লইয়া বহু ছবি আঁকিয়াছে! দুটী হৃদয়, তরুণ হৃদয়, একান্ত কাছাকাছি, পাশাপাশি,—হৃদয়ের আকুলতা—রূপ-রস-গন্ধ-ভরা এই বিশ্ব-ভুবন, চাঁদের আলো, বিহ্বল রাত্রি, বিরহ-বেদনা! শেষে···কিন্তু হুম্ করিয়া সে কথা বলা চলে না! একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল,—আচ্ছা, আপনি লিখুন, আমিও লিখি। দেখা যাক্—কি হয়!

—তার পরে কি লিখবো, একটু suggestion দিন্ না···

বন্ধু কহিল—এখন, আমায় নিমন্ত্রণ করেচেন, আমি এসেচি, এবং নিত্য এই আসা-যাওয়া! বন্ধু থামিল; পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—এই তো লেখবার জিনিষ পেলেন··

অনিন্দিতা কহিল,—তার পর?

বন্ধু কহিল,—এই থেকে ইচ্ছামত develop করে তুলবেন।

অনিন্দিতা কি ভাবিল, ভাবিয়া কহিল—আপনি লিখুন—আমি পারবো না···সত্যি, পারবো না। তবে মনে হয়, এ তো ঠিক হচ্ছে···এর পরে এই, তার পর তাই···কিছু নিজে থেকে লিখতে বসি যদি, ভেবে লেখার বস্তু কিছু মেলে না!

বন্ধু কহিল,—হুঁ···

দুজনে আবার স্তব্ধ। অনিন্দিতা কহিল,—লিখবেন তো?

—লিখবো।

—শীগ্‌গির লিখবেন। দেরী নয়।

বন্ধু কহিল,—না।···

তার পর বাড়ীর পরিচয়—কে আছে, আত্মীয়-স্বজন, কোথায় বাড়ী, ভবিষ্যতের স্বপন-ছবি···

শুনিয়া অনিন্দিতা কহিল—এখানো বিয়ে করেন নি!

—আশ্চর্য্য তো!

বন্ধু কহিল—আপনার বিবাহ হয়েচে ?

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুর দৃষ্টি পড়িল অনিন্দিতার সীমন্তের দিকে! সিন্দুরের বিন্দু? অতি মৃদু রেখায় ঐ না…? হাঁ। অনিন্দিতা একটা নিশ্বাস ফেলিল,—নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—বিয়ে ঐ নামেই। স্বামী কি, জানি না! একটা হৃদয়হীন দুর্বৃত্ত!…স্বামীর জন্য কোনো অভাব বুঝি না! বেশ আছি। মা-বাপের আদরে হেসে-খেলে বেড়াচ্ছি।…ভুল! বিয়ে করতে হবে…কেন? স্বামী সহায় কেন? না। স্ত্রীলোক উপার্জ্জন করে না আমাদের দেশে, তাই। কিন্তু যদি কোনো স্ত্রীলোকের সে-অভাব না থাকে—স্বামীতে তার কি প্রয়োজন?

বিস্মিত দৃষ্টিতে বন্ধু অনিন্দিতার পানে চাহিল, কহিল—শুধু আশ্রয়ই ?

তার কথা বাধিয়া গেল। অনিন্দিতা কহিল—আপনি বলতে চান, ভালোবাসা…?

বন্ধু ঘাড় নাড়িল, তাই।

অনিন্দিতা কহিল—ভালোবাসার অভাব কি? মা, বাপ, ভাই, বন্ধু…আমি তো পুরুষের সঙ্গে মিশি বেশ অসঙ্কোচে—কোনো দুর্ব্বলতা কখনো জাগে নি…এ পর্য্যন্ত তো না!…

অনিন্দিতা মৃদু হাসিল।

বন্ধু তার পানে চাহিল—চোখে তেমনি অনিমেষ মুগ্ধ দৃষ্টি।

অনিন্দিতা বন্ধুর দিকে চাহিল, কহিল,—তর্ক থাক্।—চলুন, গান শুনবেন।

—অনুগ্রহ!

অনিন্দিতা কহিল—আসুন…

অনিন্দিতা উঠিল,—বন্ধুও। অনিন্দিতা হার্ম্মোনিয়মের পাশে বসিল। বন্ধুকে কহিল,—বসুন…

বন্ধু বসিল। অনিন্দিতা হার্ম্মোনিয়মের সামনে বসিয়া গান ধরিল—

আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল,
শুধাইল না কেহ!
সে তো এলো না—যারে সঁপিলাম

বন্ধুর স্থূল শরীর চেয়ারে বসিয়া রহিল; মন গানের সুরে কোন্ ছায়াময়ী অমরার পথে উড়িয়া চলিল।

গান থামিলে বন্ধু কহিল—রবিবাবুর গান ?

অনিন্দিতা কহিল,—তাই। এমন প্রাণের কথা আর কেউ বলতে পারে?

বন্ধু কহিল—আজ-কাল অনেকেই বলচে। অনেকে কেন—আমরা বলতে সুরু করেচি, আরো স্পষ্ট করে, আরো জোরালো ভাষায়!

—বটে! অনিন্দিতা কহিল,—আমায় পড়াবেন তো আপনার কবিতা ?

৪

পরের দিন আবার আসিতে হইল অযাচিত, বিনা-নিমন্ত্রণে। না আসিয়া থাকা যায় না! গৃহে অনিন্দিতা একা। বন্ধু কহিল—খপর নিতে এলুম—আপনার সেই আত্মীয়ের অসুখ…তিনি কেমন আছেন?

অনিন্দিতা কহিল,—ভালো আছেন!

বন্ধু কহিল—আসি…

অনিন্দিতা কহিল,—সে কি! এলেন—বসবেন না?

বসিতে হইল। অনিন্দিতা কহিল,—একা এমন বিশ্রী লাগে! রাত্রেও তাই…এমন নিঃসঙ্গ কখনো থাকিনি। তাছাড়া এ দু'দিন…

অনিন্দিতা ছোট একটা নিশ্বাস ফেলিল।

করুণ সহানুভূতি-ভরা দৃষ্টিতে বন্ধু তার পানে চাহিল, কহিল—আপনার বাবা-মা কবে ফিরবেন ?

অনিন্দিতা কহিল—একটু ভালো না দেখে তো ফিরতে পারেন না।

—আপনার দাদা ?

—তাঁরই শ্বশুরের অসুখ। কাজেই বৌদি-দাদা সেখানে আছে। শ্বশুরের আর কেউ নেই। ঐ একটি মেয়ে, বৌদি…

—ও!……

রাত্রে মন তেমনি আকুল! কিন্তু কি বলিয়া যায়! বন্ধু অধীর ভাবে একখানা নভেলের পাতা উল্টাইতে লাগিল; এবং সেই অবসরে গভীর নিদ্রা…

পরের দিন আবার মাণিকতলার বাগান…

অনিন্দিতা কহিল—ভালো লাগে না। আমার বারণ, সেখানে যাওয়া। টাইফয়েড্ কেশ্ কি না। অথচ এমন একা…

বন্ধু বসিল। অনিন্দিতা কহিল—আপনি আর আসবেন না বন্ধু বাবু…সঙ্গে সঙ্গে একটা নিশ্বাস পড়িল!

বন্ধু অবাক! অনিন্দিতা কহিল—আপনার সঙ্গে দু'দিন মাত্র আলাপ—তবু মনে হয়, যেন কত কালের পরিচয়!

অনিন্দিতা শূন্য দৃষ্টিতে আকাশের পানে চাহিল, একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—আপনার জন্য মন এমন অস্থির হয়…কখন্ আসবেন! চলে গেলে এমন ফাঁকা ঠেকে! এ দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়…

একটা নিশ্বাস চাপিয়া বন্ধু কহিল—আমাকে চিরদিন পাশে স্থান দিতে আপত্তি আছে? বন্ধু বলে… আত্মীয় বলে ?

—বন্ধু! না—না। ভাবচি, আপনার কাছে একটু

লিখতে শিখবো। শেখাবেন? ঐ লেখার মধ্যেই নিজের মহা-দুঃখ ডুবিয়ে দেবো…

—বেশ!…

আরো কথাবার্ত্তা—দেশের নারীর দুর্দ্দশার বিবিধ আলোচনা…

অনিন্দিতা কহিল—সন্ধ্যার পর আসবেন? এখানে খাওয়া-দাওয়া করবেন, তার পর বায়োস্কোপে যাবো। এমনি করে যতটা সময় কাটে।

অনিন্দিতা বঙ্কুর পানে চাহিল—তার চোখের দৃষ্টিতে দুনিয়ার যত ব্যথা যেন ভরিয়া উঠিয়াছে!

বঙ্কু কহিল,—আসবো। এলে যদি আপনি ভালো থাকেন…আমার আসা কর্ত্তব্য!

খুশী-মনে অনিন্দিতা কহিল,—আসবেন।

৫

সন্ধ্যার পর সাজ-পোষাকে আরো ঘটা। বঙ্কু শচীকান্তর সদ্য বিবাহ হইয়াছে। তার ঘড়ি, চেন, আংটি ধার লইতে বঙ্কু দ্বিধা করে নাই…বায়োস্কোপে যাইবে—সঙ্গে তরুণী রূপসী সখী!

আহারাদির পর অনিন্দিতা কহিল—একটু বাগানে বেড়াবেন?

—চলুন…

মালতীর ঝাড়ে ফুলের রাশ…জ্যোৎস্নায় স্নান করিয়া বাগানের যা শোভা হইয়াছে, অপূর্ব্ব।

অদূরে শাণ-বাঁধানো ছোট পুকুর। দু'জনে গিয়া ঘাটে বসিল। দূরে এ্যামেচার থিয়েটারের আখড়া, সেখান হইতে গানের শব্দ ভাসিয়া আসিতেছিল. .

এমন চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভালো
সে মরণ স্বরগ- সমান!

বঙ্কু ও অনিন্দিতা দুজনে স্তব্ধ, মৌন…বঙ্কুর মনে একরাশ বাসনা মর্ম্মরিয়া উঠিতেছিল!

সহসা একটা প্রচণ্ড নিশ্বাস ফেলিয়া অনিন্দিতা ডাকিল—বঙ্কুবাবু…

কম্পিত স্বর!

বঙ্কু কহিল—কি বলচেন? তার স্বর গাঢ়!

অনিন্দিতা একেবারে তার কোলের উপর মাথা রাখিয়া কহিল—বিবাহের মন্ত্রই কি দুনিয়ায় সব-চেয়ে বড়? প্রাণের এই আকুলতা…মনের এই গভীর আবেগ? এ-সবের কোনো দাম নেই?

বঙ্কু কহিল—নিশ্চয় আছে। এই আবেগই মিলনের অমোঘ মন্ত্র…

সে অনিন্দিতার মুখখানি তুলিয়া ধরিল, কহিল,—অনিন্দিতা, দেবি, আমি তোমায় ভালোবাসি…

অনিন্দিতার করুণ নয়নের দৃষ্টি…ঐ আবেশ-ভরা মুখ…বঙ্কুর চিত্তে উন্মাদনা জাগাইল। সে ডাকিল,—অনিন্দিতা, দেবি…

হঠাৎ সেই মুহূর্ত্তে আকাশ ভাঙ্গিয়া মাথায় বাজ পড়িল! বিকট গর্জ্জন,—কে তুই?

চমকিয়া চাহিয়া বঙ্কু দেখে, আকাশের বাজ নয়! একটা জুয়ান লোক…তার কণ্ঠে বজ্রস্বর! এক হাতে লোকটা বঙ্কুর গলা টিপিয়া ধরিয়াছে, অপর হাতে পিস্তল। লোকটা কহিল—আমার স্ত্রীর সঙ্গে তোর কিসের আলাপ…

বঙ্কু উঠিয়া দাঁড়াইতে গেল—অনিন্দিতা ছুটিয়া পলাইল। লোকটা বঙ্কুকে চাপিয়া ধরিয়া কহিল—যদি পুলিশে দি?

এক-আকাশ জ্যোৎস্না ফাঁশিয়া চুর হইয়া গেল।… বঙ্কুর সামনে আলোর দুনিয়া ভূমিকম্পে দুলিয়া কোন্ আঁধার পাতালে নামিয়া চলিল! এ কি সত্য… না…

সত্য! কঠিন সত্য! লোকটা কহিল,—যা কিছু আছে দে… কোনো দয়া নয়। না দিস্, পুলিশে যাবি…

সারা পৃথিবী রক্তে রাঙা হইয়া উঠিল। মন্ত্র-চালিতের মত ঘড়ি, চেন, আংটি, টাকা কড়ি যা কিছু ছিল, বঙ্কুকে সঁপিয়া দিতে হইল।

লোকটা বঙ্কুর ঘাড় ধরিয়া বাগানের ফটক পার করিয়া দিল; কহিল,—ফের যদি এ-মুখো হবি, জান্ যাবে! হুঁশিয়ার!

সিক্ত মার্জ্জারের মত নিঃশব্দে বঙ্কু বাহির হইয়া গেল।

দুদিন পরের কথা। 'ভাব-বন্যা'র মিটিং। বঙ্কু সে মিটিং তুচ্ছ করিয়া দেশে ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছে। আর এখানে নয়! রোমান্সের পিছনে এত বড়…

ভৃত্য আসিয়া একখানা চিঠি দিল। ডাকে আসিয়াছে।

খাম ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিয়া বঙ্কু দেখে, লেখা আছে,—

কিছু মনে করবেন না। প্রাণে দৌর্ব্বল্য জাগিতেছিল, ভগবান তাই রুদ্র মূর্ত্তিতে দেখা দিলেন! আবার দেখা হইবে কি না, জানি না। তবে একটা কথা, যদি কোনো অসহায় তরুণীকে বিপদে রক্ষা করিবার সুযোগ আবার কোনো দিন ঘটে, তার চিত্তহরণের চেষ্টা করিবেন না। নারী কৌতুকময়ী, নারী পাষাণী, নারী হেঁয়ালি—এ কথাগুলো বোধ হয় একদম মিথ্যা নয়।

অনিন্দিতা

চিঠিখানা ছিঁড়িয়া বঙ্কু বিছানার মোট বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল।

শেষ

# পঞ্চশর

## কৌতুক নাট্য

[ ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত ]

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

## পূর্ব্বকথা

পঞ্চশর প্রকাশিত হইল।

আমার রচিত 'প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ' নামক ছোট গল্প-অবলম্বনে এই কৌতুক-নাট্যখানি রচিত হইয়াছে। 'প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ' আমার রচিত 'পুষ্পক' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

এ কৌতুক-নাট্যখানি সাত-আট বৎসর পূর্ব্বে রচিত হয়; ইহার অভিনয়ও হইয়াছে, বহুকাল-পূর্ব্বে। নানা দৈব-দুর্ব্বিপাকে এতদিন প্রকাশিত হয় নাই,—প্রকাশের ইচ্ছাও ছিল না। তবে আমার কয়েকজন বন্ধুর সাগ্রহ অনুরোধ এড়াইতে পারিলাম না বলিয়াই পঞ্চশর এতকাল পরে লোকচক্ষুর গোচরে আসিল।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতা, ১লা মাঘ; ১৩২৬।

বন্ধুবর

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র গুপ্ত

করকমলেষু

## চরিত্র

### পুরুষ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| বামনদাস লাহিড়ী | ... | ... | ... | বাগদা-নিবাসী বৃদ্ধ বিপত্নীক |
| ঈশান | ... | ... | ... | ঘটক |
| প্রমথ | ... | ... | ... | রিষড়া-নিবাসী তরুণ ধনি-পুত্র |
| বিপিন | ... | ... | ... | ঐ বন্ধু |
| জগৎ | ... | ... | ... | কলিকাতা-বাসী বেকার যুবা |

প্রমথর পিতা, ঘটক, লোকগণ, কন্যাযাত্রিগণ, কুলিগণ, বাঙ্গাল আরোহী, প্রভৃতি

### নারী

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| আশা | ... | ... | ... | অনূঢ়া দরিদ্র-কন্যা |
| চপলা | ... | ... | ... | ধনি-কন্যা; ঐ সখী |

আশার মাতা, ঘটকীগণ, বালিকাগণ, পুরমহিলাগণ প্রভৃতি

# পঞ্চশর

## প্রস্তাবনা

কোরাস্। গীত

পঞ্চশরে বিদ্ধ করে সবায়, ওগো—
নাইকো কারো বাঁচন।
জ্বালায় প্রাণে, নাচায় সে গো বিষম তুর্কি-নাচন!
বসন্তে কোন্ মধুর রাতে, চাঁদের ঝরা কিরণ-পাতে
মিষ্টি মুখের হাসি-কথায় সোহাগ-আদর-যাচন!
প্রথমটা বেশ! ভারী খাসা! মধুর স্বপন, রঙিন নেশা।
মরি-মরি উহু-আহায় প্রেমের প্রবেশ-জ্ঞাপন!
শেষে ঘটা হুহু-হাহার, সারে না, তা; খাওনা হাজার
হোমিও-এ্যালোপ্যাথি, কি ঐ কবিরাজের পাঁচন।

## প্রথম দৃশ্য

বাগ্‌দা—গ্রাম্যপথ

বামনদাস ও ঈশানের প্রবেশ

বামন। তোমাকে এর উপায় কর্‌তেই হবে, বাবা। দ্যাখো না, আমার কি দশা হয়েছে···

ঈশান। আজ্ঞে, দেখতে সব পাচ্ছি। তবে—

বামন। কি আর বল্‌বো বাবা, এ তো গিন্নী মরেন নি, আমাকেই মেরে গেছেন।

ঈশান। সত্যি তো! ভারী অন্যায়—ভারী অন্যায়! এটা কি তাঁর উচিত হয়েছে? এ-বয়সে স্বামীকে এই বিপদে ফেলে কোনো পতিব্রতা স্ত্রী মর্‌তে পারে কখনো!

বামন। এই-এই বলো বাবা! একলা ঘরে শুতে আমার গা ছম্‌ছম্ করে। এতকালের অভ্যাস, ঘুম হবে কেন? সারা রাত এ-পাশ ও-পাশ করেই কেটে যায়!

ঈশান। বিশেষ এই শীতের রাতে—একলা কোনো ভদ্দর লোক শুতে পারে! না, শুলে ঘুম হয়!

বামন। সবই তো বোঝো, বাবা! বুঝে দয়া করে একটা কিনারা যা হোক্···

ঈশান। আমার কি অসাধ মশায়! কিন্তু দেখ্‌চেন তো, বাগ্‌ড়া কত! মেয়ের বাপ-বেটারা ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসে আছে,—বলে, এমন বুড়োর হাতে মেয়ে দেবো না!

বামন। না, না, এমন কি বুড়ো হয়েছি! বয়স আমার কতই বা হয়েছে!

ঈশান। বলে, পাকা চুল!

বামন। সেটা গিন্নীর শোকে ভেবে ভেবে, বাবা, ভেবে ভেবে। আবার একটি ঘরে আসুক, দুদিনে এ সাদা চুল কেঁচে যাবে।

ঈশান। বলে, তোব্‌ড়া গাল!

বামন। ওরে বাবা! তাই না কি! তা, তা মাংস খেলে আবার শাঁস গজাতে কতক্ষণ!

ঈশান। বলে, থুথ্‌ড়ু করে হাঁটে—পায়ে জোর নেই—

বামন। না, না। হাঁটতে পারি, হাঁটতে পারি। হাঁটা কি—দৌড়ুতেও মজবুত্ আছি। এই ছাখো না। (সজোরে পরিক্রমণাভিনয়) তার উপর এই যে সেদিন—বোসেদের বাগানের ধারে অত-বড় পগারটাই একলাফে ডিঙ্গিয়ে গেলুম!

ঈশান। বলেন কি মশায়! পগার ডিঙ্গুলেন?

বামন। হাঁ বাবা, মস্ত পগার,—তাকে খাল বললেও চলে! একটা গরুতে তাড়া করেছিল, সামলাতে না পেরে টকাস্ করে পগারটা ডিঙ্গিয়ে গেলুম! ডিঙ্গিয়ে মনে ভারি আপশোষ হল, আহা, পায়ের জোরটা কেউ দেখলো না! মনে করছি, এবার থেকে ফুটবল খেলবো।

ঈশান। তার পর আবার বলে, সব দাঁত পড়ে গেছে!

বামন। সেগুলো দুধে দাঁত বাবা, দুধে দাঁত! ছেলেদের পড়ে না? ন' দশ বছর বয়সে? তা আমার তো তখন পড়ে নি, এই যা পড়ছে! আবার উঠতে কতক্ষণ! এই ছাখো না, এই ছাখো (হাঁ করিয়া) মাড়ি কত শক্ত, কর্‌কর্ কর্‌চে, দু-একটা উঠচেও। না হয় বলো, মটরভাজা চিবিয়ে দেখিয়ে দেবো।

ঈশান। তার উপর অত ছেলে-মেয়ে নাতি-পুতি।

বামন। ও-সব আমার নয়, আমার নয়—গিন্নীর। যত কাঁটা গেড়ে রেখে গেছে। কখনও সদ্ভাব ছিল না—ছাখো না! সদ্ভাব থাক্‌লে আর দুম্ করে মরে এই বিপদে ফেলে যায়?

ঈশান। এরা তো সংসার জুড়ে বসে আছে?

বামন। উড়ে এসে, বাবা, উড়ে এসে। তুমি বুঝিয়ে বলো, বুঝিয়ে বলো—একবার বিয়েটা হোক্ না—তার পর সব শালাকে তেজ্যপুত্তুর করে তাড়াবো! শালার বেটার শালা, আপদ সব! আর জায়গা পায়নি, আমার বাড়ী এসে জুটেছে!

ঈশান। তাই তো! আপনি ফ্যাসাদ বাধালেন, দেখ্‌ছি!

বামন। ফ্যাসাদ কি বাবা ঈশেন? তুমি উপায়

করো—নাহলে,—নাহলে আমি আত্মঘাতী হবো—হ্যাঁ, হবো! তা বলে রাখ্‌চি! এই ছাখো তোমার সামনেই—(গলা টিপিবার চেষ্টা) এই—এই —জিব বেরুলো বলে,—এই—এই—

ঈশান। (বাধা দিয়া) আরে, আরে, কি করেন? সত্যিই দেখচি আত্মঘাতী হন যে! না—না—

বামন। বলো উপায় কর্‌বে? কর্‌তে পারবে?

ঈশান। পারবো কি? আমরা হলুম্ গে প্রজাপতির দূত—আমাদের অসাধ্য কিছু আছে? হুকুম করুন না, বাঘের দুধ এনে দিচ্ছি—গণ্ডার ধরে আনছি।

বামন। না বাবা, বাঘের দুধ আন্‌তে হবে না। তুমি শুধু একটি কনে জুটিয়ে দাও, আমি তোমায় খুশী করে দেবো। খুব খুশী—

ঈশান। কি! টাকার লোভ দেখাচ্ছেন! ঈশেন টাকার কেয়ার থোড়াই করে! আপনার উপকার করবো, তার দরুণ টাকা নেবো? টাকা! আপনার কাছ থেকে? সে টাকা মুর্গীর মাংস!—সে টাকা—সে-টাকা···খোলামকুচি!

বামন। আবে, না, না, টাকা না নিলে চলবে কেন! তোমার তো' পুষ্যি কম নয়! ঈশ্বরের অনুগ্রহে—

ঈশান। তারা না খেয়ে শুকিয়ে মরুক—আম্‌সির মত চিম্‌সে হোক্—তা বলে আপনার মত মহাশয়-লোকের কাছ থেকে টাকা নেবো! আমায় কি তেমনি পেলেন?

বামন। আচ্ছা, আচ্ছা, সে পরের কথা পরে। এখন বলো, একটু আশা নিদেন দাও যে ধড়ে প্রাণ পাই।

ঈশান। দেখুন মশাই, আপনাকে তবে সব কথা খুলে বলি। এ গ্রামে থেকে বিয়ে হওয়া দুষ্কর।

বামন। তা ঠিক, তা ঠিক। কিন্তু কেন বল দেখি?

ঈশান। ধরুন, সম্বন্ধ ঠিক-ঠাক হলো, কিন্তু আপনার ছেলে-মেয়েরা ঘুণাক্ষরে জানতে পার্‌লে তখনি ভাংচি দেবে! এমন কি, বিয়ের সভা থেকেও হয়তো আপনাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে আস্‌বে।

বামন। তা পারে, পারে। যে-সব গোঁয়ার-গোবিন্দ ছেলে—কিছু অসাধ্যি নেই!—তাহলে—তাহলে কি উপায় করি, বাবা?

ঈশান। তার চেয়ে চলুন কলকাতায়। সেখানে দেদার লোক, মেয়েও তাদের দেদার—টাকাকড়ির অভাবে সব মেয়ে পার করতে পারে না! আপিসের ছাঁ-পোষ জীব তারা, দোজবরে তেজবরে, কিছু মানে না! বেশ ডাগর ডাগর মেয়ে পছন্দ-মাফিক মিলে যাবে'খন! আপনিও তো আর কচি খোকাটি নন্ যে কচি-খুকি বৌ ঘরে এনে তাকে মানুষ করবেন! আপনি এমনটি চান, যে এসে আপনাকে মানুষ করতে পারে?

বামন। মনের কথা টেনে বলেচো বাবা—আমি ঠিক অমনটিই চাই। বেশ ডাগর-ডোগর···দেখলে মনে হবে, চমৎকারটি···

ঈশান। তাহলে টাকাকড়ি কিছু নিয়ে কলকাতায় চলুন। নেহাৎ কালীঘাটের যাত্রীর মত থাকলে চলবে না! একটু ভড়ং চাই।···টাকাকড়ি আপনি কোথায় রাখেন?

বামন। সিন্ধুকে।

ঈশান। সে সিন্ধুক থাকে কোথায়?

বামন। আমার বড় মেয়ের শোবার ঘরে।

ঈশান। তার চাবি?

বামন। আমার ট্যাঁকে!

ঈশান। বেশ! কিন্তু চালাকি করে টাকাগুলো বার কর্‌তে হবে! কেউ না সন্দ করে! আপনি তেজারতি করেন না?

বামন। হাঁ।

ঈশান। আচ্ছা, দেখুন, আমার এক জানিত বিশ্বাসী লোককে একটু পরে পাঠাবো'খন। আপনি বাড়ীর মধ্যে গিয়ে বল্‌বেন, একজন গহনা রেখে কিছু টাকা ধার চায়—এই বলে সিন্ধুক খুলে যত টাকা সরাতে পারেন, সরাবেন—সরিয়ে আমার সেই লোকের হাতে দেবেন। সে এসে টাকা আমায় দেবে! তার পর আপনাকে শেস-রাত্রে ডেকে আন্‌বো। আপ্‌নি রাত্রে কোন্ ঘরে শোন্?

বামন। গিন্নী যাওয়া-ইস্তক বাইরের ঘরে শুই!

ঈশান। বেশ—তাহলে জানলায় টোকা দেবো—তিন টোকা! আপনিও ঠিক আসবেন,—ঘুম ভাঙ্গবে তো?

বামন। বললুম তো বাবা, ঘুম কি আর চোখে আছে? গিন্নীর সঙ্গে-সঙ্গে ঘুমও গেছে!

ঈশান। দেখুন দেখি!—আর ছেলেগুলো তোফা নাক ডাকিয়ে বৌ নিয়ে ঘুমোচ্ছে! এতটুকু আক্কেল নেই! ছি-ছি! বুড়ো বাপের এ কষ্ট দেখলে—একটা কি, আমি দশটা বিয়ে দিয়ে দিই!

বামন। তোমার মত সু-ছেলে আর কার হবে! এরা যত অকাল-কুষ্মাণ্ড জুটেছে—

ঈশান। নরকেও স্থান হবে না—পরে দেখে নেবেন! এখন তাহলে আসি। এই হতভাগা পুষ্যি-গুলোর একটা হিল্লে করে···

বামন। ভালো কথা,—ভুলে যাচ্ছিলুম! তোমার বাড়ীর খরচের জন্য আপাততঃ এই পঞ্চাশ টাকা নিয়ে রাখো! কাছেই ছিল—শ্রীনাথ গাঙ্গুলির কাছ থেকে আদায় হয়েছে!

ঈশান। (হাত বাড়াইয়া) টাকা! আরে না, না! কি বলেন আপনি—না মশাই—

বামন। (হাতে টাকা গুঁজিয়া দিয়া) সে কি হয় বাবা—এ আর কি—এ তো কিছুই নয়—

ঈশান। (টাকা লইয়া) না নিলে আপনার অপমান হবে—কি করি—তাই নিতে হলো। তাহ'লে এই কথাই রইলো, কেমন? এর যেন নড়চড় না হয়!

বামন। নড়চড় কি বাবা,—আমি তোমারই আশায় বসে থাকবো! তা হলে এখন আসি?

ঈশান। হ্যাঁ, আসুন। একটু এগিয়ে দিয়ে আসি, চলুন। না, থাক্—এক-সঙ্গে দুজনকে দেখ্‌লে আবার পাঁচ বেটা পেছনে লাগবে। তাহলে আসুন!

বামন। হ্যাঁ, আসি। তা হলে মনে রেখো বাবা। কি আর বল্‌বো—আমার বাপের কাজ কর্‌লে তুমি!

ঈশান। আজ্ঞে আগে কবি, আপনার আশীর্ব্বাদে—তার পর বলবেন।

বামন। তাহলে আসি।

(প্রস্থান)

ঈশান। ভাবী দাঁও মিলেচে! একে তো ঘটকালীর হাল এই! তার উপর যুদ্ধ বেধেছে—ভাগ্যে বুড়োর বাতিক চেগেছে। যাই—এখন কলকাতায় দুদিন ঘুরে আসা যাক্! সাম্‌নে বড় দিন আসছে আবার,—ফুর্ত্তিকে ফুর্ত্তি করা যাবে, তার উপর টাকা রোজগার হবে। একেই বলে বরাত!

(প্রস্থান)

## দ্বিতীয় দৃশ্য

### রিষড়া—চপলার পিতার উদ্যান

বালিকাগণের প্রবেশ

বালিকাগণ। গীত

ভোরের হাওয়া ধেয়ে এল, ফুটিয়ে গেল ফুলের রাশি!
রাতেরই স্বপন দিয়ে জাগিয়ে দিল রঙিন হাসি।
কোথা কোন্ পরীর দেশে, সাত-সাগরের কোন্ পারে সে
ভালোবাসা লুকিয়ে ছিল, ভোরের হাওয়ায় এল ভাসি!
বিরলে রাতি সে কার,—কেটেছে—প্রাণে আঁধার?
এ আলো-হাওয়ায় এসে, সে আঁধার যাবে খসি!

(প্রস্থান)

চপলার প্রবেশ

চপলা। এবার এসে অবধি সইকে দেখিনি! এত করে ডেকে পাঠালুম, তবু এলো না,—এর মানে কি? সে কি রাগ করেছে? না, আমি যাইনি বলে অভিমান করে আস্‌ছে না? তাকে তো লিখেছিলুম—আমি কথা দিয়ে এসেছি, বাড়ীর বার হয়ে কারো সঙ্গে দেখা কর্‌বো না—সে কথা কি করে ঠেলি! না হলে দিনে পঞ্চাশ-বার ছুটে যেতুম!...কেন সে বুঝচে না! অনেক কথা জমে রয়েছে তাকে বল্‌বার জন্য! শুনেছি, রোজ সকালে বাগানে আসে, মাসিমার পূজোর জন্যে ফুল নিতে, তাই আজ ভোরে উঠেই বাগানে এসেছি! কৈ, এখনও সে এলো না! ও-পাড়ার মেয়েরা এসে ফুল তো উজোড় করে নিয়ে গেল!—ঐ না কে আস্‌ছে! একলাটি! সই না?—সই—(ছুটিয়া নেপথ্যাভিমুখে গেল ও মুহূর্ত্ত-পরেই আশার সহিত পুনঃ-প্রবেশান্তে) কেমন, আজ ধরা পড়েছ! রোজ চুপি চুপি এসে ভোরের বেলাতে ফুল তুলে নিয়ে পালাও—আজ কেমন ধরেছি! সত্যি ভাই, এত করে ডেকে পাঠাই, একবারও কি আস্‌তে নেই? কি নিষ্ঠুর তুমি হয়েচো!

আশা। নিষ্ঠুর কেন হবো সই?

চপলা। নিষ্ঠুর নও! আচ্ছা, বলো, তবে কেন তুমি আসো না?

আশা। সব তো জানো ভাই।

চপলা। কি জানি! না, আমি কিছুই জানি না। কি হয়েছে? মুখ নীচু কর্‌চো কেন? না ভাই, লক্ষ্মীটি, বলো।

আশা। ভাই, এত লোক মরে, আমি ভাবি, আমার কেন মরণ হয় না!

চপলা। সে কি—কি দুঃখে মরণ-কামনা করো তুমি?

আশা। কি দুঃখ! আমার জন্যে আমার বিধবা মার একদণ্ড স্বস্তি নেই! যে-সে এসে পাঁচ কথা শুনিয়ে দিয়ে যাচ্ছে!

চপলা। কেন? কি কথা?

আশা। কি আবার! বলে, এত-বড় ধেড়ে মেয়ে রেখে কি করে মুখে ভাত দিচ্ছগো?

চপলা। ওরে বাস্‌রে! কথা শোনো! বেশ করে, মুখে ভাত দেয়! তোদের কি? ভালো কর্‌বার বেলা কেউ নেই—কথা শোনাবার বেলা আছেন! কি ধার ধারি তাদের, যে মুখে ভাত দেবো না!

আশা। সেই জন্যেই ভাই তোমার কাছে আসতে পারিনি! পাঁচজনে আসা-যাওয়া করে—ঠেশ দিয়ে কেউ না কেউ দুটো কথা বল্‌বেই! তাই মা-ও কোথাও যায় না, আমিও না!

চপলা। সত্যি, বিয়ের কিছু ঠিক হয়নি?

আশা। না।

চপলা। কোথাও কথা হয়নি?

আশা। তা হবে না কেন? তবে মার তো এক কাঁড়ি দেবার ক্ষমতা নেই।

চপলা। যাক্,—জমিদারদের ছেলের সঙ্গে যে কথা হয়েছিল, শুনছিলুম!

আশা। জমিদারের বাড়ীর খাঁই আরও বেশী!

চপলা। সত্যি ভাই, এদের কারও চোখ নেই··· তাই শুধু টাকাই চায়! কিন্তু এমন সাত রাজার ধন মাণিক,—সত্যি বল্‌চি আশা, আমি যদি পুরুষ হতুম, তোমায় দেখে, শুধু তোমার জন্তেই আমি তোমাকে বিয়ে করে ফেলতুম!

আশা। সেই আশায় এ-জন্মটা বসে থাকি, ফিরে-জন্মে তুমি এসে বিয়ে করো!

চপলা। একেবারে হতাশ হোস্‌নে ভাই! গুণের কথা ছেড়ে দি, তার পরিচয় পেতে যেন সময় লাগে,—কিন্তু রূপ! এ রূপের কি কোন দাম নেই?

আশা। যাক্ ভাই,—ও-সব কথা ছেড়ে দাও। ফুলগুলি গেলে পূজো করে মা তবে মুখে একটু জল দেবে—আজ আবার দ্বাদশী। আমি আসি।

চপলা। তাহলে আর ধরে রাখবো না। দেখি, পারি তো মাকে বলে-কয়ে দুপুর বেলা একবার যাবো—মাসিমাকে প্রণাম করে আসবো'খন! অনেক কথা জমে আছে ভাই—তোকে বল্‌বার জন্যে। প্রাণটা ছট্‌ফট্ করছে!

আশা। বেশ ভাই—তাই যেয়ো! তখন আমিও তোমার সব কথা শুনবো।

চপলা। শুধু শুন্‌লে চল্‌বে না। কিছু বল্‌তেও হবে।

আশা। বলবো আর কি, বলবো? আমার আর বল্‌বার কি আছে!

চপলা। কিছু নেই? ও কি! মুখ নীচু কর্‌ছিস্ যে!

আশা। কৈ—না।

চপলা। না বই কি। মুখ যে রাঙা হয়ে উঠলো! দেখি,—দেখি···কেনগো কেন, এত লজ্জা কেন?

আশা। না, লজ্জা আবার কিসের?

চপলা। তবে—

আশা। কি তবে?

চপলা। হাসিখুশী যে উবে একেবারে গেল! কথা জড়িয়ে যাচ্ছে! সেই গানটা আমার মনে পড়েছে!

আশা। কি গান?

চপলা। জানিস্ না? তবে শোন্—কিন্তু বলে রাখ ছি, তার পর আমায় সব কথা বল্‌তে হবে—

গীত

জীবনে সেদিন আসে!
হাসি-খেলা সব ঝরে যায়—
মনে হয়, উপহাস এ!
মধু গীত, মধু গন্ধ, ললিত ছন্দ
অন্তরে পরকাশে।
যা-কিছু আঁধার চকিতে মিলায়
প্রেমেরি আলো বিকাশে!

চপলা। শুনলি তো! আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—জমিদারের ছেলে ঐ যে, নাম বুঝি, প্রমথ—সে তোকে বিয়ে কর্‌তে চায় না? আমি শুনেছি সব, লুকোলে চল্‌বে না।

আশা। কি জানি!

চপলা। আবার আমার কাছে লুকোচ্ছিস্? বল্ দেখি, তোকে সে দেখ্‌লে কি করে? বল্—লক্ষ্মীটি!

আশা। বল্‌চি ভাই, সবই খুলে বল্‌চি! মার একবার খুব অসুখ করে; আমাদের ঐ বুড়ো ঝী ওঁদের ডাক্তারখানা থেকে ওষুধ আনতো! ডাক্তার একদিন আসতে পারেনি বলে আমি আবার ঝীকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাই, সে সময়ে তিনি ডাক্তারখানায় ছিলেন। নিজে ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে মাকে দেখতে আসেন, তারপর যতদিন মার অসুখ ছিল, রোজ দু' চারবার তিনি দেখ্‌তে আস্‌তেন।

চপলা। সেই এসেই বুঝি তোমায় ফাঁশে জড়িয়ে গেছেন!

আশা। না ভাই, বড় ভাল লোক তিনি,—কখনও আমার মুখের পানে চেয়ে দেখেন নি।

চপলা। ওলো সে-চাওয়া কি প্রকাশ্যে হয়? সে খুব গোপনে চাওয়া! তুই যে তাঁর পানে চেয়ে দেখতিস্, সেটা কি আর কেউ জেনেছে? অথচ তোর চাওয়ায় তো কম্‌তি হয়নি কোন দিন!

আশা। যাও···

চপলা। তা এর আর যাওয়া-যাওয়ি কি! ভগবান চোখ দুটোর সৃষ্টি করেছিলেন কেন? রূপ দেখবার জন্য, নিশ্চয়ই! তা এমন রূপসী সাম্‌নে থাক্‌তে যে চেয়ে দেখে না, সে যে অন্ধ, ভাই!

আশা। যাও, তুমি যদি ঠাট্টা করো তো আর কিছু বল্‌বো না।

চপলা। না, না, আর ঠাট্টা করবো না। তুই বল্ ভাই!

আশা। তার পর আমার বিয়ের কথা নিয়ে মা দুঃখ করেন, তাতে তিনি তাঁর বাবার কাছে লোক পাঠাতে বলেন—মা পাঠিয়েছিলেন।

চপলা। কি জবাব এলো?

আশা। দশ-পনেরো হাজার টাকার ফর্দ্দ।

চপলা। তখন নায়ক-প্রবর কি কর্‌লেন?

আশা। মাকে বললেন, আপনি রাজী হন—আমি এ-টাকার জোগাড় যেমন করে পারি, করে দেবো। মা রাজী হলো না।

চপলা। এঁ্যা—বলিস্ কি ভাই? এ যে রীতিমত প্রেমের উপন্যাস। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বো, ঠিক জবাব দিবি?

আশা। কি ?

চপলা। তুই তাঁকে মনে-মনে ভালোবেসেছিস্ !

আশা। তা ভাই, আমাদের মত গরীবের উপর তাঁর এত স্নেহ—এত দয়া, তার জন্য কৃতজ্ঞতা নেই ?

চপলা। কিন্তু এ কি শুধু কৃতজ্ঞতা ?

আশা। না হয় তারও বেশী ! তাতে দোষ কি ভাই ?

চপলা। এখন আর-কারো সঙ্গে যদি তোর বিয়ে হয় ?

আশা। তুমি ভুলে যাচ্ছ, সই, জীবনটা উপন্যাসের পাতা নয় ! আমি কি তোমায় ভালবাসি না ? মাকে বাসি না ? বাবাকে বাস্‌তুম্ না ? তবে ? যাক্— এখন তবে আসি, ভাই—বেলা হয়ে যাচ্ছে। তুমি দুপুর বেলায় যেয়ো।

( প্রস্থান )

চপলা। এমন মেয়ের বিয়ে হয় না,—কেন ? না, কতকগুলো টাকার ঝন্‌ঝনে আওয়াজ নেই। কিন্তু এর প্রাণের মধ্যে যে জিনিষ আছে—যে মন, তার কি কোন পরিচয় কেউ নেবে না ? রূপের কথা না হয় ছেড়ে দিলুম, কিন্তু এই মনটার কোন দাম নেই ? হারে পুরুষ।

( প্রস্থান )

## তৃতীয় দৃশ্য

রঙ্গপট

বঙ্গকুমারীগণ। গীত

আমরা অবলা বঙ্গকুমারী চির-বিষাদিনী রে।
মা-বাপের বুকে ফুটে আছি কাটা, দিবস-যামিনী রে !
উঠিতে-বসিতে অভিশাপ-গালি, বেদনা-অশ্রু গোপনেতে ঢালি—
দেখিলে নাহিগো রক্ষা, খেলে বচন-দামিনী যে।
কেটে যায় দিন, কাটে গো বর্ষ, মা-বাপের মুখ ঘোর বিমর্ষ—
জল করে দিই বুকের রক্ত, মোরা অভাগিনী রে !
যত সুধা-মধু সঞ্চিত বুকে, বাঙালীর ছেলে খায় থাকে সুখে,
যা চায়, তা পায়, নন্দদুলাল, যশোদারি নীলমণি রে।
বাঙালীর মেয়ে পূজা-তপ করে, চৌদ্দপুরুষ-উদ্ধার-তরে—
কন্যা মিলিবে—বাপ যাবে পথে, মা হবে ভিখারিণী রে !
এ বুকে আছে যে কি শোভা-মাধুরী,
কেহ তা দেখে না, বোঝে না বিচারি,
ওজনে তঙ্কা মিলিলে, চরণে ধরিবে বঙ্গ-কামিনীরে !

---

## চতুর্থ দৃশ্য

বাগ্‌দা—গ্রাম্য পথ

চারিজন লোকের প্রবেশ

১। বলো কি, রাহাজানি !

২। গুম-খুন।

৩। বুড়ো-চুরি !

৪। আহা, খালি গোলই করচো সব। বলি, ব্যাপারখানা কি ?

১। ব্যাপার ভারী সাংঘাতিক !

২। শুধু সাংঘাতিক ! সর্ব্বনাশ হলো বলে !

৩। দেখে নিয়ো, মড়কে দেশ উচ্ছন্ন যাবে।

১। ঘুমের দফা গয়া !

২। মুখে ভাত কি ছাই উঠবে !

৩। আরও কি হবে, কে জানে ?

৪। আরে ছাই, তবু বকে ! বলি, ব্যাপারখানা কি ?

৩। ব্যাপার গুরুতর। শুন্‌লে নাড়ী ছেড়ে যাবে।

২। নাঃ, এমন ভৌতিক ব্যাপার চক্ষে কখনও দেখা যায় নি।

১। কাণেই বা শুনলুম কবে? ওঃ, ভাবতে হৃৎকম্প হয়।

৪। আরে মর্, তবু বকে ! বলি, ব্যাপারখানা কি ?

১। এটা নিশ্চয় মাঝ-রাত্রে ঘটেছে।

১। কাল আবার তিথি ছিল, একাদশী—

৩। তাই তো ! ও বৃথা চেষ্টা, দাদা ! ( হতাশভাবে বসিয়া পড়িল )

২। দেখেছিলে, কাল সন্ধ্যাবেলা ঈশান-কোণে একটা চিল উড়ছিল ?

১। আর সেই কদম গাছটায় শব্দ।

৩। তখন থেকেই সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

৪। ( ধাক্কা দিয়া ) আরে ব্যাপারখানা কি ? কি হয়েছে ?

৩। জানো না কিছু ? সে কি ! সারা গাঁয়ে হুলস্থূল বেধে গেল !

১। বলে, যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়া-পড়শীর ঘুম নেই !

২। গাঁজায় দম দিয়ে থাকলে আর জানবে কি করে, দাদা ?

৪। বটে ! গাঁজায় দম ! তবে দেখবে মজা ?

১। আরে না, না, শোনো।

২। বামনদাস লাহিড়ীকে—হ্যাঁ, হ্যাঁ—বুঝলে কি না !

৪। কি ? গঙ্গাযাত্রা করেচে না কি ?

৩। আরে না, না, দেবযোনিতে নিয়ে গেছে।

১। যেমন বিয়ের সখ হয়েছিল, তেমনি সখ ছিরকুটে দিয়েছি!

২। বাবাঃ, একেই তো স্ত্রীগুলো যখন বেঁচে থাকে, তখনই কি নেই-আঁকড়া! কি একগুঁয়ে! এতটুকু হেনস্থা সহ্য করতে পারে না! চব্বিশ ঘণ্টা আমাদের তটস্থ থাকতে হয়!

৩। আর সেই স্ত্রী মরে গিয়ে স্বামীর আবার বিয়ে বরদাস্ত করবে, এ কি সম্ভব?

১। আরে ছ্যাঃ—বলে, মেয়েমানুষের তেজ! তার কাছে চালাকি!

২। সাধে কি আর গোলাম হয়ে আছি? দাপটে গোলাম করে রেখেছে! যদি বলেন, জল উঁচু, তো অমনি বলতে হবে, জল উঁচু! আবার যদি বলেন, খবরদার—না,—জল নীচু। অমনি কেন্নোর মত কুঁকড়ে বলি, আজ্ঞে হ্যাঁ, জল নীচুই বটে!

৩। নৈলে রক্ষে আছে!

১। কুরুক্ষেত্তর বাধিয়ে দেবে।

৪। হ্যাঁ হে—পাগল হয়েছ নাকি। বামনদাস লাহিড়ীকে দেবযোনিতে নিয়ে গেল কি?

৩। তার মরা পরিবার এসে তাকে নিয়ে গেছে। তবে কোথায় নিয়ে গেছে—

১। তা' ঠিক বলতে পাচ্ছিনে। কোনো গাছে আস্তানা বেঁধেছে, বোধ হয়।

২। কোনো পগারের ধারেও হতে পারে!

৪। ক্ষেপেচো সব! আরে, ভূতে নিয়ে গেছে কি?

১। তবে আর শুনছো কি?

৪। ভূতে নিয়ে যাবে কি! ভূত কি আছে?

২। ঠিক। ভূত কি থাকতে পারে, ভায়া—ভূত মানে যা ছিল।

৪। বুড়ো মিন্সে সব—ভূত-ভূত করচো! লজ্জা করে না?

৩। কিছু না, বাবা। ভূত মানি না মানি—ভয়টা মোদ্দা করি। ঐ সামনে অশথ গাছ—কাজ কি আর ভিরকুটি করে!

আর-একটি লোকের প্রবেশ

৫। ওহে, আমি যা ভেবেছিলুম, ঈশেন ঘটক বেটাও কোথায় ভেগেছে! এ সেই বেটার ফন্দী! বেটা কোথাও সম্বন্ধ-টম্বন্ধ ঠিক করে বুড়োকে নিয়ে রাতারাতি সরেছে—বিয়ে দেবে আর কি!

আর দুইজনের প্রবেশ

৬। ঠিক বলেচো! রাত আটটা নটার সময় বুড়ো সিন্দুক খুলছিল,—মেয়েরা কে বললে, কি হচ্ছে? তা বুড়ো বললে, একজন কিছু টাকা ধার চায়—গহনা বন্ধক রেখে। কাজেই কারো সন্দেহ হয়নি। এখন দেখা গেল, টাকার থলি নেই—অথচ বন্ধকী গহনাও দেখা যাচ্ছে না!

৪। ঈশেনও তাহলে এর মধ্যে আছে।

৫। নিশ্চয়। সে বেটা একের নম্বরের ধড়ীবাজ।

৬। চলো সকলে, ওদের পরামর্শ দিয়ে থানায় নিয়ে গিয়ে একটা ডায়েরি করানো যাক—পুলিশে তদন্ত করবে।

৭। কি হয়েছে মশায়? আমি একজন ফৌজদারীর মোক্তার, দাঁড়িয়ে সব শুনছি: কোন্ ধারা খাটাতে চান, বলুন—তৈরি করে দেবো—আগাগোড়া সাক্ষী শিখিয়ে দেবার ভার নেবো। (বই দেখিতে দেখিতে) বলুন, কোন্‌টা চাই, ৩৭৯? ৩৮০, ৪০৩ না ৪০৬?

৪। ভালো জ্বালা, আপনাকে তো কেউ ডাকেনি মধ্যস্থতা করতে! এদিকে বিপদ, উনি যেন ভাগাড়ে শকুনি এসে পড়লেন! জলজ্যান্ত একটা মানুষ নিয়ে সটকান দিলে, তার সন্ধান করবো, না, উনি এলেন ফ্যাচ্-ফ্যাচ্ করতে—

৭। মানুষ নিয়ে পালানো—বলেন কি? বেশ, দেখচি। (বই দেখিতে দেখিতে) আচ্ছা, বলুন তো, ৩৬৩, না ৬৪? ৬৫, না ৬৬?

৫। পাগল না কি।

৭। পাগল কি মশায়! আমার অসাধ্য কাজ নেই। আমি আগুন গিলতে পারি, জল চিবুতে পারি! বলুন না, এখান এই Penal Code খানা দেখছেন তো—এর আগাগোড়া মুখস্থ বলে যাচ্ছি! ধরুন, অবিশ্বাস হয় যদি। আচ্ছা, বলুন দেখি, যাকে নিয়ে পালিয়েছে, তার বয়স কত? যোলর বেশী, না কম? Minor কি না, সেটা দেখতে হবে কি না! মেয়ে না পুরুষ? Kidnoppinga? না abduction?

৬। শুনছেন বুড়ো মানুষ—আবার জিজ্ঞাসা হচ্ছে, বয়স যোলর বেশী কি না!

৭। কি জানেন, আমরা আইন নিয়ে নাড়াচাড়া করি। সব সঠিক না জেনে কিছু পরামর্শ দিতে পারি না।

৫। থামো, থামো, তোমায় কেউ পরামর্শের জন্ম ডাকেনি। চলো হে একবার ভূতিদের ওদিকে যাওয়া যাক—এ খপরটা দিতে হবে। ওরা ক' ভায়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে একেবারে।

৬। বলো কি, বসবে না! পথের ভিখিরী করে গেছে সকলকে।

(৭ম ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

৭। কি! একটা ফৌজদারীর মোক্তার আমি—আমায় মানলে না? আচ্ছা, নেভার মাইন! নেভার মাইন! কখনো কি ব্যাটাদের হাতে পাবো না!

(প্রস্থান)

## পঞ্চম দৃশ্য

রিষড়া—প্রমথদের বাটীর বহিঃকক্ষ

বিপিনের প্রবেশ

বিপিন। কোথায় গেল প্রমথ? আঃ! ওহে—এই যে! বলি, ব্যাপার কি?

প্রমথর প্রবেশ

প্রমথ। কেন?

বিপিন। কাল বোটে চড়ে বেড়াতে গেলুম—তোফা Picnic! তুমি গেলে না যে।

প্রমথ। ভালো লাগে না।

বিপিন। কেন? হঠাৎ এমন বৈরাগ্যোদয় হল!

প্রমথ। বৈরাগ্য কি? মনটা ভালো ছিল না।

বিপিন। মন ভালো ছিল না! কেন—?

প্রমথ। সেটা তো আমার হাত নয়।

বিপিন। বটে! কার কাছে সে খপরটা পাওয়া যাবে, তবে? বলো, না হয় একবার সন্ধান নি।

প্রমথ। এই বিয়ের জ্বালায় আমায় দেশ-ছাড়া হতে হবে দেখচি।

বিপিন। হঠাৎ এমন সৃষ্টিছাড়া বাতিক তোমার হলো কেন? বিয়েটা ত ভালো জিনিস বলেই আমার ধারণা আছে। শুধু আমার কেন? আমাদের মত বয়সে সকলেই বিয়ের ভারী গোঁড়া।

প্রমথ। বিয়ে আমি করবো না!

বিপিন। অতি সহজ কথা বলবার সময়। তার পর সে রাঙা অধর, কালো নয়ন—

প্রমথ। রেখে দাও তোমার রাঙা অধর, কালো নয়ন!

বিপিন। বললে তো রেখে দাও—কিন্তু ও জিনিস দুটি কি যেখানে-সেখানে রাখা যায় হে ভায়া? হঠাৎ তুমি এ বাই ধরলে কেন?

প্রমথ। এই টাকা-কড়ির জ্বালায়। বাবা এক সম্বন্ধ স্থির করেছেন। তাঁরই এক বন্ধুর মেয়ে—নগদে জিনিস-পত্রে হাজার পনেরো দেবে, তার পর ঐ মেয়েই সব—তার আর ভাই-বোন নেই, বাপের জমিদারীটুকু অবধি এসে আমার কপালে জোড়া লাগবে—

বিপিন। আরে, তবে ত, "শুভস্য শীঘ্রং!" আজকাল-কার দিনে এমন করে লক্ষ্মী যদি আসতে চাচ্ছেন তো নেহাৎ গর্দ্দভের মত তাতে বাধা দিয়ো না।

প্রমথ। লক্ষ্মী শুধু একলা আসছেন না ভাই, পেঁচা বাহনটিকেও সঙ্গে আনছেন।

বিপিন। অর্থাৎ?

প্রমথ। অর্থাৎ লক্ষ্মীটি রূপে তাঁর সৎমা শ্যামাঠাক-রূণের যমজ বোন!

বিপিন। ওঃ—তাই বলো,—অমাবস্যায় লক্ষ্মীপূজা!

প্রমথ। শুধু তাই নয়, ভাই। সভা-সমিতিতে আমরা এই বিয়ের খরচ কমাবার জন্য বক্তৃতা সুরু করেছি, বিবাহের পণ ওঠাবার জন্য প্রবন্ধের ঝুড়িতে মাসিকপত্র বোঝাই কচ্ছি—শ্লেষ-বিদ্রূপ-ভরা প্রহসন দেখে হাততালি দিচ্ছি—কিন্তু নিজেদের ঘরে এই কুপ্রথা ওঠাবার জন্য কি চেষ্টা করছি? কিছু না! আরো মজা একটা দেখি, খপরের কাগজে মাঝে মাঝে খপর বেরোয়, কুমার অমুকচন্দ্রর ছেলে এম, এ পাশ, কুমার অমুক-চন্দ্রর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে—পাত্রপক্ষ মোটে যৌতুক চান্‌নি! আরে, ও-ধারে না চাইতেই বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা এমনি ঘরে ঢুক্‌লো যে! কাগজওয়ালারা অমনি ধন্য-ধন্য করে যেন শেয়াল ডেকে ওঠে! ওরে আহাম্মক, এত হাঁক-ডাক কেন? হয়েছে কি? কুমার বাহাদুর যদি কোন গরীবের সুন্দরী মেয়েকে বিনা-পণে ছেলের বৌ করে নিতেন, তবে বুঝতুম তাঁর উদারতা!

বিপিন। ভাবার্থটা খুলে বলো ভাই। যে-রকম তোড়ে বক্তৃতা সুরু করেচো!

প্রমথ। শোনো, আমার বিয়েতে আমার বাবা টাকা চাইবেন, আর আমি বাছা গোপাল হয়ে বসে থাকবো—অথচ পরের বেলা টিপ্পনী ঝাড়বো।—এ আমার বরদাস্ত হবে না! অপমান করা নয়, বাবাকে স্পষ্ট বলবো, বিয়ে দেন যদি তো কোন গরিব গৃহস্থের মেয়ের সঙ্গে দিন—না হলে আমি বিয়েই করবো না—আমার সাফ কথা!

বিনোদ। বটে—এই কথা?

প্রমথ। হ্যাঁ, তবে মেয়েটি সুন্দরী হওয়া চাই।

বিপিন। তার ভাবনা কি! আমাদের পাড়ায় হরিহরের এক মেয়ে আছে···

প্রমথ। রমেশের বোন্—সে আর এমন কি সুন্দরী!

বিপিন। রমেশের বোন্ সুন্দরী নয়? তাহলে দেখচি, ব্যাপার নেহাৎ সরল নয়—রঙ্গমঞ্চে নায়িকার আবির্ভাব হয়েছে!

প্রমথ। নায়িকা কি রকম?

বিপিন। নয়তো কি? সামনে এগজামিন—এ সময় তার চিন্তা ছেড়ে হঠাৎ কন্যাদায়ের উপর ভীষণ বক্তৃতা সুরু করলে—এতে কোন্ ভদ্দর লোক না নায়িকার আবির্ভাব কল্পনা করবে দাদা?

প্রমথ। নায়িকা-টায়িকা নয়—তবে নপাড়ার মহেন্দ্র গোস্বামীর এক মেয়ে আছে—মেয়েটির কি রূপ! আহা, অমন সুশ্রী মেয়ে দেখা যায় না! তা তার বিয়ে হয় না কেন? না, বিধবা মার পয়সা নেই বলে!

বিপিন। বেশ! তুমি বিহিত করে দাও।

প্রমথ। বাবা মত করেননি, তাঁরা আমার কথা-মত

লোক পাঠিয়েছিলেন, বাবা প্রকাণ্ড এক ফর্দ্দ দিয়েছিলেন—তা আমি তবু লোক দিয়ে তাঁদের বলেছিলুম, আপনারা রাজী হন, আমি যেখান থেকে পারি, টাকার জোগাড় করে দেবো—কেউ জানতে পারবে না—তাঁরা রাজী হলেন না।

বিপিন। রাজী হলেন না?

প্রমথ। না। মেয়ের মা বলেন, আমার আশাকে দেখে পছন্দ করে যিনি নেবেন, তাঁরই পায়ে মেয়েকে দেবো। যিনি টাকা আগে চান, পরে মেয়ে—সেখানে কোন্ প্রাণে মেয়ে দি?

বিপিন। কথাটা চমৎকার! আজকাল সময় যা পড়েছে, তাতে দেখতে পাই, পাওনাটাই আসল—বউটিকে যেন অনুগ্রহ করে ফাও নেওয়া হয় মাত্র! তা তুমি কি করবে?

প্রমথ। আমার এক কথা—ঐ মেয়ে যদি হয়, তবেই বিয়ে করবো, না হয় বিয়ে করবো না! আহা, কি রূপ! যেন সেই, "চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিতসত্ত্বযোগা রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতা নু—"

বিপিন। ইস্, আবার কবি হয়ে উঠেচো! রবিবাবু ঠিক লিখেচেন,—"পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একি সন্ন্যাসী! বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে—"। তা বিশ্ব-মাঝে হোক্ না হোক্, বাঙলাদেশে যে সে ছাই খুবই ছড়িয়েছেন, তার আর সন্দেহ নেই। বাঙালীর ছেলেগুলো আজকাল উঠতে বসতে কবিতা লিখচে, আর পটাপট্ প্রেমে পড়ছে।

প্রমথ। বাজে কথা থাক্। এখন এসো, একটু বেড়িয়ে আসা যাক্। ভালো লাগছে না কিছু!

বিপিন। চলো, গঙ্গার ধারে যাই। হে প্রেমিক-বর, সন্ধ্যা হয়ে আসছে—তুমি নদীর তটে বসে নৌকা গুণবে চলো। আমি পাশে বসে বসে তুড়ি দেবো, আর হাই তুলবো। কি আর করি? বিশ্ববিদ্যালয় যে আবার ওদিকে আছেন খাঁড়া উঁচিয়ে। না হলে দুষ্যন্তর সেজে বেড়াতুম।

প্রমথ। আর বকামি করে না, চলো।

( উভয়ের প্রস্থান )

---

## ষষ্ঠ দৃশ্য

রঙ্গপট

বরগণ ও কন্যাগণ

গীত

বরগণ। আমরা বাঙলা দেশের বর—
কন্যাগণ। মোরা বাঙ্‌লা দেশের কনে!
বরগণ। গুণের কথা কইব কি আর?
চেহারাতেই বুঝচ, ইয়ার।
কন্যাগণ। পাব ঐ পায়ে ঠাঁই,
তপস্যা তাই, কর্‌চি কচু-বনে!
ওগো, বসে কচু-বনে!
বরগণ। বলি, কিসে তুষ্ট করবে যাদু,
চাইছো যে ঠাঁই পায়?
কন্যাগণ। আছে বিদ্যে—
বরগণ। ধারিনে ধার!
কন্যাগণ। রূপ?
বরগণ। সে রূপোর চাকায়!
বাপের যদি থাকে কড়ি, এসো শুভক্ষণে!
কন্যাগণ। কাণা, খোঁড়া, খোনা, বোঁচা—
বরগণ। যায় না কিছু এসে!
কন্যাগণ। কি মহিমা!
বরগণ। নাইক সীমা।
কন্যাগণ। ( দেবো ) মূর্চ্ছো না যাই শেষে!
বরগণ। মোদের শ্বশুরার্থ পরমার্থ, মগ্ন তারই
ধ্যানে!
ওগো, মগ্ন তারই ধ্যানে!

---

## সপ্তম দৃশ্য

কলিকাতা—মেশের সম্মুখ

জগৎ ও ঈশানের প্রবেশ। পশ্চাতে মুটে; তাহার মাথায় তরী-তরকারির ঝুড়ি।

ঈশান। যা বাবা, ভিতরে ওগুলো নামিয়ে রেখে আয়। আমি কর্তার জন্য বাইরে একটু দাঁড়াই।

( মুটের ভিতরে গমন )

জগৎ। ঠিক-ঠিকানা কিছু হলো?

ঈশান। একটু কিনারা হয়েছে। পরশু বিয়ে হবে, তবে না হলে কিছুই বলা যায় না। দেশ যা হয়েছে,—হাঁ-হাঁ করে পাঁচ-বেটা পড়ে না ভাংচি দেয়!

জগৎ। কেন, পাঁচজনের কি মাথাব্যথা?

ঈশান। এই বলে কে। ভালো করতে তো কেউ নেই, মন্দ করতে সকলে অমনি ছুটে আসে! পাঁচবেটা এসে আহা-উহু করবে, হাঁ, হাঁ, করচো কি? ঘাটের মড়া ধরে এনে, এমন মেয়ে তার হাতে দিচ্ছ! তা এদিকে ভারী দরদ! কৈ, কর্‌না দেখি নিজেরা আছিস্ তো, ছেলে-ছোকরার দল, কর্ না বিয়ে! তখন গরিবের সে দায়ে দাঁড়াতে এক ব্যাটার চুলের টিকি দেখতে পাবে না।

জগৎ। যা বলেচো! যত কথার ভট্‌চাযি্য বৈ নয়! যাক্, এখন কাজের কথা কওয়া যাক্। চাকরের

বাজার তো এই, তার উপর বিষম যুদ্ধ বেধেচে, আর কোন ব্যবসা চলুক না চলুক, তোমাদেরটা বেশ চলেছে। তার সাক্ষী এই তুমি নিজে। এক বুড়োর বিয়ে দিতে কলকাতায় এসে আর গোটা আষ্টেক বিয়ের জোগাড় করে দিয়ে তবিলটি বেশ ভারী করেচো।

ঈশান। আরে চুপ, চুপ। বুড়ো জানে, তারই কনের সন্ধানে টো-টো করে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি।

জগৎ। তা যাক্ গে, বুড়োর কথায় আমার দরকার নেই। আমি বলছিলুম, সেই ঘটকালির এজেন্সির কথা। সেটা খোলার কি হলো? আমি প্রায় ছ'মাস ইন্সিওরেন্স অফিসে এ্যাপ্রেন্টিসি করে কাটালুম—বিনে মাইনের ফাই-ফরমাস কম খাটলুম না দাদা, কিন্তু সব ভুয়ো। তাই ভাবচি, তোমার মত এক জন লোক পেলে ঘটকালির এজেন্সি ফাঁপিয়ে তুলি। এ-দিকটায় এখনো কেউ পা বাড়ায় নি। তুমি খুব ওস্তাদ লোক কি না, তাই বলছি।

ঈশান। আমিও ক'দিন সেটার কথা ভাবছি। বেশ কমিশনের বন্দোবস্ত করো দেখি, আমি দেদার জোগাড় করে দেব। এই বুড়োর পাল্লায় লিষ্টি যা জোগাড় করেছি, সোজা নয়—রঙ্-বেরঙের মেয়ে, হরেক রকমের ছেলে।

জগৎ। তবে ভাবনা এই, বুড়োর বিয়ে হলেই ত তুমি আবার দেশে ফিরচো।

ঈশান। পাগল হয়েচো! কলকাতার কলের জল একবার যার পেটে পড়েছে, সে কি আর সহর ছেড়ে নড়তে পারে? তার উপর যখন দেখচি, এখানকার পথে-ঘাটে পয়সা ছড়ানো রয়েছে! অর্থাৎ বুঝলে কি না, শুধু তা দেখার চোখ, আর কুড়োবার তাগ্ থাকা চাই। বুড়োর বিয়ে হলে এই বাড়ীতেই পরিবার নিয়ে এসে মৌরুসী পাট্টা গাড়বো—এ তুমি দেখে নিয়ো।

জগৎ। তবে তো তোফা হয়েছে। কিন্তু একটা কথা? কতকগুলো মাগী চাই,—চেহারা মানান-সই, বয়স বেশী নয়, একটু চট্‌পটে হবে আর সাজ-সজ্জা বেশ কেতা-মাফিক।

ঈশান। মাগী?

জগৎ। হ্যাঁ। একটু রকমারি হওয়া চাই, নাহলে ব্যবসা চলবে কেন? আসল ব্যাপার ত জানো, সেকালে কর্ত্তারা থাকৃতো ছেলে-মেয়েদের বিয়ের কথায়—গিন্নীরা আড়াল থেকে শিকলী নেড়ে হাঁ-হুঁ সায় দিত, এখন আর গিন্নীরা কর্ত্তাদের এ-ব্যাপারে থাকতে দিতে চায় না—আসল দেনা-পাওনার কথা এখন পাকা হয় অন্দরে। কাজেই মাগীগুলোকে শিখিয়ে পড়িয়ে অন্দরে পাঠানো চা —তাতে কমিশন বেশী মিলবে'খন।

ঈশান। ঠিক, ঠিক বলেছ! এটা আমার মাথায় আসেনি। (মুটের পুনঃপ্রবেশ) এই নে তোর পয়সা—যা।

মুটে। আউর দোঠো পয়সা বাবু—বহুৎ দূর পড়া!

ঈশান। যা, যা, আর ফ্যাচ-ফ্যাচ করিস্ নে। এই নে আর একটা পয়সা দিচ্ছি, নিয়ে চলে যা।

মুটে। আউর একঠো বাবু—

ঈশান। যা, যা, আর হবে না। (মুটের প্রস্থান) এই যে কর্ত্তা—

বামনদাসের প্রবেশ

জগৎ। এই যে,—আসতে আজ্ঞা হয়, ঠাকুর্দ্দা।

বামন। কি দাদা, রাস্তায় দাঁড়িয়ে যে!

জগৎ। এই তোমার জন্য ঠাকুর্দ্দা।

বামন। দাদা আমার ভারী রসিক।

ঈশান। (জনান্তিকে জগতের প্রতি) ওহে, ঠাকুর্দ্দা বলো না, বুড়ো চটে।

জগৎ। (জনান্তিকে) তাইতো একটু মজা করছি।

বামন। ঈশেন—

জগৎ। ঠাকুর্দ্দা, তোমার বিয়েয় আমি নিৎবর সাজবো।

বামন। হলে ভালই হতো। তবে কি না, আমার চেয়ে তুমি বয়সে বড়, এই না মুস্কিল।

জগৎ। না ঠাকুর্দ্দা, বয়সে বেশী বড় হবো না—তবে কি না, আমাকে দেখায় ছোট।

বামন। আমি জিম্‌ন্যাষ্টিক করি কি না, তাই এমন বাড়ন্ত গড়ন আমার। দেখি ঈশেন, একটা সিগারেট দাও তো হে—অনেকক্ষণ খাইনি। (সিগারেট লইয়া জ্বালাইয়া মুখে দিল, এবং মুখের বিকৃতভাব করিয়া থুতু ফেলিল)

জগৎ। ফোগলা দাঁত, সিগারেটটা গলে বেরিয়ে আসচে, বুঝি?

বামন। ফোগলা কি রকম! এই দেখ, দাঁতের সার—(বাঁধানো দাঁত দেখাইল)

জগৎ। ইস্, আগাগোড়া বাঁধিয়ে ফেলেচো যে। যেন হুগলির পোল! বাঃ, খাশা!

বামন। বাঁধানো নয়,—আপনি গজিয়েছে।

ঈশান। (জনান্তিকে) বুড়োকে ঘাঁটিয়ো না হে, তাহলে এজেন্সি মাটী।

জগৎ। ঠিক!···কোথায় গেছলেন, শুনি?

বামন। গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে গেছলুম। একটা গোরার সঙ্গে হাতাহাতি হয়ে গেল—Young man—রক্ত একটুতেই গরম হয়ে ওঠে কি না—বেটাকে কাবু করে এসেছি। (হাতের গুলি দেখাইল)

জগৎ। তা তোমার মত জোয়ান মরদের সঙ্গে বেচারা গোরা পারবে কেন? তুমি এই বাঙালী পল্টনে নাম লেখালে না কেন? গেলে হতো ভাল।

বামন। নিলে না যে! না হলে সেই মতলবেই বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলুম। বললে, আর-একটু বড় হও, তার পরে এসো।

জগৎ। তবে যে শুনলুম, ঈশেন পাত্রী খুঁজে বেড়াচ্ছে।

বামন। কি করবো? ঠাকুমার সাধ! বলেন, কবে আছি, কবে নেই, বিয়েটা করে ফেল্ দাদ', নাৎ-বৌ দেখে হাসিমুখে মরবো তবু! নৈলে আমার ত ইচ্ছে ছিল, আর একটু বয়স হলে—

ঈশান। আরে না, না—আমরা সেকেলে মানুষ, আমাদের মতে বেটাছেলের অল্প বয়সেই বিয়ে করে ফেলা ভাল। কি জানো, ও টীকে দেওয়া আর কি।

বামন। তা আমি নেহাৎ ছেলেমানুষ নই—অপোগণ্ডটি নই একেবারে! তবু কি জানো—আর একটু বয়স হলেই হতো ভাল! কি করি, ঠাকুমার বেজায় জেদ।

জগৎ। আহা, সে তো ঠিক। বুড়ী মানুষ করেছে কি না! তাঁর ইচ্ছে—

বামন। এই—তুমি ঠিক বুঝেচো দাদা।

ঈশান। তাহলে জগৎ, তুমি এখন এসো—সন্ধ্যার পর এইখানেই আজ খাওয়া-দাওয়া করো। বাজার করে আনলুম। মিউনিসিপাল মার্কেটে গেছলুম।

বামন। মটন্ আছে তো? মটন্ না হলে রাত্রে আমার খাওয়াই হয় না। তাহলে এসো দাদা।

জগৎ। আজ্ঞে, আসবো বৈকি—বলেন কি, মটন্! আরে বাস্, এ যে ভারী স্ব-ঘটন। নিশ্চয় আসবো ভাই। ( প্রস্থান )

বামন। ঈশেন, তার পর খপর কি, বলো বাবা? দাঁত বাঁধিয়ে জোয়ান সাজিয়ে কতদিন আর বসিয়ে রাখবে? সেই দুর্ল্লভ বাবুর ভাগ্‌নীটির কি হলো? আহা, মেয়ে নয়, যেন মা জগদ্ধাত্রী আমার দাঁত মেলে হাসচেন।

ঈশান। আজ্ঞে, আপনার ইচ্ছে বুঝে সেইখানেই পাকা কথা কয়ে এসেছি। তারাও রাজী। আশীর্ব্বাদটা অবধি সেরে এসেছি—আর বলেছি, আমাদের আশীর্ব্বাদের পাট্ নেই—বংশে মানা আছে।

বামন। বেশ বলেচো বাবা, বেশ বলেচো। তার পর?

ঈশান। তাঁরা রাজী—তবে বিয়েটা সেই বিয়ড়ের বাড়ী থেকে হবে। সেইখানেই মেয়ের বাপের বাড়ী। বাপ গেলেও নামটা এখনো আছে।

বামন। তা বেশ, বেশ। তাঁদের ইচ্ছেটা রাখা খুব উচিত। তা দিনটা স্থির করে এসেছ তো! মাস যে ফুরিয়ে এলো!

ঈশান। দিন-টিন সব ঠিক, কর্ত্তা। বিয়ে হচ্ছে এই পরশু তারিখে। ঐটেই এ মাসের শেষ দিন। ঐ একই দিনে গায়ে হলুদ। লগ্ন রাত বারোটায়। দশটার ট্রেণে আমরা যাবো। বেশী আগে গিয়ে কি হবে?

বামন। ঠিক তো, ঠিক তো! তাহলে, ঈশেন—

ঈশান। কি মশায়?

বামন। পরশু তাহলে?

ঈশান। আজ্ঞে হ্যাঁ।

বামন। আমার যে বিশ্বাস হচ্ছে না, বাবা—এ'তো স্বপ্ন নয়?

ঈশান। আজ্ঞে স্বপ্ন কি, মশায়? বলেছি ত, ঈশেনের অসাধ্য কাজ নেই। ঈশেন বাঘের দুধ এনে দিতে পারে, গণ্ডারের ছানা—

বামন। থাক্ থাক্ বাবা—সে-সবে আমার দরকার নেই।

ঈশান। এখন ভিতরে আসুন। অন্য কথাবার্ত্তা ঢের আছে।

বামন। চলো বাবা, তাই চলো। ( উভয়ের প্রস্থান )

## অষ্টম দৃশ্য

রঙ্গ পট

ঘটক ও ঘটকী

গীত

ঘটকী। ও তোর কুলকুলুজী বাপ না ঢেকে,
খাটছে না সে, খাটছে না আর।
গিন্নীরা ভার নিয়েছে—
উল্টে গেছে বিয়ের বাজার।
ঘটকী। খুলেছি কোম্পানি, নথ-নাড়া তোর বাপ ভুলে,
কি দরে বিকচ্ছে শেয়ার, প্রাইস্ দেয়ার,—
কাগজগুলো দেখ খুলে।
( আবার ) মাসিক কাগজ করছি যে বার,
ফর্দ্দ দেখ এই, হাজার হাজার।
ঘটকী। কাগজ তুলে রাখ্‌গে শিকেয়, কাটুক পোকায়!
দেখবে কে তায়?
তাড়া খেয়ে কাণ মলেছে,
কর্ত্তারা না থাকার কথায়।
গিন্নীরা কোট ধরেছে, শিকলী নেড়ে ঠকছে না আর।
ঘটক। চলেছে রিক্রমেশন, উঠছে নেশন,
ঘটকী। পেষা কি তায় কমে?
ঘটক। মেয়ের বাপ হাসছে সুখে,—
ঘটকী। ছেলের বাপ আছে কষে বেজায় পুরো দমে।
ঘটক। কত হচ্ছে মিটিং—
ঘটকী। —মাথা eating (ইটিং)—একটি (বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন)
বরের বাবার। ( প্রস্থান )

## নবম দৃশ্য

হাওড়া—রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম্ম

বিস্তর লোকজন মোট প্রভৃতি লইয়া ছুটাছুটি করিয়া চলিয়াছে। কুলির মাথায় একটি ট্রাঙ্ক চাপাইয়া বামনদাস ও ঈশান প্রবেশ করিল।

ঈশান। রাখ্, রাখ্, এইখানে রাখ্ রাখ্! (বামনদাসের প্রতি) আপনি এইখানে দাঁড়ান। আমি টিকিট দুখানা কিনে আনি।

বামন। কুশণ্ডিকা ফুলশয্যা সেইখানেই সারা হবে, বলে দিয়েছ?

ঈশান। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঈশেন ভোলবার ছেলে নয়।

বামন। আমাকে চিরদিনের জন্য কিনে রাখলে, বাবা।

ঈশান। আপনি তাহলে একটু অপেক্ষা করুন—আমি যাবো আর আসবো। (কুলির প্রতি) ওরে, কোথাও চলে যাস্‌নে—গাড়ীতে মোট তুলে দিলে তোর পয়সা চুকিয়ে দেবো!

কুলি। হাঁ বাবু, ও সব হাম্ ঠিক কর্ দেগা।

ঈশানের প্রস্থান, লোকজন চলাফেরা করিতেছে।

বামন। কি কাণ্ডই করেছে। ওঃ, ইষ্টিশানই কত বড়! এ কি আমাদের বাগদা যে গরুর গাড়ী ঘ্যাঁকচ্ ঘ্যাঁকচ্ করতে করতে এসে মাঠের পাশে দাঁড়ালো, ইষ্টিশান মাষ্টার হুমকি-দুমকি হয়ে ছুটে এসে সবুজ নিশেন উড়িয়ে দিলে, আর গাড়ী অমনি সোঁ করে বেরিয়ে গেল! লোক একবারে গিস্‌গিস করছে। ওঃ, যেন রথের না চড়কের ভিড় জমে গেছে!

কুলি। কুত্তাবাবু, হামি আভি আসবে—গাড়ী'পর চিজ-বস্তু ঠিক-ঠাক সব উঠাবে—দুসরা আদমি মৎ বোলাইয়ে!

বামন। তুমি কোথায় যাবে?

কুলি। আসবে, হামি আসবে।

(প্রস্থান)

বামন। টোপর সঙ্গে দেখলে পাছে লোকে হাসে বলে ঈশেন সেটা বাক্সর ভিতর পুরে দিয়েছে। নাঃ, ঈশেন ছোকরাটির বুদ্ধিশুদ্ধি বেশ আছে।

এক আরোহী, সঙ্গে এক কুলি প্রবেশ করিল। আরোহী গলাবন্ধ জড়াইয়াছে—মাথায় নাইট ক্যাপ্—কুলির মাথায়-পিঠে-হাতে বিস্তর মোট।

কুলি। বাবু, হামি আর পারবে না! এক আদ্‌মি পচাশ আদ্‌মির ভার চাপিয়েছে! জান্‌তো বাবা ফাটিয়ে গেলো! একঠো রূপেয়ার কম লিবে না! (একটা মোট ছিটকাইয়া পড়িয়া গেল)

আরোহী। আরে বিটা, বকর্ বকর্ কইরে বইক্যো মাথাডা খাইলো। এড্‌ডা টাহা লিব—এড্‌ডা টাহা মুয়ের কথা পাইছ, না? অ হালার পুত, এ কি করছ! বোড়ে মারি সিধা না করলি চলবিক না, ছাখতিছি। হক্কল জিনিস ফেলাইছ হালার পুত, আবাগীর বিটা!

কুলি। খবরদার বাবু—গালি দেও মৎ!

আরোহী। না, গালি দিমু না—তোন্দেশ খাতি দিমু! আবাগীর পুৎ হামার জিনিস ফেলাইল, আবাগীর পুৎকে হপ্পে ছাড়মু—তিমন বঙাল হামি না—হঃ!

কুলি। লে'যাও তোমারা মোট—হাম কুছ নেহি মাংতা। টেংরীকা নবাব-সাব আয়া। দো-চার পয়সাকা ওয়াস্তে হাম জান্ দেগা? (সব মোট ফেলিয়া দিল)

আরোহী। অ হালার পুৎ, হক্কল খাইছ—(কুলিকে প্রহার)

কুলি। আপনা ইজ্জৎ আপনা-পাশ রাখ্‌খো—খবরদার্।

আরোহী। কি! হপ্পে ছাড়মু? হালা—(প্রহার)

কুলি। (প্রহার করিল)

আরোহী। খাইল, খাইল, আবাগীর পুৎ! উহুহুঃ—গোড়-মুড়োডা জলতি নাগিছে। উহুহুঃ, বাপ্পোরে, বাপ্পো। এ কনষ্টবিল, এ কনষ্টবিল—

কুলি। বোলাও তোমারা বাপকো—আউর জোর্‌সে চিল্লাও।

(প্রস্থান)

আরোহী। হালা পলাইল—পলাইল।

তিন-চারিজন কুলির প্রবেশ

কুলিগণ। গাড়ী'পর চিজ উঠানে হোগা?

আরোহী। এড্‌ডা হলিই অইব।

কুলিগণ। এক কুলিকা কাম নেহি, বাবু।

(দুই তিন জন কুলি মোট লইয়া প্রস্থান করিল)

আরোহী। আরে, আরে, আরে—এ হুমুন্দির ছাওয়ালরা আমারে পুছ না কইর‍্যা আমার মোট লইয়্যা চলে! আরে, কনে যাস্ রে? কনে যাস্?

(একটু বেগে প্রস্থান করিল)

কুলি। (বামনদাসের প্রতি) বাবু, টাইমতো হো গিয়া—মেল আভি ছুটেগা। চিজ লে'কে গাড়ী'পর উঠায় দেনা?

বামন। আমার আর-একজন লোক আছে বাপু, তাকে দেখেছ?

কুলি। হাঁ, হাঁ, ও বাবু পিছু আতা—অভি মোট উঠায় দেনেসে আচ্ছা জায়গা মিলেগা—নেহি তো বহুৎ ভিড় হোগা!

বামন। তবে চলো। তাইতো, ঈশেন গেল কোথায়?

(নেপথ্যের দিকে চাহিল)

কুলি। আইয়ে বাবু—( ট্রাঙ্ক মাথায় লইয়া প্রস্থান )

বামন। ঈশেন আসবে ঠিক। আমি আগে গিয়ে গাড়ীতে চেপে বসি। নাহলে যে-রকম ভিড়—হয়তো জায়গা পাবো না। ( পশ্চাতে চাহিয়া ) তাইতো, এত দেরী করছে কেন ? সে চালাক ছেলে,—আসবে ঠিক! আমি উঠে পড়ি। কি জানি, যদি গাড়ী ছেড়ে যায়!

( প্রস্থান )

## দশম দৃশ্য

পথ

কোরাস। গীত

এস, পা চালিয়ে সবাই যাই।
বাজাবাতে ঝুড়ি ভবে করতে হবে বর বোঝাই।
কুল-শীলের নাইক ল্যাঠা, মাকা-মাবা বব,
যাস্টো সেকেও সব কেলাশই সাজানো থর-থর—
তেমনি জোগান্ দিতে পারি, যেমনটি যার চাই।
চশ্‌মা-আঁটা, দাড়ি-ছাঁটা, নবা বাবুর দল—
পুচ্ছের মত উচ্চ-গুম্ফ, বকেন অনর্গল—
দরা কিছু বেশী, তাঁদের বিলেত যাবার বাই!
আছে অন্ধ, আছে খঞ্জ, স্বরূপ, কালি-ঝুল,
হাড়ে ছাতা ধরা, কারো অম্ল-পিত্ত-শূল,—
দিচ্ছিনে দম্, সাচ্চা দাম এ, পাঁচের নীচে নাই।
সবার সঙ্গে সর্ত্ত কিন্তু আছে, বাপো শুনে—
হাঁচতে কাশ্‌তে ওঁর দিতে হবে কাণে গুণে।
জিনিস পত্তর ? উঁহু—কাগজ কর্‌করেতে চাই।
বাড়ী-গাড়ী যা আছে, সব হবে লিখে দিতেই,
তারপরেতে বানপ্রস্থ, নাহয় সেঁধোও চিতেয়।
মেয়ের বে দে সংসারে বাস—শাস্ত্রে বিধান নাই।

## একাদশ দৃশ্য

রিষড়া—বিবাহ-বাটীর প্রাঙ্গণ

বরশয্যা সজ্জিত। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ বসিয়া কেহ তামুক সেবন করিতেছে; কেহ বিবাহের কবিতা পাঠ করিতেছে।

চারিধারে কোলাহল—"ওরে, তামাক দিয়ে যা রে, তামাক,"—"মামাবাবু, দই এসে পৌঁছোয়নি এখনো।"

১। আজকাল এই এক ঢং হয়েছে, বিয়ের পদ্য না হলে চলে না।

২। হ্যাঁ, কনে মিলুক না মিলুক—পদ্য কিন্তু চাই।

৩। তা বুঝি জানো না—আমার এক পিসতুতো ভাইয়ের ছেলের বিয়ের সময় হলো কি, জানো ? বিয়ের দিন-টিন সব স্থির—বাড়ীতে লোকজন সোরগোল আরম্ভ করেছে—হঠাৎ মেয়েদের বাড়ী থেকে খপর এলো, সে তারিখে বিয়ে হতে পারে না। কারণ কনের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী নিমন্ত্রণে এসে সংবাদ পেলেন, বিয়ের পদ্য লেখা হয়নি। তাঁর স্বামীটি কবি—থাকেন পশ্চিমে কোথায় তাঁর কাছে টেলিগ্রাম গেল, পদ্য চাই! তাঁর কাছ থেকে পদ্য পেলে সে পদ্য ছাপা ঠিক-ঠাক হলে তবে বিয়ের দিন-স্থির হলো!

৪। কলকাতার এ ফতো চাল আমাদের পাড়াগাঁয়েও চললো।

১। ( চুপি চুপি ) তা দাদা, এ তো ভারী সুখের বিয়ে! শুনছি, বুড়ো বর।

২। তা বলে বিয়ের আমোদ মাটি হতে পারে না! বিয়ে বিয়ে।

৩। দাঁও লাগিয়েছে মন্দ নয়!

৪। হ্যাঁ, বুড়ো সবলেই তেজারতির কারবার।

১। না হে, বুড়োর ছেলেপিলে আছে অনেকগুলো—দাঙ্গা-হাঙ্গাম বাধিয়ে দেবে। তারা কি সহজে ছাড়বে?

৩। দ্যাখো, আমাদের না শেষে আদালতে সাক্ষী দিতে যেতে হয়।

২। যা বলেচো! শুনেছি বুড়ো লুকিয়ে কলকাতায় পালিয়ে এসে বিয়ে কচ্ছে।

৪। মেয়েটার কপালে কি আছে, কে জানে!

৩। আরে ভাই, অত তর্কে কাজ কি! এসেছি দুখানা লুচি খেতে, ব্যস্, খেয়ে চলে যাবো—অত বরাত ঘাঁটাঘাঁটির ধার ধারিনে।

৫। তাইতো ডাকবে কখন্? রাত হয়েছে অল্প নয়!

১। বর আসবে কখন্ ?

২। 69 up-এ আসবার কথা।

৩। তাহলে এলো বলে। ( ঘড়ি দেখিয়া ) ঠিক এগারোটা বেজেছে।

৪। বর না এলে পাত পড়বে না। এই যে মাতুল মশায়...

মাতুলের প্রবেশ

মাতুল। আপনারা তামাক-টামাক পাচ্ছেন হ্যাঁ, চেয়ে-চিন্তে নেবেন—আপনাদের বাড়ী, আপনাদের ঘর। ফুলের মালা পান্‌নি আপনারা? ওগো প্রমথ বাবু, এঁদের মালা ?

প্রমথ ও বিপিনের প্রবেশ

প্রমথ। এই যে—

( সকলের গলায় পুষ্পমাল্য পরাইয়া দিল )

বিপিন। এতক্ষণে বরের পৌঁছুবার কথা, মামা।

মাতুল। হ্যাঁ, সময় ত হয়েছে বাবা! এঁরা যা কষ্ট করছেন—এই সব দেখা-শোনা—করা-কর্ম্মানো—কত বড় লোক—অগাধ পয়সা—তা যেন মাটির মানুষ!

সকলে। আহা, তা হবে না? দেশের তুটি বত্ন, তুজনে!

শশব্যস্তে ঈশানের প্রবেশ

মাতুল। এই যে ঘটক মশায়! (নেপথ্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া) ওগো, শাঁক বাজাও গো, শাঁক বাজাও মেয়েরা। বর এসেছে।

সকলে। (দাঁড়াইয়া) কৈ? কৈ?

(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি)

ঈশান। দাঁড়ান্, দাঁড়ান্, বব এসেছে কি? কখন্ এলেন?

মাতুল। কি রকম—আপনার সঙ্গে আসেন নি?

ঈশান। না।

সকলে। সে কি! আপনি একলা?

ঈশান। হ্যাঁ!

বিপিন। জুচ্চুরির আর জায়গা পাওনি? বটে!

প্রমথ। বব কোথায়?

ঈশান। তা তো বুঝতে পাচ্ছি না।

প্রমথ। থামো, থামো বিপিন। ব্যাপাব কি, খুলে বলুন দেখি।

ঈশান। বর তাহলে এখনো আসেন নি?

মাতুল। না।

ঈশান। তবেই তো সর্ব্বনাশ।

সকলে। কেন? ববের কি হয়েছে?

ঈশান। রাত ন'টার সময় হাবড়া ষ্টেশনে তাঁকে নিয়ে এসে এক জায়গায় বসিয়ে আমি গেলুম টিকিট কিন্‌তে! তার পর যেমন গেরো, মশায়, একবেটা খোট্টার জলের ঘোটায় ঠোক্কর লেগে পড়ে গেলুম—তাই নিয়ে হুলস্থূল বেধে যায়—মারামারি পর্য্যন্ত। তু-চার ঘা খেয়েওচি—এই দেখুন না, জামা ছিঁড়ে গেছে! পুলিশ এসে টানে, বিস্তর কাকুতি-মিনতি করে রূপচাঁদের খাতিরে তিনি আমায় ছাড়লেন! আমি এক-দৌড়ে গিয়ে টিকিট কিনে ফিরলুম। ফিরে দেখি, কর্ত্তাকে যেখানে বসিয়ে রেখে গেছলুম, সেখানে তিনি নেই—তাঁর জিনিস-পত্রও নেই। বিস্তর খোঁজাখুঁজি করলুম। তখন তু-একটা কুলি বললে, বাবু গিয়ে গাড়ীতে উঠেছেন!... গাড়ীতে আমি খুঁজতে বাকী রাখিনি, মশায়! এধার থেকে ওধার অবধি নাম ধরে-ধরে চেঁচিয়ে ডেকেছি, তাব পর এখানকার ষ্টেশনে নেমে প্রাণপণে হেঁকেছি, কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা! শেষে ভাবলুম, যদি গাড়ী থেকে নেমে বরাবর আপনাদের লোকের সঙ্গে এখানেই এসে থাকেন!

১। খুব যে রূপকথা আউড়ে গেলে বাপু! এখন উপায়?

মাতুল। আমরা সহজে ছাড়বো না তোমায়!

২। ডামিজের নালিশ করবো।

ঈশান। তাই তো, লোকটা গেল কোথায়? এই রাতবিরেত—

বিপিন। তুগ্ধপোষ্য ছেলে কি না! ছেলেধরায় ধরে নিয়ে গেছে!

৩। একেবারে পাকা জোচ্চোর!

ঈশান। গাল দেবেন না, মশায়।

বিপিন। গাল দেবো না! তোমায় ঘাল্ করে ছেড়ে দিচ্ছি! ভেবেচো, গরীব বিধবা—কে তার দেখে-শোনে—তাই দম দিচ্ছ! ছাড়চি না।

ঈশান। দম কি মশায়? উল্টে আমরাই নগদ দাম ছেড়েছি। এতগুলি টাকা!

মাতুল। ও-সব শুনচি না। এই রাত তুপুরের সময় এখন বর পাই কোথায়? মেয়েটার উপায়?

ঈশান। আজ্ঞে, তা তো দেখতেই পাচ্ছি সব। কিন্তু আমার কি দোষ, বলুন? কর্ত্তার কি হলো, তাও তো বুঝতে পাচ্ছি নে! রাত্রে রেলে কাটা পড়লেন, না কি, তা কে জানে? বুড়ো মানুষ!

মাতুল। এখন উপায় কি, বলে দিন।

ঈশান। আমি একবার খুঁজে দেখি।

২। আপনাকে ছাড়চি না: আপনি পালাবেন।

ঈশান। মশায়, এতগুলি টাকা আগাম ধরে দেওয়া হয়েছে, তার খোঁজ রাখেন? বলি, লোকসানটা কার? জুচ্চুরি মতলব থাকলে লোকে টাকা ঢালে! বটে!

২। ও-সব ঢের চালাকি জানা আছে, বাবা। এ তোমার কলকাতা পাওনি যে, ঢং দেখিয়ে জিতে যাবে!

ভগবতী ও তুই-চারিজন প্রৌঢ়া মহিলার প্রবেশ

ভগবতী। হ্যাঁ বাবা, এ কি কথা শুনছি! বর নাকি আসেননি?

প্রমথ। না, মা! ঘটক বলছে, তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ভগবতী। এখন তবে উপায়? এ কি সর্ব্বনেশে কথা! আমার আশার দশা কি হবে?

বিপিন। আপনি কাঁদবেন না,—দেখি, আমরা কি উপায় করতে পারি।

ভগবতী। রেলের সময় কি গেছে?

প্রমথ। অনেকক্ষণ।

ঈশান। আমি একবার খোঁজ করে দেখি।

১। পালাবে কোথায়? বর এনে দাও—লে'আও বর।

ঈশান। ভালো জালা! বলেন কি মশায়? লোকটা বেঁচে আছে, না মলো—

২। কুচ্ পরোয়া নেই—তা জানতে চাই না। তুমি বর আনো। বর—

ভগবতী। ও বাবা প্রমথ, কি হবে? এখন উপায়?

পুরোহিতের প্রবেশ

পুরোহিত। (নস্য লইয়া) বর লা কি আসে নি?

ভগবতী। না। কি হবে কাকা?

পুরোহিত। তাই তো—লগনের আর অধিক বিলম্ব নাই!

বিপিন। (ঘড়ি দেখিয়া) ঠিক পঁচিশ মিনিট আছে।

পুরোহিত। এর মধ্যে স্ত্রী-আচার-টাচার সেরে নিতে হবে।

ভগবতী। তুমি এর বিহিত করো, কাকা। আর বাবা প্রমথ—তোমরা দেখ, গরিব বিধবার জাত-কুল না যায়!

পুরোহিত। উপায় একমাত্র হচ্ছে—অন্য পাত্রে কন্যা দান করা। তা ছাড়া উপায় কি?

৩। এত রাত্রে—এখন পাত্র পাই কোথায়?

ভগবতী। যা জানো বাবা, তোমরা করো—আমার মাথা ঘুরছে।

[নেপথ্যে নারীকণ্ঠে কোলাহল। "ওগো, আশা অজ্ঞান হয়ে গেছে।"]

এঁ্যা—এ আবার কি বিপদ। হা মা দুর্গে, এ কি করলে!

(নারীগণের প্রস্থান)

ঈশান পলায়নোদ্যত; বিষম কোলাহল উঠিল।

৩। (ঈশানকে ধরিয়া) পালাচ্ছ কোথায় হে?

৪। মারো বেটাকে—দু-চার ঘা দাও।

প্রমথ। বিপিন, একবার দেখি গে এসো, কি হলো?

বিপিন। প্রমথ—

প্রমথ। কেন?

বিপিন। একটা উপায় আছে, করতে পারবে?

প্রমথ। কি?

বিপিন। এই গরিব বিধবার কন্যাদায় উদ্ধার করতে পারো শুধু তুমি!

প্রমথ। আমিও তাই ভাবছিলুম। কিন্তু বাবার সে বিয়ে কি সুখের হবে? নববিবাহিতা পত্নীকে সস্নেহ অমতে? সাদর অভ্যর্থনার বদলে একটা রুষ্ট অভিশাপ—

বিপিন। সে বিষয়ে ভেবো না। তোমার বাবার মত করাবোই আমি—যেমন করে পারি। এখনই চলুম।

(প্রস্থান)

১। চমৎকার হয় তাহলে।

পুরোহিত। মেয়েটি রূপে-গুণে লক্ষ্মী।

২। এমন মেয়েকে একটা বুষকাঠের গলায় বেঁধে দিচ্ছিল!

বধূবেশে সজ্জিতা আশার হাত ধরিয়া ভগবতীর প্রবেশ

ভগবতী। এই আমার দুঃখিনী মেয়ে। এর মুখের দিকে চেয়ে তোমরা উপায় করো, বাবা।

পুরোহিত। তোমার ভাবনা নেই মা—প্রজাপতি স্বয়ং বর এনে দিয়েছেন্।

সকলে। এখন ঘট্‌কাটাকে মারো। মারো শালাকে—

ঈশান। দোহাই মশায়, আমার দোষ নেই। আমাকে ছেড়ে দিতে বলো, মা—

ভগবতী। ওকে মেরে কি হবে বাবা? ছি, ওকে ছেড়ে দাও। ওর দোষ কি?

১। যা বেটা, বেঁচে গেলি।

ঈশান। নিশ্চয়—নিশ্চয়!—বাপ্, এখন পলায়ন দি বাবা।

(প্রস্থান)

সকলে। প্রমথর সঙ্গে আপনি বিয়ে দিন। যেমন মেয়ে, তেমনি জামাই হবে আপনার।

বিপিন ও প্রমথর পিতার প্রবেশ

বিপিন। প্রমথ—

প্রমথ। বাবা—

প্র-পিতা। বিপিনের মুখে আমি সব কথা শুনলুম। এ ক্ষেত্রে তোমার যদি আপত্তি না থাকে তো, এ বিবাহে আমারো কিছুমাত্র আপত্তি নাই। ব্রাহ্মণের এ দায় ব্রাহ্মণেরই উদ্ধার করা খুব উচিত।

ভগবতী। আমার এই একটিমাত্র মেয়ে। পৃথিবীতে আমাদের দেখবার কেউ নেই। শুধু ভগবান্ আছেন! এই মেয়েটির মুখ দেখে যদি আপনাদের কারো প্রাণে দয়া হয়—

প্রমথ। বাবা—

প্র-পিতা। আমি মোহে অন্ধ হয়েছিলুম, তাই সোনা-রূপোর ওজনটাই এত বেশী মনে জেগেছিল। প্রমথ, তুমি এই লক্ষ্মীকে গৃহলক্ষ্মী করো—মহাপুণ্য হবে, তুমি চিরসুখী হবে! এসো মা—(আশার মাথায় হাত রাখিয়া) আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, চিরসুখিনী হও। তুমি আমায় জ্ঞান দিয়েছ। এখন লগ্ন বয়ে যায়—ভটচায্যি মশাই, জোগাড় করুন।

ভগবতী। আমাদের আপনি কিনে রাখ্‌লেন! ভগবান্ আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন!

১। স্ত্রী-আচার সেরে নাও গো—

বিপিন। ওগো, শাঁখ বাজাও গো—শাঁখ বাজাও, বর এসেছে।

(নেপথ্যে হুলু ও শঙ্খধ্বনি)

২। যাও, বর নিয়ে যাও! আর দেরী করো না। এ কাপড়টা ছাড়িয়ে নাও গো, একটা চেলি-টেলি দাও।

সজ্জিত-বেশা রমণীগণের প্রবেশ

আ-মাতা। এসো মা,—তোমরা বর-কনেকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে এসো। আজ আমার মেয়ের শিবপুজো সার্থক হলো! শিবের মত বর পেয়েছে।

(প্রস্থান)

রমণীগণ। গীত

তুমি এসেছ, তুমি এসেছ!
মনে কি পড়েছে সখা, তাই চেয়ে হেসেছ।
গভীর তামসা রাতি, না ছিল তারার ভাতি—
রাঙা রবি ফুটে উঠে সে আঁধারে নেশেছ।
স্বপনের দেবতা হে কোথা ছিলে কোন্ দেশে
হৃদয়-আসনে আজি রাজা হয়ে বসেছ।
দয়া যদি হলো দুখে, বুকে রেখো, রেখো সুখে—
রেখো হাসি চাঁদ-মুখে, যদি তা ফুটায়েছ!

(সকলের প্রস্থান)

## দ্বাদশ দৃশ্য

বিষড়া—ষ্টেশনের পথ

এক দিক দিয়া ঈশানের দ্রুত এবং অপর দিক দিয়া বামনদাসের কুণ্ঠিতভাবে প্রবেশ—পরস্পরে ধাক্কা লাগিল; ও উভয়ের পতন।

ঈশান। কোথাকার কাণা রে বাপু—দেখে পথ চলতে পারো না? (উঠিয়া দাঁড়াইয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িল)

বামন। ওঃ, গেছি বাবা, গেছি, বুড়ো মানুষ—পা দুটো একেবারে গেছে। উহুহু—(উঠিবার চেষ্টা)

ঈশান। (ভাল করিয়া দেখিয়া) আরে কে? কর্ত্তা যে—উঠুন, উঠুন। (ধরিয়া উঠাইল)

বামন। এঁ্যা—ঈশেন! বাবা! কিছু মনে করো না, বাবা—মাথার ঠিক নেই, কাজেই দেখতে পাইনি।

ঈশান। যাক্, আপনার লাগেনি ত?

বামন। না, না,—এ কিছু নয়! তার পর খপর কি বাবা?

ঈশান। আপনার খপর কি, বলুন দেখি। সারা রাত্তির কোথায় ছিলেন? দেখুন দেখি, কি অনর্থপাতই করলেন। ছ্যা ছ্যা ছ্যা—

বামন। কেন বাবা, কি হয়েছে? বল, বল!

ঈশান। মাথামুণ্ডু কি-ই বা ছাই বলবো? কাল হাবড়া ষ্টেশনে আপনাকে গরুখোঁজা করেছি। শেষে কোন পাত্তা না পেয়ে ট্রেণে এসে এধার ওধার কম না হোক্ পঞ্চাশবার আপনার নাম ধরে ডেকে বেড়িয়েছি। তা কা কস্য পরিবেদনা! শেষে ট্রেণে চড়ে এখানে এসে ষ্টেশনে আপনার নাম ধরে আবার কত ডেকেছি! তার পর মেয়ের বাড়ী গিয়ে হাজির হলুম। সেখানে মার-ধোর বিস্তর দিয়েছে—গালাগালির কথাই নেই! আমার উপর বেশ ক'পশলা হয়ে গেছে। এই দেখুন, জামা ছিঁড়ে গেছে। মারের চোট্ দেখচেন? আচ্ছা, দেখে নেব বেটাদের—৩২৩ কি ৩৫২ ধারা ফৌজদারী পড়ে রয়েছে। আর এই ছেঁড়া জামায় ৪২৬ ধারাও হবে'খন! আপনার জন্য কম নাকাল হয়েছি, মশায়! তার পর ছিলেন কোথায়?

বামন। সেরোর কথা আর বলো কেন, বাবা? তুমি তো চলে গেলে, দেরী হচ্ছিল ফেরবার—এমন সময় এক-জন মুটে এসে আমায় তোরঙ্গ-শুদ্ধ একটা গাড়ীতে চাপিয়ে দিয়ে গেল।

ঈশান। বেশ তো, তার পর বিষড়েয় নেমে গেলেন কোথায়?

বামন। বিষড়ে পেলুম কি বাবা যে, নামবো! সে গাড়ী হাবড়া ছেড়ে একেবারে বর্দ্ধমানে গিয়ে দাঁড়াল। ষ্টেশন-মাষ্টার এসে টিকিট দেখে আমায় নামিয়ে নিলে।

ঈশান। এঁ্যা, আপনি পাঞ্জাব মেলে চড়েছিলেন নাকি?

বামন। আমি কি অত জানি, বাবা? বুড়ো মানুষ—পাছে গাড়ী ফেল হয় বলে সাবধান হতে গেলুম, না, উল্টে বিপদে পড়লুম।

ঈশান। তাইতো! তার পর?

বামন। তার পর আর কি! ষ্টেশনমাষ্টারটি লোক ভালো—আমার কথা শুনে আর কাকুতিতে গলে, তিনি আবার এক মালগাড়ীতে তুলে দিলেন আমাকে—সে গাড়ী এই আধঘণ্টাটাক হলো এখানে আমায় নামিয়ে দিয়ে গেছে।

ঈশান। হায়, হায়, হায়! দেখুন দেখি একবার কাণ্ডখানা! ইতোভ্রষ্টস্ততো নষ্ট! পয়সাকে পয়সা গেল, তার উপর এই অপমান! একেবারে যাকে বলে, প্যাজ-পয়জার!

বামন। যাক্ বাবা, এখন উপায় কি? এঁদের বাড়ী একবার চলো। পাঁজি দেখে আর একটা দিন-টিন ঠিক করা যাক।

ঈশান। আর দিন ঠিক করবেন কার জন্য? সে মেয়ে কি আর আছে?

বামন। কেন? মারা গেছে নাকি?

ঈশান। মারা যাবে কেন মশায়? সে মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ওখানকারই এক বড়লোকের ছেলে দয়া

করে সেই রাত্রেই তাকে বিয়ে করে ফেলেছে। সে রাত্রে বিয়ে কি পড়ে থাকে ?

বামন। তবে কি হবে, বাবা? এঁ্যা! (বসিয়া পড়িল) সাম্‌নে যে সর্ব্বনেশে পোসমাস!

ঈশান। আজ্ঞে, চেপে-চুপে থাকুন একটু। এই বড়দিনের ছুটিতে পাঁজিতে লিখ্‌ছে,আগাগোড়া সব ভালো দিন। ওরই একটায় লাগিয়ে দেবো। এখন উঠে পড়ুন। ঐ আবার বিস্তর লোক আসছে—ধরে যদি প্রহার দেয়! ও বাবা, এ যে দেখছি, প্রমীলার পুরী! হাতে আবার সবার অস্তর! পালিয়ে আসুন কর্ত্তা, পালিয়ে আসুন —তেড়ে লম্ফ দিন!

(সবেগে প্রস্থান)

বামন। ও বাবা, দাঁড়াও, দাঁড়াও। আমায় একলা ফেলে পালিয়ো না! আমি বুড়ো মানুষ, জানো তো—দৌড়তে পারবো না!

রঙ্গিনীগণের প্রবেশ; বামনদাসের পথ-রোধ করিয়া

গীত

আজি এসেছ, এসেছ, এসেছ বঁধু হে
বেলে চড়ে মাথা খেতে কাবি ?
দেখি তোমার এ বর-বেশ, হাসিব কি কাঁদিব!
বুঝিতে না পারি।
জোরে, দিব কি ও কাণ দুটি মলিয়া ?
ঝাঁটায়ে পিঠের ছাল তুলিয়া ?
মাথাটি কামায়ে ঢালিব ঘোল কি ? বাহাবিবে ভাবী।
মরি, দেখালে যে লীলা অপরূপ সে গো,
বেহায়ার শিরোমণি!
আজি সকালে, আবার ও-মুখ দেখালে, মনে না সরম গণি।
যদি এসেছ, লব অঙ্কিত করি তব ছবি।
প্রহসনে কালে যদি লেখে কোনো কবি,
কেমনে এ-যুগেও পঞ্চশরে খেলে খেলা মজাবি।

## যবনিকা

# রূপসী

নাটক

বান্ধব-সমিতি কর্ত্তৃক অভিনীত

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

## পাত্র ও পাত্রী

| | |
|---|---|
| নিরঞ্জন | মান্দার দুর্গাধিপতি |
| রূপসী | নিরঞ্জনের পত্নী |
| আর্য্যধন | নিরঞ্জনের বৃদ্ধ পিতা |
| দেবল | নিরঞ্জনের অধীনস্থ সৈন্যাধ্যক্ষ |
| কহ্লন | |
| বরাট | মোগল সেনাপতি |

# রূপসী

## প্রথম অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

[ নিরঞ্জন, দেবল ও কহ্লন মুক্ত বাতায়ন পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। মুক্ত বাতায়নের বাহিরে মান্দার গ্রামের অনেকখানি দেখা যাইতেছে ]

নিরঞ্জন। আর কোনো আশা দেখছি না। চারিধারে শত্রুসৈন্য! আমাদের সাহায্য করবার জন্য বুঁদেলা থেকে যে সৈন্য এলো, তারা শত্রুর ব্যূহ ভেদ করে গ্রামে পৌঁছুতে পারলো না! বুঁদেলার সেনা মান্দারের ওধারে অলস হয়ে বসে আছে।···উপায় নেই! নীল-পাহাড়ের ধার বেয়ে যে শীর্ণ পথ, সেখানেও শত্রুরা সজাগ পাহারা দিচ্ছে! আমাদের আর কোনো আশা নেই! পরিত্যক্ত উপায়হীন আমরা—খেয়ালী শত্রুর হাতে বন্দী হওয়া ছাড়া আর কোনো পথ দেখ্‌চি না। শত্রু এখন তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্য সব-চেয়ে কঠিন ভীষণ অভিসন্ধি আঁটচে—তাতে কোনো সন্দেহ নেই! বুঁদেলা সৈন্য পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত আছে। এ কথা বুঝছে না, আহার না পেয়ে মান্দারের এত বড় বাহিনী শত্রুর হাতে আত্মসমর্পণ করবে! অথচ এরা কি বিপুল বিক্রমে চদিন যুদ্ধ করে এসেছে—তিন মাসের অবিরাম যুদ্ধে শত্রু তাদের একতিল হঠাতে পারেনি! ধৈর্য্য তাদের অসীম, বীর্য্যের তুলনা নেই। স্বার্থত্যাগের এমন দৃষ্টান্ত আর কেউ কখনো পৃথিবীতে দেখিয়েচে কি না, জানি না! কিন্তু আজ অন্ন নেই! শত্রু এমন ব্যূহ রচনা করেছে, নিরন্ন উপবাসী সৈন্য তাদের হঠিয়ে আজ আর অন্নচেষ্টায় বেরুতে পারছে না। এমন অবস্থায় ক'দিন লড়া যায়? মান্দারের আশা নেই! ভিতরের এ খবর শত্রু যদি একবার জানতে পারে, তাহলে মান্দারের প্রাচীর আপনা-হতে তাদের গতির সম্মুখে মাথা হেঁট করে নুয়ে দাঁড়াবে! গড়ের দ্বার তাদের উদ্ধত পদাঘাতের আশঙ্কায় আপনাকে মুক্ত করে দেবে!

দেবল। আমার তূণ আজ শূন্য! একটি তীর নেই—বন্যপশু এসে আক্রমণ করলে, তাকে হঠাবার সাধ্যও নেই!

কহ্লন। আমার সৈন্যেরা আহার-অভাবে ধূলার উপর লুটিয়ে পড়েছে—তার উপর একটুকুরো বারুদ অবধি নেই।

দেবল। ওদিকে বরাটের কামান এখনো সঘন গর্জ্জন করছে। অস্ত্র নেই, আহার নেই—কিসের বলে শত্রুকে হঠিয়ে রাখা যায়?

কহ্লন। অথচ সন্ধির আশা—

দেবল। সন্ধি! ও নাম মুখে উচ্চারণ করলে বরাট উচ্চ হাস্য করে উঠবে! তার প্রতিহিংসা বাজের চেয়েও ভীষণ! তার নিষ্ঠুরতা সীমা জানে না!

নিরঞ্জন। তবু অন্নহীন মান্দারের মুখ চেয়ে, অপমান জেনেও আমি আমার বৃদ্ধ পিতাকে বরাটের কাছে পাঠিয়েছি, আমাদের অবস্থার কথা প্রকাশ করে বলতে বলেছি। এখনো তিনি ফিরলেন না!

দেবল। এক সপ্তাহ আমাদের কামান স্তব্ধ! ধনু থেকে তীর ছোটেনি—দুর্গের স্থানে স্থানে রন্ধ্র হয়েছে—তবু বরাট এসে দুর্গ অধিকার করছে না! দারুণ হত্যার আদেশ দিচ্ছে না! এতে আমার বিস্ময় বোধ হচ্ছে—সে কি সাহস হারিয়েছে? না, এ স্তব্ধতাকে আসন্ন প্রলয়ের সূচনা মনে করে স্থির হয়ে আছে?

কহ্লন। হয়তো সম্রাটের আদেশ পায়নি। তাই বরাট স্থির হয়ে বসে আছে। দিল্লীর মোগল-শক্তিকে এতখানি মেনে চলে বরাট! সম্রাটের আদেশের জন্য এতখানি সে সপ্রতিভ—অথচ শিশু বা নারীকে তোপে ওড়াতে তার বাধে না! অদ্ভুত-চরিত্র বরাট—একটা হেঁয়ালির রূপান্তর বলেই মনে হয়!

দেবল। শুনেছি, এই বরাটের জন্ম অতি ছোট বংশে। শুধু দৈহিক শক্তি আর দুঃসাহসের জোরে সে আজ মোগল-বাহিনীর অধ্যক্ষ, মোগল-সম্রাটের ডান হাত। শুনেছি, তার চরিত্র অতি বদ। সে নিষ্ঠুর, খেয়ালী—

নিরঞ্জন। নিমকহারাম নয়। সে মোগলের নিমক খেয়েছে এবং সে-নিমকের মর্য্যাদা রাখ্‌তে জানের তোয়াক্কা রাখে না।

কহ্লন। হতভাগ্য মান্দার! এ অবস্থায় তার হাতে আত্ম-সমর্পণ করা ছাড়া উপায়ও নেই!

নিরঞ্জন। তবু সবুর করো। সকলেই আমরা এমন কাপুরুষ নই যে, তুচ্ছ দুটি অন্নের জন্য শত্রুর কাছে মাথা নুয়ে দাঁড়াবো! সেজন্য বলি, একবার প্রচার করো,

যারা প্রাণের মায়া করে না, অন্নের জন্য নীচতাকে প্রশ্রয় দিতে রাজী নয়—তারা একবার আমাদের সঙ্গে মিশে জলোচ্ছ্বাসের মত ঐ শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ুক! এসো—একবার আমাদের শেষ শক্তি নিয়ে যুঝে দেখি—সমস্ত দেশের অন্ন লুঠে আনি—না পারি, শত্রুর তপ্ত নিশ্বাসে উবে যাবো! প্রাণ একবার যাবার—সে যাবেই। শত্রুর ঘৃণায়-দেওয়া দু মুঠো অন্নের জোরে এ-প্রাণ বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা না করে বরং একবার রুখে উঠে দেখি, এসো—যদি মরি, শত্রুর ঈর্ষাকুল বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে গৌরবের মুকুট মাথায় দিয়ে মরবো।

[ আর্য্যধনের প্রবেশ ]

এই যে পিতা! খবর কি? আপনি অক্ষত দেহে ফিরে এসেছেন! মোগল ভৃত্যের অস্ত্রচিহ্ন আপনার গায়ে দেখছি না! তারা আপনাকে বন্দী করলে না? আপনি ফিরে এলেন?

আর্য্যধন। না, পুত্র, তাঁরা কোন অত্যাচার করেনি। দেখলুম, তারা বর্ব্বর নয়, মানুষ। আমায় যথেষ্ট সম্মান করেচে। বরাট নতজানু হয়ে প্রণাম করলে·· জানো পুত্র, বরাটের শিবিরে কার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো?

নিরঞ্জন। মোগল সম্রাট?

আর্য্যধন। না। পণ্ডিত মাধবাচার্য্য। এত-বড় দার্শনিক ভারতে এ যুগে জন্মগ্রহণ করেছেন কি না সন্দেহ! দর্শনের সুগভীর জটিল তর্ক এমন সহজ কথায় অল্প সময়ের মধ্যে বুঝিয়ে দিলেন শুনে সামান্য একটা প্রহরী অবধি মুগ্ধ হয়ে গেল। তিনি বোঝাচ্ছিলেন, আত্মার কথা। অর্থাৎ···

নিরঞ্জন। থাক্ পিতা—দর্শনের কথা শোনবার এখন আমাদের অবসর নেই। এত-বড় সৈন্যের দল একটু আহারের জন্য অধীর উন্মুখ হয়ে আছে—তাদের আহারের কোন উপায় হলো কি না, জানতে পেলে মুগ্ধ হয়ে যাবে—আত্মার সংবাদ তারা চায় না!

আর্য্যধন। কিন্তু এই আত্মা অবিনশ্বর।

নিরঞ্জন। সে অবিনশ্বরত্ব দর্শনের পাতায় আঁটা থাকুক! এখানে ত্রিশ হাজার লোক অন্নাভাবে মরতে বসেছে—অবিনশ্বর আত্মা তাদের নশ্বর দেহে এতটুকু ভরসা দিতে পারবে না—মুহূর্ত্ত-বিলম্ব তাদের সহ্য হবে না! অন্নের কি উপায় হলো, তাই বলুন। বরাট কি চায়? আমাদের শির? না, হিন্দু নারীর নারীত্ব? বলুন—ঐ শুনুন, নীচে বুভুক্ষু সৈন্যের উন্মত্ত চীৎকার। চেয়ে দেখুন, তারা ঐ কঠিন কর্কশ শিলা-লগ্ন তৃণগুচ্ছ খাবার জন্য পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করছে—

আর্য্যধন। আমি ভুলে গেছলুম, পুত্র! বসন্তের এই স্নিগ্ধ শ্যাম সৌন্দর্য্য, পাখীর এই কলগান, ঐ নির্ম্মল-নীল আকাশ—এ-সবের মধ্যে ভুলে গেছলুম, যে প্রকাণ্ড একটা যুদ্ধ চলেছে! মানুষের প্রাণের যে বাঁধন, তা কেটে ছিঁড়ে ফেলবার জন্য দু'দিকে দু'দল সৈন্য শুধু হিংসায় ফুঁশছে, আর অস্ত্র শানাচ্ছে! মানুষের বুকে যে অমল শুভ্র আনন্দ শতদলের মত ফুটে আছে, তাকে রক্তে রাঙা করে দেবার জন্য তোমরা সকলে মিলে শুধু অবসর খুঁজচো। না, ঠিক বলে—ক্ষুধার্ত্ত সৈন্যের আর্ত্ত চীৎকার·· শোনো তবে· আমায় যে জন্য পাঠিয়েছিলে—তার কি করে এসেছি, শোনো। ত্রিশ হাজার প্রজার জন্য আমি জীবনের আশ্বাস বয়ে এনেছি। কিন্তু—না, সে তুচ্ছ একজন—একজনের দুঃখ। ত্রিশ হাজারের সুখের সামনে—কিছুই নয়! একদিকে ত্রিশ হাজার আর্ত্ত নর-নারীর প্রাণ—আর একদিকে একজনের বুক-ভাঙ্গা যাতনা। শোনো পুত্র·· কিন্তু সে কথা শুনলে তুমি উন্মাদ হয়ে যাবে—হয়তো এক-নিমেষে প্রাণহীন পাষাণ-শিলায় পরিণত হবে! বুঝে দেখ, পুত্র—শুনতে পারবে? সে শক্তি তোমার—কিন্তু মনে রেখো, ওদিকে ত্রিশ হাজার আর্ত্ত নর-নারীর অমূল্য প্রাণ···

নিরঞ্জন। (বিরক্ত চিত্তে) দেবল, কহ্লন, তোমরা অন্তরালে যাও।

আর্য্যধন। না, না, থাকো। তুমি, আমি, দেবল, কহ্লন, সকলেই এই ত্রিশ হাজার নর-নারীর অন্তর্গত। তবে! সমস্ত নগর এসে এখানে সমবেত হোক্—যেখানে রাজ্যের যত ক্ষুধার্ত্ত জীবন-ভিখারী হতভাগা আছে, সকলকে ডেকে এনে এখানে দাঁড় করাও—সকলের সুমুখে চীৎকার করে আমি বলি, ওরে দুর্ভাগা, জীবন-কামীর দল, আমি তোদের জীবন দান করবো—প্রকাণ্ড আশ্বাস বয়ে এনেছি!

নিরঞ্জন। আমরা তিন জন এই ত্রিশ হাজারের প্রতিনিধি। বলুন পিতা, কি সংবাদ, যত কঠিন হোক, আমরা অকম্পিত চিত্তে তা শুনবো, ভীত হবো না।

আর্য্যধন। তবে তাই হোক। বরাটকে দেখলুম—তার যে ছবি এখানে বসে তোমরা এঁকেচো, তা ঠিক নয়—দেখলুম তার বিপরীতই। তোমাদের আঁকা ছবি থেকে আমি ভেবেছিলুম, গিয়ে বরাটকে দেখবো, একটা উচ্ছৃঙ্খল, বর্ব্বর, রক্তপিপাসু দানব। যুদ্ধের জন্য উন্মত্ত, ভদ্রতার ধার ধারে না! শ্রদ্ধা, প্রীতি, মায়া, মমতাহীন এক দুর্বৃত্ত!

নিরঞ্জন। সে মোগলের দাস।

আর্য্যধন। কিন্তু ভদ্র। নিমকহারাম নয়—নিমকের মর্য্যাদা রাখে! শান্ত, গম্ভীর, বিনীত মূর্ত্তি!—আমার শুভ্র শির দেখে নতজানু হয়ে সে প্রণাম করলে—আতিথ্যে এতটুকু ত্রুটি রাখেনি। তবু আমি তার শত্রু।

নিরঞ্জন। বৃদ্ধ বয়সে আপনার মতিভ্রম হয়েছে—তাই এ সঙ্গীন সময়েও শত্রুর স্তুতি করতে ইতস্তত

করচেন না! ওদিকে ত্রিশ; হাজার নর-নারী ক্ষুধার্ত্ত, বিপন্ন—

আর্য্যধন। তবে শোনো পুত্র—মান্দার ধ্বংস করাই মোগলের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য-সাধনের ভার বরাটের উপর। বরাট বীর। সে চায় যুদ্ধ করে মান্দার দখল করতে—মোগল চায়, কৌশলে! তাই বরাটের অনুপস্থিতিতে মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ মুলতব খাঁর কৌশলে মান্দার অতর্কিতে অবরুদ্ধ। তিন মাস মুলতবের লোক শুধু নজর রেখে আসছে—বাহির থেকে এতটুকু খাবার কি রসদ যেন মান্দারে না আসে! তাই তোমরা মান্দার থেকে যখন হাজার তোপ দেগেছ—মোগল তখন শুধু পাঁচটা জবাব দিয়েছে। তোমরা মোগলের মতলব বোঝোনি। তার পর তোমাদের গোলাগুলি যখন ফুরিয়ে গেছে, আহার-অভাবে তোমরা বিপন্ন নির্জীব, তখন মুলতব খাঁ তোমাদের গড়দখলের জন্য উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু বরাট এ-তত্ত্ব জানতে পেরে তা হতে দেয়নি! মুলতব খাঁ দিল্লীশ্বরের আদেশ প্রার্থনা করেছে, বরাটও মুলতবের নামে নালিশ করেছে—তার অধীনস্থ মুলতব খাঁ বরাটের মর্য্যাদা রাখেনি, বীরত্বের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছে! বরাট চায়, মান্দারকে যুদ্ধে জয় করবে—খাদ্যাভাবে শীর্ণ মৃত শব মাড়িয়ে সে মান্দারে প্রবেশ করতে চায় না।

নিরঞ্জন। উদারতার অনুগ্রহ! কিন্তু এতে তার উদ্দেশ্য থাকতে পারে।

দেবল। থাকতে পারে কি! উদ্দেশ্য আছে।

কল্যাণ। খুব গভীর মতলব—না হলে বিধর্ম্মীর দাস হবে কেন?

আর্য্যধন। তোমাদের জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে। মহত্ত্বকে সন্দেহ করলে নিজের অধঃপতনের পরিচয় দেওয়া হয়!

নিরঞ্জন। যাক। তার পর—

আর্য্যধন। আমার মুখে মান্দারের সংবাদ শুনে বরাট বিস্মিত হলো। অস্ত্র-শস্ত্র আর প্রচুর আহার এখনি সে পাঠাতে প্রস্তুত—সম্রাটের আদেশের অপেক্ষা করবে না।

নিরঞ্জন। এত মহৎ! নিশ্চয় উদ্দেশ্য আছে।

দেবল। গভীর উদ্দেশ্য! বাদশার আদেশ নেবে না? তাহলে তার মাথা থাকবে?

আর্য্যধন। উপায় নেই। বাদশার কাছ থেকে সে আদেশ আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে গেলে, এধারে এ হতভাগ্য ক্ষুধার্ত্তদের প্রাণ থাকবে না যে! বাদশার কাছে তার জন্য কৈফিয়ৎ দিতে সে প্রস্তুত! আপাততঃ তিনশ' গাড়ী ভরে আহার আর অস্ত্রশস্ত্র সে পাঠাতে চায়।

নিরঞ্জন। আশ্চর্য্য!

আর্য্যধন। কিন্তু—

নিরঞ্জন। কিন্তু কেন?

আর্য্যধন। এবার প্রস্তুত হও পুত্র,—খুব কঠিন কথা শুনতে হবে। এ উপকার সে করবে, কিন্তু মূল্য চায়।

নিরঞ্জন। তাই বলুন, মূল্য চায়! এ তার রহস্যময় মহত্ত্ব! আর উদারতার অর্থটুকু বোঝা গেল! বলুন, কি মূল্য চায়?

আর্য্যধন। সে চায়, কিশোরী রূপসী তার শিবিরে গিয়ে আজ রাত্রি যাপন করবে—

নিরঞ্জন। রূপসী!

আর্য্যধন। আমার পুত্রবধূ।

নিরঞ্জন। পিতা—( অস্ত্র তুলিতে উদ্যত )

আর্য্যধন। শোনো…

নিরঞ্জন। আপনি পিতা!

আর্য্যধন। হা বৎস, তোমার পিতা, পুত্রের গর্ব্বে গর্ব্বিত পিতা আমি। আর তুমি আমার পুত্র, একমাত্র পুত্র, আমার মাতৃহারা পুত্র!

নিরঞ্জন। রূপসী! কিন্তু মান্দারে সহস্র রূপসী নারী আছে…

আর্য্যধন। তাদের যাবার কথা বলো নি!… মনে রেখো পুত্র, মান্দারের স্বাধীনতা! মনে রেখো ত্রিশ হাজার আর্ত্ত নর নারীর অমূল্য প্রাণ।

নিরঞ্জন। মান্দার রসাতলে যাক্! ত্রিশ হাজার নর-নারীর প্রাণ ভস্মীভূত হোক। রূপসী! আমার স্ত্রী, সহধর্ম্মিণী…

আর্য্যধন। তুমি প্রাণ দিয়েও মান্দারকে রক্ষা করতে চাও।

নিরঞ্জন। তাই রূপসীকেও তার মান, আর নারীত্ব বিসর্জ্জন দিতে হবে?

আর্য্যধন। রূপসী তোমার সহধর্ম্মিণী…

নিরঞ্জন। আমি তার স্বামী! কিন্তু মান্দার আমার কে? মান্দার আমি চাই না।

আর্য্যধন। কিন্তু এই সঙ্গিন মুহূর্ত্তে মান্দারকে তুমি ত্যাগ করবে? মান্দার যখন আজ…

নিরঞ্জন। নিজের প্রাণ দিয়ে যদি মান্দারকে রাখতে পারতুম, রাখতুম! কিন্তু ধর্ম্ম …

আর্য্যধন। মান্দার তোমার দেশ! এই মান্দারকে মোগলের পায়ে ফেলে দেবে পুত্র! যে-মান্দার তোমার মাথায় গৌরবের মুকুট পরিয়েছে…

নিরঞ্জন। না, মান্দার কেউ নয়—মান্দার জড় মাটি। কিন্তু রূপসী…

আর্য্যধন। এই জড় মান্দার আজ তোমারই মুখ চেয়ে আছে, পুত্র…

নিরঞ্জন। তবে কি মান্দার চায়, তার জন্য আমার ধর্ম্ম, আমার পত্নীর মান, সম্ভ্রম, মর্য্যাদা, নারীত্ব—সব আমি বিসর্জ্জন দেবো? বলুন, মান্দার তাতে সুখী হবে? মান্দার তবু মুখ ফুটে বলবে—হাঁ, দাও তোমার ধর্ম্ম, তোমার পত্নীর ধর্ম্ম, সব দিয়ে আমায় রক্ষা করো?

আর্য্যধন। যদি সে বলে, একদিকে একজনের ধর্ম্ম, মান, সুখ, আর-এক দিকে ত্রিশ হাজার আর্ত্ত নর-নারীর প্রাণ? ভেবে দ্যাখো পুত্র···

নিরঞ্জন। অসম্ভব! ঢের ভেবেচি! না, তা হতে পারে না। মান্দার যদি এমন নীচ হয়, এমনি হেয় উপায়ে আপনাকে সে রক্ষা করতে চায় তো আমি তাকে এতটুকু সাহায্য করতে প্রস্তুত নই। তাছাড়া আমার নিজের উপরই নিজের অধিকার আছে। রূপসীকে আমি কোন মুখে বলবো, দাও, আমার সাধের মান্দারের জন্য তুমি তোমার নারীত্বকে বলি দাও। দিয়ে পতির কীর্ত্তি উজ্জ্বল করো, সতী!

আর্য্যধন। যদি রূপসী বলে, মান্দারকে আমি রক্ষা করবো?

নিরঞ্জন। রূপসী বলবে! ঐ পণে? পিতা, আপনি বাতুল হয়েছেন! রূপসীকে আমি জানি না? রূপসী আমার স্ত্রী। তার মন···

আর্য্যধন। রূপসী আমার মা। আমিও তাকে জানি, পুত্র। জানি, কত উচ্চ, কত মহৎ তার প্রাণ··

নিরঞ্জন। একে মহত্ব বলে না, পিতা। এ কাপুরুষতা—দারুণ ক্লৈব্য।

আর্য্যধন। আর রূপসী যদি বলে, ত্রিশ হাজার নর-নারীর প্রাণের জন্য, মান্দারকে রক্ষা করবার জন্য এ মূল্য সে দিতে প্রস্তুত?

নিরঞ্জন। (উচ্চ স্বরে) পিতা, আমি যোদ্ধা হলেও মানুষ। আমারও সহ্য করবার একটা সীমা আছে। পিতৃ-হত্যার অপরাধে অপরাধী করবেন না···

আর্য্যধন। একবার রাজা রামচন্দ্রের কথা মনে করো পুত্র,—প্রজার মঙ্গলের জন্য তিনি আপনার প্রাণ-অংশ ছিন্ন করেছিলেন, লক্ষ্মীস্বরূপিণী সীতা-দেবীকে বিনা-দোষে বর্জ্জন করেছিলেন।

নিরঞ্জন। রামচন্দ্রের মহত্ব রামচন্দ্রের থাক্, পিতা! আমি সামান্য মানুষ, অত উচ্চ আদর্শ সহ্য আমার হবে না।

আর্য্যধন। প্রকৃতিস্থ হও, পুত্র। রূপসী এ মূল্য দিতে চায়।

নিরঞ্জন। চায়?

আর্য্যধন। হাঁ চায়।

নিরঞ্জন। সে তবে সব শুনেচে? কে তাকে এ কথা বললে?

আর্য্যধন। আমি বলেচি।

নিরঞ্জন। আপনি!···না···থাক্! শুনে সে কি বললে? বললে, সে বরাটের শিবিরে যাবে?

আর্য্যধন। না।

নিরঞ্জন। তবে? তবে?

আর্য্যধন। মুখে সে কোনো কথা বলেনি। এ কথা শুনে মুখ তার পাণ্ডু হয়ে গেল—সমস্ত অবয়বে যেন মৃত্যুর ছায়া নেমে এলো! সে নীরবে সে-স্থান ত্যাগ করলো!

নিরঞ্জন। সরলা—রূপসী! কিন্তু শুনুন পিতা, এ মূল্য দিয়ে মান্দারকে রক্ষা করা হবে না। মান্দার যদি তবু তাই চায়, তবে তার সে-স্পর্দ্ধার শাস্তি আমি দিতে জানি, এ কথা মনে রাখবেন! এই নীচ মান্দারকে তাহলে নিজের হাতে আমি ধ্বংস করবো! যে মান্দারকে নিজের হাতে গড়ে তুলেচি, নিজের হাতে এমন করে যে মান্দারকে সাজিয়ে—সেই মান্দারকে গুঁড়িয়ে চূর্ণ করে দেবো। দেবল, কহ্লন, আমার এই বাতুল পিতাকে বন্দী করো! সতর্ক থেকো—ক্ষিপ্ত মান্দার যেন তাঁকে না দ্যাখে, এ প্রস্তাব মান্দারের কানে না ওঠে!

আর্য্যধন। মান্দার সব শুনেচে, পুত্র। মান্দার ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে বলেচে, সতীর সতীত্বের মূল্যে প্রাণ সে কিনতে চায় না। রূপসীকেও তারা সে কথা বলেচে।

নিরঞ্জন। এই তো আমার মান্দারের যোগ্য কথা! কিন্তু আমার অসাক্ষাতে এতখানি গোপন ষড়যন্ত্র, গোপন পরামর্শ চলেচে, আশ্চর্য্য! অকৃতজ্ঞ মান্দার আমার অসাক্ষাতে এ-সবের আলোচনা শেষ করে ফেলেছে! অথচ এই মান্দারের মঙ্গল আমি চিরদিন সাধন করচি, তপস্বীর নিষ্ঠায়!—আমার কাছে তার জন্য মান্দারের এতটুকু ঋণ নেই? প্রাণ কি এত বড়—সে-প্রাণ কি এমনই রাখবার যোগ্য যে, এই জঘন্য—

(বাহিরে কোলাহল) কিসের কোলাহল?

দেবল। ক্ষুধার্ত্ত মান্দারের চীৎকার।

নিরঞ্জন। সব আলোচনা শেষ করেও মান্দার আবার এখন কি চায়?

আর্য্যধন। তারা আমার কাছে দরবার করতে এসেচে। নির্জ্জীব মান্দার আমার মার পায়ে তাদের ভক্তি জানাতে এসেচে।

নিরঞ্জন। কি স্পর্দ্ধা! নারী আর বৃদ্ধ মিলে মান্দারকে চালাবে! কেন, আমি কি মরেচি? অকৃতজ্ঞ মান্দার, এমন হীন কৌশলে স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীকে সে আজ ছিনিয়ে নিতে চায়? বুঝেচি, এ ষড়যন্ত্র, চারিধারে ভীষণ ষড়যন্ত্র—বেড়া-পাকে আমায় ঘিরতে চায়!···দেবল, বন্ধু, আমার পিতাকে বন্দী করো—

এ ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি করেচে এই বৃদ্ধ। তাকে বন্দী করো! তারপর অকৃতজ্ঞ মান্দারকে আমি একবার দেখতে চাই!

[ উন্মত্তভাবে বাহির হইয়া গেল ]

## দ্বিতীয় দৃশ্য

মান্দার দুর্গের উপরিতলস্থ চত্বর;
নিম্নে মান্দারের মুক্ত প্রান্তর।
ক্ষুধার্ত্ত নর-নারীর আর্ত্ত কোলাহল শুনা যাইতেছে।

নিরঞ্জন ও আর্য্যধন

নিরঞ্জন। মান্দারের পথ-ঘাট পঙ্গপালের মত মানুষে ছেয়ে গেছে!

আর্য্যধন। ক্ষুধার জ্বালায় মাটী আঁকড়ে পড়ে সব প্রাণ দিচ্ছে। মা কোল থেকে ছেলেকে ছুড়ে ফেলচে, স্বামী স্ত্রীর টুঁটি টিপে ধরচে। অসহ্য দৃশ্য।

নিরঞ্জন। তুচ্ছ প্রাণের জন্য মায়া-মমতা, স্নেহ দয়া অকাতরে সব বিসর্জ্জন দিচ্ছে! একবার ভাবচে না··

আর্য্যধন। ভাববার অবসর নেই, পুত্র। মৃত্যুর বাঁশী বেজে উঠেচে। সে বাঁশীর সুরে মানুষ পাগল হয়, তার কোন জ্ঞান থাকে না!

নিরঞ্জন। এই উন্মাদ প্রাণীর দলকে ঠেকিয়ে রাখা শক্ত, দেখচি।

আর্য্যধন। ঐ যে একদল লোক দুর্গের দিকে এগিয়ে আসচে।

নিরঞ্জন। চালাও তোপ। দেবল—

আর্য্যধন। স্থির হও, পুত্র! তুমিও উন্মাদ হয়ো না। ওরা কি বলে, শোনো···

নিরঞ্জন। বাতুলের প্রলাপ শুনতে হবে?

আর্য্যধন। ঐ শোনো অভাগাদের আর্ত্তনাদ।

[ একদল লোক চীৎকার করিয়া উঠিল—"এক টুকরো রুটি দাও"—"চাই না দেশ—" "ভাঙ্গো কেল্লা," "প্রাণ যায়—" "খাবার দাও গো—খাবার", "বাঁচাও মা" ]

নিরঞ্জন। এদের স্পর্দ্ধা দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছি। ক্ষিপ্ত হয়ে এরা এই দুর্গের দিকেই ছুটে আসচে। এ স্পর্দ্ধা এদের প্রাণে আপনিই জাগিয়েচেন, পিতা। এর জন্য ক্ষমা···

আর্য্যধন। ক্ষমা করো না, পুত্র। আমায় বন্দী করো, হত্যা করো। তুমি যদি আজ আমি হতে পুত্র।··· পুত্রের হাতে-গড়া এই সোনার দেশ, পুত্রের প্রাণ-দিয়ে-জাগিয়ে-তোলা এই অসংখ্য নর-নারী—নিরঞ্জন, গর্ব্বে আমার বুক ফুলে উঠচে!

[ চীৎকার—"মার কাছে আমরা দরবার করতে এসেছি। তুমি শুধু আমাদের বাঁচাতে পারো, মা—জননী গো, বাঁচাও, অন্ন দিয়ে বাঁচাও, আমাদের।" ]

শুনচো? এক উপায়, শুধু এক উপায় আছে, পুত্র।

নিরঞ্জন। কাপুরুষ, বৃদ্ধ, তুমি পিতা! শাস্ত্র বলে, পিতাকে ভক্তি করো, ভালোবাসো। সে এই পিতা! পুত্রের জীবনের সমস্ত আলো বিদ্রূপের ফুৎকারে যে নিবিয়ে দিতে চায়, পুত্রের পুণ্যময় শুভ্র জীবনে কলঙ্কের কালি যে লেপে দিতে চায়, সেই পিতা! অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস। এর চেয়ে রাক্ষসকে শ্রদ্ধা করা সহজ, নির্ম্মম ঘাতককেও বোধ হয় ভালোবাসতে পারি!··· আশ্চর্য্য! এই পিতাকে দেবতার মত এত দিন ভক্তি করে এসেচি, এঁর আদর্শে নিজেকে গড়বার চেষ্টা করেচি।

আর্য্যধন। ভুল করেচো, পুত্র। তবু শোনো, আমি বৃদ্ধ হয়েচি, অনেক দেখেচি, অনেক শিখেচি। মায়া, মমতা, ভালোবাসা সুখ, দুঃখ, তোমার চোখে যে মূর্ত্তিতে ধরা দিচ্ছে, আমার বহুকালের জীর্ণ ক্ষীণ দৃষ্টিতে আমি আজ তাদের অন্য মূর্ত্তি দেখচি। আমার মনের মধ্যে এখন কি স্রোত বয়ে চলেচে! কত মিথ্যা সংস্কার, মায়ার জঞ্জাল, সে স্রোতে ভেসে যাচ্ছে, আর তার জায়গায় কি আলো, কি সত্য জীবন্ত হয়ে জেগে উঠচে, তা যদি তুমি দেখতে, পুত্র।

নিরঞ্জন। চুপ!—রূপসী।

আর্য্যধন। মা। আমার মা। এসো মা—

( রূপসীর প্রবেশ )

রূপসী। পিতা, এ আর্ত্ত চীৎকার আর আমার সহ্য হয় না। আমি যাবো। যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেচি আমি। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন—বৃদ্ধ দধীচি নিজের অস্থি দান করে দেবতাদের রক্ষা করেছিলেন, আমি সামান্য নারী,—আমার কোনো শক্তি নেই—বড় দুর্ব্বল আমি।

আর্য্যধন। তুমি শক্তিময়ী, সতী, অন্নপূর্ণা, এই ক্ষুধার্ত্তদের মুখে অন্ন তুলে দাও মা। আমি আশীর্ব্বাদ করচি, মা, কীর্ত্তিমান স্বামীর কীর্ত্তি তুমি উজ্জ্বল করো! আমারও জীবন সার্থক হোক্!

নিরঞ্জন। রূপসী, এ তুমি কি বলছ? কোথায় যাবে?—কিসের জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেচ তুমি?··· আমি তোমার চোখের পানে চেয়ে আছি—কি দেখচি, জানো? ঐ চোখে তোমার নির্ম্মল সরল দৃষ্টি—শান্ত, উজ্জ্বল বিভা!···নির্ব্বোধ মূঢ়ের দল—কীট এরা মাটীর, মাটীতে মিশিয়ে দেওয়াই এদের যোগ্য শাস্তি। মিথ্যা মোহে এই মাটীর কীটগুলোকে আমি মানুষ করবো,

ভেবেছিলুম! আমার এই তরুণ জীবনের জ্বলন্ত উৎসাহ দিয়ে আমি আকাশে প্রাসাদ গড়তে উদ্যত হয়েছিলুম! স্বপ্ন, কেবলই স্বপ্নে ভেসে বেড়িয়েচি… কিন্তু আর নয়, এবারে জেগেচি! আর মিথ্যা নয়, মোহ নয়, এবার কঠিন সত্যকে প্রাণপণে বুকে চেপে ধরেচি! এই সব অকৃতজ্ঞ পশু…এদের সুখের জন্য নিজের আরাম, বিলাস—সব ত্যাগ করেছিলুম! অন্যায় করেচি! সেই অন্যায়ের আজ প্রায়শ্চিত্ত করবো—এই সব অধম পশুকে পৃথিবীতে ছেড়ে রাখলে মনুষ্যত্ব এখানে লোপ পাবে—পশুত্ব প্রবল হয়ে উঠবে! তার অবসর দেওয়া হবে না। তোপের মুখে আজই এদের উড়িয়ে দেবো। একটি তোপ—রূপসী, শুধু একটি তোপের ওয়াস্তা!

রূপসী। এ কি বলচো স্বামী? মাটী চষে বেড়াতো এরা—মনুষ্যত্ব, বীর্য্য, মহত্ত্ব, কিছুই জানতো না। আজ এদের প্রাণে মনুষ্যত্বের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলে—এই মরু-প্রান্তরে এমন সোনার দেশের প্রতিষ্ঠা করে, আজ—

নিরঞ্জন। একটি ফুৎকারে উড়িয়ে দেবো! ভুল, ভুল করেছিলুম! আর নয়। নীচতাকে বাড়তে দিতে পারি না!

আর্য্যধন। মা, তোমার অন্ধ স্বামীকে দৃষ্টি দান করো—আশীর্ব্বাদ করি, তার দেশের মুখ উজ্জ্বল করো। (প্রস্থান)

রূপসী। নাথ…

নিরঞ্জন। কি বললে, রূপসী? এখন বলো, যা শুনছিলুম এতক্ষণ, এই অস্পষ্ট আভাসে—তা সত্য নয়—স্বপ্ন,—শুধু দুঃস্বপ্ন? বলো—

রূপসী। অনুমতি দাও, নাথ!

নিরঞ্জন। অনুমতি! কিসের অনুমতি চাচ্ছ, রূপসী?… তুমি বুঝতে পেরেচো? বলো, স্পষ্ট করে বলো, আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি না—আমার সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, যেন কিসের ঝড় বয়ে চলেছে, উদ্দাম ঝড়!

রূপসী। আজ রাত্রে আমি বরাটের শিবিরে যাবো।

নিরঞ্জন। তুমি তাকে হত্যা করতে চাও? তাই তো, এ কথা আমার মনে হয় নি—রূপসী। কিন্তু… না, ভয়ঙ্কর গোল বাধবে!…তুমি কি করে ফিরে আসবে? ক্ষিপ্ত পশুর দল…মান্দারের সে শক্তি কৈ? সে পশুর গ্রাস থেকে তোমাকে উদ্ধার করবে, তেমন লোক-বল মান্দারের দেখচি না তো! তবে?…বিষ? হাঁ, কিন্তু তেমন বিষ—পেয়েচো তুমি? খুব তীব্র জ্বালাময় বিষ…নীরবে যা…

রূপসী। কিন্তু এ হত্যায় তোমার মান্দার তো রক্ষা পাবে না, নাথ! মান্দার অন্ন চায়, তাকে অন্ন যোগাতে হবে।

নিরঞ্জন। পাপিষ্ঠা, সত্যই তবে তুমি অভিসারে যেতে চাও?

রূপসী। (মলিন মৃদুহাস্য) তিরস্কার করচো! করো,—কিন্তু অনুমতি দাও!

নিরঞ্জন। রূপসী…

রূপসী। নাথ…

নিরঞ্জন। তুমি বরাটকে ভালোবাসো?

রূপসী। আমি তাকে কখনো চোখেও দেখিনি।

নিরঞ্জন। তার শৌর্য্যের কাহিনী শুনে মুগ্ধ হয়েচো?

রূপসী। বিশ্বাস করো, নাথ, রূপসী চিরদিন তোমারই শৌর্য্য-কাহিনী শুনে এসেচে। তারি ধ্যানে রূপসী তন্ময়।

নিরঞ্জন। তবে শোনো, বরাট তরুণ যুবা—সুপুরুষ! শৌর্য্য তার অসীম—বিধর্ম্মী হলেও সে মোগলের ডান হাত!

রূপসী। ও সব শোনবার প্রয়োজন নেই, নাথ!

নিরঞ্জন। রূপসী,—না, বাতুলের মন্ত্র ভুলে যাও। এসো, আমরা পালিয়ে যাই…দুজনে! যেখানে হোক, লোকালয় ছেড়ে সুদূর বনে…চলো, চলো। মানুষ বড় নীচ, বড় হিংস্র, বড় পাষাণ—পরের সুখ সে সহ্য করতে পারে না—তার হিংসা হয়! কাজ নেই আমাদের এমন লোকালয়ে থেকে। চলো, গাছের ছায়ায়-ঘেরা শ্যামল কুঞ্জে বসে দুজনে প্রেমালাপ করবো, দুজনে দুজনের কাণে প্রাণের গান অজস্র শুনিয়ে যাবো!… এতদিন তোমার পানে ফিরে তাকাইনি,—রণোন্মাদনায় তোমার এই নববিকশিত যৌবনকে উপেক্ষা করে এসেচি। তার জন্য অভিমান করো না, প্রিয়ে। এখনও সময় আছে; বেশী বিলম্ব হয় নি! যৌবন এখনো পালিয়ে যায়নি। চলো, সে সমস্ত অবহেলা-ত্রুটি প্রাণ দিয়ে শোধ করবো। এখানে বাহিরের তুচ্ছ কোলাহল অনেক শুনেছি, মানুষ অনেক দেখেছি। আর নয়—বড় শ্রান্ত হয়েচি, রূপসী—চলো! এখানে কি সুখ? সুখ পাইনি। সুখ নেই। শুধু নেশায় মেতেছিলুম! এখানে নিত্য দ্বন্দ্ব—নিত্য হিংসার গর্জ্জন—নিত্য অহঙ্কারের আস্ফালন!…চলে এসো, অভিমান করে দাঁড়িয়ে থেকো না।

রূপসী। অভিমান! কিসের অভিমান নাথ? কোনদিনই আমি অভিমান করিনি! তুমি কঙ্কালে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করছিলে, আমি গৃহের কোণে বসে মুগ্ধ নয়নে তাই দেখছিলুম। গর্ব্বে আমার ছোট মন ভরে উঠছিল। তাই আমি আজ এমন করে বেরিয়ে আসতে পেরেচি। মনে আমার কোনো দ্বিধা, কোনো সঙ্কোচ নেই! তোমার সাধের মান্দার—সেই মান্দারের সেবা যদি করতে পারি…

নিরঞ্জন। না, রূপসী, কিছু করতে হবে না। আর কাজ নেই কিছু করে! এসো আমার সঙ্গে, চলো, দুজনে চলে যাই!

রূপসী। কিন্তু এখন যে যাবার উপায় নেই। কর্ত্তব্যকে এমন ভাবে তুমি বলি দেবে?

নিরঞ্জন। কর্ত্তব্য। কিসের কর্ত্তব্য? কার উপর কর্ত্তব্য, রূপসী?

রূপসী। তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না, নাথ! সময় যায়। ঐ দ্যাখো, সন্ধ্যা হয়ে আসচে—এতগুলো নর-নারীর প্রাণ তোমার একটি ইঙ্গিতের অপেক্ষায় রয়েচে—তাদের রক্ষা করো প্রিয়!

নিরঞ্জন। রূপসী, তুমি এমন নিষ্ঠুর হতে পারো! এ-সব কথা বলতে তোমার কষ্ট হচ্ছে না?

রূপসী। বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে, নাথ। আমি বড় দুর্ব্বল, তুমি আমায় শক্তি দাও। এ বড় কঠিন কাজ নাথ, জানি, কিন্তু তবু এ কাজ করতেই হবে। দাও, অনুমতি দাও···( পায়ে হাত দিল )

নিরঞ্জন। অনুমতি! অনুমতি দেওয়া এতই সহজ ভাবো, নারী? তুমি বুঝচো না। এত দিন আমার বুকের মধ্যে থেকে, আমার সকল চিন্তা, সকল স্বপ্ন, সকল আশা তন্ন তন্ন করে দেখে বুঝেও আমার দিকে চেয়ে অম্লান বদনে তুমি বলচো, অনুমতি দাও!···আমার বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে—তোমারও যাচ্ছে, বলচো—এ যদি সত্য হয়, তবে আর কেন এ নিষ্ঠুর আঘাত করো, রূপসী?

[ নিম্নে কোলাহল—"মাগো, বাঁচাও—দয়া করো মা" ]

রূপসী। ঐ, ঐ শোনো, অভাগাদের করুণ কাতর আর্ত্তনাদ! না, আমার সহ্য হচ্ছে না। দাও, অনুমতি দাও। এ-ছাড়া আর যে কোন উপায় নেই!

নিরঞ্জন। কোনো উপায় নেই—তাই এই বর্ব্বর কুৎসিত প্রস্তাব শিরোধার্য্য করতে হবে? এত বড় অধর্ম্মকে আশ্রয় করে নীচ কতকগুলো পশুর প্রাণ বাঁচাতে হবে? ওঃ, ভগবান···না, ভগবান নেই, থাকলে এ কুৎসিত কথা সে-দুর্বৃত্তের মুখ থেকে বার হবার আগে তার মাথায় বাজ পড়েনি? এত বড় অধর্ম্ম বিজয়-গর্ব্বে নিজের কাজ হাসিল করে যাবে?···না, কখনো না। আমি থাকতে কখনো তা হতে দেবো না। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পাপ, পুণ্য সব আজ সমূলে ধ্বংস করবো! এই সব হতভাগা কাপুরুষের দল—পা দিয়ে চেপে এদের মেরে ফেলবো। কহ্লন, বন্ধু, দাগো তোপ···

রূপসী। স্থির হও—( হাত ধরিল )

নিরঞ্জন। ( সবলে হাত ছাড়াইয়া ) না, ছেড়ে দাও, রূপসী—মিথ্যা এ অভিনয়ের প্রয়োজন নেই!···এই সব বর্ব্বরের দল—এদের কারো ঘরে নারী নেই? স্ত্রী নেই, ভগ্নী নেই, মা নেই—যে, নারীর নারীত্বের মূল্যে জীবন রাখতে অনায়াসে উদ্যত হয়েচে? এদের তুমি বাঁচাতে বলো, রূপসী?—এদের নিশ্বাসে বাতাস কলুষিত হয়, মনুষ্যত্ব পুড়ে ছাই হয়ে যায়···দ্যাখো, তোমার নিজের পানে একবার চেয়ে দ্যাখো, এদের নিশ্বাসে তুমি পাষাণ হয়ে গেছ! তোমার দৃষ্টি অকম্পিত, চোখে এক ফোঁটা জল নেই!···উঃ, এই কি পৃথিবী! আমার চারিধারে শুধু ভীষণ মরু ধূ-ধূ করচে—মায়া নেই, মমতা নেই, কিছু নেই, শুধু হিংসার জ্বলন্ত ক্ষুধা—প্রচণ্ড বিশ্ব-গ্রাসী ক্ষুধা···( সহসা দুই হাতে রূপসীর হাত চাপিয়া ধরিয়া ) রূপসী, একদিন তুমি আমায় স্বর্গ-সুখ দিয়েছিলে! আজ তবে—

রূপসী। নাথ ( হাত ধরিল, স্বর বাষ্পার্দ্র হইল )

নিরঞ্জন। ( হাত ছাড়াইয়া ) না, আর নয়, ঐ কোমল হাতের স্পর্শে আর আমি ভুলচি না। পিতার কথা ঠিক। তিনিই তোমাকে ঠিক চিনেছেন! তুমি পাষাণী! আমি যৌবন-মদের নেশায় বিহ্বল হয়ে ছিলুম—তোমায় চিনিনি, জানিনি!···থাক্, আর কেন? তুমি যেতে পারো—তোমায়-আমায় কোন সম্পর্ক নেই। মিথ্যা আর অনুমতির দোহাই দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা কেন করচো? যাও, তুমি যাও···

রূপসী। মুখ ফিরিয়ো না। চেয়ে দ্যাখো নাথ, আমার মনের মধ্যে একবার চেয়ে দ্যাখো। ভুল বুঝো না। তোমার হাতে-গড়া মন্দার—প্রাণের মন্দার—আমার সে যে কি—কতখানি সে আমার বুকে—(অশ্রু-মার্জ্জনা করিল )

নিরঞ্জন। আর মায়া নয়, রূপসী। আমি দুর্ব্বল নই, উন্মাদ হইনি—বেশ স্থির হয়ে আছি! চোখের জলে আর গলবো না। তোমার কোনো ভয় নেই, তুমি যাও। ভেবো না নারী, নির্ব্বোধের মত নিজেকে আমি হত্যা করবো! তেমন মতিভ্রম আমার হয়নি। কেন? একটা নারী—তার লাবণ্য-ভরা প্রলোভন-ঘের দেহের জন্য? হাঁ, শুধু দেহ! মন···? কোথায় মন—নারীর মন! কবির কল্পনা!···নিজের উপর ঘৃণা হচ্ছে—এতদিন এই তুচ্ছ খেলনা নিয়ে খেলা করেচি! যাও, যাও রূপসী—অভিসারিকা নারী, অভিসারে যাও···

রূপসী। নাথ—

নিরঞ্জন। না, রূপসী, না। দুঃখ আমার নেই! নদীর যে স্রোত চলে যায়, তাকে আর ফেরানো যায় না। যা গেল, তা আর ফিরবে না! ভ্রূ-বিলাসে নিরঞ্জন আর ভুলবে না।

রূপসী। বড় ভুল বুঝচো তুমি! কি করবো? আমায় যেতেই হবে। যদি ফিরি···ফিরে এসে তোমায় বোঝাবো, নাথ—[ স্বর বাষ্পরুদ্ধ হইল ]

নিরঞ্জন। যদি ফিরি!···ঐ মুখ নিয়ে আবার তুমি ফিরবে? সে সাধ আছে? বেশ, ফিরো···সে এক চমৎকার দৃশ্য হবে। আমিও যোগ্য বেশে সজ্জিত থাকবো,—তখন আর এক নূতন অঙ্কের অভিনয় সুরু হবে—দেখবার কৌতূহল হয়!

রূপসী। আসি নাথ। আশীর্ব্বাদ করো—না, কোন প্রার্থনা নিয়ে যাবো না, শুধু ঐ পায়ের ধূলো।

[নিরঞ্জনের পদধূলি লইতে গেল; নিরঞ্জন পা সরাইয়া লইয়া প্রস্থান করিল]

আমায় ভুল বুঝলে নাথ! যদি আমার মনের মধ্যে একবার চেয়ে দেখতে!

(ধীরে ধীরে প্রস্থান)

# দ্বিতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

মোগল-শিবিরের সম্মুখস্থ প্রান্তর।

বরাট ও ভানু। ভানু—বরাটের অনুচর।

ভানু। দিল্লী থেকে পত্র এসেছে। বাদশাজাদাও এসেছেন। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।

বরাট। (পত্র-গ্রহণান্তে) বড় জরুরি খবর আছে, বলো।

ভানু। বাদশাজাদা শিবিরে অপেক্ষা করছেন।

বরাট। অপেক্ষা করছেন! এ যে খোদ বাদশার পাঞ্জার ছাপ দেখচি। হাতের লেখা। বাদশাজাদা নিজের হাতে লিখেছেন। মহম্মদের কাজ। (পত্র-পাঠান্তে) আমার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ। মোগল মুলতব খাঁ মান্দার দখল করতে চেয়েছিল, হিন্দু আমি তাকে বাধা দিয়েচি; পরিশ্রান্ত শত্রুকে বল সংগ্রহের প্রচুর সুযোগ দিয়ে আমি অলস হয়ে বসে আছি। তাই আদেশ হয়েচে, ফৌজের ভার বাদশাজাদার হাতে দিয়ে আমাকে দিল্লীতে ফিরে আমার আচরণের কৈফিয়ৎ দিতে হবে।··· এ গভীর ষড়যন্ত্র ভানু, অতি নীচ চক্রান্ত!· ভেবেচে, ভয়ে কম্পিত হয়ে নতশিরে গিয়ে আমি সেখানে দাঁড়াবো,—একজন হীন অপরাধীর মত!·· ভুল বুঝেচে! এত দিনেও মোগল আমায় চেনেনি, দেখচি।

ভানু। বাদশাজাদা দেখা করতে চান—

বরাট। ও! মহম্মদ নিজে এসেছে! আর কারো হাতে চিঠি পাঠাতে ভরসা পায়নি! ভেবেচে, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমায় চমকে দেবে! গর্দ্দভ!··· বেশ! এই মুখোমুখি দেখায় অনেক জঞ্জাল সাফ হয়ে যাবে, মোগল আমার সঠিক পরিচয় পাবে! এই কাপুরুষ মহম্মদ···

ভানু। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

বরাট। তাইতো! আর্য্যধন এখনো ফেরেনি—না? তাহলে আমার প্রস্তাবে ওরা রাজী! নাহলে বৃদ্ধ ফিরে আসতো।...সীমানায় আমাদের বিশ্বস্ত প্রহরী খাড়া আছে তো? তাকে বলে রেখেচো, এক নারী আমার শিবিরে আসতে চাইলে, তো, কেউ যেন তাতে বাধা না দেয়, সসম্মানে যেন এখানে নিয়ে আসে?

ভানু। লালসিং আর গুজারী সীমানার প্রান্তে পাহারা দিচ্ছে। আপনার আদেশ তাদের জানিয়েছি।

বরাট। লালসিং আর গুজারি! তারা আমার জন্য জান্ দিতে পারে, জানি, তবু···তুমিও যাও ভানু, অলক্ষ্যে থেকে এই নারীকে সঙ্গে নিয়ে এসো। আর রসদের গাড়ী তৈরি আছে—যা-যা বলেছি? সে নারী শিবিরে পা দেবামাত্র যেন ঐ সব গাড়ী মান্দারে যায়—খুব হুঁশিয়ার প্রহরী সঙ্গে দিয়ো। তারা যেন কোন রকম অভদ্রতা সেখানে না করে। অত্যাচার হলেও নীরবে সব সহ্য করবে, এমন লোক সঙ্গে দিয়ো।···ঐ দূরে মান্দার দুর্গের উপর নক্ষত্রের মত একটা আলোর বিন্দু ফুটে উঠেছে, না? সন্ধ্যার অন্ধকারে তারার মত ঐ জ্বল্ জ্বল্ করচে? হাঁ, ঠিক। সম্মতির সঙ্কেত।···এই ক্ষণটুকুর জন্য কত দিন থেকে প্রতীক্ষা করে আছি! আমার কৈশোরের স্বপ্ন সফল হবে,·· তা কি সম্ভব! উচ্ছৃঙ্খল দুর্বৃত্ত মস্ত অবলম্বন পাবে।···ভানু, তুমি যাও, মহম্মদকে আমার সেলাম দাও গে—আর বনবীরকে আমার শিবিরের বাহিরে সতর্ক থাকতে বলে দিয়ো।

(ভানুর প্রস্থান)

মোগল ভেবেচে, চোখ রাঙিয়ে বরাটের সব সঙ্কল্প ভেস্তে দেবে। বড় বুদ্ধিমান মোগল, আর বরাটকে সে ভেবেচে, নির্বোধ বালক!

(মহম্মদের প্রবেশ)

আসুন শাহজাদা, সেলাম।

মহম্মদ। সেলাম।

বরাট। আসতে আপনার পথে কোনো কষ্ট হয়-নি?

মহম্মদ। না। সেনাপতি, দূরে ঐ মান্দার দুর্গের উপর একটা আলো দেখা যাচ্ছে। আমাদের ফৌজ ও আলো দেখে চঞ্চল হয়েছে। আপনি জানেন, হঠাৎ ও আলো কেন দেখা যায়?

বরাট। আপনার কি মনে হয়, কোনো সঙ্কেত?

মহম্মদ। নিশ্চয়! আরও মনে হয়, ও আলোর সঙ্গে মোগল সেনাপতির কোন সম্পর্ক আছে! সেই কথাই আমি বলতে এসেছি।

বরাট। বলুন, আমিও শোনবার জন্য প্রস্তুত।

মহম্মদ। বরাট—

বরাট। 'সেনাপতি' বলবেন, শাহজাদা।

রণক্ষেত্র, শাহজাদার মজলিস নয়। এ সব আদব-কায়দা মেনে চলবেন, শাহজাদা।

মহম্মদ। সেনাপতি বরাট, আপনি বাদশার পত্র পড়েছেন? তাঁর আদেশ জানেন?

বরাট। হঠাৎ আমাকে এতখানি নির্ব্বোধ ঠাওরাচ্ছেন কেন, শাহজাদা! আমি লেখা-পড়া জানি এবং আমার নামের পত্র আমি নিজেই পড়ি—তার অর্থ পড়েও বুঝতে পারি। এ পত্র আমি পড়েছি, এবং পড়ে বুঝেছি, এ একটা অত্যন্ত ঘৃণ্য চক্রান্ত চলেছে আমার বিরুদ্ধে। আরও বুঝেছি, সে চক্রান্তের মূলে আছেন, —আপনি।

মহম্মদ। আমি!

বরাট। আপনি।

মহম্মদ। কিন্তু মুলতব খাঁ গিয়ে বাদশার দরবারে গুরুতর অভিযোগ জানিয়েছেন। জানিয়েছেন, ক্ষুদ্র মান্দার যখন যুদ্ধে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে, তার গোলা-বারুদ সব ফুরিয়ে গেছে, খাদ্যের অভাবে মান্দার একেবারে নির্জীব, তখনই মান্দার-অধিকারের সুন্দর সুযোগ—আপনি সে সুযোগ উপেক্ষা করে দিব্য অলস হয়ে বসে আছেন। এই কি মোগল-সেনাপতির যোগ্য কাজ? নিমকের···

বরাট। সাবধান হয়ে কথা বলবেন, শাহজাদা। বালকের চাপল্যেরও একটা সীমা আছে! এ যুদ্ধে সেনাপতি আমি, মুলতব নয়, আপনিও নন। আর আমার উপর সে-বিশ্বাস না থাকলে এত বড় মোগল-বাহিনীর ভার বাদশা আমার উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত হতেন না! আমার জায়গায় মুলতবকেই তিনি সেনাপতি করে পাঠাতেন।

মহম্মদ। বাদশা ভুল করেছিলেন, তখন আপনাকে চিনতে পারেন নি। এখন চিনেছেন। আপনি কত বড় বিশ্বাসঘাতক—

বরাট। রসনা সংযত করো, বালক। আমারও রক্ত-মাংসের শরীর। আমি বৃদ্ধ নই। রক্ত আমার সহজেই গরম হয়ে ওঠে।

মহম্মদ। চোখ-রাঙানিতে ভয় করি না, সেনাপতি। মনে রাখবেন, আমি ভাবী মোগল-সম্রাট!

বরাট। আপনিও মনে রাখবেন, মোগল সাম্রাজ্য আমার একটা ক্রুদ্ধ নিশ্বাসে আমি উড়িয়ে দিতে পারি!

মহম্মদ। এ উত্তম, সেনাপতি।

বরাট। বালক, তোমার সঙ্গে তর্ক করতে আমার লজ্জা হচ্ছে! কিন্তু শোনো, তুমি অতি নির্ব্বোধ, তাই মুলতবের কথায় এতখানি নৃত্য করে উঠেচো! মুলতবের সঙ্গে তোমার যে চিঠি-পত্র চলেছে, জেনো, সে সব আমার হাতে এসেচে। মোগল আমায় ভয় করে! আমার সাহস, আমার বীরত্বে সে ভীত, তাই সে আমায় বাধা দিতে চায়! মোগলের ভয় হয়, কি জানি, আমার এ সাহস পাছে কোনদিন দিল্লীর বাদশাহী-তখ্‌তের দিকে আমায় চালিত করে!···চমকে উঠবেন না, শাহজাদা——আমি মোগলকে চিনি। সে একজন বিধর্ম্মীকে বড় হতে দিতে চায় না,—এ আমি জানি! কিন্তু মনে রাখবেন শাহজাদা, বরাটকে মোগল বড় করেনি, বরাটই মোগল শক্তিকে প্রসারিত বিস্তৃত করে দিয়েছে। দিল্লীর তখ্‌তের দিকে কোনদিন যদি বরাটের লক্ষ্য থাকতো, তাহলে বালক মহম্মদ আজ আমার সামনে মাথা তুলে দাঁড়াবার সুযোগ পেতো না, জানবেন, সে আমার পাদুকা সাফ করতে পেলে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করতো!

মহম্মদ। এত স্পর্দ্ধা! (সহসা তরবারি টানিয়া বরাটকে আঘাত করিল; বরাট চকিতে সে আক্রমণ হঠাইতে গেলে তাহার চোখের নীচে একটা চোট্ লাগিল এবং রক্ত-ধারা বহিল)

বরাট। (সবলে মহম্মদের তরবারি কাড়িয়া লইয়া) এ আঘাতের জন্য প্রস্তুত ছিলেম না, আমি। বীর মোগল···(মহম্মদকে ভূমে নিক্ষেপ করিয়া, তরবারি উঠাইল) এখন···?

মহম্মদ। আমায় মেরে ফ্যালো বরাট, আমি এ ঘৃণ্য জীবন নিয়ে আর একদণ্ড বাঁচতে চাই না।

বরাট। বরাট বীর—ঘাতক নয়। সে হিন্দু। করতল-গত শত্রুকে সে হাসি-মুখে মাপ করতে পারে! (মহম্মদকে ছাড়িয়া) উঠে দাঁড়াও, মহম্মদ। যদি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবার সাধ থাকে, তাহলে সময়ান্তরে সাক্ষাৎ করো। তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করবো।·· কিন্তু শোনো এখন,—যদি বাদশাহী করবার বাসনা থাকে, মনকে বড় করো—নীচ, হীন, জঘন্য ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়ো না। খল, হিংস্র পরিজনের চাটুবাদে আত্ম-বিস্মৃত হয়ো না! বাদশাহী মন নিয়ে বাদশাহীর কামনা করো।·· শোনো মহম্মদ, বরাট নিমকের মর্য্যাদা রাখে—সে বিশ্বাসঘাতক নয়। আমি যদি আজ অবসর পেয়ে মান্দার অধিকার না করে থাকি তো জেনো, তার মধ্যে আমার গভীর উদ্দেশ্য আছে—জেনে রেখো, বরাট মুখে যে কথা দেয়, কাজেও তা করে! কোনো প্রলোভনে সে কথার খেলাপ করে না। সেই সঙ্গে আরো মনে রেখো, বরাট প্রকাণ্ড যোদ্ধা হলেও সে মানুষ! সময়ে সব বুঝতে পারবে—একটু ধৈর্য্য রেখো শুধু।

মহম্মদ। তাহলে বাদশার কাছে যে কৈফিয়ৎ তলব হয়েচে···

বরাট। সে কৈফিয়ৎ বরাট দেবে! তুমি নিশ্চিন্ত থাকো—বালক। আর সেই সঙ্গে এই কাটা দাগও

অনেক কথা বলবে। ( মহম্মদ গমনোদ্যত )···যেয়ো না, দাঁড়াও। তোমার ঔদ্ধত্যের দণ্ড নিতে হবে, শাহজাদা। আপাততঃ যুদ্ধ-শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আপনি আমার বন্দী। কুতব—( জনৈক প্রহরীর প্রবেশ ) তুমি আর জহর শাহজাদার জন্য দায়ী। শাহজাদা আমার বন্দী। আমার আদেশ-ছাড়া তিনি বন্দীশালা ত্যাগ করতে পাবেন না। বুঝলে? আমার আদেশ।

মহম্মদ। এতদূর!

বরাট। অতি লঘুদণ্ড, শাহজাদা। আপনি বালক, তাই আপাতত এইটুকুই যথেষ্ট হবে, মনে করি।

( মহম্মদ ও কুতবের প্রস্থান )

উদ্ধত বালক। এই ঔদ্ধত্য মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস করবে। এই সন্দেহই মোগলকে টিঁকে থাকতে দেবে না, এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এই নীচতা, এই হীন চক্রান্ত···

( ভানুর প্রবেশ )

ভানু। আপনি শাহজাদাকে বন্দী করেচেন?

বরাট। হাঁ। বালকের ঔদ্ধত্যকে একটু সিধা করতে চাই।

ভানু। কিন্তু এতে বিপদ ডেকে আনচেন···

বরাট। বিপদ!···ভানু, বিপদকে যদি বরাট ভয় করতো, তাহলে আজ পৃথিবীতে বরাটের চিহ্ন থাকতো না। যাক্—আজ এখন আর অন্য কথা নয়—ওদিককার খপর কি, ভানু? সে আসচে?···সারা জীবন ধরে এই ক্ষণটুকুর স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছি। কখনো ভাবিনি, এ ক্ষণটুকু সত্য হয়ে ফুটবে।··· ভানু—( নেপথ্যে বন্দুকের শব্দ ) ও কি। বন্দুকের আওয়াজ কেন?: যাও, যাও, কেউ বাধা দিতে যাচ্ছে না কি?

ভানু। না, আমাদের বন্দুক। এ কি—আপনার চোখের নীচে রক্ত!

বরাট। মহম্মদ আঘাত করেছে।

ভানু। মহম্মদ।

বরাট। হাঁ, অতর্কিত আঘাত। তাকে ক্ষমা করেচি—নাহলে বাদশা এতক্ষণে পুত্রহীন হতেন।···ঐ যে আলো দেখা যায়—কাছেই। ভানু, সে এসেচে—

ভানু। এক নারীর অস্পষ্ট ছায়া দেখতে পাচ্ছি।

বরাট। সে এসেচে। যাও, ভানু যাও, সসম্মানে তাকে আমার শিবিরে নিয়ে এসো। দেখো, যেন কোন রকমে অমর্য্যাদা না হয়!

( ভানুর প্রস্থান ; বরাটের শিবিরাভ্যন্তরে প্রবেশ )

## দ্বিতীয় দৃশ্য

মোগল-শিবির। বরাটের কক্ষ।

বরাট আসীন ; রূপসীর প্রবেশ

বরাট। এসো রূপসী!···এ কি তোমার হাতে রক্ত।

রূপসী। কাঁধে একটা গুলি লেগেছিল।

বরাট। গুলি লেগেছিল! কোথায়? কখন্? আমাদের শিবিরে? এইমাত্র বন্দুকের আওয়াজ শুনলুম। সে তবে—কিন্তু কার এ স্পর্দ্ধা হলো?

রূপসী। লোকটা পালিয়ে গেল।

বরাট। তোমার খুব লেগেচে? যন্ত্রণা হচ্ছে?

রূপসী। না।

বরাট। আঘাত সামান্য নয় তো! দেখি, ওষুধ দি।

রূপসী। কোনো প্রয়োজন নেই! এ সামান্য আঘাত। ( ক্ষণেক স্তব্ধতা )

বরাট। তুমি তাহলে এসেচো রূপসী! কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি, এই যে এসেচো, এ তোমার নিজের ইচ্ছায়?

রূপসী। হাঁ।

বরাট। কেউ জোর করে পাঠায় নি?

রূপসী। না।

বরাট। জানো, কি সর্ত্তে এসেচো তুমি?

রূপসী। জানি।

বরাট। তবু এসেচো। আমি বিস্মিত হচ্ছি।··· অচঞ্চল মনে এসেচো তুমি!

রূপসী। এমন সর্ত্ত ছিল না সেনাপতি যে আমার মনের চাঞ্চল্যটুকু সেখানে রেখে আসবো।

বরাট। তোমার স্বামী—দুর্গাধিপতি আসবার অনুমতি দেছেন?

রূপসী। হাঁ।

বরাট। ভেবে দ্যাখো রূপসী, এখনো সময় আছে। ইচ্ছা হলে তুমি ফিরে যেতে পারো।

রূপসী। না।

বরাট। ফিরবে না! আশ্চর্য্য! জিজ্ঞাসা করতে পারি, কেন এ-সর্ত্তে রাজী হলে?

রূপসী কেন? না-হলে ক্ষুধার জ্বালায় একটা বিকাশমান জাতি সমূলে ধ্বংস হয়। আমার স্বামীর কীর্ত্তি অকালে লোপ পায়।

বরাট। এ-ছাড়া আর কোনো কারণ নেই? এই কলঙ্ক মাথায় নিয়ে, আপনাকে এভাবে বলি দিতে···

রূপসী। এ-ছাড়া আর কোন কারণ নেই সেনাপতি! ···কিন্তু এত কৈফিয়ৎ দেবার সর্ত্ত বোধ হয় ছিল না!

বরাট। রাগ করো না। আমি শুধু আশ্চর্য্য হচ্ছি··· এমন উচুঁ প্রাণ।···কিন্তু এখনো আমার সন্দেহ হচ্ছে, এক জন সাধ্বী এমনভাবে···

রূপসী। বলেচি, আমি তর্ক করতে আসিনি, সেনাপতি। তা ছাড়া কোন কথার জবাব দেওয়া না দেওয়া আমার ইচ্ছা।

বরাট। এমন পতিগত-প্রাণা! আশ্চর্য্য!

রূপসী। নারীর হৃদয় নিয়ে ব্যঙ্গ করো না, সেনাপতি! আমার অন্তরাত্মা জানে···

বরাট। অন্তরাত্মা! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!···যাক্, আসবার সময় আমাদের শিবিরের সম্মুখে দেখেচো, গাড়ী-ভরা খাদ্য, গাড়ী-ভরা অস্ত্র-শস্ত্র, সজ্জিত রয়েছে?

রূপসী। দেখেচি।

বরাট। এ-সমস্ত এই মুহূর্ত্তে মান্দারে পাঠানো হবে। আমার সঙ্কেত পেলেই ওরা রওনা হবে।···কিন্তু ভেবে ছাখো রূপসী, এখনো সময় আছে—ইচ্ছা হলে তুমি ফিরতে পারো।

রূপসী। আমি সর্ত্ত রক্ষা করতে এসেচি, সেনাপতি, চাতুরী করতে আসিনি।

বরাট। তুমি আমায় বড়ই বিস্মিত করেচো! এ সমস্ত প্রহেলিকা বলে আমার মনে হচ্ছে! কিন্তু সে সব কথা থাক্!···যখন এসেচো···বেশ, (বংশীধ্বনি করিল) এইবার ওরা রওনা হোক্! আহার আর অস্ত্র যা পাঠানো হচ্ছে, মান্দার তাতে প্রাণ পাবে, নব বলে বলী হবে, যুদ্ধে নিশ্চয় জয়লাভ করবে!···তুমি চোখে দেখতে চাও—গাড়ী রওনা হলো কি না?

রূপসী। হাঁ।

বরাট। তবে এসো এই শিবিরের দ্বারে। (পর্দ্দা তুলিয়া ধরিল) ঐ ছাখো—

[অদূরে অস্পষ্ট আলো দেখা গেল,—এবং সেই সঙ্গে অস্ত্র-শস্ত্র এবং আহার্য্যে-ভরা অসংখ্য গাড়ী মান্দার-অভিমুখে চলিতে সুরু করিয়াছে, তাহাও দেখা গেল]

মান্দার আজ তার জঠর-জ্বালা ভুলবে! কাল প্রত্যুষে নব বলে বলী হয়ে মান্দার দুর্দ্ধর্ষ মূর্ত্তিতে জেগে উঠবে!··· সুগভীর জয়ের উল্লাসে সারা মান্দার প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠবে—আর তার জন্য ধন্যবাদ দেবে সে কাকে, জানো? তাদের রাণী বিজয়িনী রূপসীকে!··· দেখলে? এখন তুমি খুশী হয়েচো?

রূপসী। হাঁ।

বরাট। এসো তবে, রূপসী। এইবার এইখানে এসে বসো! যদিও তোমার যোগ্য স্থান এখানে নেই—এ শিবির—তবু এই জানলার পাশে বেদীর উপরে এসো।···বেশ শান্ত রাত্রি! মৃদু জ্যোৎস্না ফুটে উঠেচে—এইখানে বসো। জ্যোৎস্না তোমার সারা অঙ্গে লুটিয়ে পড়ুক! জ্যোৎস্নার ফুটে ওঠা সার্থক হোক্।···কিন্তু হাঁ,···তোমার সঙ্গে কোনো অস্ত্র-শস্ত্র নেই তো? বুকে ছুরি লুকিয়ে রাখনি?

রূপসী। না।

বরাট। বিষ?

রূপসী। এত ভয়! সন্দেহ হলে তল্লাস নিতে পারো।

বরাট। সন্দেহ! না। আর ভয়? মৃত্যুর ভয় বরাট কখনো করে না। তবে—তোমার জন্যই সতর্ক হতে চাই।

রূপসী। আমার জন্য ভয় করবার প্রয়োজন নেই। আমার কাছে আমার চেয়ে আমার মান্দারের মূল্য অনেক

বরাট। এ তোমার ভুল, রূপসী! যাক্, আমি মিছে তর্ক করতে চাই না! এসো—এই জানলার পাশটিতে এসে বসো—বাহিরে জানলার ধারে অজস্র ফুল ফুটে উঠেছে, পাহাড়ী ফুল—সন্ধ্যার বাতাসকে মৃদু গন্ধে আকুল করে তুলেছে। এ গন্ধ আমার বড় ভাল লাগে। এ গন্ধে মন অতীতের অনেক হারানো সুখের স্মৃতি কুড়িয়ে পায়।···(রূপসী জানালার কাছে আসিয়া বসিল)···ঐ ছাখো, আকাশে একটু ছোট্ট ফালি চাঁদ উঠেছে—কি শান্ত জ্যোৎস্না চারিধারে ঢেলে দিয়েছে! তোমার মুখে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে—সুন্দর দেখাচ্ছে! (রূপসী মুখ নত করিল; বরাট কিছুক্ষণ একদৃষ্টে রূপসীর পানে চাহিয়া থাকিয়া গাঢ় স্বরে ডাকিল) হাসি—(রূপসী চমকিয়া উঠিল) মনে পড়ে, হাসি? সে আজ কত—কত দিনের কথা··· সেই ঝরণার ধারে ছোট্ট কুটীর—কুটীরের পাশ দিয়ে শীর্ণ রেখায় তরল রূপার মত জলের ধারা তর্ তর্ করে বয়ে যায়—আশে-পাশে গাছের ছায়ায় পাখীর গান—দূরে রাখাল ছেলেরা বাঁশী বাজায়, খেলা করে!···উঃ, তার পর সারা জীবনের উপর দিয়ে কি ঝড় বয়ে গেছে! নৈরাশ্যের বাজ কি হুঙ্কার দিয়ে ফিরেছে! সমস্ত প্রাণ আমার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে—কিন্তু···(একটু থামিয়া থাকিয়া) আমার হাসিকে তারা তো এ বুকের মধ্য থেকে ছিনিয়ে নিতে পারেনি তো।

রূপসী। ও-নাম কি করে জানলে? কে তুমি?

বরাট। আমি! তুমি অবাক হচ্ছো, হাসি, আমায় চিনতে পারচো না?··· ঐ নাম শুনে কাকেও আজ তোমার মনে পড়চে না? কি করে চিনবে তুমি! ফুলের মত তার কোমল শুভ্র মন তুমি দেখেছিলে! আর আজ! ফুল নেই, তার একটি দলও নেই—আছে শুধু পাষাণ, পাষাণ, কঠিন পাষাণ, হাসি।···কিন্তু বিশ্বাস করো, এ পাষাণের গায়ে যদি কোনোদিন কোন অঙ্কুর ফুটে উঠে আজ-পর্য্যন্ত

অটুট থাকে তো সে সেই অতীতের স্মৃতি—হাসি, সে তোমার স্মৃতি!

রূপসী। আমায় তুমি চেনো? আমার সে ছেলেবেলাকার নাম ধরে ডাকলে! কিন্তু···

বরাট। আশ্চর্য্য হয়ো না, হাসি···সারা জীবন ভরে ধ্যান করে আসচি আমি! নিজের ধ্যানের মূর্ত্তিকে মানুষ কখনো ভুলতে পারে?···এখনো তুমি চিনতে পারচো না?

রূপসী। (সন্দিগ্ধভাবে চাহিয়া) না। তুমি···?

বরাট। আমি কিন্তু ভুলিনি! মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিনি! হতভাগা আমি একটা ঢেউয়ে কূল ছেড়ে কোথায় কতদূরে সরে পড়লুম—তার পর আজ আবার আর-এক ঢেউয়ে যদি সেই কূলের কাছে এসে পৌঁছেচি, তো সে-কূলে আমার ঠাঁই নেই। বারো বৎসরে অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে আমার, কিন্তু তুমি ঠিক তেমনি আছো, হাসি! এতটুকু তফাৎ নয়। সেই নির্ম্মল সরল দৃষ্টি, সেই ভুবন-ভুলানো শ্রী।

রূপসী। কে তুমি?

বরাট। মনে পড়ে হাসি, সেই তোমাদের কুটীরের সামনে ছোট্ট বাগানটুকুর কথা? একদিন বিকেলে এক যুবা সেই বাগানে গাছে ফল পাড়তে উঠেছিল, আর তুমি ঝরণার ধারে বসে কাঁদছিলে, ঝরণার জলে তোমার আংটি পড়ে গেছলো—তুমি খুঁজে পাচ্ছিলে না। যুবা গাছ থেকে নেমে তোমার কাছে এলো,তার পর ঝরণার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তোমার আংটি খুঁজে তুলে আনলে, তোমার হাতে সে আংটি সে পরিয়ে দিলে। তোমার জল-ভরা ডাগর চোখদুটি তুলে তুমি তার পানে চেয়ে দেখলে···তার পর—তার পর, হাসি—

রূপসী। মুঞ্জা।

বরাট। হাঁ, মুঞ্জা। মনে আছে? সেই মুঞ্জাই বরাট।

রূপসী। মুঞ্জা! তুমি মুঞ্জা? (বরাটের পানে চাহিয়া) হাঁ, মুঞ্জাই বটে! কপালের উপর সেই তিল। আমি লক্ষ্য করিনি, তাই চিনতে পারিনি।

বরাট। এখন চিনেচো, হাসি? (হাসিল)

রূপসী। এবার চিনেছি। তুমি বীর, অনেক নরহত্যা করেচো তুমি, কিন্তু তোমার হাসিটুকু এখনো তেমনি শিশুর মত সরল রেখেচো তো···এ কি? তোমার চোখের নীচে রক্ত!

বরাট। ও কিছু নয়—সামান্য একটু চোট লেগেচে মাত্র!

রূপসী। না, না, সামান্য নয়! এসো, আমি বেঁধে দি। (নিজের বস্ত্রাংশ ছিন্ন করিয়া ক্ষতস্থানে বাঁধিয়া দিল) এ কাজ তোমারই জন্য শিখতে হয়েচে। এ যুদ্ধে এই হাতে অনেক আহতের শুশ্রূষা করতে হয়েচে।···বারো বৎসর—বললে না?···হাঁ, বা-রো—ব-ৎ-স-রই বটে! অনেক দিন, তবু মনে হচ্ছে, যেন কালকের কথা! সেই বাগান, সেই ঝর্ণা,—বাবা—মা—সকলকে যেন আমি চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি! মানুষের জীবনের উপর দিয়ে শুধু ঘটনার স্রোত বয়ে চলেছে—ওঃ, মানুষ এত ভুলে থাকতে পারে! আশ্চর্য্য। আজ নতুন করে সব কথাই আমার মনে জেগে উঠচে।...সেই এক-দিনের কথা মনে পড়চে, সেদিন ভারী গরম, এতটুকু বাতাস বয়নি, গাছপালা যেন কঠিন নিশ্চল পাথরের মত স্থির দাঁড়িয়েছিল, তুমি একটা বরা মেরে পিঠে বয়ে সেটাকে নিয়ে এলে—

বরাট। মনে পড়েছে?···শুধু সেইটুকু মনে পড়েছে? আমার কিন্তু আরো মনে পড়চে, বরা দেখে তুমি কি বলেছিলে। তার পর আমার হাতের রক্ত ধুয়ে দিলে! সেদিন তুমি একটি ফুলের মালা গেঁথেছিলে, মনে আছে, হাসি? সেই মালা আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে তুমি বললে,—"বিজয়ী বীরের জয়মাল্য।"

রূপসী। মনে আছে। তুমি কিন্তু সে মালা গলা থেকে খুলে আমার মাথায় পরিয়ে দিলে, বললে, ফুল পুরুষের জন্য নয়, তাতে ফুলের অপমান হয়! ফুলের সৃষ্টি হয়েচে, মেয়েদের রূপশ্রীকে ফুটিয়ে তোলবার জন্য—···তার পরে হঠাৎ তুমি কোথায় একদিন চলে গেলে—

বরাট। কাশ্মীরে। পথে বাবার মৃত্যু হলো, মাও শোকে প্রাণ দিলেন। পথ হারিয়ে আমি গান্ধারের দিকে চলেছিলুম—একদল পাহাড়ী ডাকাতের হাতে বন্দী হই! তারা যথাসর্ব্বস্ব কেড়ে নিল। আমার মৃত্যু-ভয় ছিল না দেখে জীবনটুকু নিল না। দলে সঙ্গী করলে। তাদের দলে মিশে লুঠ-পাট দাঙ্গা-হাঙ্গামে রীতিমত দড় হয়ে উঠলুম। তার পর যখন বন্দী-দশা ঘুচলো, নজর-বন্দীর হাত এড়ালুম, তখন একদিন প্রথম সুযোগ পেয়ে তাদেরই ঘোড়ার পিঠে চড়ে বরাবর আমাদের সেই গাঁয়ে ফিরলুম। চার বৎসর পরে। এসে দেখি, তোমাদের কুটীরের চিহ্ন নেই! শুনলুম, তোমার বিধবা মা মারা গেছেন। তোমার সন্ধান দেশের লোক কেউ দিতে পারলে না। তার পর কত দিন যে তোমায় খোঁজ করে বেড়িয়েচি, কত দিন, কত মাস, কত বৎসর! কেউ বললে, তোমায় কারা চুরি করে নিয়ে গেছে—কেউ বললে, তুমি বেঁচে নেই! আরো অনেকে অনেক কথা বললে, সব শুনলুম—শুনে মানুষের উপর কেমন রাগ হলো। ভাবলুম, মানুষ আপনাকে নিয়ে এত ব্যস্ত, এত মত্ত। এক অসহায় বালিকার কোন সন্ধান রাখলে না! আচ্ছা, এই মানুষকে একবার দেখে নেবো। মোগল তখন

মানুষ মারবার কল পাতচে। আমি এসে সেই মোগলের দাসত্ব স্বীকার করলুম! মোগল আমার দুঃসাহস, আমার কৌশল দেখে আমায় তারিফ করলে—তাই আজ আমি মোগল সেনার একজন অধ্যক্ষ! তার পর মান্দার লুঠ করতে এসে হঠাৎ এক বৃদ্ধ কৃষকের কাছে মান্দারের রাণীর পরিচয় পেলুম। পেয়ে আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। মান্দারের দিকে মন আরো আকৃষ্ট হলো। সেই জন্যই জয় করবার সময় পেয়েও মান্দারকে আমি জয় করিনি। মান্দার জয় করবার ইচ্ছা আমার আর ছিল না—কোন মতে মান্দারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে মান্দারের রাণীকে যদি একবার দেখতে পাই, এই হলো আমার সাধ।

রূপসী। তবু আমিই সে হাসি, এ তুমি এত শীঘ্র চিনতে পারলে! বারো বৎসর পরে দেখা—

বরাট। বারো বৎসর সামান্য, হাসি। যুগ-যুগান্তর পরে দেখা হলেও আমি তোমাকে চিনতে পারতুম। পৃথিবীর সমস্ত রূপসীর সঙ্গে মিশে থাকলেও আমি তোমাকে চিনতে পারতুম। বললুম তো হাসি, বারো বৎসর অনেক অত্যাচার করেছি আমি। পশু থেকে নিজেকে এতটুকু তফাৎ করিনি—তবু এই বারো বৎসরে এমন দিন ছিল না, যেদিন তোমার এই মূর্ত্তি না ধ্যান করেচি। আমার বারো বৎসরের ধ্যানের মূর্ত্তি—তাকে আমি চিনতে পারবো না—এ কি সম্ভব, রূপসী?...বারো বৎসর তোমার সন্ধানে কত দেশে ঘুরে বেড়িয়েচি, কত বন ঢুঁড়েচি, পাহাড়ে উঠেচি, খর-স্রোতা নদী সাঁতরে পার হয়েচি। কিন্তু তোমায় পাই নি। নিজের দেশ নেই, ভুঁই নেই, আত্মীয় নেই, বন্ধু নেই, শুধু তোমাকে আমি খুঁজে বেড়িয়েচি। ভক্ত যেমন করে তার ভগবানের খোঁজ করে, তেমনি করে খুঁজেচি। কোথাও যখন সন্ধান পেলুম না, তখন একবার মনে হলো, আর তবে বাঁচা কিসের জন্য? কিসের আশায়? নিজেকে হত্যা করতে তলোয়ার তুলেচি, উদ্যত তলোয়ার হাত থেকে খশে পড়েছে। তখন মনে হলো,—না, মরবো না। মনের মধ্যেও কে যেন আশ্বাস দিয়ে বললে,—দেখা হবেরে, দেখা হবে।"

রূপসী। তুমি উন্মাদ।

বরাট। সত্যই উন্মাদ, হাসি। তোমার রূপে উন্মাদ! তোমার প্রেমে উন্মাদ। কিন্তু তুমি—তুমি—

রূপসী। এ-সব কথা বলো না, মুক্তা। আমি অপরের স্ত্রী, সে কথা ভুলে যেয়ো না।

বরাট। সে কথা ভুলি নি, হাসি।...কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই, তুমি বেশ মনের সুখে আছ? বলো, বলো, তোমার প্রাণে কোন দুঃখ, কোন অভাব...?

রূপসী। কোন দুঃখ নেই, কোন অভাব আমি জানি না। স্বামীর নিবিড় স্নেহে-প্রেমে আমার চিত্ত ভরপুর। তাঁর ভালোবাসা অগাধ, করুণা অসীম।

বরাট। বড় বিলম্ব করেছিলুম, হাসি, বড় বিলম্ব।...কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি তোমার স্বামীকে যথার্থই এমনি প্রাণ-মন দিয়ে ভালোবেসেচো? বলো...

রূপসী। বাসিনি? মুক্তা, তোমরা পুরুষ, বড় ভুল বিশ্বাস নিয়ে নিজের মনে তোমরা শুধু মিথ্যার রাশি জড় করো! নিজের দুঃখ তোমরা নিজেরা গড়ে তোলো! মা বাবা গেলেন,—অসহায় আমি অকূল পাথারে পড়লুম! সে বিপদ থেকে মাথা তোলবার আগেই আবার অন্য বিপদ সুরু হলো। বলবান পুরুষ বলে আমায় লুণ্ঠন করতে উদ্যত হলো, রূপের ভিখারী মিনতি জানালে; দুর্বৃত্তরা হুঙ্কার দিয়ে পথ আগলে দাঁড়ালো। শেষে এক মোগলের লোলুপ দৃষ্টি শ্যেনের মত আমায় ঘিরে ধরলো। নিরাশ হয়ে বর্ব্বর একদিন আমায় নির্জ্জনে অসহায় পেয়ে আমার হাত চেপে ধরলে। চারিধার অন্ধকার দেখলুম। চোখ মুদে ভগবানকে ডাকলুম—স্বামীর মূর্ত্তি ধরে ভগবান সেদিন আমায় দেখা দিলেন, সে বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন, তার পর আমার পরিচয় নিয়ে আমায় অসীম সম্পদের অধিকারিণী করলেন, পথের ভিখারিণীকে রাণীর ঐশ্বর্য্য দিলেন। স্বামীর প্রেমে, স্বামীর স্নেহে আমি স্বর্গসুখ পেলুম। সব শোক ভুললুম। অতীতের বেদনা জীবন থেকে নিমেষে মুছে গেল। তিনি আমায় পরিহাস করে বললেন, 'তুমি শুধু হাসি নও, রূপের হাসি'। তিনি আমার নাম রাখলেন, "রূপসী—"...সেই অবধি শুধু সুখ, শুধু তৃপ্তির মধ্যে আমি ডুবে আছি। এ কি সুখ, কি তৃপ্তি, তা বোঝাবার ভাষা আমার নেই, মুক্তা। শুধু এইটুকু জেনো, এর স্পর্শে আমার সমস্ত অতীত কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে!

বরাট। আর সেই-সঙ্গে সেই বাগান, কুটীর, ঝর্ণা, মুক্তা, সব তুমি ভুলে গেছ!

রূপসী। তাতে অন্যায় হয়েছে, মুক্তা?—আমার দেবতা স্বামী, তাঁর অমন ভালোবাসা—এতেও যে-নারী অতীত আঁকড়ে পড়ে থাকে, তার দুঃখের সীমা নেই! সে ত দুর্ভাগিনী!

বরাট। (স্তব্ধ রহিল; কোন কথা কহিল না)

রূপসী। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি, মুক্তা, হঠাৎ এ সর্ত্ত তুমি কেন করলে? একজন নারীকে তার স্বামীর কাছ থেকে টেনে এনে, তার সব গৌরব ছিনিয়ে নিয়ে...

বরাট। ভুল করেচি, হাসি, অন্যায় করেচি। আমি ভেবেছিলুম, আমার মত তুমিও বুঝি সেই অতীতকে আঁকড়ে বসে আছো! তাই দুজনেই সুখী হবো,

ভেবে আমি আমারও সমস্ত ভবিষ্যৎ পা দিয়ে ঠেলে ফেলেচি।

রূপসী। বুঝেচি, ..এইজন্য মোগলেরও বিশ্বাস হারিয়েছ তুমি!

বরাট। মোগলের বিশ্বাস-অবিশ্বাস—সে আমি গ্রাহ্যও করি না। বে-ইমান মোগলই আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে—এ আমি বুঝেছিলুম। তাই আমি হাসির স্বামীকে সাহায্য করবো, স্থির করেছিলুম—ভালোই করেচি, হাসি। যে দেশের জন্য আমার সেই হাসি মাথায় কলঙ্কের বোঝা তুলে নিতে এতটুকু হঠেনি, অকম্পিত পদে মোগলের শিবিরে চলে এসেছে, সেই-হাসির সেই-দেশকে আমি প্রাণ দিয়েচি,—এ কি আমার কম সুখ!

রূপসী। আমারই জন্য তুমি এতখানি ত্যাগ করেচো! নিজের একমাত্র অবলম্বন তুমি পা দিয়ে ঠেলে দেছ!

বরাট। কিন্তু কি সুখ আমি পেয়েচি। তোমার পায়ে কাঁটা ফুটলে সে কাঁটা তুলে ফেলতে আমি আমার সর্ব্বস্ব দিতে পারি, হাসি!

রূপসী। মুগ্ধা, ভাই, তুমি মহৎ।

বরাট। না হাসি, আমি দুর্বৃত্ত নরাধম বর্ব্বর। তাই আমি বুঝে দেখিনি, তোমায় আসতে বলে কত বড় অন্যায় করেছি! তোমার সর্ব্বনাশ করেচি—

রূপসী। সর্ব্বনাশ।

বরাট। নয়? এখন তুমি ফিরে গেলে তোমার স্বামী আবার তেমনি হাসি মুখে তোমায় বুকে তুলে নেবে কি? সারা দেশ—তুমি জানো না, হাসি, এ বড় লক্ষ্মীছাড়া জায়গা, এই পৃথিবী! নারীর বিরুদ্ধে পুরুষ এখানে দিবারাত্র ষড়যন্ত্র করছে, কি করে তাকে পায়ের তলায় চেপে রাখবে! তুমি জানো না, নারীর প্রতি এখানে পুরুষের কি দারুণ অবজ্ঞা, গভীর অবিশ্বাস! তুমি ভাবো, তোমার স্বামীর বিশ্বাস হবে—তুমি নির্ম্মল? তুমি নিষ্কলঙ্ক?

রূপসী। স্বামীর বিশ্বাস! কেন হবে না? নিজের মুখে আমি সব কথা তাঁকে খুলে বললে—

বরাট। তাই হোক্! ভগবান তোমার মঙ্গল করুন!

রূপসী। আর তুমি? তোমার কথা ভাবচো না?

বরাট। আমার কথা! সে আর জিজ্ঞাসা করো না। আমি ঠিক বুঝতে পারচি না, আমি কি করবো।··· যাক্! একটা কথা হাসি, তুমি যখন বরাটের শিবিরে আসতে উদ্যত হলে, তখন জানতে, কোথায় আসচো—কার কাছে আসচো?

রূপসী। না।···অনেক কথা শুনেছিলুম···কেউ বললে, বরাট দুর্বৃত্ত বর্ব্বর—আবার কেউ বললে, সে এক তরুণ যুবা, অদ্ভুত রকমের খেয়ালী।

বরাট। কিন্তু তোমার বৃদ্ধ শ্বশুর আমায় দেখে গেছলেন। তিনি কিছু বলেন নি?

রূপসী। না।

বরাট। তুমি নিজেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করোনি? জানবার কৌতূহল হয়নি?

রূপসী। না, জানবার প্রয়োজন মনে করিনি। সর্ত্ত-মত আমায় আসতে হবে, এইটুকুই বুঝেছিলুম! না হলে দেশ-রক্ষার আর কোন উপায় ছিল না।

বরাট। কিন্তু আসতে তোমার বুক কাঁপেনি? পা টলেনি? এই সন্ধ্যায় এক অপরিচিত দুর্বৃত্তের শিবিরে, শত্রুর শিবিরে—সুন্দরী কিশোরী তুমি একলা আসচো—

রূপসী। বলেচি তো—সর্ত্ত ছিল, আমাকে আসতেই হবে।

বরাট। তারপর যখন আমায় দেখলে, তখন কি মনে হলো?

রূপসী। কিছুই মনে হয়নি।

বরাট। এখন কি মনে হচ্ছে? যদি আমি কোন অত্যাচার করি?

রূপসী। অত্যাচার! তুমি করবে? (হাসিয়া) আমার কোন ভয় নেই, মুগ্ধা—কাকেও ভয় নেই! মানুষ মানুষের উপর খামখা অত্যাচার করবে কেন! বিশেষ তুমি! তুমি কোন অত্যাচার করতে পারো না।

বরাট। পারি না!—কেন?

রূপসী। তুমিই বলেচো, আমায় তুমি ভালোবাস।

বরাট। হায় নারী, এত সরল, এমন নির্ম্মল তোমার মন!···পুরুষকে তুমি জানো না, তার প্রবৃত্তি কত কুৎসিত, তার মন কত কদর্য্য···

রূপসী। মুগ্ধা, মিথ্যা আমায় ভয় দেখাবার চেষ্টা করচো। তুমি আমায় ভালোবাস, তুমি আমার মন্দ করতে কখনো পার না!

বরাট। ঠিক বলেচো—হাসি, আমি তোমার মন্দ করতে পারি না। তোমায় ভালোবাসি, তোমাকে সুখী দেখলেই আমি সুখ পাই।···কিন্তু না, আর বিলম্ব করা ঠিক নয়। চলো, এই রাত্রির গোপনতার মধ্য দিয়ে তোমায় দুর্গে রেখে আসি! তোমার স্বামীকে বলো, বরাট তার বন্ধু, ভাই, আর বলো,—এ যুদ্ধে মান্দার জয়ী হবে।

রূপসী। তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করবে?

বরাট। বিশ্বাসঘাতকতা! বরাট বিশ্বাসঘাতক নয়। তা-ছাড়া কার বিশ্বাস সে ভাঙ্গবে? মোগলের! সে সব শোধ-বোধ হয়ে গেছে। মোগল যেদিন আমায় অবিশ্বাস করেছে, সেই দিনই মোগলের নিমকের দেনা আমি শোধ করেছি।

রূপসী। মোগল বলী!

বরাট। বরাট মোগলের তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী।

রূপসী। নিজের ভবিষ্যৎ—মোগলের রোষ-রক্ত আঁখি—

বরাট। বরাট তার থোড়াই তোয়াক্কা রাখে!··· যাক, এসো হাসি, আর দেরী নয়। তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি। (নেপথ্যে কোলাহল—বন্দুকের শব্দ শুনা গেল) ও কি!

(শশব্যস্তে ভানুর প্রবেশ)

বরাট। খবর কি, ভানু?

ভানু। শাহজাদা পালিয়েছেন—সমস্ত সৈন্য তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছে। তারা আপনার বিরুদ্ধে উদ্যত হচ্ছে। আপনার অনুচর ক'জন শাহজাদাকে ধরতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে।

বরাট। এমন অকস্মাৎ?

ভানু। মুলতর সাতশ' ফৌজ নিয়ে এসে পৌঁচেছে।

বরাট। দ্যাখো হাসি, মোগলের বিশ্বাস দ্যাখো! মোগলই আমাদের বিশ্বাসঘাতকতা শেখাচ্ছে। এর প্রতিফল তাকে পেতে হবে।···এখন এসো, শীঘ্র এসো।

রূপসী। তুমি কোথায় যাবে?

বরাট। মান্দার দুর্গে। ভানু, তুমিও আমার সঙ্গে এসো—যদি পথে মোগল আমায় আক্রমণ করে, তাহলে তুমি এই মান্দারের রাণীকে—আমার ভগ্নীকে সসম্মানে দুর্গে পৌঁছে দিয়ে আসবে। মেঘের আড়ালে চাঁদ ঐ ঢাকা পড়েচে, চমৎকার সুযোগ মিলেছে।

রূপসী। মান্দারও তোমার শত্রু, মুঞ্জা। দুধারে দু'দল শত্রুর মধ্যে পড়ে তুমি—তুমি কি করবে?

বরাট। আমার জন্য ভেবো না। এ পৃথিবীর কোল নেহাৎ ছোট জায়গা নয়—আমার ঠাঁই আমি কোনোখানে করে নেবোই। আর না হয়,—

ভানু। কিন্তু শিবিরের সামনে মুলতবের আস্তানা।

বরাট। বেশ—তবে এই শিবির ফুঁড়েই আমরা পথ করে নেবো। এসো হাসি!

রূপসী। না, তোমার সঙ্গে আমি যাবো না। তোমাকে বিপদে ফেলে··

বরাট। হাসি, এ-সময় অবুঝ হয়ো না। তুমি আমার কৌশল জানো না। যা বলচি, শোনো, এসো—নাহলে দুজনের কেউ রক্ষা পাবো না।

রূপসী। তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

বরাট। যাবো।

রূপসী। তবে এসো। কিন্তু একটা কথা, বলো, ফিরে আসবে না? মান্দারেই থাকবে?

বরাট। তোমার স্বামীর মত হবে?

রূপসী। আমি তাঁকে সব কথা খুলে বলবো।

বরাট। তিনি বিশ্বাস করবেন?

রূপসী। নিশ্চয়।

বরাট। যদি না করেন?

রূপসী। না করেন!···না, না, করবেন বৈ কি, নিশ্চয় করবেন। আমি নিজে সব কথা বলবো—এসো—

বরাট। না, মান্দারের দ্বারে শুধু তোমায় পৌঁছে দেবো। মান্দারে পা দেওয়া হবে না, হাসি।

রূপসী। কেন, মুঞ্জা—তোমার ভয় কি?

বরাট। ভয়! ভয় তোমার জন্য।

রূপসী। আমার জন্য?

বরাট। হাঁ, তোমার জন্য। আমায় তোমার সঙ্গে দেখলে—

রূপসী। সে ভয় সমানই আছে আমি তোমার সঙ্গেই ফিরি কি একলাই ফিরি—নয় কি? ভয় তোমার জন্য। কিন্তু তবু আমি সে ভয় করি না। বিপন্ন মান্দারকে তুমি তার বড়-দুর্দ্দিনে রক্ষা করেচো! নিজের ভবিষ্যৎ বিসর্জ্জন দিয়েও তাকে রক্ষা করেছ, মান্দার অকৃতজ্ঞ নয়, আজ তোমার দুর্দ্দিনে সেও তোমাকে রক্ষা করবে।···তাকে ঋণী করে রেখো না, মুঞ্জা,—এসো, মান্দারের রাণী তোমায় নিমন্ত্রণ করচে,·এসো।

বরাট। যাবো?

রূপসী। না যাও, আমিও যাবো না।···যদি আমায় ভালোবাস, মুঞ্জা—এসো, আর বিলম্ব করো না। ঐ, ঐ শোনো চীৎকার! শীঘ্র এসো—

বরাট। ভানু, আমরা শিবির ছাড়লে তুমি শিবিরে আগুন লাগিয়ে দাও, তার পর অলক্ষ্যে আমাদের পিছনে এসো। যদি আমায় আক্রমণ করে, তাহলে মোগলকে আমি রুখে রাখবো, তুমি ততক্ষণে রাণীকে মান্দারে পৌঁছে দিতে পারবে।

রূপসী। মুঞ্জা, ভাই, এসো।

[বরাটের হাত ধরিয়া রূপসী বাহিরে গেল; ভানু তাহাদের পানে চাহিয়া রহিল]

(মহম্মদ ও মুলতবের প্রবেশ; সঙ্গে চারিজন সশস্ত্র প্রহরী)

মহম্মদ। কোথায় গেল?

ভানু। আমি এসে দেখি, শিবিরে কেউ নেই।

মুলতব। কেউ নেই! এ তোর শয়তানী বান্দা! শাহজাদা, এই তাহলে এসে সংবাদ দিয়েছে।

মহম্মদ। নিমকহারাম—

মুলতব। বল্, তোর বিশ্বাসঘাতক মনিব কোথায়? কোন্ দিকে গেছে?

ভানু। জানি না।

মহম্মদ। জানিস্ না? মুলতব, একে বন্দী করো।

সাঁড়াসী দিয়ে ওর জিভ টেনে ধরো। দেখি, কতক্ষণ না বলে চুপ করে থাকে।

ভানু। বেশ! তাই হোক্।

( প্রহরিগণ ভানুকে বন্দী করিল )

মহম্মদ। শিবিরে-শিবিরে সন্ধান করো।

ভানু। ( স্বগতঃ ) যাক্, অনেকখানি সময় পাওয়া গেল! বাঃ! এমন হবে, তা তো ভাবি নি কখনো। সেনাপতি যদি খপরটা পেতেন! আহা!

# তৃতীয় অঙ্ক

নিরঞ্জনের প্রাসাদ-কক্ষ

নিরঞ্জন, আর্য্যধন, দেবল ও কহ্লনের প্রবেশ।

নিরঞ্জন। আর নয়। তোমাদের সকলের কথাই রেখেচি, অক্ষরে অক্ষরে রেখেচি। কারো মনে কোনো ক্ষোভ নেই। আমি স্তব্ধ হয়ে এতক্ষণ সকলের তৃপ্তি-সাধন করেচি! নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলুম— ডাকাতে বাড়ী লুঠচে দেখে কাপুরুষ গৃহস্বামী যেমন এককোণে লুকিয়ে থাকে—তেমনি আমি নিজেকে এককোণে জোর করে লুকিয়ে রেখেছিলুম! আমার ঘর লুঠ হয়ে গেল, তবু একটা নিশ্বাস অবধি ফেলি নি! আমার এত বড় অপমানে ধৈর্য্য হারাইনি, মাথা খাড়া রেখেছিলুম। তোমরা আমার সে স্তব্ধতার চূড়ান্ত মূল্য আদায় করেচ! আমার সম্মানের মূল্যে আপনাদের তুচ্ছ উদর-পূর্ত্তির অন্ন কিনেচ···আমি বাধা দিইনি। এখন সর্ত্ত রক্ষা হয়েচে, তোমরা উদর পূর্ণ করেচ—চাঙ্গা হয়ে উঠে দাঁড়িয়েচ! ব্যস্! এধারে রাত্রি কেটে গেছে, প্রভাত হয়েছে,—আমারও পা থেকে চুক্তির শৃঙ্খল খশে গেছে! আমি এখন মুক্ত, স্বাধীন,—নিজেকে আবার আমি ফিরে পেয়েছি! গা থেকে সমস্ত লজ্জা, সমস্ত কলঙ্ক ঝেড়ে আবার আমি উঠে দাঁড়িয়েছি!

আর্য্যধন। তোমার এ দুঃখ সীমাহীন—এ-দুঃখে সান্ত্বনার ভাষা নেই, পুত্র···সান্ত্বনার কথা তোমার গায়ে কাঁটার মত বিঁধবে—সান্ত্বনা দেবার চেষ্টাও আমি করবো না। তবু মনে রেখো পুত্র, তোমার মান্দার বড় বিপদ থেকে আজ পরিত্রাণ পেয়েচে। এর জন্য লজ্জায় আমাদের মাথা নত হয়ে আছে, তোমার মুখের পানে আমরা চাইতে পারছি না। তবু···শোনো পুত্র, যদি কোন দিন বুঝে থাকো, আমি তোমায় ভালোবেসেচি, সকলের চেয়ে সব-জিনিসের চেয়ে ভালোবেসেছি, আমার প্রাণাধিক তুমি, গৌরব তুমি—তাহলে আমার একটা অনুরোধ রেখো—ক্রোধের বশে মন যখন তপ্ত, বিষাদে যখন সে মূর্চ্ছিত, তখন সেই মন দিয়ে আমার মায়ের বিচার তুমি করো না।···এই রাগ যখন শীতল হয়ে যাবে, বিষাদ কেটে যাবে, মন শান্ত হবে,—তখন এ ব্যাপারকে আর-এক মূর্ত্তিতে দেখবে।···মা আমার এখনই ফিরে আসবে। আজ তার বিচার করো না পুত্র—কোন রূঢ় কথা বলো না। এ সঙ্গীন মুহূর্ত্তে তোমার একটা তপ্ত শ্বাস প্রলয় ঘটিয়ে তুলতে পারে!···শান্ত হয়ে বিবেচনা করো। যদি বোঝো, সে শক্তি তোমার আজ নেই, তাহলে তার সঙ্গে দেখা করো না।···মানুষ কতকগুলো দুর্দ্দম শক্তির খেলনা বৈ নয়। সে শক্তিগুলো যতক্ষণ জেগে থাকে, ততক্ষণ মানুষ বুঝতে পারে না, তার বুকের মধ্যে কতখানি মহত্ত্ব, কতখানি সুবিচার, বুদ্ধি, বিবেক, ধৈর্য্য, ক্ষমাশীলতা পাথারের মত বিস্তীর্ণ হয়ে আছে!··সেই শান্ত মুহূর্ত্তে আমার পানে চেয়ে দেখো পুত্র, দেখবে, মনে তোমার এতটুকু ঘৃণা হবে না, ক্রোধ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। এক অপূর্ব্ব অসীম ভালোবাসায় প্রাণ তোমার ভরে উঠবে!

নিরঞ্জন। বক্তব্য তোমার শেষ হয়েচে, বৃদ্ধ? আর ও-সব বাক্যচ্ছটার প্রয়োজন নেই। তোমাদের দিন কেটে গেছে—এখন আমার দিন এসেচে। তোমরা উদর ভরে আহার পেয়েচো, কড়ায়-গণ্ডায় আমি তার মূল্য দিয়েছি। ব্যস্—দেনা-পাওনার সম্পর্ক চুকে গেছে!··· তবু আমি ভাবছিলুম, এখনো তোমার কি বক্তব্য থাকতে পারে! তাই স্থির হয়ে সব শুনছিলুম। আশ্চর্য্য, এখনো সেই এক কথা,—ধৈর্য্য ধরো, সহ্য করো, ক্ষমা করো—! সেই সনাতন যুগ থেকে এই উপদেশ বকে বকে মানুষ এখনো তা বক্‌বার স্পর্দ্ধা রাখে! যেন মানুষ একটা যন্ত্র! শুধু পরের হাতে দম খেয়েই সে চলবে—নিজের তার কিছু নেই! তার ইচ্ছা···থাক্, আমি বেশী কথার ধার ধারি না। স্পষ্ট সহজ ভাষায় বলি, শোনো, আমি কি করবো, তা স্থির করেছি। এক পাষণ্ড দস্যু আমার রূপসীকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেছে—যতক্ষণ সে এ-পৃথিবীতে আছে, ততক্ষণ রূপসীর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই! হয় সে, নয় আমি, এক জনকে দুনিয়া থেকে সরতে হবে। বুঝলে? আর আমি যে মূল্য দিয়েচি, তার বিনিময়ে আমি কি চাই, জানো?···মান্দার আমার সম্মানের মূল্যে এই যে আহার পেয়েচে, সেই আহারে বলিষ্ঠ সবল হয়ে উঠেছে, তার নির্জ্জীব হাতে আবার সে শক্তি ফিরে পেয়েছে—এখন মান্দার আমার সে সম্মানের মূল্য দিতে বাধ্য—আজ থেকে মান্দারের সমস্ত প্রাণী আমার ক্রীতদাস। আমি তাদের নিজের সম্মান দিয়ে বাঁচিয়েছি। মান্দারের প্রতি আমি আমার কর্ত্তব্য করেছি, এখন মান্দার আমার প্রতি তার কর্ত্তব্য করুক!

এই সমস্ত প্রাণী আমার ইঙ্গিতে আজ চলা-ফেরা করবে। রূপসী? তাকে আমি ক্ষমা করবো—বুদ্ধিহীনা দুর্ব্বল নারী! কিন্তু সে পাষণ্ড বেঁচে থাকতে এ ক্ষমা সে পাবে না।…জানি, সে প্রতারিত হয়েচে, কতকগুলো স্বার্থপর বাক্‌পটু লোকের কথার ফাঁদে পা দিয়ে বিপন্ন হয়েচে। তবু সে এতে আশ্চর্য্য সাহসের পরিচয় দিয়েছে।…তার এই সাধুতা, এই মহত্ত্ব এমনভাবে কাজে খাটাতে মান্দার এতটুকু লজ্জা বোধ করলো না? প্রাণটা তার কাছে বেশী দামী হলো? আশ্চর্য্য! যাক্, যা হয়ে গেছে, তা আর ফেরবার নয়!…

ভুলবো?—অসম্ভব। মানুষ এ ভুলতে পারে কখনো? …কিন্তু সেই পাষণ্ড—আর তুমি—আমার পিতা…জেনো, একটা মহৎ উদার প্রাণকে তুমি উচ্ছৃঙ্খল, উন্মত্ত করে দিয়েচো—তার ফলও মান্দার দেখবে! তোমায় শাস্তি নিতে হবে। আমি তোমায় ঘৃণা করি। খুব ঘৃণা…কোন পুত্র পিতাকে কখনো তেমন ঘৃণা করে নি—পিতাকে তেমন অভিসম্পাত কখনো দেয়নি—

আর্য্যধন। তাই করো, আমাকে ঘৃণা করো পুত্র, অভিসম্পাত দাও—কিন্তু আমার মাকে মার্জ্জনা করো।…সমস্ত দেশকে আমার মা আজ প্রাণ দিয়েছে। জগতে যদিও সে সুবিচার না পায়, জেনো, আর এক জগৎ আছে, সেখানে সোনার অক্ষরে মার এই কীর্ত্তি-কথা তারা লিখে রেখেচে। তারা সুবিচার করবে!…আমি মুখের কথায় অনুমতি দিয়েচি মাত্র। অনুমতি দেওয়া খুব সহজ, কিন্তু তা পালন করা—তাতে অসাধারণ শক্তি আছে, পুত্র!…আজ যদি তুমি আমায় ঘৃণার চক্ষে ছাখো, তাও আমার সহ্য হবে। সহ্য হবে এই জন্য যে আমার মা—আমার মা—আমায় অতুল গৌরব দান করেছে! মার কৃপায় আমি স্বর্গ দেখেচি!…তোমার কোনো দোষ নেই, পুত্র। তুমি আমায় ত্যাগ করলে, যে কদিন আমার এ দেহে প্রাণ আছে, জেনো, আমি তোমার মঙ্গলই কামনা করবো। তোমার অপরাধ নেই। তোমার মত বয়সে আমিও ঠিক এই রকম বিচার করতুম, পুত্র। আমি যাচ্ছি, আর তুমি আমায় দেখতে পাবে না, কিন্তু যাবার সময় আবার অনুরোধ করি, পুত্র, আমার মাকে কঠিন কথা বলো না, তিরস্কার করো না, তাঁকে ক্ষমা করো! তোমার ক্রোধের বহ্নি আমারই মাথায় তুমি নিঃশেষে নিক্ষেপ করো, করে শান্ত হও। এর একটি স্ফুলিঙ্গ তোমার বুকে লুকিয়ে রেখো না।…মনে রেখো পুত্র, ক্রোধ এখানে শুধু ক্ষণিক আস্ফালন করে, সে বড় ক্ষণিকের। ক্ষমা শান্ত নির্ম্মল হাসির মত মানুষের বুক ভরে রেখেচে। ক্রোধের ক্ষণিক গর্জ্জনে ভীত হয়ে প্রকৃতির সে হাসি মাঝে মাঝে লুকিয়ে পড়ে, কিন্তু বুক ছেড়ে পালায় না। মানুষ তাই মানুষের পাশে এতকাল নিরন্তর হয়েও শুধু সেই গভীর বিশ্বাসে হেসে-খেলে বেঁচে আছে!…আমি তোমার সমস্ত অকরুণা, সমস্ত ক্রোধ, সমস্ত ঘৃণা নিয়ে চলে যাচ্ছি পুত্র, কিন্তু আমার একটি প্রার্থনা আছে। পিতা হয়ে প্রার্থনা করচি, আমায় নিরাশ করো না- মনে শুধু আমার একটি সাধ আছে, যাবার পূর্ব্বে একবার আমায় দেখতে দাও,—মা আমার ফিরে আসচে। এখনি এসে পৌঁছুবে! এলে তার দুই হাত ধরে তাকে তোমার বুকে তুলে নাও। সে দৃশ্য দেখে তখনি আমি চলে যাবো, হাসি-মুখে যাবো। জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েচি, পুত্র, তোমার এ বিচার বেশী আর-কি দুঃখ দেবে? দুঃখের ভারে ঘাড় আমার নুয়ে পড়েচে, না হয় আর একটু নুইবে, না হয় এ ঘাড় সে দুঃখের ভরে ভেঙ্গে যাবে। তাতে আমি কাতর হবো না পুত্র। কিন্তু দেখো, আমার মাকে যেন একবিন্দু দুঃখ না স্পর্শ করে …তার মুখের হাসি যেন অটুট থাকে!

[ অদূরে অস্পষ্ট কোলাহল শ্রুত হইল ;
ক্রমে সে কোলাহল স্পষ্টতর হইলে শুনা গেল,
অসংখ্য কণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠিতেছে,

"জয় মাতাজীর জয়"
"জয় রূপসী-রাণীর জয়!" ]

ঐ, ঐ মা আমার আসছে। কৃতজ্ঞ মান্দার মহা-উল্লাসে জয়-ধ্বনি করচে। এ কি মূর্চ্ছা? এ কি সুপ্তি? না, না, ভগবান, ভগবান…আমায় আর-খানিক বাঁচিয়ে রাখো, চেতন-হারা করো না!

দেবল ও কহ্লন বাতায়ন-পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল।

দেখতে পাচ্ছ! ঐ—ঐ কাতারে-কাতারে সব দাঁড়িয়ে আছে, দলে-দলে সব লোক ছুটেছে! মান্দারের পথ-ঘাট নর-মুণ্ডে ভরে গেছে। গাছের ডালে, চারিধারে—শুধু মানুষের মাথা! কিন্তু আমার মা? আমার মা কৈ? তোমরা দেখতে পাচ্ছ? আমি বৃদ্ধ, দৃষ্টি আমার ক্ষীণ, তার উপর অশ্রু এসে সে ক্ষীণ দৃষ্টিটুকুকে রোধ করছে! কৈ? কৈ? আমার মা কৈ? যাই, যাই, আমি নেমে যাই।

দেবল। (আর্য্যধনকে ধরিয়া) না, যাবেন না। মান্দার উন্মত্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। উত্তেজনায় অধীর মান্দার—তার পায়ের তলায় পড়ে আপনি পিষে চূর্ণ হয়ে যাবেন।…ঐ, ঐ রাণী আসচেন, মান্দারের পানে সস্নেহ দৃষ্টিতে চেয়ে হাসি-মুখে রাণী আসচেন…

আর্য্যধন। হাসি-মুখে! হাঁ, ঠিক দেখেচো, তাহলে—হাসিমুখে! ঠিক! এই আমার মায়ের মুখ। জয়ের হাসি ভরা,—বড় গৌরবের হাসি এ! আজ বার্দ্ধক্যে আমার ক্ষোভ হচ্ছে! যদি সে শক্তি থাকতো, যদি এ বাহুতে সে বল—মাকে আমার এ পথটুকু চলবার কষ্ট দিতেম না, কোলে তুলে নিয়ে আসতুম! তোমরা বলো,

বলো, মার মুখে সত্যই হাসি দেখচো ? বলো, বলো, মার মুখে দীপ্তি দেখতে পাচ্ছ ? বিজয়ের উজ্জ্বল দীপ্তি ?

কহ্লন। অপূর্ব্ব রশ্মিতে মুখখানি উজ্জ্বল, উদ্ভাসিত। ...সারা পথে যেন আলো ছাড়িয়ে আসচেন।

দেবল। কিন্তু ও কে ? ঠিক-পিছনে ঐ সঙ্গে সঙ্গে আসচে, নত শিরে, মন্থর গতিতে ?

কহ্লন। জানি না। অপরিচিত মুখ ! বেশ-ভূষাও—

[ নেপথ্যে আবার জয়ধ্বনি উঠিল ]

আর্য্যধন। ঐ আবার সকলে জয়ধ্বনি করছে! কাছে এসেচে !...সমস্ত প্রাসাদ না এই কেঁপে উঠলো ? ঠিক। ওদের জয়ধ্বনিতে কেঁপে উঠেচে ! দেওয়াল-গুলো, প্রাসাদের মূক দেওয়ালগুলো যেন উত্তেজনায় সাড়া দিচ্ছে ! এই দেখ, আমার পায়ের তলায় মেঝেটা অবধি তালে-তালে নেচে উঠেছে! আনন্দ ! ওরে, আনন্দ! চারিধারে মা আমার অধীর আনন্দ ছড়িয়ে আসচেন। সত্যই তো পথে যেন আলোর হিল্লোল !

দেবল। মান্দারের পুরনারীরাও পথে বেরিয়েছে। মা ছেলে কোলে করে, তরুণী দ্বিধা-ভয় দূরে ঠেলে পথে এসে দাঁড়িয়েছে। বাতায়ন থেকে বধূরা ফুল ছুড়ে দিচ্ছে, লাজ বর্ষণ করছে! ঐ যে গলা থেকে মোতির মালা ফেলে দিলে। ফুলের পাপড়িতে পথ ভরে গেছে... এসে পৌঁছুলো! মান্দার আজ সত্যই উন্মত্ত হয়েছে। মান্দারের এ মূর্ত্তি তো কখনো চোখে দেখিনি ! কৃতজ্ঞ মান্দার। না, না—এ যে বন্যার মত জনস্রোত আসছে। প্রাসাদ-দ্বারে রক্ষীরা সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিপুল স্রোত রুখে রাখতে হবে। প্রাসাদে ঢুকলে প্রাসাদ চুরমার হয়ে যাবে। যাই, আমি যাই, প্রাসাদ-দ্বার বন্ধ করতে আদেশ দিইগে—এ উন্মাদের দলকে ভিতরে আসতে দেওয়া হবে না !

আর্য্যধন। আহা,—আসুক, আসুক! ওদের প্রাণ বড় উল্লাসে মুঞ্জরিত হয়ে উঠেচে ! কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আজ অজস্র ফুল ফুটেচে—সবার কঠিন বুক কোমল হয়ে গেছে। বড় দুঃখ পেয়েছে...বেচারা মান্দার! তার কৃতজ্ঞ হৃদয়ের এ উচ্ছ্বাস রোধ করো না। মুক্ত এসেছে আজ, মুক্ত—প্রাচীর তুলে এ-মুক্তকে আর বন্ধ করো না। ওরে আমার সাহসী বীরের দল,কণ্ঠ ভরে তোরা আজ যে আনন্দ-সুধা পান করচিস, সে বড় মধুর সুধা রে, বড় মধুর ! কর্ জয়ধ্বনি কর্, মধুর সুরে জয়ধ্বনি কর্ ! আমার জীর্ণ কণ্ঠ ! তোদের সুরে সুর মেলাতে পাচ্ছি না—আমি...আমি অভিভূত হয়ে পড়চি। আমার সাধ হচ্ছে, তোমাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে মার জয়ধ্বনি তুলি—গগন ফেটে যাক ! গগনের বুক থেকে অজস্র পুষ্পবৃষ্টি হোক !...মা, মা—আমার মা ! ঐ ! ঐ না প্রাসাদ-সোপানে মার চরণ-পদ্ম ফুটে উঠেচে ! আয় মা, তোর সন্তানের বুকে আয় (ছুটিয়া গমনোদ্যত ; দেবল ও কহ্লন আর্য্যধনকে ধরিয়া রাখিল ) ! ওরে, আমায় এরা ধরে রেখেচে, ধরে রেখেছে—আমার এ আনন্দে ওরা শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। আয় মা, আয়, আয়,—স্বর্গের সুষমা তোর সারা অঙ্গে আজ কি লাবণ্য ফুটিয়ে তুলেচে ! আমার বড়-সুন্দর মা—আমার পুণ্যময়ী মা—আয় মা ! ( কক্ষ-মধ্যস্থ-পুষ্পাধার হইতে পুষ্পগুচ্ছ লইয়া ছিঁড়িয়া পুষ্পদল ছড়াইতে ছড়াইতে ) আয় মা, এই সুগন্ধি ফুলের দলে তোর পা রাখবি আয়—ফুলের মত তোর ঐ সুন্দর কোমল পা দুখানি দিয়ে...

[ রূপসীর প্রবেশ ; পশ্চাতে নতশিরে বরাট ও নাগরিকগণ। ]

রূপসী। বাবা—

আর্য্যধন। এসেচিস্, মা আমার এসেচিস্ ! আয় ( রূপসীকে বুকে ধরিয়া )...ছেলের বুকে ফিরে আয় মা ! দাঁড়া, স্থির হয়ে দাঁড়া, একবার তোর পানে চেয়ে দেখি, ভালো করে তোকে দেখি। তোর মুখের পানে চেয়ে থাকতে থাকতে আমার দৃষ্টির শেষ কিরণটুকু যদি আজ মিলিয়ে যায় কোন ক্ষোভ থাকবে না ! অশ্রু আমার দৃষ্টি রোধ করচে মা, তবু সেই অশ্রুর মধ্য দিয়েও আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি—আমার মা—আমার মায়ের কত রূপ ! কত মাধুরী ! আমার মায়ের মুখে কি স্বর্গীয় দীপ্তি ! তারা তো এ দীপ্ত কৈ, এতটুকু কেড়ে নিতে পারেনি ! ঐ চোখে তোর সেই হাজার চাঁদের আলো, ঐ ঠোঁটে তোর সেই শুভ্র অমল হাসি তেমনি আছে, ঠিক তেমনি !

রূপসী। বাবা—( চতুর্দ্দিকে চাহিয়া ) কৈ ?... কৈ ?...আমি যে সকলের সামনে সব কথা বলতে চাই, বাবা। প্রথমেই—

আর্য্যধন। নিরঞ্জন ! ঐ তোমার স্বামী, ঐ সে। আজ সে আমার বিচার করেছে. মা, বিচার শেষ হয়েছে, আমাকে দণ্ড দিয়েছে ! কিন্তু তোর প্রতি সুবিচার সে করবে ! এত বড় মহত্ত্ব ! বর্ব্বরের মাথাও এর সম্মানে হয়ে পড়ে !.. এত বড় ব্রত উদ্‌যাপন করে এলে, যাও মা, তোমার স্বামীকে প্রণাম করো।

( রূপসী নিরঞ্জনকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে নিরঞ্জন বাধা দিল )

নিরঞ্জন। রূপসী—( নাগরিকগণের প্রতি ) যাও তোমরা। এ ঠিক তামাসা হচ্ছে না যে দাঁড়িয়ে দেখবে সব। যাও—

রূপসী। না, না, থাকুক, সকলে থাকুক—সকলে শুনুক—সকলকে বলবো আমি ! তুমিও শোনো (নিরঞ্জনের কাছে আসিল )

নিরঞ্জন। সরে যাও, আমায় স্পর্শ করো না, রূপসী। (নাগরিকগণের দিকে অগ্রসর হইয়া) তোরা শুনতে পাচ্ছিস না? দূর হ কাপুরুষের দল, তোরা চলে যা! নিজেদের গৃহে তোরা যা খুশী তাই করতে পারিস, কিন্তু এখানে এ আমার ঘর, এখানে আমি প্রভু—আমার আদেশ করবার শক্তি আছে, চলে যা তোরা। দেবল, কহ্লন, প্রহরীদের ডাকো—যারা না যাবে, তাদের স্পর্দ্ধার শাস্তি দাও! মান্দার আহার পেয়েচে, চুকে গেছে। যাও। সকলে যাও। (জনতা অস্পষ্ট কোলাহল করিতে করিতে চলিয়া গেল) এখানে কেউ থাকবে না, কেউ নয়! (আর্য্যধনকে ধরিয়া) তুমি যে দাঁড়িয়ে রইলে বৃদ্ধ! তুমিও যাবে—তোমাকেও যেতে হবে। যাও—তুমিও ঐ বর্ব্বর মান্দারের একজন—তোমার অপরাধ সব-চেয়ে বেশী, তুমি যাও। তুমি আমার চোখে জল দেখে আনন্দ করবে, ভেবেচো? না, তা হবে না—লোকের নিশ্বাস আমার সহ্য হচ্ছে না। কলুষিত নিশ্বাস! কেউ এখানে থাকবে না—যাও। (বরাটকে দেখিয়া) তুই! তুই কে? মাথা নীচু করে পাথরের মূর্ত্তির মত নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে আছিস্—কে তুই, বল্। কথা ক'। তুই প্রেত না, ছায়ামূর্ত্তি? কে তুই? এখানে দাঁড়িয়ে আছিস্ কোন্ স্পর্দ্ধায়? এখনো নড়িস্ না? ভেবেচিস্, আমার হাতে অস্ত্র নেই? (তরবারি টানিয়া) দেখেচিস্, যদি প্রাণের মায়া থাকে, এই দণ্ডে দূর হ। কি, হাত তুলচিস? তরবারির আঘাত তুই বোধ করবি? বাতুল—জানিস্, এ তরবারি কত বীরের রক্ত পান করেচে? ......না, তোর অঙ্গে এ তরবারি আঘাত করবো না!...এখনো নড়িস্ না, মাথা তোল্ বর্ব্বর। এখানে ভেল্কি দেখাতে এসেচিস্! জবাব দে।...এখনো জবাব দিলি না? কে তুই? বল্...

(বরাটের দিকে অগ্রসর হইয়া তাহার মুখে বাঁধা বস্ত্র-খণ্ড টানিয়া সরাইল; রূপসী ছুটিয়া আসিয়া দুই-জনের মধ্যে দাঁড়াইয়া নিরঞ্জনকে সরাইয়া দিল)

রূপসী। ওকে তুমি স্পর্শ করো না...

নিরঞ্জন। আমি বিস্মিত হচ্ছি রূপসী—এত শক্তি তুমি কোথায় পেলে?

রূপসী। এ আমায় রক্ষা করেছে।

নিরঞ্জন। এ রক্ষা করেচে! কিন্তু বড় বিলম্ব হয়ে গেছে, রূপসী! মহৎ কাজ করেছে ও, সন্দেহ নেই... কিন্তু—

রূপসী। শোনো, তোমায় মিনতি কচ্ছি, একটা কথা শোনো। এ আমায় শুধু রক্ষা করেনি, আমায় বিপুল সম্মানে সম্মানিত করেছে, বিপুল গৌরব দিয়েছে, পুরুষের প্রতি অনেকখানি শ্রদ্ধা জাগিয়ে তুলেছে, প্রভু! ...এখন এখানে আমার আশ্রিত হয়ে এসেচে ও, আমি ওকে কথা দিয়েচি, কেউ ওর কেশাগ্র এখানে স্পর্শ করবে না। তুমি অবধি না...রাগ করচো? করো, কিন্তু আমার একটা কথা শোনো—

নিরঞ্জন। এ কে—আমি জানতে চাই।

রূপসী। এ বরাট।

নিরঞ্জন। কে! কি বললে!...যাকে আমি খুঁজচি, সেই বরাট?

রূপসী। হাঁ, বরাট। তোমার অতিথি আজ, আমার আশ্রিত। তোমার বন্ধুত্ব প্রার্থনা করতে এখানে এসেচে। এই বরাটই আমাকে দারুণ কলঙ্ক, দারুণ অপমান থেকে রক্ষা করেচে!

নিরঞ্জন। (মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া, পরে) হাঁ, এইবারে বুঝেচি সব!...এই তো আমার রূপসীর যোগ্য কাজ! রূপসী, সহধর্ম্মিণী আমার—বেশ করেচো! পতির ব্রতে আজ তুমি বড় সাহায্য করেচো সতী, ঠিক কাজ করেচো!... তোমার কৌশল এখন আমি বুঝেচি! দুরাত্মাকে ছলে ভুলিয়ে এখানে টেনে এনেচো! বাঃ, এ যে আমি কল্পনা করতে পারিনি, রূপসী! দুর্ব্বল নারী আত্মহত্যা করে; সে দুর্ব্বলতা, পাপ! তাতে কোনো লাভ নেই...ক্ষতি! ঋণ আরো বেড়ে যায়। কিন্তু তুমি! উচিত কাজ করেচো...জয়ের আভাস পাচ্ছি আমি... (হাস্য) তোমার পিছনে-পিছনে পোষা কুকুরের মত চলে এলো!... মূর্খ! এত সহজে ফাঁদে পা দিল! আশ্চর্য্য! নিরাশ্রয় একা ওকে গোপনে শিবিরে মেরে ফেললে কি হতো? কিছু না! এখানে কে জানতো? কেউ না! তোমার কোন গৌরব হতো না—লোকের মনে সন্দেহের ছায়া থেকে যেতো। আর এখন? চমৎকার হয়েচে! হাঃ হাঃ সবাই এখন জানবে, সবাই এখন বুঝবে, নারীর বল কত অসীম, বুদ্ধি তার কত গভীর! না, ওদের ডাকি—সকলকে ডাকি। সকলে এসে দেখুক, নিজের চোখে তোমার গৌরব দেখুক—দেখে মাটির কীট সব ধন্য হয়ে যাক—কৃতার্থ হয়ে যাক্! (বাতায়নের ধারে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে) এসো, সকলে এসো এখানে। বরাট—বরাট আমাদের কবলে এসেচে। আমাদের শত্রু, মান্দারের শত্রু, মনুষ্যত্বের শত্রু! সেই বরাটকে আমাদের মুঠোর মধ্যে পেয়েচি আজ। এসো সকলে।'

রূপসী। (নিরঞ্জনকে ধরিয়া) ও কি করচো তুমি! তুমি কি উন্মাদ হয়েচো? শোনো, শোনো—

নিরঞ্জন। (রূপসীকে হঠাইয়া) না,—কোন কথা শুনবো না, কোন কথা শুনতে চাই না আর! বরাট, বরাটকে আমি পেয়েচি। এসো, সকলে এসো, আমার বৃদ্ধ পিতাকেও সঙ্গে নিয়ে এসো। বড় আনন্দ—বড় সমারোহ আজ! সকলে আজ রূপসীর জয়ধ্বনি করো—আমিও তোমাদের সুরে সুর মেলাই।

( জনতার প্রবেশ ; সঙ্গে আর্য্যধন প্রভৃতি )

বিচার আছে—ভগবান আছে ! কে বলে—নেই ? মূর্খ সে, পাগল সে !···আমি ভেবেছিলুম, কত দিন, কত মাস, কত বৎসর তার প্রতীক্ষায় থাকতে হবে ! তার জন্য কত নগর, কত বন চ্ঁড়তে হবে, কত নদীতে ঝাঁপ দিতে হবে—কিন্তু না, না, এত সহজে বরাটকে পেয়েচি ! ওঃ ! আমার বিশ্বাস হচ্ছে না···কিন্তু না, কেন, অবিশ্বাস কেন ? ঐ যে, ঐ বরাট—( আর্য্যধনকে ধরিয়া ) দেখচো বৃদ্ধ, তোমার বন্ধু বরাটকে দেখেচো ?

আর্য্যধন। হাঁ। এই বরাট--

নিরঞ্জন। এই বরাট। দেখ, চিনতে পারচো ?

আর্য্যধন। বরাটই।

নিরঞ্জন। হাঁ, সে-ই। চেয়ে দ্যাখো, কোন ভুল, নয়—কোন সন্দেহ নেই !···দেখ, আরো কাছে এসে দেখ, স্পর্শ করে দেখ। হয়তো নতুন কোন সংবাদ থাকতে পারে।—হাঃ-হাঃ ! আর সে উদ্ধত শির নেই, উজ্জ্বল বেশ নেই—তবু এতটুকু দয়া করবো না আমি, করা হবে না। কদর্য্য হীন ফন্দিতে যে আমার অপমান করেচে, নিষ্ঠুর বর্ব্বরের মত আমার শান্তির গৃহে আগুন লাগিয়েচে ! আমার স্ত্রী—কারো সম্মানের প্রতি লক্ষ্য করে নি,—এত বড় কাপুরুষ, এত বড় নৃশংস বরাট আজ আমার মুঠোর মধ্যে এসেছে—আমি তার শাস্তি দেবো। এমন শাস্তি যে সে-শাস্তির কথা শুনে—বড়-বদমায়েস্ যে, তারও সমস্ত শরীর কেঁপে শিউরে উঠবে···শুনে পঙ্গু হয়ে বসে পড়বে ! তাদের সমস্ত শয়তানী উবে যাবে !···হাঁ, এসো, আরো কাছে এসো·· পালাবার পথ নেই আর—পালাতে পারবে না। এমন কোন দেবতা নেই দানব নেই যে তোকে আমার গ্রাস থেকে আজ ছিনিয়ে নেবে ! ···শোন্ পাষণ্ড, তোমরাও শোনো, এই দুর্বৃত্ত দস্যু তোমাদের ধ্বংস করছিল, তোমাদের সুখের ঘর শ্মশান করে দিতে এসেছিল, তোমাদের সর্ব্বস্ব লুঠ করতে উদ্যত হয়েছিল, তোমাদের স্ত্রীদের কন্যাদের সম্মান হরণ করবার জন্য হাত বাড়িয়েছিল, তাকে কি শাস্তি দিতে চাও তোমরা ? বলো, সকলে বলো, সকলের কথা আজ আমি রক্ষা করবো। সকলের মিলিত ব্যবস্থায় প্রচণ্ড শাস্তি আবিষ্কার হবে। আমার স্ত্রী তাকে আজ আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে ! ·· রূপসী, মান্দার এ ঋণ কখনো ভুলবে না। মন্দির গড়ে তাতে তোমার মূর্ত্তি স্থাপনা করবে, মান্দার সে-মূর্ত্তির পূজা করবে।··· শোনো, তোমাদের রাণী কি বলতে চান, শোনো—

রূপসী। হাঁ, সকলে এসেচো—তোমরা সকলে শোনো। আমি এক আশ্চর্য্য কাহিনী বলবো, শোনো—

নিরঞ্জন। মন দিয়ে শোনো। এমন কাহিনী, নারীর এত বড় জয়ের কাহিনী তোমাদের পুরাণে নেই, ইতিহাসে নেই ! শোনো—

রূপসী। সত্যই নেই। এত বড় গৌরব, এত বড় সম্মান, পুরুষের সংযমের এত বড় কাহিনী আজ পর্য্যন্ত কেউ শোনে নি, কখনো কল্পনা করে নি। বাবা, আপনিও শুনুন···

নিরঞ্জন। বলো, রূপসী—আসল কথা শীঘ্র করে খুলে বলো। দেখ, এরা শোনবার জন্য অধীর হয়ে রয়েচে !

রূপসী। হাঁ, শোনো মান্দারবাসী, তোমরা সকলে শোনো, জীবনে কখনো আমি মিথ্যা বলিনি—চিরদিন সত্য পথে চলেছি, সত্য কথা বলেছি—কোন বিষয়ে কোনো গোপনতা কখনো রাখিনি—আজও কিছু গোপন করবো না। এত বড় সত্য আমি আর কখনো বলিনি, শোনো। আমার পানে চেয়ে দ্যাখো, সকলে—আমার প্রাণের মধ্যে দৃষ্টি রেখে শোনো—সমস্ত দেবতার নামে শপথ করে আমি বলচি—আমার কথা বিশ্বাস করো···কাল রাত্রে এই শত্রুর শিবিরে আমি গেছলুম। উপায় ছিল না : দারুণ ভয়ে কম্পিত বুকে গেছলুম ! কিন্তু শত্রু আমায় স্পর্শ করে নি, আমায় অপমান করে নি—প্রচুর সম্মানে সম্মানিত করে ভগ্নী বলে সে আমায় সম্বর্দ্ধনা করেছে। যেমন নিষ্কলঙ্ক দেহ-মন নিয়ে আমি গেছলুম, তেমনি নিষ্কলঙ্ক দেহ-মন নিয়ে ফিরে এসেছি ! এতটুকু কলঙ্ক আমায় স্পর্শ করে নি ! আমি ফিরে এসেচি,—মানুষের উপর সুগভীর শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস-ভরা হৃদয় নিয়ে···আমার ভাইয়ের ঘর থেকে আমি ফিরে এসেছি !

নিরঞ্জন। এ কথা আমাদের তুমি বিশ্বাস করতে বলো রূপসী ?

রূপসী। বলি এ কথা সত্য।

নিরঞ্জন। বরাট হঠাৎ এমন মহৎ হলো। তাহার কারণ ?

রূপসী। কারণ, বরাট আমায় ভালোবাসে। তার তরুণ বয়স থেকে, প্রথম কৈশোর থেকে সে আমায় ভালোবাসে।

নিরঞ্জন। এই কথাই আমি শুনবো, ভাবছিলুম। ···ঠিক···তোমার চোখে তাই আমি অস্বাভাবিক দীপ্তি দেখচি !···কি বললে ? তোমায় ও স্পর্শ করে নি···?

রূপসী। না, স্পর্শ করে নি। বিশ্বাস হচ্ছে না ? তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না ? তুমি আমায় চেনো, তুমি আমায় জানো ত—আমি সত্য কথা বলছি, কিছু গোপন করিনি--

নিরঞ্জন। সত্য কথাই বলেচো ! কিন্তু বড় অসম্ভব সত্য রূপসী। একটা বর্ব্বর, বিশ্বাসঘাতকতায় যে

হঠে না, নিমকহারামিতে পেছপাও নয়, সারা পৃথিবীর শত্রু, মনুষ্যত্বের শত্রু, শান্তির শত্রু, আনন্দের শত্রু—চট করে সে এতখানি মহৎ হয়ে উঠবে! অসম্ভব, রূপসী। পৃথিবীতে সম্ভাবনার একটা সীমা আছে—সে সীমার অনেক দূরে তুমি আমাদের যেতে বলচো! কাল সন্ধ্যার কামোন্মত্ত বর্ব্বর, অমন স্নিগ্ধ চন্দ্রকরোজ্জ্বল রাত্রি, সুন্দরী কিশোরী, নির্জ্জন অবসর—এ তুমি কি বলচো রূপসী! পুরাণেও এমন অসম্ভব গল্প কেউ কখনো পড়েনি··· তোমরা বলো, এ কাহিনী তোমরা বিশ্বাস করেচো কেউ? (সকলে নিস্তব্ধ) যারা বিশ্বাস করেচো, তারা আমার দিকে অগ্রসর হয়ে এসো—[ আর্য্যধন শুধু অগ্রসর হইল] তুমি, বাতুল বৃদ্ধ, এ প্রলাপ তুমিই শুধু বিশ্বাস করেচো—কিন্তু চেয়ে দ্যাখো, আর কেউ বিশ্বাস করেনি।

আর্য্যধন। ওরে মূঢ় হতভাগা মান্দার, অকৃতজ্ঞ পাষণ্ড মান্দার, নীচ কুৎসিত মান্দার—না, তোদের কোনো কথা বলতে চাই না!···কিন্তু নিরঞ্জন, এ-ভাবে সতীর অমর্য্যাদা তুমি করো না। সতী, সে তোমার স্ত্রী! মনে রেখো, সীতাদেবীর অগ্নি-পরীক্ষার কথা।···সতীর পরীক্ষা চাও! লজ্জা হয় না? মায়ের মুখ দেখেও বুঝচো না! ধিক! তোমাদের আর কি বলবো? মা, মা আমার, এরা বড় হীন, বড় নীচ, ও-মহত্ত্ব এরা ধারণা করতে পারে না—নিজেদের পাপে-ভরা জর্জ্জরিত হৃদয় নিয়ে অপরের হৃদয়ের বিচার করে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করেচি মা, তোর প্রতি কথা আমি বিশ্বাস করেচি।

নিরঞ্জন। তুমিও এই চক্রান্তের মধ্যে আছ! তোমার বিশ্বাসে মান্দাদের কিছু এসে যায় না।

আর্য্যধন। এই মান্দারই সব নয়। মান্দারের উপর যে বড় মান্দার আছে, আমার বিশ্বাসে তার বিস্তর এসে যাবে পুত্র।

নিরঞ্জন। বাতুলের সঙ্গে বাদানুবাদ করা বাতুলতা! যাক,···রূপসী, তুমি দেখলে—মান্দার তোমার এ কাহিনী বিশ্বাস করলে না!

রূপসী। মান্দারের বিশ্বাস-অবিশ্বাস আমি গ্রাহ্য করি না। এরা কি জানে? কাকে জানে? কিন্তু তুমি, তুমি বলো, তোমার স্ত্রীর কথা তুমি বিশ্বাস করেচো কিনা! ···চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখচো—হাঁ, দেখ, আমার দিকে চেয়ে দেখ, আমার মুখের পানে চেয়ে দেখ, দেখে বলো, তোমার মনে কোন সংশয় আছে কি না···

নিরঞ্জন। অবিশ্বাস! বলা কঠিন, রূপসী···যে ঝড় আমার উপর দিয়ে বয়ে গেছে, সে ঝড় আমায় একেবারে জীর্ণ করে দেছে, আমার বার্দ্ধক্য এসেচে! আমি চোখে সমস্ত ঝাপসা দেখচি—আমার চোখের সে আলো নিবে গেছে, আমার কাণে আমি সমস্তই অস্পষ্ট শুনচি। অনেক আশা করেছিলুম রূপসী, মনে বড় আশা হয়েছিল,—যাক···আমি ঠিক বুঝতে পারচি না, কিছু বুঝতে পারচি না। রাগ নয়, রূপসী, হিংসা নয়—আমার মন এখন খুব শান্ত, কিন্তু সে থই পাচ্ছে না—কোন্‌টাকে অবলম্বন করবে, তার কিছু বুঝচে না··· যাক, ও আর ভাববো না। আমার এক কথা—একে শাস্তি নিতে হবে! তারপর তোমার কথা পরে ভেবে দেখবো ···তোমার কোন অপরাধ নেই—যা হয়ে গেছে, তা আর ফেরবার নয়। উপায় নেই। তুমি সত্য বলেচো? হবে! পরে মন স্থির করে আবার তোমার কথা শুনবো। হয়তো এখন যা অবিশ্বাস করচি, পরে তা বিশ্বাস করবো!

রূপসী। কিন্তু আমার পানে আবার তুমি চেয়ে ছাখো—ছাখো, এই চোখের পানে চেয়ে ছাখো, আর এই স্বর—একটুও কম্পিত দেখচো! এমন অকম্পিত স্বর দেখেও তুমি কিছু বুঝচো না!···এমন করে মাথা তুলে তোমার সামনে দাঁড়াতে পাচ্ছি, তবু তুমি বিশ্বাস করচো না! আশ্চর্য্য! কিন্তু আমি সত্য কথা বলেচি, প্রভু—বরাট আমায় স্পর্শ করেনি—বরাটের দৃষ্টিতেও আমি এতটুকু কালিমা দেখিনি!

নিরঞ্জন। খুব ভালো কথা, রূপসী, খুব ভালো কথা। তোমরাও সব শুনেচো ত, এখন সকলে যাও।···তবে যাবার আগে একটা কথা শুনে যাও—এদের দুজনকে পথ ছেড়ে দিয়ো—আমার স্ত্রী আর এই বাতুল বৃদ্ধ। এরা তোমাদের দারুণ বিপদ থেকে উদ্ধার করেচে—তোমাদের প্রাণ দিয়েচে। এদের পথ কেউ রোধ করো না।··· রূপসী, তোমার-আমার মধ্যে সব সম্পর্ক শেষ—এ ঘটনার পর আর নতুন করে গ্রন্থি দেওয়া চলে না। আমি মানুষ, যদি অবিচার করে থাকি—মানুষ বলেই মার্জ্জনা করো। কিন্তু এই পাষণ্ড—এর শাস্তি আমি দেবো—অন্ধকার কারাগারে আপাতত একে নিক্ষেপ করবো, তার পর অনেক ভেবে শাস্তির ব্যবস্থা ঠিক করতে হবে। এর মুক্তি নেই, মুক্তি নেই—কিছুতেই মুক্তি নেই।

রূপসী। মুক্তি নেই···? ওগো, না, না, শোনো··

নিরঞ্জন। কোনো কথা নয়—কোন মিনতি শুনবো না। আমার সঙ্কল্প অটল। কারো মিনতিতে এ ব্যবস্থা টলবে না—( বরাটকে সবলে ধরিয়া ) বর্ব্বর দস্যু, তোর উপর আমার সম্পূর্ণ অধিকার—রাজার অধিকার, স্বামীর অধিকার—

রূপসী। ( সবলে বরাটকে মুক্ত করিয়া ) না, না, ওর উপর তোমার কোন অধিকার নেই! কিসের অধিকার! শোনো, সকলে শোনো। আমি মিথ্যা কথা বলেচি। আগাগোড়া মিথ্যা কথা! এখন সত্য কথা বলচি, শোনো—এই বর্ব্বর দস্যু আমায় কলুষিত করেচে—তাই শাস্তি দেবার জন্য কৌশলে ভুলিয়ে ওকে

এখানে এনেছি—নিজের হাতে আমি ওর সে-অপরাধের শাস্তি দেবো—এইটুকু আমার মিনতি! আমি কত বড় মূল্য দিয়েছি, সে কথা মনে করে এ-অধিকারটুকু তোমরা আমাকে দাও। আমি নতজানু হয়ে তোমাদের সকলের কাছে ভিক্ষা চাইছি—

বরাট। না, না, রাণী মিথ্যা কথা বলচে। আমায় রক্ষা করবার জন্য মিথ্যা বলচে। রাণী নিষ্কলঙ্কা—স্পর্শের কালিমাও রাণীর গায়ে লাগেনি—নির্ম্মল-চিত্তা সাধ্বী রাণী।

রূপসী। চুপ করো বন্দী। না হলে তোমার প্রগল্‌ভতার শাস্তি পাবে! বর্ব্বর দস্যু—না, না, এঁর গায়ে হাত দিয়ো না! (জনৈক প্রহরীর হাত হইতে শৃঙ্খল লইল) দাও, আমাকে দাও, আমি নিজের হাতে ওকে শৃঙ্খলিত করবো। আমি ওকে বন্দী করেচি—ও আমার বন্দী। বন্দীর উপর আমার অধিকার! (বরাটকে শৃঙ্খলিত করিল) তোমরা ছাখো—ওর মুখে অস্ত্র-চিহ্ন দেখচো? এ আঘাত আমিই দিয়েচি—আমি। কাপুরুষ, পশু, নারীর যে সম্মান জানে না! তার শাস্তি, তোমরা পুরুষ, তোমরা কি আবিষ্কার করবে? তার শাস্তি আমি দেবো। নারীর প্রতিহিংসা! লাঞ্ছিতা অপমানিতা নারীর স্বহস্তে-দেওয়া শাস্তি, তোমরা সে শাস্তির কথা শুনলে এখনই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বে।

নিরঞ্জন। রূপসী—কোন্ কথাটা তুমি সত্য বলচো?

রূপসী। কোন্ কথা! তুমি এত বড় যোদ্ধা হয়েও তা বুঝচো না? বুঝবে না! কেবলই দেহের শক্তি দেখে এসেচো—মানুষের মন বলে যে একটা পদার্থ আছে, তার পানে ফিরেও কখনো চাওনি! হতভাগ্য স্বামী! যাক্, আমি তর্ক তুলতে চাই না। বন্দী···এ আমার বন্দী। এর উপর আমার সম্পূর্ণ অধিকার।...শোনো সকলে, সেই শিবিরেই আমি ওকে হত্যা করতে পারতুম,—করিনি। অস্ত্র চোখের নীচে আঘাত করতে ভীত দুর্ব্বল হাত থেকে অস্ত্র খসে পড়লো—তাই এই কৌশল করে ওকে এখানে এনেচি।···বন্দীর ভার বাবা, আমি আপনার হাতে দিলুম। এর জন্য আপনি দায়ী। খুব সতর্ক থাকবেন। যেন না পালায়, যেন আমার বন্দীর কাছে আর কেউ না যায়—আমার অধিকারে কেউ না হস্তক্ষেপ করে! যান, আপনি একে নিয়ে যান্—

(আর্য্যধন বরাটকে লইয়া প্রস্থান করিল; জনতার প্রস্থান)

নিরঞ্জন। রূপসী···

রূপসী। কেন?

নিরঞ্জন। আমি বুঝচি, এ মিথ্যা—এর সমস্ত মিথ্যা! ···বলো, এখন বলো, এখন এখানে আর কেউ নেই, সব কথা খুলে বলো, আমার সামনে বলো···

রূপসী। সত্য কথা আমি বলেছি নাথ। বরাট আমার বাল্য-সহচর, মুগ্ধ। আমার পিতার কুটীরের কাছে থাকতো। আমায় সে ভালবাসতো। আমিও হয়তো আর এক মূর্ত্তিতে তাকে দেখতুম—কিন্তু তার আগে সে চলে গেল! বরাট আমায় ভোলে নি, চিরদিন আমায় খুঁজে বেড়িয়েচে! সে মোহ এখনো আছে। আমায় দেখতে চেয়েছিল, কিন্তু আমার সুখের কথা শুনে 'ভগ্নী' বলে আমায় সম্বোধন করেছে—আমায় সে স্পর্শ করে নি···এর জন্য মোগলের দারুণ বিদ্বেষ সে মাথায় নিয়েচে, মোগলকে শত্রু করেচে!—তাই আমি ওকে এখানে এনেচি। ও আসতে চায় নি, আমি অভয় দিয়ে এনেচি। সেই শত্রুর হাতে নিঃসঙ্গ ওকে রেখে আসতে পারিনি। চুপ করে রইলে! বিশ্বাস হলো না?

নিরঞ্জন। বিশ্বাস করা বড় কঠিন! তুমি সুন্দরী কিশোরী, বরাট তরুণ পুরুষ, তার পর কৈশোরের সে প্রথম অনুরাগ!···বিশ্বাস করতে চেষ্টা করবো রূপসী। তোমার কথাই থাক্—বরাটের কারাগারের চাবি তুমি নিজের হাতে রাখো—যতক্ষণ না একটা প্রচণ্ড শাস্তি স্থির করিতে পারচি, ততক্ষণ বরাট তোমারই বন্দী থাক্! কিন্তু—

রূপসী। না, আর কিন্তু নয়—বিশ্বাস করতে চেষ্টা করো নাথ। নারীকে যত হেয়, যতখানি দুর্ব্বল মনে করো, নারী ঠিক ততখানি দুর্ব্বল নয়। নারীর চিত্ত ছোট নয়, সামান্য জিনিষ নয়—বোধ হয়, পুরুষেরও এতখানি চিত্ত নেই!·· বেশ করে বুঝে দেখো নাথ। দেখবে, এ সমস্ত দুঃস্বপ্নের মত মিলিয়ে যাবে ···প্রভাতের আলোয় প্রাণ তোমার ভরে উঠবে! তোমার চোখে আমি তার আভাস দেখতে পাচ্ছি···তা যদি না দেখতুম, তাহলে বাঁচবার কোন সাধ রাখতুম না। কাল-রাত্রি থাকে না, দিনের আলো ফোটেই—সেই আশায় আমি ধৈর্য্য ধরে থাকবো; আমার কোন দুঃখ নেই, কোন অভিমান নেই। ঐ আলোর আশা-পথ চেয়ে আমি ধৈর্য্য ধরে থাকবো। যদি সে আলো ফুটতে দেরী হয়, অনেক—অনেক দেরী হয়, তবু ধৈর্য্য হারাবো না। আমি জানি নাথ, এ আলো তোমার বুকে, তোমার চোখে ফুটবে, এ আলো ফুটবেই!

যবনিকা

# আধুনিক সামাজিক সমস্যা ও তাহার সমাধান

নগ্না

## প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা

এই যে চারিধারে দাস-মনোভাব (slave-mentality), অবরোধ-মুক্তি প্রভৃতি বড় বড় কথা লইয়া তুমুল গবেষণা চলিয়াছে, গবেষণায় সমস্যা ঘনীভূত হইতেছে এবং সে-সমস্যার সমাধান মিলিতেছে না, ইহার কারণ কেহ অনুধাবন করিয়া দেখিয়াছেন কি?

কখনোই না। তাহা দেখিলে এমন putting the cart before the horse-এর মত হাস্যকর ব্যাপার ঘটিত না। এ ভাবে সমস্যা-সমাধানের প্রয়াসে মস্ত logical fallacy বর্ত্তমান—যে fallacyকে বিজ্ঞ প্রফেশরের দল বলেন, petitio principii.

এ সমস্যা-সমাধানের একটিমাত্র উপায় আছে। সে উপায়, মানব-সৃষ্টির কাল হইতে আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত সমাজ-তত্ত্বের আলোচনা। যেহেতু আজ যে দাস-মনোভাব, অবরোধ-মুক্তি প্রভৃতি কথা উঠিয়াছে, এ সবের অন্তরালে প্রকাণ্ড সমাজটুকুকে আমরা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। এ সমাজ বিধাতার তৈয়ারী নয়। মানুষ এ সমাজের সৃষ্টি করিয়াছে—নিজের সুখ-সুবিধা-স্বার্থ প্রভৃতি লইয়া যাহাতে স্বচ্ছন্দ মনে অক্ষত দেহে সকলে বাস করিতে পারে, সেই কারণে। কাজেই দেখা যাইতেছে, প্রথম যে দিন আদি মানব-মানবী আসিয়া মর্ত্ত্যে দেখা দিলেন, সে দিন এ সমাজের অস্তিত্ব ছিল না; এবং সমাজ না থাকার দরুণ ঐ দাস-মনোভাব, অবরোধ বা মুক্তির কোনো বালাই কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। অতএব, আজিকার এ সমস্যা-সমাধানের উপায়-নির্দ্ধারণের প্রয়াস পাইতে গেলে আমাদের প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য, মানবের প্রথম অভ্যুদয় এবং মানবের ইঙ্গিতে বা বুদ্ধি-কৌশলে এই সমাজ-বস্তুটির সৃষ্টির ইতিহাস ও উক্ত সমাজে ক্রম-বিবর্ত্তনের ধারার আলোচনা করা।

## সৃষ্টি-তত্ত্ব

যাঁরা বুদ্ধিমান্—অর্থাৎ পাঠক-পাঠিকাবর্গের মধ্যে যাঁদের বুদ্ধি আছে—অন্ততঃ যে সব পাঠক-পাঠিকার মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে তাঁদের বুদ্ধি প্রচুর—তাঁহাদিগকে এ কথা প্রমাণ-প্রয়োগে বুঝাইতে হইবে না যে, বিধাতা একসঙ্গে একযোগে এই প্রকাণ্ড নর-নারীর বিরাট মেলা গড়িয়া তুলেন নাই। আজিকার এই নর-নারীর বিশাল অক্ষৌহিণী আচম্বিতে কাহারো দ্বারা গড়িয়া তোলা কখনও সম্ভব হইতে পারে না! কেন সম্ভব হইতে পারে না, তাহার প্রমাণ আমাদের নিত্য-কার জীবনে প্রচুর পাই। যথা:—

১। সদনুষ্ঠান-কল্পে আমরা যদি সাধারণের কাছে চাঁদা চাহি, সে চাঁদার মোট টাকা আদায় করা কেমন কঠিন, ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন।

২। কোনো মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্র বাহির করিলে তার পাঁচশো গ্রাহক সংগ্রহ করা কতখানি দুঃসাধ্য ব্যাপার!

৩। একশোটি টাকা জমাইব বাসনা করিলে কি সে টাকা জমানো যায়?

ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সুতরাং এ কথা ভালো করিয়া বুঝিলাম, এই বিশ্ব-জোড়া নর নারীর সৃষ্টি চট করিয়া ঘটে নাই। ইহাতে বহু বহু যুগ-সময় লাগিয়াছে। এ সম্বন্ধে একটিমাত্র শাস্ত্রীয় প্রমাণ যথেষ্ট বলিয়া মনে করি। যেহেতু আপনারা জানেন, আমার প্রবন্ধাদি মূর্খ বা নিরেট পাঠক-পাঠিকার জন্য আমি কস্মিন্‌কালে লিখি না। আমার পাঠক-পাঠিকার বুদ্ধি চিরদিন প্রখর—নচেৎ কলম ধরিবার প্রবৃত্তি আমি বহু কাল পূর্ব্বে সমূলে বিনষ্ট করিতাম।

যে শাস্ত্রীয় প্রমাণের কথা বলিতেছিলাম—পৃথিবীর নর-নারী যে বহু বহু যুগ ধরিয়া মর্ত্তাধামে বর্ত্তমান থাকিয়া আসিতেছে, নিমেষে তাহা প্রতীতি হইবে পঞ্জিকার পৃষ্ঠা খুলিলে। পঞ্জিকার গোড়ার দিকে "হর-পার্ব্বতী সংবাদ" অধ্যায়ে দেখিবেন, "অথ সত্যযুগোৎপত্তিঃ,—"তৎপরিমাণবর্ষাণি ১৭২৮০০০"; তার পর অথ "ত্রেতাযুগোৎপত্তিঃ—তৎপরিমাণ-বর্ষাণি ১২৯৬০০০"; তার পর দ্বাপরযুগ—৮৬৪০০০ বৎসর এবং এই কলিযুগে বর্ষ-পরিমাণ, ৪৩২০০০। অঙ্ক-শাস্ত্রে যারা অতীব অজ্ঞ, তারাও এই সংখ্যাগুলির যোগ-ফল-নির্ণয়ে রসনা মেলিবেন না, নিশ্চয়! অতএব দেখা যাইতেছে, এত দীর্ঘ দীর্ঘ বৎসর ধরিয়া এই পৃথিবী টি কিয়া আসিতেছে—এবং এখন সেন্‌সাসে এই যে বিরাট জনসংখ্যার পরিমাণ আমরা পাইতেছি, তাহা গড়িয়া তুলিতে বেচারী ভগবানের কত বৎসর সময় লাগিয়াছিল, হিসাব করুন!

তাহা হইলে প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে—ভগবান্ প্রথমে ক'জন নর-নারীর সৃষ্টি করিয়া মর্ত্ত্যে পাঠাইয়াছিলেন?

এ বিষয়ে গবেষণা দ্বারা আমরা জানিয়াছি, দু'জন। এক জন পুরুষ ও এক জন নারী। যদি বলেন, প্রমাণ? আমি বলিব, আদম ও ঈভ। মানিবেন না? না মানেন, কেহ আপনাকে মাথার দিব্য দিতেছে না! আর কেনই বা মানিবেন না, বুঝি না। আদম ও ঈভ যদি সত্যই না থাকিবে, তবে শয়তান মিথ্যা? সাপ মিথ্যা? আপেলও মিথ্যা?

অসম্ভব! শয়তান মিথ্যা নয়। যেহেতু যে আপনার দুশমণ, তাকে আপনি কখনো 'শয়তান' বলেন নাই? গোয়ালা দুধে জল মিশাইলে, স্যাকরা পাণ দিয়া গহনার বাণী বেশী ধরিলে, বৈবাহিক তত্ত্ব ফাঁকি দিলে, আপনি বলেন নাই, ব্যাটা শয়তানী করিয়াছে? দুনিয়ায় যখন এত শয়তানী, তখন প্রমাণ পাইলাম, শয়তান মিথ্যা নয়, কবির কল্পনা নয়।

সাপ? সাপ যে মিথ্যা নয়, তার প্রমাণ আর কোথাও সংগ্রহ করিয়া কাজ নাই—প্রাণঘাতী ব্যাপার ঘটিতে পারে। সোজা চলিয়া যান আলিপুরের চিড়িয়া-খানায় Reptile House-এ। তা ছাড়া পথে সাপুড়ের খেলা দেখেন নাই? অতএব সাপের অস্তিত্বও প্রমাণ হইয়া গেল।

ইডন গার্ডেন যে আছে, তার প্রমাণ কলিকাতার ষ্ট্রাণ্ড। ঐ কেল্লার (Fort William) উত্তরে ক্যাল-কাটা গ্রাউণ্ড, তার কাছে···সেই যে ব্যাণ্ড ষ্ট্যাণ্ড, বর্মীজ প্যাগোডা—মনে পড়িয়াছে? অতএব প্রমাণ পাইলাম!

আর আপেল ফল? যদি নগদ পয়সা ব্যয় করিবার শক্তি থাকে তো একবার হগ সাহেবের বাজারে যান, নয়তো কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে, নয়তো শেয়ালদা ষ্টেশনের পশ্চিম ফুটপাথে! যত চান—আপেল পাইবেন।

কাজেই দেখা গেল, শয়তান আছে, সাপ আছে, ইডন্ গার্ডেন আছে, আপেল আছে। এতগুলি যদি সত্য হয়, আদম ঈভকেও সত্য হইতে হইবে, তাদের মিথ্যা বলিয়া উড়াইবার উপায় নাই।

কাজেই দেখা যাইতেছে, সৃষ্টির আদি যুগে ছিলেন একটিমাত্র নর এবং একটিমাত্র নারী। হাট ছিল না, বাজার ছিল না, সমাজ ছিল না, আইন ছিল না, আদালত ছিল না, ঘর ছিল না, বাড়ী ছিল না। মনের সুখে আদম বেড়াইত এক দিকে, ঈভ বেড়াইত আর-এক দিকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, দাস-মনোভাব কিম্বা ঐ অবরোধ বা মুক্তি কিছুই ছিল না। ও-অবস্থায় থাকিতে পারে না! কার জন্ম থাকিবে? স্কুলে যদি একটিমাত্র ছাত্র থাকে—তবে পরীক্ষায় ফার্ষ্ট-সেকেণ্ড হওয়ার বালাই থাকে না—থাকিতে পারে না।

এখন কথা এই, আদম আর ঈভ কি খাইত? গাছের ফল, নদীর জল, আর অবাধ হাওয়া। নিত্য এক জিনিষ খাইলে মানুষের অরুচি ধরে, এ কথা সর্ব্ববাদি-সম্মত। তার পর কাজ-কর্ম্ম না থাকিলে মানুষ শুধু হাই তোলে আর ঘুমায়। হরদম ঘুমাইলে শরীর খারাপ হয়, মাথা ধরে এবং বিবিধ উপসর্গ ঘটে। এক দিন আদমের মাথা ধরিয়াছিল; ধরা মাথা লইয়া বেচারী পড়িয়াছিল নদীর ধারে। ঈভ আসিয়া দেখিল, লোকটা পড়িয়া আছে।

ঈভ কহিল,—শুয়ে আছো!

আদম কহিল—হুঁ।

ঈভ কহিল,—কেন?

আদম কহিল,—মাথা দপ্ দপ্ করচে, মাথায় ব্যথা।

ঈভের মাথাও দপ্ দপ করিতেছিল। সে কি মনে করিয়া নদীর জলে গিয়া নামিল, আঁজলা ভরিয়া জল লইয়া মাথায় দিল। মাথাটা যেন একটু জুড়াইল। কি খেয়াল হইল, একটু জল লইয়া আদমের কাছে আসিল, আঙ্ লের ফাঁক দিয়া জল পড়িয়া গেল, সেই ভিজা হাতে আদমের কপাল চাপড়াইল। অমনি আদম উঠিয়া বসিল, কহিল,—বাঃ, মাথাটায় আরাম বোধ হচ্ছে।

এমনি করিয়া দু'জনে পরিচয়।

আর এক দিনের কথা বলি। পথ চলিতে ঈভ দেখে, একটা গাছে থোলো থোলো ফল পাকিয়া টস্‌টস্ করিতেছে। সে হাত বাড়াইল, নাগাল পাইল না। অথচ বড় সাধ, ঐ ফল খায়। সে পথে আদম আসিতেছিল।

আদম কহিল,—কি হচ্ছে?

ঈভ কহিল,—কেমন ফল, ছাখো।

আদম কহিল,—খাবে?

ঈভ কহিল,—খাবো।

আদম কহিল,—খাও।

ঈভ কহিল,—নাগাল পাচ্ছি না···

আদম ঈভের পানে চাহিল। বেচারী! আদম চট্ করিয়া গাছে চড়িল, ফল পাড়িয়া নিজে খাইল, ঈভকে দিল।

দ্বিতীয় দিন এমনি ভাবে পরিচয়!

আদম বুঝিল, তার গায়ে শক্তি আছে; ঈভ যা পারে না, সে তা পারে। আরো বুঝিল, ঈভ দেখিতে বেশ—মুখের কথাগুলি খাশা। আর ঈভ? ঈভ বুঝিল, আদমের সঙ্গে ভাব করিলে উঁচু ডাল হইতে ফল পাড়িয়া খাওয়াইবে! আদম ভাবিতেছিল সে-দিনকার সেই ভিজা হাতে মাথা চাপড়ানোর কথা। সেবায় আরাম পাইয়াছিল।

আদম কহিল,—অত দূরে থাকো কেন?

ঈভ কহিল,—তাই ভাবছিলুম, কাছাকাছি আসবো!

পরস্পরের স্বার্থ, সাহায্য—এটুকু যেমন বুঝা, অমনি বন্ধুত্ব!

ভগবান্ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার লোক নন্, তাঁর মাথায় ফন্দী খেলিতেছে, সেই কোন্ সত্য যুগেরও বহু পূর্ব্ব যুগ হইতে। প্রমাণ? নারদ-সংহিতা পড়ুন। কিম্বা মহাভারতীয় যুগে ভীম শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, চক্রী তুমি। • মনে আছে?

একবার দুটি নর-নারী গড়িয়াছেন। গড়ার নেশা! ভগবান্ আরো গড়িতে লাগিলেন। কাজেই একটি দুটি করিয়া মর্ত্ত্যধামে লোক জমিতে লাগিল। তখন তো মোহন-বাগানের ম্যাচ ছিল না যে, এক-দম ট্রাম ভরিয়া, বাস ভরিয়া, পায়ে হাঁটিয়া কিল-বিল করিয়া লোক আসিবে! একটি দু'টি করিয়া লোক-সংখ্যা ক্রমে বাড়িতে লাগিল। মাথা সকলের এক রকম নয়। † কেহ মাঠ চষিতে লাগিল, কেহ চাল বেচিতে লাগিল; কেহ ধার চাহিতে লাগিল, কেহ ধার দিয়া সুদের সুদ গণিয়া বাক্স ভরিতে থাকিল, কেহ বই লিখিতে লাগিল; কেহ কাণা কড়ি দিয়া সে লেখা কিনিয়া বই ছাপিয়া বড় পাব্লিশার বনিয়া উঠিল—এমনি করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রথম সূত্রপাত! ঠিক এমনি সূত্র ধরিয়া পুরুষের দল ব্যবসাতে যায়, ফিরিয়া আসিয়া রাঁধিয়া বাড়িয়া আহার করে। তাহাতে আরাম নাই। মেয়েদের ডাকিয়া তারা বলিল, —তোমরা তো মাঠে লাঙ্গল ঠেলিতে পারিবে না, আমাদের রাঁধিয়া দাও, ভাতের বখরা দিব।

এমনি করিয়া নারী শারীরিক শক্তির অভাবে পুরুষের দাস্য প্রথম স্বীকার করিল। ক্রমে এই প্রভুত্ব ও দাস্য-ভাব নর-নারীর অভ্যাস হইয়া গেল।

কিন্তু সকল যুগেই চিরকাল এক শ্রেণীর লোক দেখা যায়, যাদের দৃষ্টি শুধু বর্ত্তমানে নিবদ্ধ থাকে না, ভবিষ্যতের সন্ধানে ঘোরে। এইরূপ একদল দূরদর্শী দেখিল, নারীর দল আরামে খাইয়া গায়ে বেশ শক্তি সংগ্রহ করিতেছে। যদি কোনো দিন এ দাস্যে অতৃপ্ত হইয়া বিদ্রোহ করিয়া বসে? গোপনে এই দূরদর্শীর দল মিলিয়া একটা মিটিং ডাকিল এবং আরো গোপনে পরামর্শ আঁটিয়া স্থির করিল—নারীগুলোকে বাঁধিয়া এমন ভাবে রাখা চাই, যাহাতে উহারা মুখ তুলিবার কল্পনা না করিতে পারে!

তখন শাস্ত্র তৈয়ার হইয়া গেল। অনুস্বার-বিসর্গের প্রলেপ দিয়া এমন হিত-কথা রচিত হইল, যার অর্থ—স্ত্রীলোক অতি নির্ব্বোধ, অতি মূঢ়, অতি বেচারা, অতি অসহায়—তাই পুরুষ প্রবল দাক্ষিণ্যগুণে তাদের পক্ষপুটাশ্রয়ে চিরদিন রক্ষা করিবে। নারী সেই আশ্রয়-টুকু যদি সম্পূর্ণ নিঃশঙ্কে মানিয়া চলিতে পারে, তবেই জীবনে তার পরম সৌভাগ্য, এবং জীবনান্তে অক্ষয় স্বর্গ-লাভ হইবে।

তার পর এক দল লোককে গহনা গড়ানোর কাজে নিযুক্ত করা হইল; এমনি ভাবে গহনা, বেনারসী বস্ত্রাদি ও শাস্ত্র-বাক্য—এই ত্রিবিধ শৃঙ্খলে নারীকে আবদ্ধ রাখা হইল।

যুগ যুগ ধরিয়া এই ব্যবস্থা চলিল। পুরুষ যথা-ইচ্ছা প্রভুত্ব খাটাইয়া চলে, বা-খুশী করিয়া বেড়ায়, নারী নত-শিরে সে-প্রভুত্ব মানিয়া নারী-জন্ম সার্থক করে।

কিন্তু এমন ব্যবস্থা না কি কোথাও টিঁকে নাই। সর্ব্বদেশের ইতিহাস একবাক্যে বলিয়া আসিতেছে—absolute monarchy ক্ষয় পায়, ব্যাঙকে ক্রমাগত খোঁচাইলে সেও গর্জ্জন তোলে।

তবু সেকালের বিধি-ব্যবস্থা একালে অটুট থাকিতে পারিত। কিন্তু পুরুষ অত্যধিক স্বাধীনতা ভোগ করিয়া সে-স্বাধীনতা-রক্ষায় দৃষ্টি শিথিল করিল। এই সময় কতকগুলা কুলাঙ্গারের সৃষ্টি হইল। তাদের নাম ইতিহাসে খুব ছোট অক্ষরে লেখা আছে। স্ত্রৈণ, অতি-দরদী, ফাজিল, সাহিত্যিক আর দুশ্চরিত্র। স্ত্রৈণ স্ত্রীর রূপ-যৌবনে এমন বিহ্বল হইল যে, স্ত্রী যা চায়, তাই দেয়।

স্ত্রী বলিল,—থিয়েটার দেখতে যাবো।

সে বলিল,—তথাস্তু!

স্ত্রী বলিল,—বামুন রাখো, আমি রাঁধবো না।

সে কহিল,—যথা আজ্ঞা।

স্ত্রী বলিল,—তোমার বড় ভাইয়ের সঙ্গে পৃথক হও।

সে কহিল,—এখনি।

স্ত্রী বলিল,—বাড়ী বেচিয়া আমার মা-বাপ, ভাই-বোনকে পোষো।

সে কহিল,—আলবৎ!

স্ত্রী বলিল,—জানালার পর্দ্দা ছেঁড়ো। আমায় মাঠের হাওয়া খাওয়াইয়া আনো। মিটিং করিতে দাও।

স্ত্রৈণ কহিল,—ওঁ শিবমস্তু!

অতি-দরদীর দল ব্যথায় গলিয়া বলিল,—আহা, তাই তো গা—দখিণ হাওয়ায় আমাদের বুক ভরিল, ভুঁড়ি ফুলিল—আর ও-বেচারীরা রান্নাঘরে ভ্যাপসা গরমে মরিল যে। এসো, এসো, স্কুলে এসো, কলেজে এসো!

ফাজিল সাহিত্যিকের দল বই ছাপিতে লাগিল—পুরুষ যদি কালো বৌ দেখিয়া পর-নারীর প্রেমে মজিতে

---

• পাণ্ডব-গৌরব—৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

† তা যে নয়, তার প্রমাণ, কেহ সম্পাদক, কেহ প্রিণ্টার; কেহ লেখক, কেহ সমালোচক; কেহ নাট্যকার, কেহ নট। তখন ভুঁই ফোড়া মায়ার প্রভাব ছিল কম, কাজেই একাধারে সর্ব্ব-বিদ্যাদিগ্‌গজ ব্যক্তি সেকালে একটিও ছিল না। এখন অবশ্য অনেক গজাইয়াছে।

পারে তো তুমি নারী, চাকুরে স্বামী ছাড়িয়া তরুণের হৃদয়-হরণের ব্রত গ্রহণ করো! স্বামী আহার জোগাইবে, বস্ত্র জোগাইবে, মোটর জোগাইবে—আর তুমি সেগুলির সদ্ব্যবহার-সূত্রে তরুণ প্রণয়ীর তৃষিত অধরে সুধার পাত্র ধরো।

দুশ্চরিত্রের দল মাতাল হইয়া স্ত্রীকে ঠ্যাঙায়, দিবা-রাত্রির মধ্যে বাড়ী আসে না। স্ত্রী গর্জ্জিয়া উঠিল,—তবে রে হতভাগা!

ইতিমধ্যে পুরুষের দল বহু যুগের স্বাধীনতা ভোগ করিয়া স্বাধীনতা-সম্বন্ধে এমন অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, ওদিকে স্বাধীনতা খর্ব্ব হইতে পারে, দৃষ্টি-শৈথিল্যে সে সম্বন্ধে তাদের চেতনা বিলুপ্ত হইয়াছিল। সেই শৈথিল্যের অন্তরালে ঐ হতভাগা স্ত্রৈণ, অতি-দরদী, ফাজিল সাহিত্যিক আর দুশ্চরিত্রের দল যেন সেই ভবানন্দ মজুমদার হইয়া দাঁড়াইল। পুরুষ-প্রতাপাদিত্যের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতে নর-নারীর দল মোগল-বাহিনীর মত আসিয়া রণাঙ্গনে হানা দিল। তার ফলে গৃহে বাধিল দারুণ কলহ-কলরব। স্ত্রী রাঁধিয়া ভাত দিতে নারাজ, নয় তো ঘরে চাবি দিয়া পিত্রালয়ে কিম্বা মিটিং করিতে ছোটে—ছেলে মেয়ে পালন করিতে চায় না—সর্ব্বদা বিরক্তির ঝাঁজে ঝাঁজিয়া আছে! বেচারী পুরুষ অফিস হইতে ফিরিয়া অন্দরে প্রবেশ করিতে ভয়ে শিহরিয়া ওঠে; অন্দরে গেলে দাসী-চাকরের সামনে এমন তাড়া খায় যে, তার সকল প্রভুত্ব লোণা-ধরা দেওয়ালের ঝরা বালির মত খশিয়া পড়ে! মাস-মাহিনাটি পাইবামাত্র পুরুষ দেখে, সে টাকা স্যাকরার গৃহে, নয় বেনারসী বস্ত্রালয়ে অদৃশ্য হইয়াছে। অশান্তি, উৎপাত, উপদ্রবে একেবারে ত্রাহি মধুসূদন ডাক ওঠে!

অন্ধকারে পথে বসিয়া পুরুষ বিশ্ব-পৃথিবীর ইতিহাস আওড়াইতে থাকে—যখন পুরুষ অপ্রতিহত স্বাধীনতার গর্ব্বে হুহুঙ্কার তুলিয়া বেড়াইত, নারী তার ভয়ে কাঁপিতে থাকিত! সাধ করিয়া এমন সোনার স্বাধীনতা তাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছে। বাড়ীর দলিল এখন স্ত্রীর নামে, ছেলেপিলের উপর কোনো অধিকার নাই, শুধু পয়সা ছাড়ো, পয়সা ছাড়ো! ব্যস! চাহিবামাত্র পয়সা দিতে না পারিলে…

শুনিতেছি, মহিলা-সভা ইস্তাহার জারী করিতেছে, সর্ব্বদেশের সঙ্গে সমানে তাল রাখিয়া ঐ ডিভোর্সটাও নারীর করতলগত করিয়া দেওয়া চাই! নারী যখন রুদ্র মূর্ত্তি ধরিতে পাইতেছে—স্বামীকে যা-ইচ্ছা ভর্ৎসনা করিতে পাইতেছে, প্রভুত্বে স্বামীকে পরাভূত করিতে পাইতেছে, তখন ও অধিকারটুকুও…

তাই বলি, পুরুষ জাগো, প্রেমের কবিতায় নারীর অহেতুক স্তুতি ছাড়িয়া মাভৈঃ রবে আবার নিজ-মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়াও! নহিলে…

কিন্তু এ কথা কেন? সমাজের ইতিহাস আলোচনার কথা পড়িয়াছিলাম না? গবেষণা? সেই যে কোন্ লেখক বলিয়া গিয়াছেন, সেই কথাটাই মনে পড়িতেছে, Bachelors live like men and die like dogs, while married men live like dogs and die like men কথাটা হয়তো খাঁটি! আপনারা কি বলেন?

# লেখার নমুনা

( নক্সা )

সাহিত্য যদি আর্টের অঙ্গীভূত না করিলে তো বৃথা সাহিত্য-চর্চ্চা। 'দেশ দেশ নন্দিত করি' এই বাণীই 'নন্দিত' হইতেছে, 'দিন আগত' দেখিতেছি; তথাপি এমন সাহিত্য-প্রতিভা সত্ত্বেও কোনো মাসিকের মালিক আমাকে সম্পাদকীয় আসনে গ্রহণ করেন না কেন? করিলে সাহিত্যকে আমি আর্টের তুঙ্গশৃঙ্গোপরি চড়াইয়া দিই। আমার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী। সাহিত্যের যে সকল বিভাগ আছে, তার সমুদয় বিভাগেই আমার রীতিমত পারদর্শিতা আছে। কন্টিনেণ্টাল সাহিত্য---আজকাল সাহিত্য-জ্ঞানের মাপকাঠি। সে মাপকাঠি দিয়া পরখ করিলে সকলে বুঝিবেন, আমি একখানি এনসাইক্লোপিডিয়া। বহু মাসিকে ও সাপ্তাহিকে আমি বহু বিষয়ে লেখনী চালনা করিয়া থাকি। সে সব পত্র-পত্রিকার সম্পাদক আমার রচনা সাদরে ছাপাইয়াছেন এবং আমার ভূয়োদর্শিতায় বিমুগ্ধ হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন—'এসিয়ার বিজ্ঞতম-সুধী' উপাধিতে আমায় বিভূষিত করিবার জন্য। কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ না কি 'মৃত' ছাড়া 'জীবিতের' সহিত সম্পর্ক রাখেন না, এ-কারণে তাঁরা স্থির করিয়াছেন, আমি বাঁচিয়া থাকিতে আমাকে উক্ত উপাধি-ভূষণে ভূষিত করিবেন না, আমি মারা গেলে মস্ত সভা ডাকিয়া উক্ত উপাধি-ভূষণে ভূষিত করিবেন। উপাধিটি এজন্য শিকায় সযত্নে তুলিয়া রাখিবেন।

এই ব্যাপার হইতে আমার পরিচয় সকলে কিয়দংশে অবগত হইবেন বলিয়া কথাটার উল্লেখ করিলাম। কিন্তু তাঁদের কথার উপর কাহাকেও আমি নির্ভর করিতে বলি না। আমার শক্তির পরিচয়-স্বরূপ আমার বিবিধ লেখার নমুনা দেখাইতেছি। দেখিলে বুঝিবেন, কোনো মাসিক-মালিক যদি তাঁর সমস্ত লেখকদের বিদায় দেন, আমি একা লেখনী-গাণ্ডীব-সংযোগে যে কোনো বাঙলা মাসিকের পৃষ্ঠা বিবিধ রচনা-সম্ভারে পরিপূর্ণ করিয়া দিতে পারি।

মাসিক পত্রে প্রথমে চাই 'ছোট গল্প'। ছোট গল্পের রচনায় আধুনিক যুগে আমি মিষ্টার টেক্কা। আমার লেখা ছোট গল্পের নমুনা দিই। গল্পটি আগাগোড়া উদ্ধৃত করিয়া দিলে আমার পক্ষে ক্ষতি; তাই প্লটটুকু ও সেই সঙ্গে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। গল্পের **নাম—'চাউনির ছাউনি'।**

নায়ক সুধাকর জোয়ান্ যুবা। তার অগাধ ঐশ্বর্য্য; সে একা থাকে; লেক রোডের কাছে বাড়ী। সুধাকর মুগুর ভাঁজে, ডন্ করে; ব্রিজ ও ফুটবল খেলে; থিয়েটারে যায়, গান গায়; মাসিক পত্রে মাঝে মাঝে ছবি আঁকে, গল্প লেখে; সখের থিয়েটারে নাচ শেখায়; পেশাদারী থিয়েটারের গ্রীণ রুমে মাঝে মাঝে গিয়া বসে। ইউনিভার্সিটি থেকে সব কটা ডিগ্রী আদায় করেছে। বাড়ীতে তিনটি ভৃত্য, পাচক ব্রাহ্মণ, মোটর, সোফার আর দরোয়ান। অর্থাৎ নায়ক সুধাকর হলো নব্য যুগের আদর্শ জীবো!

সে-দিন কুমার শান্তনুনন্দনের গৃহে ছিল প্রমোদ-উৎসব। সে-উৎসব সেরে সুধাকর যখন বাড়ী ফিরলো, রাত তখন দুটো বেজেছে। ড্রাইভার গ্যারেজে গাড়ী তুলে শুতে চলে গেল। সুধাকর নিজের শয়ন-কক্ষে এসে চাকরকে বললে—তুই যা, শুগে যা...

ভৃত্য চ'লে গেল। আলো নিবিয়ে সুধাকর বিছানায় শুয়ে পড়লো।

শুয়ে শুয়ে সুধাকর ভাবছিল, শান্তনুনন্দনটা কি মূর্খ। আমাকে বলে, বিবাহ করো! তার অর্থ, নারীকে বিবাহ! নারী···দুনিয়ার যত আরাম, সুখ-শান্তি হরণের মূল। এই মুক্ত জীবনে নারী কঠিন শৃঙ্খল।...

সহসা একটা শব্দ···খুট্-খুট্, খশ্-খশ্···সুধাকর ভাবলে, কুকুরটা?··· সে কাণ খাড়া করে রইলো। আবার খশ্-খশ্, খুট্-খুট্ শব্দ!

না, কুকুর তো নয়! বাথ-রুমে মানুষের পায়ে চলার শব্দ···তাতে ছন্দ আছে! সুধাকরের ওস্তাদী কাণ! তাই ছন্দটুকু ধাঁ করে বুঝে ফেললে। সুধাকর বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো; নিশ্চল, নিথর দাঁড়িয়ে রইলো মেঝের উপর। ওদিকে পাশে বাথ-রুমে আবার সেই পায়ে চলার অতি-মৃদু শব্দ!

নিশ্চয় চোর! সুধাকর অতি সন্তর্পণে এগিয়ে এসে ড্রয়ার থেকে নিঃশব্দে রিভলভার বার করলে, রিভলভার হাতে তাগ করে বাথ-রুমের দোর এক-টানে খুলে ফেললে। সঙ্গে সঙ্গে বাথ-টবের পিছনে কে বসে পড়লো। সুধাকর সুইচ্ টিপলো, বাথ-রুমে আলো জ্বললো। সে আলোয় সুধাকর চেয়ে দেখে, বাথ-টবের পিছনে একটা কাপড়ের আবরণ। কে ও?

সুধাকর বললে—বেরিয়ে এসো। না হলে আমার হাতে···দেখচো? পিস্তল··গুলি-ভরা। শীগ্‌গির উঠে এসো। এক···দুই···

একটা আর্ত্ত রব ফুটলো—না, না, গুলি করো না···আমার তরুণ বয়স, শ্যামা ধরণীরে আমি বাসিয়াছি ভালো!

সুধাকর অবাক্! এ যে নারীর কণ্ঠ! বস্ত্রাবৃত মূর্ত্তি উঠে দাঁড়ালো। তার মুখের আবরণ খশে পড়লো। সুন্দর একখানি মুখ···কুঞ্চিত কালো কেশরাশির নীচে, গোলাপ-গঞ্জিত··লাল-টুকটুকে···অপূর্ব্ব। সুধাকর ভাবলে, যক্ষ-প্রিয়ার যে ছবি সে এঁকেছিল, সে ছবিতে এ মুখখানি বসাতে পারলে···

কিন্তু না! এ তরুণ বয়সের মোহ! এ মোহের প্রশ্রয় দেওয়া হবে না ···

কঠিন স্বরে সুধাকর বললে,—এগিয়ে এসো

অশ্রু-ভরা দুই চোখ···চোখে কাতর দৃষ্টি, তরুণী এগিয়ে এলো। তার কৃশ দেহলতা ভয়ে থর-থর কাঁপচে!···সুধাকর বললে,—তুমি চুরি করতে এসেচো!···তুমি চোর···

তরুণী কম্পিত-কলেবরে বললে,—না, না। আমি চোর নই···

[আমার কৌশল অর্থাৎ লেখার আর্ট আপনারা লক্ষ্য করেচেন! সুধাকর যখন বললে—তুমি চোর?···তখন আপনারা ভেবেছিলেন, তরুণী বলবে, যে, হাঁ, সে চোর···জীর্ণ কুটীরে তার বাস···মা নেই। বুড়ো বাপ রোগে কাতর···পথ্য মেলে না, পয়সার অভাব। তাই তার তরুণী কন্যা গভীর রাত্রে এসেচে চুরি করতে! কিন্তু কোথা থেকে সে এলো? দরোয়ন-চাকরের লক্ষ্য এড়িয়ে? এ ভেবেও মুস্কিলে পড়েচেন। সে চোর নয়, এ পরিচয়ে আমি মামুলিত্ব বর্জ্জন করে চমৎকার twist (মোচড়) দিলুম, এটুকু লক্ষ্য করচেন! তার পর এত বড় লোকের বাড়ীর দোতলায় আসা··· সে সম্বন্ধে আমি কোন কথা বলবো না। কারণ, এটুকু ধরে নিতে হবে—যেমন করেই হোক, সে এসেচে। গাছে চড়ে, নয়তো দাসী সেজে, নয়তো···অর্থাৎ তার আসা চাই—গল্পের নায়িকা যে, তাই সে এসেচে। আর এ সব খুঁটি-নাটি ধরলে গল্প পড়া চলে না।]

সুধাকর তরুণীর উত্তর শুনে বিস্ময়ে বিমূঢ়। তরুণী আবার বললে—আমি চোর নই। এবার তার কণ্ঠ বেশ স্পষ্ট! স্বরে জড়তা নেই।

সুধাকর বললে—যদি চোর নও, তবে এ-রাত্রে এখানে কেন এসেচো? কিসের প্রয়োজনে?···

তরুণী বললে—বুঝবে না, বুঝবে না,—তা বিশ্বাস করবে না গো···

সুধাকর বললে,—তবু আমি জানতে চাই, কেন এসেচো···

তরুণী বললে—এখানকার নারী-অক্ষৌহিণীর আমি সেক্রেটারী। নারী-চিত্ত-মুক্তি আমাদের ব্রত। সে ব্রতে চাঁদা চেয়ে তোমায় পত্র লিখেছিলুম। তুমি তার জবাব দাওনি···চাঁদা দাওনি···তাই আমি এসেছি।

তরুণীর চোখে জল, অধরের ভাষায় আগুনের ফুল্‌কি···

সুধাকর বল্‌লে,—তোমার স্বামী এ কথা জানেন?

তরুণী বললে—কোথায় স্বামী? আমি বিবাহ করিনি। বিবাহে চিত্তের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়!

সুধাকর বললে—···! হুঁ যাও, ঐ বালিশের তলায় চাবি আছে, আমার সিন্দুকের চাবি। সিন্দুক খুলে টাকা নাও···যত চাও, যা পাও···

তরুণী মৃদু হাস্যের বিদ্যুৎ ফুটিয়ে সুধাকরের কক্ষে ঢুকলো; বালিশের তলা থেকে চাবি নিয়ে সিন্দুক খুললে। সিন্দুকে টাকা, নোট, গিনি ··এবং অলঙ্কারের রাশি···মুক্তা, চুণী, পান্না ও হীরা অজস্র···

দু'হাতে টাকা-কড়ি সংগ্রহ করে অঞ্চলে বেঁধে তরুণী সুধাকরের পানে চাইলো। সুধাকর তার পানে চেয়েছিল; তার দৃষ্টি···সে দৃষ্টিতে কী যে ছিল!

তরুণী বললে আপনার স্ত্রীর গহনা বুঝি?

সুধাকর বললে—স্ত্রী কোথায়? আমি বিবাহ করিনি···

তরুণী বিস্মিত দৃষ্টিতে সুধাকরের পানে চাইলো··· তার হাতের মুষ্টি শিথিল হলো। আঁচল থেকে টাকা-কড়িগুলো ঝন্ ঝন্ শব্দে অম্‌নি মাটীতে পড়লো।

সুধাকর বললে—এ কি টাকা-কড়ি ··?

তরুণী একেবারে অশ্রু-বিগলিত স্বরে বলে উঠলো,—মিথ্যা, মিথ্যা এ অক্ষৌহিণীর মুক্তির অভিযান ··

সুধাকর বিস্মিত!···খোলা খড়খড়ি দিয়ে একরাশ জ্যোৎস্না এসে সুধাকরের মুখে পড়েছিল। সুধাকর ডাকলে,—নারী··

তরুণী এ কথায় বিহ্বল বিবশ হলো। নিমেষের জন্য ···বল্‌লে,—নারী নাই। আমার নাম রুবি রায়।

বল্‌তে বল্‌তে আবেগে একেবারে সুধাকরের বুকের উপর সে ঝাঁপিয়ে পড়লো, পড়ে বললে,—না, আমি চোর···চোর ···আমায় বন্দী করো। সন্ধি নয়, !

দু'হাতে তরুণীকে বেষ্টন করে তাকে বুকে টেনে সুধাকর বললে,—তাই করলুম, নারী। আমি শক্তির উপাসক, তুমি শক্তি। তোমার সঙ্গে সন্ধি করলুম, তোমায় বন্দী করলুম!

চাঁদের আলো ঘরের মধ্যে কুহক-মায়া রচনা করে হাসতে লাগলো···বাতাস এসে দু'জনকে ছুঁয়ে গেল। দূরে কোন্ চালতা গাছের ডালে বসে একটি পাখী গেয়ে উঠলো—পিয়া, পিয়, পিয়া···

[ দেখলেন, আমার লেখার কৌশল ! এ গল্পে তরুণ, তরুণী, শক্তি, ব্যায়াম-চর্চা, যৌবনের ডাক, নাচ-শেখানো, প্রমোদ-উৎসব, অক্ষৌহিণী, সঙ্ঘ, মুক্তি এবং শেষে সেই সনাতন সত্য,—মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা—কি পরিষ্কার ফুটিয়ে তুলেচি ! ]

এ হলো ছোট গল্প, তার পর কবিতা চাই ? একটি নমুনা দেখাই। কবিতার নাম 'আলকাৎরা'। ফুল, জ্যোৎস্না, এ-সবের উপর বহু কবিতা লেখা হয়েচে ! লেখা শক্ত নয়। কিন্তু "আলকাৎরা"...উপেক্ষিত আলকাৎরা ! Stern reality ! এ কবিতা লেখার কল্পনা কেউ করেচে কখনো ? নমুনা দেখুন।

গ্রীষ্ম আসুক, বর্ষা নামুক,
শীতের বাতাস কাঁপিয়ে দে যাক্ হাড়।
বসন্ত সে আসচে-যাচ্ছে—
আমি শুধু কাৎ করে এ ঘাড়
জানলাটিতে বসে আছি,
নয়ন মেলে শুধুই আছি চেয়ে—
কোন্ ঘরে হায়, কোন্ তরুণী
শামলা দেশের কমলা-মুখী মেয়ে
চাইবে কবে আমার পানে,
কইবে আশার বাণী—
জাগিয়ে আমার বক্ষে ওগো
এ-যৌবনে গানের কাণাকাণি ?
কেউ চাহে না ! ঘর-বাসিনী, পথ-চারিণী !
হায় রে হতভাগা !
মিছে আমার দিনের চাওয়া,
ফাগুন-বায়ে অ'কূল-নিশি জাগা।
বুকে আমার সেই সাহারা...
ধু-ধু ক্ষুধা...কিছুতে না মিটে—
ছেঁড়া কথার টুক্‌রো খুঁজি,
খুঁজি চোখের চাউনি-চিনির ছিটে !
মিল্‌লো না কো কিচ্ছু রে মোর।
তরুণ বুকে এই যে রঙীন আলো
শাহাবারি বালির খোলায়
নিরাশ-ঝাঁজে পুড়ে হলো কালো।
শুধুই কালো ? তরল যা রস
চল্‌চলে তা শুকিয়ে গেছে ত্রস্ত !
সেই আলো আজ জম্‌লো বুকে
আলকাৎরার কালো চাঙ্গাড় মস্ত !

[ এ কবিতায় দেখবেন, মামুলিত্ব নেই,—তবু আধুনিক যৌবন-সমস্যার কি সুর বেজেচে ! এমন কবিতা ভূরি ভূরি লিখেচি এবং লেখার শক্তি রাখি। আমার কাব্য-কল্লোলিয়া ভাবসিন্ধু কালি-কলমের মুখে ঝরি,—বিচিত্রা প্রগতি' ধরি উত্তরার পৃষ্ঠ দিবে ভরি,—' বুঝলেন। ]

তার পর সাহিত্যিক ও, সামাজিক প্রবন্ধ ? তারো কিছু নমুনা দি—

"যে সাহিত্য এক দিন বাংলা দেশে সাহিত্য নামে আপনাকে পরিচিত করিয়া তুলিতেছিল, সে সাহিত্য ফাঁকি, জাল, সাহিত্যের ধাপ্পাবাজী ! কারণ, বাঙলার নাড়ীর যোগ তাহাতে ছিল না। বাঙালীর বাঙালীত্ব তার হৃদয়ের প্রেম-প্রবণতায় ! নারী দেখিলেই তার চরণে ঢলিয়া পড়িবার যে প্রচণ্ড আগ্রহ, তাহাই বাঙালীর বাঙালীত্ব ! নহিলে ভারতচন্দ্র পশার করিতেন না এবং বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাসও কবি হইতে পারিতেন না। 'রজকিনী রামী' —এ কথার eternal সত্য কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি ? আজো রজকিনী-গৃহে রজকিনী-দলে যৌবনের যে কোমল কঠিন নিটোল বাঁধন দেখা যায়—যৌবন কত যাবির ধরিয়া বাঁধিয়া বাঁধিয়া রে...এ ছন্দের সার্থকতা আজো রজকিনী-গৃহে ঘুচে নাই। এই রজক-গৃহে গর্দ্দভ এখন একমাত্র যৌবন-স্তুতি প্রচার-কল্পে তার কণ্ঠে যে-সুর বাহির করে, তাহা কেহ লক্ষ্য করিয়াছেন কি ? আমরা বৈজ্ঞানিক psycho-analysis দ্বারা রাসভের সুর টিউন্ ও টোন্ করিয়া যাহা পাইয়াছি, তাহা প্রকাশ করিয়া বলি,—

গ্ গ্ গ্ গ্-গ্ গ্-গ্ গ্ !...গ্ গ্-গ্ গ্—ও—ও...

এ-রাগিণী অনভিজ্ঞের কর্ণে শুধু বিশ্রী বেতালা গাধার চীৎকার মাত্র। কিন্তু আমরা নানা প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ঐ গাধার গানে খাঁটী গান্ধার ! গাধার × গান—গা × ধা × র × গা × ন = ২গা × ধা × র × ন = গা × ন × ধা × র (২সংখ্যা-নির্দ্দেশক অর্থাৎ মাত্রা, বাদ গেলে থাকে গা × ন × ধা × র ) = গান্ধার।

আজ culture-এর অভাবে গাধার সুরে মসৃণতার অভাব—ভাব কিন্তু lyric। এখন culture কামীদের উচিত, ঐ সুরে সুর মিশানো"...ইত্যাদি.. এক প্রস্থ।

দ্বিতীয় প্রস্থ শুনুন...

"—বেদব্যাস বা বাল্মীকির, ভার্জ্জিল বা হোমারের লেখা পড়লে মনে হয় না যে, তাঁদের কালে কোনো রকম সমস্যা ছিল বা সমস্যার কোনো সমাধান দিতে চেয়ে কিংবা দিতে না পেরে তাঁরা উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁরা শুধু খবরের মত গল্প ব'লে গেছেন। ধরুন, ঐ দ্রৌপদীর কথা...পাঁচটি স্বামী মিলিয়ে কি কাণ্ড ঘটালেন! অসভ্য-যুগের ছায়াপাত হলো ! তার চেয়ে ঐ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিয়ে দিয়ে দ্রৌপদীকে আর চার ভাইয়ের প্রতি আসক্ত দেখালে আধুনিক সভ্য-যুগের শাশ্বত ছবি ফুটতো ! বিরাট sex-সমস্যা দেখা দিত। eternal cry of sex

তার পর সূর্পণখা! বেচারা সূর্পণখা! তরুণ বয়সে একাকিনী প্রেম-পাগলিনী! লক্ষ্মণকে দেখে বিহ্বল হলো··· আর ষ্টুপিড্ লক্ষ্মণ কি করলে···? ঐ লক্ষ্মণ আবার বীর! ও কি ভদ্রতা? হায় রে! নেহাৎ বুনো! বাল্মীকির বুড়া বয়সের বিকৃত মস্তিষ্কের দোষে কতখানি রোমান্স মাটী হয়ে গেছে। তার পর মায়া মৃগের আহ্বানে গমন-বিমুখ লক্ষ্মণকে সীতার ভর্ৎসনা—বদমায়েস, তুমি রামচন্দ্রের সাহায্যে যাচ্ছো না কেন, বুঝেচি! তিনি মারা গেলে আমায় নেবে···সেই লোভে বনে এসেচে সঙ্গী হয়ে! লক্ষ্মণ এ-কথা শুনে কাণে আঙুল দিয়ে পালালেন! এ'ও বাল্মীকির বিকৃত মস্তিষ্কের লক্ষণ!···যে-কথা অন্তরের অন্তরে গোপন ছিল···তাকে উস্কে তুলতে তিনি পারলেন না!

এ সম্বন্ধে আর বেশী কথা বলবো না। বহু গবেষণার পুরাণ-শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় আমি নূতন আধুনিক আলোক-পাত করচি। তা ছাড়া এই subject নিয়ে আমার একখানি আধুনিক নাটক লেখবার বাসনাও আছে, নাট্য-কলার দিকে বহু তরুণের ঝোঁক পড়েচে এবং এমনি ultra-modern idea ও তাঁরা পাচ্ছেন আমাদের আলোচনা থেকে। কাজেই তাঁরা যদি আগে যাত্রা সুরু করে দেন···

একটা কথা অকপটে বলবো, আমরা তরুণদল বাঙলার হাম্‌শুন্। আমাদের লেখায় কনটিনেণ্টের কেমন হাওয়া বহাচ্ছি। বাঙলা নামগুলোর ফাঁকে ফাঁকে নরওয়ের কন্‌কনে বাতাস, বেলজিয়ামের কাঁচের কারখানার ঠুনঠুন শব্দ, বিলাতী বান্নাঘরের সুবাস, রাসিয়ান্ ভড্‌কার তীব্র কটু গন্ধ, মস্কোর সাদা ভাল্লুকের ঘোঁৎঘোতানি প্রতি মুহূর্ত্তে জাগ্রত হয়ে উঠেচে কি না? নারীর মাতৃত্ব বার্দ্ধক্যে জবজব হয়ে গেছে। সে বস্তুকে নিমতলার ঘাটে চিতায় চড়িয়ে তরুণের এই যে সাহিত্য-অভিযান সুরু হয়েচে—নারীর যৌবনকে অগ্রদূতিনী করে—তাঁদের সৃষ্টিতে নারী যে উন্মাদ নেশাভরা যুবতী-বেশে জেগে উঠচেন অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার দুর্দ্দম ব্যথা নিয়ে, এতে মনে হয় না জার্মিজভ্, সীডেনসাভেন, শীলার, কোলজভ, ভাটুডস্কি, সাঙ্গানিকা, কর্কোলাভ, নিউজীল্যাণ্ড, পোলার বেয়ার, হোটেনটট্, ম্যাডাগাস্কার, অক্টোপাশ প্রভৃতি চিন্তাশীল ধুরন্ধররা যে pseudo romantic ও nomadic স্বপ্ন দেখতেন, বাঙলার তরুণ সাহিত্যিক দলও সে স্বপ্ন সফল করবেন। মেরে কেটে আর কটা মাস··তার পর দেখবেন, বাঙলা সাহিত্য দুই মেরুকে গ্রাস করে তা থিয়া থৈ নৃত্য করচে! তার কষ বয়ে নারী-রক্তধারা ঝরছে! গোবর্দ্ধনের মেশে লিজা এসে দাঁড়াবে মাজা বাসন নিয়ে; করিম মিয়ার চায়ের দোকানে কারেনিনা এথেলের দল নৃত্য সুরু করে দেবে···তখন মানুষ ক্ষুদ্র পারিবারিক গণ্ডী কেটে গৃহত্যাগ করে এসে বিশ্ব-মানবকে প্রণয়াবেশে আলিঙ্গন করবে,—গৃহে গৃহ থাকবে না, গৃহের বন্ধন থাকবে না—থাকবে শুধু পথ, আর পথিক।

তার পর মাসিক সাহিত্য-সমালোচনার নমুনা দিই। পরকে গালিতে দাবালে নিজেকে বড় বলে সমাজে চালানোর জুৎ হয়। এ সম্বন্ধে ঐ সমালোচনী-পত্র "ধূমসী চর্ম্মছানি"র আদর্শ আমি শিরোধার্য্য করি। নিজের মধ্যে 'খ্যাড়্' কেবলি 'খ্যাড়্'; তাই সেই 'খ্যাড়ে' 'তোবড়া' বানিয়ে সারা দুনিয়ার গায়ে নোংরা কালো কালি লেপ্‌বো মহা আস্ফালনে। আমার সমালোচন-শক্তি দেখে জগৎ স্তম্ভিত হয়ে ভাববে, ভঙ্গুর মনুষ্যদেহে এত বিজ্ঞতাও সম্ভব! রূপকথার সেই ক্ষ্যাপা হাতীকে মনে আছে? শুঁড়ে জড়িয়ে, যাকে খুশী সিংহাসনে বসাতো? তেমনি হাতীর বিক্রমে লেখনী-শুঁড়ে তুলে যাকে খুশী সিংহাসনে বসাবো, যাকে খুশী সিংহাসন থেকে হিঁচড়ে টেনে রসাতলে নামাবো।

এ-মাসের 'ছুচুন্দরের' সমালোচনা নমুনা-স্বরূপ দিচ্ছি।

"বস্তীর সুখ-কিবিস্তি" গবেষণামূলক প্রবন্ধ। লেখকের চিন্তাশক্তির পরিচয় পাই। "বেদান্তে পলিটিক্স" শ্রীকিপ্‌পিন চন্দ্র ঘাল প্রণীত। আজ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া লেখক পলিটিক্সের ক্ষেত্রে তুড়ি-লাফ খাইয়া বেড়াইতেছেন—এ প্রবন্ধটি তাঁর বিচিত্র লক্ষের হৃৎকম্পকারী গবেষণার ফল। বেদান্তে মায়াবাদ জানিতাম—তার মধ্যে চরকার শূন্যবাদ এ-ভাবে বিকৃত আছে জানিয়া চমৎকৃত হইলাম। "দূর্ব্বা" ভক্ত-কবি কৃত্তিবাস চায়ের রচনা। ভক্ত-কবির হাড়ে হাড়ে অপরূপ দূর্ব্বা-বীজ ভক্তি-অশ্রু-সেচনে অঙ্কুরিত হইয়া বর্দ্ধমান হইয়াছে দেখিয়া তৃপ্তি পাইলাম। দু'ছত্র তুলিয়া দিতেছি—

"মাটী-ফোঁড়-সম্ভবা কচি কচি দূর্ব্বা মা,
তুই দেবী গোরুর আহার।
হাড়ে হাড়ে গজাইয়া তারি রসে কাব্যে দে
গব্যেরি পবিত্র বাহার।"

খাশা! চমৎকার! এমন পবিত্র দেব-কবিতা বহুকাল পাঠ করি নাই। "একপাটী নাগ্‌রা" শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা দে রচিত। গল্পের আখ্যায়িকা ভাগ ভালো; তবে লেখকের ভাষাজ্ঞান আজো হয় নাই। বানান নির্ভুল, তবে প্রথম অংশ শেষে এবং শেষাংশ প্রথমে দিলে গল্পটি মন্দ জমিত না। "ছুঁচোর কীর্ত্তন" সাহিত্যিক সন্দর্ভ। শ্রীবৎসলাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত। পড়িয়া তৃপ্তি লাভ করিলাম। নারদের কীর্ত্তনের কথা মনে পড়ে, তা পড়িলেও এ প্রবন্ধে মৌলিকতা অপূর্ব্ব। "কবিবর প্রণয়লাল ঢোল"—শ্রীশাখাবিহারী পুচ্ছ। কবির কাব্য

সম্বন্ধে কয়েকটি কথা উক্ত হইয়াছে। "সার্শির আড়ালে" —শ্রীযুক্ত গবাকান্ত রায়; পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। "সঙ্গীতে রুণুঝুনু" শ্রীযুক্ত বেসুর বসু। লেখক মাদলের সুরে পিয়ানো বাজাইতে উপদেশ দিয়াছেন। "চোখের তারা"—শ্রীযুক্ত নবনীনাথ চটরূপাধ্যায়। আরও কিছু বলিলে ভালো হইত। 'ফরাসী সাহিত্যের সহিত বাঙলা সাহিত্যের মিল' দেদারবাগ্র; পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। "মাতৃত্ব ও নারীত্ব" শ্রীসরেশচন্দ্র রায়। পূর্ব্ববৎ চলিতেছে।… "ধাপার মাঠ" শ্রীঘর্ম্মেন্দ্রকুমার শীল। ক্রমশঃ-প্রকাশ্য উপন্যাস।

এবারে লেখার এই নমুনা দেখাইলাম। আশা করি, দেখিয়া খুশী হইবেন।

# গবেষণা

নক্সা।

আমার প্রতিভার বিচিত্র বিকাশ দেখিয়া মনে মনে অনেকে তারিফ করিতেছেন খুব, আমি তাহা জানি। সব্যসাচীর বাণের মত লেখনীর এই অজস্র ও অব্যর্থ মর্ম্মঘাতিতায় শঙ্কিত হইবার যথেষ্ট আশঙ্কাও অনেকে রাখেন, তাহাও আমি বুঝি! আমি সে অমর কবিতার ছত্র পড়িয়াছি। সেই Try, Try, Try Again· বহু আঘাতে পেরেক দেওয়ালে বসে। আমার প্রতিভা তেমনি বহু আঘাতে বাঙ্গালীর মর্ম্ম বিদ্ধ করিবে। সে বিশ্বাস আছে বলিয়াই আমি লেখনী চালাইতেছি।

বাঙলার সাহিত্য গগনে আমার উদয় একেবারে ধূমকেতুর মত! প্রতিভার লেলিহান অগ্নিরেখায় দিগন্ত আলোকিত করিয়া এই যে আমার অভ্যুদয়, ইহাতে হয় বাঙলার সাহিত্য জ্বলিয়া ছাই হইবে, নয় আমি নিজে আমার এ প্রতিভা-অগ্নির বিরাট দাহে পুড়িয়া ভস্মীভূত হইব! অ-রাম নয় অ-রাবণ হইবে মেদিনী!

কাজের কথা পাড়ি। আপনারা হয়তো ভাবিয়াছেন, লঘু সাহিত্য লইয়াই আমার বেশাতি। তা নয়।

আমার মাথা—একেবারে আর্ম্মি-নেভি ষ্টোর্শ। এনসাইক্লোপিডায়াও বলিতে পারেন। একটা মানুষের মাথায় ভাবের এত চর্কী ঘোরে! আমি নিজেই বিস্মিত হই। আপনারা যে বিস্মিত হইবেন, এ আর এমন কি কথা। সাধে আমার উপাধি হইবে "এসিয়ার বিজ্ঞতম সুধী?" গবেষণায় আমার কীদৃশ শক্তি, তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় আবার দিতে আসিয়াছি।

প্রথমতঃ ধরি মহাভারত। কারণ, কথায় বলে, যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে। মহাভারত হইতে বহু গবেষণাযুক্ত প্রবন্ধ আমি লিখিয়াছি। দু' একটি দৃষ্টান্ত দিই।

## ১। বেদব্যাসের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি-জ্ঞান

মহাভারতে ভারতের মর্ম্ম-কথার যেমন ব্যঞ্জনা পাই, এমন আর কোথাও নয়! ভাইয়ের বাড়া শত্রু নাই—মহাভারত এই সত্য শিক্ষা দিতেছে। ভাই বিষয়ের ভাগীদার, স্নেহ-আদরের ভাগীদার। কুরু-পাণ্ডব—চিরকাল যুদ্ধ-কলহ করিয়া আসিয়াছে। তার পূর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডু। পাণ্ডু ছিল এনিমিক, ডিসপেপ্টিক লোক; ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য লইয়া বসিল। পাণ্ডু মরিলে ধৃতরাষ্ট্র ভাইপোদের কিছু জমি-জমা দিয়া ঠাণ্ডা রাখিবার প্রয়াস পায়; কিন্তু দুর্য্যোধন তুখোড় ছেলে, সে জমি ছাড়িবে কেন? বলিয়া দিল, বিনা-যুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমি দিবে না! দুই দলে যুদ্ধ বাধিল। আত্মীয়-কুটুম্বগণের মধ্যে কতক দাঁড়াইল এ পক্ষে, কতক গেল ও পক্ষে। কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে ভারী যুদ্ধ চলিল। শেষে দুর্য্যোধনের দল ফর্শা হইলে পাণ্ডবেরা আসিয়া রাজ্য দখল করিল, অর্থাৎ possession লইল।

বেদব্যাস যে কূট আইনজ্ঞ, এই কাহিনী তাহার পরিচয় দিতেছে। কুরু-পাণ্ডব হইল ভারতের চির-সনাতন ভাই-ভাই। কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গন হইল আদালত-কাছারি। শকুনি-গৃধিনী যে উকীল-পেয়াদা-মুহুরির দল—এ কথা খুলিয়া না বলিলেও চলে। তারা চিরদিন রুধির পাইলে খুশী থাকে! আর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শকুনি, কৃপাচার্য্য—এঁরা এক পক্ষের সাক্ষী। শুধু কলহ উস্কাইয়া দিতে তৎপর। যতক্ষণ কলহ বা মামলা চলে, সাক্ষীদের ষোল পোয়া আরাম। পাণ্ডব-পক্ষে দাঁড়াইলেন চক্রী শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি। শ্রীকৃষ্ণ হুঁশিয়ার চৌকশ ছোকরা, মামলার কায়দা-কানুনে সবিশেষ পোক্ত, ছল-চাতুরী সে-মাথায় বেশী খেলে। মামলার তদ্বিরে এমনি মাথাই পরিপক্ক। কাজেই শ্রীকৃষ্ণ যখন তদ্বির-কারক, তখন পাণ্ডবগণ ত জিতিবেনই। এতাবৎ তাহাই ঘটিতেছে। চাহিয়া দেখুন এটর্ণীপাড়ার দিকে—যে এটর্ণী যত চক্রী, তাঁর মক্কেলের জয় তত সুনিশ্চিত।

অতএব, মহাভারতে এই সত্য আমরা উপলব্ধি করি—যে, ভাইয়ের সঙ্গে বিষয় লইয়া কেবল মামলা-কলহ চালাও। এবং জ্ঞাতিবর্গ? এক দিকে, নয় অপর দিকে দাঁড়াইয়া পড়ো!

যুধিষ্ঠিরাদির মহাপ্রস্থানের মানে বোঝেন? অর্থাৎ কিছু কাল রাজ্য চালাইবার পর পাওনাদারেরা যখন বিব্রত করিয়া তুলিল, এটর্ণীর বিল যখন আর দাবিয়া রাখা চলে না, তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন,—যাক্, আমাদের যথেষ্ট রাজত্ব করা হইয়াছে—এইবার মহাপ্রস্থান। অর্থাৎ পিটটান দেওয়া যাক!

তার পর পরীক্ষিৎ, জন্মেজয় প্রভৃতির রাজত্ব বিশেষত্বহীন···মানে, বিষয় তখন কোর্ট অফ ওয়ার্ডসে। তাই বেদব্যাস ও কাহিনীর বিশদ বর্ণনায় ক্ষান্ত রহিয়াছেন। এই ব্যাখ্যার সহিত হালের ব্যাপার মিলাইয়া দেখুন—মহাভারত অজরামরবৎকাল ভারতের মর্ম্ম-কথা উদ্ঘাটিত রাখিয়াছে।

## রামায়ণে sex-তত্ত্ব

রামায়ণেও ঐ কথা! তবে ভাইয়ে ভাইয়ে কলহ মহাভারতে আছে। তাই বাল্মীকি originality রক্ষা-কল্পে ও-কথা না পাড়িয়া sex-problem ফাঁদিয়াছেন। কৈকেয়ীর প্রতি দশরথের পক্ষপাতিতায় sex-সমস্যা প্রথম জাগিয়াছে। দশরথ-কৈকেয়ীর আদর্শ আরও আধুনিক-চিত্তে পূর্ণ বিকশিত হইয়া বিজয়-বসন্তের গল্প-রচনায় প্রথম প্রতিভা উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। তবে দশরথ নেহাৎ বুড়া, তাই ওটুকু সংক্ষেপে সারিয়া বাল্মীকি এক নব ছবি গড়িলেন,—সূর্পণখা। বাঙলা রঙ্গমঞ্চের দুর্ভাগ্য, আজো 'সূর্পণখা'র দুঃখে গলিয়া কোনো তরুণ নাট্যকার নাটক বা গীতিনাটক ফাঁদেন নাই! তবে যে-ভাবে এ যুগের দৃষ্টি ফুটিতেছে, তাহাতে 'সূর্পণখা' কাব্যে উপেক্ষিত হইয়া অশ্রু-সলিল-সিক্ত-বসনা থাকিবে না বলিয়া অনুমান হয়। আর কেহ না উদ্যোগী হন, আমাকেই অগত্যা সে চেষ্টা দেখিতে হইবে।

অবান্তর কথা যাক্! সূর্পণখা রাম-লক্ষ্মণের কাছে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। স্থান নির্জ্জন বন-তল, কাল গোধূলি-বেলা। আহা, অস্তগামী রবিকরদ্যুতিতে কানন-ছবি রক্তিমাভ! সূর্পণখা আসিয়াই যৌবন দান করিতে চাহিল। সীতার পানে চাহিয়া রাম সখেদে নিশ্বাস ফেলিলেন। পরকীয়া উপযাচিকা···তাঁরও বয়স তরুণ! কিন্তু পাশে সীতা রহিয়াছেন! নারীর সব সয়···প্রিয়জনের প্রীতির বিবাগ সয় না। তাই তিনি লক্ষ্মণকে দেখাইয়া কহিলেন—ও-বেচারা স্ত্রীকে সঙ্গে আনে নাই। উহার কাছে যাও!

সূর্পণখা তাই করিল। কিন্তু লক্ষ্মণ নেহাৎ কাপুরুষ—moral coward! সে ফোঁশ্ করিল। তার পর ঐ নাক-কান কাটা···ওটা বর্ব্বর যুগের বর্ব্বরতার পরিচয়! সূর্পণখা প্রণয়-নিবেদনে বাধা পাইয়া দলিতা ভুজঙ্গিনীর মত কহিল—নারীকে উপেক্ষা! নারীর শক্তি তবে ভাখো!

তার পর রাবণ আসিল। এ লোকটি sex-মন্ত্রের পূজারী। নারী দেখিলেই তাকে আয়ত্ত করিতে চায়। বাল্মীকির কাব্যেই এ পরিচয় পাই। এ-যুগের কথা-সাহিত্যের শক্তিমান্ হীরোর মত রাবণ কহিল,—হাম্ সীতা লেঙ্গা···

যে কথা সেই কাজ। সীতা-হরণ···ব্যস্, তার পর যুদ্ধ। এখানে আইনের কথাই পাই। Abduction এবং wrongful confinement etc. অর্থাৎ section 359 of the Indian Penal Code একেবারে দায়রার কেশ। সীতা-হরণের ফলে বিষম যুদ্ধ—কি না ভীষণ মামলা-মকর্দ্দমা। রাবণের সবংশে নিধনের আধ্যাত্মিক মর্ম্ম,—সমারোহে মামলা লড়িয়া রাবণ ফতুর হইল। ফতুর হইবেই, কারণ, বিভীষণ ছিল ঘর-শত্রু। ঘরের সব কথা বিপক্ষ জানিতে পারিলে জেরায় তার বল চতুর্গুণ বাড়ে। অতএব, এ ক্ষেত্রে এই শিক্ষাই পাই যে, মামলা করিতে হইলে, বিপক্ষকে পাড়িতে চাহিলে তার পক্ষীয় কাহাকেও সঙ্গ-ভুক্ত করা চাই। জেরায় বিপক্ষের সাক্ষীকে তাহা হইলে ফাঁশিতেই হইবে।

রামায়ণে যে sex-psychologyর অঙ্কুর পাই, সে পরিচয় আরো সুপরিস্ফুট হইয়াছে রাধাকৃষ্ণ-লীলায়। আধুনিক যুগে যে sex psychology লইয়া বঙ্গসাহিত্যে মহা হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছে, কজন চট্টরাজ ঝাঁকড়া-কেশ কোটর-গত-চক্ষু প্রতিভাধর যে psychologyকে নিজেদের আমদানি বলিয়া চীৎকার করিতেছেন, পরকীয়া-প্রীতি তাদের কপোল-কল্পিত বলিয়া গর্ব্বে দিশাহারা হইতেছে, আমি প্রমাণ করিয়া দিব, সে sex-psychology রাধাকৃষ্ণ-লীলায় পূর্ণ-বিকশিত হইয়াছিল এবং আধুনিক বাঙলা-সাহিত্য কন্‌টিনেন্টের কাছে ঋণ স্বীকার করিলেও রাধাকৃষ্ণের কবির কাছেও কম ঋণী নয়।

প্রথমে দেখি, কৃষ্ণের জন্ম হইল কংসের কারাগারে। কংস তাঁর মাতুল। মাতুল গৃহ-পালিত ভগ্নীপতির পুত্রের ভার লইতে নারাজ। কে লয়? কাজেই কৃষ্ণ বিতাড়িত হইলেন। কোথায়? গোপ-গৃহে। অর্থাৎ গোয়ালা-বস্তীতে। নন্দকে যত গোয়ালা দুধ জোগান্ দেয়। নন্দ গোয়ালাদের চাঁই, তাই শ্রীনন্দ গোপ-রাজ। কৃষ্ণ সেই গোয়ালার ঘরে মানুষ হইতে লাগিলেন। সঙ্গী জুটিল যত democrats—বস্তীবাসী গোয়ালার ছেলে! তাদের সঙ্গে কৃষ্ণ আড্ডা দিয়া বেড়ান···গাছতলায়, নদীর ধারে। ক্রমে গোপিনীদের আলাপ-পরিচয় ঘটিল। তাদের দুধের ভাঁড় ভাঙ্গায় flirtationএর সূত্রপাত দেখি। সে রঙ্গ কারো ভালো লাগে—কারো লাগে না। যাদের ভালো লাগে, তারা ভাঁড় হইতে ক্ষীর-ননী ঢালিয়া কৃষ্ণকে দেয়, গান গাহিয়া শুনায়; বনফুলের মালাও কৃষ্ণের গলায় পরাইয়া দেয়! এই ব্যাপারের সঙ্গে আধুনিক ঝাঁকড়া-চুল কবিদের কবিত্ব-কাকলীর ছবিটুকু মিলাইয়া দেখুন!

তার পর কৃষ্ণ বাঁশী ধরিলেন। সে বাঁশী বাজানো হয় যমুনা-কূলে!

ইহার মধ্যে একটু সুগভীর অর্থ আছে। বাঁশী বাজানো আর মাসিক-পত্রে কবিতা ছাপানো—ব্যাপার প্রায় এক। বাঁশীর সুরের তুলনায় মাসিকের কবিতার প্রসার বেশী। কারণ, মাসিকের কবিতার প্রচার চলে দূর দেশান্তরেও। বাঁশীর সুরের গতি ঐ গোয়ালা-বস্তীর মধ্যে সীমাবদ্ধ! যমুনাতীরে কদমতলা, ইহার সঙ্গে মাসিকপত্রের কার্য্যালয় খাপ খায়। শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী

বাজাইলেন…সে বাঁশীর স্বরে মজিলেন রাধা এবং তাঁর সখীবৃন্দ। মাসিক পত্রে কবি কবিতা ছাপিলেন, সে কবিতায় প্রাণ বিঁধিল তরুণী প্রতিবেশিনীর! বাস্তবজগতে যথার্থ এমন ঘটে কি না, জানি না। তবে মাসিকে কবিতা ছাপাইয়া কবি তুষ্ট হন কিসে? যত দূরেই তার চালান যাক্ না কেন, তিনি তুষ্ট হন প্রতিবেশিনীর হাতে সেই সংখ্যা মাসিকপত্র দেখিলে। "মেশের কক্ষে উঁকি-ঝুঁকি" নাটকের প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্যে এমন ঘটনার কথা পড়িয়াছি। মেশের বহু কবির জীবন-স্মৃতিতেও ঈদৃশ মহাসত্যের সঙ্কেত পাই।

শ্রীরাধা পরস্ত্রী—তবু কৃষ্ণ তাকে বাঁশী শুনাইতে আকুল, চঞ্চল! শ্রীরাধাও যোগ্যা নায়িকা। জল ফেলিয়া কুম্ভ-কক্ষে জল আনিতে যাওয়া, এবং কৃষ্ণকে কুঞ্জে আনা…how daring, how Cold! এই মাসিক সাহিত্যের যুগে রচনায় এতখানি বুকের পাটা মুষ্টিমেয় কয়জন প্রতিভাধর ছাড়া আর কে দেখাইতে পারিয়াছে?

তার পর কৃষ্ণের কালী-মূর্ত্তি ধরা! কি সুনিপুণ ইঙ্গিত! ছদ্মবেশে গোপনতার আভাস ইহাতে পাই। অমৃতলাল কি এই ধার-করা আইডিয়ায় "চোরের উপর বাটপাড়ি" লিখিয়াছিলেন? বেচারা আয়ান—গরু তাড়াইয়া পূজাপাট লইয়া উন্মাদ! ওদিকে…কিন্তু আয়ান ছিল বুড়া…পত্নী রাধা তরুণী… [চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর চরিত্রাঙ্কনে বঙ্কিমচন্দ্র কি এই কাহিনীরই ছায়া লন নাই?] কাজেই রাধা sex-psychologyর অব্যর্থ বিধানে কৃষ্ণে মজিবেন, বিচিত্র নয়!

তার পর জটিলা কুটিলা। এ দুটো চরিত্রের অর্থ, জীর্ণ গলিত পচা সামাজিক সংস্কারের এরা প্রতিচ্ছবি!… ঐ প্রণয়ে বিদ্বেষ জাগানোর অপর অর্থ থাকিতে পারে না! তার উপর psychologyতে jealousy বলিয়া একটা কথা আছে…রাধার প্রতি কৃষ্ণের পক্ষপাতিতায় কুটিলা যদি jealous হয় তো বেচারীর কি দোষ? সেও তো তরুণী। তার উপর ভর্ত্তৃ-বিয়োগ-ব্যথায় কাতরা, যৌবনে যোগিনী। বুড়া আয়ান তরুণী রূপসী স্ত্রীর রূপে মশ্‌গুল—তাই যখনি স্ত্রীর নামে জটিলা-কুটিলা তার কাছে কুৎসা তুলিয়াছে, তখনি সে লাঠি তুলিয়া তাদের মারিতে উদ্যত হইয়াছে। শাশ্বত সত্যই এ ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছে।…

গবেষণার তোড় দেখিলেন? আরো চাই? ধ্রুবপ্রহ্লাদের গল্প আছে। তারো ব্যাখ্যা কি গভীর গবেষণায় বাহির করিয়াছি, নমুনা দেখুন।

ধ্রুব দুওরাণী সুনীতির ছেলে; থাকে মায়ের সঙ্গে রাজপুরীর বাহিরে এক বিজন বনে। আর সুওরাণী সুরুচি থাকেন অন্তঃপুরে রাজার মহিষী সাজিয়া। রাজার নাম উত্তানপাদ অর্থাৎ যার পা উঠিয়াছে ঘাটের দিকে। আধুনিক ভাষায় যার মরিবার পালখ উঠিয়াছে!

রূপসী রাণীতে মজিয়া রাজা একচোখোমি করিলেন, ধ্রুবকে তাড়াইলেন। সে ধ্রুব। সে গেল বনে তপস্যায় অর্থাৎ শক্তি-সংগ্রহে। ধ্রুব হরিকে ডাকিল—হে হরি, কি করি? বাপের রাজ্য হরি! তাকে বিভীষিকা দেখাইতে আসিল রাক্ষস, দৈত্য, অপ্সরী, বাঘ, সিংহ, সাপ। তার অর্থ ধ্রুব বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে বাপ সৈন্য পাঠাইলেন, তাকে দমন করিতে। তাহাতে সফল হইতে না পারিয়া অপ্সরী ছাড়িলেন, অর্থাৎ কাপ্তেন ছেলের মাথা খাইতে যেমন বাইজী পাঠানো হয়, তেমনি! ধ্রুব কাজের ছেলে। সে ক্ষণিকের মোহে ভুলিল না। কাজেই একদিন তার ভাগ্যে রাজ্য মিলিল। নহিলে উত্তানপাদ আসিয়া শেষে অত সাধ্য-সাধনা করিবেন কেন? রচনাটুকু Royaltyর যুগের। কাজেই সুস্পষ্ট ভাষায়, লেখক উত্তানপাদের পরাভবের কথা না বলিয়া ঐ হরিকে আড়াল করিয়া democratic government-এর পত্তনের কথা তুলিয়াছেন।

প্রহ্লাদের গল্প কি? সংক্ষেপে বলি। হিরণ্যকশিপু দৈত্য অর্থাৎ মূর্খ, গোঁয়ার। ছেলে প্রহ্লাদকে লেখাপড়া শিখাইতে দিল গুরুর কাছে। ছেলে পণ্ডিত হইয়া বাপকে হঠাইল। ইহা হইতে আমরা এটুকু বুঝিতে পারি যে, মূর্খ লোকের উচিত, ছেলেকে মূর্খ করিয়া রাখা—পণ্ডিত হইলেই বাপের পক্ষে ইজ্জৎ রক্ষা করা দায়! ছেলের হাতে বাপের মার তখন অবশ্যম্ভাবী।

আজ এই অবধি থাক্। আপনারা বেদ-বেদান্ত চান? কালিদাসের জন্মভূমির আবিষ্কার লইয়া দুর্ব্বোধ বাক্-বিতণ্ডা? অর্থাৎ ফুটনোট-কণ্টকিত মহা-প্রবন্ধ? যাহা মনুষ্য-সমাজের কোনো কাজে লাগে না, অথচ মাসিক-পত্রকে ভরাট ভারী গম্ভীর করিয়া তোলে, এমনি গিরি-গোবর্দ্ধন-গবেষণাত্মক বা ঢক্কা ঢোল-নিনাদ-তুল্য প্রবন্ধ? অর্ডার দিবেন। আমার কাছে সর্ব্বপ্রকার প্রবন্ধ মজুত আছে। অর্ডার পাইবামাত্র পাঠাইয়া থাকি।

# বায়োস্কোপের শিনারিও

কলিকাতার ইংরেজ-পাড়ায় একটিমাত্র থিয়েটার-গৃহ ছিল; সেখানে বিলাতী নাট্য সম্প্রদায় মাঝে মাঝে আসিয়া অভিনয় করিত; এবং সে অভিনয় দেখিয়া এখানকার প্রবাসী ও ঘর-বাসী ইংরেজ-সম্প্রদায় তাঁদের নাট্য-রস-পিপাসা মিটাইতেন। কিন্তু বায়োস্কোপের অতিরিক্ত জনপ্রিয়তায় সে গৃহেও এখন বায়োস্কোপের ছবি দেখানো সুরু হইয়াছে। অর্থাৎ বিলাতী নাট্যের অভিনয়ে যবনিকা-পাত ঘটিয়াছে। এ ব্যাপার লইয়া ও-সম্প্রদায় ক্ষণেকের জন্য একটু বাদানুবাদ তুলিয়াছিল, কিন্তু ও-পাড়ার লোকে নির্ব্বাক্-সবাক্ বায়োস্কোপ দেখিয়া ও শুনিয়া নাটকের সজীব অভিনয় দেখিবার কথা আর মনে আনেন না!

বাঙালী হয়তো এ ব্যাপারে বিচলিত হন নাই। ইহাতে বুঝা যায়, বাঙালীর ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি কম। কিন্তু সব বাঙালীর পক্ষে যে এ-কথা খাটে না, তার প্রমাণ আমি। কারণ, ঐ ঘটনা হইতে আমি বাঙলা নাট্য-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিতেছি। কেন,—সে কথা খুলিয়া বলি।

কিছুকাল পূর্ব্বে অলিতে-গলিতে, মেশের বাসায়, বৈঠকখানা-গৃহে থিয়েটারের আখড়া বসার ঘন-ঘটা দেখিতাম। খুশী হইতাম ভাবিয়া, বাঙালী নাট্য-শিল্পকে ঠেলিয়া আকাশে না তুলিয়া ছাড়িবে না। গ্যারিক-ক্রেগে বাঙলা দেশ ভরিয়া উঠিবে! তা ছাড়া তাস-পাশায় মানুষ অলস হয়, জ্ঞান-পিপাসা-নিবারণে বাধা জাগে। কাযেই "এ্যামেচার'-থিয়েটারী সখে বাঙালীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, ইহাই কল্পনা করিতাম। কিন্তু অহো দুর্দ্দৈব, সে আশা আজ সাবানের ফেনার মত ফাটিয়া চুরমার হইতে বসিয়াছে!

কেন চুরমার হইতে বসিয়াছে—সে সংবাদ আপনারা রাখেন? পলিটিক্স লইয়া মাতিয়া আছেন, নিশ্চয় সে সংবাদ রাখেন নাই! কেন রাখিবেন? এক দিক দিয়াই জাতিকে ঠেলিয়া উন্নতির এভারেষ্টে তুলিবেন, ঠাওরাইয়াছেন! হায় রে, যে-ছেলের সর্ব্বাঙ্গে ঘা, তার মাথায় শুধু মলম লাগাইলেই কি সে আরাম পাইবে? না, সারিয়া উঠিবে? সর্ব্বাঙ্গে মলম লাগানো চাই! আমাদের জাতির সেই দশা! তার যেমন স্বায়ত্ত শাসন চাই, তেমনি তার অন্ন-বস্ত্রের অভাব, তার মনের স্বাস্থ্যাভাব, তার কাল্‌চারের দৈন্য—এ সবও ঘুচানো প্রয়োজন! নচেৎ কর্পোরেশনে মিটিং সারিয়া বাড়ী ফিরিয়া অবসাদের অন্ধকারে কালি-মাখা সার হইবে, এ কথা এখন আপনারা না ভাবুন, বাঙলা কাগজের সম্পাদকেরা কেন যে এ চিন্তায় কাতর হইয়া গবেষণা-মূলক প্রবন্ধের পরিবর্ত্তে শুধু গল্প ছাপিয়া আর খবর তর্জ্জমা করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন, দেখিয়া আমি হতভম্ব!

কিন্তু এ সব কথা আজ বলিতে আসি নাই। এ যেন ধান ভানিতে শিবের গীত গাওয়া! লেখার আর্টে এই বাহুল্য মস্ত ত্রুটি। আমি লেখক—সুতরাং আমার লেখায় এ ত্রুটি ঘটিতে দেওয়া ঠিক নয়। কাজের কথা পাড়ি।

দেখিতেছি, গলিতে গলিতে সে 'এ্যামেচার' থিয়েটারের আখড়া বিলুপ্তপ্রায়,—তার স্থান দখল করিতেছে নব-নব বাঙলা ফিল্ম-কোম্পানি! ফিল্মের দাম শস্তা; দু'চারিজন ভদ্রলোক সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড ক্যামেরা কিনিতেছেন, এবং 'ক্র্যাঙ্ক', 'টেম্পো, 'লং-শট', 'ক্লোজ-আপ' প্রভৃতি কথাগুলার মানেও মুখস্থ করিতেছেন। কেহ-কেহ তদুপরি বন্ধু-বান্ধব ও বান্ধবী প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ট্যাক্সিতে চড়িয়া লেকের পাড়ে, বাদার ধারে, নয় তো ই, বি, আর, রেললাইনের নীচে, কিম্বা গড়িয়া-হাটের মাঠে, বা কোন্ ধনীর বন্ধকী জীর্ণ বাগান-বাড়ীর ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

ব্যাপার দেখিয়া বাঙলার থিয়েটার ও নাট্য-সাহিত্য-সম্বন্ধে আমার আতঙ্ক জাগিতেছে! এই বাঙলা থিয়েটারগুলি—শনিবারে-শনিবারে নূতন নাটক, মহানাটক, দেব-নাটক প্রভৃতি খুলিয়া কি কাণ্ডই না বাধাইতেছে—তুমুল ব্যাপার! অবশেষে বায়োস্কোপ কি তাদের আস্ফালন চূর্ণ করিয়া দিবে? তার পর বাঙালীর দারিদ্র্যের যে-ছবি অহরহ মাসিকে-সাপ্তাহিকে অঙ্কিত দেখিতেছি—যে দারিদ্র্যের জন্য ধনী বা গৃহস্থের কথা গল্প-উপন্যাসে ছাপা দেখিলে সমালোচকবর্গ কুকুরের মত আর্ত্তনাদ করিয়া ওঠে—দারিদ্র্য-মূর্ত্তি ছেঁড়া কানি, ছেঁড়া জুতার লোভে রসনা মেলিয়া লম্ফ দেয়, সে দারিদ্র্যের জীর্ণতার ফাঁকে নিত্য বায়োস্কোপের দু-তিনটা 'শো'য়ে দর্শকের কি ভিড়! বায়োস্কোপের সামনে পথ দিয়া লোক চলিতে পারে না, পথে গাড়ী দাঁড়াইয়া থাকে—তখন ভাবি, ঐ কাগজে-লেখা দারিদ্র্য শুধু কাগজেই? না, বাঙালীর ঘরে ঢুকিয়া সে ঘরকে সত্যই শ্মশান করিয়া দিয়াছে?

এই ব্যাপার দেখিয়া এবং বাঙলা ফিল্ম-শিল্পে বাঙালীর প্রচণ্ড অনুরাগ বাড়িতেছে দেখিয়া আমি ভাবিতেছি, বাঙালীর সুপ্ত (লুপ্ত নয়) প্রতিভাকে এই ফিল্ম-সাহিত্যের রচনায় উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তোলা উচিত। সেই সম্বন্ধে আজ হিতোপদেশ দিতে বসিয়াছি।

জ্ঞানের রাজ্যে কতকগুলা formula আছে। বিজ্ঞানে, গণিতে, দর্শনে, সর্ব্বত্র এই formula জানা থাকিলে জ্ঞান-বস্তুটুকু চট্ করিয়া আয়ত্ত হয়। এই formulaর সাহায্যে সেকালে সংস্কৃত নাটক লেখা খুব নাকি সহজ ব্যাপার ছিল। ধীরোদাত্ত নায়ক, প্রেম-বিহ্বলা নায়িকা, উদরপরায়ণ বিদূষক—এমনি কটা চরিত্রের আদ্বা formulaর ছকা ছিল! 'অলঙ্কার-শাস্ত্র' একেবারে আইন বাঁধিয়া দিয়াছিল, নাটকের নায়ককে প্রেমে পড়িতেই হইবে এবং সে-প্রেমে ঈর্ষার বিষ ছড়াইবেন পাট-বাণী; বেচারী নায়িকা ভীতি-বিহ্বলা—বুক ফাটিলেও ভয়ে লজ্জায় তার মুখে কথা আর ফুটিতে চাহিবে না; এবং শেষ দৃশ্যে মিলন ঘটাইতেই হইবে। কাজেই দেখুন, এতখানি যদি বাঁধা পথ পাওয়া যায়, তাহা হইলে গোটা কয়েক নাম আর কথা মাত্র সম্বল করিতে পারিলেই নাট্যযশঃপ্রার্থী নাট্যকার ঐ বাঁধা পথে চট্ করিয়া চলিয়া যাইতে পারে, পা পিছলাইবার আশঙ্কা থাকে না। তার পর এই Logic পড়ার ব্যাপার! সেই Barbara, Celarent, Darii প্রভৃতি formula; আলোক-বিজ্ঞানে Vibgyor; তার পর গণিতে তো শুধুই formula। এই formula যে যে-পরিমাণে আয়ত্ত করিতে পারে, সে সেই পরিমাণে দিগ্‌গজ বনিয়া ওঠে! বাঙলা সাহিত্যের পত্তনের প্রথম যুগে মহাকাব্য-রচনায় অত ধুম পড়িয়াছিল কেন? হেতু, ঐ formulaর আধিপত্য। মহাকাব্যের জন্য formula ছিল,—যুদ্ধ বর্ণনা হইবে মহাকাব্যের প্রাণ। তার পর চাই কতকগুলা সর্গ, প্রথম সর্গে বাঁধা ব্যবস্থা ছিল প্রাচীন কবির স্তব-স্তুতি, পরে একটু প্রাকৃতিক বর্ণনা; একটু প্রণয়, 'হায় লো সখি' প্রভৃতি দিয়া একটু হা-হুতাশ! Formulaর সাহায্যে সেকালে ঝুড়ি-ঝুড়ি মহাসর্গ রচিত হইতে লাগিল। তার পর যুগধর্ম্মে মহাকাব্য লোপ পাইয়াছে।

এখন লিরিক্-কবিতা, ছোট গল্প এবং যৌনতত্ত্ব-ঘটিত উপন্যাসের মরশুম্। এও ঐ formulaর ব্যাপার। লিরিকের formula—দখিণ হাওয়া, পাখী, ছোট খাঁচা, দোদুল দোলা, অলক, কবরী, চাঁপার বন, ঝাউপাতা, খোলা বাতায়ন, নিশির তিমির, বিজন পথ, চপল-চাহনি, বাদল বাঁশী, শাড়ীর পাড়, গায়ের হাওয়া, তরণী বাওয়া, ঘাসের বন, আল্‌তা পা, কাজল আঁখি প্রভৃতি। অর্থাৎ এই কথাগুলার permutation আর combination। এই কথাগুলা জোড়াতাড়া লাগাইলেই first class lyric হইবে! এই কথা জোড়াতাড়া লাগানোর কেরামতিতে কবির নামে ফার্ষ্টক্লাস, সেকেণ্ড-ক্লাস ছাপ মিলিবে,—যেমন ছাপ মেলে বক্‌রীর মাংসে, মিউনিসিপ্যাল কর্ম্মচারীর পরীক্ষায়

ছোট গল্পের formula,—পাশের বাড়ী, খোলা ফিরকি, ছাদের চিলকোঠা, নিঝুম দুপুর, মেশের বাসা, কবিতার ছেঁড়া খাতা, মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠা, লাল-পাড় শাড়ী, নাগরা জুতা, এ্যালা খোঁপা, পিন্, ব্রুচ, চুড়ি, মাথার কাঁটা, ঠোঁটের হাসি, বিদায়-বেলা, নেটের-পর্দ্দা, লেশ, চায়ের পেয়ালা, এম-এ পাশের পড়া, মেয়ে ইস্কুলের গাড়ী, বাসের টিকিট, সিডলি-কার, বেড রোড, বায়োস্কোপ, কলাবাগানের বস্তী, বাঁশের টুকরি, টী-শপ, চীনা হোটেল, রিক্‌শ গাড়ী, স্বামীর অত্যাচার, বুকের বিরহ, পিয়ানোর সুর, রবি বাবুর গান। এগুলার permutation ও combination-এ একেবারে আধুনিক ছোট গল্পের টেকা বনিয়া ওঠে।

উপন্যাসে ঐ ব্যাপারগুলাই আরো সাংঘাতিক করিয়া তোলা চাই; এবং সেই সঙ্গে সমাজে যা আছে, তার ঠিক উল্টা ব্যাপারটাকে জোর কলমে ফুটানোর ওয়াস্তা। যথা স্ত্রীর ঘাড় ধরিয়া বাড়ীর বাহির করিয়া দাও, এবং পথের আনাজওয়ালীকে গৃহে আনিয়া তার হাতে সিন্দুকের চাবি দাও; এবং সে যখন ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া চাহিবে, তখন তাকে লইয়া নায়ককে একেবারে পাঠাইয়া দাও দার্জ্জিলিঙে, নয় ড্রেশ্‌ডেনে, শিলোনে, নয় ষ্টকহলমে; কিম্বা স্বামী আপিসে যায়, টাকা আনে, স্ত্রীর হাতে সর্ব্বস্ব দেয়, কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর কোনো সম্পর্ক নাই, স্ত্রী freely তরুণ সমিতির সেক্রেটারী অনঙ্গলালের সঙ্গে বসিয়া চা খায়, বায়োস্কোপে যায় এবং কন্‌টিনেণ্টাল্ অথরদের লেখা লইয়া মনস্তত্ত্বের দীর্ঘ আলোচনা করে; অর্থাৎ যা নয়, তাই লেখা চাই! যত কিছু প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থায় উলট-পালট বাধাইয়া দিতে পারিলেই উপন্যাস! এবং 'অপরাজেয়' বিশেষণ লাভ করিতে চাহিলে যে-সমস্যা দেশে নাই, তার আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়া, অর্থাৎ একটা বিদেশী উপন্যাসের নাম-ধামগুলা দেশী করিয়া ছাপিয়া দিলেই লেখক 'গর্কি' নয়, 'গলশওয়ার্দ্দি বনিবেন!'

নাটক সম্বন্ধে আধুনিকতা তেমন জোর পায় নাই। যেহেতু থিয়েটারগুলার বর্ব্বর ভাব এখনো কাটে নাই। পাহাড়ের ধার, কিরিচ্, বর্শা, কামান, ঢাল-তলোয়ার, জাতীয় সঙ্গীত, হিন্দু-মুসলমান, মার-কাট্—এগুলাই নাটকের নাটকত্ব! কাজেই বাঙলা নাট্য এখনো সেই মহানাটকের পর্য্যায়ে থাকিয়া গিয়াছে; হালের ফ্যাশন তেমন মানিয়া লইতে পারিতেছে না। তবে দু-চারিজনে পরামর্শ চলিয়াছে, তাঁহারাই বাঙলা সাহিত্যে নাটকের আমদানি করিবেন—যাকে বলে সজীব নাটক! তাঁদের বশওয়েল্‌রা চাঁদা তুলিতেছে, এক-পয়সানে সাপ্তাহিক বাহির করিবার উদ্দেশ্যে। যেহেতু এক-পয়সানে সাপ্তাহিকের সম্পাদক

বাঙলা দেশে নাটক বুঝিবার লোক নাই! কাজেই আশা আছে, বাঙলা উপন্যাসের মত বাঙলা-হরফে ছাপা অপূর্ব্ব নব-নাটক শীঘ্রই দেখিব। একখানা বিদেশী নাটকের পাত্র-পাত্রীর নাম পাল্টাইয়া বাঙলা নাম চালাইয়া নিজেই সুরু করিব না কি?

Formulaর কথায় অনেক কথা বকিতে হইয়াছে। উপায় নাই। যেহেতু formulaর প্রভাব জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তুচ্ছ করিবার নয়; এবং ফিল্ম-সাহিত্য বাঙলায় যে-ভাবে গজাইতে সুরু করিয়াছে, তাহাতে গোড়া হইতেই যদি formula মানিয়া চলা যায়, তাহা হইলে বিদেশী ফিল্মের সঙ্গে সমানে টক্কর দিতে পারিবে বলিয়া আমার ধ্রুব বিশ্বাস আছে।

প্রথমেই দেখুন—ফিল্ম দেখিতে গিয়া আমরা দেখি,—ছবির পর্দ্দায় কোম্পানির নাম দেখা দেয় সর্ব্বাগ্রে; তার পর কে শিনারিও লিখিয়াছে, কে ফটো তুলিয়াছে, কে Direction করিয়াছে। সেই ধারা আমাদের বাঙলা ফিল্মেও চাই। শুধু তাই কেন, বাঙলা ফিল্মের এ শৈশব-কাল। উৎসাহে শিল্প উন্নতি লাভ করে; কাজেই এখানে ঐ পরিচয়-সূত্রে সকলের নাম ছাপিয়া দেওয়া উচিত—কে ছবি তুলিয়াছে; সেই সঙ্গে কে ছবি Print করিয়াছে, কে ফিল্ম কিনিয়াছে, কে পার্ট লিখিয়াছে, কে Suggestion দিয়াছে, কে আর্টিষ্ট খুঁজিয়াছে—এমনি প্রত্যেক খুঁটিনাটি ব্যাপারের পরিচয় দেওয়া অত্যাবশ্যক। তার পর ছবির title ফোটার সঙ্গে সঙ্গে গল্প বা চিত্রনাট্য আরম্ভ করো।

চিত্র-নাট্যে কোন্‌টা জমে? প্লটে খুব হৈ-হৈ ব্যাপার সব-চেয়ে জমে। অর্থাৎ খুন, চুরি, ডাকাতি, বেলে কাটা, মোটর চাপা, দৌড়-ঝাঁপ—ধরি ধরি ধরা যায় না এমনি-ভাবে পলায়ন; আর সব ব্যাপার হাতের কাছে একে-বারে মজুত আছে—এমনিভাবে ঘটনা বাঁধিয়া যাওয়া চাই। নায়ক হইবে খুব ভালো লোক—সাত চড়ে কথা কহিবে না—বোকার মত ঠকিবে, মার খাইবে। নায়িকা পদে পদে ভুল করিবে,—যদি কেহ বলে, দিয়াশলাই দাও, তোমার ঘরে আগুন দিব, অমনি সে শুধু দিয়াশলাই আনিয়া দিবে না, কোন্ ঘরে আগুন দিলে চট্ করিয়া ধরিবে, তাও দেখাইয়া দিবে। তার পর ঘাটে বাসন মাজিতেছে বাঙালীর মেয়ে—চট্ করিয়া কোথা হইতে তিন-চারজন আসিয়া তার মুখে কাপড় বাঁধিয়া তাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবে,—নারী নিমেষে অচেতন হইয়া পড়িবে,—পথে লোকজন হাঁ করিয়া তাকাইয়া দেখিবে। নারী-হরণ চাইই! কেহ বাধা না দিলেও হরণকারীরা পিস্তল ছুড়িবে, এবং অবশেষে এক খোলা ময়দানে নারীকে ফেলিয়া রাখিয়া সহসা চা-পানের উদ্যোগে রত হইবে! সেই অবসরে নারী সহসা হাতের পায়ের দড়ি খুলিয়া পলাইবে—ছুটিবে না; দুই হাত প্রসারিত করিয়া ধীরে ধীরে স্খলিত কম্পিত পায়ে মাঠ পার হইবে। সে মাঠ পার হইবামাত্র দস্যুদলের হুঁশ হইবে, লুঠ্ ভাগলবা! তারা তখন অনুসরণ করিবে। ধরে-ধরে, এমন সময় নারীর সামনে একটা ঘোড়া আসিয়া দাঁড়াইবে, নারী খপ্ করিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া পগার ডিঙ্গাইয়া জলার উপর দিয়া তীরের বেগে ছুটিবে; হরণ-কারীর দল সব পথ জানে; তাই তারা বাঁকা পথে আসিয়া সেই ছুটন্ত ঘোড়া প্রায় ধরিয়া ফেলে,এমন ব্যাপার, হঠাৎ তখন রেলের লাইন পার হইয়া ঘোড়া-সমেত নারী পলাইবে। হরণকারীদের সামনে চলন্ত ট্রেণের বাধা, তারা পিছনে পড়িয়া থাকিবে। তার পর নারী ঘোড়া ছাড়িয়া হয় চলন্ত ট্রেণের ছাদে লাফাইয়া পড়িবে, নয় ওধারে মোটর খাড়া থাকিবে, তার প্যাসেঞ্জারদের মুষ্ট্যাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া সেই গাড়ীতে চড়িয়া জলা-মাঠ-পুকুর ভাঙ্গিয়া দিবে টানা ছুট্! শেষে অবশ্য নারীকে একেবারে তার গৃহের দ্বারে, নয় তো এক তরুণ প্রণয়ীর বুকে আনিয়া তোলা চাই—কিন্তু গল্পের climax situation হইবে এই chasing। যদি বলেন, ঘাটে-বাসন-মাজা মেয়ে সহসা ঘোড়া পায় কি করিয়া? তার জবাবে বলিতে পারি, অত গভীর যত্ন-তত্ত্ব জ্ঞান লইয়া শিনারিও লেখা চলে না—কাণ্ডাকাণ্ডের জ্ঞান সম্বন্ধে সচেতন থাকিলে বাঙলা ফিল্ম গড়া কোনো দিন সম্ভব হইবে না। প্লট যত অসম্ভবই হোক, তার মধ্যে গতির বেগ চাই অসামান্য। ঐ গতির বেগে ছবি দর্শকের মনে এমন শোঁ শোঁ বেগে ঢুকিয়া যাইবে যে, তাকে রোধ করে, এমন সাধ্য বাঙালী দর্শকের থাকিতে পারে না। তাছাড়া চার আনা ব্যয় করিয়া দর্শক চায় উত্তেজনা। কাজেই উত্তেজনা যত জমাইতে পারিবে, তা সে উড়ে বামুন রান্নাঘর ছাড়িয়া এরোপ্লেন হইতে লাফাইয়া পড়ুক, বা কাদু-ঝী মোটর-বাইক চালাইয়া প্রভু-পত্নীর উদ্ধার-সাধন করুক সুন্দরবনের জঙ্গল হইতে—তাহাতে কিছু আসিয়া যাইবে না। কতকগুলা thrills আর sensations চাই—একটি বদমায়েস-গুণ্ডা রমণী-হরণকারী; এক পুরাতন ভৃত্য—মাহিনা না লইয়া যে মনিবের কাজ করে এবং নিজের বাড়ী ফেলিয়া মনিবের সংসার চালায়। অতএব বাঙলা ফিল্মের প্রযোজক বা স্রষ্টার প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত, শিনারিওয় এই টগ্‌বগে রকম উত্তেজনা রাখা! অসম্ভব বলিয়া কোনো বস্তু বাঙলা ফিল্মে মানিবার প্রয়োজন নাই। যিনি মানিবেন, তাঁর পক্ষে ওস্তাদ বনিবার সম্ভাবনা নাই। বহু বাঙলা চিত্র দেখিয়া যে ভূয়োদর্শিতা লাভ করিয়াছি, সেই ভূয়োদর্শিতার উপর নির্ভর করিয়াই এ কথা আমরা সদর্পে বলিতেছি!

এখন আলোচনা ছাড়িয়া একটি আদর্শ শিনারিও

বিবৃত করিতে চাই। নির্বাক ছবির শিনারিও। বাঙলা ফিল্ম কোম্পানিরা এ শিনারিও অবলম্বনে ছবি তুলিয়া ভাগ্য পরীক্ষা করিলে দস্তরমত লাভবান হইবে, সে সম্বন্ধে গ্যারাণ্টি দিতে প্রস্তুত আছি। কারণ, গল্প-উপন্যাস রচনায় আমি আনাড়ি। শিনারিও-রচনায় আনাড়ির নাড়ীই 'প্রাণঘাতিকা' অর্থাৎ 'মার-মার'-গোছের ফিল্ম তৈরীতে ওস্তাদ্!

ছবির প্রথম দৃশ্য ফুটিবে—একখানি মুখ ( Close-up ) সেই সঙ্গে টাইটেল—"সনাতন—বাঙলার সনাতন ভৃত্য"; তার পর টাইটেল—'বেচারাম বাবু—এককালে মস্ত ধনী—কিন্তু পরের দায়ে বহু অর্থ দিয়া এখন নিঃস্ব।" ছবিতে দেখাইবে—ছেঁড়া-জামা ছেঁড়া-কাপড়-পরা এক ভদ্রলোক, উঠানের ধারে যে আমরুল পাতা হইয়াছে, সেই পাতা ছিঁড়িতেছেন। তৃতীয় টাইটেল 'তাঁর গৃহিণী উমাসুন্দরী'—কাঁখে কলসী, স্নান সারিয়া আসিলেন। স্বামীকে দেখিয়া বলিলেন, ঘরে যে কিছু নেই।

বেচারাম আমরুল পাতা দেখাইলেন, অর্থাৎ এই পাতা রাঁধো।...

কি করুণ situation বলুন তো! ধাঁ করিয়া দর্শকের চোখ ছলছলিয়া উঠিবে। এমন সময় এক কন্যাদায়গ্রস্ত লোক আসিয়া সাহায্য চাহিবে, বেচারাম কাঁদিয়া উঠিল—কখনো কাহাকেও ফিরান নাই। গৃহিণী জল ফেলিয়া কলসীটা স্বামীর হাতে দিলেন, স্বামী সেই কলসী কন্যাদায়গ্রস্তের হাতে দিতে সে খুশী হইয়া কলসী লইয়া বিদায় হইল। তার পর গল্প এই ভাবে চলিবে:—

বেচারামের যুবতী কন্যা কিশোরী—রূপ দেহ উথলিয়া উঠিয়াছে। বিবাহ হয় না—কারণ, বাপের পয়সা নাই! কিশোরী সাজাইতে হইবে এক ফেরঙ্গ-ললনাকে,—অবশ্য বাঙলা নাম দিয়া। মিস গীতা দেবী, বা গায়ত্রী দেবী, বা শর্মিষ্ঠা দেবী, বা অশ্রুকীর্ত্তি দেবী—এমনি-গোছের নাম দেওয়া চাই। পাড়ার দামোদর চক্রবর্ত্তীর কাছে বেচারামের ভিটে বাঁধা; দামোদরের ছেলে লাবণ্য-কুমার কলিকাতায় এম-এ পড়িতেছে; খাশা ছেলে। লাবণ্যর ইচ্ছা, কিশোরীকে বিবাহ করে; কিন্তু বাপ তাহা ঘটিতে দিবে না। দামোদরের কিছু নাই। কিশোরী রান্না করে, জল আনে, ঘাটে বসিয়া বাসন মাজে—জলে লাবণ্যর মুখ ভাসিতে থাকে, [ ক্যামেরাম্যানের বাহাদুরির জন্য এ দৃশ্য চাই—নহিলে সে অনেক বেশী charge করিবে ছবি তোলার জন্য; শিশু শিল্পের এমন অবস্থা নয় যে ক্যামেরাম্যানের খাঁই পুরাপুরি মিটাইতে পারে—কাজেই দু'পক্ষেরই চোখ ঠারিয়া চলা চাই। ]

গ্রামে আসিয়া উদয় হইল এক পাজী জমিদার ধূর্জ্জটিচন্দ্র। দামোদর তার সঙ্গে ভারী আলাপ জমাইল; এবং ধূর্জ্জটি একদিন পুকুরে মাছ ধরিতে আসিয়া কিশোরীকে দেখিল। অমনি দামোদরকে বলিল,—পাঁচ হাজার টাকা দেবো। ঐ রূপসীকে চাই। দামোদর গুণ্ডা ডাকাইল,—এবং সব ব্যবস্থা পাকা হইয়া গেল!

[ ধূর্জ্জটি কিশোরীকে বিবাহ করিবে, বলিতে পারিত; কিন্তু তা বলিতে দেওয়া ঠিক নয়—গল্পের thrill তাহাতে মারা যাইবে। ]

সে রাত্রে কিশোরীর ঘুম হইতেছিল না—শুধু লাবণ্য-কুমারের কথা ভাবিতেছিল। এমন সময় কতকগুলো হাত.. ( ক্যামেরাম্যানের কেরামতির জন্য )—তার পর ব্যস্—ধূর্জ্জটির লোকজন তাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া একটা মোটরে চাপাইল।

[ মোটর আসিল কি করিয়া? এই অজ পাড়াগাঁ! তা হোক—বলিয়াছি, অত কৈফিয়ৎ দিতে গেলে ফিল্ম হয় না। ]

তার পর একেবারে এক তেতলা বাড়ীর উপর-তলার ঘর! কিশোরী বন্দিনী! ধূর্জ্জটি আসিয়া বলিল, 'আমার হও'। কিশোরী ফুঁশিয়া বলিল,—'প্রাণ থাকিতে নয়।' ধূর্জ্জটি চোখ রাঙাইয়া বলিল—'বেশ, আমি দুদিন সময় দিলাম।'

[ এ সময় দিবার তাৎপর্য্য কি? তারো কৈফিয়ৎ দিব না। ]

বন্দিনী কিশোরী জানলার বাহিরে নীচে তাকায়; নীচে একটা নদী। জানলায় লোহার গরাদ—ফাঁকে মাথা গলাইবার উপায় নাই। কিশোরী বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। তার পর টাইটেল—'পরদিন প্রাতে।' ছবিতে দেখিব,—ঐ বাড়ীর উঠান,—মস্ত দুটো ডালকুত্তা ঘুরিতেছে; একটা তক্তাপোষের উপর বসিয়া চারিটা মোটা পালোয়ান গুণ্ডা। ধূর্জ্জটি মোটরে বাহির হইয়া গেল। উপরের জানলায় কিশোরীর বেদনা-কাতর মুখের Close up—ব্যস্! আবার টাইটেল দাও, 'দুপুর বেলায়।' ছবিতে দেখাও—পাশের নদীতে নৌকা—সেই নৌকায় বন্দুক-হাতে শীকারীর বেশে তিনজন যুবা। একজন হঠাৎ গান গাহিল। ঘরে বসিয়া কিশোরী কাঁদিতেছিল—নীচে গান শুনিয়া জানলায় আসিয়া দাঁড়াইল,—title ফুটিল, "লাবণ্যকুমার!" তার পর মূর্চ্ছা! এবারে title—"জানলার ধারে গাছ। গাছে পাখী দেখিয়া শীকারী তাগ করিল।" তার সঙ্গে ছবিতে দেখিলাম, শীকারীদের মধ্যে একজন বন্দুক ছুড়িল—ঘরে কিশোরী মূর্চ্ছিতা; তার গায়ে ছররা লাগিল। সে উঠিয়া জানলায় দাঁড়াইল। অমনি title—"চারি চোখে মিলন।" ছবিতে দেখাও, শীকারীরা বন্দুক হাতে লোহার গরাদ ধরিয়া উপরে উঠিতেছে।

[ ফটকে গেল না কেন? তার কারণ, ফিল্মের নায়ক কখনো সিধা সোজা পথে চলে না। তাই বলিয়া নল

বহিয়া একদম তেতলায় ? জানলায় লোহার গরাদ—আসিবে কি করিয়া ? জবাব,—তবু আসিবে। নহিলে thrill হইবে না! যা নিত্য ঘটে, ছবিতে তাই দেখিবার জন্য দর্শক গাঁটের চার আনা পয়সা খরচ করে নাই তো!]

কিশোরী দ্বার টানিতে লাগিল—দ্বার খুলিয়া গেল।

[প্রশ্ন হইতে পারে, এতক্ষণ টানে নাই কেন? তার জবাব,—এতক্ষণ প্রয়োজন ছিল না।]

যেই তিনজনে ঘরে ঢুকিল, কিশোরী কহিল, লাবণ্য! সঙ্গে সঙ্গে কিশোরীর মূর্চ্ছা! মূর্চ্ছিতাকে বহিয়া তিন বীরের গাছ বহিয়া নামিবার প্রয়াস।

[আপনারা বলিবেন, গুণ্ডাগুলা তবে কি চৌকি দিতেছে? তার জবাব,—এমনি দিবে। নহিলে গায়ে কাঁটা দিবার আয়োজন থাকে না! যদি বলেন, গুলির শব্দ তাদের কাণে যায় নাই? এর উত্তরে বলিব, থাক্—তার আভাস দিলে নির্ব্বিঘ্নে উদ্ধার-কার্য্য ঘটে না; thrill বেশী বাড়ে না। তাছাড়া Poetic justice আছে তো। ধর্ম্মের জয়? অধর্ম্মের পরাজয়? আমরা যত আধুনিকই হই—ধর্ম্মের জয় দর্শকরা মানে।]

কিশোরীকে যেই আনিয়া নৌকায় তোলা, অমনি দেখাও, একজনের বন্দুক গাছের ডালে আটকাইয়া আছে। সে গেল বন্দুক আনিতে এবং আনিয়া নৌকায় উঠিবে, এমন সময় ডালকুত্তা ও গুণ্ডাগুলার প্রবেশ—এবং উপরের ঘরে ধূর্জ্জটি! [কি-রকম thrill! জোর-হাততালি পড়িবে। হাততালি মিলিলেই "সাফল্য-গৌরব" এবং সপ্তাহ-বৃদ্ধি!] বীরগণের নৌকা লইয়া সোঁ সোঁ বেগে ধাবন—এরাও অনুসরণ সুরু করিল। ['কুত্তাগুলাকে ভালো রকম শিখাইতে পারিলে তারাও thrill বাড়াইবে অনেকখানি।] তেতলা হইতে ধূর্জ্জটি বন্দুক দাগিল—অব্যর্থ লক্ষ্য! নৌকা কাঁপিল—বীরগণ জলে ভাসিল; কিশোরীও সেই সঙ্গে। কিন্তু তার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়াছে। ব্যস্! সাঁতার সুরু! পিছনে গুণ্ডারাও সাঁতরাইয়া আসিতেছে। সামনে একটি মোটর বোট [এ জিনিষটা আজো কেহ বাঙলা ফিল্মে আনেন্ নাই—এ বোটে thrill ও হাততালির ভারী ঘটা বাধিবে]। বীরগণ কিশোরী-সমেত বোটে উঠিল—গুণ্ডাদের এক জন ডুবিয়া গেল; বাকীগুলা জলে চুবন খাইতে লাগিল [দর্শক ইহাতে ভারী আমোদ পাইবে—হাসিয়া একেবারে ফুটি-ফাটা হইবে]। তার পর···

কিন্তু বাকীটুকু বলিব না। যদি কোনো কোম্পানি কিঞ্চিৎ দক্ষিণার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে সম্পূর্ণ গল্পটা তাঁদের দিতে প্রস্তুত আছি।

উপসংহারে thrill খুব। ঐ মোটর বোটেই উহাদের সে রাত্রি কাটিবে—বোটের যে মালিক, তার লোভ হইবে কিশোরীকে পাইবার; এবং গভীর নিশীথে সে ক্লোরোফর্ম্ম-যোগে ঘুমন্ত বীরত্রয়কে অচেতন করিয়া জলে ফেলিয়া কিশোরীকে বোটে লইয়া বোট চালাইয়া দিবে। নদীর দুধারে পল্লীর শোভা—বোট সকালে গিয়া চরে থামিবে। [এই পল্লীই বাঙলার—বাঙলার—না হোক্—ফিল্মদর্শকের নাড়ী। Local Colour বলিয়া ইংরাজী 'ডেলি'তে প্যারা লিখিতে পারিবে।] কিশোরী ঘুম হইতে চোখ মেলিয়া চাহিতেই দেখিবে, সামনে মালিক—তার মুখের পানে চাহিয়া—চোখে দুষ্ট লালসা। সে কোমরে আঁচল জড়াইয়া রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি ধরিবে, এবং তার পর···

কি যে ঘটিবে, ওঃ! দর্শকদের তাক্ লাগিয়া যাইবে! পুলিশ, স্বদেশী ভলান্টিয়ার, নারী-কর্ম্মীর দল, ভালুক-নাচ, সাঁওতাল-সর্দ্দার, চরকা—অর্থাৎ কি যে নাই এ ফিল্মে···

কিন্তু আর বলিব না। বলিয়াও বলার বিরাম দিতেছি না, ঠিক নয়। উপসংহারটুকু ফিল্ম কোম্পানির দক্ষিণা-সাপেক্ষ।

---

# মোটরে কাশ্মীর-যাত্রা

ভ্রমণ ]

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

৬

অমৃতসর বেশ সমৃদ্ধ সহর, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। চতুর্থ শিখ-গুরু রামদাস এ সহরের পত্তন করেন,১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে। বছর নিয়ে একটু মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে নয়, ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে এ নগরের প্রথম পত্তন হয়। বাদশাহ আকবর এ জায়গাটুকু তাঁকে জায়গীর দেন। স্বর্ণমন্দির-সংলগ্ন ভূমিতে সহরের প্রথম পত্তন হয়। এখানে গুরু রামদাস এক দীঘি তৈরী করান; সে দীঘির নাম দেন অমৃতসর—তাই থেকেই সহরের নাম হয়েচে অমৃতসর। এই দীঘির বুকের উপর মস্ত প্রাসাদ। দীঘিটি অমৃতসর সিটির মধ্যে; ক্যাণ্টনমেণ্ট থেকে দূরে। এই দীঘির বুকে এই প্রাসাদের নাম হরমন্দির বা গুরু-দরবার বা দরবার-সাহেব বা স্বর্ণমন্দির। কারো মতে স্বর্ণমন্দির তৈরী করান পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিং। এ কথা ঠিক নয়। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে স্বর্ণমন্দির প্রথম তৈরী হয়। পরে আহমদ শাহ দুরানি পুরানো মন্দিরটি ধ্বংস করেন; ১৮০২ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ সিং মন্দিরের সংস্কার করে তাকে বর্ত্তমান শোভা-শ্রী-সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করেন। স্বর্ণ মন্দির বহুকালের প্রাচীন মন্দির।

তীর-পথ থেকে মন্দিরে যাবার জন্য শ্বেত পাথরে-রচা একটি পুল-পথ আছে। এই পথই মন্দিরের প্রবেশ-পথ। স্বর্ণমন্দিরের গড়ন মন্দিরের মত নয়—rectangular, চতুষ্কোণ প্রাসাদের মত; নীচের অংশ পাথরের তৈরী, মাথায় চারদিকে চারটি রূপার চূড়া। এ চূড়াগুলির ভিতর দিয়ে পথ আছে; সেই পথে মাঝখানকার উচ্চ চূড়ায় পৌঁছানো যায়। মাঝখানকার এই সর্ব্বোচ্চ চূড়াটি তামার সোণালি পাতে মোড়া।

এই মন্দিরের চারিধারে বহু গৃহ। গৃহগুলিকে বুঙ্গা বলে। বুঙ্গাগুলিতে গণ্যমান্য শিখ-সর্দ্দারেরা পূজা দিতে এসে বাস করেন। উত্তর-পশ্চিম কোণে তখ্‌ত্‌ আকাল বুঙ্গা—এটি পঞ্চম গুরু অর্জ্জুন তৈরী করান্। এই বুঙ্গায় গুরু গোবিন্দ সিংএর তরবারি সংরক্ষিত আছে।

মন্দিরের মধ্যে বিচিত্র সোণালি কাজ-করা হল-ঘরে 'গ্রন্থসাহেব' সংরক্ষিত। নিত্য মৃদঙ্গ-বীণা ও বিবিধ বাদ্য-সংযোগে ধ্রুপদ ও ভজন-গানের ব্যবস্থা আছে। প্রহরে প্রহরে গীত-বাদ্য হয়। মন্দিরে ঢুক্‌তে হলে জুতা খুলে যেতে হয়। সর্ব্বজাতির পক্ষেই এই ব্যবস্থা। শুনলুম, য়ুরোপীয়েরাও এ নিয়মের বহির্ভূত নন্। মন্দিরের ছাদে শীষমহল—গুরুর বাস-গৃহ। ময়ূরপুচ্ছের ঝাঁটায় এই মন্দির নিত্য ঝাঁট দেওয়া হয়।

মন্দির-সংলগ্ন ভূ-খণ্ডের দক্ষিণে দরবার-উদ্যান। উদ্যানে নানা ফলের গাছ। তা ছাড়া একটি দীঘি আছে। দক্ষিণে অটল টাওয়ার—সাধু হরগোবিন্দর পুত্র অটল রায়ের নামে এটি উৎসর্গীকৃত।

অমৃতসর সিটির উত্তর-পশ্চিমে রণজিৎ সিংয়ের তৈরী দুর্গ গোবিন্দগড়; চৌদ্দ মাইল দূরে তরণ-তারণ। তরণ-তারণ একটি দীঘি—গুরু অর্জ্জুন এ-দীঘি তৈরী করান্। এ দীঘির জল তীর্থ-বারির মত পবিত্র। শিখেরা বলেন, এ দীঘির জলে স্নান করলে ও সাঁতার কাটলে কুষ্ঠরোগ আরোগ্য হয়। গুরু অর্জ্জুনের না কি কুষ্ঠরোগ ছিল। তাই তিনি তরণ-তারণের তীরে বাস করতেন।

বলেচি, অমৃতসর সহরটি বেশ পরিচ্ছন্ন। পথ-ঘাট তক্‌তক্‌ ঝক্‌ঝক্‌ করচে। এখানে বহু ধনীর বাস। তা ছাড়া কাশ্মীরী, আফগান, নেপালী, বোখারাই,

তিব্বতী, বেলুচি, ইয়ারখন্দী বহু ব্যবসায়ী ব্যবসা-সূত্রে এখানে এসে বাস করচেন। জরি-চুমকি, শাল, আলোয়ান, পশমিনা, হাতীর দাঁতের কাজ অমৃতসরের নামকে সারা বিশ্বে খুব প্রসিদ্ধ করে তুলেছে। সেপ্টেম্বর মাসেও এখানে বেশ গরম। রাত্রে ছাদে বা খোলা বারান্দায় বহু ধনী নেয়ারের খাট পেতে তাতে শয্যা বিছিয়ে নিদ্রা যান। এখানকার মুসলমান মেয়েরা পায়-জামা পরেন—সে পায়জামার নাম সুথন। সুথনের কোমরের কাছটা যেমন চওড়া, পায়ের দিকটা তেমনি সরু। হিন্দু মেয়েরা পরেন ঘাগরা। সাধারণ ভাষায় এই ঘাগরার নাম ল্যাঙ্গা। মেয়েরা মাথায় ছোট ছোট বেণী রচনা করে চুল পাতিয়ে রাখেন। মেয়েদের পায়ে জুতা পরার রেওয়াজ আছে। সুশ্রী বলিষ্ঠ দীর্ঘ দেহ—শক্তির সঙ্গে শ্রীর অপূর্ব্ব সমন্বয় এই শিখ-রমণীর দেহে।

এখানকার হল্-বাজার খুব বড় বাজার। হল্-বাজারের কাছেই হল্-গেট্। ক্যাণ্টনমেণ্ট ছেড়ে রেলের পুল পেরিয়ে এই হল্-গেট দিয়ে সিটিতে প্রবেশ করতে হয়। হল্-গেট্ দিয়ে ঢুকে সিটির দিকে খানিকটা এলে জালিয়ানওয়ালা বাগ—যেখানে মানব-জীবনের নির্ম্মম এক ট্রাজেডির অভিনয় হয়ে গেছে একদিন! জালিয়ান-ওয়ালা বাগ একটি মস্ত পার্ক—আগাগোড়া পাঁচিল-ঘেরা। কত হতভাগ্যের দীর্ঘনিশ্বাসে তার বাতাস আজো ভারা-ক্রান্ত রয়েচে!

১২ সেপ্টেম্বর ঊষার আলো ধরণী স্পর্শ করবামাত্র আমরা হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লুম। অত ভোরে ফটো নেওয়া সম্ভব হলো না। কাজেই নিরাশ চিত্তে ফিরে আমরা রামবাগে এলুম। রামবাগ এখন ক্যাণ্টন-মেণ্টের মধ্যে। এই রামবাগ ছিল রণজিৎ সিংয়ের খাশ-বাগান। এর মধ্যে গ্রীষ্ম-যাপনের জন্য তাঁর সৌধ ছিল। সে সৌধ এখনো বর্ত্তমান আছে।

রামবাগ ঘুরে আমরা গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোডে এলুম। আশে-পাশে কখানা দোকান। এখানে দোকানে ভাত, রুটী, মাংস বিক্রী হয়—শিখেরা খায়। মুসলমানী হোটেলে শিখেরা প্রবেশ করে না। শিখের জাত্যভিমান খুব বেশী। অমৃতসরে অনেকগুলি সবাই আর ধর্ম্মশালা আছে। গান-বাজনার রেওয়াজও এখানে বেশী রকমের।

একটু আগে এসে দেখি, পথের দুধারে ধু-ধু মাঠ। বাঁয়ে দূরে রেল-লাইন। ডাহিনে কোন্ দুঃখী-গরীবের জীর্ণ গৃহ, কোথাও শুষ্ক মাঠ, কোথাও বা ঘেঁসাঘেঁসি কয়েকটা গাছপালা। একটু আগে খালশা কলেজের প্রকাণ্ড বাড়ী নজরে পড়লো।

অমৃতসর ছেড়ে ঠিক ৫৫ মিনিট পরে লাহোরে প্রবেশ করলুম। লাহোরে ঢুকে প্রথমেই ডান দিকে দেখলুম, সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শালিমার-বাগ। ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ শাহজাহান কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ শালেবাগের আদর্শে শালিমার-বাগ তৈরী করান। বাগানটি তেতলা। ফটক দিয়ে ঢুকে রাস্তার সঙ্গে এক levelএ প্রথমেই যে তলা, সেই তলাটি সব-চেয়ে উঁচু। এই তলা থেকে সিঁড়ি নেমে নেমে মাঝের তলা, আবার মাঝের তলা থেকে সিঁড়ি বয়ে শেষের তলায় যেতে হয়। সর্ব্বোচ্চ প্রথম তলাটির নাম ফরং বখ্‌স্। সর্ব্বোচ্চ প্রথম তলায় দুধারে ফল-ফুলের বিচিত্র গাছপালা, নানা রঙের ফলে-ফুলে অপূর্ব্ব শ্রী জাগিয়ে রেখেছে! মাঝখানে জলের লহর, দীর্ঘ—তাতে ১০০টি ফোয়ারা। দোতলায় চারিধারে ফুলগাছের মধ্যে শ্বেতপাথরে তৈরী জলটুঙ্গি। জলাধারের মাঝে মর্ম্মর-রচিত গৃহ—গৃহটির চারিধার খোলা। জলাধারে পদ্মের রাশ ফুটে রয়েচে। শেষের সব-নীচু তলায় বিস্তর আম গাছ। এ বাগান শাহ-জাহানের হুকুমে তাঁর স্থপতি আলিমর্দ্দন খাঁ তৈরী করেন।

শালিমার-বাগের সামনে আর একটি বাগান আছে। সেটির নাম গুলাবী বাগ। শাহজাহানের একজন প্রধান ফৌজদার ছিলেন, সুলতান বেগ; তিনি এই গুলাবী বাগ তৈরী করান। এ বাগানে হরেক রকমের নকাশী কাজ আছে—ভারী চমৎকার। এই বাগানের সামনে যে লিখন আছে, তার অর্থ—

"চমৎকার এই বাগান। এ বাগানে ফুলের রূপ দেখে চন্দ্র-সূর্য্য হিংসায় খুন হয়েছিল,—তারা এখন এ বাগানে রোশনি দিচ্ছে।"

কিম্বদন্তী, লাহোরের প্রতিষ্ঠা করেন সূর্য্যবংশীয় রাজা লব। সে সম্বন্ধে অবশ্য কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। ইতিহাসের যুগে দেখি, দশম শতাব্দীতে লাহোর কাবুলের ব্রাহ্মণ-রাজাদের অধিকার-ভুক্ত ছিল। মামুদ গজনীর অভিযানের পর তাঁর অধীনস্থ দাস মালিক আয়াজ লাহোরের শাসন-কর্ত্তা হন। লাহোরের সমৃদ্ধি গৌরব যা-কিছু, তা ঘটে মোগল বাদশাহ আকবরের আমলে। ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে এখানে তিনি এসে রীতিমত দরবার করলেন। জাহাঙ্গীর লাহোরে ভালোভাবেই বাদশাহী আস্তানা পাতেন। তাঁর আমলে আদি-গ্রন্থের সংগ্রহ-কার শিখ-গুরু অর্জ্জুন লাহোরের দুর্গমধ্যে বন্দী অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। জাহাঙ্গীরের পর শাহ জাহান লাহোরের সমৃদ্ধি-শ্রী আরো বাড়িয়ে তোলেন। ঔরংজীবের আমলেও লাহোর বেশ সমৃদ্ধ ছিল। ঔরংজীবের কন্যা জেব-উন্নিসা এখানে এক বাগান তৈরী করান, তার ফটক চৌ-বুরুজী; সে বাগান নেই, তার ফটক আছে। তবে চৌ-বুরুজের একটি বুরুজ লোপ পেয়েছে। এ বাগানটি তিনি কাকে দান করেন; পরে লাহোরের নওয়ান কোটে আর একটি বাগান তৈরী করান। নওয়ান কোটের এই বাগানে দেহান্তে তাঁকে

কবরিত করা হয়। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে লাহোর শিখের অধিকার-ভুক্ত; পরে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশের হাতে আসে।

শালিমার-বাগ প্রভৃতি দেখে সহরের মধ্য দিয়ে আমরা ক্যাণ্টনমেণ্টে এলুম। ক্যাণ্টনমেণ্টের পুরানো নাম মীয়ান মীর। মীয়ান্ মীর ছিলেন এক ফকির, জাহাঙ্গীর ও শাহ জাহান তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর সমাধিও এখানে আছে। লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্ট প্রকাণ্ড সমাধি-ক্ষেত্রের উপর তৈরী হয়ে উঠেচে।

লাহোরে বহু লোকের বাস। সহর বেশ সমৃদ্ধ; কিন্তু দেশী-পল্লী অত্যন্ত নোংরা। সাইন-বোর্ডের এখানে ভারী ঘটা দেখলুম। নর্ত্তকী বাইজীর বাড়ীর দোরে অবধি সাইনবোর্ড আঁটা। তাতে যে-সব কথা লেখা আছে, তাতে বৈচিত্র্য মন্দ নয়! "নাচ দেখতে চান তো আসুন—পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হবে না, খুব ভালো বন্দোবস্ত" ইত্যাদি ধরণের বিজ্ঞাপন অপ্রতুল নয়।

লাহোরে অসংখ্য বাগান। যুগে যুগে যে-সব রাজা-বাদশা লাহোরে প্রভুত্ব করে গেছেন, এই সব বাগান তাঁদের সৌখীনতার চিহ্ন-স্বরূপ আজো পড়ে আছে। এ-গুলির মধ্যে হুজুরী-বাগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রণজিৎ সিংয়ের বাগান ছিল এই হুজুরী-বাগ। বিস্তর মোগল সৌধ ভেঙ্গে তার উপাদানে হুজুরী-বাগের মাঝখানে শ্বেত-পাথরের বারদ্বারী তৈরী হয়েচে। হুজুরী-বাগের মধ্যে শ্বেত সমাধি-ভবন। এই ভবনে রণজিৎ সিং, খড়্গ সিং ও নেহাল সিংয়ের ভস্ম সমাহিত আছে। লাহোর দুর্গের ঠিক পশ্চিমে এই হুজুরী-বাগ। সমাধি-ভবনের মাঝখানে এক প্রস্তর-বেদী। বেদীর মাঝখানে পাথরে ক্ষোদা মস্ত একটি পদ্ম,—এই পদ্মটির ঠিক নীচে মহারাজ রণজিৎ সিংয়ের ভস্মরাশি আছে; আর এই বড় পদ্মটির চারি ধারে পাথরে-ক্ষোদা ছোট ছোট এগারোটি পদ্ম। চারটিতে রণজিতের চার মহারাণীর ভস্ম; বাকী সাতটি তাঁর সাত গণিকার ভস্মাধার। এঁরা এগারো জনেই মহারাজের চিতায় দেহ বিসর্জ্জন দিয়ে সতী হয়েছিলেন!

লাহোর দুর্গের কারিগরিতে তিন রকম প্যাটার্ণ লক্ষ্য হয়। প্রথমে এ দুর্গ তৈরী হয় জাহাঙ্গীরের আমলে ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে; পরে শাহ জাহান নতুন ভাবে এর সংস্কার করান, ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে; তার পর শিখের আমলে আর একবার এ দুর্গের সংস্কার হয়। শিখের হাতে শোভা-শ্রী কিছুই ফোটেনি।

এই দুর্গের মধ্যে বাদশাহী কেতায় দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, মস্‌জিদ প্রভৃতি সবই মজুত আছে। দেওয়ান-ই-আমের ঝরোকাগুলির ভারী বাহার। রণজিৎ সিংয়ের রাজত্বের সময় এই দেওয়ান-ই-আমের নতুন নাম-করণ হয় তখ্‌ত্। দুর্গমধ্যে যে মোতি মসজিদ আছে, শিখেদের আমলে সেটি তোষাখানায় রূপান্তরিত হয়। তার পর লর্ড কার্জ্জন তাকে এই আধুনিক বর্ব্বর-পাশ থেকে মুক্ত করেন। ঐতিহাসিক সৌধমালার সংস্কার ও সেগুলির গৌরব-সৌষ্ঠব সংরক্ষণে লর্ড কার্জ্জনের দরদ আর সহানুভূতি বিশ্বের দরবারে শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য। যদি এদিকে দরদী লর্ড কার্জ্জনের দৃষ্টি না পড়তো, তা হলে ভারতের এই সব ঐতিহাসিক মহাতীর্থ আজ কঙ্কালমাত্রে পর্য্যবসিত হতো—তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে এত খোঁচা বিঁধতো যে সেগুলিকে চিনে নেবারও উপায় থাকতো না! এই লাহোর দুর্গের মধ্যে একটি প্রশস্ত হল্ আছে, তার নাম খিলাৎখানা; রণজিৎ সিংয়ের আমলে এখানে কাছারি বসতো। শিখের হাতে শীষমহলের যথেষ্ট দুর্দ্দশা হয়েছে।

সোনেরা মসজিদ—এটি তৈরী করান ভিখারী খাঁ, ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে। লাহোরের শাসন-কর্ত্তা মীর মন্নুর বিধবা পত্নীর প্রিয়-পাত্র ছিলেন এই ভিখারী খাঁ। মীর মন্নুর মেজাজ ছিল ভারী উগ্র। প্রভুত্বের গর্ব্বে তিনি সর্ব্বদা মশগুল থাকতেন। মীর মন্নু একবার পত্নীর কাছে কি অপরাধ করেন—পত্নীর তা অসহ্য বোধ হওয়ায় তাঁর হুকুমে বাঁদীরা মীর মন্নুকে প্রহার করে মেরে ফেলে। মীর মন্নুর মৃত্যুর পর তাঁর এই বিধবা পত্নী লাহোর শাসন করেন।

লাহোর দুর্গ আর হুজুরী-বাগের কাছে লাহোরের প্রসিদ্ধ বাদশাহী মসজিদ; লালরঙের বেলে পাথরে তৈরী, মাথায় প্রকাণ্ড গম্বুজ। এ মসজিদ বাদশাহ ঔরংজীব ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে তৈরী করান। মহারাজ রণজিৎ সিং এ মসজিদটিকে বারুদখানা-রূপে ব্যবহার করতেন।

এ-সব দেখে আমরা আনারকলিতে এলুম। আনার-কলি প্রকাণ্ড মহল্লা।—এক তরুণী বাঁদী আকবরের মহালে ছিলেন, তাঁর রূপের জ্যোৎস্নায় শাহজাদা সেলিম অভিভূত হন। তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে আকবর স্নেহ-ভরে তাঁর নাম দেন আনারকলি। এই আনারকলি আর সেলিম, দুজনের মধ্যে গভীর প্রণয়-সঞ্চার হয়। সে প্রণয়-কাহিনী যেমন মধুর, তেমনি করুণ! আনার-কলির অপর নাম নাদিরা বেগম বা সরিফ-উন্নিসা। দিল্লীর ভবিষ্যৎ সম্রাট এক বাঁদীর পাণিগ্রহণ করবেন, বাদশা আকবরের তা সহ্য হলো না। বাদশার হুকুমে শাহ-জাদাকে ভালোবাসার স্পর্দ্ধা-হেতু বেচারী আনারকলিকে জীবন্ত কবর দেওয়া হয়! আনারকলির উদ্যানে আনার-কলির সমাধি আছে। সমাধির গায়ে ছোট্ট একটি ছত্র ক্ষোদা আছে—'মজনুন্ সেলিম্-ই-অকবর' অর্থাৎ আকবরের পুত্র প্রণয়-মুগ্ধ সেলিম! তা ছাড়া দুটি পারশী হরফে কবিতার ছত্র লেখা আছে। তার অর্থ, 'প্রিয়ার ঐ মুখখানি যদি একবার দেখতে পেতুম, তা হলে

জীবনের শেষক্ষণটুকু অবধি খোদার পায়ে প্রাণের ধন্যবাদ জানাতুম !'

এই আনারকলির বাগানের কাছে আনারকলি মিউ-জিয়ম। ভারতে এত বড় মিউজিয়ম আর নেই। এখানে সেকালের বহু অমূল্য মণিমাণিক্য-অলঙ্কার সংরক্ষিত আছে। তা ছাড়া শিখ-গুরু গোবিন্দ সিংয়ের পিতলের কামান এবং আরো বহু প্রাচীন বসন-ভূষণ, অস্ত্রশস্ত্র এখানে সংরক্ষিত আছে। মিউজিয়মের সামনে পঞ্জাব য়ুনিভার্শিটি-গৃহ ও লাইব্রেরী। লাইব্রেরীর সামনে বিখ্যাত "জমজমা গ্যন্" ( gun ) বা 'ভুঙ্গীওয়ালী তোপ'।

এই কামানের একটু ইতিহাস আছে। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে আহমদ শাহ দুরানি এই কামান নিয়ে ভারত-আক্রমণে আসেন। পাণিপথ যুদ্ধে তিনি এই কামান ব্যবহার করে-ছিলেন ; তার পর লাহোরে এ কামান তিনি পরিত্যাগ করে যান। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ সিং এ কামান দখল করেন। তাঁর মৃত্যুর পর এই কামান অমৃতসরের ভুঙ্গীদের হাতে যায়। তা থেকেই এর নাম হয় ভুঙ্গীওয়ালা-তোপ! এ তোপের সম্বন্ধে কিম্বদন্তী আছে, যে-জাতি এই কামানের অধিকারী হবে, সেই জাতিই এই কামান-অধিকৃত ভূখণ্ডের মালিক হবে।

এই মহালে আনারকলির মস্ত বাজার। বাজারের পূবদিকে নীল-গম্বুজ,—হুমায়ুনের আমলে সাধু ফকির আবদুল রাজ্জাকের সমাধি-মন্দির। বাজারে ঢুকে আমরা তরী-তরকারী কিনলুম—আঙুর, কমলা-লেবু, আপেল—এ-সবও সংগ্রহ করা হলো। দাম খুব শস্তা। আনারকলি ঘুরে আমরা পেট্রোল সংগ্রহ করলুম। ১৩ টীন পেট্রোল আর দু'টীন মোবিল অয়েল নেওয়া হলো। তার পর লাহোরের ম্যল্ ধরে একচক্র ঘোরা হলো।

এখানকার লরেন্স গার্ডেন্‌স্ দেখবার মত। এর উত্তরে গবর্ণমেণ্ট হাউস। গভর্ণমেণ্ট হাউসটি সমাধিক্ষেত্রের উপর নির্ম্মিত। সামনে মহম্মদ কাশেম খাঁর সমাধি-মন্দির—নাম কুস্তিওয়ালা গম্বুজ। কাশেম খাঁ ছিলেন বাদশাহ আকবরের জ্ঞাতি-ভ্রাতা। ইনি সে-আমলের প্রসিদ্ধ কুস্তিগীর পালোয়ান ছিলেন। লাহোরের এচিশনস্ চীফ কলেজ এই ম্যলের ধারে। ম্যল্ ঘুরে অচিরে রাবী নদীর পুল পার হলুম। রাবীর পৌরাণিক নাম ইরাবতী। রাবীর তীব্র স্রোতের বেগে লাহোর একবার বিপর্য্যস্ত হয়ে যায়, তাই ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে বাঁধ বেঁধে দেওয়া হয়। সেই বাঁধ ছুঁয়ে রাবী এখন লাহোরের গা ঘেঁসে বয়ে চলেছে।

অচিরে চোখের সামনে ফুটে উঠলো বড় বড় গম্বুজ! বুঝলুম,ঐ শাহ-দারা,—বাদশাহ জাহাঙ্গীর ও বিশ্ব-রূপসী নুরজাহানের সমাধি-মন্দির। রৌদ্র তখন বেশ তপ্ত হয়ে উঠেচে। পঞ্জাবী রৌদ্র! তার উপর পথে কি ধুলা! ক্রমে সমাধি-ভবনের সামনে এসে পৌঁছুলুম। পথের ডাহিনে মস্ত তোরণ—এ সমাধি-মন্দির আগ্রার ইৎমদ-উদ্দৌলার ছাঁচে গড়া!

গ্রামের নাম হয়েচে শাহ-দারা! শাহ-দারার অর্থ আনন্দ-উদ্যান। রাবীর ওপারে লাহোর, আর এ-পারে লাহোর থেকে পাঁচ মাইল দূরে শাহ-দারা। মস্ত বাগান—নানা ফল-ফুলের গাছ, ফুলের গাছে নানা রঙের ফুল ফুটে যেন রামধনুর বিচিত্র বাহার খুলে দেছে! বাগানটি তৈরী করান নুরজাহান বেগম, তৈরী করিয়ে প্রিয়তম স্বামী বাদশাহকে সেটি উপহার দেন। বাগানের অপর নাম দিলখুশা বাগ। এই দিলখুশা বাগে জাহাঙ্গীর বাদশার সমাধি। তাঁর সাধ ছিল, দেহান্তে তাঁকে যেন কাশ্মীরের ভেরী-নাগে সমাহিত করা হয়। কিন্তু এ তো গরীব গৃহস্থের অন্তিম ইচ্ছা বা অনুরোধ নয় যে, পুত্র-পরিজন সর্ব্বাগ্রে তা পালন করবে। এ বাদশার ইচ্ছা, বাদশার সাধ। এ মেটানোর আগে কায়দা-কানুন, ইজ্জৎ-মান এ-সব দেখা চাই!

এই রঙীন ফুলের রাশ, লহরের রাশ, ফোয়ারার রাশ—এ সবের মাঝে মন কেমন স্বপ্নাতুর হয়ে উঠ্‌লো। দিলখুশা বাগ—এইখানেই জাহাঙ্গীর-নুরজাহানের প্রণয়ের শত লীলা উৎসারিত হয়েছিল একদিন! কত মান, কত অভিমান, অনুরাগের কত কাকলী এর চারিদিকে পুঞ্জিত রয়েচে! প্রিয়তমার ছোট একটু মানের কিম্মৎ রাখতে গিয়ে বাদশা হয়তো কত বড় বড় যুদ্ধের আয়োজন করেচেন,—যে-যুদ্ধে কত রাজ্য, কত গৃহ, কত বুক হয়তো শ্মশান হয়ে গেছে!

এরি কাছাকাছি নুরজাহানের সমাধি। এ সমাধি-গৃহের অবস্থা জীর্ণ। সমাধি-বক্ষে ফারসী হরফে লেখা আছে—

বর্ মজারে মা গরিবাঁ নেই চেরাওয়ে নেই গুলেস্ত!
নেই পরে পরওয়ানা সাজৎ নেই সদাএ বুলবুলেস্ত।

এর অর্থ—

অতি-দীনা এই আমার সমাধি' পরে
জ্বলে নাকো দীপ, ফোটে নাকো কোনো ফুল।
হায়,অতি-ছোট পতঙ্গ মেলি পাখা
ওড়ে নাকো হেথা, গাহে নাকো বুলবুল।

বেগম নুরজাহান! অলৌকিক রূপের অধীশ্বরী, প্রতাপ-শালিনী, সমগ্র ভারতের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রী নুরজাহান···এই তাঁর শেষ শয্যা! একদিন সমস্ত ভারতবর্ষ যাঁর অঙ্গুলির ইঙ্গিতে কম্পিত বুকে চেয়ে থাকতো!···সেই চিরপুরাতন বাণী মনে পড়লো,—

মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্!

নুরজাহানের ফুলের সখ, বাগানের সখ ছিল প্রচুর। তা ছাড়া তাঁর একটা নূতন পরিচয় পেলুম, যা

ছেলে-বেলায় ইতিহাস পড়ে পাইনি, কলকাতার ষ্টেজে বাংলা নাটক দেখে পাইনি! সে পরিচয়—তিনি একজন অদ্বিতীয় ঘোড়-সওয়ার ছিলেন।

লাহোরে ওয়াজীর খাঁর এক মসজিদ আছে। এর নকাশী-কাজের তুলনা নেই। তা ছাড়া শাহ-আলমের উদ্যান—আজো বর্ণে-গন্ধে সুষমায় অনুপম বেশে দাঁড়িয়ে আছে।

শাহ-দারা ছেড়ে আমরা রেলওয়ে-লাইন পার হয়ে সেই রৌদ্র-তপ্ত আকাশের তলে ধূলি-জর্জ্জর পথে সবেগে গাড়ী চালিয়ে দিলুম। খানিকটা পথ কোনো বৈচিত্র্য পেলুম না। দুধারে প্রশস্ত প্রান্তর, রৌদ্রের তেজে তার মাটী ফেটে চৌচির হয়ে রয়েছে! তারি মাঝে মাঝে দু'চারটে গাছের আড়ালে Persian wheel কুয়া আর পথে এমন ধূলা উড়চে যে, সামনে কিছু দেখা যাচ্ছে না!

রৌদ্রের তেজ ক্রমে বাড়তে লাগলো। গাড়ীর হুড, সাইড-স্ক্রীন্ দস্তরমত আঁটা থাকলেও রৌদ্রের সে তেজে ঝল্‌শে ওঠবার জো! জ্বলন্ত গন্‌গনে আগুন থেকে যেমন হল্কা ওঠে, দুধারে প্রান্তরের গা বয়ে তেমনি যেন একটা গন্‌গনে হল্কা উঠচে। লাহোর থেকে ২৪ মাইল পরে সাধোকি, ৩০ মাইলে ধীলানওয়ালা পার হলুম; ৪২ মাইলে পেলুম গুজরানওয়ালা। এই গুজরানওয়ালা হলো মহারাজা রণজিৎ সিংয়ের জন্মভূমি। তাঁর পিতা মোহন সিংয়ের সমাধি এখানে আছে। বাবা নানকের শৈশবের বাসভূমি নানকানা-সাহেবও এই গুজরানওয়ালার অতি সন্নিকটে। মোহন সিংয়ের সমাধি-মন্দির খুব উঁচু, মাথায় সোনালি কাজ-করা গম্বুজ। বাজারের কাছে সেই গৃহ দেখলুম—যে-গৃহে রণজিৎ সিংয়ের জন্ম হয়। এখনও আছে।

গুজরানওয়ালায় কমলা লেবুর অসংখ্য বাগান। এখানকার লেবু যেমন মিষ্ট, দর তেমনি শস্তা। গুজরানওয়ালায় লোহার সিন্দুকের বিস্তর কারখানা দেখলুম—সে সব সিন্দুকের বেশ খ্যাতি আছে। দেশ-বিদেশে এই সব সিন্দুক প্রচুর পরিমাণে চালান যায়। তা ছাড়া ক'বছর পূর্ব্বে এই গুজরানওয়ালায় যে অসন্তোষের স্ফুলিঙ্গ ফোটে, তাই প্রচণ্ড তেজে জ্বলে উঠে জালিয়ানওয়ালা-বাগের মর্ম্মান্তিক ট্রাজেডিতে পরিণত হয়! তার ফলে পুরানো রেলওয়ে ষ্টেশনটি ধ্বংস পায়, এখন নতুন রেলওয়ে ষ্টেশন তৈরী হয়েছে। গুজরানওয়ালার ডাক্‌বাংলা বেশ প্রশস্ত। আমরা ভেবেছিলুম, এখানে রান্নাবান্না স্নানাহার সেরে নেবো—কিন্তু ডাকবাংলো ভরতি ছিল। কাজেই সেই ধু-ধু রৌদ্রে প্রচণ্ড ধূলা খেতে খেতে এগিয়ে যেতে হলো। ৫৩ মাইলে পেলুম ঘক্কর। এখানকার ডাকবাংলাটি ছোট,—তাতেও লোক রয়েছে। থামা হলো না। আরো এগিয়ে এসে লাহোর থেকে ৬২ মাইল দূরে পেলুম ওয়াজিরাবাদ। এখানেও দেখি ডাকবাংলা ভর্ত্তি।

বাদশা শাহ জাহানের রাজত্বের সময় ওয়াজির খাঁ এই নগরের পত্তন করেন। এখানে দুটি পুল পার হলুম। দুটিই চেনাবের পুল। চেনাবের পৌরাণিক নাম চন্দ্রভাগা। একটি পুলের নাম বল্‌কার ব্রিজ, অপরটির নাম চেনাব ব্রিজ। এ পুলদুটি হালে তৈরী হয়েছে। আগে ফেরির সাহায্যে এ নদী পার হতে হতো—নয় ট্রাকের বন্দোবস্ত করতে হতো। পুল হবার পর থেকে পথ খুব সুগম হয়েচে। এই ওয়াজিরাবাদ হলো জংশন ষ্টেশন। এখান থেকে এক স্বতন্ত্র রেলোয়ে-লাইন শিয়ালকোট হয়ে কাশ্মীর রাজ্যের রাজধানী জম্মুতে গেছে। ওয়াজিরাবাদ থেকে মোটরে চড়েও জম্মু যাওয়া যায়। কিন্তু সে পথ সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিত হদিশ পাইনি। তা ছাড়া আমাদের লক্ষ্য ছিল, শ্রীনগর—কাজেই এ-পথে কাশ্মীর-প্রবেশের অভিপ্রায় আমাদের ছিল না।

শিয়ালকোট ছিল শল্য রাজার রাজধানী। শিয়ালকোটের ক্রিকেট-ব্যাট, বল প্রভৃতি বিখ্যাত। ওয়াজিরাবাদের ডাক-বাংলায় আমাদের স্থান হলো না। এখানে পথে এক জায়গায় একটু ছায়া পেতে গাড়ী থামালুম। সেই সুযোগে এঞ্জিনে জল নেওয়া হলো। নিকটেই একটি Persian wheel কুয়া; গৃহস্থেরা জল তুলছিল। তাদের অনুমতি নিয়ে জল আনানো হলো। তৃষ্ণায় সব ছাতি ফেটে যাচ্ছিল। জল পান করে আবার রওনা হলুম। ওয়াজিরাবাদে এখন অস্ত্র-শস্ত্র তৈরী হয়।

পথের যেন আর শেষ নাই! এখন একটু বিশ্রাম পেলে বর্ত্তে যাই, এমন অবস্থা! অদৃশ্যান্তরাল-বাসিনী ভাগ্য-লক্ষ্মীর উদ্দেশে প্রাণের মধ্য থেকে আকুল নিবেদন ফুটে উঠেছিল—রবীন্দ্রনাথের সেই অমর ছত্রও—আর কত দূর নিবে যাবে মোরে হে সুন্দরী! সুন্দরীর মৌনতা ভাঙ্‌লো না! কাজেই আমরা নিরুদ্দেশ-যাত্রায় আরো অগ্রসর হয়ে চললুম।

ওয়াজিরাবাদ থেকে আরো ৩৮ মাইল এসে পেলুম গুজরাট। দূর থেকে পথের ডানদিকে দুর্গের মত এক সৌধ দেখা যাচ্ছিল।—তার আশে-পাশে বসতির চিহ্ন··· পাকা ঘর-বাড়ী। গুজরাটের সমৃদ্ধির পরিচয় সে ঘর-বাড়ীর আষ্টে-পৃষ্ঠে লেখা রয়েচে। এই গুজরাট ছিল পুরু রাজার রাজধানী। সেকন্দর শাহ পুরুরাজকে হারিয়েছিলেন, পরে চন্দ্রগুপ্ত গুর্জ্জর অধিকার করেন। বর্ত্তমান গুজরাট সেই প্রাচীন নগরের ধ্বংস-স্তূপের উপর তৈরী হয়েচে। বর্ত্তমান গুজরাট গড়ে তোলেন শের শাহ ও বাদশাহ আকবর। যে দুর্গটি এখনো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে

আছে, সেটি আকবরের তৈরী। তিনি এই গুজরাটের নাম দিয়েছিলেন, আকবরাবাদ। কিন্তু সে নাম টেঁকলো না—গুজরাট নামই বাহাল রয়ে গেছে। পরে শাহ জাহানের আমলে পীর শাহ দৌলা নামে এক মুসলমান ফকির গুজরাটে বেশ খাতির জমিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর উদ্যোগে গুজরাট সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এই গুজরাটের কাছে দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধ হয়—সে যুদ্ধে পঞ্জাবের ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়! পীর শাহ দৌলার আমলের এক প্রকাণ্ড গভীর কূয়া, আর বাদশাহী হামাম এখানে দেখবার জিনিষ।

এখানকার ডাক-বাংলাতেও ভিড় দেখে আমাদের নামা হলো না। আরো ক মাইল এগিয়ে মস্ত এক সহর পেলুম। সহরের নাম শুনলুম, লালা মুশা। পথের ধারে জোয়ান পাঠানের দল। ষ্টেশনের কাছে মস্ত বাজার। সেখানে খুব বেচাকেনা চলেছে—বিক্রেতা-ক্রেতা দু'দলই পাঠান। তাদের কাছে ডাকবাংলার পাত্তা চাইতে তারা যে-ভাষায় জবাব দিলে, তার বিন্দু-বিসর্গ বুঝলুম না। তবে কোনো রকমে ইঙ্গিত বুঝে পথের ডান দিকে এক মাঠের মধ্য দিয়ে গাড়ী চালিয়ে গিয়ে ডাকবাংলায় উঠলুম।

লালা মুশা মস্ত জংসন। এখান থেকে রেলোয়ে-লাইন সোজা গেছে রাওয়ালপিণ্ডি হয়ে পেশোয়ার। তা ছাড়া বাঁয়ে আর একটা দীর্ঘ লাইন গেছে, চিলিয়ানওয়ালা হয়ে ডেরা ইশমাইল খাঁ, ডেরা গাজি খাঁ। আশে-পাশে প্রাচীন কালের বিস্তর ধ্বংস-স্তূপ দেখলুম। হিন্দু রাজা ছিলেন তেল ও বিল। এগুলি তাঁদের আমলের। এ রাজাদের নাম কখনো শুনিনি—তবে হিন্দু রাজা শুনে প্রাণটা আনন্দে ভরে উঠলো। বাংলার ঐতিহাসিক মশায়রা এঁদের একটু পরিচয় সংগ্রহ করে দিন্ না! সে পরিচয় আর কোনো কাজে না লাগুক, আমাদের বাংলা নাট্যকারের দল বাংলার রঙ্গালয়ে তাঁদের খাড়া করে দিতে পারবেন তো!—ডালিম সিং আর বিক্রম সিং দেখে দেখে চোখ আর মন যে শ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

লালা মুশার ডাক-বাংলায় বন্দোবস্ত ভালো—টানা-পাখা, চেয়ার, টেবিল্, খাট, বাথরুম—সব আছে। তবে ভালো জলের অভাব! য-ভায়া মোটর নিয়ে রেলোয়ে ষ্টেশনে গেলেন জলের জন্য। আমরা কাছের Persian wheel থেকে জল আনিয়ে স্নান সেরে নিলুম। লাহোরের বাজার থেকে যে তরী-তরকারী সংগ্রহ করা হয়েছিল, তা নিয়ে মহিলারা ষ্টোভ জ্বেলে রান্না চড়িয়ে দিলেন। আহারাদি শেষ হতে পৌনে চারটে বাজলো। বাসন-কোসন মাজানো হলে আবার জিনিষ-পত্র গাড়ীতে তুলে রওনা হলুম। আধ ঘণ্টার মধ্যে ঝিলাম ষ্টেশনে এসে পৌছুলুম।

ঝিলাম নদীর পুল পার হয়েই রেলোয়ে ষ্টেশন। ঝিলামের পৌরাণিক নাম বিতস্তা। প্রকাণ্ড নদী। নদীর বুকে বিস্তর মোটা মোটা গাছের গুঁড়ি ভাসচে। ষ্টেশনের চতুর্দ্দিকে বড় বড় কাঠের গোলা। শুনলুম, এই সব কাঠ কাশ্মীর থেকে নদীর স্রোতে ভেসে আসচে। কাঠের ব্যবসায়ীরা যেখানে ঐ সব কাঠ কাটিয়ে নম্বর মেরে চিহ্নিত করে নদীর জলে ভাসিয়ে দেয়, আর এখানে তাদের লোকজন কাঠের নম্বর দেখে গোলায় তোলে। রেলোয়ে ষ্টেশনে ঢুকে বরফ আর কলের জল পেলুম—পান করে আরাম হলো।

রেলোয়ে ষ্টেশনের কাছে বহুপ্রাচীন স্তম্ভের ধ্বংস-স্তূপ পড়ে আছে। এগুলি বৌদ্ধ যুগের। এখান থেকে বহু শিলা-স্তূপ তুলে লাহোর মিউজিয়মে রাখা হয়েছে। রেলোয়ে-এঞ্জিনিয়ারের কম্পাউণ্ডে এখনো একটি শিলাস্তম্ভ পড়ে আছে। সেটি শুনলুম, গ্রীক সম্রাট সেকন্দর শার আমলের। ঝিলাম ষ্টেশনের কাছে একটি ছোট ঝরণা দেখলুম—ঝরণাটির নাম কতস্। সতী-হারা শিবের শোকাশ্রু থেকে না কি কতসের উৎপত্তি! কতস্ আর পুষ্কর,—দুটিরই সৃষ্টি সতী হারা শিবের চোখের জলে। কতস্ হিন্দুর তীর্থ!

ঝিলাম ছাড়িয়ে পাঁচ ছ' মাইল এগুতে পার্ব্বত্য পথে প্রবেশ করলুম। দুধারে উঁচু পাহাড়, মাঝে পথ। পাহাড়ের গা কি রুক্ষ—তৃণগুল্মের চিহ্নমাত্র নেই! পথও আঁকা-বাঁকা! কোথাও পথের ধারে পাহাড়ের গা ঘেঁষে প্রকাণ্ড গহ্বর—যেন দুনিয়াটাকেই গিলে খেতে পারে! ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! বিজন পথে পেশোয়ারী পথিকের দল কেউ পায়ে হেঁটে চলেছে—কেউ বা ঘোড়ার পিঠে। সকলেই সশস্ত্র। পাঁচ-ছ'হাত লম্বা লাঠি আর টাঙ্গি-গোছ অস্ত্র। কি হিংস্র দৃষ্টি তাদের চোখে! গা ছম্‌ছম্ করতে লাগলো। পাহাড়ের বাঁকে কোথাও বা পেশোয়ারীরা দল বেঁধে আড্ডা জমিয়েচে। দু'পাশে পাহাড়ের মাঝে যে-পথ, সেই পথের বহু ঊর্দ্ধে পাহাড়ের বুকে পেশোয়ারী ছেলে-মেয়েরা খেলা করচে—তাদের সামনে পাথরের রাশ। দুদিকের পাহাড় এমনভাবে দু'পাশে খাড়া উঠেচে যে, হঠাৎ দেখলে মনে হয়, কে যেন ফটক তৈরী করে রেখেছে! ঐ পেশোয়ারী ছেলেমেয়েরা যদি খেলার ছলে খেয়াল-ভরে ক'খানা পাথর আমাদের গাড়ী লক্ষ্য করে ছুড়ে মারে, কিম্বা পাহাড়ের খানিকটা ধ্বসে নীচে গড়িয়ে পড়ে, তা হলেই গেছি! ভাগ্যে তাদের এ খেয়াল হয়নি—তাই এ যাত্রা খুব রক্ষা পেয়েচি!

পাহাড়ের এই ভীম রুদ্র মূর্ত্তি দেখে গা যে ছম্‌ছম্ করেনি, এমন নয়। কে জানে, কোথায় কোন্ দুর্গম গিরিশৃঙ্গে হয়তো বাধা পাবো! দু' একজন পথিককে প্রশ্ন করলুম, রাওয়ালপিণ্ডির পথ ভালো তো? তারা যে

কথার জবাব না দিয়ে বললে,—সিধি সড়কী,···ন ইধির ন উধির। পথের সম্বন্ধে যাকে প্রশ্ন করি, সে-ই ঐ এক জবাব দেয়, সিধি সড়কী! অগত্যা এই সিধি সড়কী ধরে এগিয়ে চললুম। প্রায় বারো মাইল এসে পাহাড়ের গা ভেদ করে একটা দুর্গের মত বস্তু নজরে পড়লো! দুর্গ-ই। ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে শের-শাহ তৈরী করেন—এর নাম আট্‌খট্‌ থাম্বা। দুর্গে আটঘট্টিট টাওয়ার আর বারোটি ফটক আছে। সীমান্ত-প্রদেশের ঘক্কর জাতের লুঠ-তরাজের হাত থেকে রাজ্য-রক্ষার জন্ম এ দুর্গ তৈরী হয়। দুর্গটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল; পরে রাজা মানসিংহ একে আবার দুর্জ্জয় শক্তিতে গড়ে সুসংস্কৃত করে তোলেন।

বেলা ক্রমে পড়ে আসছিল। আঁকা-বাঁকা পাহাড়ের পথে কখনো উঁচুতে উঠি, আবার কখনো ঐ পথ বয়ে নেমে পড়ি। থাকে-থাকে পাহাড় কত দূর জায়গা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সে দৃশ্যে চমৎকারিত্ব যেমন, ভয়ের ছমছমানি তেমনি। এই পাহাড়ের গায়ে এক-তলার পথে আমরা চলেছি, দোতলায় রেলোয়ে লাইন—আবার একটু পরে রেলোয়ে-লাইন এক-তলায়, আমরা দোতলায়! বিস্তর টনেলের মাথা বয়ে টনেল পার হলুম।—ছোট ব্র্যাকেটের মত পাহাড়ের গা বয়ে রেল-লাইন—খেলা ঘরের গাড়ীর মত ট্রেণ চলছে! উঁচু পাহাড়ের বুকে নির্জ্জনতার মাঝে দু'একখানি বাংলা দেখতে ছবির মত। ঝিলাম থেকে ৩১ মাইল পরে সোহাওয়া, এখান থেকে উত্তর-সীমান্তের বিখ্যাত শল্ট রেঞ্জ দেখা যায়। ভয়ঙ্কর রুদ্র সে দৃশ্য!

এখানে এক কাণ্ড ঘটলো।

পাহাড়ের আড়ালে সরে পড়বার আগে সূর্য্য তখন লুকোচুরি সুরু করেচে। ড্রাইভারকে সরিয়ে ভ-ভায়া মোটর চালিয়ে চলেছিলেন। ডিহিরি থেকে তিনিই মোটর চালিয়েছেন; দু-চারবার মাত্র চুপচাপ বসে ছিলেন। লালা মুশা থেকে তিনিই এ পথে চালক। খুব জোরে যাওয়া হচ্ছিল, কারণ, রাত্রি আটটা ন'টা নাগাদ রাওয়ালপিণ্ডি পৌঁছানো চাই। হঠাৎ এই পার্ব্বত্য পথে আমাদের গতি অবরোধ করে দাঁড়ালো দুই ভীম-দর্শন পেশোয়ারী। শুধু আকারে তারা ভীম দর্শন ছিল না, তাদের দুজনের হাতের লাঠি লম্বে প্রায় সাত-আট হাত। ব্যাপার দেখে আমরা একটু সন্ত্রস্ত হলুম। ভ—গাড়ী থামিয়ে ফেললেন। প্রশ্ন করলুম—কেয়া মাংতা? বিশুদ্ধ পেশোয়ারীতে তারা উত্তর যা জানিয়ে দিলে, তার অর্থ—তারা দু'জনে বিশ মাইল দূরে যেতে চায়—আমাদের গাড়ীতে আমরা তাদের উঠিয়ে নেবো, তারা এই চায়। গাড়ী তখন প্রায় থামো-থামো দেখে তারা পথ থেকে একপাশে দাঁড়িয়েছে। ভ—অমনি তাদের পাশ কাটিয়ে চকিতে গাড়ী ছুটিয়ে দিলে। খানিক গিয়ে ভয় হলো, যদি পিছনের গাড়ীতে লাঠি চালায়! পিছন-পানে তাকিয়ে দেখি, ৯৩৩৭ নম্বর গাড়ীর ড্রাইভারকে ইঙ্গিত করে তারা সে-গাড়ী থামিয়েছে। আমরা হর্ণ দিয়ে তখনি সঙ্কেত করলুম, চালাও! ড্রাইভার সে গাড়ী সজোরে চালিয়ে দিতে পেশোয়ারী দুজন গাড়ীর পিছনে লাঠি তুলে একটু আক্রমণোদ্যত ভাবে তাড়া করলো; কিন্তু মোটরের সঙ্গে ছুটে পারবে কেন! দুখানি গাড়ী তখন তীরবেগে ছুটিয়ে দেওয়া হয়েচে। বহুদূর এসে গাড়ী থামিয়ে ড্রাইভারকে প্রশ্ন করলুম—ওরা কি বলছিল? সে জবাব দিলে,—ওরা বলছিল, দশঠো রুপেয়া দেও, সাব্‌, লোক বোলা হ্যায়। সর্ব্বনাশ! রুপেয়া! পেশোয়ারী দুটো ভারী ওস্তাদ তো!

রৌদ্র ক্রমে চট্‌ করে মিলিয়ে গেল এবং সন্ধ্যার নিবিড় ছায়া সেই দুর্গম পথকে আরো ভীষণ-মূর্ত্তিতে ভরিয়ে তুললো! লাইট জ্বালিয়ে এসে পাহাড় ছাড়িয়ে সমতল-ভূমি পেলুম। পথের দুধারে লোকের বসতি, পথে লোকজন অনেক; কিন্তু পেশোয়ারী মুসলমানই সব। ডান্‌দিকে রেলোয়ে লাইন দেখলুম—এবং ক্রমে রেলোয়ে ষ্টেশন নজরে পড়লো।

প্রশ্ন করে জানলুম, এ জায়গার নাম গুজর খাঁ। এখানে ভালো ডাকবাংলা আছে, খাবার-দাবার ভালো না মিললেও ফল, ছাগ-মাংস আর দুধ মেলে প্রচুর। এখান থেকে রাওয়ালপিণ্ডি, শুনলুম, প্রায় ৩০ মাইল।

তখন সমস্যা হলো—কি করা যায়? সামনে অন্ধকার রাত্রি, কে জানে, আবার অমনি দুর্গম পার্ব্বত্য পথ যদি মেলে! এধারে ডাকাতির ভয় আছে, শুনেছিলুম। এগুবো, না, এইখানে আস্তানা পাতবো? গুজর খাঁর দু'চার জন লোক বললে, পথ খুব ভালো। তখন স্থির হলো, এই নির্জ্জন স্থানে ডাকবাংলায় না থেকে রাওয়াল-পিণ্ডিতেই যাওয়া যাক।—এগুলুম। প্রায় চার-পাঁচ মাইল এসে পিছনে চেয়ে দেখি, ৯৩৩৭ নং গাড়ীর চিহ্ন নেই! পথের দু'ধারে ধু-ধু মাঠ! বন্দুক-রিভলভার সঙ্গে ছিল, সেগুলো উদ্যত রেখে পিছনের গাড়ীর জন্ম প্রতীক্ষা করতে লাগলুম। প্রায় বিশ-পঁচিশ মিনিট কেটে গেল।—তবু সে গাড়ীর দেখা নেই! ভাবনা হলো। অগত্যা ফিরে গুজর খাঁ রেলষ্টেশনের কাছাকাছি এসে দেখি, ৯৩৩৭ নং গাড়ীর টায়ার ফেটেচে! অন্য টায়ার পরানো হলো। সকলে স্থির করলুম, রাত্রে নির্জ্জন পথে আবার যদি এমনি দুর্য্যোগ ঘটে! অজানা ভূঁই। এগিয়ে কাজ নেই। তার চেয়ে গুজর খাঁর ডাক-বাংলাতেই রাত্রিটা কাটিয়ে দেওয়া যাক্‌!

তাই হলো। ডাকবাংলায় এলুম। রাত তখন আটটা। লোকজন স্নানের জল তুলে দিলে। স্নান সেরে

আমরা কিছু আহার না করেই বন্দুক খাড়া রেখে সজাগ হয়ে রাত্রি কাটালুম।

পরদিন ভোর হলে গুজর খাঁ ত্যাগ করলুম। পথ ভালো; তবে খানিক এসে ধনুকের মত নুয়ে পড়েচে। একদিক্‌কার উঁচু সীমানায় গাড়ী এলে দেখি, দূরে এক নগরের চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে উঠেচে—পেট্রোলের ট্যাঙ্ক, জলের প্রকাণ্ড ট্যাঙ্ক, অসংখ্য চিমনি, বাড়ী, ঘর···ছবির মত যেন আকাশের গায়ে আঁকা! বুঝলুম, ঐ রাওয়াল-পিণ্ডি! পথের মাইল-ষ্টোন্ থেকে বুঝলুম, সহর এখনো ২০।২৫ মাইল দূরে! আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলুম—পথের প্রায় প্রান্ত-সীমায় এসে পৌঁছে গেছি!···

১৩ই সেপ্টেম্বর বেলা ঠিক সাতটায় রাওয়ালপিণ্ডিতে প্রবেশ করলুম। রাওয়ালপিণ্ডি মস্ত ক্যাণ্টনমেণ্ট। পথ ঘাট দিব্যি তক্‌তক্ ঝক্‌ঝক্ করচে—পথের দুধারে কেয়ারি-করা ফুলের গাছ। নানা রঙের শীজন্ ফ্লাওয়ারে গাছগুলি আলো হয়ে রয়েছে। বড় বড় দোকান। এক ধারে মাঠে কিং কার্নিভালের মস্ত তাঁবু পড়েচে। নানা রঙের নিশান টাঙানো। আমরা সোজা এলুম একেবারে রেলোয়ে-ষ্টেশনে। আগে থেকে এখানকার এন্ ডি, রাধাকিষণ কোম্পানির কাছে পরিচয়-পত্র পাঠানো হয়েছিল। এঁরা হলেন নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলোয়ের outer agents—কাশ্মীরের মাল-পত্র এঁরাই বহন করবার অধিকারী; পোষ্টাল পার্শ্বেল ছাড়া যত কিছু রেলোয়ে পার্শ্বেল এঁরাই বহন করেন! রেলোয়ে-ষ্টেশনে এসে এঁদের অফিসে গিয়ে পরিচয় দেবামাত্র হেড্ অফিস থেকে এক কর্ম্মচারী এলেন। তিনি সাদরে আমাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন। ছেলেরা পূর্ব্বদিন এসে পৌঁচেছে, শুনলুম।

অচিরে তাঁদের guest-houseএ গিয়ে উঠলুম। পোষ্ট অফিসের কাছে বড় রাস্তার উপর মস্ত দোতলা বাড়ী, চমৎকার সজ্জিত। আমাদের যে তাঁরা গোটা বাড়ীটা ছেড়ে দিলেন, তা নয়, ভৃত্য-পরিজন দিলেন, আর খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত যা করে দিলেন, একেবারে রাজার যোগ্য।

# গার্হস্থ্য উপন্যাসের আদর্শ

[ নক্সা ]

একখানি গার্হস্থ্য উপন্যাস লিখিয়াছি! সাহিত্য-সেবা হোক না হোক, দু পয়সা যাহাতে হাতে আসে, প্রধান লক্ষ্য অবশ্য সেইদিকে। ভয় হয়, sex-তত্ত্বের যে মরশুম চলিয়াছে, তাহাতে গার্হস্থ্য উপন্যাস কাটিবে কি? অথচ sex-এর তথ্য লইয়া উপন্যাস আর গল্প—তাও একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে। তাও লিখিতে পারি। সে উপন্যাসের জন্য বাঁধা Formula আছে। অবশ্য recipeতে একটু একটু বৈচিত্র্য চাই। সে বৈচিত্র্যের সংবাদ রাখি। সেই তো—

১। (ক) পাশের বাড়ীর জানলা;

(খ) সে-জানলায় নেটের পর্দ্দা;

(গ) পর্দ্দার আড়ালে হারমোনিয়ম বাজে, গানের সুর জাগে; আর জাগে চুড়ির রিনি-ঝিনি, অধরের হাসি;

(ঘ) আরো জাগে পর্দ্দার ফাঁকে দুটি কালো আঁখি-তারা;

(ঙ) এদিককার ঘরে চেয়ার ও টেবিল, চেয়ারে বসিয়া তরুণ; টেবিলে বি-এর টেক্সট্ বই—শেলি, কীটস্ প্রভৃতি;

(চ) ও-বাড়ীর গানের সুরে তরুণের মন উদাস! খাতা টানিয়া সে কবিতা লেখে, লিখিয়া জানালায় আসিয়া দাঁড়ায়;

(ছ) শ্রাবণের আকাশ মেঘে ভরে—এদিকে দীর্ঘ নিশ্বাস ঝড়ের মত মাতন তোলে।

২। (ক) স্বামী-স্ত্রী এবং এক তরুণ বন্ধু...

(খ) স্বামী গেল পশ্চিম; নয়তো অফিসের কাজে সে ব্যস্ত। তরুণ বন্ধু গান গায়, কবিতা লেখে। বন্ধু-পত্নী একাকিনী; সে গানে তার প্রাণ নিশ্বাসে ফুলিতে থাকে;

(গ) তরুণ আসিয়া ডাকে,—বন্ধু! বান্ধবীর চোখে জল! বন্ধু বলে, ওঃ! তার কথা বাধিয়া যায়; দীর্ঘশ্বাসে বুক কাঁপিয়া ওঠে...

৩। (ক) বেপরোয়া তরুণ। লেখাপড়া ভালো লাগে না, ডোমপাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ায়—মাথায় দীর্ঘ চুল, গায়ে বোতাম-ছেঁড়া পাঞ্জাবি; পায়ে স্যাণ্ডাল, উস্কখুস্ক মূর্ত্তি;

(খ) ডোমেদের মেয়ে টুকনি ছড়ারবাঁশের তৈয়ারী বেতের চুবড়ী লইয়া কাঁদে—খরিদ্দার নাই;

(গ) তরুণের প্রাণ দরদে গলে, পকেটে ষষা দুয়ানিটি শুধু সম্বল—টুকনির হাতে দিয়া বলে,—এই নে কাঁদিস নে...তোর কি এ বয়সে কাঁদিবার কথা! দুয়ানিটি ছাড়া আর আমার আছে এই জীবন, যৌবন;

টুকনি ছলছল চোখে চায়...তার পা টলে! বুঝি বা পড়িয়া যাইবে! তরুণ তাকে ধরিয়া বুকে লয়...

এ মশলা লইয়া উপন্যাসের পাক্ যে-রেটে চলিয়াছে, তাহাতে পাঠক-পাঠিকার অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য হইতে দেরী নাই। চোঁয়া ঢেঁকুরের গন্ধ ইতিমধ্যে উঠিতেছে! মুখ-বদল চাই।... অতিরিক্ত পোলাও-কালিয়ার পর লোকে খোঁজে লিমন স্কোয়াশ, নয়তো জোয়ানের আরক, নয় সোডা, নয় আগ্নেয়ভস্ম! পোলাও-কালিয়া খাইতে সুস্বাদু, জানি। কিন্তু বেশী খাইলে বিপদ—কাজেই মানুষ তখন আগ্নেয়ভস্ম বা সোডা খোঁজে। তাই সময় থাকিতে আমি গার্হস্থ্য উপন্যাস ফাঁদিয়া বসিতেছি। ঠিক সময়টিতে জোগান দিতে পারিব—পারিলে দু'পয়সার সংস্থান কোন্ না হইবে!

প্রথমেই যা কিছু চিন্তা উপন্যাসের নাম লইয়া। "সংসার," "জীবন," "বাঙালী," গৃহস্থ"—এমনি একটা নাম কেমন হয়? তবে নাম-করণের ভার প্রকাশকের হাতে দেওয়া ভালো। যেহেতু উপন্যাসের এমন নাম তিনি চান, যাহাতে সে উপন্যাস নামের জোরে শুভবিবাহে নববধূর হাতে উপহার দেওয়ার উদ্দেশ্যে লোকে কেনে! তাঁরা বলেন, (শুনিয়াছি। প্রত্যক্ষ-প্রমাণ অভিজ্ঞতার অভাবে দিতে পারি না) উপন্যাস যা-কিছু বিক্রয় হয়, তা ঐ পঞ্জিকার শুভবিবাহের লগ্নগুলিতে। অতএব নাম লইয়া মাথা ঘামাইয়া মরি কেন? প্রকাশক যা-খুশী নাম দিতে পারেন,—গায়ে হলুদ, দুধে আলতা, ফুলশয্যা, যৌতুক, আশীর্ব্বাদ...অর্থাৎ যা তাঁর খেয়াল!

এবার আর্টের কথা বলি!...বলার উদ্দেশ্য, আপনারা কাগজ বাহির করিতেছেন, পাঁচটা বইয়ের দোকানে সে কাগজ বিক্রয় হয়। পাঁচজন প্রকাশক কোন্ না মাঝে মাঝে আপনাদের কাগজ খুলিয়া টোপ হাতে লেখক-মৎস্যের সন্ধান করেন! যদি আমার এই "উপন্যাসের আদর্শ" দৈবাৎ নজরে পড়ে, তাহা হইলে আমার একটা হিল্লা হইতে পারে!

## প্রথম পরিচ্ছেদ

বাঙালীর সংসার। বড় লোকের নয়, সাধারণ গৃহস্থের। যেহেতু বড় লোকের কথা লইয়া বই লিখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বাতিল হইতেছেন। এ Democratic যুগ।

নায়ক পুঁটিরাম [ বাহারে নাম আমিও দিতে পারি। যথা—ললনলাল, পেলবকুমার, বেতসনাথ, লিলিমোহন, শিহরণচন্দ্র ইত্যাদি। কিন্তু sex-তত্ত্ব-মূলক উপন্যাসে এ-সব নামের আদ্যশ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে; কাজেই আমি আটপৌরে নাম দিতেছি ]—বয়স পঁচিশ বৎসর। গৃহে বিধবা মা, ছোট ভাই, দুটি বোন (বিবাহ হয় নাই)। পুঁটিরাম চাকরী পাইয়াছে—কর্পোরেশনে। (চাকরী পাওয়ার মস্ত ইতিহাস আছে। প্রকাশক যদি চাহেন, সে ইতিহাস শেষের দিকে একটা নূতন পরিচ্ছেদে লিখিয়া দিতে রাজী আছি) মাহিনা একশো টাকা। (নায়ক হইয়াছে বলিয়া পুঁটিরামের মাহিনা আরো কমিবে, এমন বিধি নাই।)

বাড়ী খড়দায় কিংবা সোদপুরে। নিত্য ডেলী প্যাসেঞ্জারি করিয়া চাকরি রাখে। প্রথম মাসে মাহিনা পাইলে পুঁটিরাম সংসারে ব্যয় করিল চল্লিশ টাকা; ষাট টাকা রাখিল সেভিংস ব্যাঙ্কে।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এক বৎসর পরে ব্যাঙ্কে জমিল ৬০ × ১২ = ৭২০ টাকা। মা বলিলেন, "এবার বিয়ে কর্ মানিক।"

মানিক বিবাহ করিল। যৌতুকাদির ব্যাপারে যে টাকা ঘরে আসিল, তাহা হইতে বৌয়ের জন্য একখানি সোনার চিরুণী গড়ানো এবং লোক-জন খাওয়ানো-বাবদ খরচ-পত্র করিয়া বাঁচিল, ৩১৭৷৶১৫।

৷৶১৫ পোষ্টেজ ষ্ট্যাম্প কিনিয়া বাকী ৩১৭ টাকা পুঁটিরাম সেভিংস-ব্যাঙ্কে জমা দিল।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাহিনার টাকা-বাবদ প্রতিমাসে সেভিংস্ ব্যাঙ্কে ৬০ টাকা আর যায় না—কোনো মাসে যায় ৩০; কোনো মাসে যায় ৪০। তত্ত্ব-তাবাসের ব্যয় আছে, তার উপর শনিবারে শ্বশুরবাড়ী যাইবার সময় এসেন্স বা বাংলা কবিতার বই প্রভৃতি পুঁটিরামকে এখন কিনিতে হয়। যাই হোক, পূজার তত্ত্বে জুতার দাম-বাবদ পুঁটিরাম শ্বশুরবাড়ী হইতে বারোটি টাকা নগদ হাতে পাইল। তার জুতার প্রয়োজন ছিল না, কাজেই ও টাকা সেভিংস্ ব্যাঙ্কে গিয়া জমিল।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এক বৎসর পরে বৌ প্রমীলাবালা শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছে। ছোট ননদ-দেওররা আবদার তোলে। কাজেই সে পুঁটিরামকে ধরে—এবং পুঁটিরামকে জলছবি, লজেঞ্জেস্ প্রভৃতির খরচ-বাবদ মাসে তিন টাকা খরচ করিতে হয়।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আরো এক বৎসর পরে। প্রমীলা কন্যা প্রসব করিল। প্রসবের পূর্ব্বে সাধভক্ষণ, পরে আটকড়ায়ে ষষ্ঠীপূজা-বাবদ অনেক ব্যয় হইল। সে মাসে সেভিংস ব্যাঙ্কে টাকা গেল না; বরং সেখানকার সঞ্চয় হইতে ৭৫ টাকা বাহির হইয়া আসিল।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সংসারে খরচ বাড়িয়াছে। বাড়ীর গরু দুধ বন্ধ করিয়াছে; খোকার জন্য হরলিক্স্ কিনিতে হয়। তার পর প্রমীলার শরীর ভালো নয়, ডাক্তারের পরামর্শে ঔষধ-পথ্য চাই। সেভিংস ব্যাঙ্কে টাকা গেল না। মাসের শেষে পুঁটিরামের খরচের খাতায় হিসাব দেখা গেল,—

| | |
|---|---|
| হরলিক্স্-বাবদ ব্যয়— | ১১৷০ |
| দুই শিশি মিকশ্চার— | ১৷০ |
| অয়েল ক্লথ— | ২৷৴০ |
| চুষি— | ।৴০ |
| ফিডিং বোতল— | ১৶০ |
| প্রমীলার জন্য টনিক্— | ৫৷৶০ |
| তিন দফা ডাক্তারের ফী— | ১২৲ |
| | ৩৩৸৶০ |

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

আরো দু বৎসর পরে। দুটি বোন মাথা চাড়া দিয়া বড় হইয়া উঠিয়াছে। তাদের বিবাহ দিতে হইবে। পুঁটিরামের আর একটি মেয়ে হইয়াছে। প্রমীলার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। পুঁটিরামের মেজাজ খারাপ; সেভিংস্-ব্যাঙ্কের খাতা খুলিয়া পুঁটিরাম দেখে, সেখানে সুদে-আসলে পড়িয়া আছে ৩৭৶০।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

দেশে নানা অস্বাচ্ছন্দ্য। পুঁটিরাম কলিকাতায় একখানা তক্তাপোষ ভাড়া লইয়াছে। ব্যয় বাড়িয়াছে। মাহিনা এখন পায় ১২০ টাকা। উপরি আদায়ের জন্য সে বেশ হাত পাতিতে শিখিয়াছে।

প্রমীলার আর-একটি মেয়ে হইয়াছে। হরলিক্‌স্ ছাড়া আর কোনো খাদ্য তার পেটে সয় না। পুঁটিরাম নিজের কাপড়ে নিজে সাবান দেয়। এখন দাড়ি রাখিতেছে—অর্থাৎ ধোপা-নাপিত বন্ধ করিয়াছে। বাজে খরচ!

## নবম পরিচ্ছেদ

আরো দু' বৎসর পরে প্রমীলা আর একটি কন্যা প্রসব করিয়াছে। ডাক্তার বলিয়াছে, প্রমীলাকে মাঝে মাঝে যদি পশ্চিমে না পাঠানো হয় তো পরে জটিল ব্যাধির সৃষ্টি হইতে পারে। ভোরে উঠিয়া পুঁটিরাম তাই কাবলী-বস্তিতে ঘুরিতেছিল।

## দশম পরিচ্ছেদ

পুঁটিরাম মেশ ছাড়িয়াছে। সদা-সর্ব্বদা পাঁচ-ছ'টা কাবলী তার মেশের দ্বার চাপিয়া বসিয়া থাকে। পুঁটিরামকে দেখিলে যে-ভাবে চোখ রাঙাইয়া কথা কয়··· পুঁটিরামের মনে জাগিয়া ওঠে, কবে সেই ছেলেবেলায় পড়া আফগান যুদ্ধের ইতিহাস।

## একাদশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণ।···পুঁটিরাম গঙ্গার ধারে জেটিতে বসিয়াছিল। সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। আকাশ লালে লাল। পুঁটিরাম ভাবিতেছিল, প্রথম সংসারে ঢুকিয়া সারা আকাশ সে এমনি লালে লাল দেখিয়াছিল··

তার পর চাহিয়া দেখে, দূরে একরাশ কালো চিমনি বিশ্রামের পূর্ব্বে বুকের যত ধোঁয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। ওদিক্‌কার আকাশ মিশ্‌ কালো। ধূমাচ্ছন্ন আকাশের আড়ালে দুনিয়ার রঙ ঢাকিয়া গিয়াছে; কিছু দেখা যায় না।

পুঁটিরাম ভাবিল, তার সামনে সমস্ত ভবিষ্যৎ অমনি আঁধারে ঢাকা। কিছু দেখা যায় না, ওদিকে কি আছে।

জলের পানে চাহিয়া ভাবিল, আর ডাঙ্গায় থাকিয়া কি হইবে? জলের তলে বিরাম-শয়ন পাতি। সন্ধ্যা আসন্ন। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বুক-পকেটে একখানা কাগজ ঠেলিয়া উঠিল। বাহির করিয়া দেখে, প্রমীলার চিঠি। খরচের ফর্দ্দ পাঠাইয়াছে—

ছেলের স্কুলের মাহিনা—তিন মাসের
বড় খুকীর ফ্রক্ একটি
মেজ খুকীর জন্য অয়েল-ক্লথ
ছোট খুকীর জন্য চার শিশি হরলিক্‌স্ মিল্ক
দুই দেওরের একজামিনের ফী
দুই ননদের দুই জোড়া করিয়া শাড়ী
(সব ছিঁড়িয়া গেছে)
মায়ের জন্য একটি তামার কোশা
(যে-কোশা ছিল, ফুটা হইয়া গিয়াছে)

জল-তলে বিরাম-শয়নের কল্পনা উড়িয়া গেল। পুঁটিরাম খিদিরপুরের দিকে চলিল। ওদিককার কাবলীদের সঙ্গে পরিচয় নাই। অফিসের বন্ধু বিধু বলিয়াছে, তার জানা লোক আছে—মোমিন খাঁ। লোকটি ভালো। গোঁয়ার নয়—মেজাজ দেখিলে কে বলিবে, কাবুল-পেশোয়ার হইতে আসিয়াছে। লাঠি ঘাড়ে তাগাদা করিতে আসে না। তবে মাহিনা পাওয়ার দিন অফিসে আসিয়া হাজির হয়। ঠিক দিনটিতে টাকা না মিলিলে সে কাছারিতে যায়—নালিশ ঠুকিতে। পুঁটিরাম ভাবিল, মোমিন্ খাঁ তার saviour. উপস্থিত বাঁচিতে হইবে তো! জলের তলে বিরাম-শয়ন যদি পাতিতে হয় তো আর একদিন সে চিন্তা করিবে! গঙ্গায় অনেক জল। গঙ্গা দুদিনে শুকাইবে না!

# উদ্ধার

[ গল্প ]

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

একালের তরুণী স্ত্রীকে কি যত্নে স্বামীর প্রেম সজীব সজাগ-সবুজ রাখতে হয়, ওগো কলম-বিলাসী লিখিয়ের দল, তোমরা তার কি বা জানো, আর তার কি তত্ত্বই বা তোমাদের লেখায় পাই!

দিকে দিকে কত প্রলোভন—পুরুষ আজো এত কাব্য-চর্চ্চাসত্ত্বেও কৈ পারলো না তো, নারীকে কেন্দ্র করে তার চিত্ত-শতদল জাগ্রত রাখতে! অথচ এই নারী...

শয়নে-স্বপনে তার চিন্তার কি বিরাম আছে! সংসার তার—সব তার—অথচ সংসারে নারী একা।

ভূমিকা রেখে নিজের কথাই বলি।

চার বৎসর আমাদের বিবাহ হয়েচে।... হায় রে, চারটি মাত্র বসন্ত আমার মনের দ্বারে তার হাসি-গান-গন্ধের ডালি বয়ে এনেচে। পাঁচবারের বারে আমাকে সে ভুলে গেল। কোথায় রইলো তার ফুলের বর্ণ গন্ধ।—কোথায় বা বসন্ত-পূর্ণিমায় চাঁদের সে হাসি। কোথায় গেল সে পাপিয়া। বৈশাখের তীব্র দাহে আজ আমার আকাশ-বাতাস জ্বলে যাচ্ছে।

বাতাস চাই গো, বাতাস! আমার নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসচে। আলো, আলো! কোথায় সে আলো গো ...আমার চোখের দীপ্তি, মনের দীপ্তি—সব বুঝি অন্ধকারে মিশে যায়!

স্বামী! আমার 'পরে ছাড়া আর সবার 'পরেই তাঁর দৃষ্টি আছে!

সকাল হয়, আজ-কাল আমার যে কি হয়েচে—ঘুম ভাঙ্গে বেলায়। চোখ চেয়ে দেখি, আমার নিশি বহুক্ষণ পুইয়ে গেছে! বিছানায় আমি একা পড়ে আছি। স্বামী বিছানায় নাই! ঘরে নাই,—অন্দরে নাই—একবারে বাহির-বাড়ীতে গেছেন...তাঁর বসবার ঘরে। এর মধ্যে পাড়ার পাঁচজন এসেচে! সেখানে গল্প চলেছে, কাব্য চলেছে, পলিটিক্স চলেছে—সব চলেছে—অচল শুধু আমি! হায় নারী।

নীচে নেমে এলুম। চায়ের কেটলি পড়ে আছে। পঞ্চু বললে,—বাবুর চা খাওয়া হয়ে গেছে।

পঞ্চুকে ধমক দিলুম—আমাকে ডাকতে পারো নি! নিজেরা গিন্নীপণা সুরু করেচো!

সভয়ে পঞ্চু বললে,—দু'চারজন বাহিরের বাবু ছিলেন—বাবু আমায় বললেন, চা আন্...

তাই ভাবি, একবার কোনো সময়ে উনি বাড়ীর মধ্যে এলে কথাটা বলবো। কিন্তু মনের কি যে হয়েচে—কিছু আর মনে থাকে না! নিত্য এখন এমন হয়—নিত্য এই ভুল। পঞ্চুকে নিত্য এমনি বকি!

ওঁর বন্ধুদের উপর রাগ ধরে! সে উপায় যদি থাকতো, ঐ বাহিরের ঘরে গিয়ে সম্রাজ্ঞীর ভঙ্গীতে তাদের বলতুম,—এ উত্তম। তোমাদের কি বাড়ী নাই? ঘর নাই? সে বাড়ী-ঘরে দরদ করবে, সেজন্য স্ত্রী নাই...?

কিন্তু বাঙলার নারী চির-বন্দিনী...লোকাচারের লৌহ-কপাট অন্দরের কটা প্রাচীরের পিছনে তাকে বন্দী করে রেখেচে! বাহিরের লোকের পানে চোখ তুলে তার চাইতে মানা। তাদের সঙ্গে কথা কইতে মানা। নিষেধ—নিষেধের শিকল টেনে বাঙলার নারী চলে ফেরে—আজো! হাঁ, আজো, অন্ততঃ আমাদের এ-পাড়ায় তাই দেখচি!

স্বামী আসেন অন্দরে—স্নান সেরে। এসেই হাঁকেন,—ভাত দাও গো, ভাত। সবুর সইবে না! দত্তদের বাগানে মাছ ধরার আয়োজন! এখনি যেতে হবে। বাইরে ননী বসে আছে।

অভিমানের পাথর বুকে ধরে আমি এক কোণে চুপ করে বসে থাকি। আমার মুখে কথা ফোটে না। দূরে সরে থাকি! আমার পানে ফিরে তাকাবার ওঁর সময় হয় না! অথচ কোথাকার ননী এসে বসে আছে—তাই এমন তাড়া। তোমরা বলবে, আমি কেন কথা কই না?

কি করে কইবো গো! কথা মনে হলে চোখ আমার জলে ভরে আসে—কে যেন কণ্ঠ চেপে ধরে!

তাছাড়া যেচে মান, সোহাগ, আদর···তার জান্ কতটুকু!

সারাদিন স্বামীর আর দেখা নাই! চাকরির চেষ্টায় না কি ঘুরচেন! দরকার আছে, মানি। কিন্তু ছুটীর দিনটাতেও মানুষ···

আসল কথা, সে-টান ওঁর নেই! ছুটীর দিনে সভা-সমিতি, বন্ধু-বান্ধব, মাছ ধরা, তাস-পাশা, দাবা-লুডো··· বাহিরের ঘরে যেন মেলা বসে! সকলের দাবী মেটে! শুধু অভাগী স্ত্রী—তার কথা পুরুষ-স্বামীর মনে থাকে না।

রাত্রে উনি শুতে আসেন···তখন এগারোটা, বারোটা। সারাদিন বুকে এই নিঃসঙ্গতার বেদনা·· রাত নটা বাজতে ঘুমে চোখ ভরে আসে। সে কি আমার অপরাধ?

দিনে পাড়ার পাঁচজন মেয়েছেলে আসে। তাদের মুখে রাজ্যের কত খপরই পাই। কিন্তু আমার বেদনা···? আমার মত হতভাগিনী তোমাদের মধ্যে কেউ যদি থাকো তো শুধু সে-ই বুঝবে! যৌবনে যোগিনী···আমি যেন তাই!

সেদিন···বেলা তখন একটা···জানলার ধারে শুয়ে ছিলুম। রৌদ্র আসছিল—সেই রৌদ্রে ভিজা চুল মেলে ···হাতে ছিল একখানা উপন্যাস। নায়িকার বেদনায় মন তখন ভরে উঠেচে, উনি এলেন ঘরে। ব্যস্ত ভাব! এসেই ডাকলেন—শুনচো···ওগো···

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলুম। বললুম,—এসো গো। এ-বইখানা পড়ো। সত্যি· কি লেখাই লিখেচে! আমার চোখ জলে ভরে উঠেচে!

উনি হাসলেন, হেসে বললেন,—শোনো···শোনো··· বই রাখো।

উঠে দাঁড়ালুম। বললুম,—কিছু শোনবার প্রয়োজন নেই! তুমি শুধু চুপ করে বসে থাকো। কত দিন এমন করে আসোনি বলো তো···

উনি বললেন—হাবুল এসেচে তার স্ত্রীকে নিয়ে··· গাড়ীতে বসে আছে। তোমার গৃহে অতিথি! তুমি নিজে গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করে উপরে আনো।

হায় রে, আমার জন্য স্বামী অন্দরে আসেন নি! তাঁর বন্ধু-পত্নীকে আপ্যায়িত করবো—তারি অনুরোধ নিয়ে এসেচেন! আমার কথা আজ মনেও নেই। অথচ আমার বয়স এখনো উনিশ পার হয়নি! এই বয়সে ··

আসা-যাওয়ার চকিত-চমক—তাতেও আজ এমন স্বার্থ! অথচ একদিন ছিল···

নিশ্বাসের বোঝায় বুক আমার ভরে ভারী হয়ে আছে, সারাক্ষণ! এই বোঝার ভারেই এ নিশ্বাস একদিন একেবারে বন্ধ হবে···জানি, জানি। তার আভাস আমি পাই! তাই হোক্! তাই করো ভগবান্···ছোট এই নিশ্বাসটুকু তুমিই গ্রহণ করো।

এমন সুন্দর পৃথিবী···ছ'ঋতুর এই বিচিত্র লীলা! ঐ আকাশ, বাতাস—ফুল-ফল, নদী, নির্ঝর! নির্ঝর চক্ষে দেখি না, কাব্যে পড়ি—তবু···তবু···এ-সব ছেড়ে এই বয়সে চলে যাবো?

সে চিন্তাতে শিউরে উঠি! এত বেদনার মধ্যেও নারীর মত নির্লজ্জা দুনিয়ায় আর আছে কেউ?

বসে বসে অতীত দিনগুলোর কথা ভাবি! যখন বাপের বাড়ীতে থাকতুম, অতর্কিতে ওঁর সেই সেখানে যাওয়া···নিত্য সেই চিঠি লেখা···আদর-সোহাগের কি মালাই গাঁথতেন! আর আজ?

সে মালার ফুল ঝরে গেছে—ডোরটুকু অশ্রুর কালিতে কালো ঝুল!

কিন্তু না, না—এমন করে থাকা চলে না···আমি থাকবো না! মন গর্জ্জন তোলে···তোর কি নাই? এমন রূপ···মুখে এমন হাসি! তার উপর এ-কালের মুক্তির বাণী-ভরা দিক্-ভোলা দখিণ হাওয়া!

আশ-পাশ থেকে দৃষ্টির তীর গায়ে লাগে—আমি তা বুঝি! জানলায়, ছাদে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে খোলা আকাশের পানে একটু চাইবো, সে উপায় নেই! অমনি চারিদিক থেকে দৃষ্টি-শর! তীক্ষ্ণ তীর! এ তীর যারা নিক্ষেপ করচে···তাদের পানে চাইতে লজ্জায় মাথা কাটা যায়। ভয়ে শিউরে সরে আসি।

এমন হাওয়ায় বাস করেও মুক্তির জন্য আকুল হলুম না—এ দুঃখের কথা বলি কাকে!

লাইব্রেরী থেকে এ-বেলা, ও-বেলা বই আনাই—তাজা টাট্‌কা আনকোরা সব নতুন বই···কবিতা, উপন্যাস! তারা আমার কাণের কাছে কেবলি বলে,—কি যে বলে, বুঝি না! তবে মনে জাগে সেই কথা, সেই সুর—

পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি
আপন গন্ধে মম, কস্তুরী মৃগসম!

আমি যেন চিড়িয়াখানার সেই পিঞ্জরে পোরা বাঘ···তেজ আছে!—সে তেজ ফলাবার উপায় নেই! যেন হরিণ··· কিন্তু পিঞ্জরে বন্দী! দৌড়ের সীমা একেবারে গণ্ডী টানা।

কি অধম এই নারী-জাত!

শেষে বাহিরের সে তীরগুলা ঘরে এসে বিঁধতে লাগলো। দুনিয়ার লোক এমন বদ! নারীকে তার গৃহ-দুর্গেও নিরাপদে থাকতে দেবে না!

বেলা তখন দুপুর। পঞ্চু এসে বললে—একটি বাবু এসেচেন···

বাবু! আমি তার পানে চাইলুম—দৃষ্টিতে বিরক্তি! বললুম,—কে বাবু এসেচেন, তা আমাকে গিয়ে বৈঠকখানায় বাবুর জায়গায় বসতে হবে? তুই পাগল হলি পঞ্চু!

পঞ্চু বললে,—আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

আমার সঙ্গে! আমার বুক কেঁপে উঠলো। কে? কে এ বাবু?

পরিচিত জগৎটুকুর উপর দিয়ে আমার ভীত-কম্পিত মন বিচরণে চললো!...হাঁ—ঠিক। নিশ্চয় সেই লোক... সেদিন গঙ্গাস্নানে গেছলুম—ঘাটের রাণায় সে দাঁড়িয়েছিল, আমার উপর থেকে চোখের দৃষ্টি ফিরতে চায় না। লজ্জায় এতটুকু হয়ে কি করে এসে আমি গাড়ীতে বসলুম! সে কথা মনে পড়তে শিউরে উঠলুম। ভাবলুম, কি একখানা উপন্যাসে, না, গল্পে সেদিন পড়ছিলুম—নারীর মনে বিজয়িনী বাস করছে—নারীর অলক্ষ্যে সে চায় দুনিয়াকে শরে বিঁধতে, জয় করতে!

পঞ্চু বললে—বাবুর সঙ্গে গাঁটরি...

গাঁটরি! কৌতূহল হলো।

বললুম,—এই রোয়াকে ডেকে আন্।

পঞ্চু তাকে ডেকে আনলো। সে এসে বললে,—দেশী তাঁত বসিয়েছি...ভালো শাড়ী আছে। নেবেন?

বুঝলুম, শাড়ীর এই পশরা—এ ছল! ছুতো! আসলে চায়, আমার সঙ্গে আলাপ করতে—কথা কইতে! গল্পে-উপন্যাসে এই যে নূতন হাওয়ার কথা পড়ি—এ সেই হাওয়া! চুড়িওয়ালা না কি-একটা গল্পে পড়েছিলুম—পশরা নিয়ে আসা, তার পরে ঘনালো মস্ত ট্রাজেডি! বঙ্কিমবাবুর হরিদাসী বৈষ্ণবীর কথাও মনে পড়্লো!

গা কেমন জ্বলে উঠলো! তাকে প্রশ্ন কর্লুম—কীর্ত্তন-গান জানো?

সে আমার পানে তাকালো। কি করুণ মিনতি-ভরা দৃষ্টি। মৃদু স্বরে বল্লে—না।

ওরে নির্লজ্জ তরুণ! মনে হলো, আকাশখানা এখনো পৃথিবীর গায়ে ভেঙ্গে পড়চে না কেন?

পাথরের মূর্ত্তির মত অবিচল আমি দাঁড়িয়ে রইলুম! আর আমার চোখের সামনে গাঁটরি খুলে সে দু'খানা, চারখানা, দশখানা শাড়ী দেখালো। আমি কিছু দেখলুম না! মনের মধ্যে কে তখন হাতুড়ি পিটছিল—সারা দেহ কাঁপছিল যেন বাবলার পাতা...ভয়ে, ভাবনায়! এইবার...এইবার...এইবার হয়তো বলবে—সেই নিদারুণ বাণী...জনম-অবধি হাম রূপ নেহারনু—নয়ন না তিরপিত ভেল!

কিন্তু সে-কথা সে বললে না! তার পরিবর্ত্তে বললে,—বাবুরা বাড়ী নেই বুঝি?

শয়তান! যেন জানে না, বোঝে না! এ সময়ে কোন্ বাবু বাড়ীতে থাকে! কোনোমতে বললুম,—শাড়ী নেবো না।

কথাটা বলে বীরেন্দ্রাণীর ভঙ্গীতে একেবারে দোতলায় নিজের ঘরে এসে বিছানায় কম্পিত দেহ লুটিয়ে দিলুম। দু'চোখে কোথা থেকে সাগরের জল ঢেউ তুলে বয়ে এলো।

...এ কি নির্লজ্জার মত বাহিরের সামনে আজ আমাকে দাঁড় করালে প্রভু!...

চোখের জল শুকোলে নীচেয় নামলুম। এসে দেখি, লোকটা গাঁটরি নিয়ে চলে গেছে!

শয়তান—অভদ্র—ইতর! এমনি করে নারীর সর্ব্বনাশের পশরা নিয়ে বেড়াও বটে!...ইতর! বদমায়েস!

উনি এলে ওঁকে কিন্তু এ কথা বলতে পারলুম না!

তবু কি নিস্তার আছে! দুনিয়া জুড়ে শয়তানের বাসা! এ হাওয়ায় এত লোকের মনে দুঃসাহস জেগেচে! প্রচণ্ড স্পর্দ্ধা!

আর একদিন। বেলা তখন চারটে, পঞ্চু এসে বললে,—একটি ভদ্রলোক এসেচেন...বাবু পাঠিয়েচেন! আপনার সঙ্গে কথা কইতে চান।

আমার সঙ্গে কথা! মনে যেন আগুন জ্বললো! বাবু পাঠিয়েচেন? ভদ্রলোককে?

ওঃ! সন্দেহ! স্বামী এমন ইতর হয়েচেন! ছি! বুঝেচি—সেদিন সেই শাড়ীর পশরা নিয়ে এসেছিল, গোপনে তার কথা জেনেচেন! রাগ হলো! দুঃখও! লজ্জায় মাটীতে মিশে যাবার বাসনা জাগলো! কিন্তু না...দেখি, আরো কত আমাকে সইতে হয়!

আসুক ঝঞ্ঝা—মহিমময়ীর বেশে সে ঝড় বুকে নেবো!

বললুম—ডেকে আন্।

ভদ্রলোক এলেন। আজ কিন্তু আমার বুক কাঁপলো না...পা টললো না। এ লজ্জা, এ অপমান স্বামীর দেওয়া! বুঝি, সেই অভিমানে! স্থির অবিচল কণ্ঠে বললুম—কি চান?

ভদ্রলোক বললেন—হার্ম্মোনিয়মটা দেখতে এসেচি! কি না কি খারাপ হয়েচে...

এ-ও ছল—বুঝলুম। ভদ্রলোককে ঘরে ডাকলুম। তিনি হার্ম্মোনিয়ম দেখতে লাগলেন...আমি দ্বারের বাহিরে দাঁড়িয়ে রইলুম। মনে আমার যে আগুন জ্বলছিল...তার তেজে বোধ হয় দশটা পৃথিবী পুড়ে ছাই হয়ে যায়!

আমার সঙ্গে এ চাতুরীর কি প্রয়োজন ছিল?

সন্দেহের কথা স্পষ্ট প্রকাশ করতে কেন বাধলো ? এমন করে দুপুরবেলায় 'স্পাই' পাঠানো ! বটে ! মন ঝেঁজে উঠছিল !

ঘরের মধ্যে হার্মোনিয়ম বাজলো—সে কি আর্ত্তনাদ! তার বুক যেন ফেটে ছিঁড়ে যাবে! সে আর্ত্তনাদ করুণ নয়…শান্ত নয়…তীব্র ঝাঁজালো !…সে রবে কাণ যায়, প্রাণ যায়—মানুষ পাগল হয় !

আধ ঘণ্টা পরে ভদ্রলোক চলে গেল। আমি কাঠের মত দাঁড়িয়ে দেখলুম ! বুঝলুম,—লোকটা ঐ বাজনার সুরে তার প্রাণের ব্যথা জানাতে এসেছিল। ওরে দুর্বৃত্ত পুরুষ—নারীকে তুই এমনি সুলভ, লঘু ভাবিস !…

এ কথাও স্বামীকে বললুম না !

তার পর আর একদিন। সেদিনও বেলা তখন দেড়টা—এক ভদ্রলোক এসে উপস্থিত। হাতে বাঁধানো খাতা…নিশ্চয় কবিতা-লেখা খাতা !

ধোপা এসেছিল—বাহিরের ঘরের তক্তাপোষে যে চাদর পাতা ছিল, সেটা ময়লা হয়েচে—কাচতে দেবো কি না, চোখে দেখে দি—চিরদিন। তাই বাহিরের ঘরে আসছিলুম, হঠাৎ লোকটির সঙ্গে চোখো-চোখি হলো…

তার চোখের দৃষ্টি…কি বলে' চেয়ে থাকে অমন করে! দু'পা সরে এলুম। মৃদু স্বরে ডাকলুম—পঞ্চু ··

পঞ্চুর সাড়া নেই। আবার ডাকলুম,—পঞ্চু…

স্বর এবার উচ্চ। তবু জবাব মিললো না !

রাগ হলো। সদর দোর খোলা…যে-সে লোক এসে বাড়ী ঢুকচে, চোরের ভয় একালে তত নেই, মানি… কিন্তু ভয় করি আজকালকার এই লেখকদের। যে রকম বেপরোয়া ভয়ঙ্কর গল্প লেখে—মনে যদি মোহ জাগে!

ডেকে ডেকে গলা ভেঙ্গে ফেললুম। পা কাঁপছিল। মাঝখানে শুধু একটা দেওয়ালের আড়াল ! কণ্ঠস্বর তাই কর্কশ রুক্ষ করলুম ! যদি তেমন কোনো উদ্দেশ্য থাকে, বুঝবে, এ নারী সহজ নয়, ভীমা ভৈরবী !…

সহসা মনে পড়লো, ঠিক…পঞ্চুকে পাঠিয়েচি শৈলজার বাড়ী। শৈলজা একটা উলের প্যাটার্ণ দেবে… সেই জন্য।…তাহলে উপায় ?

পাড়ার লোক…কে বা এখন আছে ! দরকার হলে কাকে ডাকবো ? তার পর মনে হলো, ভয় পেয়েচি, এটা না বুঝতে পারে ! কোনোমতে সাহসে ভর করে প্রশ্ন করলুম,—কি চান আপনি এমন সময়ে ?

সে বললে,—ইলেকট্রিকের মিটার দেখতে এসেচি।

—যান…

আমার সামনে দিয়ে লোকটা বৈঠকখানায় গিয়ে ঢুকলো। মীটারবোর্ড বৈঠকখানার দেওয়ালে। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম !…

এক মিনিট। সে বাহির হয়ে গেল। যাবার সময় আমার পানে চাইলো—আমার বুকটা ধ্বক্ করে উঠলো…এবার বুঝি প্রেমের কোনো কথা শোনাবে আমার কাণে! সারা অঙ্গ রী রী করে উঠলো—ঘৃণায়, লজ্জায়। একটু ভয় পেলুম ! চেয়ে দেখলুম—ঐ যে রোয়াকের গায়ে হেলানো মাছ কোটবার বঁটী · কিসের ভয় ?

সে বললে,—বোধ হয় লিক্ করচে…এবারে বেশী উঠেচে। কথাটা বলে' সে চলে গেল !…

তার স্পর্দ্ধা দেখে আমার আপাদ-মস্তক জ্বলে উঠলো! আমার বাড়ী ইলেক্‌ট্রিক বিল যদি বেশী হয়—সেজন্য তোমার এত মাথা-ব্যথা কেন ? কেন এ দরদ ? আমার বুঝতে বাকী রইলো না—এ দরদ মীটারের উপর নয়—আমার উপর! ঐ ছলে আমার সঙ্গে একটু আলাপ !

ওঃ, এ পৃথিবী এমন…নারীর বিরুদ্ধে এমন চক্রান্ত ! এর উপর তোমরা আবার নারীর পর্দ্দা ফাঁশাতে চাও!

এ অপমানও নীরবে সইতে হলো! স্বামীকে বলা চললো না! হা রে জন্ম-দুঃখিনী নারী !

সন্ধ্যায় স্বামী এসে ডাকলেন—বীণা…

আমার বুক দুলে উঠলো। মনে পড়লো আবার এতদিনের পরে ?

কাছে এসে দাঁড়ালুম—চোখে করুণ মিনতি ভরে'। কিন্তু তিনি তা দেখলেন না! বললেন—চট্ করে দু'পেয়ালা চা দিয়ে পাঠিয়ো…আমার এক বন্ধু এসেচেন। তাঁরা এ পাড়ায় উঠে আসচেন। মানে, মোড়ে ঐ যে বাড়ীটা খালি আছে। ভালো কথা, চন্দ্রকান্তবাবু… তুমি তাঁকে চেনো গো !

চন্দ্রকান্ত বাবু! আমার আপাদ-মস্তক শিউরে উঠলো! হ্যাঁ, বাপের বাড়ীর কাছে থাকতো। তখন আমরা দুজনেই ছোট। একসঙ্গে খেলা করেচি, গল্প করেচি। বৌ-বৌ খেলাও—দশ-বারো জনে মিলে—চন্দ্রকান্ত বর সেজেচে, আমি বৌ…কখনো সে দাদা, আমি ছোট বোন…

উনি বলিলেন—ভালো কথা, তোমার ছেলে-বেলাকার বন্ধু ছিল সে! বলছিল…তোমরা একসঙ্গে খেলাধুলা করেচো…

লজ্জা, রাগ, দুঃখ,—কি যে না হলো, বুঝলুম না। মনের মধ্যে যেন ঝড়ের ঘূর্ণী বয়ে গেল! আমি বললুম—আর কি বলেচে, শুনি ?

আবার কি বলবে? বাড়ীর মধ্যে এলো না। বললে, না, থাক্, আজ বড্ড দেরী হয়ে গেছে, আর একদিন আসবো'খন! এ-পাড়ায় তো উঠে আসচি !…তা আমি ছাড়লুম না…বললুম, অন্ততঃ এক পেয়ালা চা…

উনি চলে গেলেন। ষ্টোভ জেলে জল গরম করে আমাকেই চা তৈরী করতে হলো।…মেয়ে-মানুষের জন্মটাই যে বিরাট অভিশাপ! একে স্বামীর মনে বিরাগ, কাব্যে-উপন্যাসে এদিকে এই বিশ্রী সুর, তার উপর ছেলেবেলাকার খেলার সাথী চন্দ্রকান্ত হঠাৎ এসে হাজির হলো।…আমার দু'চোখ ফেটে জল এলো…এ নিয়তির চক্রান্ত!

অনেক রাত্রি। শুতে এসে উনি বললেন—চন্দ্রকান্ত আমাদের খুব মুরুব্বি হয়ে উঠেচে গো। দুই ছেলে, এক মেয়ে। মেয়েটির বয়স প্রায় সাত বছর। খুব অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল…না?

বললুম—হ্যাঁ।

মনে পড়ে বেশ—তার বিয়ের রাত্রির কথা। আভাসে আমায় কোনোদিন জানায়নি, যে আমায় ভালোবাসে …বিয়ের দিনেও না! আমারো কোনোদিন এমন কথা মনে হয় নি। বৌ-বৌ খেলা তো বৌ-বৌ খেলা! কিন্তু এখন এই সব গল্প-কবিতা পড়ে বুঝচি, মনের মধ্যে ভালোবাসা নিশ্চয় জন্মেছিল। তেমন হাওয়া পায়নি বলে মস্ত সম্ভাবনা মাটী হয়ে গেছে।

আজ বোধ হয় ওর সে-কথা মনে পড়েচে! আমার সঙ্গে খেলার স্মৃতি! তাতে দেখা দিয়েচে প্রেমের কমল …তাই আসচে এ-পাড়ায় বাস করতে! এত দিনের পর…

না হলে এত দিন কোথায় ছিল! হঠাৎ এ পাড়ার উপর আজ এমন মায়া কেন হবে? হলেও এ বাড়ীতে কেন সে আসবে? এলেও আমার সঙ্গে দেখা করতে তার পা জড়িয়ে যাবেই বা কেন? মনে যদি কালির রেখা না থাকতো, সোজাসুজি এসে আমাকে ডাকতে পারতো তো,—ওরে ও বীণা…

তা যখন নয়, তখন নিশ্চয় ওর মনে অভিসন্ধি আছে, গূঢ় অভিসন্ধি! এ'ও আজ নারী-মনস্তত্ত্বে ওস্তাদ হয়ে উঠেচে! সেই বাল্য-প্রেম…

তাই ভাবি, নারীকে কত সতর্ক হয়ে চলতে হয়! ভাগ্যে ভগবান্ তাকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়েচেন…ছায়া দেখে ভাগ্যে সে সাবধান হতে শিখেচে!…

চন্দ্রকান্ত বাবুর যাতায়াত এ বাড়ীতে বাড়লো। সন্ধ্যা হলেই এসে উদয় হন—নিত্য! বাহিরের ঘরে পুরা দমে তাস-পাশা চলে…ওঠবার নাম নেই। উনি আগে যদি শুতে আসতেন রাত্রি এগারোটায় তো এখন আসতে লাগলেন, বারোটার পর।…

এক দিন দু'হাতে বুকখানাকে চেপে ধরে প্রশ্ন করলুম,—ওগো—এত রাত্রি অবধি কেন জাগো? অসুখ করবে যে…

হেসে উনি বললেন,—খেলা চুকলে চন্দ্রকান্ত বাবুর লেখা শুনি। উনি নাটক লিখচেন। খাসা লেখেন।

আবার লেখা! ওগো মা গো, এই লেখার বিষেই আমার জীবন যাবে। যেতে বসেচে। এই লেখার হাওয়াতেই স্বামী আজ দূরে দূরে আড়ালে আড়ালে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আর পাঁচজনে নানা ছলে আমার সামনে এসে উদয় হচ্ছে! এ অনাসৃষ্টি লেখা কি বন্ধ হয় না? স্বয়ং নিয়ে যে এদিকে লাঠালাঠি চলে!

সেদিন—উনি তখন বাড়ী নেই, কোথায় গেছেন, হঠাৎ চন্দ্রকান্ত এসে উদয় হলো—একেবারে বাড়ীর মধ্যে…

রোয়াকে বসে চুল বাঁধছিলুম, চমকে ধড়মড় করে উঠে পড়লুম।

বললুম—চন্দরদা…

চন্দরদা বললে,—অবিনাশের (স্বামীর নাম অবিনাশ) আজ ফিরতে দেরী হবে বীণা। আমি বাইরে বসে আছি, শশধর বাবু এসেচেন। চা চাইছেন—তোমার চাকরটাকে পাচ্ছি না…

—ও!

চন্দরদা ফিরলো। আমি বললুম—একটু বসো না, চন্দরদা। বাড়ীর সকলে কে কেমন আছে, শুনি।

চন্দরদা যেন হাওয়ায় চড়ে এসেচে! বললে—না, ওঁরা বসে আছেন। আমার চাল দেওয়া বাকী। দাবা চলেছে।

চন্দরদা চলে গেল। দাঁড়ালো না, ফিরলো না! আমার আর বুঝতে বাকী রইলো না, চন্দরদার এখানে আসবার অর্থ কি! হায় রে, ছেলেবেলায় কবে একদিন খেলার ঘরে বৌ-বৌ খেলা খেলেছিলুম বলে ভাবে, আজো সে ছেলেমানুষী-খেলার স্বপ্ন আমার এ-বুকে স্মৃতির রেখায় আঁকা আছে! পুরুষমানুষগুলো এমন নির্বোধ, এত অহঙ্কারী হয় কি করে!…

দুঃখ আমার বেড়ে চললো! আগে যেখানে মাছ ধরা, আর সভা ছিল, সেখানে এসে জুটেচে এখন চন্দরদার নাটক!

রাত্রি তখন নট'…শুয়ে একখানা মাসিক পত্রের পাতায় চোখ বুলোচ্ছিলুম!

একটা কবিতা চোখে পড়লো…

বীণা, আমার বীণা!
আমার ব্যথায় আমার সকল সুখে—
আমার প্রাণের সুরটি তোমার বুকে
বলো, বলো, বাজে কি না?

এ কি! এখানেও! কে লিখলো এ কবিতা?

এমন ইতর স্পর্দ্ধা···! আমার নামে এমন কবিতা লিখে তা ছাপিয়ে বিশ্বের দরবারে প্রকাশ করে!

তলায় দেখি, নাম ছাপা রয়েচে—শ্রীবিনোদলাল হালদার। কে এই বিনোদ হালদার?···

আমার দেখা-না-দেখা, কাগজে-পড়া ছোট বড় রাজ্যগুলোয় ঘুরে খুঁজতে লাগলুম···বিনোদ! কে কোথায় এমন বিনোদ আছে···আমায় দেখেচে···? চোখে? না, আবছায়ে? না, ফটোগ্রাফে···?

ঠিক।

আমার বয়স তখন ন'বছর···বাড়ীতে আমার টিউটর ছিলেন একজন—কে হালদার। নামটা ভুলে গেছি। পুরুষের নাম কে মনে রাখে? বিশেষ পর-পুরুষ! প্রবন্ধ-টবন্ধ লিখতেন। পাগলাটে গোছ! বুঝলুম, এ তাঁর কীর্ত্তি! যেন আমি তাঁর ধ্যানে আকুল···তাঁর সুখ, তাঁর দুঃখের ভাবনায় অধীর অস্থির হয়ে আছি! আমার স্বামী···সংসার···যেন কিছু নেই! সেই লক্ষ্মী-ছাড়া মাষ্টার মশাই···একটা কবিতা লিখে নিজেকে এমন দিগ্‌গজ ঠাওরেচে যে, কুল-নারী আকুল হয়ে তার মূর্ত্তি ধ্যান করবে! তার সুখ-দুঃখ চিন্তা করবে!

কাগজখানা ছুড়ে ফেলে দিয়ে জানলায় এসে বসলুম···বাহিরে কালো আঁধারে ঢাকা রাত্রি। আমার মনের পটে তেমনি আঁধার!···

অপমানে আমার চোখে জল এলো!···

কত আর সইবো গো!...নিঃসঙ্গ, একা···স্বামীর আদর-প্রেম-হারা অভাগিনী···

তার উপর নূতন বিপদ! স্বামীর বাড়ী ফেরায় নানা গোলযোগ ঘটতে লাগলো। আগে ঠিক সময়ে ফিরতেন। আমার কাছে না আসুন, বৈঠকখানায় তো থাকতেন! এখন সে জায়গায় বাড়ী ফেরেন কোনোদিন রাত নটায়—কোনো-দিন বা একটাতে···

সেজন্য লজ্জা নেই, সঙ্কোচ নেই—মুখে-চোখে অপরাধের কোনো চিহ্ন নেই!···তার বদলে উচ্ছ্বসিত অধীর আবেগ!

এসে আমার পানে চেয়ে বলেন,—ও গো, আজ একেবারে···

চোখের জল সামলে নিয়ে আমি বলি,—তোমার খাবার দেখি। বলে ঘর থেকে বেরিয়ে ছাদে চলে যাই। পড়ে পড়ে কাঁদি আর কাঁদি!···তার পর কখন্ এক সময় কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ি! ঘুম ভাঙ্গে, দেখি, রৌদ্র মেখে পৃথিবী তপ্ত হয়ে উঠেচে···বেলা দেখি সাড়ে সাতটা-আটটা।

যখনি উনি ফিরতে রাত্রি করেন,—তখনি ঘটে এই ব্যাপার। বুঝি, ব্যবধান বেড়ে চলেছে, বেড়েই চলেছে!···

কিন্তু এমন করে আর পারা যায় না যে গো! ক্লান্ত মন···শ্রান্ত দেহ···লোকের কাছে এ কান্নার কি কৈফিয়ৎ দেবো? লোকে বলবে কি? তারা যদি জেনে ফেলে—এই বয়সে আমি স্বামীর প্রেমে বঞ্চিতা···

না গো না! সে-লজ্জা দুঃখের চেয়েও অনেক বেশী! দুঃখ সইতে পারি। যত কঠিন সে দুঃখ হোক্! কিন্তু কারো কৃপা বা করুণা—না, তা সহ্য হবে না!···

মাকে চিঠি লিখলুম—অনেক দিন তোমাদের দেখিনি মা—একদিন যাবো, ভাবচি।

উনি বসে দাড়ি কামাচ্ছিলেন, গিয়ে বললুম,—একটা অনুরোধ আছে। রাখবে?

অতি দীন করুণ স্বর! নিজেই সে স্বরে চমকে উঠলুম। উনি আমার মুখের পানে চাইলেন, বললেন,—ইস্···একেবারে শ্রীমতী বিনয়াবনতা দেবী।

আমি বললুম,—না, তামাসা নয়!···সত্যি···

উনি বললেন,—কি বলবে?···বলো···

বললুম,—অনেক দিন মার কাছে যাই নি। ভাবচি, যাবো। যদি অনুমতি পাই!

উনি হো-হো করে হেসে উঠলেন, বললেন,—এর জন্য শব্দকল্পদ্রুম সাজচো কেন? অনুমতি, বিনয়! ছি-ছি বীণা! বেশতো, যাবে। তোমার যখন ইচ্ছা হয়েচে, ঘুরে এসো···

পা টলতে লাগলো! এই চার বৎসরমাত্র বিবাহ হয়েচে! স্বামী সানন্দে বললেন,—যাও বাপের বাড়ী...

তাঁর বুক কাঁপলো না—স্বর অবিচল রইলো! অথচ একদিন ছিল, সেদিন···

বাপের বাড়ী যাবার আগের রাত্রে আমার বুকে মাথা রেখে সারা রাত কেঁদে কাটিয়েচেন! হাঁ গো, কেঁদে। কেঁদে! দুজনে একসঙ্গে কেঁদে রাত্রি কাটিয়েচি! আর আজ?

ওরে হতভাগিনী, জীবনের আশা এখনো করিস। এখনো।···

যাবার দিন স্থির হয়ে গেল। স্বামীর সেদিকে খেয়াল নেই! তিনি তাঁর বন্ধু-বান্ধব, খেলা, আমোদ নিয়ে সমানে মত্ত আছেন! আমার বিসর্জ্জনের বাঁশী বেজেচে বলে কি ওঁর আনন্দ বাদ পড়বে?···এ কথা কেন যে ভাবি!

উনি গেছেন বাইরে। বেলা পাঁচটায় আমার বিদায়-বেলা। পঞ্চুকে আর ঠাকুরকে চার্জ্জ বুঝিয়ে দিলুম সংসারের গৃহিণীপণার···

কি করে চোখের জল চেপেছিলুম, তা আমার অন্তর্যামীই জানেন!

তার পর ওঁকে চিঠি লিখলুম,—ওগো, এমনি করেই

আমার মনের দীপ নিবিয়ে দিলে ! ফুলশয্যার রাত্রের সে ফুলের মালার গন্ধ যে আজো আমার মন থেকে মিলোয় নি !...

পঞ্চু একখানা চিঠি নিয়ে এলো—ডাকওয়ালা দিয়ে গেছে। রেজেষ্ট্রী চিঠি !

উনি বাড়ী নেই। সই দিয়ে সে চিঠি আমায় নিতে হলো...

কৌতূহল হলো। কিসের চিঠি ? পড়লুম। যাবার বেলায় অপরাধ ! যদি করে থাকি...অন্তর্যামী ভগবান্, তুমি আমার মন বুঝে সে-অপরাধ ক্ষমা করো !

এ কি—চিঠি !...

—ওয়াজিলপুর ষ্টেটে ওঁর চাকরি হয়েচে...ষ্টেটের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট দেওয়ান। অবিলম্বে যাত্রা করা চাই !—

আমার সব আয়োজন পণ্ড হলো। মার কাছে যাওয়া হলো না !

উনি এলেন। চিঠি দেখে আমায় বুকে জড়িয়ে কি আদর ! বললেন,—কি করে দিন কাটছিল, জানো না বীণ ! তোমার কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা হতো ! তোমার রঙীন ভবিষ্যৎ, তোমার জীবনটাই বুঝি অভাবের গদায় চূর্ণ করে দিলুম। তাই ফাঁকে ফাঁকে বাজে খেলা-গল্পে মনকে ডুবিয়ে রাখতুম। যেখানে যেখানে চাকরি খালি দেখেচি, দরখাস্ত পাঠিয়েচি। শেষে এই চন্দ্রকান্ত বাবুর কথায় দিলুম ছেড়ে এক দরখাস্ত ওয়াজিলপুর ষ্টেটে। পোষ্টটার মাহিনা মাসে তিনশো টাকা। চন্দ্রকান্ত বাবুর শ্বশুর সেখানকার জজ। তাঁর দৌলতে...

আলো ! আলো...!

স্বামীকে পেলুম...ফিরে পেলুম...ফিরে পেলুম !...

তার পর এই লক্ষ্মীছাড়া পাড়া। এই তাসের আসর, থিয়েটারের রিহার্শাল—স্বামীর মুখে পরে শুনেচি—ফিরতে কেন তাঁর রাত্রি হতো। তার কারণ, চন্দ্রদার সঙ্গে তাঁর নাটকের রিহার্শালে যেতেন !

এ সব থেকে আজ তাঁকে উদ্ধার করেচি। আমারো উদ্ধার হয়েচে। নূতন দেশে যাবো,—সংসার পাতবো—সেখানে হতভাগা বন্ধু নেই, তাসের আসর নেই। সেখানে শুধু উনি আর আমি।

যাবার উদ্যোগ করচি। স্বামীর কাছ-ছাড়া হলে আর সকলে কেমন করে সে দুঃখ সয়ে হাসি-মুখে দিন কাটায়, জানি না। আমি তো যেতে বসেছিলুম ! আজ জিনিষপত্র গুছোচ্ছি আর ভাবচি, সত্যি, সেখানে পৌঁছে নতুন করে ফুলশয্যা পাতবো !

তোমরা হেসো না গো ! আমার যে মনে হতো...কত কি—তা তোমরা কি বুঝবে

# কবিতা ও গান

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

## কবিতা

### প্রথম দর্শন

এ কি হর্ষ। প্রাণে আজ কি পুলক-লীলা।
উদ্দাম ঝঙ্কার আজি বিরাম হৃদয়ে।
শুষ্ক তরুসম ছিল মানস আমার—
আজি শত পুষ্প-লতা বসন্তের বায়ে
ওঠে বিকশিয়া মরি,—শোভা কমনীয়!
আজি চির-স্বপনের ধ্যান-ধ্যেয় ধন
মূর্ত্তি হয়ে পশিয়াছে মোর চিত্ত-ভূমে;
সাহানায় বাজে বাঁশী! প্রণয়-রতন
কি কিরণ-দীপ্তি মরি করে বিকশিত!
এ চায় হৃদয়ে তব বরগুঞ্জমালা—
তারি মধ্যমণি হয়ে আমার এ প্রেম
রাজিবে শাশ্বত-শ্রী, তব বক্ষে ঢালা!
ওগো সখা, আজি তব প্রথম-দরশে
কাঁপিছে মানস মম প্রণয়-পরশে!

১৩০৮

---

### রূপ ও প্রেম

যৌবন নব জাগিবে যেদিন,
প্রেম দিবে তারে তুলিয়া—
যে তোমারে সখি, হৃদয়ের সনে
চাহিবে আপনা ভুলিয়া!
দিন চলে যায়, ফোটে নব দিন
প্রতি-প্রভাত-অরুণ-বিকাশে—
রূপ ঝরে যায়, মাধুরী মিলায়—
উষা-রাগ দিবা-প্রকাশে!
মুক্ত স্বচ্ছ আকাশের মত
মাধুরী-সুষমা ও দেহে!
আঁখি দু'টি যেন দু'টি শুক-তারা
কি মায়া-কুহক সে বহে!
দিবসের তাপ যেমনি ফুটিবে,
মিলাবে সে হায় সজনি!
কুহক-স্বপন কোথা রবে, যবে
ফুরাবে জ্যোৎনা-রজনী!

উষার মাধুরী, নিশীথিনী মায়া
ক্ষণেকে সে যায় ঝরিয়া!
দিবসের তাপ—ধূ-ধূ দাহ ফোটে—
স্বপন লুকায় সরিয়া!
তাই বলি সখি, যৌবন-উষায়
প্রেম দিতে কভু ভুল না!
হেথা পুরুষের প্রেম—যে সে প্রেম নয়—
শুধু রূপের সাধন-ছলনা!

১৩০৯

---

### অসহ্য সহন

তুমি বুঝি ভাবিতেছ, তোমার নয়নে আমি
দেখি নাই উচ্ছ্বসিত বারি?
তুমি বুঝি ভাবিতেছ, আমি সখি শুনি নাই
তব গীতি-করুণ-লহরী?
অকম্পিত অচঞ্চল হৃদয়েতে হায়,
আমি যে তা সব সহিয়াছি!
তবু ভাঙ্গে নাই প্রাণ! অটুট, অটল আছে—
তবু আমি প্রাণ ধরে আছি!
নীরব সে দীর্ঘশ্বাস, তুমি ভেবেছিলে হায়,
কারো নাহি পশিবে শ্রবণে!
হায় সখি, জানো না কি, তোমার মনের ভাব
ঝঙ্কারিয়া ওঠে মোর মনে!
দুটি বিন্দু অশ্রু তব কি ব্যথা আঁকিল হায়,
এই তপ্ত পরাণে আমার!

একটি সে দীর্ঘশ্বাস— সারা চিত্ত মর্মরিয়া
তুলিল কি তীব্র হাহাকার !
এই বক্ষ—সব ওগো, সব সহিয়াছে—
তবু আছে অটুট, অচল !
তোমা ছাড়া হয়ে আজি এখনো, এখনো মোর
রহিয়াছে,—ছিল যা সকল !
তুমি কি আমার ব্যথা আজিকে বুঝিবে সখি,
এই চিত্তে কি আগুন জ্বলে ?
সেই তব অধরেতে সরিল না ভাষ ; মৃদু
দীর্ঘশ্বাস—সব দিল বলে !
বৃথা এ নয়ন-জল,— বৃথা এ সাধনা, জানি !
মুছে ফ্যালো অশ্রু আঁখিকোণে—
সকল গিয়াছে ; শুধু স্মৃতিকণা আছে পড়ি
এক পাশে মনের গহনে।
সে স্মৃতি হৃদয়ে তব যদি গো অনল জ্বালে—
শোনো,—তবে মিনতি আমার,—
ভুলিয়ো আমারে তুমি—স্মৃতিরে দলিয়ো পায়ে -
স্মৃতি লয়ে বেঁচে থাকা ভার।

১৩১০

## পূর্ণিমা-রাত্রে

রজত-কিরণ-বাসে আবরিয়া তনু
সেজেছে প্রকৃতি যেন রূপসী নবীনা—
বিপুল-প্রীতির বশে ঘোমটা খুলিয়া
চেয়ে আছে বিশ্বপানে যেন স্বপ্নলীনা !
নীরব আকাশ ওই চন্দ্ররশ্মি-করে—
চাহে বাঁধিবারে তায় প্রেম-আলিঙ্গনে—
প্রকৃতি হাসিছে তাই। ক্ষুদ্র নদী পাশে-
শুভ্র বারি বহি চলে অলস গমনে।
বিভোর তন্দ্রার ছায়ে। নেশা-মাতোয়ারা
যেন নিখিলের বুক করেছে চঞ্চল !
সুমধুর মলয়ের মৃদুল নিশ্বাস
লুটায় পল্লববক্ষে আবেশ-বিহ্বল !
অদূরে অশোক-তলে পুষ্পিতযৌবনা
আমার কল্পনা চাহে বাজাইতে বীণা !

---

## যৌবনের সুর

তখনো নিশীথ আছে !
উষার কনক-কিরণের রেখা
ঝরিয়াছে গাছে গাছে !
মন্দিরে শুনা যায়
পুণ্য-আরতি-প্রভাতী-শঙ্খ
নির্মল এ উষায় !
মৃদু-মধু বায়ু বহে।
গঙ্গা-পুলিনে বসিয়া ভক্ত
ধেয়ানে মগন রহে।

শয়ন ছাড়িয়া আমি
উষার ভ্রমণে বাহির হলেম
স্মরি অন্তরযামী !
চলিতে শুনিনু দূরে—
গরজন আর মিনতি-বচন
পথে কুহরিছে সুরে।
দাঁড়ানু অন্তরালে—
বুঝিনু সকল,—পড়িয়াছে চোর
পাহারওলার জালে।

পাহারওয়ালা বলে,—আরে··
দেবো দুটি কাণ মলি—
কোথা লয়ে যাস্ বাসনের বোঝা ?
করিস্ নে চতুরালী !

চোর কহে, বাপ, ছাড়ি আগে হাঁক,
ওগো ভগিনীর পতি,
তোমার সঙ্গে চতুরালী ! ছি ছি,
হবে না সে দুর্মতি !
শুন পরিচয়, পাগড়ী-মুশয়,
আমি তো তোমার··· ।
মিথ্যা ছাড়িয়া বলিব সত্য।
মিথ্যায় বহু জ্বালা।
কাচ্ছা-বাচ্ছা লয়ে ঘর করি
এই দুঃখের দিনে,—
কেহ নাহি দাদা দরদী বন্ধু—
শুধু এই তোমা বিনে !
বেকার বেচারা পেটে নাই ভাত,
রাস্তায় পড়ে মরি'—
তুমি নিয়ে যাও থানায় যতনে
তোফা জেলে দাও ভরি'—
মিছা কথা মুখে আটকায় না কো—
বলার ভঙ্গী খাশা !
চুপ করে শুনি—তাক্ লেগে যায়—
জেলে গিয়ে বাঁধি বাসা !
অন্ন দু'বেলা জোটে। নাই দুখ—
নাহি কাবুলীর ভয় !
বাড়ীওলা, মুদি—পথ নাহি রোধে।
এ যে কৃপা, কৃপাময় !

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভালো কথা, নিজের কথাতে
আসল কথা যে ভুলি !
অভ্যাস-দোষ ! ও লাল-পাগড়ী
ধরে বিস্মৃতি-তুলি !

মনে পড়ে দাদা, সেই মাতামাতি ?
সেই পথে পথে খেলা ?
তোমাতে-আমাতে ছেলেবেলা হায়,
সেই প্রমোদের মেলা ?
আমি বলিলাম,—দারোগা হবেই—
আমারে যে ভুলে রবে !
তুমি বলিলে সে,—আরে রাম, রাম,
এমন কখনো হবে ?
তার পরে সখা—কত না গ্রীষ্ম,
কত না বর্ষা-শীত—
এলো—চলে গেল কত ঝড়-জল —
হিতে হলো বিপরীত !
এ-পথে ও-পথে চলি-ফিরি দোঁহে—
চোখে-চোখে দেখা নাই।
বলি, আছো ভালো ?—ভবিষ্যৎ খাশা ?
বলো—ভুলো না কো ভাই !
ভাবো রে বন্ধু, অতীত কাহিনী—
কত সুখে দিবা-রাতি—
মনে কি পড়ে না—সুখিয়ার সনে
সেই কত মাতামাতি !
হাঁ, হাঁ, ভালো কথা—সুখিয়া বলেছে,
তুলি শোনো তার ব্যথা—
তোমারি সঙ্গে দেখা হলে যেন
বলি আমি সেই কথা !
সে বলে—আমি যে চাতকীর মত
তার দরশন-আশে !
অর্থ বুঝেচো ? অর্থাৎ তোমা'
সুখিয়া চাহিছে পাশে।
আমি হেথা-সেথা নিতুই ঘুরি হে,
না পাই তোমার দেখা—
আজিকে মনেতে ফিকির তাইতে
সহসা হইল লেখা !
ভাবিলাম,—তুমি দারোগা-সুজন,
সুজনে দেখিতে নারো !
দুর্জ্জন-চোরে দেখিলে অমনি
ক্যাঁক্ করে চেপে ধরো !
ভাবিলাম, তাই আছে তো বাসন—
তারি বোঝা বহি মাথে—
নিশি-শেষে তব দরশ মাগিয়া
বার হবো এই পথে !
যা মনে করেছি, সে আশা পূরেছে।
তুমি বলো মোরে—'চোর।'
তোমারি কাজেতে হেন অপবাদ,—
একি দুর্গ্রহ মোর !

পাহারওয়ালা ক্ষণ রহে চাহি—
বচন মুখে না সরে—
বুঝি সে ভাবিল—এ কি বলিতেছে ?
সুখিয়া আবার কে রে ?
না মানে দুষ্ট—তিলেক সরম—
সেটা যে চোরের মণি।
ভাবিলাম আমি—দেখি কোথা রয়
মেড়ুয়া-বুদ্ধিখানি।
কহে পুন চোর—শুন কথা মোর—
সুখিয়া দিয়াছে বলি—
তার হয়ে দুটি চুম্বন-রেখা
আঁকিতে তোমার গালে।

এতেক ভাবিয়া যাহা নহে, তাই !
পাহারওলারে ধরি—
দাড়ি-গোঁফে ভরা সেই মুখে কি না
চুম্বন করে। হরি।

চোখ মেলি চাহি—সাবাস বুদ্ধি !
ঐ যায় চোর ছুটে !
সাবাস রে চোর—বুদ্ধির জোর।
নিড়ি মেড়ুয়ারে লুটে।
মেড়ুয়া-রতন জাগিলে চেতনা
কহে বুলাইয়া দাড়ি,—
'ভোরের বেলায় এ কি মহা দায় !
ভেবে ছেড়ে যায় নাড়ী !'
আমি কহিলাম,— 'হে নগরপাল,
এমনি বুদ্ধি তোর !
চোখে ধূলি দিয়া তোকা পলাইল,
এ ভোরে চতুর চোর !'

কহিল কোটাল, 'আরে বাবু, বোঝো,
সুখিয়া সুখিয়া কয়ে
প্রাণটা আমার করে চুরমার !
কেমনে বা থাকি সয়ে !

আমার এ প্রাণ সদা আন্‌চান্‌,
কে কোথা বাসিল ভালো!
চোর শয়তান— যেন তা জানিত—
তাই এত বলে গেল।
যাও, যাও বাবু আপনার কাজে—
এ কথা বলো না কারে।
ছুটী লয়ে ছুটি প্রেয়সীর পাশে,
মন ঠিক করিবারে!'

বেচারা কোটাল ধীরে চলে যায়
চেয়ে থাকি তার পানে—
সারা নিশীথের কি স্বপন-রাগে
কোন্‌ সুর-ভোলা গানে,
বিরহীর বুক উথলি উঠিল—
বেকুব বনিল হা রে!
ফুলশর হেন উষায় বিঁধিল
প্রাণ-ভরা হাহাকারে।

# গান

[ রূপদক্ষ বন্ধু শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর আমেরিকা-যাত্রার প্রাক্কালে আর্ট থিয়েটার্শ তাঁকে যে অভিনন্দন-দানের ব্যবস্থা করেন—২১ ভাদ্র, ১৩৩৭—সেই অনুষ্ঠানের জন্য এই গানটি বিশেষভাবে রচিত ও শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার মল্লিক কর্তৃক গীত হইয়াছিল ]

বাঙ্গালার নাটমন্দিরে তুমি করিলে মহিমা-উজ্জ্বল।
আরতির দীপশিখার পরশে নাশিলে তিমির-কজ্জল!
অমৃত মন্ত্রে দিলে প্রাণ, রূপ, আশা,
বিমল হাসি-ভাতি, নব সুর-ভাষা—
অতীত ভারত-জীবন-সাগরে করিলে মুক্ত উচ্ছল!
ধূপ-গন্ধে শুভ শোচন-পুণ্য
নাট্যবেদীরে করিলে ধন্য—
জ্যোতির রাগে গরব-গণ্য, শুভ্ররুচির নির্ম্মল!
তোমার পূজার কুসুম-গন্ধ,
তোমার মন্ত্রবাণী
সিন্ধুপারের জনগণ-মন
মুগ্ধ আনিল টানি।
চাহে তারা আজি তোমারে নিকটে—
বরণ-পিয়াসী—হৃদয়ের তটে;
মানস-বিজয়ে হও হে যাত্রী! গাহি তব জয়-গান!

---

( সাধারণ নাট্যপীঠের উদ্বোধন-অনুষ্ঠানের জন্য রচিত )

জয় জয় নাটেশ নর্ত্তেশ নটরাজ রুদ্রপাল!
নাটেশ্বর গলাবলম্বলম্বিত-সাপমাল।
ডম ডম ডম ডডম ডডম ডম্বরু ঘন বোলে,—
চঞ্চল-চল তাণ্ডবে বাহু-চরণযুগল দোলে!
চন্দ্রশেখর-বাঘাম্বর জ্বলৎ-বহ্নিভাল!
নট-বিলাস-নাট্যপীঠে প্রমোদ-বোধন-রাতি—
উজ্জ্বল রাখো শঙ্কামোচন, বিতর লোচন-ভাতি!
অশিব হরো হে শঙ্কর শিব,—শির-ধর-জটাজাল!

( রঙ-মহলের উদ্বোধন-নিশির উৎসব-অনুষ্ঠানের জন্য রচিত )

রঙ-মহলের মহাল আজি আলোয় ভরো। ( হে নটনাথ )
তোমার চরণপরশে তায় ধন্য করো!
তোমার নাচের তালে-তালে উঠুক ভরি—
রসের লীলায় সুরের ধারা পড়ুক ঝরি—
প্রমোদ-উজল রাখো নাটের অঙ্গন হে!
তোমার বিষাণ-ওঙ্কারে সব শঙ্কা হরো!
তোমার জটায় লীলাময়ী গঙ্গাসম
পুলক-নির্ঝর নিত্য ঝরুক মধুরতম—
তোমার অটল আসন পাতো এ মন্দিরে।
সফল-আশার প্রদীপ জ্বালো হে সুন্দর।

---

[ নিম্নলিখিত গানগুলি বেহালা অপেরা পার্টি-অভিনীত 'সুরথ-সুধন্বা' নাট্যলীলার জন্য রচিত হয়—১৩২৬ ]

১

রাখো চরণে হে শিব, বিনাশো বিঘ্ন, বিঘ্ন-বিনাশন!
তাপিত ভীত চিত! হে হর, ভয় হর, ভব-ভয়-ভঞ্জন!
রাখিতে অতীতে নারীর লজ্জা,
নয়নে ধরিলে ভ্রূকুটি-সজ্জা—
দহিলে মদন, দেব-ত্রিলোচন, হে শিব-শম্ভু অশিব-বারণ!
বিজন বনপথ—আঁধার ঘনঘটা—
নয়নে জ্বালো প্রভু অভয় আলো-ছটা—
চরণাগতা দাসী ডাকিছে অনাথা—
চরণে রাখো তারে—দাও হে শরণ!

২

সাজো হে সাজো সমর-সাজে,
সাজো হে দেশবাসী!
জাগাও নব-চেতনা হে বীর,
সুপ্তি-ঘন নাশি!

বাজুক ও ভেরী উচ্চ রবে, মিল হে বাল-বৃদ্ধ সবে—
অস্ত্র-সয়ে এসো আহবে, ছাড়ি বিলাস-রাশি।
মন্ত্রী, সত্বরা দেশের মাঝে
প্রচারো—যে না সমর-সাজে
আসিবে,—যাবে মৃত্যু-লোকে তপ্ত তেলে ভাসি!
অটল ধ্রুব এ পণ মম, হবে না তিল ব্যতিক্রম—
প্রাণের প্রিয় তনয় হলেও—এ-পণ অবিনাশী!

৩

চাহি না, চাহি না সুতে—হেরিব না মুখ তার।
কলঙ্ক দিল কুলে—প্রাণে দিল দুখ-ভার!
স্নেহসুধা দিয়া যারে প্রাণের অধিক করে'
পালিনু! সে ফণী হয়ে দংশিল প্রাণে আমার!
কুলের পাবন—সে কুল-নাশন!
মানিল না স্নেহ—পণের শাসন!
অটল মম পণ—ত্যজিবে জীবন—
নাহিক ক্ষমা তার—নাহিক নিস্তার!

৪

পরাণে নাহি সাধ,—কি হবে থেকে তবে?
পরাণ-মণি বিনে পরাণ কিসে রবে?
আপন-হাতে হায় রোপিনু আশা-তরু—
সুরভি-কানন আজি সে ধূ-ধূ মরু!
মমতা স্নেহ-মায়া ঝরিয়া গেল সবে!
সে-হীন সংসার এ—ভরা কি আঁধারে—
সে কোথা গেল? অনল জ্বালো।
অনলে মম প্রাণ তাহার সাথী হবে!

---

[আমার রচিত 'স্বয়ংবরা' নাটক-অবলম্বনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানি কর্তৃক "সাবিত্রী" টকি-ফিল্ম গঠিত হয়। সেই টকি-ফিল্মের জন্য নিম্নলিখিত চারিখানি সঙ্গীত বিশেষভাবে লিখিত হয়]

(প্রস্তাবনায়—back-ground নেপথ্য-সঙ্গীত)

১

ওমা,
সেই গহন বনে, রাতের ঘন অন্ধকারে
প্রাণের স্বজন বক্ষে—মরণ এলো দ্বারে!
দেখি তার রুদ্রবরণ, রক্ত আঁখি, কঠিন মতি—
মাগো, তুই শঙ্কাহীনা, জ্যোতির্ময়ী জাগলি সতি
দেখি সে দীপ্ত তেজে স্তব্ধ চরণ! মরণ হারে।
অতীতের এ গল্প-কথা নয় মা জানি—
ভারত আজো স্মরণ করে অমর-বাণী;
তোমার নতি জানায় সতি, ছন্দ-হারে!

২

দ্যুমৎসেন।
সকল ছেড়ে এলেন যখন বনে—
সেদিন হতে জেনেছিলেম মনে,
ঘর-ছাড়া এই পথের 'পরে
স্নেহ-মায়া দেছ ভরে'
তোমার আকাশ-বাতাসে এই বিহঙ্গ-কূজনে!
ভাবি, চাওয়ার পালা শেষ হয়েছে,
কখন যাবো পারে—
উদাস মনে বসে আছি জীবন-নদীর ধারে!
তবু এ-মন কিসের আশায়
ঘরের পানে ফিরে তাকায়—
ধরা দিতে চাহে আবার বাসনা-বন্ধনে!

৩

দ্যুমৎসেন।
জাগো, জাগো হে অন্ধ নয়নে—
নির্ব্বাণ-দীপ জ্বালো।
দেহ অন্তরে শুভ চেতনা,
জগত-প্রকাশ আলো।
সমীরে শিখায়ে দিয়েছ যে-প্রীতি—
মুক্তির গাথা গেয়ে যায় নিতি!
জ্যোতির বারতা আনে তব রবি
ঘুচায়ে তামস-কালো!

৪

দ্যুমৎসেন।
মনের আলো নিবে এলো, ঘনায় অন্ধকার!
আকাশে কার কাঁদন জাগে, জাগে হাহাকার।
কেন এমন নীরব পাখী?
গান ভুলে সে গেল না কি?
বনে কি ফুল ফুটলো না হায়!
পাই না কেন গন্ধ তার?
কত কথা—যাই যে ভুলে।
আকুল পরাণ উঠছে দুলে।
বাতাস কেন পরশ-হারা?
বুকে ব্যথা, বেদন-ভার?

শেষ


বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির